সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন।

—সম্পাদক—

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

—দ্বিতীয় বর্ষ—

কার্ত্তিক ১৩২০ হইতে আশ্বিন ১৩২১।

ময়মনসিংহ।

বার্ষিক মূল্য—দুই টাকা।

PUBLISHED FROM

RESEARCH HOUSE—MYMENSINGH.

বিষয় সূচী।

চিত্র-সূচী।

—

সঙ্গীত ও সৌরভ।

ইটালী প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত ললিত কুমার হেম কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

Asutosh Press, Da
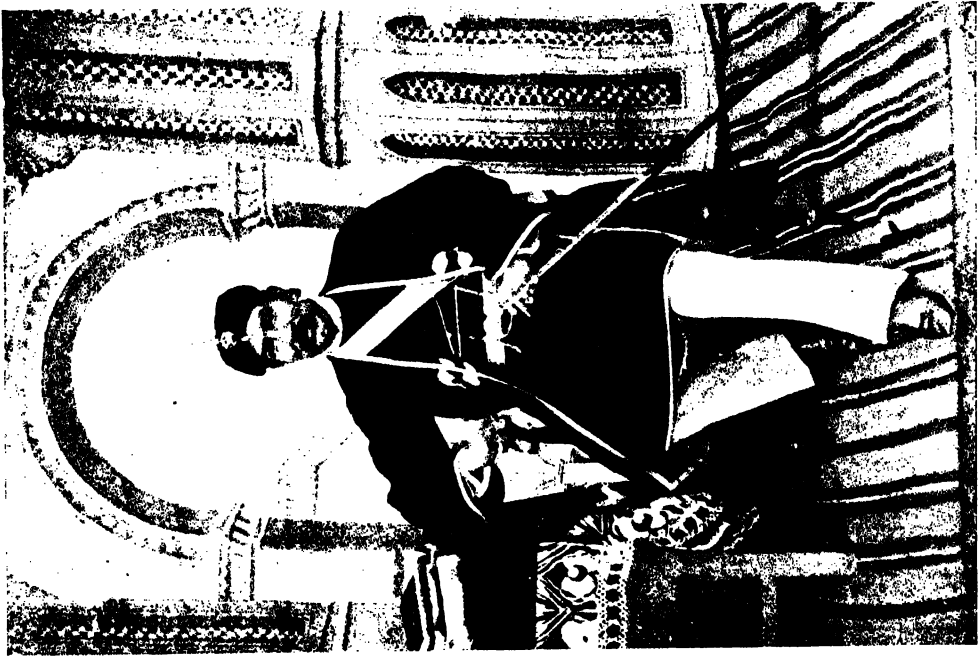
মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর।
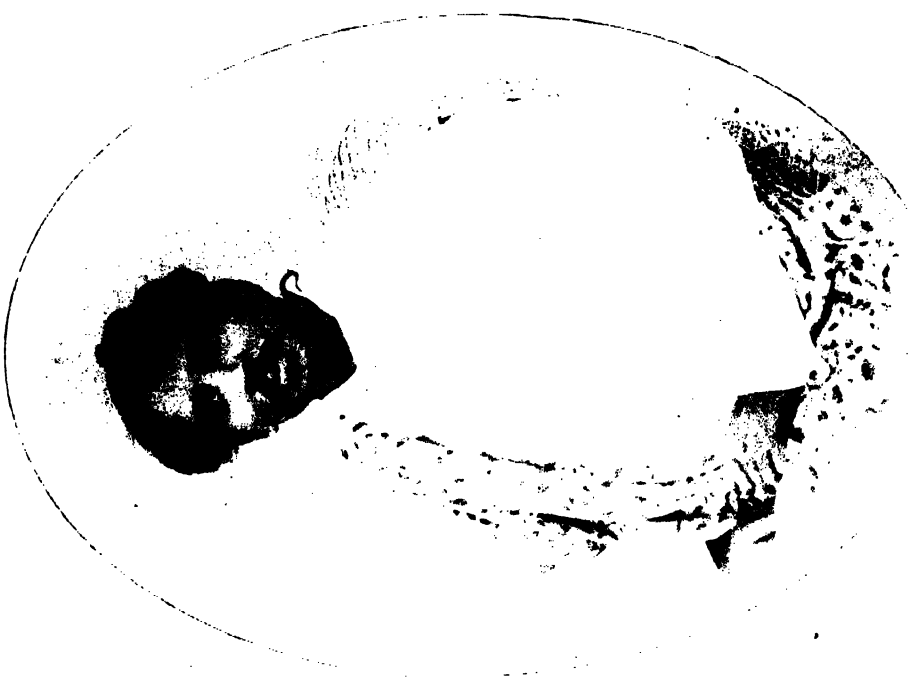
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

Ashutosh Press, Dacca.

সৌরভ

দ্বিতীয় বর্ষ। ময়মনসিংহ, ১৩২০। প্রথম সংখ্যা।

সৌরভের নব সাধনা।

কোন্ কোন্ পুষ্টিকর খাদ্যে সাময়িক সাহিত্য সবল হয় এবং সুস্থ থাকে, তাহা নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসার অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। শিক্ষার প্রচার, ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, সমাজের সংস্কার লইয়া তিনি ব্যস্ত ছিলেন। তৎকালে সাময়িক সাহিত্য উক্ত তিন বিষয়ের বাগ্‌বিতণ্ডায় বল সঞ্চয় করিয়াছিল। এক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত কবিতায় কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি করিতেন। অন্য সময়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "রহস্য সন্দর্ভ", এবং "বিবিধার্থ সংগ্রহ" জ্ঞান বিজ্ঞানের উপাদেয় খাদ্য যোগাইত। হুতুমী ভাষা এবং আলালী ভঙ্গী এক নূতন উপচার। ভাষার যদি হৃদয়, মন, শরীর ও আত্মা থাকে, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রই "বঙ্গদর্শনে" উহার শক্তি ও স্বাস্থ্যের নিদর্শন দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি যাহা বুঝিয়াছিলেন এক শ্রেণীর লেখক তাহা অন্যরূপ বুঝিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন——টীকা টীপ্পনিতে পাশ্চাত্য গ্রন্থের বহু উল্লেখই বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চায় এক মাত্র বাহাদুরী। তখন সাময়িক সাহিত্যে "Vide Volume"এর অতিশয় আধিক্য। দেখিতে দেখিতে চীন পরিব্রাজক হিয়েনথ সঙ্গ, ফাহিয়ান্ ইত্যাদি না হইলে আর সাময়িক পত্রের সম্ভ্রম থাকিত না। শিলালিপি এবং তাম্রশাসন— অন্য এক যুগ। বৌদ্ধদেবের প্রভাবে সাময়িক পত্র এখন আর এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। নিশিকান্ত এক সময় রুষ-কাহিনী লিখিয়াছিলেন। তদবধি ভ্রমণ বৃত্তান্তের অন্ত নাই। বর্ত্তমান সময়ে সাময়িক পত্রে গল্প না থাকিলে পাঠকের মন মাত্রই মজে না। গল্পের চাপে কবিতার কাকলী হারিয়া গিয়াছে।

উপরে যে কয়েক প্রকারের খাদ্যের উল্লেখ করা হইল, উহাদের সকল গুলিরই প্রয়োজন ছিল। দেহ এবং ধাতু বুঝিয়া উহার পরিমাণ লইতে হয় এবং সময় অনুসারে প্রয়োগ করিতে হয়। পঞ্জিকাকার প্রতি তিথিতে একই প্রকারের খাদ্য নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যেও একই প্রকারের সুর সর্ব্বদা ভাল শুনায় না। উহাতে শক্তি ও স্বাস্থ্য লাভ ত দূরের কথা, সাহিত্য চর্চ্চায় অরুচি এবং অবসাদ আনয়ন করে।

দেশ কাল পাত্র অনুসারে সাহিত্যে নূতন নূতন অঙ্গরাগ হইয়া থাকে। ইংরেজি সাহিত্যে তাহাই হইয়াছে। এডিসন এবং জনসনের লিপি ভঙ্গি এখন অচল। বিলাতী সাময়িক পত্রগুলির একটা বিশেষত্ব এই—প্রত্যেকেই নূতন নূতন বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন। একের পত্রে প্রকাশিত চিত্র অন্য পত্রে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বিলাতী সাময়িক পত্রের বৈচিত্র্য এবং বিপুলতার কারণ ইউরোপীয় জাতির নিত্য নূতন কর্ম্ম ক্ষেত্র। সাগর ও পর্ব্বত তাহাদের আয়ত্ত। সামরিক অভিযানে তাহারা অগ্রদূত। বর্ত্তমান সময়ে আকাশ

পথে পুষ্পক রথ উড়িয়া চলিয়াছে। তাহাদের স্বাধীন সমাজ এবং স্বাধীন সামাজিক রীতি নীতি সাহিত্যের প্রসার বাড়াইয়া দিয়াছে। এই সকল ব্যাপারের বর্ণনা সাময়িক পত্রগুলিকে সজীব করিয়া রাখে। উহাতে অর্থব্যয় আছে, অধ্যবসায় আছে। আমরা এতদুভয়েই দরিদ্র। নানা খাদ্যে সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্টি করিবার সামর্থ্য অর্জ্জনের পথ হইতে আমরা এখনও বহুদূরে।

সৌরভ সাহিত্যের সাধনায় কোন্ কোন্ উপচার অতি মাত্রায় কিম্বা অল্প মাত্রায় বিতরণ করিতেছে, সে বিচার আমরা করিব না; সৌরভ, ময়মনসিংহের অনাবিষ্কৃত তথ্য সংগ্রহে যত্ন করিয়াছে; ইতিহাস্ ভূগোলে, লোক-চরিত্র এবং প্রত্নতত্ত্বে—যাহা জ্ঞাতব্য যথাসাধ্য তাহার সন্ধান লইয়াছে। ময়মনসিংহের প্রবীণ লেখকগণের চিন্তা সংগ্রহ এবং নূতন লেখকের সৃষ্টি সৌরভের সাহিত্য সাধনার এক প্রধান অঙ্গ। আমরা গতবর্ষে বহু পুরাতন এবং নূতন লেখকের সহায়তা পাইয়াছি।

বর্ত্তমান বর্ষে আমরা আর একটী কর্ত্তব্য বৃদ্ধি করিয়া লইলাম। আমরা আমাদের জেলা—ময়মনসিংহের চিত্র-শিল্পিগণের অঙ্কিত চিত্র সমাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিব। উপন্যাসের অপূর্ব্ব চরিত্রগুলির ভাব বিকৃত করিয়া ফেলিবে ভয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কখনও চিত্রকরের সহায়তা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার সে সময় এখন নাই। বটতলা, কালীঘাটের দিন গিয়াছে। চমৎকারিত্বের হাটে এখন আর শিশুবোধকের "বৃষকেতু" বিকায় না। তবুও এদিকে বহু উন্নতি করিতে হইবে। চিত্রে ভারত ইউরোপের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। চিত্রে বর্ণের বিন্যাস এবং ভাবের বিকাশ এক কথা নহে। ভাবব্যক্তি প্রতিভা সাপেক্ষ। ময়মনসিংহ দুই একটী চিত্রকর-প্রতিভার স্পর্দ্ধা করিতে পারে। আমরা এই স্পর্দ্ধার পরিধি বর্দ্ধিত দেখিতে চাই। চিত্র সাহিত্যে প্রাণ সঞ্চার করে—বর্ণনায় চিত্ত আকৃষ্ট হয়। সৌরভের উৎসাহে আর দুই চার জন, যদি তুলিকার সম্মান রক্ষা করেন, তাহা হইলে আমরা আমাদের যত্ন সার্থক জ্ঞান করিব।

আমাদের কোন্ পন্থা অবলম্বনীয়?

ব্যষ্টি ভাবে প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে এবং সমষ্টি ভাবে প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে এমন একটা সময় আসিয়া উপস্থিত হয় যে তখন স্বতই জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্তি হয়— "ভোগেই সুখ, অথবা ত্যাগেই সুখ?" বর্ত্তমান কালে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এই প্রকার জিজ্ঞাসার সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার মূল মন্ত্র—"জ্ঞানই শক্তি" (Knowledge is power) এবং ভারতবর্ষীয় (প্রাচ্য) শিক্ষার মূলমন্ত্র—"জ্ঞানই মুক্তি"। পাশ্চাত্য শিক্ষা বলিতেছেন—এই শক্তি লাভের উদ্দেশ্য—নিত্য নূতন অভাব কল্পনা করতঃ তাহা পূরণের চেষ্টা। এক কথায় বলিতে গেলে পাশ্চাত্য শিক্ষা পার্থিব ভোগ মূলক এবং ভারতীয় আর্য্য শিক্ষা ভোগবাসনা ত্যাগ মূলক। ত্যাগের দৃঢ়ভিত্তির উপরই প্রাচ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য শিক্ষা বলিতেছেন—"ভোগেই সুখ" এবং প্রাচ্য শিক্ষা বলিতেছেন—"ত্যাগেই শান্তি এবং তাহাতেই সুখ।" "ত্যাগাচ্ছান্তিঃ", এবং "অশান্তস্য কুতঃ সুখম্!" মানবের সুখ ও শান্তি দুইটী বিভিন্ন অবস্থা। অনেকেই পার্থিব ভোগ বিলাসে সুখী হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার পক্ষে শান্তি লাভ নাও ঘটিতে পারে। বাস্তবিক সুখ অপেক্ষা শান্তি যে অধিকতর স্পৃহনীয়, তাহাতে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। প্রচলিত কথায়ও বলা হয় যে, "সুখ অপেক্ষা শোয়াস্তি ভাল"। ভোগ দ্বারা ক্রমে ভোগবাসনা বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়, তাহাতে শান্তি লাভের আশা সুদূর পরাহত।

"কামঃ কামোপভোগেন ন যাতি সাম্যতাং,
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভি বর্দ্ধতে।"

বাসনা ক্ষয় করিতে না পারিলে শান্তি লাভের সম্ভাবনা নাই এবং বাসনা ক্ষয় দ্বারাই মুক্তি লাভের আশা করা যায়। ইহাই ভারতবর্ষীয় ঋষিগণের প্রায় সর্ব্ববাদি সম্মত মত। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে—আমরা বর্ত্তমান সময়ে কোন্ পন্থা অনুসরণ করিব? ভোগের পথ, কি ত্যাগের পথ? জড় বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি সহকারী পাশ্চাত্য জাতিগণ জগতের

উপর প্রভূত ক্ষমতা বিস্তার করিতেছেন এবং পার্থিব ভোগলালসার চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হইতেছেন। আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার অধীনে থাকিয়া ক্রমশঃই ভোগবিলাসী হইতেছি এবং ত্যাগের মহিমাও ধীরে ধীরে বিস্মৃত হইতেছি। পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানের কতক গুলি উপপত্তি (Theory) কণ্ঠস্থ করিয়াছি বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সেগুলির যথাযথ প্রয়োগ করিয়া বিদ্যার সাফল্য প্রতিপাদন করিতে পারিতেছি না। এই অবস্থা যে তাদৃশ বাঞ্ছনীয় ও প্রকৃত উন্নতির পরিচায়ক নহে, একথা বোধ হয় কোনও বিবেচক ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন না। সত্য বটে আমরা অধুনা শিল্প বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিতেছি, তাহাতে কিছু সাফল্যও লাভ করিতেছি, কিন্তু তাহা প্রচুর নহে। আমার সন্দেহ হয়, আমরা ক্রমে—"শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ" এই দুই পথ হইতেই ভ্রষ্ট হইতেছি। সময়োচিত সতর্কতা অবলম্বন না করিতে পারিলে আমরা "ইতো ভ্রষ্ট স্ততো নষ্ট" হইবই। পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞান আমাদিগকে অনেক শিক্ষা দিতে পারে, একথা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য, কিন্তু কল্যাণময়ী শ্রুতি বলিতেছেন যে এমন পদার্থ অবগত হও যাহা জানিতে পারিলে জগতে আর কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকিবে না। তাহা কি? "আত্মা" বা "ব্রহ্ম"। শ্রুতি বলিতেছেন "আত্মা বা অরে মন্তব্যঃ শ্রোতব্যো নিধিধ্যাসিতব্যশ্চ,তস্মিন্ জ্ঞাতে সর্ব্বমেব বিদিতং স্যাৎ এবং ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।" উপনিষৎ বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন—"নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্" এবং ইহাও বলিতেছেন যে—বিদ্যা দুই প্রকার, অপরা ও পরা। ঋগ্‌বেদাদি (কর্ম্মকাণ্ড) ও অন্যান্য শাস্ত্র (শিল্প প্রভৃতি) "অপরা" এবং জ্ঞানকাণ্ড (ব্রহ্মবিদ্যা) পরা। পরা তদক্ষর মধিগম্যতে, 'যে বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মলাভ হয় তাহাই পরা"।

আমার মনে হয় পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞান যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, ততই তাহা ভারতের ব্রহ্ম বিদ্যার সন্নিহিত হইবে। আমরা দেখিতে পাইতেছি—পাশ্চত্য ব্যক্তিগণ এখন যেন কেবলমাত্র জড় বিজ্ঞানের আলোচনায় তেমন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না! বোধ হয় তাঁহারা যেন কতকটা শান্তির অনুসন্ধানে স্পৃহাবান হইয়াছেন। চতুর্দ্দিকের লক্ষণ দেখিয়া অনুমান করিতে ইচ্ছা হয় যে, আজ কাল সমগ্র পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী ভারতের অধ্যাত্ম চিন্তা লাভের জন্য লালায়িত হইতেছেন এবং অচিরে সমস্ত পাশ্চত্য জগৎ ভারতীয় ঋষিচরণে প্রণত হইবেন এবং সেই দিনই ভারতের প্রকৃত গৌরব রবি পাশ্চাত্য গগনে উদিত হইয়া ভাস্বর দীপ্তিতে শোভমান হইবে।

সৌভাগ্য ক্রমে হিন্দুর নিকট এখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানের দ্বার সমভাবে উন্মুক্ত। ইচ্ছা করিলেই এখন হিন্দু উভয় রত্ন ভাণ্ডার হইতে প্রভূত রত্ন সম্ভার আহরণ করতঃ ভারত মাতার শিরোভূষণে স্তরে স্তরে সজ্জিত করতঃ তাঁহাকে জগতের সমক্ষে মহিয়সী সম্রাজ্ঞীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন।

আমার বোধ হয়, হিন্দুই জগৎকে সভ্যতার পূর্ণ মূর্ত্তি দেখাইতে পারিবেন। কারণ জ্ঞান বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন তাঁহা দ্বারাই সহজে সাধিত হইবার আশা আছে। বর্ত্তমানে এই শুভ চেষ্টার যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অবহেলায় হারাইলে আমাদিগকে পরিণামে অনুতপ্ত হইতে হইবে। আমাদের পিতৃ পুরুষের সযত্নে রক্ষিত রত্ন ভাণ্ডারে যে সমস্ত রত্ন বিরাজিত আছে, তাহার প্রকৃত মর্য্যাদা আমরা যেন বুঝিতে পারিতেছিনা এবং ঘরের লক্ষ্মীকে যেন আমরা পদাঘাতে বিদূরিত করিতেছি।

আমরা বর্ত্তমান সময়ে কতকটা পরপ্রত্যয়নেয় বুদ্ধি হইয়াছি। ইহাতে বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই। আমাদের ধীশক্তি কতকটা ক্ষীণ হইয়াছে সত্য কিন্তু ভাগ্য ক্রমে তাহা একবারে বিলুপ্ত হয় নাই, কারণ এখনও বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ন্যায় ধীশক্তি সম্পন্ন মহাত্মা আমাদের দেশে জন্ম গ্রহণ করিতেছেন। এই মহাত্মা নিজের উদ্ভাবিত অভিনব বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে,ভারতের সনাতন শ্রুতি বাক্য "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" কেবল মাত্র দার্শনিক কল্পনা নহে; ইহা বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং জলন্ত সত্য। এই মহাত্মা অধুনা বহু গবেষণা দ্বারা অভিনব যন্ত্র সাহায্যে

ইহাও প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, জীবজগতের ন্যায় উদ্‌ভিদ্ জগতও প্রাণ বিশিষ্ট এবং তাহাদেরও সুখ দুঃখানুভূতি আছে; বলিতে আনন্দ বোধ হয় যে মহর্ষি মনু বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছেন যে "অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখ দুঃখ সমন্বিতা"। আমার পুনঃ পুনঃই বলিতে প্রবৃত্তি হয় যে, পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞানের উন্নতি সহকারী ভারতীয় ঋষির বেদালব্ধ জ্ঞান সমস্তই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে এবং ঋষিগণ যে বাস্তবিকই ত্রিকাল-দর্শী ছিলেন, ইহাতে আর কাহারও সন্দেহ থাকিবেনা! আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—হিন্দু সন্তান যেন মোহান্ধ হইয়া একবারেই পাশ্চাত্য বিলাসের স্রোতে ভাসিয়া না যান।

সত্য বটে পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞান আমাদিগকে অনেক অভিনব বিষয় শিক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু আমাদের অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের নিকট ও পাশ্চাত্য জাতির শিক্ষনীয় বিষয় আছে এবং এ বিষয় আমরা তাঁহাদের গুরু স্থানীয় হইবার স্পর্দ্ধা করিতে পারি—একথা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। আমাদিগকে সর্ব্বদাই এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, "ভারতঃ কর্ম্মভূমিস্তু অন্যেতুভোগ ভূময়" এবং আমরা ভারতীয় আর্য্যবংশ সম্ভূত। সংসারে বাস করিয়া নির্লিপ্ত ও নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম সাধন করাই শ্রীভগবানের আদেশ। কর্ম্মেই আমাদের অধিকার আছে মাত্র কিন্তু কর্ম্ম-ফল দাতা ভগবান। "কর্ম্মণ্যেবাধি-কারস্তেমাফলেষু কদাচন।" কর্ম্ম ত্যাগ প্রকৃত ত্যাগ নহে; কর্ম্ম-ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। বনে গেলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। সন্ন্যাস বনে নহে কিন্তু মনে। একথা প্রকৃতই বলা হইয়াছে:—

"বনে হপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং
নিবৃত্তরাগস্য গৃহন্তপোবনম্।
অকুৎসিতে কর্ম্মণিয়ঃ প্রবর্ত্ততে
গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহস্তপঃ।"

ত্যাগের ও সংযমের পবিত্র আবরণে ভোগকে আবৃত করতঃ সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করাই প্রকৃত মনুষ্যোচিত। ইহা না করিতে পারিলেই ভোগ বাসনা আমাদিগকে বিপথগামী করতঃ পশুত্বের দিকে অগ্রসর করিবেই। প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়ঃ পথে চলিবার চেষ্টাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে আমরা ভোগ বাসনার প্রবল স্রোতের মুখে তৃণ খণ্ডের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যাইব তাহা কে বলিতে পারে! অবশেষে আমাদের অস্তিত্বের শেষ চিহ্ন টুকুও ভূ পৃষ্ঠে হিন্দু নামের পরিচয় দেওয়ার জন্য বিদ্যমান থাকিবেনা। প্রবন্ধের বিস্তৃতি আশঙ্কায় সকল কথা বিশদ-রূপে বলিবার সুবিধা হইলনা। সৌরভেও স্থানাভাব. অতএব সংক্ষেপে আমাদের বর্ত্তমান সময়ে কোন্ পন্থা অবলম্বনীয় তাহাই ইঙ্গিতে মাত্র ব্যক্ত করতঃ পাঠক গণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

(সুসঙ্গ) শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

নিয়তি

সুখের সাথী হেথা কত যে আসে,
ব্যথার ব্যথী হয় কজনা?
ধরায় কেবা কার বলিতে আপনার,
কে আছে বহিবার বেদনা?
দুখের সাথে দুখ গুমরি যবে
হতাশ এনে দেয় জীবনে,
ব্যথিত আনমনে নীরব নিরজনে
কে যায় কার সনে মরণে?
তবুও চায় প্রাণ ব্যথার ব্যথী—
মনের কথা তার কহিতে,
প্রেমের বিনিময়, হোক সে অভিনয়,
মাধুরী মনে হয় প্রীতিতে।
যার যে দুখ সুধু সেইতা বুঝে
বুঝাতে চায় কেন কহিয়া?
প্রাণের জ্বালা হায়, পর কি বুঝে তায়,
গোপনে হেসে যায় চলিয়া।
এইত স্নেহ আর প্রণয় ভক্তি
প্রেম ও ভালবাসা জগতে!
ইহারি মাঝে সুখ বিরহ-শোক-দুখ
বিদারি যায় বুক—কহিতে!

শ্রীবিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী।

প্রাচীন ভারতে চৌর্য্য-শিল্প।

(ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।)

আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজে পাঠের জন্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একটী প্রবন্ধ রচনা করিয়া উপস্থিত করিতে আদেশ করিয়াছেন। তাঁহার আদেশ অবহেলা করিবার আমার উপায় নাই। সুতরাং তাহা শিরোধার্য্য করিয়া কি লিখিব নিবিষ্টচিত্তে তাহাই ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিতেছিলাম। গৃহে ফিরিতে জনৈক বন্ধুর গৃহে একখানা সাহায্য পুস্তকের প্রত্যাশায় উঠিয়াছিলাম। বন্ধু সুদীর্ঘ ভূমিকা করিয়া আমাকে যাহা নিবেদন করিলেন, তাহাতে আমি তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই গ্রহণ করিলাম যে—সম্প্রতি সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার সভ্য চোরেরও প্রাদুর্ভাব হওয়ায় পুঁথি-পত্র রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিয়াছে। এবং সেই একমাত্র কারণেই আমার প্রার্থিত গ্রন্থখানা তাঁহার সযত্ন রক্ষিত পুস্তক পেটিকা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

নিরাশ হইলাম বটে, কিন্তু বন্ধুর প্রতি অসন্তুষ্ট হইলাম না। কারণ তাঁহার মন্তব্যের সত্যতায় আমার গভীর আপত্তি থাকিলেও অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে অণুমাত্রও সন্দেহ ছিল না।

এখানে আমরা উপস্থিত সকলেই সভ্য—সুতরাং সভ্যতার উপর কেহ ভ্রূকুটী করিলে কাহার না আপত্তি হইবে? তাই মনে মনে স্থির করিলাম—সভ্যদেশ হইতে সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে যে সভ্য চোরের সৃষ্টি হইয়াছে, সাধারণের এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধেই আজ একটা প্রবন্ধ লিখিয়া উপস্থিত করিব।

আপাততঃ মুখবন্ধেই এক পৃষ্ঠা ব্যয় করিলাম, এখন প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করা যাউক।

যাঁহারা ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ, ফরাসী ও ইংরেজী ডিটেক্‌টিভ নভেল গুলির গুণ্ডামী ও ষণ্ডামীর কাহিনী পাঠ করিতে করিতে আহার নিদ্রা ভুলিয়া যান, তাঁহাদের মনে অবশ্যই এই ধারণা বদ্ধমূল যে চৌর্য্য বা তস্করবৃত্তির পরিচয় প্রদানে ইয়োরোপীয় সমাজ অন্যান্য দেশের সমাজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ঐ সমাজে চৌর্য্যবৃত্তির দস্তুর মত শিক্ষাদান চলিত, নতুবা তস্করগণ একেবারেই মাতৃগর্ভ হইতে সিঁধ কাঠি লইয়া বাহির হইয়া আসিতে পারে না।

আমার অদ্যকার আলোচনার বিষয়—ইয়োরোপীয় চোর, তস্কর লইয়া নহে; প্রাচীন ভারতের চৌর্য্য-শিল্প লইয়া। যাঁহারা মনে করেন, উপযুক্ত শিক্ষার গুণে চৌর্য্য বিদ্যা ইয়োরোপে উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভারতীয় চৌর্য্যশিল্পের আলোচনা করেন নাই। আলোচনা করিলে তাঁহারা দেখিবেন—ভারতেও এক সময় চৌর্য্য বিদ্যার বেশ আদর ছিল। চোর সম্প্রদায় প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাগারে যত্নের সহিত জ্যামিতি, ত্রিগুণমিতি, ইতিহাস, ভূগোলে জ্ঞান লাভ করিত। ভূতত্ত্বে বা আবহাওয়া তত্ত্বে তাহার অল্পজ্ঞান হইলে চলিত না, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও রসায়নে তাহাকে বিশেষজ্ঞ হইতে হইত। মনোবিজ্ঞান ও আলোক বিজ্ঞানে তাহার জ্ঞান পরিস্ফুট হওয়া প্রয়োজন হইত; জীব বিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞানে সম্যক পরিপক্কতা লাভ হইলে—তবে এক এক জন চৌর্য্য বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া 'পক্কচোর' উপাধি প্রাপ্ত হইত।

"বেদ, বেদাঙ্গ, স্মৃতি, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, তন্ত্র, উপনিষদ ইত্যাদি ইত্যাদি হইতে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত না করিতে পারিলে প্রত্নতত্ত্ব জমাট বাঁধে না।" ইতি—রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

কিন্তু আমার যে এগুলির একটীতেও দখল নাই!

যাহা হউক অদ্য আমি ক্রত কথার এবং একখানা পঠিত গ্রন্থের সহায়তায় আমার স্কন্ধে গৃহীত বোঝা নামাইতে আপাততঃ চেষ্টা করিব। চুরির উৎপত্তির ইতিহাস বেদে আছে। শ্লোক বলিতে পারিব না, কারণ—বেদ পড়ি নাই, পড়িবার শক্তিও নাই। শুনিয়াছি—অসভ্য অনার্য্যগণকেই সুসভ্য আর্য্যগণ দস্যু তস্কর ইত্যাদি বাচ্যে অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক প্রমাণ আইনের প্রচলিত ধারা বা ব্যবস্থা অনুসারে প্রমাণ হইল যে, অতি প্রাচীনকালেই চুরি নামক বিদ্যাটী ভারতীয় আর্য্য সমাজে না হউক—অনার্য্য সমাজে প্রচলিত ছিল।

অতঃপর সমাজ গঠনের পূর্ব্বে "লতা চুরি পাতা চুরি" প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইতি প্রবাদঃ।

ইহার পর চুরি ক্রমে সভ্য সমাজে প্রবেশ করিতে থাকে। ১ম অনার্য্য সভ্য সমাজে—লঙ্কায়; ২য় আর্য্য সমাজে—হস্তীনায়।

সভ্য সমাজে চুরির প্রচলনে স্ত্রী হরণই প্রথম বলিয়া মনে হয়। প্রমাণ—সীতা হরণ। ইতি রামায়ণঃ।

দ্বিতীয়—গরু চুরি—বিরাটের উত্তর গো গৃহে। ইতি মহাভারতঃ।

তৃতীয়—বস্ত্র হরণ। ইতি ভাগবতঃ।

চুরির ক্রম বিকাশ লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়, সমাজের প্রয়োজন অনুসারেই এই বিদ্যাটীর প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিতে হইলেই স্ত্রীর প্রয়োজন, তৎপর অর্থের, তারপর অন্ন বস্ত্রের। ইহার পর যাহা প্রয়োজন, ক্রমে সমাজের গতি সেই দিকেই বিস্তৃত হইতেছিল, "লতা চুরি পাতা চুরি" দেখিতে দেখিতে সিঁধে চুরি প্রচলিত হইতে লাগিল। অবস্থা বুঝিয়া সমাজ-নেতাগণ আইন বা সংহিতা প্রণয়ন করিয়া সমাজ রক্ষার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

চুরি তত্ত্বের ক্রম বিকাশ আলোচনা করিলে আপাততঃ ইহাই চুরির পুরাতত্ত্ব বলিয়া মনে হয়।

সমাজ-নেতা শাস্ত্রকারগণ আইন বা সংহিতা প্রণয়ন করিয়া চোরের দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা করিলেন দেখিয়া কি চোর সম্প্রদায় "তল্পিতল্পা" বাঁধিয়া, সিঁধ কাঠি ফেলিয়া, মুনি ঋষির দল বৃদ্ধি করিলেন? তাহা অবশ্যই নহে। বরং তাহারা গভীর উৎসাহে চৌর-শাস্ত্র বিদ পণ্ডাগণকে লইয়া শত শত নৈমিষারণ্য আবিষ্কার করিয়া, তাহার নীবিড় ক্রোড়ে সহস্র সহস্র চৌর বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া চুরি-শিল্প বিষয়ক শাস্ত্র গ্রন্থাদি আরও নিবিষ্ট চিত্তে শিক্ষা করিতে লাগিলেন। সিদ্ধান্তটী অবশ্যই প্রমাণ সাপেক্ষ্য

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আমি কোন শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করি নাই। সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় চুরি পদ্ধতি শিক্ষা সম্বন্ধে কোন্ ঋষির কি গ্রন্থ ছিল? অথবা কোন ঋষির আদপে কোন গ্রন্থই ছিল কিনা, জানি না। তবে আমার পঠিত একখানা প্রাচীন ভারতীয় নাটক গ্রন্থ হইতে প্রাচীন ভারতের চৌর্য্য-শিল্প সম্বন্ধে আমি যতদূর আনুমাণিক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা এস্থলে বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইলাম।

মৃচ্ছকটিক বোধ হয় সংস্কৃতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নাটক। বয়ঃক্রম দুই সহস্র বৎসরের ন্যূন নহে। এই মৃচ্ছকটিকের বেশ্যাসক্ত ব্রাহ্মণ তনয় শর্ব্বিলক একজন সিঁধ কাটা চোররূপে পরিচিত। মৃচ্ছকটিকের তৃতীয় অঙ্কে শর্ব্বিলকের চৌর্য্য নৈপুণ্য যেরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া এবং উপলব্ধি করিয়া আমার স্পষ্টই মনে হইতেছে, একটা বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় না হইলেও চুরি বিদ্যা শিক্ষার জন্য যে একটা বিরাট আয়োজন প্রাচীন ভারতে অনুষ্ঠিত ছিল তাহার আর বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই।

মৃচ্ছকটিকে উক্ত হইয়াছে—ভগবান শঙ্কর দেবের 'মনচোরা' রূপবান পুত্রটীই এই কলা বিদ্যার গুরু। ভারতীয় চোর সম্প্রদায় সেই শিখি-বাহন শ্রীমান কার্ত্তিকেয়ের শিষ্য। সুতরাং বোধ হয় বিদ্যাটা নিতান্ত নিন্দনীয় নাও হইতে পারে!

অতি প্রাচীন কালে বোধ হয় অন্ধকার রাত্রিতে চুরি হইত না। হইলে তাহা অতিশয় নিন্দনীয় ছিল। আচার্য্য তনয় অশ্বত্থমা কর্ত্তৃক এই ব্যাপারটা সর্ব্বপ্রথম অন্ধকার রাত্রিতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মৃচ্ছকটিকে এই মূল্যবান তত্ত্বটী সযত্নে গ্রথিত হইয়াছে। যথা—

অশ্বত্থমা এই পথ করে প্রদর্শন।
নরপতি সৌপ্তিকেরে করিয়া নিধন॥

(অনুবাদ—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

মহাভারত প্রত্নতত্ত্বের হিসাবে পাঠ করি নাই, সুতরাং অশ্বত্থমা সিঁধ কাটিয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক কার্য্যটী করিয়াছিলেন কি না—সঠিক বলিতে পারিলাম না।

মৃচ্ছকটিকে শর্ব্বিলকের মুখে তাহার নিজের শিক্ষাদাতা গুরু ও তস্য গুরুগণের ধারা বাহিক নাম সসম্মানে গৃহীত হইয়াছে। অপিচ তিনি নিজে যে তাহার গুরুর প্রথম শিষ্য তাহাও কথিত হইয়াছে। যথা—

"নমো বরদায় কুমার কার্ত্তিকেয়ায়, নমঃ কনকশক্তয়ে ব্রহ্মণ্যায় দেবায় দেব ব্রতায়, নমো ভাস্কর নন্দিনে, নমো

যোগাচার্য্যায়, যস্যাহ প্রথমঃশিষ্য, তেনচ পরিতুষ্টেন যোগ রচনা মে দত্তা"। সুতরাং প্রমাণ হইল যে—ইত্যাদি

এইবার চৌর্য্য-শিল্পের বাহাদুরী ও কৌশল গুলির পরিচয় আপনাদিগের বিশ্বাস জন্য ং ঃ সমন্বিত ছন্দে নিবেদন করিতেছি।

ব্রাহ্মণ তনয় চোর শর্ব্বিলক মহাশয় 'সিঁধ কাঠি' হস্তে রঙ্গ মঞ্চে প্রবেশ করিয়া বলিতেছেন (অবশ্যই স্বগতঃ)

কৃত্বা শরীর পরির্ণাহ সুখ প্রবেশং
শিক্ষা বলেনচ বলেনচ কর্ম্মমার্গং।
গচ্ছামি ভূমি পরিসর্পণ ঘৃষ্ট পার্শ্বো
নির্ম্মুচ্যমানইব জীর্ণ তনুর্ভুজঙ্গ ॥

অর্থাৎ আমি শিক্ষা বলে ও শারীরিক বলে আমার এই বৃহৎ শরীরের অনায়াসে প্রবেশ যোগ্য সন্ধি (সিঁধ) করিয়া খোলোস মুক্ত জীর্ণ তনু ভুজঙ্গের ন্যায় ভূ-বিবরে পার্শ্ব ঘসিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিব।"

'শিক্ষা বলেন' শব্দ দুটী—তৎকালে যে চুরি শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল—তাহা প্রকাশ করে। অতএব প্রমাণ হইল যে—ইত্যাদি।

অতঃপর শর্ব্বিলক বলিতেছে—

"আমি বৃক্ষবাটীকায় সন্ধি করিয়া মধ্যম কক্ষায় প্রবেশ করিয়াছি। এক্ষণে চতুঃশালে সন্ধি করি।"

সন্ধি গৃহের কিরূপ স্থানে করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে চোর শর্ব্বিলক বলিতেছে—

"গৃহের কোন অংশ জলাবসিক্ত হইয়া শিথিল আছে, যাহাতে সিঁধ কাটিলে শব্দ হইবে না, অন্য ভিত্তি সম্মুখে পতিত না হওয়াতে সন্ধির আয়তনও বৃহৎ হইবে, কোন স্থানটী লোনা লাগিয়া জীর্ণ হওয়ার ভিত্তির আয়তন কম হইয়াছে, কোন স্থানে সন্ধি করিলে স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ না হয়; অথচ কার্য্যসিদ্ধি হয়। সে রূপ স্থান এখন নির্ব্বাচন করা যাউক।"

অতঃপর ঐরূপ উপযুক্ত স্থানের জন্য গৃহের ভিত্তি গাত্রে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—

এই যে, এই স্থানটার প্রতিদিন সূর্য্য কিরণ পড়িয়া ও জলে ভিজিয়া লোনা হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, ইঁদুরেও মাটি তুলিয়াছে। বেশ—নিশ্চয় কার্য্য সিদ্ধি। ইহাই স্কন্দ পুত্রদিগের অর্থাৎ চোরদিগের প্রথম সিদ্ধির লক্ষণ। এইবার সিঁধ কাটা যাক্। কিন্তু কি প্রকার সিঁধ কাটিব? গুরুদেব ভগবান কনকশক্তি চারি প্রকার সন্ধির উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন।

(১) পাকা ইটের গৃহ হইলে ইট খুলিয়া লইতে হইবে।

(২) কাঁচা ইটের গাথুনী হইলে ছেদন করিয়া লইতে হইবে।

(৩) মৃৎ পিণ্ডের ঘর হইলে জল সিঞ্চনে দ্রব করিয়া।

(৪) কাষ্ঠেরগৃহ হইলে কর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে।"

এখন আপনারা দেখুন—আলোক-তত্ত্ব, ভূলোক-তত্ত্ব, মেটিরিয়মেডি—চুরি বিদ্যায় প্রয়োজন কি না?

অতঃপর সিঁধ কয় প্রকার হইতে পারে, তাহা শ্রবণ করুন। চোর বলিতেছে—

"পদ্মাকার, ভাস্করাকার, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, দীর্ঘিকাকার, স্বস্তিকাকার ও পূর্ণকুম্ভাকার—সিঁধ এই কয় প্রকার হয়। এখন আমি কোথায় এই শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করিব, যাহা দেখিয়া কল্য প্রাতে পুরবাসিগণ বিস্ময়ে অভিভূত হইবে।"

সভ্যগণ স্মরণ রাখিবেন, শুধু চুরি করিলেই হইবে না, তাহা যাহাতে সবিশেষ শিল্প নৈপুণ্য সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়েও সম্যক বিবেচনা করিয়া এবং তদনুরূপ বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া চুরি করিতে হইবে—তবেই বাহাদুরী।

এরপর চোর স্থির করিল—গৃহখানা যখন পক্ক ইষ্টক নির্ম্মিত তখন সিঁধটী কুম্ভাকার করিলেই শোভন হইবে। তাহাই করি।

"তদত্র পক্কেষ্টকে পূর্ণকুম্ভএব শোভতে। তমুৎপাদয়ামি।"

শিল্পকারগণের কার্য্যারম্ভে যেমন নান্দী প্রথা প্রচলিত আছে, চৌর-শিল্পেও এটির ব্যত্যয় দৃষ্ট হয় না। চোর কার্য্যারম্ভে তাহার ইষ্টদেবকে ও মহামহোপাধ্যায় চোর পণ্ডাগণকে স্মরণ করিয়া রক্ষিগণের দৃষ্টি ও অস্ত্রাঘাত হইতে যাহাতে শরীরকে রক্ষা করা যায় তজ্জন্য সর্ব্বাঙ্গে একটী রাসায়নিক পদার্থ লেপন করিল।

এইবার চৌর্য্যশিল্পে জ্যামিতি ত্রিগুণমিতি প্রভৃতিও শিক্ষণীয় বিষয় কিনা তাহা আপনারা উপলব্ধি করুন।

শর্ব্বিলক কার্য্যারম্ভ করিতে যাইয়া অকস্মাৎ বিষন্ন চিত্তে বলিল—"ও যাঃ। কি করিয়াছি, যে সূত্রদ্বারা সিঁধের স্থান পরিমাপ করিতে হইবে, তাহাতো ভুলিয়া ফেলিয়া আসিয়াছি।" যাই হউক, সে নিরাশ হইল না। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বলে তাহার তৎক্ষণাৎ স্মরণ হইল—সে তো ব্রাহ্মণ—যজ্ঞসূত্র কিসের জন্য! এতদ্বিধ সূক্ষ্ম শিল্পেই যদি তাহা ব্যবহৃত না হইল, তবে তাহা বৃথা ধারণের প্রয়োজন?

এইস্থানে শূদ্রক কবি যজ্ঞোপবীতের বিভিন্ন কার্য্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা দেখাইতে ক্রটী করেন নাই। বর্ত্তমানে যজ্ঞোপবীতের আদর যেমন হু হু করিয়া বৃদ্ধি হইতেছে—বক্ষ্যমান প্রবন্ধে তাহার সম্বন্ধে কিছু বলা বোধ হয় তখন "ধান ভানিতে শিবের গীত" হইবে না—বরং প্রয়োজনই আছে। কি প্রয়োজন—প্রবন্ধ লেখকের পক্ষে তাহা প্রকাশ করিয়া বলা সমীচীন নহে। যজ্ঞোপবীত ধারী চোর, উপবীত হস্তে লইয়াই তাহা ব্যক্ত করিতেছে—

"এই যজ্ঞ-সূত্রে দিয়া সিঁধ পথ মুখ মাপা যায়,
পরিহিত অলঙ্কার টানি লই ইহারি কৃপায়।
যন্ত্র-বদ্ধ কপাটেরে এরি যোগে করি উদ্ঘাটন,
কাল সর্পে দংশে যদি অঙ্গ এতে করিগো বেষ্টন।
(জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদ।)

অনন্তর শর্ব্বিলক যজ্ঞসূত্র সাহায্যেই সন্ধিস্থান মাপিয়া কার্য্য আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে গ্রন্থকার চোরের পক্ষে চিকিৎসা শাস্ত্রে অধিকার থাকা প্রয়োজন কি না তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। শর্ব্বিলককে হঠাৎ সর্পে দংশন করিল, সে যজ্ঞসূত্র সাহায্যে অঙ্গ বাঁধিয়া আত্মচিকিৎসায় সুস্থ হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিল।

সিঁধ কাটা শেষ হইয়া গেলে সে ঘরে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে আত্মরক্ষার্থ গৃহের দ্বারটী উন্মোচন করিবার আয়োজন করিল। দ্বার খুলিতে শব্দ হইবে দেখিয়া জল অনুসন্ধান করিয়া লইল এবং অল্প অল্প জল দ্বারা কপাটটীকে নমনীত করিয়া—কেমন বৈজ্ঞানিক সে চোর—নিঃশব্দে কপাটটী উদ্ঘাটন করিয়া রাখিল। অতঃপর বিবিধ পরীক্ষাদ্বারা গৃহস্থিত সকলেই যথার্থ নিদ্রিত জানিয়া তাহার সঙ্গে রক্ষিত এক প্রকার আগ্নেয় পোকা উড়াইয়া দিয়া প্রজ্বলিত নিরীহ প্রদীপটীর ভবলীলা সম্বরণের উপায় করিয়া দিল।

গ্রন্থকার চোরের মুখে আরও এইরূপ অনেক "অন্ধি সন্ধির" কথা বলাইয়াছেন। চোরের পক্ষে তাহা শিক্ষণীয় বিষয় হইতে পারে কিন্তু কার্য্যকালে কার্য্যকরী কি না তাহা পরীক্ষা সাপেক্ষ। আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস—গ্রন্থকার চোরকে যতই প্রকৃষ্ট চোর বলিয়া পাঠক সমাজে পরিচিত করিতে প্রয়াস পাউন না কেন, নির্ধন চারুদত্তের মৃদঙ্গ-মন্দিরা দর্দ্দুর-ভেরী-বীণা-বাঁশী সমন্বিত গৃহে সিঁধ কাটাইয়া তাহাকে খুব ওস্তাদ প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকার নিজেও যে উক্ত শিল্পে একজন সুনিপুণ ব্যক্তি ছিলেন, তাহার সম্বন্ধে আধুনিক সমাজে গভীর সন্দেহের কারণ রাখিয়া গিয়াছেন।

যাহাই হউক আমরা গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের বিচার করিতে বসি নাই। আমরা কাল পাত্র ও অবস্থা বিচার করিয়া চুরির পুরাতত্ত্ব লিখিতে বসিয়াছি, তাহাই লিখিলাম।

প্রাচীন কালে সভ্য আর্য্য সমাজে চুরী প্রথা বিদ্যমান ছিল এবং মৃচ্ছকটিকের সময় তাহা একটা শিল্প বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল—ইহাই আমার অদ্যকার বক্তব্য বিষয়। *

---

* সাহিত্য সমাজের সভাপতি অনারেবল শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয় প্রবন্ধে দস্যু বাল্মীকির উল্লেখ না দেখিয়া একটু মধুর মন্তব্য প্রকাশ করেন।

বাল্মীকির দস্যু অপবাদ কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিবার সুবিধা পাই নাই। সেজন্য এই নিরপরাধ ঋষির ঘাড়ে এত বড় একটা বদনাম চাপাইবার ইচ্ছা করি নাই। তারপর বাল্মীকির প্রবাদ প্রচলিত প্রকাণ্ড দস্যুতা আমাদের আলোচ্য শিল্পের অন্তর্ভুক্ত কিনা তাহাও বিচার্য্য বিষয় বলিয়া মনে করি। (লেখক)

তন্ত্র-সাহিত্যে জ্যামিতি-প্রভাব

জ্যামিতি শাস্ত্র পূর্ব্বে রেখা গণিত নামে প্রসিদ্ধ ছিল, অধুনা জ্যামিতি [Geometry] নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। জ্যামিতির উৎপত্তি বিষয়ে স্থান ও কাল নিয়া বিশেষ মতভেদ আছে। এক পক্ষ বলেন, প্রাচীন কালে মিশরদেশে নীল নদের তীরবর্ত্তী উচ্চাবচভূমির পরিমাপের জন্য এই শাস্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছিল; অপর পক্ষ বলেন, ইহাপেক্ষাও অতিপ্রাচীন কালে ভারতবর্ষে বৈদিক যজ্ঞাঙ্গ কুণ্ড-স্থণ্ডিলাদি নির্ম্মাণের জন্য ঋষিগণ এই শাস্ত্রের উদ্ভাবনা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে দ্বিতীয় মতই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রাচীন কালে জ্যামিতি পৃথক শাস্ত্র বলিয়া আখ্যালাভ করে নাই, এবং সংস্কৃত সাহিত্যে তদ্বিষয়ে কোন গ্রন্থ ছিল বলিয়াও নিদর্শন পাওয়া যায় না; কেবল রাজা জয়সিংহের সভা পণ্ডিত জ্যোতির্ব্বিৎ জগন্নাথ সম্রাট্ কৃত "রেখা গণিত"-নামক সপ্তদশাধ্যায়াত্মক গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহাও আরবীয় রেখা গণিতের অনুবাদ মাত্র। বৈদিক "শুল্বসূত্র"-নামক গ্রন্থে কুণ্ড স্থণ্ডিল প্রভৃতি নির্ম্মাণের প্রণালী উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই রেখা গণিতের আবশ্যক সূত্রগুলির অস্তিত্ব দেখা যায়। উত্তরকালে ইহা শিল্পকার্য্যের উপযোগিতা লাভ করিয়া শিল্পশাস্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। পরিশেষে বহুবিদ্যায় ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে রেখা গণিত নামে পৃথক শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন। আমরা এই প্রবন্ধে জ্যামিতির ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করিব না, তন্ত্র সাহিত্যে ও আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য ক্রিয়াকাণ্ডে জ্যামিতি শাস্ত্র কিরূপ আধিপত্য লাভ করিয়াছিল তাহাই দেখাইব।

সহস্র হোমে হস্ত প্রমাণ কুণ্ড, অযুত হোমে দ্বিহস্ত প্রমাণ এবং লক্ষহোমে চতুর্হস্ত প্রমাণ কুণ্ড করিতে হইবে। বশিষ্ঠপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—কুণ্ড চতুরস্র [Square] করিতে হইবে [সর্ব্বাধিকারিকং কুণ্ডং চতুরস্রন্তু সর্ব্বদম্] অতএব যে চতুরস্র কুণ্ডের ক্ষেত্রফল এক হাত তাহার নাম হস্তপ্রমাণ কুণ্ড, যাহার ক্ষেত্রফল দুইহাত তাহার নাম দ্বিহস্ত এবং যাহার ক্ষেত্রফল চারি হাত তাহার নাম চতুর্হস্ত কুণ্ড। হস্ত প্রমাণ কুণ্ডের ভুজ এক হাত এবং চতুর্হস্ত কুণ্ডের ভুজ দুই হাত হইবে। কিন্তু জ্যামিতি শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে দ্বিহস্ত কুণ্ডের ভুজপরিমাণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যামলে উক্ত হইয়াছে—হস্ত প্রমাণ কুণ্ডের কর্ণরেখা পরিমিত ভুজ দ্বারা কুণ্ড প্রস্তুত করিলে দ্বিহস্ত কুণ্ড এবং দ্বিহস্ত কুণ্ডের কর্ণরেখা পরিমিত ভুজ দ্বারা কুণ্ড প্রস্তুত করিলে চতুর্হস্ত কুণ্ড হইবে। [পূর্ব্বপূর্ব্বস্য কুণ্ডস্য কোণ সূত্রেণ নির্ম্মিতম্। উত্তরোত্তর কুণ্ডানাং মানন্তৎ পরিকীর্ত্তিতম্।] জ্যামিতির নিয়ম অনুসারে বলিতে হইলে এইরূপ বলিতে হইবে—কোন এক বর্গ ক্ষেত্রের কর্ণরেখার উপরি আর একটী বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত করিলে দ্বিতীয় বর্গক্ষেত্র প্রথম বর্গ ক্ষেত্রের দ্বিগুণ হইবে। যথা—
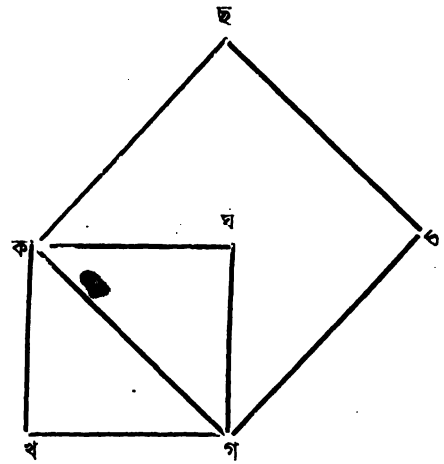
ক খ গ ঘ বর্গ ক্ষেত্রের কগ কর্ণরেখার উপরে কগ চছ বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ক গ ঘ ত্রিভুজ কখ গঘ বর্গক্ষেত্রের অর্দ্ধ এবং ক গ চ ছ বর্গক্ষেত্রের এক চতুর্থাংশ, ইহা জ্যামিতি শাস্ত্র দ্বারা সহজেই উপপন্ন হয় অতএব ক গ চ ছ বর্গক্ষেত্র কখ গঘ বর্গক্ষেত্রের দ্বিগুণ হইবে। প্রথম বর্গক্ষেত্রটী হস্তপ্রমাণ কুণ্ড হইলে দ্বিতীয় বর্গক্ষেত্র দ্বিহস্ত কুণ্ড হইবে। জ্যামিতির সাহায্য ভিন্ন এই বিষয় উপপন্ন করিবার উপায়ান্তর নাই।

শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে দ্বিহস্ত কুণ্ডের ভুজ পরিমাণ এক হাত আট অঙ্গুলি উক্ত হইয়াছে। [হস্তমাত্রমিতে কুণ্ডে সমন্তাচ্চতুরঙ্গুলম্। বর্দ্ধয়েত্তেন মানেন দ্বিহস্তঞ্চ প্রচক্ষতে।]

একহস্ত পরিমিত ভুজের দুই দিকে চারি অঙ্গুলি বাড়াইলে ভুজ পরিমাণ এক হাত আট অঙ্গুলি হইবে। ইহা আসন্ন পরিমাণ, প্রকৃত সূক্ষ্ম পরিমাণ নহে। যে হেতু ১ হাত ৮ অঙ্গুলি = ১⅓ হাত, ইহা ভুজের পরিমাণ হইলে ক্ষেত্রফল ১⅓ × ১⅓ = ১৭/৯ হাত হইবে।

জ্যামিতির অনুশীলনের অভাবে পরবর্ত্তী সংগ্রহকার ও টীকাকারগণ উপপত্তি বুঝিতে না পারিয়া অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তিথিতত্ত্বে কুণ্ড প্রকরণে এইরূপ দ্বিহস্ত কুণ্ডকে পারিভাষিক বলিয়াছেন, বস্তুতঃ ইহা পারিভাষিক নহে, প্রকৃতই দ্বিহস্ত কুণ্ড। শ্রীতত্ত্ব চিন্তামণির টিপ্পনীতে উক্ত হইয়াছে "দ্বিহস্তকুণ্ডস্য কোণ সূত্রমানেন চতুর্হস্ত কুণ্ডং চতুর্হস্তকুণ্ডস্য কোণ সূত্রমানেন ষড়্‌হস্তং এবমন্যত্র"। এই উক্তি নিতান্তই ভ্রান্তিপূর্ণ, যে হেতু চতুর্হস্ত কুণ্ডের কর্ণ সূত্রদ্বারা অষ্টহস্ত কুণ্ড হইবে, ষড়্‌হস্ত কুণ্ড হইতে পারে না।

কালী দুর্গা প্রভৃতি সকল দেবতার পূজাযন্ত্র ও ধারণ যন্ত্র প্রভৃতি জ্যামিতির সাহায্যেই উদ্ভাবিত হইয়াছে, ইহা তত্তদ্ যন্ত্রাদি অনুশীলন করিলে স্পষ্টতই হৃদয়ঙ্গম হয়। সামান্যার্ঘ্য স্থাপনের ত্রিকোণ বৃত্ত-চতুরস্র মণ্ডলটীও জ্যামিতি প্রভাবের সূচনা করিতেছে। তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই জ্যামিতি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কুণ্ড, কুণ্ডের মেখলা যোনি প্রভৃতি,
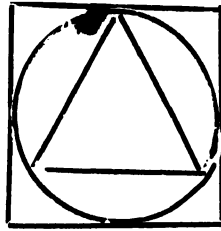
অর্ঘ্যস্থাপন মণ্ডল।

স্থণ্ডিল, পূজাযন্ত্র, ধারণযন্ত্র, অর্ঘ্যস্থাপন মণ্ডল, নৈবেদ্যমণ্ডল, ভোজনপাত্রমণ্ডল, স্রুক্, স্রুব, মেক্ষণ, জুহু প্রভৃতি প্রত্যেকেই জ্যামিতি প্রভাবের সূচনা করিতেছে। চতুরস্র কুণ্ড, ত্রিকোণ কুণ্ড, যোন্যাকার কুণ্ড, অর্দ্ধচন্দ্রকুণ্ড, বৃত্তকুণ্ড, অর্দ্ধবৃত্তকুণ্ড প্রভৃতিতে জ্যামিতির বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

ইতর প্রাণীর বুদ্ধি।

হস্তী

ইতর প্রাণীর মধ্যে হস্তীর বুদ্ধি সম্বন্ধে অনেকেই অনেকরূপ গল্প শুনিয়া থাকিবেন। যখন শিশুশিক্ষা ৩য় ভাগ পড়িতাম, তখনই এই প্রাণীর বুদ্ধি কৌশলের বিষয় পাঠ করিয়াছিলাম। তার পর আরও অনেক পুস্তক পত্রিকাদিতে এবিষয়ের অনেক তথ্য অবগত হওয়া গিয়াছে। বাস্তবিক হস্তীর অনেক কার্য্যে এমন বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় যাহাতে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। আমি নিজে এই সম্বন্ধে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা নিয়ে সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম।

যখন আমি ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে কর্ম্মসূত্রে অবস্থান করিতাম, সেই সময় তথায় হাতী ধরার অনুষ্ঠান হয়। আজ কাল সকলেই বোধ হয় জ্ঞাত আছেন যে ময়ূরভঞ্জ উড়িষ্যার একটি করদ রাজ্য। এই রাজ্যের পার্ব্বত্য প্রদেশে অনেক হস্তী আছে। মহারাজের পক্ষ হইতে মধ্যে মধ্যে হাতী ধরা হয়। আমরা হাতী ধরা দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহার বিস্তৃত বিবরণ সেই সময়কার প্রদীপ পত্রে (২য় ভাগ চৈত্র ১৩০৫) প্রকাশিত হইয়াছিল। এস্থলে সে বিষয় আর বেশী কিছু বলিব না।

যে স্থানটাতে বন্য হাতী আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহার চতুর্দ্দিকে একটা পরিখা খনিত হইয়াছিল। সেই পরিখার বাহিরে মজবুত ভাবে বেড়া দেওয়া ছিল। যখন হাতীটাকে বাঁধিবার অনুষ্ঠান করা হইল। তখন ডাল পালার বড় বড় আঁটি দ্বারা পরিখার কতকটা স্থান পূর্ণ করা হইল। এবং লোক জন তাহার উপর খুব নাচিয়া কুঁদিয়া তাহাকে শক্ত করিয়া লইল। তারপর তাহার উপরে এমন মাটি ছড়াইয়া দেওয়া হইল যে দেখিতে পাথরের মত বোধ হয়। শেষে পালিত হস্তিনী গুলিকে ঐ আবদ্ধ বন্য গজের নিকট লইয়া যাইবার চেষ্টা হইতে লাগিল। হস্তিনী গুলি সেই পথের নিকটে আসিল, স্থিরভাবে পথটি পরীক্ষা করিল, শেষে অতি সন্তর্পণে একখানি পা আস্তে আস্তে ঐ পথের উপর

স্থাপন করিল। এইরূপে সে পরীক্ষা করিয়া লইল যে ঐ পথ তাহার ভার সহিতে পারিবে কিনা। তারপর সে পা সরাইয়া লইয়া একদিকে দাঁড়াইয়া রহিল। অঙ্কুশের আঘাত, মাহুতের উত্তেজনা কিছুতেই সে সে পথে পদার্পণ করিল না। তখন আরও কিছু ডালা পালা দিয়া পথ আরও শক্ত করিয়া দেওয়া হইল। আবার হাতী আসিল, পরীক্ষা করিল, কিন্তু তাহাদের সন্দেহ দূর হইল না। একের পর এক আসিল, প্রত্যেকেই ফিরিয়া গেল। এই পরীক্ষা কার্য্যে তাহারা তিন পায়ের উপর সকল গায়ের ভার রাখিয়া অপর পা খানি যে কিরূপ সাবধানতার সহিত পথের উপর ফেলিতেছিল তাহা লিখিয়া বুঝাইবার সাধ্য নাই। মানুষেও ঐরূপ সাবধান হইতে পারে কিনা সন্দেহ।
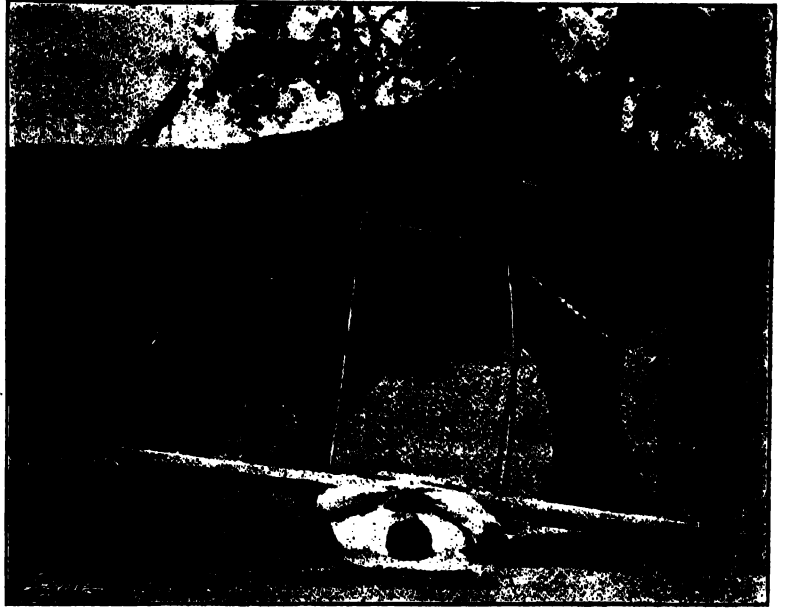
ঐ হাতীগুলির মধ্যে একটি ছোট হাতী ছিল। শেষে উহারা নিজেদের মধ্যে যেন পরামর্শ করিয়া সর্ব্ব কনিষ্ঠা হস্তিনীকে ঐ পথে প্রেরণ করিল। সেও অতি সন্তর্পণে প্রথমে এক পা, তারপর আর একখানি, এইরূপ ক্রমে ক্রমে চারি পায়ের ভার ঐ পথের উপর রাখিয়া যখন একটু স্থির হইয়া বুঝিল যে যাওয়া সম্ভব পর, তখন আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া সে পরিখা পার হইয়া গেল। তাহাকে নিরাপদে অপর পারে উত্তীর্ণ দেখিয়া অন্য হস্তিনী গুলিও ধীরে ধীরে তদনুসরণ করিল। এই পার হওয়া ব্যাপারেও তাহাদের গতি-ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইল যে তাহারা "গায়ের ভর গায়ে রাখিয়া" পা ফেলিয়া যাইতেছে!

তারপর বন্য গজটির পায়ে দড়ি বাঁধার সময়েও হস্তিনী গুলি যেরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত মাহুতদিগকে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাও দ্রষ্টব্য বিষয়। শুঁড় দিয়া দড়ি দড়া, মাহুতের হাতে দেওয়া, সম্মুখ পদদ্বয়ের আড়ালে মাহুতকে গুপ্ত রাখা, একটু বিপদাশঙ্কাতেই শুঁড়ের সাহায্যে মাহুতকে পৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া বন্য গজের নিকট হইতে সরিয়া যাওয়া ইত্যাদি কার্য্যে তাহারা বিশেষ বুদ্ধি কৌশলের পরিচয় দেয়।

পালিতা হস্তিনীগণের এইরূপ সাহায্য না পাইলে বন্য হস্তী ধৃত করা অসম্ভব হইত। Andrew Lang সাহেব তাঁহার Animal Story Book নামক পুস্তকে হস্তীর সম্বন্ধে যে সব গল্প লিখিয়াছেন, তাহাও হস্তীর বুদ্ধি বিবেচনার পরিচায়ক। একবার এক হস্তীযুথ কিরূপে সরকারী চাউলের গোলা লুট করিয়া ছিল, সেই বিবরণটি বড়ই কৌতুক পূর্ণ। সংক্ষেপে তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি। লঙ্কা দ্বীপের একটি চাউলের গোলাতে যে সব সিপাহী পাহাড়ায় ছিল, নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামের একটা দাঙ্গা নিবারণ করিবার জন্য তাহারা হঠাৎ গোলা ছাড়িয়া গ্রামে যাইতে আদিষ্ট হয়। তাহারা চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই একটি বৃহৎকায় হস্তী সেই গোলার নিকট আসিয়া গোলাটির চারিদিক বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক পুনরায় জঙ্গলে চলিয়া গেল এবং অনতি বিলম্বেই আপনার দল সঙ্গে করিয়া তালে তালে শ্রেণীবদ্ধভাবে গোলার নিকট উপস্থিত হইল। গোলাটিকে

নিরাপদ করিবার জন্য ছাদের উপরে উহার দ্বার রাখা হইয়াছিল। হস্তীর দল সহজেই তাহা বুঝিতে পারিল কিন্তু সিঁড়ি লাগাইয়া উপরে যাওয়া তাহাদের পক্ষে যে সম্ভব নহে সুতরাং কিরূপে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়? সকলে একত্র মিলিয়া এবিষয় যেন পরামর্শ করিল। তারপর একটী বৃহৎকায় হস্তী আসিয়া গোলার এক কোণে সজোরে দন্তাঘাত করিতে লাগিল। সে ক্লান্ত হইলে আর এক দন্তী তাহার স্থান অধিকার করিয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু গোলাটি সুদৃঢ় থাকায় তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। কিন্তু তাহারাও হটিবার পাত্র নহে। আর এক বিপুলকায় হস্তী আসিয়া পূর্ণ বলে সেই কোণে দন্তাঘাত করিতে লাগিল। অবিশ্রান্ত ঐকান্তিকী চেষ্টা সর্ব্বত্রই ফলদায়িকা; এই হস্তীযূথের চেষ্টাও সফল হইল। তাহাদের দন্তাঘাতে গোলার কোণের একখানি ইট খসিয়া গেল।

আর যায় কোথা! তখন সহজেই এক খানার পর আর এক খানা ইট তার পর আর একখানা আসিল এবং অল্প ক্ষণেই সমস্ত যূথের গমনোপযোগী পথ খোলা হইয়া গেল। তখন ৩৪টি হস্তী এক যোগে গোলার ভিতরে গিয়া পেট ভরিয়া চাউল খাইয়া বাহিরে আসিতে লাগিল, আবার আর এক দল ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল। এইরূপে যখন সর্ব্বশেষ দল গোলার মধ্যে চাউল খাইতেছিল তখন বাহির হইতে প্রহরী-হস্তীর তীব্র বৃংহিত ধ্বনিত হইল। আর অমনি গোলার মধ্যের দল বাহিরে আসিল এবং সকলে একযোগে শুঁড় আকাশে তুলিয়া জঙ্গলের মধ্যে পলায়ন করিল। প্রহরী-হস্তীটি দূর হইতে সিপাহিগণের শ্বেত পরিচ্ছদ দেখিয়াই সঙ্কেত করিয়াছিল। প্রহরীরা গোলায় ফিরিয়া ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইল এবং পলায়মান হস্তী যূথের প্রতি বন্দুক চালাইল, কিন্তু তাহাতে তাহাদের কোনই অনিষ্ট হইল না। তাহারা লেজ নাড়িয়া যেন সিপাহীদিগকে উপহাস করিতে করিতে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ইহাতেও হস্তীর বুদ্ধি, কৌশল, সাবধানতা, উদ্ভাবনী শক্তি প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

এই প্রবন্ধের সঙ্গে যে চিত্রখানি দেওয়া গেল ইহাও হস্তীর বুদ্ধি কৌশল ও সাবধানতার পরিচায়ক। প্রসিদ্ধ বীর রামমূর্ত্তির নাম সকলের নিকটই পরিচিত। এই চিত্রে তিনি হস্তী পদতলে পতিত আছেন। সকলে চিত্রখানির প্রতি বিশেষ রূপে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবেন যে হস্তী কিরূপে রামমূর্ত্তির বুকের উপরের তক্তাখানির উভয় প্রান্তে সম্মুখ ও পশ্চাতের পদদ্বয় স্থাপিত করিয়া স্বীয় দেহের অধিকাংশ ভার ঐ দুই প্রান্তেই রাখিয়াছে। যদি হস্তী এরূপ না করিয়া স্বীয় বিশাল পদ ঠিক প্রফেসর বীরের বুকের উপরই রাখিত, তাহা হইলে সে চাপ সহ্য করা তাঁহার পক্ষে বড় সম্ভব হইত না! হস্তী স্বীয় বুদ্ধি কৌশলে ঐ বুকের উপরের তক্তার উপর দিয়াই এমন ভাবে পা ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারে যে তাহাতেও তক্তার নীচের বীরবরের তেমন কোন কষ্ট বোধ হয় না। অবশ্য আমাদের মত ক্ষীণজীবী ব্যক্তির কথা আমি বলিতেছি না!

হস্তীর প্রভুভক্তি, হস্তীর শিশুপ্রিয়তা, হঠাৎ কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিয়া তৎপরে তাহার জন্য অনুতাপ, প্রতিহিংসা, কৃতজ্ঞতা, প্রভৃতির অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। হস্তী আমাদের দেশেরই জীব কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা ইহাদের বিষয়ে আলোচনা করিয়া সময় নষ্ট (!) করার প্রয়োজনীয়তা দেখি না, অথচ অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইহাদের অনেক ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিয়া বহু নূতন তথ্য প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

ছোট ও বড়

অতি ঊর্দ্ধে উড়ে বটে অতি ঊর্দ্ধে বাস,
তথাপিও শকুনীর নীচ অভিলাষ!
নীচে থেকে চাতকের সদা ঊর্দ্ধ মুখ,
বোঝ দেখি, ছোট বড় কেবা কতটুক!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

চন্দ্রকান্ত প্রসঙ্গ।

আমি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের একজন অতি নগণ্য ছাত্র। তাঁহার স্মৃতি সম্বন্ধে "সৌরভে" আলোচনা হইতেছে দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। এই প্রসঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধে আমি যে কয়েকটী কথা জানি তাহা তাঁহার জীবন চরিত রচনায় কার্য্যকারী হইবে বলিয়া প্রকাশ করিতেছি।

যখন আমরা সংস্কৃত কলেজে এম, এ শ্রেণীতে পড়ি, তখন একদিন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট অধ্যয়নার্থ আমরা এম. এ শ্রেণীর ছাত্রগণ তাঁহারই খাস কামরায় বসিয়াছি, এমন সময় তর্কালঙ্কার মহাশয় তথায় উপস্থিত হইলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহাকে দেখিয়াই একটী শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন এরূপ আত্মাভিমানের ভাবেই যেন আহ্লাদের সহিত বলিয়া উঠিলেন—'তর্কালঙ্কার মহাশয়! এই দেখুন এই শব্দটীর প্রয়োগ এই বিশেষ স্থলে পাওয়া গিয়াছে।" ইহা শ্রবণ মাত্রই তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "কেন মহাশয়, এরূপ প্রয়োগ ত আরও অনেক রহিয়াছে। দেখুন না, এই এই স্থলে এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।" শুনিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় একেবারে নির্ব্বাক অপ্রতিভ হইয়া রহিলেন।

আর একদিন তর্কালঙ্কার মহাশয় লাইব্রেরীতে বসিয়াছেন, লাইব্রেরীয়ানও বসিয়া আছেন, আমরা দাঁড়াইয়া আছি। লাইব্রেরীয়ানের নাম উমেশ চন্দ্র কবিরত্ন, তিনি নিজেও পণ্ডিত—ডাকের চিঠী দেখিতেছেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের একখানি চিঠী তিনি হাতে লইয়া বলিলেন, "এই আপনার একখানা চিঠি"। 'কি চিঠী?' তর্কালঙ্কার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কবিরত্ন বলিলেন, "চিঠীখানা কোনও পণ্ডিতের টোল হইতে আসিয়াছে, সাহিত্যের একটী কূট প্রশ্নের মীমাংসা জানিতে চাহিয়াছে?" তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহাকেই চিঠীখানা পড়িতে বলিলেন। চিঠীখানার মর্ম্ম শুনিয়া বিন্দুমাত্র না ভাবিয়া এবং চিঠীখানা একবার হাতেও না লইয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "ইহার এই উত্তর আপনিই লিখিয়া দিন।" শুনিয়া কবিরত্ন মহাশয় ও আমরা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

লাইব্রেরীতে অন্য একদিনের ঘটনা এই—তর্কালঙ্কার মহাশয় তথায় বসিয়া আছেন, নবদ্বীপ অঞ্চলের কয়েকটী পণ্ডিত তাঁহার নিকট একটী ব্যবস্থার জন্য আসিয়াছেন। তিনি ব্যবস্থাটী বলিয়া দিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, আপনাদের অঞ্চলের বড় স্মার্ত্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয় কলেজে থাকিতে আমার ব্যবস্থার কি প্রয়োজন? ইহাতে পণ্ডিতগণ মুক্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এতদ্দেশে আপনার অপেক্ষা আর কাহাকেও আমরা বড় পণ্ডিত বলিয়া মনে করি না—আপনার ব্যবস্থা হইলেই আমরা নিঃসংশয় হইতে পারি।" ইহার উত্তরে তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন, "আমাকে আপনারা যে বড় বলেন, তাহা আপনাদেরই সুজনতা।" তর্কালঙ্কার মহাশয় যেরূপ বিনয়ের সহিত কথাটী বলিলেন, তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্য যেন আরও উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইল।

অন্য একদিন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের খাস কামরায় আমরা অধ্যয়নার্থ বসিয়া আছি, এমন সময়ে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট কয়েকটী ধনী ভদ্রলোক দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধে ব্যবস্থার জন্য আসিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত তাঁহারা যে আলাপ করিলেন তাহাতে বুঝা গেল যে ইঁহারা অন্যায় মত ব্যবস্থা লইতে আসিয়াছেন। ন্যায়রত্ন নিজে ব্যবস্থা দিতে স্বীকৃত হইলেন, এবং মধুসূদন স্মৃতিরত্নের ব্যবস্থাও লওয়া যাইতে পারিবে বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। তখন তাঁহারা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মত পাওয়া যাইবে কিনা জানিতে চাহিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে তর্কালঙ্কার এরূপ প্রকৃতির লোক নহেন যে কোন প্রকার প্রলোভনে বাধ্য হইবেন। তখন তাঁহারা বলিলেন, তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কলেজের একজন বড় পণ্ডিত; সংস্কৃত কলেজের দুই জন বড় পণ্ডিতের মত গ্রহণ করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়কে বাদ দেওয়া বড়ই বিসদৃশ হইবে। অতএব যেরূপেই হউক তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মত লইতে হইবে। তাহাতে ন্যায়রত্ন মহাশয় উত্তর করিলেন, তাঁহারা স্বয়ং তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া দেখিতে পারেন, যদিও কোন ফল হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন না; কিন্তু তিনি নিজে আলাপ করিতে কখনই সাহস পান না। একজন অধীন অধ্যাপকের ন্যায়নিষ্ঠা

ও নির্লোলুপতার প্রতি তদীয় উর্দ্ধতন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ন্যায় অধ্যক্ষের ঈদৃশ সম্ভ্রম ভাব পোষণ করা যে তাহার পক্ষে কিরূপ গৌরবের বিষয় তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অন্য দিনের আত্ম মর্য্যাদার একটী ঘটনাও এই স্থানে উল্লেখযোগ্য। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের স্বীয় প্রকোষ্ঠে আমাদের সাক্ষাতে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত আলাপ প্রসঙ্গে তিনি তর্কালঙ্কার মহাশয়কে কোন এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা বলিলে পর তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার মুখের উপরই বলিলেন, 'মহাশয়, কলিকাতার নিমন্ত্রণে পণ্ডিত বর্গের প্রতি যেরূপ সমাদর ও অভ্যর্থনার অভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে আমি এইরূপ নিমন্ত্রণে উপস্থিত হওয়া আমাদের পক্ষে সম্মান জনক বোধ করিনা।" ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহার প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "এরূপ রীতি যখন বরাবরই চলিয়া আসিয়াছে, তখন আর কি করা যায়?" তর্কালঙ্কার মহাশয় ইহাতেও নিরস্ত না হইয়া বরঞ্চ ন্যায়রত্ন মহাশয়কে অনুযোগ দেওয়ার ভাবেই বলিলেন, "মহাশয় অধিকাংশ নিমন্ত্রণেই অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন, ইচ্ছা করিলেই সমুচিত ব্যবস্থা করিতে পারেন।" তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এই স্পষ্ট উক্তিতে নির্ভীকতা ও আত্ম মর্য্যাদার ভাব স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হইলেও তাহাতে ভব্যতা ও শিষ্টতার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় নাই, কারণ তাঁহার এরূপই মধুর প্রকৃতি ছিল যে তিনি কর্কশতা কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না।

উপরি উক্ত ঘটনা গুলি সমস্তই আমার প্রত্যক্ষীকৃত। এখন একটী শ্রুত ঘটনার বিষয় লিখিতেছি। কোন সময়ে মহীশূরের মহারাজ বাহাদুর তদীয় দ্বারপণ্ডিত সহকারে সংস্কৃত কলেজ দেখিতে আসেন। ঐ দিবস কি কারণে (কেহ বলেন সংস্কৃত আলাপে তেমন অভ্যস্ত না থাকায় ইচ্ছা করিয়াই) তদানীন্তন অধ্যক্ষ ন্যায়রত্ন মহাশয় কলেজে অনুপস্থিত ছিলেন। মহারাজ বাহাদুর অধ্যক্ষ মহাশয়কে না পাইয়া মনে মনে যেমন একদিকে ক্ষুব্ধ হন, তেমনই অপরদিকে সংস্কৃত কলেজের লোকবিশ্রুত প্রতিষ্ঠার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। এদিকে দ্বার পণ্ডিত মহাশয়ও ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার সহিত বিচারের ভয়ে অনুপস্থিত রহিয়াছেন, ভাবিয়া মনে মনে আত্ম পাণ্ডিত্যাভিমানে স্ফীত হইতে থাকেন। এমন সময়ে তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত কলেজের গৌরব নষ্ট হইতেছে, দেখিয়া মহারাজ বাহাদুরকে অধ্যক্ষ মহাশয়ের সম্বন্ধে অনুসন্ধানের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, এবং তাঁহাদ্বারা তদীয় প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে কিনা জানিতে চাহেন। তখন মহারাজ বাহাদুর তর্কালঙ্কার মহাশয়কে তদীয় দ্বার পণ্ডিতের সহিত বিচারার্থ আহ্বান করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় অকুণ্ঠিত চিত্তে তখনই বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অনর্গল সুমার্জ্জিত সংস্কৃত কথন ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার গুণে তিনিই বিচারে জয়ী হইলেন। তখন দ্বার পণ্ডিত মহাশয়ের আত্মাভিমান যেমন চূর্ণ হইয়া গেল, মহারাজ বাহাদুরেরও সংস্কৃত কলেজের একজন অধ্যাপকই যখন এত বড় পণ্ডিত তখন অধ্যক্ষ মহাশয় আরও যে কত বড় পণ্ডিত, এই ভাব হইতে কলেজের প্রতিষ্ঠা ও অধ্যক্ষের পাণ্ডিত্যের প্রতি পূর্ব্বের হতাদর ভাব বিদূরিত হইয়া গৌরব ভাব দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। এইরূপে তর্কালঙ্কার মহাশয় কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া সংস্কৃত কলেজের সুখ্যাতি শুধু অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন তাহা নহে, প্রত্যুত ইহাকে উজ্জ্বলতর করিয়াছিলেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয় তদীয় ছাত্রদিগকে সাধারণতঃ 'বাবা' সম্বোধন করিতেন। তদীয় স্নেহময় 'বাবা' সম্বোধন ও বাৎসল্য পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিলে মনে হইত যেন আর কেহই তাঁহার অধিক আদরের পাত্র নহে। শিক্ষকদিগের মধ্যে এরূপ বাৎসল্যভাবের পরিচয় আর কাহারও মধ্যে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

উপরে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, চরিত্র ও ব্যবহারের যে সমস্ত কথা বিবৃত হইল, তাহা পাঠ করিয়া সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে তিনি আমাদের দেশের কেবল যে একজন আদর্শ অধ্যাপক ছিলেন তাহা নহে, তিনিএকজন অসাধারণ প্রতিভাবান্ ও চিরস্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

জাপানে সাহিত্য চর্চ্চা

আজ কাল বাঙ্গলা দেশে সাহিত্যের নবযুগ উপস্থিত হইয়াছে। ছোট বড় অনেকেই সাহিত্যের উন্নতিকল্পে মন প্রাণ ঢালিয়া দিতেছেন; জাতীয় জীবনে ইহা একটি শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। জাতীয় জীবন বিকাশের মূলে সাহিত্য। প্রত্যেক দেশের সাহিত্য সেই সেই দেশের সভ্যতার মাত্রা নিরূপক মাপকাটি। আমরা সময়ের সহিত দৌড়াইয়া উঠিতে না পারিয়া রসাতলে গেলেও আমাদের সেই আর্য্যভাষা, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র, আমাদের দর্শন—আজ পর্য্যন্তও আমাদের সভ্যতার কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ দণ্ডায়মান। নব্য সভ্য জাতি ভারতবাসীকে অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবার বেলায় যেন আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ও দর্শন তাহাদের মুখ চাপিয়া ধরিতেছে।

পৃথিবীতে এমন কোন সভ্যজাতি নাই, যাহাদের উন্নতির মূলে সাহিত্য নহে, অথবা এমন কোন অসভ্য জাতিও নাই যাহাদের সাহিত্য বিলক্ষণ পুষ্টতা লাভ করিয়া ধরণী তলে এক নূতন সমস্যা আনয়ন করিয়াছে। যেদিন হইতে এরূপ অসভ্য জাতির সাহিত্যের উন্নতি হইতে দেখা যাইবে, সে দিন হইতেই বুঝিতে হইবে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে তাহাদের আর বিশেষ বিলম্ব নাই। যখন ভারত, গ্রীস প্রভৃতি সভ্যজগতের মস্তকস্বরূপ ছিল, তখন সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি ভাষাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষা বলিয়া বিবেচিত হইত। আজ ইংরাজ জগতের অদ্বিতীয় জাতি; ইংরাজী ভাষাও জগতে অদ্বিতীয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হিজ হাইনেস্ আগা খাঁ যখন জাপানে গিয়াছিলেন, তখন তত্রস্থ ভারতীয় ছাত্রগণ তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করেন। সেই সভায় আমাদিগকে উপদেশ ও উৎসাহ দিবার বেলায় প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি বলিয়াছিলেন, ইংরাজের সভ্যতা অন্যান্য জাতির শিরোধার্য্য বলিতেই হইবে, যেহেতু ইংরাজের ভাষা মুখে লইয়া এবং ইংরাজের গিনি পকেট লইয়া পৃথিবীর যে কোন দেশে আমরা অবাধে এবং অক্লেশে বিচরণ করিতে পারি, আর সভ্য জগতের প্রত্যেক দেশেই অভ্যর্থিত এবং সমাদৃত হইবার আশা পোষণ করিতে পারি।

জাপান পঞ্চাশ বৎসরে পুরাতন খোলোস বদলাইয়া এক নূতনদেশে পরিণত হইয়াছে। কর্ম্মজগতে আজ তাহারা কত শীর্ষস্থানে! তাহাদের রণকৌশল দেখিয়া জগতের যাবতীয় প্রধান প্রধান শক্তি ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়াছে। তাহাদের পণ্য ভারতের দরিদ্র পরিবারের ভিতর হইতেও অর্থ শোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের কর্ম্ম জগতের কৃতিত্ব আমরা ঘরে বসিয়াও উপলব্ধি করিতেছি। কিন্তু পাঠকগণ তাহাদের সাহিত্য সম্বন্ধে হয়তো অনেকেই অতি সামান্য বিদিত আছেন। সাহিত্য ক্ষেত্রেও আজ তাহারা নিম্ন স্তরে নহে; তাহারা এরূপ দ্রুত গতিতে দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে যে ভাবিলে অবাক হইতে হয়। তাহাদের প্রাচীন সাহিত্যের কথায় হাসি পায়। তাহাদের নিজেদের কোন অক্ষর ছিল না। কাযেই ধর্ম্মমন্দিরে শ্লোক কিম্বা গানের ধরণে যাহা মুখে মুখে শিখান যাইত, তাহাই তাহাদের প্রাচীন সাহিত্য। পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে জাপানে একখানা সাহিত্যও ছিল না। ইহাদের প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে—"যে কোরিয়ার ভিতর দিয়া ভারতের বৌদ্ধধর্ম্ম এবং দর্শন জাপানে আসিয়াছে, সেই কোরিয়ার ভিতর দিয়াই চীনের সাহিত্য প্রথম জাপানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে"। জায়গীর প্রথা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্ব পর্যন্ত জাপানে কয়েক শতাব্দী কেবল চীনদেশীয় শাস্ত্র এবং আচার পদ্ধতির আলোচনা হইত, এবং চীনা পুস্তক জাপানী ভাষায় অনুবাদিত হইত। এই সময় অনুবাদ-কাল (Translation period) নামে জাপানের ইতিহাসে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। জায়গীর প্রথার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই রাজ্যলিপ্সায় ব্যতিব্যস্ত থাকায় ১৫০০ খৃঃ পর্য্যন্ত সাহিত্যের কোনরূপ আলোচনাই হয় নাই। এই সময়কে তমোযুগ (Dark period) বলিয়া থাকে। আবার ষোড়শ শতাব্দীতে আমেরিকার সহিত কিঞ্চিৎ জানা শুনা হওয়ায় এবং ছাপিবার অক্ষর আবিষ্কৃত হওয়ায় পুনরায় জাপানে শিক্ষা বিস্তার আরম্ভ হইতে থাকে। ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে স্পেন ও পর্ত্তুগাল হইতে জেশুইট মিশন এদেশে আগমন করেন, এই সময় কেহ কেহ খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে থাকে। এবং জাপানী শিক্ষা

অবজ্ঞা করতঃ বৈদেশিক গ্রন্থপাঠে মনোনিবেশ করে। গবর্ণমেণ্ট বৈদেশিক জাতির সংস্পর্শে জাতীয় শক্তির শিথিলতা ঘটিবার আশঙ্কায় স্পেনিশ ও পর্ত্তুগিজদিগকে তাড়াইয়া দেন। সে সময় কেবল ওলন্দাজগণ নাগাসাকি সহরে থাকিতে আদেশ পায়। বিদেশী গ্রন্থের আমদানী বন্ধ হয়। এই সময় হইতেই জাপানীরা আগ্রহ সহকারে সাহিত্য এবং দর্শন আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। যখন ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং রুষবাসিগণ ক্রমেই এইদিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন জাপানীরা ভূগোলশাস্ত্র এবং চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করে। আজ দেখিতে দেখিতে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে উহাদের সাহিত্য ও বিজ্ঞানের কি অসাধারণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে! সঙ্গে সঙ্গে দেশ এবং জাতির অভাবনীয় বিকাশের ছটা সমগ্র সভ্যজগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সংবাদ পত্র স্তম্ভে দেখিয়াছিলাম যে ১৯০৬ খ্রীঃ সমগ্র ইংলণ্ডে এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যত মুদ্রণ কার্য্য হইয়াছে, ঐ বৎসর এক জাপানেই তাহার চেয়ে অধিক মুদ্রণকার্য্য হইয়াছে। ইংরাজী, জার্ম্মান এবং ফরাসী ভাষায় যত বড় বড় লেখকের গ্রন্থ আছে, সমস্তই জাপানী ভাষায় তর্জ্জমা হইতেছে। উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প করিতে তাহারা বলিয়া থাকে যে তাহারা মার্চ্চ্যাণ্ট-অব-ভেনিস্, কিং-লিয়ার প্রভৃতি পড়িয়াছে। উদ্ভিদ বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ যাহা কিছু পৃথিবীর সভ্যদেশে নিত্য নূতন ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে, কয়েক দিবসের মধ্যেই উহা জাপানী-ভাষায় মুদ্রিত হইয়া জাপানের হাটে, বাজারে এবং পল্লীগ্রামে দৃষ্ট হইতেছে। আজ রয়টারের সংবাদে দেখা গেল যে ইউরোপে একটা নূতন কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে, কালই উহা জাপানী সংবাদ পত্রে ও সভা সমিতিতে এক নূতন জাপানী নামে অভিহিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের ভিতর উহার ক্রিয়া কলাপ এবং বিশেষত্ব প্রচারিত হইতেছে। সার্চ্চ-লাইট, মটরকার, ইলেক্ট্রিক ট্রাম, ষ্টিম-ইঞ্জিন প্রভৃতি বলিলে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও বুঝিয়া উঠিতে পারে না, যেহেতু উহাদের ভাষাতেই উহার প্রতিশব্দ রহিয়াছে এবং ছোট বড় সকলেই নিজেদের প্রতিশব্দ ব্যবহারে অভ্যস্ত।

জাপানের উত্তর প্রদেশে সাগালিয়েন দ্বীপের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে হোক্কাইদো দ্বীপ ভূগোলে উহা ইয়েজো নামে পরিচিত। প্রাচীনকালে যখন সভ্য জাপানিগণ অসভ্য পার্ব্বত্যজাতি হইতে জাপান দখল করিয়া লয়, তখন পার্ব্বত্য জাতি এই হোক্কাইদো দ্বীপে আশ্রয় লয়। আজ পর্য্যন্তও অসভ্য আইনু জাতি তথায় দেখা যায়; সভ্যতা এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভদ্র এবং বিশিষ্ট জাপানীও এ দ্বীপেতে গিয়া বসতি বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। হাজার হইলেও জাপানের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা এ প্রদেশ আজ পর্য্যন্তও বিদ্যা ও সভ্যতায় হীন। সেই দ্বীপের দ্বিতীয় সহরে তথাকার গবর্ণর বাস করেন। গবর্ণমেণ্ট ঐ প্রদেশ উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে তথায় ইম্পিরিয়াল কৃষি কলেজ স্থাপন করিয়াছেন। আমি আমার জাপান জীবনের প্রথম বৎসর সেই কলেজে কাটাই। সহরটির নাম ছাপ্পোরো। সহরটি লোক সংখ্যায় অনেকটা ময়মনসিংহ জিলা-সহরের অনুরূপ। সেখানে যাওয়ার কয়েকদিন পর আমার এক সহাধ্যায়ীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে সে সহরে কোন সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয় কিনা। উত্তরে জানিতে পারিলাম— ঐ ক্ষুদ্র সহরে দৈনিক পাঁচখানা সংবাদ-পত্র বাহির হইয়া থাকে, এবং ২৩ মাইল দূরবর্ত্তী অপর একটি সমুদ্র তীরবর্ত্তী সহরে দৈনিক চারিখানা সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। জাপানী বন্ধু আরো জানাইলেন যে তাহাদের সেই অর্দ্ধ সভ্য দ্বীপের কোন একটি উল্লেখ যোগ্য গ্রামের একখানা উৎকৃষ্ট দৈনিক, সমগ্র জাপানের শিক্ষিত সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া থাকে।

অনুন্নত প্রদেশেই সাহিত্যের সেবায় জাপানীরা যে ভাবে নিয়োজিত রহিয়াছে, তাহাতেই স্পষ্ট উপলব্ধি হইয়া থাকে যে সে জাতির উত্থান অবশ্যম্ভাবী। মধ্য এবং দক্ষিণ প্রদেশে দেখিয়াছি যে সামান্য সামান্য নাপিত, দরজি, দুধওয়ালা, তরকারীওয়ালা প্রভৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভা, সমিতি বা ক্লাব হইতেই পাক্ষিক কিম্বা মাসিক পত্র প্রকাশিত হইত, উহাতে উহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য যাহা কিছু সম্ভব তাহাই আলোচিত হইত।

যে দেশের শতকরা ৯৮।৯৯ জন শিক্ষিত, সেখানে সাহিত্যের চর্চ্চা না হইবে কেন! প্রাতঃকালে হাত মুখ ধোয়ার পরই প্রত্যেকের প্রধান কর্ত্তব্য—ঐ দিনের সংবাদ পত্র পাঠ। প্রাতে সাতটার সময় অফিসার এবং কর্ম্মচারী অফিসের দিকে ছুটিয়াছে; অধ্যাপক এবং ছাত্র বিদ্যালয়ের দিকে দৌড়াইতেছে, কুলি কারিগর মজুরিতে যাইতেছে, তবু তাহাদের বিরাম নাই; অবসর না থাকিলেও অন্ততঃপক্ষে মোটামুটি প্রধান প্রধান সংবাদ কয়েকটি দেখিতে দেখিতে চলিয়াছে। সত্তর বৎসর বয়সের বৃদ্ধ চশমা চক্ষে দিয়া দোকানে বসিয়া সংবাদ পত্র পড়িতেছে, ট্রামে কিম্বা রিকশায় বসিয়া আরোহিগণ কাগজ দেখিতে ব্যস্ত। আরোহীর প্রত্যাশায় কোন কোন রিকশাওয়ালা চৌমাথায় রিকশার উপর বসিয়া কাগজ পড়িতেছে। চাকর চাকরাণী তাড়াতাড়ি প্রাতঃকালীন কাজ সমাধা করিয়াই খবরের কাগজ লইয়া বসিয়াছে, আমাদের চাকর চাকরাণীদিগকেও দৈনিক কাগজ লইতে দেখিতাম।

নাপিতের দোকানে চুল কাটাইতে গেলেন, নাপিত হয়তো অন্যের ক্ষৌরকার্য্যে ব্যস্ত; আপনাকে বাধ্য হইয়া ১০।১৫ মিনিট অপেক্ষা করিতে হইল; ঐ সময়টা যাহাতে আপনার অপব্যয় না হয়, সে জন্য নাপিত তাহার আগন্তুকদের জন্য টেবিলের উপর দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক কাগজ কয়েকখানা রাখিয়া দিয়াছে। বিশিষ্ট দোকানে কোন জিনিস খরিদ করিতে গেলেন, জিনিসটা ষ্টোর খুঁজিয়া বাহির করিতে কতকটা সময়ের আবশ্যক। দোকানদার গ্রাহকের হাতে একখানা নূতন সংবাদপত্র পড়িতে দিয়া জিনিস খুঁজিতে গেলেন। এইভাবে আজ কাল জাপানে সাহিত্যের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। পাহাড়ের পাদদেশে নিভৃত পল্লীতে পার্ব্বত্যজাতির ভিতরও সাহিত্য চর্চ্চা দেখিয়া অবাক হইয়াছি।

১৮০০ মাইল দূরবর্ত্তী রাজপুতনার মরুভূমি প্রদেশেও "সৌরভের" সৌরভ আসিয়া পৌঁছায় দেখিয়া আমার সেই জাপানের কথা স্মরণ হইল। বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে আমাদের মরা গাঙ্গে জোয়ার লাগিয়াছে। উপযুক্ত অর্থের সহিত রাজধানী হইতে সুদূর জেলাসহরেও সাহিত্যের পূজার বন্দোবস্ত হইতেছে। সাহিত্যের গৌরব ঘরে ঘরে রটুক; প্রতি জেলায় প্রতি মহকুমায় প্রকৃত আরাধনার জন্য সাহিত্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক। সাহিত্যের প্রভাবে বৈজ্ঞানিক যুগের আলোক ছটা সকলের ভিতর প্রকটিত হউক। নষ্ট গৌরব উদ্ধার করিয়া ভারত পুনরায় সেই ধর্ম্মশিষ্য জাপানের গুরুদেবের স্থলে অভিষিক্ত হউক।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

তুষার হইতে বিদায়।

আসি তবে, হে হিমাদ্রি, পরেছে যাত্রার ত্বরা,
দূরে হ'বে যেতে,
আঁখি ভরে, দেখি রূপ, ধবল আদর্শ তব,
মর্ম্মে নিই গেঁথে!

শুনা'লে তোমার বার্ত্তা, বুঝালে তোমার তত্ত্ব,
কাছে কাছে রাখি,
পেল দুটী স্বর্ণ পাখা, লভিয়া তোমার স্বর্গ
পিঞ্জরের পাখী।

তব ফুলে নব গন্ধ, তব গীতে নব ছন্দ,
কি কান্ত কান্তারে,
ঘুরিয়া হিমের পুরে, তৃষ্ণা মোর গেল দূরে
তোমার তুষারে!

শৃঙ্গে শৃঙ্গে এত মূর্ত্তি, এত লীলা, এত স্ফূর্ত্তি,
নিশায় দিবসে,
অবসাদ ফুরাইল, দেহ মন জুড়াইল,
শীতল পরশে!

তোমার নভের মেঘে আমার কল্পনা লেগে,
হয়ে গেছে সোণা,
আমারে করিল কবি জ্যোৎস্না ধৌত তব ছবি,
সোণার প্রেরণা!

প্রকৃতির জল-যন্ত্র, করিল কি শত-রন্ধ্র
মুরলী তোমায়?
সে ডাকে কাঁদিল আত্মা মুক্তি-স্নান সেই শত

দেখিতে তুষার দৃশ্য, পদপ্রান্তে ভক্ত বিশ্ব
গদ্গদ অন্তরে !
শিখিপুচ্ছ মনোলোভা না, এ বরফের শোভা,
শিখরে শিখরে ?
পাহাড়ের খাত বেয়ে বরফ নামিছে গলে'
তপ্ত রবিকরে,
আনন্দ কি পড়ে ঢলে', করুণা কি নামে গলে,
পাষাণের স্তরে ?
তোমার কৃত্রিম হ্রদ, তাও কত মনোমদ,
কাকচক্ষু নীর,
সেই হ্রদে দাঁড় ধরি,' বাহিয়াছি ক্রীড়া তরী
উল্লাসে অধীর !
কোথা আধিত্যকা-পথে শুয়ে দীর্ঘ শুভ্র মেঘ
পোহাইছে রোদ্,
তব বাহুবন্ধে যেন ধবল ঝরণা-ধারা
হয়েছে নিরোধ !
বিচিত্র মখমল-প্রায়, শৈবাল শিলার গায়,
মসৃণ কোমল,
তোমার নীহারে স্নাত, রৌদ্র-করে প্রতিভাত,
করে ঝল্‌মল্,
রবি-চন্দ্র তব দ্বারে, সন্ধ্যা প্রাতে করে কারে
মঙ্গল আরতি ?
কন্দরে কন্দরে শান্তি, শিখর-কান্তার কান্তি,
গম্ভীর বিরতি !
তপোমগ্ন তরু-লতা, সমাধির বিজনতা
দিতেছে পাহারা,
পান্থ যদি করে, শব্দ, 'চুপ ! চুপ ! বলে' স্তব্ধ
করায় তাহারা।
সে নিশুতি ভঙ্গ করে,' নির্ঝর নামিছে জোরে,
তার দুই ধারে—
আকাশে উঠেছে বন, পাতালে নেমেছে বন,
শৃঙ্গ অন্ধকারে !
কত গাছে অর্দ্ধ-শুষ্ক, কত গাছে মর্'-মর্'
রংটী পাতার !

হেমন্তের হিমে স্নাত, বসন্ত, হরিত, পীত,
পাতার বাহার !
ও কি কাননের স্তূপ ? না, গিরিকন্দর্প-রূপ,—
রোমাঞ্চ বনের ?
উদ্ভিদ-স্বপ্নের মত রবারের গাছ কত,
ঐশ্বর্য্য মনের !
নিম্নে বিদারিয়া শিলা ধাইছে পার্ব্বতী নীলা
গভীর গর্জ্জনে,
দু'য়ে লক্ষ তরু সা'র দু' ধারে গৈরিক পার
মিশেছে গগনে ;
শিখর-কান্তার-ফাঁকে, প্রকৃতি গড়েছে 'লন'—
আঙ্গিনা তোমারি !
কোথা শিলা-সিঁড়ি বেয়ে থাকে থাকে নামিয়াছে
চা গাছের সারি।
তব তুঙ্গ-শৃঙ্গ প'রে সমতল দেখা যায়—
অকূল সাগর !
সৃষ্টির ইঙ্গিত পেয়ে ও কি সে কারণ-বারি
স্তম্ভিত নিথর ?
সৃজন-প্রত্যুষে তাই, নভে নভোমণি নাই,
উলঙ্গ গগন !
রবি-সৃষ্টি আশা করে,' তোমার নিসর্গ বুঝি
ধ্যানে নিমগণ!
—সহসা ইঙ্গিতে কা'র উঠে রবি সিন্ধু সম
সমতলহতে'
সাঁঝে তব শৃঙ্গ পাছে স্বর্ণমেঘ যেথা আছে.
নামে সেই পথে।
রঞ্জি' দূর চক্রবাল বহুক্ষণ লালে লাল
খেলে স্বর্গ-হাসি,
সুখ- স্বপ্নে থর থর, দাঁড়াইয়া চরাচর
নমে রূপরাশি !
হেম, না ও হিম-শৃঙ্গ ? না, প্রবাসী দেবতার
রক্ত-বস্ত্রালয় ?
দেবাত্মারে লয়ে' বক্ষে দেখিছে কি মুগ্ধ চক্ষে
বিশ্বের বিস্ময় ?

এই উদয়াস্ত-তটে বসিয়া কে যেন কহে,—
'পথিক লুটাও!'
নয়নের দ্বার খোল,' 'ভোল'; এ দুনিয়া ভোল,'
যাও, ডুবে যাও!
—এসেছিনু তব ছায়ে ভগ্ন প্রাণে, রুগ্ন কায়ে,
তোমার আহ্বানে,
দিলে স্বাস্থ্য, দিলে সুখ ভরিয়া এ শূন্য বুক,
গাঁথা প্রাণে প্রাণে!
দেহে প্রাণ, গিরিরাজা, যেন ফুল কুল্ল, তাজা
কচি পত্রপুটে,
ধৌত মেঘে হিমানীতে, নব রক্ত ধমনীতে
টগ্‌বগ্‌ ফুটে।
প্রাণতন্ত্রী বাজাইলে, সাধনারে সাজাইলে
তোমার সঙ্গীতে,
শিরায় তাড়িত ছুটে', হিয়ায় কবিতা ফুটে'
তোমার ইঙ্গিতে!
আলোতে রচিয়া ছায়া জীবনে মৃত্যুর মায়া
দেখা'লে নিভৃতে,
দেবতারে চিনাইলে, আত্মা মোর জিয়াইলে
তোমার অমৃতে!
আছে যে কুহক-পুরী, মৃত্যুমন্ত্র দিয়া ঘেরা
জীবনের পারে,
আনন্দে উধাও চিন্তা আসিল আঘাত করি'
তা'রও বজ্রদ্বারে!
কিছু রাখ নাই ঢাক, কিছু রাখ নাই বাকি,
দিলে ঢেলে সব,
ক্ষুদ্র এ হৃদয়-পুটে কত আর নিব লুটে
অসীম বৈভব?
আজ স্বপ্ন টুটে' যায়, নৈরাশ্য বিদায় গায়,
ফেটে যায় প্রাণ,
ফিরে' ফিরে' চাই সুধু তোমার অনন্ত মধু,
আঁখি করে পান।
মত্ত কলাপীর মত স্ফূর্ত্তির পেখম ধরে'
এ শৈল-বিহার,
স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন, দীপ্ত জীবনে গর্ব্বের দিন
আসিবে কি আর?
আর কবে হ'বে দেখা চিত্র-চিত্রপটে লেখা
ও দিব্য মূরতি?
ভাষা-ভাব ধুলে লুটে, ভাল করে নাহি ফুটে
বিদায়-ভারতী!
প্রাণ হবে কৃষ্ণহারা পার্থের গাণ্ডীব সম
বিহনে তোমার,
ভাব মোরে যাবে ছেড়ে, ভাষারে কে নেবে কেড়ে,
স্বপ্ন চুর্‌মার্‌!
চোখের এ ছাড়াছাড়ি জানি সুধু বাহিরের,
অন্তরের নয়,
তিলেক রবে না ছাড়া, পূর্ণ করে' রবে তুমি
ভক্তের হৃদয়!
তথাপি তোমার কাছে আমার নিরাশা যাচে
বিদায়-প্রসাদ,
আজ তুমি কর মোরে শেষ দিনে প্রাণ ভরে'
শেষ-আশীর্ব্বাদ!
দেখিনু যা, শুনিনু যা, বুঝি, আর না-ই বুঝি,
প্রাণে যেন থাকে,
সংসারের ঝঞ্ঝাবাতে ফেরে যেন সাথে সাথে
শুভে মতি রাখে!
এই উঁচু দিকে চাওয়া, এই ঊর্দ্ধ পানে ধাওয়া
যেন নাহি ভুলি,
যেন ও ধবল চূড়া, ঢেউ খেলাইয়া প্রাণে
দেয় স্বর্গ খুলি'!
দুপারে দুজন মোরা, মাঝে বিরহের সিন্ধু,
স্মৃতি ভাসে তাতে,
কাঁদিব বসিয়া একা, তুমি ত দিবে না দেখা
সে বিরহ রাতে!
পূর্ণ সুকৃতির মাত্রা, সমাপ্ত তুষার-যাত্রা,
হিমানি, বিদায়।
মেঘরাজ্য রাখি পিছে নামিয়া যেতেছি নীচে,
স্বর্গভ্রষ্ট প্রায়!

মাথা নাহি রয় খাড়া, স্ফূর্ত্তি নাহি দেয় সাড়া.
চিন্তা মূর্চ্ছাহত !
রক্তধারা আসে থেমে, হৃদয় যেতেছে নেমে
নামিতেছি যত !
শোভাদ্রি, যেওনা ছেড়ে, আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে
কর'না কাঙ্গাল ;
যতই যেতেছ সরে' তোমারে জড়ায়ে ধরে
মোর স্বপ্নজাল !
ক্রমে, আধ আধ দেখা, যেন কুহকের রেখা,
ভাল লাগে তাও.
পায় পায় কোথা যাও ? বারেক ফিরিয়া চাও,
একটু দাঁড়াও !
প্রাণ নাহি যেতে চায়, তবু যেতে হয়, হায়,
এ বিধান কার ?
সৃষ্টিছাড়া বুঝি সেই, বিশ্বে তা'র কেউ নেই
হাসার, কাঁদার !
গেল হিয়া ফেটে গলে', তোমারে যে অশ্রুজলে
দেখিতে না পাই,
শুভ্র-শোভা, ধীরে ধীরে ডুবে গেলে আঁখিনীরে ?
যাই, তবে যাই।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

তিব্বত অভিযান।

উদ্দেশ্য।

বহুদিন হইতে আমাদের ভারত গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছা, তিব্বতের সহিত অবাধ বাণিজ্য সংস্থাপন করেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোনও প্রকার যত্ন বা চেষ্টার অভাব হয় নাই। কিন্তু বহু যত্ন চেষ্টায়ও কার্য্য অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। শেষ ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে যখন ইংরাজ অবগত হইলেন যে তিব্বতের রাজধানী লাসায় কয়েক জন রুষ কর্ম্মচারী উপস্থিত হইয়া তথাকার প্রধান লামার সহিত নানা প্রকার পরামর্শ করিতেছেন, তখন আমাদের গবর্ণমেণ্ট বুঝিলেন,তাঁহাদের সমস্ত আশা ভরসা আকাশ কুসুমে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। রুষ যদি তিব্বতে আধিপত্য লাভ করেন, তাহা হইলে ইংরাজকে যে তথা হইতে শুষ্ক মুখে ফিরিতে হইবে, তাহা নিতান্ত স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। ইংরাজ তখন স্পষ্ট বুঝিলেন যে, অবিলম্বে প্রতিবিধানের বন্দোবস্ত না করিলে রুষ রাজ্য একদিন দারজিলিং পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। তখন ভারত রক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে কোটি দুই মুদ্রা ব্যয় করিতে হইবে। সুতরাং বিলাতের মন্ত্রিসভা স্থির করিলেন যে, তাঁহাদের দূত অতি শীঘ্র, গিয়াংসি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবেন ; ঐ দূতকে রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্য বল তাঁহার সহিত প্রেরিত হইবে ; চুম্বি উপত্যকা অধিকার করিতে হইবে, ও যত দিন পর্য্যন্ত তিব্বত তাঁহাদের সহিত চিরস্থায়ী বাণিজ্য সংস্থাপিত না করিতেছেন, তত দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা চুম্বি ত্যাগ করিবেন না।

তখন চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। বাছিয়া বাছিয়া কষ্ট সহিষ্ণু সৈন্য ও সেনানায়কগণ নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। তিব্বত পার্ব্বত্য দেশ। এখন নবেম্বর মাস, যে হিমালয় প্রদেশ অতিক্রম করিয়া সৈন্যদিগকে গমন করিতে হইবে, তথায় এখন ভীষণ শীতের প্রকোপ। এই প্রকার স্থানের জন্য যে বিশেষ সৈন্যের প্রয়োজন তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেব এই তিব্বত অভিযানের ইংরাজ দূত নিযুক্ত হইলেন। সৈন্য পরিচালনার ভার সেনাপতি ইয়ংহাজ্‌ব্যাণ্ড্ সাহেবের উপর সমর্পিত হইল। ইংরাজ দূতকে রক্ষা করিবার জন্য প্রায় আড়াই হাজার সৈন্য নিয়োজিত হইল। এতদ্ব্যতীত, সামরিক ইঞ্জিনীয়ার, হাঁস পাতালের ডাক্তার, কমিসেরিয়েটের কর্ম্মচারী এবং অপরাপর প্রয়োজনীয় লোকজন ছিল। উপর্য্যুক্ত সংখ্যক সৈন্য ব্যতীত এই অভিযানের সহিত আরও প্রায় পাঁচ হাজার লোক ছিল। অশ্ব, অশ্বতরী, বলদ, মুর্গি, ছাগল প্রভৃতির সংখ্যাই নাই।

আমি তখন এলাহাবাদের কমিসেরিয়েট আফিসে কাজ করিতাম। একদিন বেলা একটার সময় আমাদের বড় সাহেব আফিসের সমস্ত কেরাণীকে ডাকিয়া

পাঠাইলেন। আমরা সকলে সমবেত হইলে তিনি বলিলেন—অতি শীঘ্র আমরা তিব্বতে সৈন্য পাঠাইব মনস্থ করিয়াছি। এই অভিযানের জন্য অনেক কেরাণীর প্রয়োজন। তোমাদের মধ্যে কেহ যাইতে চাহ কি?” তাহার পর তিনি আমাদিগকে পথের নানা প্রকার কষ্টের কথা বুঝাইয়া দিলেন। কিয়ৎকাল পরামর্শের পর আমাদিগের মধ্যে আমি ভিন্ন আর কেহই যাইতে সম্মত হইলেন না। সাহেব বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন বলিয়া মনে করিলাম। তিনি বলিলেন—আমি ও যাইব। যাহাতে তুমি সর্ব্বদা আমার সঙ্গে ২ থাক, তদ্বিষয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।” আমি সাহেবকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া চলিয়া আসিলাম। তাহার পর একদিন এলাহাবাদ ত্যাগ করিয়া শিলিগুড়ি উপস্থিত হইলাম। সমস্ত সৈন্যাদি ও কমিসেরিয়েটের কর্ম্মচারীবর্গের মিলন স্থান এই শিলিগুড়িতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

শুনিলাম, যে পথে আমাদিগকে যাইতে হইবে, তাহাতে কোনও প্রকার খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায় না। সুতরাং সঙ্গের সমস্ত লোকের আহারের বন্দোবস্ত সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাই। তাহার উপর পথের দুর্গমতা। এক এক স্থানে খচ্চরেরও পথ নাই। এই প্রকার স্থানে প্রায় আট হাজার লোকের খাদ্য দ্রব্য লইয়া যাওয়া যে কি প্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার, তাহা অনুমান করা বিশেষ দুরূহ নহে। অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে, সঙ্গে আমরা কেবল মাত্র দেড় মাসের খাদ্য দ্রব্য লইয়া যাইব। যে যে স্থানে খচ্চর যাইতে পারিবে না, সেখানে পাহাড়ীয়া কুলি নিযুক্ত করা হইবে।

ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রেলযোগে শিলিগুড়িতে উপস্থিত হইতে লাগিল। আমরা ঐ সকল দ্রব্য গরুর গাড়ী বোঝাই করাইয়া পাঠাইতে লাগিলাম। যতদূর পর্য্যন্ত পথ সুগম ছিল, গোশকট গমন করিল। যখন রীতিমত চড়াই আরম্ভ হইল, তখন খচ্চরের সাহায্য গ্রহণ করা হইল। ইহাদের সহিত পার্ব্বত্য কুলি প্রেরিত হইল। পথ নিতান্ত দুর্গম হইলে তাহারাই মোট লইয়া গমন করিত। এই সমস্ত কুলি কাশ্মিরী, নেপালী, ভুটানি, গড়োয়ালি, বালতি, লাপ্‌চা প্রভৃতি জাতি দিগের মধ্য হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল।
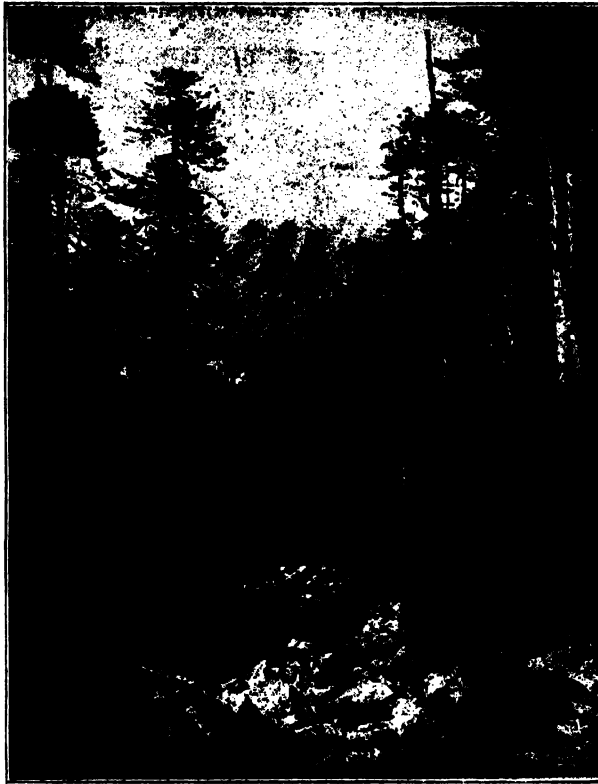
নিয়ম হইল যে, প্রত্যেক য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীর সহিত এক মণ ও প্রত্যেক দেশীয় কর্ম্মচারীর সহিত অর্দ্ধ মণ দ্রব্য যাইতে পারিবে। শুনিলাম, পথিমধ্যে ভীষণ শীতের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। সেই জন্য বিশেষ বিবেচনার পর, সঙ্গে একখানা খুব মোটা লেপ, দুইখানা রগ, ছয়খানা কম্বল, তুলাভরা জামা ও পাজামা কয়েকটা, লোমের জুতা চারি জোড়া ও চারিটা ব্যালাক্লভা টুপি লইয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত, চা ও ডিম সিদ্ধ করিবার সমস্ত দ্রব্যাদি সঙ্গে ছিল। আমার দ্রব্যাদি ২০ সেরের অনেক অধিক হইয়াছিল কিন্তু আমার সাহেবের অনুগ্রহে তাহাতে কেহ আপত্তি উত্থাপন করে নাই। এই স্থানে

বলিয়া রাখা ভাল যে, আমার সহিত আরও দুই জন বাঙ্গালী ছিলেন ; একজন হাঁসপাতালের ষ্টোর কীপার রায় মহাশয় ও দ্বিতীয়—আমাদের একজন গোমস্তা সেন মহাশয়।

তীস্তাতটে রাত্রিবাস।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই নবেম্বর আমরা সিলিগুড়ি ত্যাগ করিলাম। এখানে 'আমরা' কথার একটু টীকার আবশ্যক। ২রা নবেম্বর প্রায় দেড় হাজার সৈন্য রওনা হইয়াছিল। তাহার পর কমিসেরিয়েট—আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যাদির তত্ত্বাবধান করিতেছিলাম। আমার নিজের দলে তিন জন বাঙ্গালী, দুই জন সাহেব, পাঁচ জন হিন্দুস্থানী ও একজন শিখ ছিলেন।

অবশ্য সঙ্গে আরও কয়েক জন নিম্নশ্রেণীর ভৃত্য ছিল। আমরা উপর্য্যুক্ত এগার জন কর্ম্মচারী এক একটি করিয়া পনি পাইয়াছিলাম। সঙ্গের অপরাপর সকলে অবশ্য পদব্রজেই গমন করিতেছিল।

শিলিগুড়ি হইতে প্রথম চারি মাইল পথের মধ্যে বিশেষ কোনও বিশেষত্ব নাই। তাহার পর আমরা এক বিশাল শাল বনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি উত্তর ব্রহ্মে অনেক শালের জঙ্গল দেখিয়াছি। কিন্তু এমন উন্নত ও বিশাল বৃক্ষের একত্র সমাবেশ দেখি নাই। এ জঙ্গল অতি বিশাল। শুনিলাম, হিমালয়ের শাল বন পৃথিবীর মধ্যে অতুলনীয়। এই জঙ্গলের মধ্যে আরও অনেক রকম গাছ দেখিলাম। কিন্তু শালের সংখ্যাই খুব অধিক। প্রায় তিন ঘণ্টার পর আমরা নিপুণ পথ প্রদর্শকের সাহায্যে এই জঙ্গলের এক দিক অতিক্রম করিয়া তীস্তা নদীর তটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে বলিয়া রাখা ভাল যে, এই পথে আমাদের সৈন্য আসিবার কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে একদল রাস্তা পরিষ্কারক সৈন্য (Pioneers) আমাদের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিল।

তীস্তা একটী পার্ব্বত্য নদী। ইহার বিস্তৃতি অধিক নহে, অত্যন্ত খরস্রোতা। উভয় তটে নিবিড় শাল বন—অনেক স্থানের জল বোধ হয় কখনও রবিতাপ অনুভব করে নাই। অপর পারে ঢেউখেলান পর্ব্বত মালা—উত্তর দিকে ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইয়া শেষে যেন মেঘের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তীস্তার অপর পার হইতে ভোট রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। ভোটেরা নিজেদের দেশকে 'ভিউক' বা 'ভুক' বলে। তাহার অর্থ 'চপলার রাজ্য'। উহাদের দেশে চপলার বিশেষ প্রাদুর্ভাব বলিয়া এই প্রকার নাম হইয়াছে।

আমরা যখন তীস্তা তটে উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা প্রায় একটা। আমরা সে দিন ঐ স্থানেই গমন স্থগিত রাখিলাম। এই স্থানের কিয়দ্দূরে, তীস্তার উভয় তট হইতে দুইটি পর্ব্বত যেন নদীকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে। অবশেষে উভয়ে উভয় তটে দণ্ডায়মান হইয়া যেন মুগ্ধ-

ভাবে তীস্তার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য উপভোগ করিতেছে। এখানে তীস্তার বিস্তার ১০।১২ গজের অধিক হইবে না। নদীর জল অত্যন্ত পরিষ্কার, তলদেশের ক্ষুদ্র ২ উপলখণ্ড পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। নদীর মধ্য স্থলে একখানা বিপুলাকার প্রস্তর খণ্ড জলের উপর যেন প্রহরীর মত মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান।

আহারাদির পর আমরা তিনজনে নদীর তীরে বেড়াইতে বাহির হইলাম। জঙ্গলে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হস্তী প্রভৃতি হিংস্র জন্তু অনেক আছে শুনিয়া, আমি ও সেন মহাশয় এক একটা বন্দুক সঙ্গে লইলাম। অধিক দূর যাইতে হইল না। প্রায় এক মাইল পথ গমনের পর রায় মহাশয় সহসা দাঁড়াইলেন। চাহিয়া দেখি, তাঁহার সমস্ত মুখ একবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি, তিনি থর থর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করাতে তিনি সুধু অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিলেন। যাহা দেখিলাম তাহাতে তাঁহার কাপুরুষতার জন্য তাঁহাকে বিশেষ দোষী করিতে পারিলাম না। আমাদের বাম দিকে প্রায় ২০ গজ দূরে একটী উচ্চ স্থানের উপর একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র দণ্ডায়মান। ইহার পূর্ব্বে আমার সহিত ব্যাঘ্র জাতির কয়েকবার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া আমি নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলাম না। সেন মহাশয়কেও বিশেষ ভীত বলিয়া মনে হইল না। আমরা তখন কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিচার করিতে লাগিলাম। আমার ইচ্ছা বন্দুক চালাই, কিন্তু রায় মহাশয় বলিলেন, "যদি এক গুলিতে না মরে, তবে বিষম বিপদ হইবে।" তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে বাঘটা পর্ব্বতের অপর দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। সকলে যেন নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম।
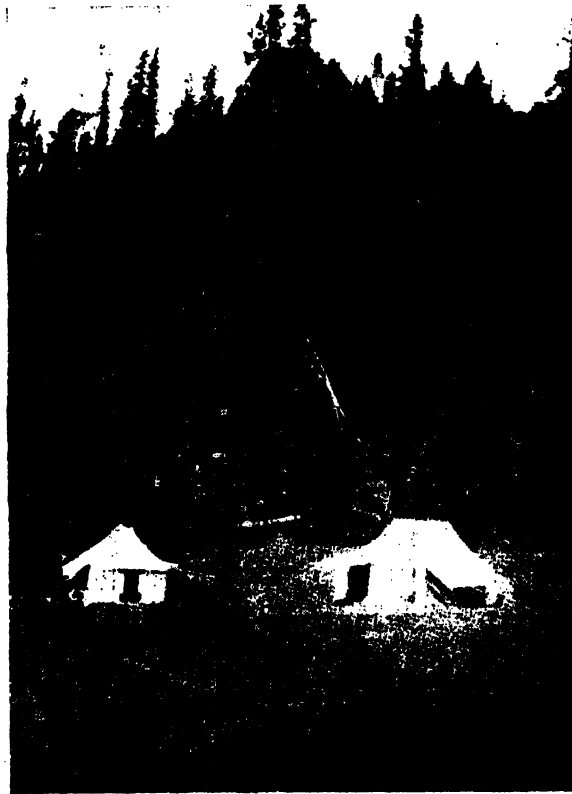
রাত্রি নয়টার পর আমাদের দলের সকলেই শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সমস্ত দিবস পরিশ্রমের পর আমরা তিনজনেই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। শয়নের সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা দেবী দয়া করিলেন। রাত্রি প্রায় একটার সময় একটা বিষম চীৎকারে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ঠিক এই সময়ে রায় মহাশয় 'বাঘ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আমি পার্শ্বস্থিত বন্দুকটি হাতে লইয়া এক লম্ফে দণ্ডায়মান হইলাম। শিবিরের মধ্যে তখন অন্ধকার। পকেটে একটা ম্যাচ বাক্স ছিল, তাড়াতাড়ি একটা মোম বাতি জ্বালিয়া ফেলিলাম। এই খানে বলা উচিত, আমরা তিনজন বাঙ্গালী একই তাঁবুর মধ্যে ছিলাম। রায় মহাশয়ের ক্যাম্প খাটটা ঠিক দরজার সম্মুখেই ছিল। তাঁবুর অপর প্রান্তে আমার ও সেন মহাশয়ের খাট। আমি রায় মহাশয়ের খাটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি, তিনি খাটের নীচে পতিত; আর তাঁহার খাটে অপর একজন কেহ রহিয়াছে। নিকটে যাইয়া দেখি, আমাদের মহারাজ (পাচক ব্রাহ্মণ রামনাথ) বেশ আরামের সহিত শয়ন করিয়া আছে। অনুসন্ধানে জানিলাম, আসল ব্যাপারটি এই—রামনাথ রাত্রে নিজের শয্যায় শয়ন করিয়া আছে এমন সময়

সহসা তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। সে দেখে, কি একটা জন্তু তাহার পা চাটিতেছে। তাহার মনে হইল, বুঝিবা বাঘ। সে তখন প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করিতে করিতে আমাদের তাঁবু সম্মুখে দেখিতে পাইয়া ঢুকিয়া পড়িল। সম্মুখেই রায় মহাশয়ের খাট। সে 'বাঘ—বাঘ' বলিয়া উহার উপর উঠিয়া পড়াতে সদ্য নিদ্রোত্থিত রায় মহাশয় বেচারা তাহাকে একটা আস্ত বাঘ মনে করিয়া একলম্ফে একবারে মাটিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু তিনি আর ঐ খাটের উপর শয়ন করিতে চাহিলেন না। অগত্যা আমার সহিত তাঁহার শয্যা বদল করিতে হইল। প্রাতে সামান্য অনুসন্ধানেই জ্ঞাত হইলাম,যে আমাদের সাহেবের একটা বড় কুকুর এই সমস্ত অনর্থের মূল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

জন্ম-রহস্য।

গৃহটী আলোকিত করিয়া আসিয়া যখন নবপ্রসূত শিশু পৃথিবীর আলোক সন্দর্শন করে, তখন সকলেই মনে করেন—আগন্তুক হয় ছেলে না হয় নিশ্চয় মেয়ে। কিন্তু কেহই বোধ হয় এই সহজ স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত ছাড়িয়া ইহা অপেক্ষা অন্য কোন জটিল অনুমানে উপনীত হইতে ইচ্ছা করেন না।

যমজ বা ততোধিক সন্তানের একেবারে জন্ম গ্রহণ একটি অপেক্ষাকৃত জটিল সমস্যা। সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বে বোধহয় কেহই এরূপ একটা ঘটনা ঘটিবে সহসা অনুমান করিতে পারেন না। সম্প্রতি বিলাতের ষ্ট্রেণ্ডমেগাজিনে Dr Norman Porritt এই জন্ম রহস্যের একটু আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সমস্ত পৃথিবীর যমজ সন্তান-জন্মের গড় ধরিয়া বলিয়াছেন, গড়ে শতকরা ৮০ জনের মধ্যে একজন শিশু যুগলে আগমন করে। তবে এই যুগলে আসিবার হার সকল দেশে সমান নহে। আয়র্লণ্ডে প্রতি ৬০ জনে একজন, খাস বিলাতে প্রতি ১১০ জনে একজন, ডাব্লিন সহরে প্রত্যেক ৫৮ জনের মধ্যে একজন যমজ সন্তান। নেপলস্ সহরে কিন্তু ১৫৮ জনে একজন যমজ। আমাদের দেশে যমজের হার শতকরা কিরূপ তাহা জানিবার উপায় নাই। সেন্সাসেও তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। তবে আমাদের দেশের যমজ সন্তানের সংখ্যা মোটামুটি দেখিলে ও অপেক্ষাকৃত গ্রীষ্ম প্রধান নেপলস্ সহরের উচ্চহার চিন্তা করিলে, শীতাতপই এই হ্রাস বৃদ্ধির কারণ বলিয়া মনে হয়।

তিনটী সন্তান একসঙ্গে খুব কদাচিৎ হইয়া থাকে। Dr Porritt বলেন—বোধ হয় সাড়ে ছয় হাজারের মধ্যে এক বারের বেশী তিনটী সন্তান একসঙ্গে হয় না। কিন্তু প্যারিসের এক রুটী বিক্রেতার পত্নী নাকি প্রতি বৎসরে ৩টী করিয়া ৭ বৎসরে তাহাকে ২১টী সন্তান উপঢৌকন দিয়াছিল!

ময়মনসিংহের কোন এক স্থানে একটী নিম্ন জাতীয়া স্ত্রীলোকের ১ম গর্ভে একটী, দ্বিতীয় গর্ভে তিনটী, তৃতীয় গর্ভে তিনটী সন্তান জন্মিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বা সুখের বিষয়, ইহাদের একটীও টিকে নাই। বলা দরকার, এই স্ত্রীলোকটী প্যারিসের সেই স্ত্রীলোকটীর মত "সমাংসমীনা" ছিল না। ফরাসী দেশে জন্মের সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রায়ই শুনা যায়। ডাঃ নর্ম্মাণ পরিট বলেন, কেবল ফরাসী দেশে নয়, সমগ্র ইউরোপেই জন্মের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। আর কলিকাতার ডাক্তার ইউ, এন্ মুখার্জ্জি তাঁহার রচিত "A dying race" নামক পুস্তিকায় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে হিন্দুজাতির ভিতর জন্মের সংখ্যা এত কমিতেছে যে অদূর ভবিষ্যতে ভালর দিকে কোন পরিবর্ত্তন না হইলে হিন্দুজাতি একেবারেই লোপ পাইবে। এখন হয়ত সব দেশেই জন্মসংখ্যা কম। কিন্তু জন্মসংখ্যা খুব বেশী হইলেও, William Stutton নামক এক ব্যক্তির প্রতি মা যেরূপ কৃপা করিয়াছিলেন, তাঁহার এরূপ কৃপা-বাৎসল্যের কথা সচরাচর শুনা যায় না। এই ব্যক্তি দুইবার দার পরিগ্রহ করেন; এবং প্রথম স্ত্রীর গর্ভে ২৮টী দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে ১৭টী—একুনে ৪৫টী, সন্তান লাভ করেন। ৯৭ বৎসর বয়সে ইনি মারা যান। তখন তিনি ৮৬ জনের

পিতামহ, ৯৭ জনের প্রপিতামহ এবং ২৩ জনের বৃদ্ধ প্রপিতামহ হইয়াছিলেন! একুনে তাঁহার বংশে ২৫১ জন জন্মগ্রহণ করিলে পর তিনি মহিষ বাহনের আহ্বানে আহুত হন। এই কলিকালেই যদি একজন হইতে একশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ২৫১টী প্রাণীর উদ্ভব সম্ভব হয়, তবে ত্রেতায় যে রাবণের "একলক্ষ পুত্তি আর সোয়ালক্ষ নাতি" হইয়াছিল, তাহা কি আর কেহ অসম্ভব মনে করিবেন? Countess of Henneberg সম্বন্ধে গল্প আছে যে, তাঁর—বছরে যতটী দিন ততটী—অর্থাৎ ৩৬৫টী—সন্তান জন্মিয়াছিল। ইহাও কি কেবল উপকথা মাত্র? এদেশের প্রাচীন রাজারা নাকি শত সহস্র পত্নী গ্রহণ করিতেন;—কিন্তু সেই পরিমাণ সন্তান পাইতেন কি?

'আগন্তুক' আসেন কিন্তু প্রায়ই রাত্রে;—তার মধ্যেও আবার শেষ রাত্রিটাই তাদের পছন্দ হয় বেশী। দিনে আসিলেও দিনের যে অংশটা রাত্রির সন্নিকট (অর্থাৎ শেষবেলা বা সকাল বেলা) সেটায়ই আসা হয় বেশী।

তুলসী দাসের একটী দোঁহা আছে, তাতে তিনি মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন 'তুমি যখন এ পৃথিবীতে আসিয়াছিলে তখন সকলই হাসিয়াছিল, কেবল কাঁদিয়াছিলে তুমি; আজ তুমি মুক্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছ, সেজন্য তোমার হাসি; কিন্তু এ পৃথিবীতে তুমি যাহাদিগকে আত্মীয় মনে করিতে, তারা সকলই এখন কাঁদে।"

আগন্তুকের আগমনে বাড়ীর সকলই যে সমান আনন্দ লাভ করে তা ঠিক নয়। পিতা মাতার অবশ্য আনন্দ হয়ই; ভগ্নীদেরও আনন্দ হয়; কিন্তু ভাইদের বোধ হয় তত আনন্দ হয় না। আমাদের দেশে একটা বিশ্বাস আছে যে গর্ভস্থ শিশু যদি ছেলে হয়, তাহা হইলে সে ছেলে প্রসব না হওয়া পর্য্যন্ত, কোলের ছেলের পেটের অসুখ করে,—যাকে চলিত কথায় "আড়ি লাগা" বলে। কিন্তু গর্ভে মেয়ে থাকিলে অথবা কোলেরটী মেয়ে হইলে আর তা হয় না। আগন্তুককে যে ভাইয়েরা তত ভালবাসে না, ইহাই কি তাহার কারণ? পিঠেপিঠি ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া বেশী হয় বলিয়া অনেকেই বিশ্বাস করেন; বিশ্বাসটী কিন্তু খুব অলীক নহে।

শিশু কোথা হইতে আইসে, তাহা শিশুর ভাইবোনদের নিকট যেমন রহস্যময়, শিশুর নিকটও তেমনি রহস্যময়। 'আমি কোথা হইতে আসিয়াছি'—এই প্রশ্নে শিশু মাতাকে কত রকমে জ্বালাতন করে, রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' তাহার উদাহরণ। "এলেম আমি কোথা থেকে, কোন্ খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?"

ঘুমে থাকিয়া শিশু যখন কাঁদে বা হাসে, প্রাচীনারা বলেন, শিশুর তখন যমের মায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে। যমের মা বলে, "তোর বাপের ঘরে আগুন লাগিয়াছে" শিশু তখনও বাপকে চিনে না—সুতরাং সত্য মিথ্যা বুঝিতে পারে না, তাই কাঁদে। যমের মা বলে 'তোর মা মরিয়াছে।' শিশু বলে 'এই ত আমি মার বুক হইতে দুধ খাইয়া আসিলাম'—আর হাসে।

জন্ম দিন হইতে ষষ্ঠ দিনে দুপুর রাত্রে ভাগ্য বিধাতা শিশুর কপালে যে দেবনাগর অক্ষরে তাহার ভাগ্য লিখিয়া দিয়া যান, এ বিশ্বাস বাঙ্গালায় খুব প্রবল।

হিন্দুর ঘরের শিশু যেদিন প্রথম ভাত খায় সে দিন, বাঙ্গালার স্থানে স্থানে তার সামনে একটী পাত্রে করিয়া কিছু ধান, কিছু মাটী, কিছু সোণা, দুই একটী টাকা এবং একটী দোয়াত কলম রাখা হয়। শিশু তখন হাত বাড়াইয়া এ গুলির মধ্যে যেটী ধরিতে চাইবে, জীবনে সে তারই অধিকারী হইবে, এরূপ বিশ্বাস আছে।

পুত্র আসিলে পরিবারে যতটুকু আনন্দ হয়, কন্যা আসিলে ততটুকু হয় না। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা জানিলে নিশ্চিন্ত হইবেন কি না জানি না, কিন্তু তথাপি দেখা যায় পৃথিবীতে মেয়ে অপেক্ষা ছেলেই আসে বেশী। মেয়েদের আয়ুর পরিমাণ কিন্তু ছেলেদের চেয়ে বেশী। ছেলেদের আয়ু যেখানে গড়পড়তায় ৪৪ বৎসর, মেয়েদের সেখানে ৪৭½ বৎসর। বর্ত্তমান সময়ে বিলাতে প্রত্যেক এক হাজার পুরুষে, এক হাজার আটষট্টি জন স্ত্রীলোক আছে। সুতরাং সমুদায় জন সংখ্যায় পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের সংখ্যা দশ লক্ষেরও অধিক।

আগন্তুকদের মধ্যে হাজার করা দশ জন আন্দাজ আগমনের দিনই বিদায় গ্রহণ করে। জায়গায় জায়গায় বোধ হয় তারচেয়েও বেশী। ডাঃ পোরিত বলিতেছেন,

বিলাতে হাজার করা এক শতের ও বেশী শিশু এক বৎসর অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই মারা যায়।

শিশু আসিলে পিতা মাতার যত প্রকার সমস্যা উপস্থিত হয়, নাম নির্ব্বাচন তার মধ্যে একটি। নামটি 'চন্দ্রে' হইবে না, 'মোহনে' হইবে, 'নাথে' হইবে, না, 'কিশোরে' হইবে, 'কুমারে' হইবে না "প্রসন্নে" হইবে—ইহা ভাবিয়া কত পিতা মাতা না ব্যতিব্যস্ত হন। নামের ভিতরেও নাকি প্রতিভার বীজ নিহিত থাকে। এ বিষয়—যাহারা ঈশ্বরচন্দ্র বা বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি নাম রাখিয়া দেখিয়াছেন, তাহারাই বিশেষজ্ঞ।

শিশু—জাতির আশা স্থল। শিশু দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের কল্যাণ করুক, ইহাই আমাদের কামনা।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

অদৃষ্টের উপহাস।

গা হইতে তখনও ভাল করিয়া কলেজের হুজুগে গন্ধ দুর হয় নাই। বার লাইব্রেরীর খাতায় নাম লেখাইয়া সবে দেশ পূজ্য হওয়ার যোগাড় করিয়াছি মাত্র—এমন সময় আমার বাসার খুব নিকটে একটী নূতন পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত হওয়ায়, সর্ব্বসাধারণের সুবিধা কুবিধা যেরূপই হইয়া থাকুক, আমার নিজের মস্ত একটা কাজ জুটিয়া গেল। তখন পর্য্যন্ত আমার সময়ের উপর মক্কেলের কোনও প্রকার দৌরাত্ম্য ছিলনা। সুতরাং প্রত্যহ রীতিমত লাইব্রেরীতে দুইবার করিয়া হাজিরা দিতে লাগিলাম। লাইব্রেরীর ছোট্ট দালান খানি প্রতিদিন সকালে-বিকালে, অজাত-শ্মশ্রু চসমিত চক্ষু তরুণ ভক্ত মণ্ডলীর তর্কোচ্ছ্বাসে ও হাস্যধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিতে লাগিল। শিশুকাল হইতেই মিঃ লাহিড়ীর ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে রস-মাধুর্য্য। সম্প্রতি মাস কয়েক ফিলেডেলফিয়াতে চিরুণী নির্ম্মাণ শিক্ষা ব্যপদেশে বাস করিয়া আসাতে, তাঁর রসাত্মক বিলাতী বোল-চাল দিবার বিদ্যেটা অসাধারণ পরিপক্কতা লাভ করিয়াছিল। তিনি যখন আমাদের লাইব্রেরী গৃহে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভক্ত শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে গুরু-গৌতমের আসনটী অধিকার করিয়া আসর জমকাইয়া তুলিলেন, তখন সত্য সত্যই আমাদের আড্ডাটী বেশ জমিয়া উঠিল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন শিক্ষিত বাঙ্গালীর বাংলা গ্রন্থে আশক্তি থাকাটা একটা ভয়ানক স্ত্রৈণ কাপুরুষোচিত লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত। লাইব্রেরী ঘরে মাত্র দুইটী কাচের আলমারীতে পুস্তক রাখা হইয়াছিল। তাদের নীচের তাকগুলি খালিই পড়িয়াছিল। কারণ যে সমুদয় হাল্কা বই অন্তঃপুরে রপ্তানি হইত, তাহারা পুনরায় লাইব্রেরীতে বড় একটা ফিরিয়া আসিত না। অন্ততঃ অক্ষত শরীরেত নয়ই। সুতরাং আমাদের আড্ডাটী যে অনুপাতে জমকিয়া উঠিল, ক্ষয়শীল ক্ষুদ্র পুস্তকাগারটীর যদি সেই অনুপাতে কলেবর বৃদ্ধি না হইয়া থাকে, সে জন্য কারো আপসোস করিবার কোনও কারণ নাই।

পুস্তকাগারটীর নাম রাখিয়াছিলাম "কোহিনুর" পাঠাগার! যে দেশে বেশীর ভাগ কাণা ছেলের নামই পদ্মলোচন, সে দেশে আমাদের পুস্তক হীন সারস্বত ভবনের সহিত কোহিনুর স্বপ্ন জড়িত করিয়া দেওয়াতে যে অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত অতিশয়োক্তির দোষ ঘটিয়াছিল এরূপ মনে করিবার কোনও সঙ্গত কারণ দেখা যায় না।

যা হোক, পাকা মেরুদণ্ডশালী পৃষ্ঠপোষক জোগাড় করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া আমাদের সর্ব্বসাধারণের পাঠাগারে সৎগ্রন্থের যথেষ্ট অভাব থাকিলেও পান চুরুট সোডালেমোনেড এমন কি চা কাফির ও ভাল রকম বরাদ্দ ছিল। মাঝে মাঝে আমাদের গুরু-গৌতম লাইব্রেরীতে "অ্যাট্ হোম" হইতেন, সেই উপলক্ষে গান বাজনারও মজলিস বসিত। গুরু গৌতম বৃহৎ বেতের ইজি চেয়ারে আপনার অরক্ষণীয় বপুখানা কোনও রূপে সামলাইয়া দশনপংক্তির মধ্যে বেতের লাঠির মত মোটা একখণ্ড চুরুট স্থাপিত করিয়া ঘুমন্তভাবে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন—"ওহে, তোমাদের এটা রিডিং রুম না প্যারির কাফে (Cafe)? আমরা চারিদিক হইতে দ্রংষ্ট্রা ময়ুখ বিকীর্ণ করিয়া তাঁর সরস রসিকতার নিছক আনন্দটুকু উপভোগ করিতাম; ইহার মধ্যে যে মস্ত একটা গাল

প্রচ্ছন্ন ছিল, সেদিকে আদৌ চক্ষু পড়িত না। এই ভাবে আমাদের সাহিত্য চর্চ্চা পূরাদমে চলিতে লাগিল।

এমন সময় একটী বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসিয়া আমাদের বালখিল্য মুনির দলে ভর্ত্তি হইলেন।

লোকটীর বেশ মোটা সোটা ভারি ভার্ক্কম রকমের দোহারা চেহারা। দাঁড়ি গোঁপ চাঁচা। অত্যন্ত সাদা সিধে রকম পোষাক পরিচ্ছদ—দেখিয়াই বোঝা যায় বেচারী মা কমলার অনুগ্রহ বঞ্চিত; ধরণ ধারণটা কতকটা সেকেলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গোছের, অথচ পাণ্ডিত্যটা যে খুব বেশী প্রগাঢ়—এরূপ আশঙ্কা করিবার কোনও সঙ্গত কারণ ছিলনা, যেহেতু আমাদের লাইব্রেরীর কড়িবাঁধা রূপার হুঁকাটীর উপর তাঁর যে পরিমাণ আশক্তি ছিল, পুস্তক পত্রিকাগুলির উপর তাঁর শিকিমাত্রা অনুরাগও দেখা যাইত না। এই সদাশয়, অমায়িক প্রকৃতির বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটীকে আমাদের লাইব্রেরীর উশৃঙ্খল সভ্য মণ্ডলীর হাতে পড়িয়া সময় সময় বিলক্ষণ লাঞ্ছনাও ভোগ করিতে হইত, কিন্তু তাহাতে তাঁর গম্ভীর প্রকৃতি কিছুমাত্র বিচলিত হইত না। শিশুর মত সরল মুখ খানি! হাসিতে গেলে দুইগালে টোল খাইত এবং তাহাতে করিয়াই যেন বাঁ গালের তিলটী তাঁর আরো বেশী মানাইত!

(২)

সে দিন সন্ধ্যার পর লাইব্রেরী গৃহে আমরা সকলে মিলিয়া তুর্ক-বুলগেরিয়া যুদ্ধ উপলক্ষে সমগ্র ইউরোপ খণ্ডের রাষ্ট্রনীতির তীব্র সমালোচনা করিতেছিলাম বলিয়া রাত একটু বেশী হইয়া পড়িয়াছিল। শরতের প্রফুল্ল জোৎস্নায় পাড়াটী জননীর স্নেহ দৃষ্টির নিয়ে আনন্দিত শিশুটীর মত আরামে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কেবল আমাদের লাইব্রেরী ঘর হইতে তর্কের জ্বালাময় অগ্ন্যোদগম হইতেছিল এবং তাহাতে চারিদিকের সুপ্তি-মগ্ন নীরবতা যেন স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছিল। আকাশের দর্পণ স্বচ্ছ নীলিমার উপর সারসীর ঝারা পালকের মত লঘু শুভ্র তরঙ্গায়িত একখানি মেঘ খণ্ড, তাঁর উপর বাঁকা চাঁদ বিচিত্র লীলাভরে হেলিয়া পড়িয়াছেন। জোৎস্নার লাবণ্য ধারা পান করিয়া আকাশের তারকারাজি নীহারিকা পুঞ্জ সকলই নিতান্ত পাণ্ডুর। নিকটস্থিত কৃষ্ণচূড়া গাছটীর পত্রবিন্যাসের ভিতর দিয়া চাঁদের সুধা স্বর্ণ জালের মত ঝমমল করিয়া পৃথিবীর বুকের উপর লুটাইয়া পড়িতেছিল!

বুড়া ভদ্রলোকটীর কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রনীতির আলোচনায় মন ছিলনা। তিনি আকাশের অনন্ত নীলিমার মাঝে আপনার মুগ্ধ নয়ন নিমগ্ন করিয়া কোন্ রহস্যময় জগতের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন কে জানে! তাঁর ভাব দেখিয়া রসিক রগড় করিয়া বলিয়া উঠিল:—

"আরে চক্রবর্ত্তী খুড়ো তো একেবারে সমাধিস্থ মনে হচ্চে!" আমাদের মজলিশে বুড়া ভদ্রলোকটী চক্রবর্ত্তী খুড়ো নামে পরিচিত! শরৎ রসিক হইলেও একটু চিকণ কাটিতে ভালবাসে! তাই সে একটু ব্যঙ্গস্থলে বলিল:—

"দেখচো না, এর নাম সবিকল্প সমাধি—ইংরাজীতে একে moon struck বলে।

নগেন ছোড়াটা অতি অল্প বয়সে মোক্তারি আরম্ভ করিয়া ইঁচড়ে পাকিয়া গিয়াছিল। ইয়ার্কিতে সে ভারি মজবুত, বাপ দাদা মানে না। সে চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে আলগোছে একটা নাড়া দিয়া বলিল:—

"শরতের বাঁকা চাঁদ দেখে কার চাঁদ বদন মনে পড়েছে খুড়ো মহাশয়?"

বৃদ্ধ চমকিয়া উঠিলেন; যেন চন্দ্র লোক হইতে ধপ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছেন তারপর গন্ধহীন কাঠ গোলাপের মত একটু হাসির ভাণ করিয়া বলিলেন—ঠিক ধরেছ বাপু! ঐ চাঁদ দেখে, অমনি ধারা আরেক খানা চাঁদপানা কচিমুখ ঘুরে ফিরে মনে পড়ছিল—

চারিদিক হইতে তার স্বরে প্রশ্ন উঠিল—"কার চাঁদ পানা মুখ?" চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন:—"আমার মেয়ের ঘরের নাতনী—কমলার!"

নগেন হাসিয়া বলিল:—"আমি ভাবছিলাম, বুঝি দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণীর! তবু যাহউক সম্পর্কটা অন্ততঃ মধুর বটে! আপনার মেয়ের শ্বশুর বাড়ী কোথা?"

বুড়ো একটা আবেগ ময় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন:— "আমার মেয়ে—নীলাচলের মহারাণী! কমলা—রাজ কন্যা।"

নগেন হিহি করিয়া হাসিয়া উঠিল। তার হাসির পরদায় পরদায় অবিশ্বাস! আমার কাছেও কথাটা নিতান্ত অলীক বলিয়াই বোধ হইল। ভিখারীর কন্যা রাজরাণী! ভাবিলাম, বৃদ্ধ বোধ হয় আফিমের নেশা করিয়া থাকেন এবং আজ মৌতাতের মাত্রা কিছু বেশী চড়াইয়াছেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদের মনের ভাবটা লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে পকেট হইতে কাপড় বাঁধা একটী ছোট পুলিন্দা বাহির করিলেন। তারপর পুলিন্দার কাপড়ের আবরণ খুলিয়া ভিতর হইতে কয়েক ভাঁজ কাগজের মোড়ক খসাইয়া ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে ফরাসের উপর একখানা পুরাতন ফটো রাখিয়া দিয়া বলিলেন:—

"গাঁজাখুরি কথা নয় মশায়, এই দেখুন না, বর কনের ছবি—ডানদিকে নীলাচল, বাঁদিকে আমার মেয়ে রাজরাণীর বেশে।"

আমি কৌতুহল সহকারে তাড়াতাড়ি ছবি খানা তুলিয়া লইলাম! কেবিনেট সাইজের ফটোখানা! বয়োধিক্য হেতু আসল রং জ্বলিয়া গিয়া ছবিতে শুকনা পাতার জরদা রং ধরিয়াছে, ছবিটীতে বর-বধুর বিবাহ বেশ! বিবাহের রাত্রিতে এই বিচিত্র ভ্রান্তি পূর্ণ জগতটা আমাদের চোখের উপর যে নন্দন কাননের ছায়া-স্বপ্ন ফুটাইয়া তুলে ছবির বর বধূর মুখে চোখে সেই মৃগ তৃষ্ণিকার ছলনা ময় মধুর আশ্বাস! ছবিখানা আমাদের কুতুহলী সভ্য মণ্ডলীর হাতে হাতে ফিরিতে লাগিল। নগেন বাবু ছাড়িবার পাত্র নয়! সে বলিল:—ইনিই যে নীলাচলের মহারাজ, তার সেনাক্ত যোগ্য প্রমাণ কোথায় খুড়ো মহাশয়?

শর্ব্বরী তখন ছবিটী দেখিতে ছিল। সে মুখ খানা একটু গম্ভীর করিয়া বেশ একটু মুরুব্বিয়ানা ভাবে বলিল:—"এ ছবি নীলাচলের রাজারই বটে।"

সে নীলাচলের মহারাজাকে চিনিত।

বৃদ্ধের মুখ খানি সহসা প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সহসা যেন তাঁর বহুদিনের রুদ্ধ স্নেহ সাগর আজ একেবারে উথলিয়া উঠিল। তিনি আজ আমাদিগকে অনেক কথা বলিয়া ফেলিলেন। তাঁর মেয়ে মুরলা রূপে গুণে রাজরাণী হওয়ারই যোগ্যা বটে! রাজ জামাতা তাকে ত গরীব বলিয়া কখনো অশ্রদ্ধা করেন না! আর কমলা! যেতো একখানা জীবন্ত ছবি, যেমন দুধে আলতায় রং; তেমনি ডাগর ডাগর চক্ষু! যেমন মমতা মাখা চাহনি, তেমনি ঘনকৃষ্ণ নয়ন পল্লব। তেমন লতায় ঢাকা তোরণের মত বাঁকানো জোড়া ভুরু আর কোথায় আছে * * * *

নাতিনী কমলার রূপ বর্ণনা করিতে করিতে বুড়ার চোখের কোণে মুক্তার কণির মত দুটী অশ্রুর বিন্দু তার শীর্ণ করতলের উপর আসিয়া ঝড়িয়া পড়িল! বৃদ্ধের ভাবোচ্ছ্বাসের ভিতরে কেমন যেন একটা আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি ছিল। আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলাম—আমার চোখের সম্মুখে—নীলাচল! ঐ যেন নীলাচলের মর্ম্মর প্রাসাদ স্বপ্নের কুহেলী জাল ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে; সেই মর্ম্মর প্রাসাদ যুক্ত প্রাচীর ঘেরা অন্তঃপুরে রাজা রাণীর সুখ দুঃখের বিচিত্র সংসার! আর দেখিতে পাইলাম—সে রাজ প্রাসাদকে উষার নবারুণে উদ্ভাসিত করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে আর একটী অপরিস্ফুট রূপ লাবণ্য ভরা চির কল্যাণময়ী বালিকামূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি রাজকন্যা কমলার।

শরত চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে বলিল "এমন জায়গা থাকতে আপনি ভবঘুরের মত যেখানে সেখানে পড়ে থাকেন কেন! জীবনের কটা দিন নাতিনীর কাছেই কাটিয়ে দিন না।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় হুঁকাটা দেওয়ালের উপর রাখিয়া দিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন:—"ও! তা হ'লে তো ওরা হাতে হাতে স্বর্গ পায়! কিন্তু কথাটা জানেন কি?—এক জন্ম ধ'রে দৈন্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে বাস কচ্চি;—সে কখনো আমার সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করলে না, আর আমি কিনা বাকী কটা দিনের জন্য তাকে ত্যাগ করে যাবো!"

আমি কিছু উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রত্যুত্তর করিলাম:—"না কখনো না। দৈন্যই দয়াময়ের সব চাইতে বড় দান, তাকে অবহেলা করলে ঠকতে হয়!"

এবার বৃদ্ধ আমার চোখের উপর তাঁর স্নেহের কোমল ব্যথাভরা নীল দৃষ্টিখানি নিবদ্ধ করিয়া আবেগ কম্পিত ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিলেন:—

"কিন্তু কমলার নামে প্রাণ যে কেমন করে ওঠে তা আর কি বলবো আপনাকে! সে যেন আমার প্রাণের শিকড় ধরে টানছে; মনে হয়, পাখী হয়ে তার হাতের উপর গিয়ে উড়ে পড়ি!"

বৃদ্ধের আবেগময়ী বাণী বাতাসে একটা ভাবের ঝঙ্কার তুলিয়া দিয়া মিলাইয়া গেল। আমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। এমন সময় "বিদ্যুৎবার্ত্তা" নামক সাপ্তাহিক কাগজ খানা পড়িতে পড়িতে শর্ব্বরী বলিয়া উঠিল:—

"ভারি সুখবর চক্রবর্ত্তী খুড়ো! নীলাচলের মহারাজ সপরিবারে এখানে আসবেন—আসচে শনিবার।"

এ শুভ সংবাদে কিন্তু চক্রবর্ত্তীর মুখখানা সহসা ভয়ঙ্কর বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি কোন রকমে নাকের উপর ভাঙ্গা চশমাটী স্থাপন করিতে করিতে শর্ব্বরীর দিকে আপনার কম্পিত শীর্ণ হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন:—"মহাশয় কাগজখানা দিন দেখি আমায় একবার।"

শর্ব্বরী খবরের কাগজ খানা বৃদ্ধের হাতে দিল। তিনি পড়িলেন:—"আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি, নূতন টেনিস ক্লাব খোলা উপলক্ষে নীলাচলের মহারাজ আগামী শনিবার (২১শে ভাদ্র) অত্র সহরে শুভাগমন করিবেন। মহারাজ "রাজনিবাস" ভবনে কিছুদিন সপরিবারে বাস করিয়া দার্জ্জিলিং যাইবেন। তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিবার জন্য সহরে বিপুল আয়োজন চলিতেছে। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, এই ক্লাব প্রতিষ্ঠার জন্য মহারাজ এককালীন একহাজার টাকা চাঁদা দিয়াছেন।"

বৃদ্ধ খবরটা অনেকবার পড়িলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বৃদ্ধ বলিলেন:—"ও:! আমাকে বুঝি এরা এবার গোপনে জালে আটকাবার ফন্দী করেছে! কিন্তু আমি যে শিকল কাটা টিয়ে"।

কথাটা বলিয়া আবার একটু হাসিলেন। কিন্তু মুখ খানা তখনো অচিরোদ্গত তৃণরাশির ন্যায় পাণ্ডুর

"হায়রে সে হাসি নয়, হাসির সে অভিনয়,
সিক্ত করে কবির নয়ন!"

আমি একটা কি কথা বলিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আজ তবে আমি?"

নগেন বলিল:—সেকি চক্রবর্ত্তী খুড়ো, আজ এত সকালে যে?'

বৃদ্ধ গুজ গুজ করিয়া হিজি হিজি কি একটা বলিতে বলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

(৩)

সেই যাওয়াই শেষ যাওয়া—আর আমরা বৃদ্ধের সাক্ষাৎ পাই নাই। আমরা সকলে আবার লাইব্রেরী ঘরে রীতিমত সন্ধ্যা সমিতি জুড়িয়া দিয়াছি কিন্তু চক্রবর্ত্তী খুড়োর অভাবটা আমরা সকলেই ভিতরে ভিতরে বেশ অনুভব করিতেছিলাম, তাই যেন আমোদটা ভাল করিয়া জমিতেছিল না আমি বলিলাম, কিহে নগেন, চক্রবর্ত্তী খুড়োর যে আর কোনও খবর পাওয়া যাচ্চেনা, ব্যাপার খানা কি?"

নগেন শুনিয়া বলিল, খুড়ো নিশ্চয় রাজবাড়ীর সীতা-ভোগ সরপূলির মাঝে একবারে আত্ম বিসর্জ্জন করেচে।"

আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম:—"উহুঁ, খুড়ো সে ধাতের লোকই নয়।"

শর্ব্বরী বলিল:—"রাজ জামাতা এবার নিশ্চয় তবঘুরে শ্বশুরটীকে আটক দিয়েচেন—বোধ করি এবার ঠাকুরের নীলাচল পর্য্যন্ত দৌড়াতে হচ্চে।"

কথাটা যেন অনেকটা সম্ভবপর মনে হইল, আমি মনে মনে খুব আরাম বোধ করিলাম। ভাবিলাম কন্যা বুঝি এতদিন পরে তাঁর উপায়হীন অভিমানী বৃদ্ধ পিতাকে মাতৃহীন শিশুটীর মত আপনার স্নেহের অঙ্কে ডাকিয়া লইয়াছেন! রাজকুমারী কমলার মুক্ত প্রীতিরসে বৃদ্ধের হৃদয়ের শুষ্ক শাখাটী এতদিনে বুঝি আবার ফুলে পাতায় মুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে।

আমি প্রফুল্ল হইয়া বলিলাম:—"চলনা আমরা সকলে একদিন রাজবাড়ীতে গিয়ে বুড়োকে একটা অভিনন্দন পত্র দিয়ে আসি।"

প্রস্তাব করা মাত্র অমনি "রিজলিউসন পাশ" হইয়া গেল। অনেক সখের সেনা জুটিয়া গেল,

সকলেই ভলান্টিয়ার! কিন্তু কার্য্য কালে দেখা গেল, ওটা একটা বৈদান্তিক মায়া মাত্র। কারণ বৃদ্ধের খোঁজে আমাকে একাকীই "রাজদ্বারে" উপস্থিত হইতে হইল। রাজদ্বার বা তত্তুল্য স্থানে বন্ধুত্ব সম্ভাবনা যে, এই প্রকারেই হইয়া থাকে, শাস্ত্রেও ঐরূপ প্রবচন আছে।

যাই হউক, যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্য রাজবাড়ীর খানসামাকে অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দান করিয়া তার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলাম। তারপর বন্ধুত্ব কিছু গাঢ় হইলে পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম :—

"রাজাবাহাদুরের শ্বশুরটীর সন্ধান আমাকে বলে দিতে পার?" সে ত কিছুতেই সে কথা আমাকে বলিবে না। সে বলিল :—

"মশায়, ওসব বড় লোকের ঘরের কথা, আপনি শুনে কি করবেন!" অঙ্গপ্রায়শ্চিত্তটা নিতান্ত ভস্মে ঘি ঢালা হইল দেখিয়া আমি আরো এক শিশি কবুল লইলাম। তখন খানসামা মহাশয়ের মুখ খুলিল। তিনি সংক্ষেপে বলিলেন :—

"দেখুন আমাদের রাজাবাহাদুরের শ্বশুর টশুরের খবরাখবর আমরা কিছু জানি না। তবে কিনা আজ কদিন হলো একটী বুড়ো ভদ্রলোক রাণী মা ও রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা কত্তে এসে এখানে তারকেশ্বরের মতো হত্যা দিয়েছিল। রাজাবাহাদুরত চটিয়া আগুন। নায়েবের উপর হুকুম হলো. বুড়োকে এখনি বাড়ী থেকে বের করে দাও। বুড়োটা'ও নাছরবান্দা, দেখা না করে কিছুতেই যাবে না। অবশেষে রাজাবাহাদুরের দারজিলিং রওনা হওয়ার আগে বুড়ো অনেক কষ্টে রাণীমার সঙ্গে একবার দেখা করবার হুকুম পায়। যখন দেখা হয়, তখন দরজার পাশে দাঁড়ায়ে আমি সব ব্যাপারখানা দেখেছিলাম। রাণী মুখ হেট করে দাঁড়ায়ে ছিলেন। রাজাবাহাদুরত একেবারে অগ্নি শর্ম্মা। আর রাজ কুমারী কমলা, আমাদের মা লক্ষ্মী চোখে আচল দিয়ে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে খালি কাঁদছিলেন। রাজাবাহাদুর বুড়োকে খুব রাগ হয়ে বল্লেন—

"তুমি আর জায়গা পেলে না, শেষকালে সহরে এসে আমার মুখ হাসাতে আরম্ভ করলে। দশলোকে শুনে কি বলবে যে নীলাচলের রাজার শ্বশুর একটা ভবঘুরে যাত্রার দলের অধিকারী!"

রাণী মা মুখ চোখ রাঙ্গা করে বল্লেন :—"বাবা, এই জন্যই কি তোমায় আমি চুপি চুপি মাসে মাসে পাঁচ টাকা করে সাহয্য করে আসছি—"

কমলা অশ্রুসিক্ত মুখে রাণীকে বলিল :—

"তাতে আর ওঁর দোষ কি হয়েচে মা, বড়লোকের কি গরীব দুঃখী আপনার মানুষ থাকতে নেই?—বাবা! তুমি যদি একদিন গরীব হয়ে যাও, তবে কি তোমায় আমি বাবা বলে ডাকবো না?"

রাজা বাহাদুর ধমক দিয়ে বলিলেন :—চুপ কর্ কমলা, তোর আর ভাগবত ব্যাখ্যা কত্তে হবে না।

বুড়ো আর কি করে!—রাজকুমারীর মাথা ছুঁয়ে আশীর্ব্বাদ করে ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে গেল—আর তার কোন খবর রাখিনা আমরা।"

পরদিন সারা সহর ভরিয়া বৃদ্ধের অনুসন্ধান করিলাম। কোথাও তার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। মনটা ভারি খারাপ হইয়া গেল।

কয়েক দিন পরে বিদ্যুৎবার্ত্তার স্থানীয় স্তম্ভে পড়িলাম একটা স্থানে লেখা আছে :—"আজ কয়েক দিন হইল সহরের প্রান্তস্থিত খালে একটী বৃদ্ধের মৃতদেহ ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। বাম গালে একটী কৃষ্ণ তিল ভিন্ন সেনাক্ত যোগ্য আর কোনও চিহ্ন নাই। স্থানীয় পুলিশ তদন্তে ব্যাপৃত আছেন!"

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

অসময়ে।

লুটিয়া মধুর ভাণ্ড
অলি যবে চলে যায়,
ফুল বালা কহে কাঁদি—
"আয় অলি! বুকে আয়!"
অলি কহে—'গুণ্ গুণ্'
সে গুণে কহিছে তার—
"এসেছি এসেছি প্রিয়ে!
কি গুণে বাঁধিবে আর?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

মার্কিন সাধারণ তন্ত্রে প্রথম বাঙ্গালী ঔপনিবেশিক।

প্রাচীন আর্য্যগণ পৃথিবীর নানা দেশে আধিপত্য বিস্তার ও উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন, নানা দিগ্‌দেশে তাহার বহু নিদর্শন আজও দেখিতে পাওয়া যায়। সুবিখ্যাত কোলম্যান সাহেব বলেন যে, সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মণ পরিব্রাজক বৈজ্ঞানিক ব্যেরণ হাম্‌বোল্টের বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি আমেরিকায় হিন্দুবসতির সুস্পষ্ট পরিচায়ক বহু নিদর্শন দেখিতে পাইয়াছিলেন। পেরু প্রদেশের সামাজিক রীতিসমূহের সহিত ভারতবর্ষের রীতির বহু সৌসাদৃশ্য দেখিয়া ঐতিহাসিক পকক্‌ সাহেব তদ্বিরচিত India in Greece গ্রন্থে (১৭৪পৃঃ) লিখিয়াছেন যে, পেরু প্রদেশের ও ভারতবর্ষের লোক, উভয়ই যে এক জাতি সম্ভূত, তাহার সন্দেহ নাই। প্রাচীন আমেরিকার স্থাপত্য, হিন্দু স্থাপত্যের আদর্শে গঠিত বলিয়া হার্ডি সাহেব এবং স্কুইর সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রাচীন আমেরিকার পৌরাণিক প্রসঙ্গে হিন্দুদের ন্যায় ধরিত্রী মাতার পূজা বা বাস্তু পূজার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীবৃন্দাবন, গোকুল প্রভৃতি হিন্দুতীর্থে শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধ দেবাদির যে প্রকারে চরণ পূজা করা হয়, মেক্সিকো দেশেও সেইরূপ জাতীয় বীরশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ নর-দেবতাদের পদচিহ্নের পূজা করিবার প্রথা আজও প্রচলিত আছে। আমেরিকানেরাও ভারতবর্ষীয় লোকের ন্যায় চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে নানা অনুরূপ অনুষ্ঠানাচরণ করিয়া থাকে। মেক্সিকোর লোকে হিন্দু দেবতা কাহিনী হিন্দুদের ন্যায় প্রাচীন আমেরিকানেরাও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই পৃথিবী যে কূর্ম্ম পৃষ্ঠে অবস্থিত রহিয়াছে, ভারতবর্ষীয় পুরাণের ন্যায় প্রাচীন আমেরিকানেরাও এ মতে বিশ্বাস করতেন। মনসাদেবীর পূজাও ভারতবর্ষের ন্যায় আমেরিকাতে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন আমেরিকান নরনারীর পরিচ্ছদও বহুলাংশে হিন্দু নরনারীর অনুরূপ ছিল। প্রাচীন পেরু-ভিয়ানেরা আপনাদিগকে সূর্য্য বংশোদ্ভূত বলিয়া বিশ্বাস করিত ও গৌরব বোধ করিত। শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব সময় প্রতি বৎসর এমেরিকার নানা স্থানে "রামসীতা" উৎসব আজও অনুষ্ঠিত হয়। প্রাচীন গ্রীস, রোম, ব্যাবিলন, মিশর প্রভৃতি নানা জনপদে গমন করিয়া ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরাই যে উপনিবেশ স্থাপন করতঃ সর্ব্বপ্রথম জ্ঞানা-লোক ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন, উচ্চশ্রেণীর বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাহা নানাপ্রমাণ প্রয়োগ করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার।

আমাদের প্রাচীন পুরাণেতিহাসেও আর্য্যগণের বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন ও সভ্যতা বিস্তার সম্পর্কে অনেক বিবরণ লিখিত আছে। মহাভারতে আছে, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন পাতালপুরীর রাজকন্যা উলূপীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। শান্তিপর্ব্বে মোক্ষ-ধর্ম্ম বিষয়ে ব্যাস—শুক সংবাদ পাঠে জানা যায়, মহাত্মা ব্যাসদেব আপন পুত্র শুকদেব ও শিষ্যের সহিত পাতালে গিয়া কতক দিন বাস করিয়াছিলেন। কপিল মুনিও পাতালপুরে বাস করিতেন। সগর রাজার পুত্রেরা এবং পৌত্র অংশুমান, সকলেই পাতালখণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি প্রাচ্য পণ্ডিত শিরোমণি

এবং এমেরিগো ভেসপুসির আমেরিকা এক এবং অভিন্ন। মোট কথা, প্রাচীন আর্য্যগণ জলপথেও বর্ত্তমান ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি নানা দেশে গমনাগমন করিতেন ও উপনিবেশ বিস্তার করিয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। ভারতের এখন আর সে দিন নাই; এসব কাহিনী কিম্বদন্তী এখন আমাদের অনেকের নিকট অলীক স্বপ্নবৎ বোধ হওয়া বিচিত্র নহে,—অনেকে এ সব কথার সত্যতায় হয়ত বিশ্বাসই করিতে পারিবেন না, বরং উপহাস করিবেন। *

আমেরিকা এখন ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের নিজস্ব সম্পত্তি। সে দেশের কোথাও প্রাচ্য এশিয়ার কোন অধিবাসীর এখন "নাগরিকের অধিকার" লাভ করা সুলভ বা সহজ সাধ্য নহে। আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের কালিফোর্ণিয়া প্রদেশের রাষ্ট্রীয় সভা, সে দেশ হইতে জাপানী প্রবাসীদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য নানা কঠোর বিধি প্রণয়ণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এ বিষয় লইয়া পাছে নব্য জাপানের জাতীয় অভিমানে আঘাত লাগে, পাছে মার্কিনের সহিত যুদ্ধ বাধে, এই আশঙ্কায় মার্কিণের অনেক মনস্বী ব্যক্তি, এমন কি মার্কিণ সাধারণতন্ত্রের সভাপতি মহাশয় পর্য্যন্ত ব্যস্ত ও চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। এ বিষয় নিয়া জাপানের সহিত তাঁহাদের কোন যুদ্ধ বাধিবে কি না, ভবিতব্যতাই বলিতে পারেন। পাশ্চাত্য জগতের কোন দেশ প্রজাতন্ত্র শাসনাধীন হইলেও পশ্চিম সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্রই পশ্চিম। সুতরাং জাপানীরা অতি সহজে আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের তুল্য নাগরিক অধিকার লাভ করিতে পারিবে, বিশ্বাস হইতেছে না। এদিকে আবার জাপান বিগত চীন ও রুশের সহিত সংগ্রামে যেরূপ অসাধারণ বীরত্ব ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে পারিয়াছে, তাহাতে পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ এখন সকলেই জাপানকে "সভ্য" জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং জাপানের অপমান ও স্বার্থহানি করা এখন আর নিতান্ত সহজ নয়।

যাহা হউক, সে সকল বড় বড় কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই। আজ আমরা আমাদের পাঠকবর্গকে একটা আহ্লাদের সমাচার শুনাইতে চাই।

আমাদের এই বঙ্গদেশের,—আমাদের স্বজেলা এই ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার নামক এক ভদ্র সন্তান সম্প্রতি এমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটসে অধিবাসী নাগরিকের স্বত্বাধিকার (Citizenship of the U. S. of America) প্রাপ্ত হইয়াছেন। ষ্টাণ্ডার্ড পত্রিকায় নিউইয়র্ক নগরের সংবাদদাতা এ সম্পর্কে যে বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহার মর্ম্মোদ্ধার করিয়া আমরা এখানে প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার মহোদয় সে দেশের বিচারালয়ের সাহায্যে দীর্ঘ দুই বৎসর কালব্যাপী মোকদ্দমায় লিপ্ত থাকিয়া বহু ব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া এই অধিকার লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে একবার ওয়াশিংটন সহরের বিচারপতি ফ্রাঙ্ক রাড্‌কিন সাহেব মজুমদার মহাশয়কে অনধিকারী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। এবার পুনর্ব্বিচার করিয়া পূর্ব্বসিদ্ধান্ত পরিহার করিয়াছেন। এবারের রায়ে বিচারপতি রাড্‌কিন বলিয়াছেন, অক্ষয় বাবু অন্যান্য মুক্ত শ্বেতাঙ্গ নাগরিকের সমতুল্য লোক (A free white person)। এ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে জজ বাহাদুরকে অনেক তথ্যের আলোচনা করিতে হইয়াছে।

অক্ষয় বাবু তাঁহার আবেদন পত্রে লিখিয়াছিলেন:—"আমি হিন্দুস্থানের উত্তর ভাগ—আর্য্যাবর্ত্ত হইতে এদেশে আসিয়াছি। আমি একজন উচ্চশ্রেণীর হিন্দু,—রণব্যবসায়ী অর্থাৎ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশে আমার জন্ম। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ আপনাদিগকে আর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়া বিবেচনা করেন। এজন্য তাঁহারা তাঁহাদের স্বদেশীয় ভাষায় হিন্দুস্থানকে "আর্য্যাবর্ত্ত" বলিয়াই অভিহিত করেন। আর্য্যাবর্ত্তের অর্থ—আর্য্যদিগের আবাস ভূমি।"

বিচারপতি রাড্‌কিন সাহেব রায়ে লিখিয়াছেন:—"মুক্ত শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি কথাটা প্রথমে ইউরোপের উত্তরাংশ

*এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জানিতে উৎসুক হইলে, আজমীঢ় নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরবিলাস প্রণীত Hindu Superiority নামক সুলিখিত গ্রন্থখানা পাঠ করিবেন। (লেখক)।

হইতে সমাগত ব্যক্তিবর্গকেই বুঝাইত এবং প্রচলিত আইনে এই অভিপ্রায়েই এ কথাটা ব্যবহৃত হইয়াছিল। যে সময়ে বর্ত্তমান আইন প্রণীত হইয়াছিল, তখন উত্তর ইউরোপের অধিবাসীদের সহিতই এ দেশের রাষ্ট্রীয় সভা ও কংগ্রেসের সম্পর্ক ছিল। ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার অধিবাসীদিগকে এই অভিধান হইতে বাহিরে রাখাও বোধ হয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল। কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, প্রকৃত ককেশীয় বংশোদ্ভব কোন ব্যক্তিকেই এ দেশে নাগরিকের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কংগ্রেসের অভিপ্রায় ছিল না, আমার এইরূপ ধারণা। ভারতবর্ষের কতকগুলি লোক যে ককেশীয় বংশোদ্ভব, তাহার সন্দেহ নাই। উপস্থিত আবেদনকারীর কথার উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহার ককেশীয় বংশে জন্ম হইয়াছে, আমি এইরূপ সিদ্ধান্ত না করিয়া পারিতেছি না। "মুক্ত শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি" বলিতে ভবিষ্যতে কোন নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীভুক্ত মনুষ্য মণ্ডলীকেই বুঝাইবে কি না, এ দেশের কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় সভা এরূপ কোন স্পষ্ট বিধান প্রণয়ন করা প্রয়োজন মনে না করিলে, এবং সেরূপ কোন স্পষ্ট বিধান প্রণীত করিয়া প্রচলিত আইনের পরিবর্ত্তন না করিলে, বিচারক এইরূপ ক্ষেত্রে এইরূপ মীমাংসা না করিয়া পারিবেন না।

উপস্থিত প্রার্থীর আবেদন ও প্রমাণাদির আলোচনায় সন্তুষ্ট হইয়া আমি তাঁহার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের নাগরিকের অধিকার স্বীকার করিলাম।"

বিচারকের নিষ্পত্তি পত্রের উপসংহার ভাগের মন্তব্য ভবিষ্যতে আমাদের ভারত প্রবাসীদের পক্ষে বিশেষ সুফলপ্রসূ হইবে, মনে হইতেছে না। আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, সে দেশের তীক্ষ্ণদর্শী ও দূরদর্শী কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় সভা হয় ত অচিরে "মুক্ত শ্বেত মনুষ্যের" অভিধাকে নূতন বিধানে সংকীর্ণতর গণ্ডীতে আবদ্ধ করিবেন।

সে যাহা হউক, এখন আমরা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার মহাশয়ের অধ্যবসায়ের শতবার প্রশংসা করিয়া অতি সংক্ষেপে তাহার বংশ পরিচয়াদি উল্লেখ করতঃ এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদারের নিবাস ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল। ইঁহারা আথৈদের মজুমদার বলিয়া পরিচিত। আথৈদ টাঙ্গাইল মহকুমার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। আথৈদের মজুমদারেরা বারেন্দ্র সমাজে কুলীন। এই বংশের উদয়নারায়ণ মজুমদার মুর্শিদাবাদের নবাবের দেওয়ান ছিলেন—তাঁহার উপাধি ছিল 'রায় সাহেব'; রায় সাহেবের পৌত্র ৺পূর্ণচন্দ্র মজুমদার অল্পদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনিও মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান নবাবের দেওয়ান ছিলেন এবং মুর্শিদাবাদে থাকিয়া 'বাঙ্গালার মসনদ' নামক সচিত্র ইংরেজী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

এই গুহ মজুমদার বংশে—অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা—৺ দুর্গানাথ মজুমদার টাঙ্গাইল ওকালতি করিতেন। তিন ভ্রাতার মধ্যে অক্ষয় কুমার জ্যেষ্ঠ। অক্ষয়কুমার টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী স্কুলের ২য় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া স্কুল পরিত্যাগ করেন এবং বহু স্থান ভ্রমণ করেন।

ছোট বেলা হইতেই তাঁহার স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনের প্রবল বাসনা ছিল। পাঠ পরিত্যাগ করিয়া তিনি নিঃসম্বল পদব্রজে চট্টগ্রাম চলিয়া যান। সেখান হইতে পীড়িত হইয়া তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিতে পথে ঝড়ে ভয়ানক বিপদগ্রস্ত হন। ইহাতে তাহার কণামাত্রও ভয়ের সঞ্চার হয় না। তিনি ভারতের নানা স্থান একাকী পরিভ্রমণ করেন। অক্ষয় বাবু অবসর পাইলেই ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিতেন।

১৯০০ সনে সন্তোষের শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর (অতঃপর—রাজা) অর্থ সাহায্যে জাপান গমন করেন। তিনি জাপানে তিন চার বৎসর অবস্থিতি করিয়া আমেরিকা গমন করেন এবং তথায় অর্থ উপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হন। বর্ত্তমান সময় তিনি আমেরিকায় একটী স্বর্ণখনির আংশিক মালিক হইয়াছেন। অক্ষয়কুমারের বয়স এখন ৩৫ কি ৩৬, এখনও তিনি অবিবাহিত জীবন-যাপন করিতেছেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী

শুভ-দৃষ্টি।

আভাষ।

কৈশোর যৌবনের সঙ্গম সময় হইতেই বঙ্কিম বাবুর নায়িকা গুলির রূপ-মাধুর্য্য আমার হৃদয় দ্বারে চুপি চুপি উঁকি ঝুকি দিতে চেষ্টা করিতেছিল। ফলে—বিংশতি বর্ষ বয়সেই বাণী মন্দিরের সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া আমি সূর্য্যমুখীর ন্যায় নায়িকার অনুসন্ধানে লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিলাম।

পিতৃদেবের মৃত্যুর পর ঋণদায়ে প্রায় সর্ব্বস্ব নীলাম হইয়া যায়। অবশেষে "বাস্তুভিটা" খানা নীলামে চড়িল। অবস্থা দেখিয়া, মাতুল মহাশয় একজন ধনবানের কন্যার সহিত আমার সম্বন্ধ স্থির করিয়া পৈত্রিক ভিটাখানা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ধনবানের সহিত ধনহীনের সম্মিলনের পরিণাম চিন্তার অবসর আমাদিগের একেবারেই ছিল না। অবস্থা চিন্তা করিয়া মাতাঠাকুরাণী তাঁহার ভ্রাতার কথায় সায় দিলেন; অগত্যা আমিও সম্মতি দান করিতে বাধ্য হইলাম। আমার প্রমত্ত হৃদয়ের অনন্ত কল্পনা একেবারে চুরমার হইয়া গেল। ঋণদায়ে ঠেকিয়া ভাবের রাজ্য হইতে মনটাকে ফিরাইয়া লইলাম। শুভদিনে সরলা আসিয়া আমার পৈত্রিক "খামার খানাবাড়ী" রক্ষা করিলেন। আমার জীবন নদীতে নূতন বাণের জোয়ার ভাটা খেলিতে লাগিল। স্মৃতির ও রোজ নামচার সাহায্যে সে জোয়ার ভাটার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সদাশয় পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিকার।

বৃহস্পতিবার—শুভদিন। শুভদিনে শুভকর্ম্ম হইল বটে কিন্তু দিনের দুর্য্যোগে শুভ-দৃষ্টিটা হইল না। কোন প্রকারে প্রাণে প্রাণে বাসর ঘরে আসিয়া আশ্রয় লইলাম। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

ঋণদায়ের দুর্ভাবনা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যে বুঝিবে না নিতান্ত দায়ে পড়িয়া যে ভাবের রাজ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, ঋণমুক্তির পর, ফুল শয্যায় শুইয়া, সরলার অনিন্দ্য সুন্দর মুখ খানা দেখিয়া মন পুনরায় সেই ভাবের রাজ্যে উধাও হইয়া ছুটিয়া চলিল। অনন্ত কল্পনা হৃদয়ে আবার লহর তুলিয়া খেলা করিতে লাগিল। সরলার মুখ খানা বাস্তবিকই আমার চোখে বড় সুন্দর লাগিল। আমি একটু অতিরিক্ত বেহায়া হইয়া তাহার লাজমুদ্রিত চক্ষু দুটীর পানে চাহিয়া রহিলাম। বাসর ভরা লোক, হাসি ঠাট্টার রোল, ঠেলা ধাক্কার কুরুক্ষেত্র, বৌদিদি কোম্পানীর অত্যাচার— আমার তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। আমি সূর্য্যমুখীর সহিত সরলার তুলনা করিয়া ভাব রাজ্যে একটা নূতন সৌধ নির্ম্মান করিতে ছিলাম; সুরেশকে হরদেব ঘোষালের স্থানে অভিষিক্ত করিয়া তাহার নিকট সরলার রূপ ও গুণের একটা বিস্তৃত চিঠির মুসাবিধা কল্পনা করিতেছিলাম! ভাব-রাজ্যের এমনই মহিমা!!

ক্রমে ভিড় কমিতে লাগিল। ছেলে পিলে গুলি ঘুমাইয়া পড়িল; পাড়ার বৌদিদি কোম্পানীও ভাটার স্রোতে বিরল হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

সময় বুঝিয়া আমি আমার জীবনের চির-সঙ্গিনীর সহিত প্রণয়ের প্রথম সম্ভাষণের ভাষা অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলাম। কি কথা বলিয়া প্রথম সম্ভাষণ করিব?

ঠিক করিলাম প্রথমে তাহার নামটাই জিজ্ঞাসা করিব। অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট না করিয়া আমি নব বধুকে চুপি চুপি প্রথম সম্ভাষণ করিয়া ফেলিলাম।

চাপামুখে স্মিত প্রভা ফুটিয়া উঠিল। সে হাসির স্পন্দন আমার বুকের ভিতর আসিয়া অমৃত সিঞ্চন করিয়া গেল।

নিতান্ত লজ্জিত ভাবে মুখে কাপড় টানিয়া দিয়া সরলা পাশ ফিরিতে চেষ্টা করিল। চেষ্টা ব্যর্থ হইল। প্রতিধ্বনি নিরুত্তর।

জীবনের প্রথম, প্রেম-সম্ভাষণ এইরূপ নির্দ্দয় ভাবে উপেক্ষিত হওয়া নিতান্তই সাংঘাতিক। আমি অপ্রতিভ হইলাম বটে, কিন্তু নিরাশ হইলাম না। বুঝিলাম সম্ভাষণটার মাঝে গন্তভাবের 'পান' পড়িয়া গিয়াছে বেশী। ইহার একটা এমেণ্ডমেণ্ট বা প্রতি প্রসবের নিতান্তই প্রয়োজন। * নূতন 'কিণ্ডার গার্টেন' প্রণালী

অবলম্বনে প্রশ্নটী হওয়া উচিত ছিল। তাহাই করিলাম। একটী পানের খিলি লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"পান খাবে ?"

'আপন মনে পথ চলিতেছিলাম।'

পুনরায় মুখে চোখে জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু মুখ ফুটিল না। আমি আদর করিয়া খিলিটী মুখে গুঁজিয়া দিলাম। আমার বুক দুরু্দুরু্ করিয়া স্পন্দিত হইতে লাগিল। প্রেম অবজ্ঞাত হওয়ার চেয়ে মর্ম্মান্তিক দুঃখ প্রেমিকের নিকট আর কিছুই নহে।

এবার আর তাহা হইল না। প্রথম উপহার উপেক্ষিত হইল না দেখিয়া হৃদয়ে অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলাম। সাহস বাড়িয়া গেল। বোটায় করে একটু চুণ লইয়া বলিলাম "চুণ চাই কি" ?

এবার মাথায় সায় পাইলাম। হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। মনে মনে বুঝিলাম, এইরূপ 'কিণ্ডারগার্টেন' প্রণালীই আশু ফলপ্রদ। কার্য্যতঃও তাহাই দেখা গেল। ইহার পর সরলা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্রোহ পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট আত্মসমর্পণ করিল।

শনিবার, শুভরাত্রি। আজ সরলার সহিত লঘু অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতেই অনেক কথাবার্ত্তা হইল। সরলা তাহার একখানা ফটো আমাকে উপহার প্রদান করিল। আমিও তাহার সহিত অঙ্গুরী বিনিময় করিলাম। আদান প্রদান অনেক হইল, কিন্তু 'শুভদৃষ্টি' হইল না। অনুনয় বিনয়ের ত্রুটী করিলাম না, কিন্তু কিছুতেই চারি চক্ষের সম্মিলন হইল না।

বুধবার। সরল পিত্রালয়ে গিয়াছে। বিবাহের দেনা পাওনা মিটাইয়া আমিও সংসার প্রতিপালনের উপায় অন্বেষণে বাহির হইলাম।

(২)

মাতুল মহাশয়ের চেষ্টায় আমি ২০৲ বেতনে কালেক্টরীতে একটী কেরাণী নিযুক্ত হইলাম।

বিবাহের পর কতক গুলি সুদীর্ঘ রজনী অতিক্রম করিয়া ক্রমে বড়দিনের ছুটী আসিল। প্রবাসী বাঙ্গালীর প্রাণের কাণায় কাণায় সাড়া পড়িয়া গেল। আমি ভাবের রাজ্যে নূতন নূতন কল্পনা সৃষ্টি করিয়া অভিনব সুখ সম্মিলনের প্রত্যাশায় গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলাম।

২৩শে ডিসেম্বর। পল্লিবাটের শান্ত মধুর দৃশ্য, মুক্ত মাঠের হরিৎ শ্যামল শোভা, জাগ্রত জগতের উচ্চ কোলাহল—আমার ভাবের রাজ্যে অধিকার পাইল না। আমি চারি দিকের মুক্ত সৌন্দর্য্যকে তুচ্ছ করিয়া প্রাকৃতিক জগৎকে অন্তরালে রাখিয়া, আপন মনে পথ চলিতেছিলাম।

সুখস্মৃতি, পুণ্য আশা—জীবনকে সস্নেহে রক্ষা না করিলে কঠোর সংসারের নির্দ্দয় নিষ্পেষণ সহ্য করিয়া থাকিতে এ সংসারে ক'জন সমর্থ হইত। আমি যখন অসীম বিশ্বের অনন্ত সুখকে কল্পনার জালে ছাকিয়া তাহার আস্বাদনের জল্পনা করিতে করিতে ক্লান্তি, শ্রান্তি ও ক্ষুধা তৃষ্ণাকে তুচ্ছ করিয়া পথ চলিতে ছিলাম, তখন পশ্চিম গগনে সহস্ররশ্মি স্বর্ণজাল বিস্তার করিয়া অস্তাচলে গমন করিয়াছেন, পক্ষীকুল আকুল ভাবে কুলায় ফিরিতে ছিল, দূর পল্লীর শ্যামলরেখা ক্রমে কুয়াশার আবরণে ঢাকা পড়িতেছিল

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া বিশ্ব জগৎ গ্রাস করিল। আমি পুঞ্জীকৃত সুখ কল্পনায় হৃদয়কে উচ্ছ্বসিত করিয়া আসিয়া মাতৃচরণে প্রণত হইলাম।

আমার উৎসুক দৃষ্টি গৃহের চতুর্দ্দিক হইতে নিরাশার বার্ত্তা লইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। কি ভয়ানক! কি চাই, কি যেন নাই!

মা বলিলেন, 'বউকে আনিতে লোক পাঠাইয়া ছিলাম—বেহাইন ছাড়িয়া দিলেন না। লিখিয়াছেন পৌষ মাসে যাত্রার দিন নাই।'

নিরাশ হৃদয়ে, অবসন্ন প্রাণে, ধীরে ধীরে শয্যা লইলাম। মাতাঠাকুরাণী আমার মনের দুঃখ বোধ হয় বুঝিলেন না—তিনি আমার উদরের সংস্থান জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমি রাগে, ঘৃণায়, অপমানে ও নিরাশায় লিখিতে লজ্জা বোধ হয়—অতি গোপনে উপাধান অভিষিক্ত করিয়া ফেলিলাম।

(৩)

২৫শে ডিসেম্বর। সমস্তদিন কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিলাম। বড়দিন বাস্তবিকই যেন অফুরন্ত হইয়া আমার ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে। সমস্ত দিনটা গৃহ রচনায় ব্যয় করিলাম। যে স্থানে যে জিনিসটী রাখিলে মানাইবে, তাহা সেই স্থানে রাখিলাম—পুনরায় মানাইল না দেখিয়া অন্যত্র লইলাম। এইরূপ ছেলে খেলা করিয়া বারটী মূল্যবান্ ঘণ্টা মাটী করিয়া দিলাম।

মা পুনরায় বউ আনিতে পাল্কী পাঠাইয়াছেন। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় আসিয়া পঁহুছাইবারই কথা। তা এখনও আসিল না; কুচিন্তায় মাথাটা বড় ঘুরিতেছিল, এমন সময় বাল্য সহচর সুরেশ ডাক্তারের আবির্ভাব হইল। সুরেশ "সাঁচিপন্দরে" থাকিয়া নূতন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হইয়াছে। সে খুব চৌকোশ ছেলে। আসিয়াই সে আমার জন্য একটা Prescription করিয়া ফেলিল। বলিল—"চল বেড়াইয়া আসি, তীর্থের কাকের মত বসিয়া থাকিলেই কি বৌ মিলিবে নাকি? উপযুক্ত সময়ে আসিয়া জমাট ফুর্ত্তি ছাকিয়া লওয়া যাইবে।"

সুরেশের কথায় পরিমাণ মত পইট্রি ছিল। আমার ভাব প্রবন হৃদয় তাহার Prescription এর প্রতি বড়ই আকৃষ্ট হইল। শীত বস্ত্র গায়ে জড়াইয়া সুরেশের সহিত তাহার Dispensaryতে গিয়া উদয় হইলাম।

সুরেশের আড্ডায় অনেক ভাব অভাবের কথা হইল। সুরেশ এ বিষয়ে আমা অপেক্ষা সিনিয়র এবং একটু অধিক প্রেক্‌টিক্যালও বটে। তাহার নিকট হইতে কিছু কিছু তালিম লইলাম। আশা এমনি জিনিস্ বটে!

সুরেশ রবীন্দ্রনাথের সদ্য প্রকাশিত একটী সঙ্গীত স্বরলিপিসহ আমাকে উপহার প্রদান করিল। গানটী পড়িয়াই মুগ্ধ হইয়া গেলাম। সুরেশ গাইল।

"কেন যামিনী না যেতে জাগালে না নাথ বেলা হ'ল
মরি লাজে।
সরমে জড়িত চরণে কেমনে চলিব পথেরি মাঝে।
আলোক পরশে মরমে মরিয়া, হেরগো শেফালী
পড়িছে ঝরিয়া,
কোন মতে আছে পরাণ ধরিয়া কামিনী শিথিল সাজে।
নিভিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ উষার বাতাস লাগি।
রজনীর শশী গগণের কোণে লইল শরণ মাগি।
পাখী ডেকে বলে, গেল বিভাবরী, বধূ চলে জলে
লইয়া গাগরী।
আমি এ আকুল কবরী আবরি, কেমনে যাইব কাজে।"

সুরেশের এই অমূল্য উপহার প্রাণের সহিত গাঁথিয়া লইলাম। যথার্থই অতি স্বাভাবিক এবং সাময়িক উপহার।

রাত্রি ৮ টার পর গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। তখনো কোন সংবাদ নাই। মা বলিলেন—"নিশ্চয়ই আসিবে। না আসিতে হইলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে লোক চলিয়া আসিত।" কথা যথার্থই বটে। আশা বৈতরণী নদী!

আহার করিয়া আসিয়া বসিয়া বসিয়া সঙ্গীতটীর সাময়িক ভাব চিন্তা করিতে লাগিলাম; এবং ক্ষণে ক্ষণে বাতাসের শব্দে, বৃক্ষপত্র পতনের শব্দে, শৃগাল কুকুরের পদ শব্দে—চমকিত হইয়া উঠিতে লাগিলাম। আমার অবস্থাটী ঠিক গীত গোবিন্দের—

"পততি পতত্রে বিচলিত নেত্রে শঙ্কিত ভবদুপয়ানম্
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্।"

হইয়া উঠিল। উপায় নাই। দেখিতে দেখিতে শেষ

"নিশি শেষ, বদন মলিন, মন উদাসীন" অবস্থায় সেই 'সুখহীন' শয্যারই আশ্রয় লইলাম।

২৬ শে ডিসেম্বর। অতি ভোরে, কাক ডাকিবার পূর্ব্বেই নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। শুনিলাম—"আমার শ্মশান চিকিৎসা নিষ্ফল হইয়াছে। ভগবান্ রক্ষা করুন!

(৪)

আশ্বিন মাস। পূজা আসিয়াছে। বঙ্গের ঘরে ঘরে মায়ের আহ্বান গীতি বাজিয়া উঠিয়াছে। মা যেমন আসিবেন, বাঙ্গালার ছেলেরাও মার ঘরে যাইবে। প্রবাসী বাঙ্গালীর এ মহা মিলনের পবিত্র সুযোগ অতি অল্প লোকেই পরিত্যাগ করে। যে করে, সে বড়ই দুর্ভাগ্য।

বাড়ীর চিঠি হইতে ইতঃপূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলাম, নববধূকে ফাল্গুন মাসে আনা হইয়াছিল, আবার পূজায় লইয়া গিয়াছে। পিত্রালয়ে পূজা সুতরাং ৮ মাস পর নূতন বধূর পিত্রালয় যাওয়ার পথে মা কণ্টক হইয়া দাঁড়াইতে সাহস করেন নাই, ইচ্ছাও করেন নাই। তবে কথা আছে, বিজয়ার দিন না হইলেও, একাদশীর দিন বধূকে তাঁহারা নিজ হইতেই পাঠাইয়া দিবেন।

১৭ই আশ্বিন। বাড়ী পঁহুছিলাম। প্রেমের প্রথম প্লাবন যখন আমার উপর দিয়া নিতান্ত নির্দ্দয় ভাবেই চলিয়া গেল, তখন সংসারের গতি বুঝিয়া ভাবরাজ্য হইতে অনেকটা দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, কার্য্য-স্থলে যাইয়া কতকগুলি নূতন আকর্ষণে মনকে আকৃষ্ট করাইতে চেষ্টা করিতেছিলাম। সুতরাং নববধূর 'শুভ-দৃষ্টির' সুখ কল্পনা, আর আমাকে ততটা পীড়িত করিতে পারিতেছিল না। বার দিন ছুটি, না হয় মাতৃসেবায়ই কাটাইয়া যাইব—এই চিন্তা করিয়াই গৃহে আসিয়াছি।

বিজয়া। বাড়ীতে পূজা নাই, সুতরাং বিজয়ার করুণ-ভাব আমার হৃদয়কে তেমন অবসন্ন করিতে পারিল না। কিন্তু নববধূর শুভাগমনের সম্ভাবনায় বিজয়ার বিদায়-গীতিই যেন আমার প্রাণে আগমনীর উলুধ্বনি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। লজ্জার কথা সন্দেহ নাই!

২৫শে আশ্বিন। বিজয়া চলিয়া গেল। ইহার পর একাদশীও আর অপেক্ষা করিল না। মা বড়ই লজ্জিত হইলেন। তিনি আজ লোক পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। আমি নিষেধ করিলাম—অসচ্ছল সংসারের টাকা পয়সা এইরূপে 'খামখেয়ালে, নষ্ট হওয়া সঙ্গত নহে।'

বাস্তবিক আমার মন আমার সংসারের এই নূতন অতিথিটীর প্রতি হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল। আমি তাহার প্রতি একেবারেই সহানুভূতি শূন্য হইলাম। মনে মনে বুঝিলাম—অক্ষম দরিদ্রের পক্ষে ধনীর কন্যার ভালবাসা লাভের কল্পনা নিতান্তই বিড়ম্বনা। আজ ধনী ও নির্দ্ধনের প্রভেদ আমার জীবনে সম্পূর্ণ রকমে প্রত্যক্ষীভূত হইল। ধনী, নির্ধনের অবস্থা বুঝিতে পারে না; তাই এ উভয়ের সম্মিলনে সংসারে সর্ব্বদা বিষফল প্রসূত হয়। দরিদ্র সে বিষফলের আস্বাদন করিয়া জীবনকে প্রতিপদে লাঞ্ছিত করে।

২৬শে আশ্বিন। ছুটী ফুরাইয়া গেল। যাত্রার উদ্যোগ করিতেছি, ঠিক এম্নি সময়ে গৃহদ্বারে আসিয়া একখানা পাল্কী পঁহুছিল।

মা বলিলেন—"যাত্রার দিন পরিবর্ত্তন কর।" মার মুখের কথা বাহির হইতে দিলাম না; তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর অষ্টদূর্ব্বা পকেটে রাখিলাম। মা মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি বলিলাম—"চাকুরী রাখিতে হইলে এরূপ কথা বলোনা মা। গোলামের আর স্বাধীনতা কোথায়?" মা অশ্রুসিক্ত নয়নে মস্তক আঘ্রাণ করিলেন।

সিদ্ধিদাতার নাম স্মরণ করিতে করিতে বিল্বপত্র নাসিকায় ধরিয়া গৃহত্যাগ করিলাম।

আমার ভাবরাজ্যে নূতন কল্পনা দেখা দিল।

(ক্রমশঃ)

উৎস।

রুদ্ধ আবেগে পাষাণ টুটিয়া ঊর্দ্ধ আকাশে ছুটি,
ব্যর্থ যতেক প্রয়াস, ধরার বক্ষে পড়ি যে লুটি।
স্নেহ বারি মোর মুক্ত-গগন-বক্ষে পেলনা স্থান,—
তৃপ্ত হইব—তপ্ত ধরার শান্ত হইলে প্রাণ।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

সাহিত্য সেবক।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।—অমৃত বাবুর নিবাস খুলনা জেলার অন্তর্গত উৎকুল গ্রামে, কিন্তু এখন আর সেখানে বাড়ীঘর নাই। অল্প বয়সেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। চৈতন্য লীলামৃত প্রণেতা ভগবদ্ভক্ত স্বর্গীয় জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় খুলনা জেলার বাগেরহাট মুনসেফ হইয়া যান এবং উক্ত স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহারই মুখে ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনিয়া অনেকগুলি বালক ও যুবক ঐ ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। ঐ সকল লোকের মধ্যে অমৃত বাবুও একজন। ইহার পর তিনি কলিকাতায় গমন করিয়া "সঞ্জীবনী" সংশ্রবে একটি সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হন এবং ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ ভাবে যোগদান করেন। ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করার পর অমৃত বাবু ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইবার জন্য বদ্ধ পরিকর হন। একুশ বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রচারার্থী লোকদিগের জন্য সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। অমৃত বাবু শাস্ত্রী মহাশয়কে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন তিনি প্রচার ব্রত গ্রহণ করিবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। এই সময় তিনি শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে এক স্থানে থাকিতেন, তাঁহার ধর্ম্মশিক্ষার অধীন হইয়া চলিতেন। তৎপরে চারি বৎসর প্রচারক দিগের সহকারী হইয়া নানা স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করেন। অবশেষে সাধনাশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে তিনি বাঁকিপুর গমন করিয়া উক্ত স্থানের ব্রাহ্ম বালকদিগের বোর্ডিং এর কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এখন অমৃত বাবু ঢাকায় বাস করিয়া পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকের কার্য্য করিতেছেন। অমৃত বাবু ছেলবেলা হইতেই অনুরাগের সহিত বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলি পড়িতে পড়িতে বাঙ্গালা রচনা লিখিতে ইচ্ছা হয়। প্রথমতঃ সঞ্জীবনী পত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন তদ্ভিন্ন মুকুলে গল্প ও কবিতা লিখিতেন। বালক বালিকাদিগের জন্য "ছেলেদের গল্প" শীর্ষক একখানা সচিত্র গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এখন ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের পত্র "সেবক" ও "ভারতমহিলা" প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন।

শ্রীঅমৃতলাল সরকার—রেভারেণ্ট অমৃতলাল—ঢাকা মিসনারী সোসাইটী কর্ত্তৃক পরিচালিত 'স্নেহময়ী' পত্রিকার সম্পাদক। ইনি 'তোষিণী' প্রভৃতি শিশু পাঠ্য পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা—শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তঃর্গত ভাঙ্গাবাড়ী নামক পল্লীগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ৺গোবিন্দনাথ সেন রাজসাহীতে একজন খ্যাত নামা উকিল ছিলেন। অম্বুজাসুন্দরীর খুল্লতাত সবজজ ৺গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়ের পুত্রই সুকবি ৺রজনীকান্ত সেন। কবি রজনীকান্ত বয়সে ইঁহার বড় ছিলেন।

অম্বুজাসুন্দরীর বয়ঃক্রম এখন ৪০ বৎসর। তিনি অতি বাল্যকাল হইতেই সাহিত্য চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি পিতা মাতা ভ্রাতা অথবা কোন বন্ধু বান্ধবের সাহায্য গ্রহণ না করিয়াই সাহিত্য জীবনের উন্নতি করিয়াছেন। তাঁহার মত অধ্যবসায়শীলা স্ত্রীলোক সচরাচর দৃষ্ট হয় না। বাংলাতে এমন পত্রিকা কমই আছে যাহাতে তিনি লেখেন নাই। বিবাহের পূর্ব্বে তিনি অধিক লেখা পড়া জানিতেন না, বিবাহের পর নিজের অধ্যবসায় গুণে এখন বহু বিদ্যা শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম পুত্র বিনয়ভূষণের মৃত্যুতে তিনি "খোকা" নামে বৃহদাকার কবিতা পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বেই তাঁহার "প্রীতি ও পূজা" প্রকাশিত হয়। "প্রভাতী" "দুটী কথা" "গল্প" "ভাব ও ভক্তি" এবং "প্রেমও পুণ্য" নামে আরও তাঁহার পাঁচখানি গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত টেরখী-গ্রামে তাঁহার শ্বশুরালয়। ইঁহার শ্বশুর ৺গতিগোবিন্দ সেন মুন্সী মহাশয় টাঙ্গাইলে ওকালতী করিতেন। ইঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত কৈলাশগোবিন্দ দাস্ গুপ্ত এম, এ, একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার হেস।

চিত্র-পরিচয়

"সঙ্গীত ও সৌরভ"

সঙ্গীত বড় কি সৌরভ বড় ? নারদের বীণা-ধ্বনিতে বিষ্ণু দ্রব হইয়া মন্দাকিনীতে পরিণত হইয়াছিলেন। কানুর বেণু এবং অরফিয়সের বংশী রবে মূক প্রকৃতি পুলকে মুখরা হইয়া উঠিত। পুষ্পগন্ধে স্বর্গের দেবতা নিত্যকাল মর্ত্তে আগমন করিতেছেন। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক Dumas একটী Black Tulipএর প্রভাব কি অদ্ভুত ভাবেই প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন! মহাসত্বার উৎসবে রুদ্রাবতার Robespierre প্রদত্ত বিরাট পুষ্পগুচ্ছ সৌন্দর্য্য সম্ভার এবং গন্ধ গৌরবের এক উল্লেখ যোগ্য উদাহরণ। Wordsworth কবিতায় পুষ্পপ্রীতির চূড়ান্ত করিয়া গিয়াছেন। বহু উদাহরণ চয়ন করিয়া আমরা বিচার করিতে চাহিনা। স্বর মিষ্ট হইলে কেহ আফ্রিকার কাফ্রির তত বিচার করেনা। গন্ধ মধুর হইলে, কেহ ফুলের রূপ তেমন দেখিতে চাহে না। কিন্তু রূপ গান্ধিকা এবং কুসুম উভয়েরই সম্মোহন অস্ত্র। "চরাচরসার" হইতে বাগ্‌দেবী ; রূপ ও সৌরভে পদ্ম হইতে পদ্মিনী। সঙ্গীত এবং সৌরভ উভয়ই অতুলনীয়।

পুরোভাগে ইটালী প্রত্যাগত ময়মনসিংহ নিবাসী চিত্রশিল্পী শ্রীমান ললিতকুমার হেসের এক খানা চিত্র প্রকাশ করিলাম। একটী রমণী হ্রদের পার্শ্বে বীণ যন্ত্র যোগে সঙ্গীতে মগ্নাছিলেন ; ধীরে ধীরে সূর্য্যের উদয় হইতেছে ; ধীরে ধীরে কমল-কোরক বিকসিত হইতেছে ; ধীরে ধীরে উহার স্নিগ্ধ সৌরভ চারিদিক আমোদিত করিয়া তুলিতেছে। রমণী সৌন্দর্য্যে এবং সৌরভে আত্মহারা। যে সকল অঙ্গুলী এতক্ষণ স্বর্ণ-ভৃঙ্গবৎ তাঁহার সাধের বীণার সোপানে সোপানে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছিল, উহারা সব নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছে—তাঁহার সুকণ্ঠ নীরব। অদূরে কুঞ্জবন;—জলদর্পণে কুঞ্জবনের কৃষ্ণকমনীয় ছায়ার উপর আর তাঁহার মন নাই। তাঁহার মন ঐ কমলে, দৃষ্টি ঐ প্রফুল্ল কমলদলে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ঐ মনোহর সৌরভে, স্পর্শ ঐ মৃণালে—রমণীর মুখে চোখে তন্ময় ভাবের মধুর বিকাশ দেখিয়া সঙ্গীত ও সৌরভ—যাহার জয় ঘোষণা করিতে হয় কর! 'চিত্রকরে ময়মনসিংহের স্পর্দ্ধা করিবার আছে'—সৌরভের নব সাধনায় ; ভরসা করি, আমাদের সে উক্তি ব্যর্থ হয় নাই।

নিশির প্রতি শশী।

ওগো কৃষ্ণসপ্তমীর প্রেয়সী যামিনী,
মনে পড়ে বহুক্ষণ তুমি একাকিনী
নিঃশব্দে করিয়াছিলে আমার ধেয়ান
সেই কবে দিনান্তে আসিয়া, সুমহান্
প্রেম-অর্ঘ্য রেখেছিলে সাজায়ে সুন্দর
বিশাল অম্বরপটে, নক্ষত্র নিকর
বিনা-সূত্রে গেঁথেছিল ফুল্ল রত্ন-মালা
মোর লাগি যত্নে কত!
অয়ি মুগ্ধা বালা!
তব সে অর্চ্চনা-ভূমে নীরবে যখন
পশিনু, হাসিল বিশ্ব সে পূত মিলন
নিরখিয়া দু'জনার! তুমি আত্ম-হারা
সর্ব্বস্ব বিলালে মোরে! ঢালি হৃদি ধারা
তোমারে বাঁধিনু বক্ষে—করিনু চুম্বন—
উথলে চৌদিকে কিবা হর্ষ-শিহরণ
অকস্মাৎ!
কতক্ষণ—কিছু নাহি জানি—
কেটেগেল স্বর্গ-সুখে, মনে মনে মানি
লইলাম সার্থক জীবন! ধন্য আমি
তোমা হেন লভি দেক-দান! প্রিয়ে, যামি,
বুঝাব কি সে গৌরব!
হেরি আচম্বিতে
তুমি কবে সরে গেছ, হায়, অলক্ষিতে
ঘুচাইয়ে অভাগার বাহুর বন্ধন
সুনিবিড়! প্রেমময়ী, তুমিত কখন
এমন পাষাণী নহ! তবে কে তোমায়
করিল হরণ সখী, মায়াবীর প্রায়
কোন ক্রুর মন্ত্র বলে? হায়, তব দান
তব দত্ত বর মালা হয়ে ছিন্ন ম্লান
একে একে মিলাল কোথায়! সান্ত্বনার
শেষ-আশা হইল নিঃশেষ! স্মৃতি শুধু
সারা শূন্য-বক্ষে মোর দাবানল ধূ ধূ
জ্বালিল সজনী! শুধু বিস্ময়ে ব্যথায়
অশ্রু মোর প'ড়িল ঝরিয়া ধীরে হায়,
সুপ্ত ধরণীর অঙ্গে!
— চকিতে ভুবন
জেগে উঠে; বিশ্ব-প্রাণ প্রেমিক পবন
দ্বারে দ্বারে ছুটে যায়, কহে বিলাপিয়া
মিলনের পরিণাম কিংবা অদৃষ্টের
নিদারুণ অভিশাপ! কাল-তপনের
পরিহাসে রুদ্র কর, তৃণের আগায়
চেয়ে দেখি অশ্রুমোর নীরবে শুকায়!

ব্রহ্মপুত্রতীরে শ্রীগৌরাঙ্গ।

চিত্রশিল্পী—শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দাস। আশুতোষ-প্রেস—ঢাকা।
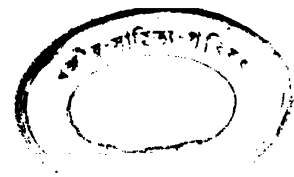
দ্বিতীয় বর্ষ। } ময়মনসিংহ, অগ্রহায়ণ, ১৩২০। { দ্বিতীয় সংখ্যা।

সভ্যতা সম্বন্ধে দুইটি উপপত্তি।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও মনুষ্যসম্বন্ধে অদ্যপর্য্যন্ত যতগুলি মতের সৃষ্টি হইয়াছে; তৎসমুদয়কে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—সেই দুইটী মত বা উপপত্তির মধ্যে একটী দেবতন্ত্র এবং অপরটী বিজ্ঞানতন্ত্রের অনুগত। যাঁহারা দেবতন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকার করেন, তাঁহাদের মত এই যে, জগৎ ভগবানের বিভূতি দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে এবং তদ্দ্বারাই পালিত হইতেছে। ইঁহারা অতিপ্রাকৃত ও অতিমানুষ শক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকেন। যাঁহারা বিজ্ঞানের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন, কোন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় শক্তিরূপিণী মূলপ্রকৃতির প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহার ক্রমোৎকর্ষ সাধিত হইতেছে। মনুষ্য সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ দুইটী মত, দেখা যায়। যাঁহারা দেবতন্ত্রের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন বাইবেল-কথিত আদিম হইতে নৈতিক পরাকাষ্ঠার অত্যুচ্চ অবস্থায় অল্পদিন হইল মানবের সৃষ্টি হইয়াছে। ভগবানের অবাধ্য হওয়াতে মানব সেই অত্যুন্নত অবস্থা হইতে পতিত হইয়াছে এবং তাহার বংশধরগণ অমরত্বে বঞ্চিত হইয়া পাপগ্রস্ত ও মরধর্ম্মের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বরের নিজপুত্র ঈশারূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ পূর্ব্বক কতকগুলি মনুষ্যের উদ্ধার করিয়াছেন। এদিকে বৈজ্ঞানিক উপপত্তির সমর্থকগণ বলেন, মনুষ্যগণ একদিনে সৃষ্ট হয় নাই, এককালেও উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। জীবের ক্রমোন্মেষ সহকারে মনুষ্যের উদ্ভব হইয়াছে। প্রথমে বন্য বা অসভ্য অবস্থা; ক্রমে মানব সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে পারিয়াছে; এই অবস্থা হইতেও ক্রমে তাহার অধিকতর উৎকর্ষ সাধিত হইবে এবং সে সভ্যতার চরম সীমায় আরোহণ করিবে।

সেই চরম সভ্যতার লক্ষণ কি, কতদিনে তাহা সাধিত হইবে, আজি সুদীর্ঘ কালের বিশাল ব্যবধানে থাকিয়া অনুমান সাহায্যে তাহার আংশিক অবধারণও অসম্ভব। কিন্তু এস্থলে সেই আনুমানিক ব্যাপারের আলোচনা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। পাশ্চাত্য জগতে সভ্যতার বিকাশসম্বন্ধে যে দুইটী মত প্রচলিত আছে, তাহার কোনটীই অভ্রান্ত বলা যায় না। উভয় মতেরই মূলে অল্প-বিস্তর যুক্তি দেখা যায় এবং জগতে উভয়েরই অল্পাধিক সমর্থক আছেন। তাঁহাদের সকলের মতামত লইয়া আলোচনা করিতে হইলে প্রবন্ধের কলেবর অযথা বর্দ্ধিত হইবে; সেইজন্য এস্থলে কেবল এই কথাই বলা যাইতে পারে যে, উক্ত উভয় মতেরই সংশোধন আবশ্যক। জগৎ একদিনে উদ্ভূত হয় নাই এবং মানবও একদিনে সভ্যতার হেম-মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া ঐশ্বর্য্যের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারে নাই;—একথা সত্য বটে; কিন্তু বিশ্বের সকল সভ্যতাই যে, ভূস্তরের ন্যায় ক্রমে ক্রমে উন্নত

হইয়াছে এবং সকল মানবই যে, পাষাণযুগ (Stone Age), ব্রোঞ্জযুগ (Bronze Age) ও লৌহযুগের (Iron Age) * অভ্যন্তর দিয়া সভ্যতার পথে পর্য্যায়-ক্রমে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, একথা সকল স্থলেই প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে কি না, সন্দেহ।

মানবের ন্যায় সভ্যতারও জাতি বা প্রকার-ভেদ দেখা যায়। পেলিওলিথিক (Paleolithic), নিওলিথিক (Neolithic) ও কালচার ষ্টেজ (Culture stage) নামে ইংরেজীতে সভ্যতার যে তিনটী যুগ বা পর্য্যায় দেখা যায়, সেই পর্য্যায়ত্রয় ক্রমিক উৎকর্ষের নিদর্শক ভিন্ন আর কিছুই নহে। মনুষ্যের প্রায় সকল সমাজেই উক্ত তিনটী অবস্থার অস্তিত্ব যে, কোন না কোন সময়ে ছিল, তাহার বহুল উল্লেখ প্রাচীন পুস্তকাদিতে লক্ষিত হইয়া থাকে। একমাত্র ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতায় আমরা ইহার কোন নিদর্শন দেখিতে পাই না। বেদ আমাদের সেই সভ্যতার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। সেই বেদে আমরা যে সভ্যতার বিবরণ দেখিতে পাই, তাহাতে পাষাণযুগের কোন চিত্র আমাদিগের নয়ন গোচর হয় না।

ঋগ্বেদের সর্ব্বত্রই স্বর্ণ, রৌপ্য লৌহের প্রভৃত উল্লেখ দেখা যায়। ক্বচিৎ কোন স্থলে শৃঙ্গ, অস্থি, বা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত কোন প্রকার ধনুঃ, কিংবা পাষাণনির্ম্মিত কোন যন্ত্র বা পাত্রের কথা দৃষ্টিগোচর হইলেই যে, তাহাকে পাষাণযুগ বলিতে হইবে, এ যুক্তি কোনক্রমেই সমীচীন নহে। ভূতত্ত্ববিৎ কতকগুলি পাশ্চাত্য পণ্ডিত দাক্ষিণাত্য ও নর্ম্মদা উপত্যকার কোন কোন স্থল হইতে প্রস্তরনির্ম্মিত নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রাদির উদ্ধার † করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই সকল অস্ত্রশস্ত্র অনার্য্যগণ ব্যবহার করিত; আর্য্যের সহিত তৎ সমুদায়ের কোন সম্বন্ধই

* Tylor's *Early History of Mankind* pp, 208,209.
Arctic Home in ths Vedas, pp, 4, Io, II.
Smith's *Man, the Primeval Savage*, p, 166.
Prehistoric Man pp, 16, 154, 244.
Joly's *Man before Metals*, pp, 20 to 22.
† *Indian Empire*, pp. 89, 100.
The Early History of Mankind, p, 215.

ছিল না। দাক্ষিণাত্যে আর্য্য-সভ্যতার প্রচার হইবার বহুপূর্ব্বে উক্ত দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই কোল, ভিল প্রভৃতি অনার্য্যগণের এবং দ্রাবিড়দিগের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল; সেইজন্য মনুসংহিতায় ঐ সকল দেশ অনার্য্যরাজ্য নামে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কপি ও জাম্বুবৎ নামক দুই প্রকার অন্ত্য মনুষ্যজাতির বাস দক্ষিণাপথের স্থানে স্থানে ছিল। প্রথমোক্ত মানবগণ পর্ব্বত বা বৃক্ষের উপরিভাগে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া এবং জাম্বুবৎগণ নানা স্থানে পাতাল গৃহ প্রস্তুত করিয়া বাস করিত;* দ্রাবিড়গণ তাহাদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে সভ্য ছিল।

পূর্ব্বোক্ত অনার্য্যগণ পাষাণনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্রাদি ব্যবহার করিত। দ্রাবিড়গণও আদিম অবস্থায় লৌহের ব্যবহার জানিত না। এতদ্ব্যতীত কপি ও জম্বুবৎগণ শাখাপল্লব বা দারুময় মুষল-মুদ্গরাদি লইয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত। পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ভারতের ভিন্ন

* হাচিন্স, জলী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন, আদিম অবস্থায় মানবগণ গিরিগুহায় বাস করিত; অনেকে ভূমির অভ্যন্তরে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া নিরাপদে থাকিত। ভারতের মধ্য প্রদেশে, মিশরে ও মেকসিকো দেশে এখনও বিস্তর অতি প্রাচীন পাতাল-গৃহ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। ইয়ুরোপের উত্তর ও পশ্চিম ভাগে—বিশেষতঃ বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের অনেক স্থানে কতকগুলি গিরিগুহার অভ্যন্তরে ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুগণের অস্থি-মালার সহিত আদিম মনুষ্য-গণের অগণ্য জীর্ণ কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে।

পুরাণে বর্ণিত আছে, রামভক্ত জাম্বুবান মধ্য ভারতের কোন একটী স্থানে পাতাল-গৃহে বাস করিত। সেই স্থলেই শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া স্যমন্তক মণি উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে যতগুলি গুহাগৃহের বিবরণ লক্ষিত হয়, তন্মধ্যে কার্কডেল্ গুহা, ড্রিম গুহা, উকী হোল, ও কেণ্ট ক্যাভার্ণ প্রসিদ্ধ।

History of Mankind, Story of Man প্রভৃতি গ্রন্থে বৃক্ষ-নিবাসী কয়েকটী মানবজাতির বৃত্তান্ত দেখা যায়। শেষোক্ত গ্রন্থে বর্ণিত আছে, দক্ষিণাপথে অতি প্রাচীন কালে এইরূপ একটী জাতি বাস করিত। তবে তাহারাই কি শ্রীরামের সাহায্যকারী কপিসৈন্য?

History Of Mankind pp. *i.*106. *ii.* 47.
The Story Of Man, pp, 58 to 73, 340, 341.
Man before Metals, p. 60.
Prehistoric Man and Beast, pp, 47 to 61.
Man the Primeval Savage, pp, 45 to 59.

ভিন্ন স্থানে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে যে সকল প্রস্তর-নির্ম্মিত বা প্রস্তরীভূত অস্ত্রশস্ত্রাদি পাইয়াছেন, তৎসমুদায় ঐ সকল অসভ্যজাতিই ব্যবহার করিত। কিন্তু আর্য্যগণ যে কখনও ঐরূপ প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্রাদি ব্যবহার করিতেন, অর্থাৎ তাঁহারা যে ধাতুসমূহের ব্যবহার জানিতেন না, বেদে আমরা তাহার কোন উল্লেখই দেখিতে পাই না। আর্য্য সভ্যতা প্রথম হইতেই উন্নত সোপানে সমারূঢ়। বরং যুগপর্য্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্ষয় ও অবনতি ঘটিয়াছে।

বেদে আমরা যে সভ্যতার বিবরণ দেখিতে পাই, তাহা আমাদের ভারতবর্ষেই স্ফুর্ত্তি পাইয়াছিল, কিন্তু তাহা জগতের কোন্ স্থলে উদ্ভূত হইয়াছিল, বিদ্যমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বেদে আমরা এই কয়টী বিষয় দেখিতে পাই :—

(১) মনু ভারতীয় আর্য্যগণের আদি পুরুষ।

(২) তিনি আদি যজ্ঞকর্ত্তা ;

(৩) তিনিই আর্য্য সভ্যতার প্রবর্ত্তক ;

(৪) সেই আর্য্যসভ্যতা জগতে শ্রেষ্ঠ,—তাহাই আদর্শ সভ্যতা।

আমরা ক্রমে উক্ত চারিটী বিষয়ের আলোচনা করিব। হিন্দুশাস্ত্রের মতে এক একটী কল্পাবসানে সমগ্র জগতের মহাপ্রলয় হইয়া থাকে। সেই মহাপ্রলয় ব্রহ্মার রাত্রি নামে বর্ণিত। মানবগণের বহুসহস্র কোটী বৎসর লইয়া ব্রহ্মার এক দিন। উক্ত ব্রাহ্ম দিবসে জগৎ সংসারের আবার নূতন সৃষ্টি হয় ; তাহাতে পর্য্যায়ক্রমে নানা জীবের সঙ্গে সঙ্গে মানবের সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস সাধিত হইতে থাকে। মনুষ্যের বহুসহস্রকোটীবর্ষপরিমিত উক্ত একটী ব্রাহ্ম দিবসের মধ্যে অর্থাৎ প্রত্যেক ব্রাহ্ম দিবসে পর্য্যায়ক্রমে চতুর্দ্দশ মনু অবতীর্ণ হয়েন। তাঁহারাই জগতের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা। মনুগণের সেই শাসনকাল হিন্দুশাস্ত্রে মন্বন্তর নামে প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক নূতন মন্বন্তরের পূর্ব্বে জগতের নানাপ্রকার নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। তাহাতে ভূমিকম্প, প্লাবন, বা উৎকট তাপে জগতের অনেক অংশ বিধ্বস্ত হইয়া যায় এবং তাহার পরে অনেক নূতন অংশের আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রত্যেক মন্বন্তরে এক একজন নূতন মনু, নূতন ইন্দ্র, নূতন সপ্তর্ষি আবির্ভূত হইয়া নূতন নূতন মনুষ্যের সৃষ্টি করেন।

এইরূপে জগতে কত ভিন্ন ভিন্ন মানবজাতির সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তন্মধ্যে অগণ্য মানববংশ একেবারে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, কোন কোন বংশের এখনও সামান্য সামান্য অবশেষ আছে ; কিন্তু তাহাদিগের অবস্থা প্রভূত পরিমাণে রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে। গত ছয়টী মন্বন্তরের ক্ষয়ব্যয় সহ্য করিয়াও যে সকল মানববংশ এখনও জীবিত আছে, তাহারা জগতের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। নৈসর্গিক নানা প্রচণ্ড বাধাবিঘ্ন বশতঃ অনেকের সন্ধান হয়ত আজিও বিদ্যমান পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের অধিগত হয় নাই। প্রাচীন মানবজাতিসমূহের যাহারা আজিও বাঁচিয়া আছে, তাহাদের এবং তাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষগণের পরস্পরের অনুলোম ও বিলোম সংস্রবে নানা সঙ্করবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল। এইরূপ মূলবংশ ও শাখাবংশসকলের অগণ্য সঙ্করবংশ সমুদায়েরও বিস্তর শাখা প্রশাখাদি উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন কোনটী একেবারে লোকলোচন হইতে অন্তর্হিত হইয়া পড়িয়াছে ; কোন কোনটী বর্ত্তমান উন্নত জাতিসমূহের সহিত মিলিত ও নষ্টত্ব প্রাপ্ত হইয়া নূতন নূতন আকারে ও বর্ণে এবং অভিনব ধর্ম্মাদির আবেগে নবীভূত উৎসাহে ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। কে তাহাদিগের সংখ্যা করিবে ?

কোথায় আতলান্তিস্ বা লিমুরিয়ার সুবিশাল মহাদেশ এবং তাহার অতি বিশালদেহ মানবগণ ? দুরিতদুষ্কৃতির দুস্তর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে কোন্ অতীত মন্বন্তরে তাহারা জগৎ হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। আজি তাহাদের অতিমানুষ অবয়ব ও বলবিক্রমের বিষয় গল্পগাথায় পর্য্যবসিত হইয়া লোকের ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। যে জাতি অযোধ্যা, ইন্দ্রপ্রস্থ, শ্রাবস্তী ও দ্বারকা প্রস্তুত করিয়াছিল, ব্যাবিলনের বিরাট মন্দির, মিশর ও মেক্সিকোর অভ্রভেদী পিরামিড ও পাতাল-গৃহ, চীনের মহাপ্রাচীর যে সকল অদ্ভুত মানবের অদ্ভুত শক্তি-সাধনার নিদর্শন,

সেই সকল জাতি কোথায়? * তাহারা কোন্ মন্বন্তরে কোন্ মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহা কে বলিবে? মাডাগাস্কার ও অষ্ট্রেলিয়ায়, দাহোমী-দেশে ও পাপুয়ায়, সিংহলে ও অঙ্গরাজ্যে আজিও যে সকল দুর্ভাগ্য মানব বাস করিতেছে, তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ কোন অতীত যুগে জগতে প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা কোন বংশে উৎপন্ন, তাহা কে বলিবে? পুরাতত্ত্ব এবিষয়ে নীরব; মানবতত্ত্ব এ সম্বন্ধে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই বিস্ময়ে নিরস্ত; ভূতত্ত্ব ও ভূগোলতত্ত্ব মায়োসিন ও প্লায়োসিন স্তর এবং উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্রের কয়েকটা দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিয়া আত্মহারা হইয়া রহিয়াছে। কে তাহাদিগের উদ্ধার করিবে?

আর কত উদাহরণ দেখাইব? ঋগ্বেদে যে সুষ্ণ, যে শম্বর, যে পিপ্রু, যে নমুচি, দৃভীক, অনর্শনি, শ্রীবিন্দ ও ইলীবিশ প্রভৃতি দানব, রাক্ষস ও যাতুধানদিগের বিবরণ দেখা যায়, যে পণি নামক অনার্য্যগণ আর্য্য ঋষিগণের গাভী হরণ করিয়া লইয়া যাইত, এবং যে সরমা মধ্যে মধ্যে তাহাদের দূতরূপে আর্য্যদিগের নিকট আগমন করিত, তাহাদিগের অস্তিত্ব কি কেবল কল্পনাপ্রসূত, না ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য? প্রজাপতি কশ্যপকে কেহ কেহ কচ্ছপ ও মহারাজ ঋক্ষকে ভল্লূক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কি সত্য? তবে কি শুনক ও কৌশিক মাণ্ডুকেয় ও মৎস্য, অজ ও শৃঙ্গিগণ বাস্তবিকই কুকুর ও পেচক, ভেক ও মৎস্য, ছাগ ও মেষাদি প্রাণী হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল? পুরাণে ও রামায়ণ-মহাভারতাদি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে যে হয়মুখ, হয়গ্রীব, একচক্ষু, নৃসিংহ, নৃব্যাঘ্র, কবন্ধ ও একপদ মানবগণের বিবরণ দেখা যায়, তাহারা কোন্ কোন্ নরবংশে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা কে বলিবে? অধিক আর কি বলিব? যে দ্রবিড় ও খশ, শক ও পারদ, কেল্ট ও গথ প্রভৃতি মানবগণ এক-কালে জগতে বিস্ময়কর বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল, কোন্ মন্বন্তরে কোন্ কোন্ মনুর চেষ্টায় তাহারা জগতে আসিয়া-ছিল, তাহা নিরূপিত হইতে পারে না। তবে অপর জাতির কথা কি বলিব? *

এক মন্বন্তরের মানবীয় ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার ও বর্ণাদির সহিত অন্য মন্বন্তরের মানবীয় ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার ও বর্ণাদি বিষয়ে বিশেষ বা সামান্য পার্থক্য সংঘটিত হয়। বর্ত্তমান কল্পের নাম বারাহ কল্প। ইহাতে ছয়টী মনুর শাসন চলিয়া গিয়াছে। এখন সপ্তম মন্বন্তর। এই সপ্তম মনুর নাম শ্রাদ্ধদেব। ইনি বিবস্বান্ অর্থাৎ সূর্য্যের পুত্র। ইনিই আর্য্যজাতির সৃষ্টিকর্ত্তা ও আদি-পুরুষ। ইঁহার মন্বন্তরের ২৭ যুগ অতীত হইয়াছে, অষ্টাবিংশ যুগে কলি চলিতেছে। কলির অবসানে আবার সত্য, ত্রেতাদি যুগ আবর্ত্তিত হইবে এবং সেই সঙ্গে সেই সেই যুগের নির্দ্দিষ্ট অবস্থা ও লক্ষণ সকল প্রাদুর্ভূত থাকিবে। আবার সপ্তমের পর অষ্টম মন্বন্তরের আবির্ভাব হইবে, এইরূপে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর অথবা সহস্র চতুর্যুগ যথা-ক্রমে অতীত হইবে, তবে কল্পাবসান এবং সেই সঙ্গে মহাপ্রলয় ঘটিবে।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থসমূহে অতিকায় মনুষ্য ও অতি ক্ষুদ্র বামনদিগের যে সকল বিবরণ লক্ষিত হয়, অনেকে তৎসমুদায়কে গল্প বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু পাশ্চাত্য মানবতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বহুল অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, পুরাকল্পে বা অতি প্রাচীনকালে জগতের নানাস্থানে ঐরূপ মানবগণ বাস করিত। কেহ কেহ বলেন, লিমুরিয়া বা এটল্যাণ্টিস্ দ্বীপে পুরাকালে যে সকল লোক বাস করিত, তাহাদের সকলেরই বিশাল দেহ ছিল। জলপ্লাবনে সেই দেশের প্রায় সমস্ত অংশ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতবর বিউএল ও র‍্যাট্জেল ঐরূপ বিস্তর অতিকায় মানবের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

রামায়ণ, আরণ্যকাণ্ড ও কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড; মহাভারত, সভাপর্ব্ব।

ঋগ্বেদ—নি সর্বসেন ইষুধী রসক্ত সমর্য্যো গা অজতি যস্য বষ্টি।

চোষ্কূয়মাণ ইংদ্র ভূরি বামং মা পণিভূর্‌স্মদধি প্রবৃদ্ধ। ১।৩৩।৩

কেহ কেহ বলেন, এই পণিশব্দ হইতেই ফিনিশীয় শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

কর্ণপ্রাবরণাশ্চৈব তথা চাপ্যোষ্ঠকর্ণকাঃ।
ঘোরলোহমুখাশ্চৈব জবনাশ্চৈকপাদকাঃ॥
পুনঃ—স্ত্রীণামশ্বমুখীনাঞ্চ নিকেতস্তত্রতত্রতু॥
রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪০।২৬ এবং ৪৩।৩০।
বক্রনাসং বিরূপাক্ষং দীর্ঘাস্যং নির্ণতোয়দম্। ৩।৭১।৫।

* *Vedic Mythology*, pp, 40, 60, 160, 161, 162, 163.
The Secret Doctrine, pp. i, 92, 348, ii 230.
Early History of Mankind pp. 321, to 325.

ময়মনসিংহে শ্রীগৌরাঙ্গ।

ময়মনসিংহ জিলার উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তস্থ সুসঙ্গ-দুর্গাপুর নামক স্থানে হাজঙ্গ জাতীয় যে সকল লোকের বাস, তাহাদের আচার ব্যবহার দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। হাজঙ্গেরা গারো প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতি হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে। কিন্তু সুসঙ্গ-দুর্গাপুরের হাজঙ্গদের অবস্থা তদ্রূপ নহে; ইহাদের গৃহগুলি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, অঙ্গন সর্ব্বদা গোময় লিপ্ত এবং প্রত্যেক বাড়ীতেই তুলসী বৃক্ষ রোপিত আছে। ইহারা বিনীত এবং অতিথি-সেবাপরায়ণ; জীবহিংসা না করিয়া কৃষিবৃত্তি দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

সুসঙ্গ-দুর্গাপুরের হাজঙ্গগণ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী; মৃদঙ্গ-করতাল সহ সঙ্কীর্ত্তন করাও তাহাদের মধ্যে অপরিজ্ঞাত নহে। এমন কি, তাহাদের কেহ কেহ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতোক্ত গুরু ও পঞ্চতত্ত্ব প্রণামাদি শ্লোক বংশানুক্রমে জানে ও বলিতে পারে। তাহারা জন্মাষ্টমী, রাস, ও দোল যাত্রা প্রভৃতির অনুষ্ঠানও করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যাহাদের খ্যাতি অধিকারী, তাহাদের গৃহে শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত আছেন,—অধিকাংশ মূর্ত্তিই রাধাকৃষ্ণ অথবা বাল গোপালের। * ফলতঃ ইহারা আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণব। আজকাল বৈষ্ণব হয় নাই—পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণব।

এই অঞ্চলের হাজঙ্গেরা ঈদৃশ ভাব ও ধর্ম্ম কোথা হইতে পাইল? ইহা অল্পকালের অনুশীলনের এবং বাঙ্গালীর অনুকরণের ফল নহে; তাহা হইলে বাঙ্গালী-পল্লীর সান্নকটবর্ত্তী অপর পার্ব্বত্য জাতিও এইরূপ আচার বিশিষ্ট হইতে পারিত। কোন পার্ব্বত্য জাতীয় ব্যক্তিকে তাহার চিরাচরিত প্রাচীন সংস্কার ও আচার ত্যাগ করান সামান্য শক্তির কার্য্য নহে। অবস্থা বিবেচনায় মনে হয়, হয় ইহা স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কার্য্য, নয় তাঁহার কোন শক্তিমান বিশিষ্ট ভক্ত দ্বারা ইহারা পবিত্রীকৃত হইয়াছে।

শ্রীমহাপ্রভু পিতৃভূমি শ্রীহট্ট গমন কালে এপথ দিয়া গমন করিয়া ছিলেন কি না বলাযায় না। প্রেম বিলাসাদি প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণোপলক্ষে তিনি অনেক স্থানে গিয়াই হরিনাম প্রচার করেন।

চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছেঃ—

"বঙ্গদেশে মহাপ্রভু হইলা প্রবেশ।
অদ্যাপিও সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ॥"
"সেই ভাগ্যে অদ্যাপিও সর্ব্ব বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন করে স্ত্রীপুরুষে॥"

শ্রীমহাপ্রভু যে কেবল পদ্মাবতী তীর পর্য্যন্ত আগমণ করিয়াছিলেন,—অন্যত্র যান নাই, তাহা নহে; "সর্ব্ব বঙ্গদেশ" লিখিত থাকায়, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট চট্টগ্রামাদি সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গই সূচিত হইতেছে।

যখন শ্রীমহাপ্রভু পূর্ব্ববঙ্গে হরিনাম প্রচার করেন, আশ্চর্য্যের বিষয় যে নবদ্বীপে সেই সময়ে তিনি ভ্রমেও হরিনাম করেন নাই।

শ্রীমহাপ্রভু ভক্তিবপুরের ঘাটে পদ্মা পার হইয়া গোপালপুরে গমন করেন, তথায় কিছুকাল বাস করিয়া পদ্মা-যমুনা-সঙ্গমে উপস্থিত হইয়া স্নান তর্পণ করিয়াছিলেন; তাহার পর ফরিদপুরে প্রবিষ্ট হন। ফরিদপুরে কিছুকাল হরিনাম ও বিদ্যাবিতরণের পর বিক্রমপুরের অন্তর্গত সুরপুরে * আগমন করেন। এই সময়ে তাঁহার পিতৃভূমি শ্রীহট্ট দর্শনের অভিলাস জন্মে, "প্রেমবিলাসে" ইহা বর্ণিত আছে——

"কিছু দিন থাকি প্রভু ভাবিলা মনেতে।
যাইতে হইল মোর শ্রীহট্ট দেশেতে॥
পিতৃ জন্ম স্থান পিতামহেরে দেখিয়া।
পদ্মাবতী তীরে ঝাট আসিব চলিয়া॥"

শ্রীমহাপ্রভু অনতিবিলম্বে যাত্রা করিয়া সুবর্ণগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। সেই সময় বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলা ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। সুবর্ণগ্রাম হইতে তিনি

* সুসঙ্গ-দুর্গাপুর হইতে সেরপুরের হাজঙ্গেরা বৈষ্ণব হয়। তত্রত্য হাজঙ্গ বসতির মধ্যে অনেক গ্রামেই অধিকারীদের বাস ও শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত আছেন। দাউধারা গ্রামের অধিকারীর গৃহে শ্রীগৌর নিতাই বিগ্রহ স্থাপিত।

* এগ্রাম অধুনা পদ্মাগর্ভে বিলুপ্ত।

উত্তর পূর্ব্ব মুখী যাইয়া লাঙ্গলবন্ধে ব্রহ্মপুত্র স্নান করেন; কথিত আছে বলরামের করধৃত লাঙ্গলে আকৃষ্ট হওয়ায় এ স্থান লাঙ্গলবন্ধ নামে খ্যাত হয়। *

তথা হইতে শ্রীমহাপ্রভু পঞ্চমী ঘাট গমন করেন; এবং তৎপরে প্রাচীন নগর এগারসিন্ধুর আগমন করিয়া ঐ স্থান পবিত্র করেন। এগারসিন্ধুর হইতে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ বেতাল গ্রামে তিনি উপস্থিত হন; ইহার নিকটেই ঢোলদিয়া ও ভিটাদিয়া প্রভৃতি প্রাচীন গ্রাম। শ্রীমহাপ্রভু ভিটাদিয়া নিবাসী লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করেন। লক্ষ্মীনাথ পরম বৈষ্ণব ছিলেন, প্রভু তাঁহার গৃহে ৩।৪ দিবস ছিলেন। **লক্ষ্মীনাথের গৃহে একটি বকুলতলায় বসিয়া উভয়ে কৃষ্ণ কথা আলাপ করিতেন। † তাহার পরে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীহট্টে আগমন করেন। §

* "বলরাম লৌহিত্যে স্নান করিবারে।
লাঙ্গল বন্ধে উপনীত হইলেন ধীরে॥
কিছুদূরে ছিল সেই ব্রহ্মপুত্র নদ।
বলরাম ডাকিলেন করি উচ্চ নাদ॥
বলরামের ডাক লৌহিত্য না শুনিল।
ক্রোধকরি বলরাম লাঙ্গল ধরিল॥
লাঙ্গলে আকর্ষণ করি নিকটে আনিল।
লাঙ্গলে বান্ধিয়া স্নান তর্পণ করিল॥
এই কারণে এই স্থানের নাম লাঙ্গলবন্ধ হয়।
শীতল লক্ষার সঙ্গম এই স্থানে রয়॥
সঙ্গমেতে স্নান কৈলে শতগুণ ফলধরে।
নানাদেশ হৈতে লোক আসি স্নান করে॥"
—রঘুদাস বৈদ্য কৃত প্রাচীন স্বরূপ চরিত্র গ্রন্থ।

* সেই স্থানে আছেন বিপ্র লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী।
পরম বৈষ্ণব সর্ব্বগুণে সর্ব্বোপরি॥
তার ঘরে কৈলা প্রভু ভিক্ষা নির্ব্বাহনে।
দুইচারি দিবস রহি তার ভক্তি গুণে॥"
প্রেম বিলাস ২৪ বিঃ।

† "ঐ দেখ তমাল আর বকুল বৃক্ষ রয়।
লক্ষ্মীনাথসহ গৌর তার তলে রয়॥
ইষ্ট গোষ্ঠী করে আর নাম সঙ্কীর্ত্তন।
যে দেখে তাহার রূপ মোহিত সে জন॥"—স্বরূপচরিত্র।

§ "লক্ষ্মীনাথে বর দিবা প্রভু গৌরহরি।
কিছুদিনে শ্রীহট্টেতে আসিলেন চলি॥"—প্রেম বিলাস।

ভিটাদিয়া হইতে তাঁহার শ্রীহট্ট গমন কোন্ পথে হইয়াছিল, বলা যায় না; সুতরাং হাজঙ্গ জাতির উদ্ধার যে স্বয়ং তিনি করিয়াছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নাই।

যিনি নীলাচলে শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে রায় রামানন্দ সদনে গিয়া কৃষ্ণকথা শুনিয়াছিলেন, সেই প্রদ্যুম্ন মিশ্র বিরচিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী নামক সংস্কৃত গ্রন্থেও শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীহট্টাগমণ লীলা বর্ণিত আছে। কিন্তু সে পরবর্ত্তী ঘটনা—সন্ন্যাসের পরে শান্তিপুর হইতে তিনি যশোড়া, অম্বিকা, ও শ্রীহট্টে "লীলাছলে" গমন করিয়াছিলেন; ইহাই বর্ণিত আছে। এই সময়ে শ্রীহট্টের বুরুগঙ্গা (বরঙ্গা) ও ঢাকা দক্ষিণে তিনি কোন কোন ভক্তকে বিশেষ ভাবে হরিনাম প্রচারে প্রেরণ করেন; কিন্তু এই সময়েও তাঁহার সুসঙ্গ-দুর্গাপুর প্রভৃতি গমনের কোন সংবাদই পাওয়া যায় না।

শ্রীহট্টের জনৈক প্রাচীন কবি কৃত "রসতত্ত্ববিলাস" নামক একখানি হস্তলিখিত কীট দংষ্ট পুঁথি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে যে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীহট্টবাসী রামদাস ও মাধব এবং জ্ঞানবর ও কল্যাণবর নামক ভক্ত চতুষ্টয়কে হরিনাম প্রচারার্থে আদেশ করিয়াছিলেন। এই আদেশ—পরে তিনি যখন শ্রীহট্ট আগমন করিয়া ছিলেন, সেই সময় প্রদত্ত হয়।

"এতবলি মহাপ্রভু ডাকে রামদাস।
দুই ভাই সঙ্গে চলে মাধব দাস॥
এই নাম বিলাইবা উত্তর দিগেতে।
জ্ঞানবর কল্যাণবর ডাকয়ে ত্বরিতে॥
মোর আজ্ঞাবলে বাপু পূরব দিগেতে।
যারে তারে এই নাম বিলাও ভালমতে॥
জন্মে জন্মে তুমাদোহার হৃদয়ে বসিয়া।
আমি প্রেম বিলাইব নিশ্চয় জানিয়॥"

রসতত্ত্ববিলাস। *

শ্রীমহাপ্রভু জ্ঞানবর ও কল্যাণবরকে পূর্ব্বদিকে এবং রামদাস ও মাধবকে উত্তর দিকে হরিনাম প্রচারার্থ "শক্তি" ("মোর বল") দিয়া প্রেরণ করেন। জ্ঞানবর

* এ গ্রন্থ রামানন্দ মিশ্র প্রণীত, রামানন্দের সহোদরের বংশে অধুনা অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ চলিতেছে।

ও কল্যাণবর কোথায় গমন করিয়াছিলেন? শ্রীহট্টের পূর্ব্বে হেড়ম্বদেশ; তাঁহাদের প্রচার ক্ষেত্র ঐ দেশই হইয়াছিল। তাঁহারা শীঘ্রই তাঁহাদের কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া হেড়ম্ব (কাছাড়) হইতে শ্রীহট্টে (পঞ্চখণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। *

রাম দাস ও মাধব শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞায় উত্তর দিকে হরিনাম প্রচারার্থ গমন করেন। জানা যায় যে তাঁহারাও কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। †

কিন্তু তাঁহারা দুইজনে সঙ্কীর্ত্তন প্রচারের সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই; তাঁহারা "কেবল নাম প্রচারে" সে দিক তরাইয়া ছিলেন।

যখন এই প্রচার কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তখন সুসঙ্গের কিয়দংশ সরকার শ্রীহট্টেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল; রামদাস ও মাধব শ্রীহট্ট জিলার উত্তরাংশে সেই স্থানেই হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। পার্ব্বত্য হাজঙ্গ জাতীয়েরা প্রথম হইতেই সঙ্কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইতে পারে নাই, তাহারা প্রথমতঃ "কেবল হরিনামেই" দীক্ষিত হইয়াছিল। ইহাই স্বাভাবিক এবং রামানন্দ কর্ত্তৃক সেই জন্যই একথা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীহট্টে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আগমনের অনেক চিহ্নই বর্ত্তমান আছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ময়মনসিংহের ভিটাদিয়া, ঢোলদিয়া, বেতাল, এগারসিন্ধুর প্রভৃতি স্থানে যে সকল লীলা করেন, তত্তস্থানে তাঁহার কোন চিহ্ন আছে বলিয়া শুনি নাই; সম্ভবতঃ তাহা কালগর্ভে বিলীন ও বিস্মৃতির আবিল জলে ডুবিয়া গিয়াছে; কিন্তু দুর্গাপুর ও সের-পুরের হাজঙ্গ জাতির আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম তাহা একবারে বিলোপ হইতে দিতেছে না। ইহাদের আচার ব্যবহারাদি দেখিলেই মনে হয় যে শ্রীগৌরঙ্গের সহিত তাহার কোন সংস্রব না থাকিবার কথা নহে। সে সম্বন্ধটি কি, এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করা গিয়াছে।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।

* "ফুরা (ফিরিয়া) গেলা জ্ঞানবর হিড়িম্বদেশ হৈতে। পঞ্চখণ্ডে বাস হৈয়া প্রেম বিলাইতে।"—রসতত্ত্ববিলাস।

† "রামদাস মাধবদাস উত্তর দিকে যাই। তথা যায়া বিলাইলা প্রভুর আজ্ঞাবলে। কেবল নাম প্রচারে সেদিকে তরাইল"—ঐ।

পল্লী-জননী।

১

হে মম পল্লী-জননী,
স্নিগ্ধ শ্যামকান্তি তব
দীনসন্তান-পালিনী

২

ঊষার স্নিগ্ধ অরুণ-কিরণে
বিকাশে তোমার হাস্য,
সন্ধ্যার শান্ত পবিত্র মূরতি,
সে যে মা তোমার আস্য!
বাজে ঘণ্টা কাঁশি মন্দিরে মন্দিরে,
ধূপগন্ধ-বায়ু বহে ধীরে ধীরে,
স্তুতিগীতি ছন্দে তুমি চিরদিন
সন্তান শুভ কারিনী।

৩

তোমার ক্ষেত্রে শস্য-ভাণ্ডার,
ক্ষুধিত সন্তান তরে,
তটিনীর জলে স্নেহের প্রবাহ
ক্ষীর ধারা সম ঝরে।
সন্তানের তরে কত আয়োজন,
কত মায়া তব কতই যতন,
শিরায় শিরায় বেঁধেছে আমায়,
তোমার স্নেহ-বন্ধনী।

৪

ষড়ঋতু আনি কুসুম অর্ঘ্য
নিয়ত তোমায় বন্দে,
বিহঙ্গের গানে ভরে উপবন,
কান্ত মধুর ছন্দে।
মাঠে কৃষকের বারমাসী গানে,
সাঁঝে রাখালের বাঁশরীর তানে,
হে সর্ব্বমঙ্গলা সন্তান বৎসলা
তুমি যে জাগ মা আপনি!

৫

তোমার রুদ্র গ্রীষ্ম জাগায়
হৃদয়ে চণ্ড চেতনা,
তোমার বর্ষা-মেদুর সমীরে
মনেপড়ে কত বেদনা।
কুটীরে কুটীরে ক্ষুদ্র সুখে দুখে,
রাখ ঢাকি তুমি আপনার বুকে,
অঞ্চলে মুছাও নয়নের জল,
তুমি মা কষ্ট-হারিণী।

৬

তোমার মৃত্তিকা নহে তুচ্ছ মাটী
এ যে পিতৃগণ দেহ,
মিশেছে উহাতে শত বরষের
কত আশীর্ব্বাদ স্নেহ।
তুচ্ছ ধূলিকণা আমিযে তোমার,
তুমি পুণ্যতীর্থ সম সাধনার,
ধরিয়াছ ক্রোড়ে জনমে আমারে
মরণে ধরিও তেমনি,
তোমার ধূলায় এদেহের শেষ
মিশে যায় যেন জননী।

শ্রী——পল্লীবাসী।

ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ।

১১৯৮ বা ১২০৩ খৃষ্টাব্দ—মোসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গ বিজয়ের সময় রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক দিকে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত গঙ্গারামপুর থানা, অপর দিকে বীরভূম জেলার উত্তরাংশ, কেবল এই দুই সীমাবর্ত্তী প্রদেশ বিজয়ী সেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজী অধিকার স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের অন্যান্য অংশ স্বাধীন ছিল।

কতিপয় মোসলমান দরবেশের উৎকট সাধনায় বঙ্গের অন্যান্য প্রদেশে হিন্দুর রাজত্ব বিনষ্ট হইয়া মোসলমানের অধিকার স্থাপিত ও ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ মকদুম শাহদৌলা নামক একজন ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারকের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতেছি। জনশ্রুতি আমাদের অবলম্বন।

আরব দেশের অন্তর্গত এয়মানের শাসন পতির পুত্র শাহজাদা মকদুম দৌলা দ্বাদশজন দরবেশ ও বহু সংখ্যক অনুচর সহ পিতার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচারার্থ বহির্গত হন। তাঁহারা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ প্রসিদ্ধ বোখারা নগরে গমন করেন এবং তত্রত্য ধর্ম্ম বেত্তা শাহ জালাল উদ্দীন বোখারী কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হন। শাহ জালাল, মকদুমকে কতিপয় খাকি রঙ্গের কপোত উপহার দেন। অতঃপর তাঁহারা জলযানে আরোহণ করিয়া ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করেন এবং বহু দেশ পরিভ্রমণান্তে বর্ত্তমান পাবনা জেলার অন্তর্গত পোতাজিয়া নামক স্থানে উপনীত হন। এই দেশ তৎকালে জলগর্ভে নিহিত ছিল! সমস্ত স্থান বিশাল সমুদ্র সদৃশ প্রতীয়মান হইত। এই স্থানে যাত্রীদলের জলযান হঠাৎ চর ভূমিতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে; তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে অসমর্থ হন। তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া জল যানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের সঙ্গীয় কপোত দল প্রাতঃকালে জল যান পরিত্যাগে পূর্ব্বক বহির্গত হইত, সন্ধ্যাকালে নৌকায় ফিরিয়া আসিত। এক দিন এই সকল পক্ষীর পদে কর্দ্দম দেখা যায়; এজন্য যাত্রীদল অদূরে বাসোপযোগী ভূমির অস্তিত্ব অনুমান করেন। শাহ জাদা মকদুমের আদেশে নাবিকেরা ডিঙ্গি নৌকায় আরোহণ করিয়া পর দিন প্রাতঃকালে পক্ষীগুলির অনুসরণ করে এবং বর্ত্তমান শাহজাদপুর নামক স্থান তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। অতঃপর মকদুম এই স্থানে দ্বাদশজন দরবেশ ও অনুচর বর্গ সহ বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন।

শাহজাদা মকদুম দৌলার অভিনব বাসভূমি তাঁহার উপাধি অনুসারে শাহজাদপুর নামে পরিচিত হয়। মকদুম তথায় মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হন। তদ্দেশের হিন্দু অধিপতি বিজাতির আবির্ভাব দেখিয়া ভীত হন এবং তাহাদিগকে বিধ্বস্ত ও বহিষ্কৃত করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন।

উভয় পক্ষে প্রবল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ক্রমান্বয়ে তিনবার যুদ্ধ হইয়াছিল; তৃতীয় যুদ্ধে সাহজাদা মকদুমদৌলা কতিপয় সহচর সহ প্রাণ পরিত্যাগ করেন। একজন হিন্দু সৈনিক পুরস্কার লোভে মকদুমের ছিন্ন শির লইয়া স্বীয় প্রভুর নিকটে গমন করে। হিন্দু অধিপতি এই মস্তকে নানাপ্রকার সুলক্ষণ দর্শন করিয়া মকদুমকে একজন মহাধার্ম্মিক বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং তজ্জন্য তাঁহার মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেন। অতঃপর মকদুমের অবশিষ্ট দরবেশ ও অনুচর নিরুপদ্রবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। মকদুমের মৃত দেহ সমারোহ সহকারে সমাহিত হয়।

শাহজাদা মকদুমদৌলার মসজিদ ও কবর অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। মসজিদ ও কবরের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য ৭২২ বিঘা নিষ্কর ভূমি নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। এই নিষ্কর ভূমির অধিকাংশ প্রাগুক্ত দরবেশ ও অনুচরগণের উত্তরাধিকারীরা ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন। প্রত্যেক বৎসর বৈশাখ মাসে এই ঘটনার স্মরণার্থ শাহজাদপুরে মেলা হইয়া থাকে, এই মেলায় বহুদূর হইতে হিন্দু মোসলমান আগমন করিয়া তাঁহার স্মৃতির তর্পণ করে।

আমরা শাহজাদা মকদুম দৌলার বঙ্গদেশে আগমন কাল নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। শাহজাদপুর অঞ্চলের জনশ্রুতি অনুসারে তিনি মহাপুরুষ মোহাম্মদের জীবদ্দশায় বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মোয়াজউদ্দীন জবল। তিনি মহাপুরুষের সহচর ও এয়মানের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। হজরত মোহাম্মদের আবির্ভাবের বহুকাল পরে বঙ্গদেশে মোসলমানের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় বঙ্গদেশের এক প্রান্তে তাঁহার সম সময়ে ইস্লামের প্রবর্ত্তন ও মোসলমানের আধিপত্যের সূত্রপাত বিশ্বাস যোগ্য নহে। এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাক্তার বুকানন লিখিয়াছেন যে, বহু মোসলমান খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের নানা স্থানে বাণিজ্য উদ্দেশ্যে আগমন করিতেন এবং তাঁহাদের অনেকে ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। অতএব এরূপ সম্ভব পর যে, মোসলমানের তরবারি হস্তে আগমনের বহু পূর্ব্বেই একদল দুঃসাহসিক মোসলমান পূর্ব্ববঙ্গে উপনীত হইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। ইহা বুকানন সাহেবের অনুমান মাত্র; পক্ষান্তরে একটি আভ্যন্তরীণ প্রমাণে দেখাযায় যে, মোহাম্মদ বক্তিয়ার খিলিজির সম সময়ে অথবা পরবর্ত্তী কালে মকদুম সাহেব বঙ্গদেশে আগমন করেন। মকদুম সাহেব ধর্ম্ম প্রচারার্থ বহির্গত হইয়া প্রথমতঃ বোখারা নিবাসী সাধু প্রবর শাহ জালাল উদ্দীন বোখারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এই জালাল উদ্দীন সাধু ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং মুলতান নগরের অধিবাসী হয়েন। তাঁহার পৌত্রের নাম মকদুম-ই-জাহানিয়া। মোসলেম ইতিহাসে মকদুম-ই-জাহানিয়ার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি মুলতানের নিকট উচ্ছনামক স্থানে ১৩২৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। পিতামহ ও পৌত্রের মৃত্যু মধ্যে ১০০ বৎসরের ব্যবধান ধরিয়া লইলে আমরা ১২২৭ খৃষ্টাব্দে উপনীত হই। এই সময়ে অথবা ইহার কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে শাহজাদা মকদুমদৌলা বঙ্গদেশে আগমন করেন। আমাদের নির্দ্দেশ ঠিক হইলে বলিতে হইবে যে, মকদুম সাহেব মহাপুরুষ মোহাম্মদের শিষ্য মোয়াজউদ্দীন জবলের পুত্র নহেন, বংশধর। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বহুসংখ্যক মোসলমান সাধু বোখারা হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন ইতিহাসে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। মকদুম সাহেবকে তাঁহাদের অন্যতম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।*

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ।

ক্ষুদ্র হয়ে তবু করি যতন অশেষ,
গড়িছে প্রবালকীট কত দ্বীপ দেশ।
অতিকায়-তিমি শুধু ফিরে গর্ব্ব ভরে,
ফুৎকারে সমুদ্রজল তোলপাড় করে।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

---

* Journals of the Asiatic Society of Bengal 1896.

তিব্বত অভিযান।

হিমাচল বক্ষে।

৭ই নবেম্বর প্রত্যুষে চা পানের পর আমরা পুনরায় রওনা হইলাম। এখন আমরা তীস্তার দক্ষিণ তট দিয়া গমন করিলাম। নিবিড় জঙ্গল মধ্য প্রবাহিতা তীস্তার সৌন্দর্য্য ও সেই ভ্রমণ বৃত্তান্ত জীবনে কখনও ভুলিব না। যেদিকে দেখি কেবল জঙ্গল ও অনন্ত হিম-মুকুট-শোভিত হিমাচলের অপরূপ মনোরম শোভা; আর কিছুই দেখা যায় না;—তাহাও ঠিক কথা নহে। মস্তকের উপর অনন্ত নীল আকাশ, ক্রমে ক্রমে দূরে হিমালয়ের অনিন্দ্য শুভ্র মহাকায়ের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। প্রতি মুহূর্ত্তে ঐ স্বর্গীয় দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইতে ছিল, যেন আজি কোনও অদৃশ্য কারিকর স্বীয় বায়োস্কোপযন্ত্রের দৃশ্যাবলি আমাদের চক্ষের সম্মুখে খুলিয়া দিয়াছেন। নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, কবির হৃদয় লইয়া জন্ম গ্রহণ করি নাই। তাহা হইলে আজ মনের সাধে ঐ দুর্লভ দৃশ্যের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিতাম।

মধ্যে মধ্যে আমরা দুই চারি জন স্থানীয় অধিবাসীকে দেখিতে পাইতেছিলাম। শুনিলাম, ইহারা শীকার অথবা কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য এই গভীর জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের মধ্যে নেপালী,লাপ্‌চা ও তিব্বতিয়েরাই প্রধান। ইহারা জঙ্গলের এক এক স্থানে কুটির নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছে। আমরা এই পথে আসিয়াছি শুনিয়া তাহারা সোণালু (হরিদ্রা বর্ণ বিশিষ্ট এক প্রকার সুমিষ্ট পার্ব্বত্য ফল; খাইতে অনেকটা নাস্‌পাতির মত) নারঙ্গি প্রভৃতি ফল রাস্তার ধারে, সাজাইয়া রাখিয়াছে। শুনিলাম, এই নারঙ্গি সিকিমে অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। এক আনা সের দরে আমরা প্রায় সকলেই কিছু কিছু খরিদ করিলাম। এই নারঙ্গি শ্রীহট্টের কমলা অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে হইল না।

অদ্য প্রাতঃকালে আমরা দেখিলাম—কোনও সময়ে এই জঙ্গলের মধ্যে একটি পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল, উহার নিদর্শন এখনও বেশ স্পষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম যে, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল গ্রাহামের সৈন্যদলের জন্য চুম্বী পর্য্যন্ত এই পথ প্রস্তুত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য আমরা সকলে এই পথ অনুসরণ করিতেছিলাম। এই সুবিধা সত্ত্বেও আমরা পদে পদে পথের দুর্গমতা অনুভব করিলাম। একদিকে অভ্রভেদি পর্ব্বত ও অপরদিকে সুগভীর খড় বা নিম্ন ভূমি। পূর্ব্বে এই খড়ের দিকে মজবুত বেড়া দেওয়াছিল।

ফল বিক্রেতাগণ।

এক্ষণে কিন্তু তাহা আর দেখিতে পাইলাম না। শুনিলাম, গাড়ী, ঘোড়া, বা যাত্রীরা মধ্যে মধ্যে এ খাদে পড়িয়া গিয়া একবারে ছাতু হইয়া যায়। সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের মধ্যে সেপ্রকার কোনও দুর্ঘটনা ঘটে নাই।

আজ বেলা এগারটার সময় কিয়ৎকালের জন্য গতি-রোধ করিয়া আহারাদি করিয়াছিলাম। তাহার পর বেলা একটার পর আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। ঘণ্টা দুই পরে আমরা তীস্তা পার হইলাম। ইহারই কিয়দ্দূরে ডার্লিংএর কয়লার খনি অবস্থিত। নদীর অদূরে রিয়াং গ্রাম। সিঙ্কোনা উৎপন্নের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট এখানে একটি কুঠি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। একজন ইংরাজ ইহার

অধ্যক্ষ। আমরা সে দিবস উহার সম্মুখে শিবির সন্নিবেশ করিলাম।

এই গ্রামের পাঁচ মাইল দূরে কালিম্‌পং। ইহা একটি উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গে অবস্থিত। শুনিলাম স্থানটি এ দেশে স্বাস্থ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। স্কচ মিশনের গ্রাহাম্ সাহেব এই স্থানে একটি অনাথ য়ুরোপীয় ও য়ুরেসিয়ান্ বালক--বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য একটি আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। যাহারা এক সময়ে হয়ত সমাজের কতকগুলা আবর্জ্জনার সৃষ্টি করিয়া দেশের পাপের স্রোত বৃদ্ধি করিত, তাহারা আজ গ্রাহাম্ সাহেবের নিঃস্বার্থ দয়াগুণে এই স্থানে সুস্থ ও সবল দেহে নানাপ্রকার কল্যাণময়ী বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া সমাজের শ্রী ও বল বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। হায় ইংরাজ পাদরী! কি বলিয়া তোমার প্রশংসা করিব? ধর্ম্মের ও দেশের মঙ্গলের জন্য তোমার অদ্ভুত স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত জগতে বড় বিরল। আফ্রিকা, আমেরিকা, ও এসিয়া খণ্ডের সহস্র সহস্র দুর্গম স্থানের নিরক্ষর বন্য অধিবাসীরা তোমার কৃপায়, সভ্যতার ও ধর্ম্মের আলোক লাভ করিতেছে।

এই কালিম্‌পংএর অনাথ আশ্রমের কয়েক মাইল দূরে পাদরী দেশ-গোডিন্‌স্ (Father Des-godins) সাহেব অবস্থান করেন। ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি স্বদেশ, স্বজন প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া এই গভীর অরণ্যে বাস করিতেছেন। প্রচার কার্য্যে তিনি প্রায়ই স্বীয় আবাস হইতে ১৫০, ১৬০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করেন। আজ প্রায় চারি বৎসর যাবৎ তিনি এই স্থানে আছেন। আমাদের ডাক্তার সাহেবের সহিত পাদরী সাহেবের পরিচয় ছিল বলিয়া তিনি আমাদের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বাক্যালাপে বুঝিলাম যে, তিনি এই নির্জ্জন স্থানে বেশ সুখে কাল যাপন করিতেছেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা তিনি জীবনটা এইখানেই কাটাইয়া দেন; কারণ, তাঁহার বিশ্বাস এখানকার অসভ্য অধিবাসীরা আজকাল ধীরে ধীরে সভ্যতার আলোক লাভ করিতেছে ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতি দিন দিন আকৃষ্ট হইতেছে। পাদরী সাহেবের তুষার শুভ্র শ্মশ্রু-গুম্ফ, তাঁহার সরল কথা বার্ত্তা, তাঁহার সর্ব্বভূতে সম ব্যবহার প্রভৃতি দর্শনে আমার প্রাচীন যুগের ঋষিদিগের কথা মনে পড়িল।

৮ই নবেম্বর। পরদিবস আমরা প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া রওনা হইলাম। প্রায় তের মাইল গমনের পর আমরা থিয়াংপংএ গতিরোধ করিলাম। আজ পথের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। অনেক স্থানে আমাদিগকে দুর্গম চড়াই সকল উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। পথ এত বন্ধুর যে, আমাদিগকে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া গমন করিতে হইয়াছিল। যে স্থানে আমরা শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলাম, তথায় কোনও গ্রাম ছিল না। স্থানটি সম্পূর্ণ নির্জ্জন। উত্তর পূর্ব্ব ও উত্তর-পশ্চিম দিকে বিশাল ও অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার হিমালয়, কোন অজ্ঞাত রাজ্যে যাইয়া মিশিয়াগিয়াছে। আমাদের চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা প্রকারের বৃক্ষ ও লতা। দূরবীণের সাহায্যে আমি বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করিলাম। কোনও প্রকার লোকালয়ের চিহ্নমাত্র দেখিলাম না। রাত্রি আটটার পর আমাদের শিবিরের সকলেই নিদ্রার বিমল অঙ্কে সমস্ত দিনের পথশ্রম বিস্মৃত হইলেন। আমি কিন্তু রাত্রি প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত জাগ্রত রহিলাম; কারণ, আমি সেই দিন প্রাতঃকালে দেশের ডাক পাইয়াছিলাম।

একখানা সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছি, এমন সময় অনতিদূরে ব্যাঘ্রের গভীর গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম। রায় মহাশয় ঠিক আমার পাশেই একখানা ক্যাম্প খাটে শুইয়াছিলেন। ঐ গর্জ্জনের পর তিনি সহসা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া একলম্ফে আমার খাটের উপর আসিয়া পড়িলেন। খাট নির্ম্মাতা অবশ্য এপ্রকার ব্যায়ামের জন্য ঐ খাট নির্ম্মাণ করে নাই। রায় মহাশয় লম্ফ দিবা মাত্র খাটখানা কবুল জবাব দিয়া তিনখণ্ড হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুই জনই ভূমির আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। যাহা হউক, সে রাত্রে ব্যাঘ্র মহাশয়ের আর কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। প্রাতঃকালে শুনিলাম, আমাদের সাহেবের একটা টেরিয়ারের কোনও সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। শিবিরের বাহিরে ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন দর্শনে তাহার গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোনও সন্দেহ রহিল না।

৯ই নবেম্বর। পর দিবস দ্বিপ্রহরের পর আমরা র‍্যাপো গ্রামে উপস্থিত হইলাম। ইহা সিকিম রাজ্যের অন্তর্গত। গ্রাম খানি একটি পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত। গ্রামের অধিবাসী সংখ্যা প্রায় ৬০০। এক প্রান্তে এক বিস্তৃত ময়দানের পার্শ্বে গ্রামের বাজার। আমরা সেই স্থানে শিবির সংস্থাপন করিলাম। এই গ্রামে আমাদের কমিশেরিয়েটের একটি প্রধান আড্ডা স্থাপিত হইয়াছিল। কারণ, সিলিগুড়ি হইতে এই গ্রাম পর্য্যন্ত গো-শকটের পথ ছিল। ইহার পর পথ অত্যন্ত দুর্গম বলিয়া দ্রব্যাদি এখান হইতে গরুর ও কুলির সাহায্যে প্রেরিত হইয়াছিল।

এই স্থানের প্রকৃত নাম রাম্‌পু। আমরা যখন ঐস্থানে উপস্থিত হইলাম, তখন দেখিলাম এই অভিযানের অনুগ্রহে উহা একটী নাতি ক্ষুদ্র নগরে পরিণত হইয়াছে। প্রায় ২৫০ খানা আটচালা নির্ম্মিত হইয়াছে। উহাদের প্রায় অর্দ্ধেক আমাদের দ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ; অপরার্দ্ধ কুলি, তাহাদের কর্ম্মচারী ও খচ্চর সমূহে পূর্ণ। দেখিলাম একটি ডাকঘর খোলা হইয়াছে। পোষ্ট মাষ্টার মহাশয় বাঙ্গালী। আমাদের আসিবার কয়েকদিন পূর্ব্বেই আসিয়া আফিস খুলিয়াছেন। দ্রব্যাদি দেখিবার ও রওনা করাইবার জন্য আমাদিগকে এই স্থানে কয়েক দিবস থাকিতে হইল বলিয়া আমরা তিনজন বাঙ্গালী মাষ্টার মহাশয়ের বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। দিনগুলা বেশ আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত হইতে লাগিল। মাষ্টার মহাশয়ের শিকারে খুব সক বলিয়া আমরা দুইজনে দিবসের অধিকাংশ সময় পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। শুনিলাম, এখান হইতে কয়েক মাইল দূরে একটা জঙ্গলে বন্য-হস্তী, ভল্লুক প্রভৃতি প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামের নিকটে কোন হিংস্র জন্তু বড় একটা দেখা যায় না। একদিন আমাদের ডাক্তার সাহেব রাত্রিকালে বিশেষ ভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িলেন।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

অভাব।

অভাব অভাব সুধুই অভাব!
অভাব তবে কি জগত ময়?
অভাবের বাস এখানে কি শুধু?
অন্যত্র অভাব নাহি কি রয়?
দিব কি উত্তর একথার আর?
—অভাব নিজের মনের মাঝে;
আকাঙ্খা পুরিত যাহাদের প্রাণ,
অভাব তাদের লাগিয়া আছে।
বাসনা বিহীন হতে যদি পার,
অভাব যাবেনা কখনো পাছে,
ধাতার দানে তুষ্ট যেই জন,
অভাব তাহার আসেনা কাছে।

শ্রীহৈমবতী দেবী।

গো-যান।

মানুষ সভ্য পদবীতে আরূঢ় হইলেই তাহার গতায়াতের সুবিধাজনক বিবিধ যানের আবশ্যকতা অনুভব করে। এবং তদনুসারে স্ব স্ব প্রতিভা বলে নানাপ্রকার যানের উদ্‌ভাবনা করিয়া থাকে। পুরাকাল হইতে অদ্যাবধি যে সকল যানের আবিষ্কার হইয়াছে, তন্মধ্যে গোযানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। কারণ অসমান পথে গতায়াতে গরু যেমন পটু, তাহার দ্বারা পরিচালিত যান ও তদনুরূপ নিরাপদ। পৃথিবীতে সমতল ভূভাগাপেক্ষা অসমান ভূভাগের মাত্রা অধিক সুতরাং নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজন নির্ব্বাহার্থ অসমান পথে গমন পটু যানের দিকেই সর্ব্বাগ্রে মানবের বুদ্ধি ধাবিত হওয়া সম্ভব।

"গোযান" সাধারণতঃ রথ এবং শকট এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যে চক্রযুক্ত যান যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত তাহার নাম—শতাঙ্গ স্যন্দন এবং রথ, যাহা যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত না, বিলাস ভ্রমণাদিতে নিযুক্ত হইত তাহা পুষ্যরথ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। যাহা বর্ত্তমান সময়ে গাড়ী নামে পরিচিত, তাহারই পুরাতন নাম শকট এবং অনস্।

রথ এবং শকট এই উভয়ের মধ্যে রথই যেন প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কারণ চক্রের একটি নাম রথাঙ্গ এই যোগরূঢ় নাম দেখিয়া বোধ হয় চক্রের সাহায্যে প্রথমতঃ কেবল রথই পরিচালিত হইত, এবং রথের একশত অবয়বের মধ্যে চক্রের প্রাধান্য বশতঃ তাহাই রথাঙ্গ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শতাঙ্গের নির্ম্মান এবং চালন—প্রয়াস সাধ্য, এবং সর্ব্বত্র এই বিপুল কায় পদার্থের আবশ্যকতাও অনুভূত হয় না সুতরাং পাখোয়াজ হইতে তবলার উৎপত্তির ন্যায় বৃহৎকায় রথ হইতে ক্ষুদ্র প্রয়োজন সম্পাদনোপযোগী ক্ষুদ্রকায় শকটের আবিষ্কার হইয়াছে। আচ্ছাদিত যে ক্ষুদ্র রথ রমণীদিগের গতায়াতে ব্যবহৃত হইত, তাহার নাম—কর্ণীরথ প্রবহণ এবং ওরণ। যদিও অমরকোষ প্রভৃতিতে তিনটি নাম দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু সাহিত্যে ওরণ শব্দের প্রয়োগ প্রায় দেখা যায় না। কালিদাসের বর্ণনায় "কর্ণীরথে"র পরিচয় পাওয়া যায়।

'কর্ণীরথস্থাং রঘুবীর পত্নীম্" (রঘুবংশ ১৪)।

শূদ্রকের লেখনীর কৃপায় মৃচ্ছকটিকে প্রবহণ বিশেষরূপেই পরিচিত হইয়াছে।

রথ এবং শকট এই উভয় যানই গরুর দ্বারা চালিত হইত, প্রাচীনগ্রন্থে এই বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই। উপনয়নের পর গুরুকুলে বেদপাঠ সমাপ্ত করিয়া সমাবর্ত্তনের পর যে সকল বস্তুর মন্ত্র পূর্ব্বক ব্যবহার বিহিত হইয়াছে, তন্মধ্যে রথের উল্লেখ আছে; এই রথের আরোহণ মন্ত্রে রথবাহক গরুর সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

যথা—"হে বনস্পতি বিকার (কাষ্ঠময়) রথ! তুমি স্থিরাবয়ব হও। এবং আমাদের সখা (মিত্রস্বরূপ) হও। প্রতরণ অর্থাৎ দুর্গম পথ হইতে তরণের উপায় হও। এবং সুন্দর সারথিযুক্ত হও। তুমি গো সকলের সহিত যুক্ত হইয়াছ; অতএব আমাদিগকে তীব্র বেগযুক্ত কর।"

ঋগ্বেদের ৮ মণ্ডলের ৫৩ সূক্তে রথ এবং রথবাহক গরুর উল্লেখ আছে। *

যে জিনিস প্রথমতঃ কেবল কোনও প্রয়োজন নির্ব্বাহের অভিপ্রায়ে উদ্‌ভাবিত হয়, ক্রমে তাহা বিলাসিতার উপকরণ মধ্যে পরিগণিত হইলে আদিম অবস্থার প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, ইহা সচরাচর প্রত্যক্ষ হইতেছে। এই রীতি অনুসারেই বোধ হয় রথ বহনের ভার ক্রমে গরুর স্কন্ধ হইতে অশ্ব এবং অশ্বতরীর স্কন্ধে নিহিত হইয়াছিল। ইহার ফলেই রথবাহক অশ্বের এবং অশ্বতরীর বর্ণনায় প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের কলেবর পরিপূর্ণ হইয়াছে। অশ্বতরীযুক্ত রথ বিশেষ বিলাসিতার জিনিসরূপে পরিচিত হইয়াছিল; ইহা বিশিষ্ট উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইত। ছান্দোগ্যোপনিষদের একটি আখ্যায়িকা পাঠে জানা যায়—রাজা জানশ্রুতি উপদেশ

* ঋগ্বেদ বর্ত্তমান সময়ে অজাতশ্মশ্রু বালকের ক্রীড়ণক রূপে ব্যবহৃত হইতেছে, এই হেতু আমি কোন প্রবন্ধেই ঋগ্বেদের প্রমাণ উদ্ধৃত করিনা, সুতরাং নাম এবং স্থান মাত্রের উল্লেখ করিয়াই নিবৃত্ত হইলাম।

পাইবার অভিলাষে রৈক্ক ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ছয় শত গো একটি নিষ্ক (কণ্ঠহার) এবং অশ্বতরী যুক্ত রথ প্রদান করিয়াছিলেন।

রৈক্কেমানি ষট্‌শতানি গবাময়ং নিষ্কোঽয় অশ্বতরী রথোঽনুম এতাং ভগবোদেবতাং সাধি যাং দেবতামুপাস্সে ইতি—৪ অধ্যায়।

রথ বিলাসোপকরণে পরিণত হইলে তাহার নানা প্রকার সাজ সজ্জার উদ্ভাবন হইয়াছিল। এমন কি শুধু আবরণের পার্থক্যানুসারে ইহার বিভিন্ন সংজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। পাণিনির কয়টি সূত্র এই স্থলে উল্লেখ যোগ্য।

'পরিবৃতোরথ' ৪।২।১০। তাহার দ্বারা পরিবৃত হইয়াছে, রথ, এই অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় হয় যাহারা সমস্ত অবয়ব আবৃত হইয়াছে পরিবৃত শব্দে তাহাকে বুঝায়। (কাসিকা) বস্ত্রের দ্বারা পরিবৃত রথ বস্ত্রে, কম্বলাবৃত রথ কাম্বল এবং চর্ম্মাবৃত রথ-চার্ম্মণ।

"পাণ্ডুকম্বলাদিনিঃ"—৪।২।১১। পূর্ব্বোক্ত অর্থে পাণ্ডু কম্বল শব্দের পর ইনি প্রত্যয় হয়। পাণ্ডুকম্বলের দ্বারা আবৃত রথ—পাণ্ডুকম্বলী। পাণ্ডুকম্বল শব্দ রাজাস্তরণ কম্বল বিশেষকে বুঝায়।

"দ্বৈপবৈয়াঘ্রাদঞ্" ৪।২।১২ দ্বৈপ এবং বৈয়াঘ্র শব্দে দ্বীপি এবং ব্যাঘ্রের চর্ম্মকে বুঝায়। দ্বৈপ এবং বৈয়াঘ্রের দ্বারা পরিবৃত রথ অর্থে অঞ্ প্রত্যয় হয়। দ্বৈপরথ বৈয়াঘ্ররথ।

ক্রীড়ার্থ ভ্রমণাদিতে ব্যবহৃত পুষ্যরথের শিশুপাল বধে যে বর্ণনা দেখাযায়, তাহাতে বোধ হয় ইহার নির্ম্মাণে বিশেষ কৌশল প্রযুক্ত হইত। যথা—"রথাঙ্গী" (কৃষ্ণ) ইষ্ট সিদ্ধির সম্পাদক সর্ব্বদিকে অপ্রতিবিদ্ধ গতি অর্থাৎ যাহার গতি কোন দিকেই প্রতিহত হয় না ঈদৃশ পুষ্যরথে আরোহণ করিয়া পুষ্যানক্ষত্রগত বস্ত্রের ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন। সর্ব্বদিকে অর্থাৎ সম বিষম পথে গতির অপ্রতিঘাত সম্পাদন করিতে হইলে কিরূপ নৈপুণ্যের আবশ্যকতা তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

শকট গোমহিষাদি বিভিন্ন শ্রেণীর জন্তুর দ্বারা চালিত হইত, এক জাতীয় শকট কেবল গরুতেই বহন করিত, এবং তাহা গন্ত্রী নামে পরিচিত হইয়াছিল। "গন্ত্রীকাম্বলি বাহ্য কম্" অমর)।

গোচালিত শকটের স্বতন্ত্র সংজ্ঞা দেখিয়া সাধারণ শকটে অন্যান্য জন্তুর বহনাধিকার সহজেই অনুমেয়। বাহকের সংখ্যানুসারেও শকটাদির বিভিন্ন সংজ্ঞা দেখা যায়। চারিটি গরু অথবা মহিষে যে শকটকে বহন করে, তাহার নাম চাতুরগ (সিদ্ধান্ত কৌ)।

নারীদিগের বহনোপযোগী প্রবহণ টানিতে বলিবর্দ্দেরই নিয়োগ হইত,। অন্ততঃ মৃচ্ছকটিকের সময় পর্য্যন্ত এই রীতিরই পরিচয় পাও যায়। কারণ চারুদত্তের মত উমরাও নায়কের সহিত উদ্যানে মিলনাভিলাষিণ বসন্তসেনার মত বারমুখ্যা নায়িকার প্রবহণ টানিতেও কবি প্রবর বলদেরই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। শূদ্রকাপেক্ষা অর্ব্বাচীন কবি মাঘের বর্ণনায় রমণী বহনে নিযুক্ত লঘবী নামক এক প্রকার যানের পরিচয় পাওয়া যায়। * এই লঘবী করভ অর্থাৎ এক প্রকার সঙ্কর জাতীয় অশ্বের † দ্বারা চালিত হইত, তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়। হেমচন্দ্রের মতে লঘবী এক প্রকার স্যন্দন অর্থাৎ রথ। §

বর্ত্তমান সময়ে দেবতার জন্য যে রথ প্রস্তুত হয়, তাহাতে বহু চক্রের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্বকালের সাহিত্যে "দ্বিচক্র স্যন্দনঃ যথা" ইত্যাদি দৃষ্টান্তে দুইটি মাত্র চক্রের উল্লেখ আছে।

গোযানে আরোহণ পাপ জনক বলিয়া অদ্যাপি স্থানে স্থানে বিবেচিত হইয়া থাকে। যে দেশে এই কল্পিত পাপের আশঙ্কা, তথায় কিছুদিন পূর্ব্বেও গোযান সাধারণের দৃষ্টি গোচর হইবার কারণ ছিল না। অভিনব রীতির অনুসরণ করিতে হইলে নানা প্রকার খুঁটিনাটি সমাজে দেখা দেয়, ইহা এক প্রকার সাধারণ নিয়ম।

* এতো সমাসন্ন করেনু সূৎকৃতা ন্নিয়স্তরি ব্যাকুল মুক্তরজ্জুকে।

† কিণ্ডাব রোধাঙ্গন মুৎ পথেন গাং বিলঙ্ঘ্য লঘবীং কর ভৌ বভঞ্জতুঃ। ১২স ২৪।

§ "করভো বেসরেঃ প্যাষ্ট্রে ইতি সজ্জনঃ।
লঘবী লাঘব যুক্তায়াং প্রভেদে স্যন্দন স্যচ।"

বিশেষতঃ হিন্দুর পরমারাধ্য গো জাতির অবমাননায় পাপের আশঙ্কা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না।

কিন্তু পূর্ব্ব প্রদর্শিত প্রমাণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আশঙ্কার কোন কারণ থাকে না। অধিকন্তু বাঙ্গালীর মুখ পাত্র মহাত্মা কুল্লুকভট্ট এই বিষয়ের সুমীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। যথা ভগবান মনু বলিয়াছেন—

"গবাশ্ব যানঃ পৃষ্ঠেন সর্ব্বথৈব বিগর্হিতম"। ৪।৭২

গরুর পৃষ্ঠে গমন সর্ব্বতো ভাবে নিষিদ্ধ। এই স্থানের ব্যাখ্যায় কুল্লুক বলিয়াছেন—"পৃষ্ঠেনেত্যভিধানাদাকৃষ্ট শকটা দৌন দোষঃ।" পৃষ্ঠে আরোহণ করিবেনা এই উক্তিতে বুঝিতে হইবে যে গরুর দ্বারা আকৃষ্ট শকটাদিতে আরোহণে কোন দোষ নাই। ভাষ্যকার মেধাতিথিও বলিয়াছেন "গন্ত্রী প্রভৃতি গোচালিত যান পৃষ্ঠ-যান নহে সুতরাং তাহাতে কোন দোষ নাই।"

"গন্ত্রাদি যুক্তে যুক্তে পৃষ্ঠ যানত্বাদ প্রতিষেধঃ।"

উপসংহারে বক্তব্য এই যে গোযানের বিষয় আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, রথের বিষয় প্রসঙ্গতঃ সামান্য দুচার কথা বলা হইয়াছে মাত্র। হিন্দু শিল্পে রথ অতি উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার আলোচনা সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

রসায়ণ বিদ্যার উৎপত্তি

বর্ত্তমান ইউরোপীয় "কেমিষ্ট্রি" বিদ্যা পূর্ব্বে "আলকিমি" নামে অভিহিত হইত। "আলকিমি" বিদ্যার তুল্য "রসায়ণ" নামে এক বিদ্যার চর্চ্চা ভারতবর্ষেও হইয়াছিল। এস্থলে আমরা "কেমিষ্ট্রি" ও "রসায়ণ" উভয় বিদ্যাকেই "রসায়ণ" নামে উল্লেখ করিব। এই রসায়ণ বিদ্যার উৎপত্তি ইউরোপে ও ভারতে কিরূপে সাধিত হইয়াছে ও এই বিদ্যার বীজ মানব সভ্যতার কোন্ অতীত যুগে উপ্ত হইয়াছে তাহা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ নানা দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও গ্রন্থ প্রভৃতি আলোচনা করিয়া কতক পরিমাণে নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব, কিরূপে এই বিদ্যা প্রাচীন কাল হইতে মানবের চিত্ত আকার্ষণ করিয়া বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞান পদবী লাভ করিয়াছে।

ডাইওস্কোরাইডিস, প্লিনি ও নষ্টিক সম্প্রদায় খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহাদিগের পুস্তকাবলী হইতে জানা যায় যে তাম্রকে সুবর্ণ ও রজতে পরিণত করিবার প্রণালী তাঁহাদের সময়ে পরীক্ষা সিদ্ধ ফল বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে জুলিয়াস ফারমিকসের ফলিত জ্যোতিষ গ্রন্থে নিকৃষ্টধাতুকে সুবর্ণাদি উৎকৃষ্ট ধাতুতে পরিণত করিবার বিদ্যাকে "কিমিয়া" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে "কিমিয়া" শব্দ এই অর্থে কোন স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। জোসিমস নামে এক প্রসিদ্ধ রসায়ণ বিদ্ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে প্যানোপলিস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে "কিমিয়া" বিদ্যা "কিমিউ" নামক এক গুহ্য পুস্তক হইতে লাভ করা হইয়াছে বলিয়া ঐ বিদ্যার নাম "কিমিয়া"।

প্রাচীন মিশরীয়গণ স্বদেশকে "কমিৎ"অর্থাৎ কৃষ্ণদেশ বলিত; কারণ সে দেশের মৃত্তিকা কৃষ্ণ বর্ণ। অনেকে মনে করেন যে এই "কমিৎ" শব্দ হইতে "কিমিয়া" শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে। এরূপ মনে করিবার বিশিষ্ট কারণও আছে। নিম্ন লিখিত ঐতিহাসিক তত্ত্ব গুলি দ্বারা ইহার উপলব্ধি হইবে। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৩৬৬ অব্দে তেতা বা এথোথিস নামে এক রাজা মিশরে রাজত্ব করিতেন। প্রবাদ আছে যে তিনি শারীর সংস্থান বিদ্যার এক পুস্তক রচনা ও তাঁহার মাতা "শেষ" কেশ বৃদ্ধির জন্য এক প্রকার তৈল প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছিলেন; "এবার" দ্বারা ক্রীত ভূর্জ্জপত্রেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

খৃষ্টের ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিশরীয়গণ তাম্র অস্ত্র ব্যবহার করিত। কিন্তু খৃষ্টের পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহাদিগের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। রাজা দ্বিতীয় রামসেসের সময়ে (খৃষ্টের পূর্ব্ব ১৩৪৫ অব্দে) বারকোটী পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড (sterling) মূল্যের সুবর্ণ প্রতিবৎসর মিশরে আনীত

হইত। নিউবিয়া দেশ হইতে পাওয়া যাইত বলিয়া মিশরীয়গণ স্বর্ণকে 'নুব' বলিত। তাহারা কঠিন অস্ত্রাদি লৌহ দ্বারা ও অপরাপর অস্ত্রাদি পিত্তল দ্বারা প্রস্তুত করিত। তাম্র ও পিত্তল আবিষ্কারের পর লৌহ মিশরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। লৌহগলনোপযোগী অগ্নিকুণ্ডে ভস্ত্রা বা ভাতি যন্ত্রের সাহায্যে তাহারা লৌহ প্রস্তুত করিত। পিরামিড গাত্রে খোদিত চিত্রাবলীতে লৌহগলনের এবম্বিধ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কালেও আফ্রিকা মহাদেশের নানাস্থানে প্রাচীন মিশর দেশীয় ভাতি যন্ত্র (বা হাপর) ব্যবহার করিতে দেখা যায়। পূর্ব্বে সম্ভবতঃ পিঙ্গলবর্ণ আকর (Brown Hematite) ও চৌম্বিক আকর (Magnetite) হইতে লৌহ গলন সম্পন্ন হইত।

অতি প্রাচীন কালে মিশরে কাচ প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়া ছিল। সম্ভবতঃ নিম্ন লিখিত রূপ ঘটনায় অযাচিত ভাবে মিশরীয়গণ ইহা লাভ করিয়াছিল। মিশর দেশে সর্জ্জিকা ক্ষার (sodium carbonate or Trona) স্বাভাবিক অবস্থায় বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। বালুকা মিশ্রিত সুবর্ণ হইতে মিশরীয়গণ সুবর্ণ পৃথক করিবার নিমিত্ত খুব সম্ভব সর্জ্জিকা ক্ষার সহযোগে উহা উত্তপ্ত করিয়া থাকিবে। বালুকা ও সর্জ্জিকা-ক্ষার একত্র উত্তাপ সংযোগে কাচে পরিণত হইতে দেখিয়া কাচ প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মিশরে এই শিল্পের সমূহ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। মিশরীয়গণ এনামেল ও কৃত্রিম মণি মাণিক্য প্রস্তুত প্রণালীও আবিষ্কার করিয়াছিল। খৃষ্টের পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীকগণ ইহাদের নিকট হইতে কাচ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা লাভ করেন।

প্রাচীন মিশরের প্রত্যেক দেব মন্দিরের মধ্যে একটি করিয়া পরীক্ষাগার নির্দ্দিষ্ট থাকিত। ডেণ্ডেরা ও এডফুর মন্দিরস্থ কক্ষ মধ্যে চিত্রাবলী ও চিত্রলিপি সকল ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সকল পরীক্ষাগারে নানাবিধ ও নানা বর্ণের কাচ, বস্ত্রাদি রঞ্জনোপযোগী রং এবং ধাতু, নানা ভেষজ ও পচন নিবারক ঔষধ প্রস্তুত করণ প্রণালী সম্বন্ধে গবেষণা হইত। দেশীয় পুরোহিতগণ এই সকল শিল্প বিদ্যা অতি গোপনীয় ভাবে রক্ষা করিত। রাজা ও রাজ পুত্র ব্যতীত অপর কেহ এই বিদ্যা লাভে অধিকারী ছিল না। কিন্তু চিরকাল ইহা স্বদেশে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে মিশরীয়গণ সক্ষম হয় নাই। ফণিক, য়িহুদী গ্রীক ও রোমানগণ মিশরীয় দিগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া এই সকল বিদ্যা আয়ত্ত করতঃ স্ব২ দেশে প্রচার করিয়াছেন। পিথাগোরস (৫৮০—৫০০ খৃঃ পূর্ব্ব), সোলন (৫০০—৪০০ খৃঃ পূঃ) ডেমোক্রিটস (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী) ও প্লেটো (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী) মিশরীয় বিদ্যার প্রচারক ছিলেন।

গ্রীক দেবতা "ত্রি-গুণিত-মহান্ হার্মিস" সর্ব্ব প্রকার শিল্প ও বিজ্ঞানের আবিষ্কার কর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। নিকৃষ্ট ধাতু উৎকৃষ্ট ধাতুতে পরিণত করিবার বিদ্যা ইনিই উদ্ভাবনা ও গ্রন্থাকারে লিপি বদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া গ্রীক ও রোমানগণ মনে করিতেন। এই নিমিত্ত রোমানদিগের অধিকার কালে হার্মিসের উদ্দেশে বহু স্তম্ভ মিশরদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল স্তম্ভের উপরিভাগে, ধাতু পরিবর্ত্তন বিষয়িণী নানা কথা চিত্র লিপি যোগে অঙ্কিত রহিয়াছে। কিন্তু এই গ্রীক দেবতা যে প্রাচীন মিশরীয়দিগের থটদেব ভিন্ন অপর কোন দেবতা নহেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ আছে। নীলনদের তীরবর্ত্তী ডক্কের মন্দিরে থটদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মন্দিরে মিশরীয় চিত্রাক্ষরে ও গ্রীক এবং রোমান অক্ষরে উৎসর্গ পত্র খোদিত রহিয়াছে। অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায় এই খোদিত উৎসর্গ পত্রে থট, হার্মিস ও মার্কুরিয়স এই তিনটী নাম বর্ত্তমান। প্রথম নাম চিত্রাক্ষরে, দ্বিতীয় গ্রীক ও তৃতীয় রোমান অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে গ্রীক দেব হার্মিস, রোমান দেব মার্কুরিয়াস ও মিশরের থট দেবতা অভিন্ন অথবা মিশরের এই থটদেবই গ্রীসে হার্মিস নামে এবং ইটালিতে মার্কুরিয়াস নামে পূজিত হন। অতএব মিশরেই যে সর্ব্বপ্রকার শিল্প ও বিজ্ঞানের এবং "কিমিয়া" বিদ্যার সূত্রপাৎ হইয়াছিল এবং এই সকল শিল্প ও তাহাদের অধিপতি থট নামক দেবতাকে গ্রীক ও রোমানগণ মিশরীয়দিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

"লীডেন ভূর্জ্জপত্র" নামে যে প্রসিদ্ধ ভূর্জ্জপত্র মিশরের থীবসনগর হইতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা সম্ভবতঃ ৩০০ শত খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু উহার রচনার কাল জানিবার কোন উপায় নাই। ফরাসী পণ্ডিত বার্থেলো ইহার অর্থ অতি যত্ন সহকারে উদ্ধার করিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মূল্যবান ধাতু প্রস্তুত করণ, বস্ত্রাদিরঞ্জন ও নানাবর্ণের কাচ প্রস্তুত করণ প্রণালী ইহাতে বর্ণিত আছে। রসায়ণ বিদ্যার চর্চ্চা অপেক্ষাকৃত আধুনিককালেও যে মিশরে প্রচলিত ছিল, তাহা ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

কালের ডায়রী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নিরাশ্রয়ের কথা।

ভগবান বিষ্ণু আমাকে অনাদি বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছেন; সুতরাং আমি অনাদি। আমি সেই অনাদি কাল হইতে সুখ, দুঃখ ও দৈন্যকে বুকে করিয়া ছুটিয়াছি। সে একদিন কাঙ্গালবেশে আসিয়া আমার স্মরণ লইয়াছিল; সে সময় এই বিপুল সংসারে সে নিরাশ্রয়। আমি তাকে ফেলিতে পারিলাম না। অসহায়কে আশ্রয় দেওয়াই আমার কার্য্য। গর্ব্বীত এবং অত্যাচারীকে শাস্তি দেওয়াও আমার সীমার বাহিরে নহে।

আমি মানবের স্পর্দ্ধা ও গর্ব্বের ভস্মস্তূপ—জগতের ধন জন শোভা সম্পদের নশ্বরত্বের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। আমি নিত্য নবভাবে কত অরুন্তুদ করুণ কাহিনীর অভিনয় করিয়া যাইতেছি, সুখের অট্টহাস্যে গগন মেদিনী প্লাবিত করিতেছি. ঐশ্বর্য্য মদের প্রমত্ত তাণ্ডবে জগৎ প্রকম্পিত করিয়া তুলিতেছি এবং তাহার ফলে জগতে তোমরা নিত্য নব নব সত্যের লীলা খেলার অভিনয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছ।

মানুষ যখন সম্পদের মাঝখানে অবস্থান করে, তখন আমায় বড় গ্রাহ্য করিতে চায় না; কিন্তু সে যখন কাঙ্গালবেশে আমার দ্বারে এসে দাঁড়ায়, তখন আর আমি তাকে হেলায় ফেলিতে পারি না। সে তখন আমায় বেশ চিনতে পারে। জগতের এই উত্থান পতন ও সুখ দুঃখের চিত্র আমার হৃদয় ফলকে খোদিত হইয়া যায়। সে স্মৃতি আমি ভুলতে পারি না। আমার সেই ডায়রী জীর্ণ হয় না, নষ্ট হয় না। আমার ডায়রীর পৃষ্ঠা যে এরূপ কত কীর্ত্তি কাহিনীতে রঞ্জিত হয়ে রয়েছে,

লক্ষ্মীনারায়ণের প্রাচীন মন্দির।

তার সংখ্যা নাই। সে ডায়রীর এক পৃষ্ঠা আজ সৌরভের পাঠককে উপহার দিতে প্রয়াস পাইব।

সে দিনটী আমার বেশ মনে হইতেছে। তখন খরস্রোতা নরগুন্দা বেশ বুক ভরা প্লাবন লইয়া প্রবাহিত হইত। কত সওদাগর সেই জলস্রোতে তরী ভাসাইয়া চলিত, কত লবণের স্তূপ আসিত যাইত, কত যাত্রী আপন মনে অবাধে চলিয়া যাইত—সে অতীত কালের

"কৃষ্ণদাসের জীর্ণ-গৃহের প্রাঙ্গনে এই অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল"।

অতীত কথা স্মরণ করিয়া আজ ফল নাই সত্য, কিন্তু এই উত্থান পতনের চিত্র চিরকাল মানব সমাজকে দেখানই আমার ব্যবসা।

সেই যে দিনের কথা বলিতেছি—একদিন নববসন্তের স্নিগ্ধ প্রদোষে দেখিলাম—সে নিতান্ত দরিদ্র, একটী ভাঙ্গা ঘটি সম্বল, ম্লান মুখে আসিয়া আমার স্মরণ লইল। কেউ জানে না, কোথা থেকে সে এল, কোথাইবা তার বাড়ী ঘর। তখন যুবকের মাথা রাখিবার একটু স্থান নাই। উদরে অন্ন নাই, অঙ্গে বসন নাই; রুক্ষ কেশ, শীর্ণ দেহ, কে আশ্রয় দেয়? আশ্রয়ের অন্বেষণে ফিরিতেছে সে যুবক। বুঝিলাম আমি ভিন্ন আর জগতে দরিদ্রকে আলিঙ্গন করে এমন কেউ নাই। আমি সেই পথের কাঙ্গালকে আমার বুকে তুলে নিলাম; সে নিশ্বাস ফেলিয়া যেন প্রাণে বল সঞ্চয় করিল।

জগতের কিছুই আমার অগোচর নাই। আমি সেই ভিখারীকেও জানিতাম, তবু তার পরিচয় লইলাম। সে বলিল—"আমার নাম কৃষ্ণদাস, পূর্ব্ব নিবাস বারপাড়া। দারিদ্র্যের প্রবল নিষ্পেষণে, তদুপরি জমিদারের খাজানার ভীষণ পীড়নে আমি এই একটী ভগ্ন ঘটী, সাতটী শিশু সন্তান ও স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া ভগবানের নাম করিতে করিতে গৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমি এখন নিরাশ্রয়।"

আমি সেই নিরাশ্রয় যুবককে সাদরে বরণ করিয়া লইলাম। যুবক এই নদী তটের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া এই স্থান টুকুর জন্য বিশেষ প্রলুব্ধ হইল। ভূমিটুকুও সেই দীন দরিদ্রকে বরণ করিয়া লইল। দিন চলিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আশ্রিতের কথা।

ব্রহ্মপুত্রের এক প্রবল স্রোত নরশুন্দা দিয়া প্রবাহিত হইত, তাই নরশুন্দা খরস্রোতা ছিল। নরশুন্দাতটে ইংরেজ ফরাসি ও পুর্ত্তগীজদিগের কুঠি ছিল। এই সকল বণিক সম্প্রদায় তখন শুকনা মাছ, তঞ্জাব ও লবণ প্রভৃতির ব্যবসা করিত। "ঢাকাই মসলিন" নামে যে মসলিন তখন ঢাকা হইতে আরব্য, পারস্য ও চীনে রপ্তানি হইত, দিল্লীর বাদশাহ, বেগমগণের চিত্ত রঞ্জনের

জন্য যে মসলিন ব্যবহার করিতেন, তাহার অধিকাংশ এই নরগুন্দাতট হইতে ঢাকায় যাইত এবং "ঢাকাই মসলিন" নামে পরিচিত হইত।

এই নরগুন্দাতটে সেই নিরাশ্রয় কৃষ্ণদাস কোন প্রকারে একটু মাথা রাখিবার স্থান করিয়া বাস করিতে লাগিল।

* * * *

সহসা আর এক দিন দেখিলাম কৃষ্ণদাসের জীর্ণ গৃহপ্রাঙ্গণ স্তূপাকার ইষ্টক রাশীতে সমাচ্ছন্ন! কৃষ্ণদাস ভারি ব্যস্ত। তার বুকে অদম্য উৎসাহ, প্রাণে প্রভূত বল। সেই ব্যস্ততার মধ্যেই কৃষ্ণদাস বলিতে লাগিল "আপনার যে অবশ্যম্ভাবী বিধানে, জগতে নিত্য নূতন উত্থান পতনের চিত্র প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, সেই বিধানে আমারও এই পরিবর্ত্তন। আমি কৃতজ্ঞতার সহিত আমার জীবনের এই অংশ বলিয়া যাইতেছি, আপনি শ্রবণ করুণ"।

"আমি এই—পর্ণ কুটীরে মাথা রাখিবার স্থান করিলে পর আমার চক্ষু এখানকার ব্যবসা বাণিজ্যের উপর পতিত হইল। আমি তখন ইংরেজ ও ফরাসি কুঠিতে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। অল্পদিন মধ্যে তাঁহাদিগের শুভদৃষ্টি আমার উপর পতিত হইল, আমি তাঁহাদের অনুগ্রহ লাভ করিলাম। এই সময় একটী অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়া গেল, একদিন শুভ সন্ধ্যার নিবিড় আঁধারে, এক সন্ন্যাসী আসিয়া আমার পর্ণকুটীরে আবির্ভূত হইলেন। তখন বাড়ীতে কেহই ছিল না। জটাজূট ভূষিত সন্ন্যাসী দেখিয়া আমার স্ত্রী ভীতা হইলেন। সন্ন্যাসী গোপনে, আমার অগোচরে আমার স্ত্রীকে একটী শালগ্রাম শিলা প্রদান করিয়া বলিলেন "মা আমি বিশেষ কারণে তীর্থে যাইতেছি, এই লক্ষ্মীনারায়ণ তোমার নিকট রাখিয়া যাইব। এই গৃহ দেবতা যতদিন তোমার গৃহে থাকিবে,
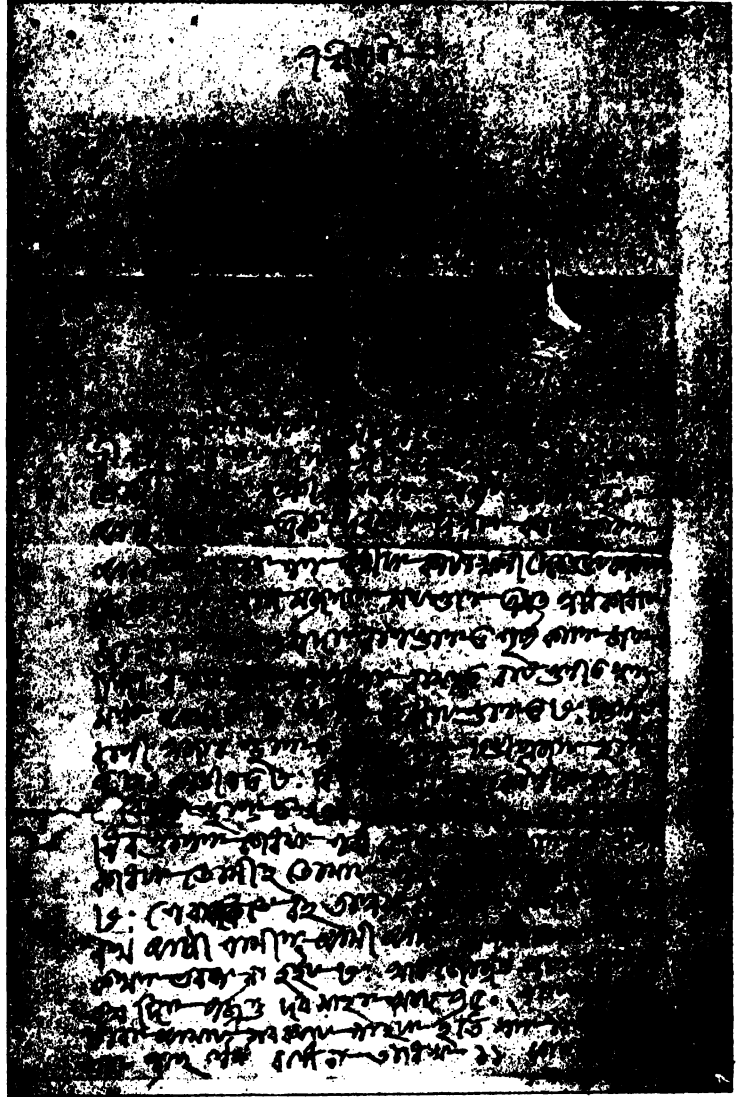
তত দিন [তোমার] কোন দুঃখ নাই। ইহাকে আশ্রয় দাও ইঁহার চিন্তা ইনিই করিবেন।" হিন্দুরমণী লক্ষ্মী নারায়ণের নামে মুখ ফুটিয়া "না" কথাটী বলিতে পারিলেন না; নিজ অবস্থা চিন্তা করিয়া কেবল অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিলেন। উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া সন্ন্যাসী সেই রাত্রির আঁধারে গা ঢাকা দিলেন।

"যে দিন এই নূতন অতিথি গৃহে আসিল সে দিন

আমার বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন হইল। অধিক রাত্রে গৃহে আসিয়া যখন এই নূতন অতিথির কথা শুনিলাম, তখন প্রাণে বড় একটা সুখ অনুভব করিলাম। ইহার পর হইতে আমার দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। নিত্য নূতন অর্থাগমের পন্থা বাহির হইতে লাগিল। আমার বিশ্বাস—লক্ষ্মীনারায়ণের শুভ আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই আমার শুভ দিন দেখা দিয়াছে। তাই লক্ষ্মী নারায়ণের জন্য বাড়ী ও মন্দির নির্ম্মাণ করিবার উদ্যোগ করিলাম। আপনি সর্ব্বদর্শী সর্ব্ব নিয়ন্তা—আপনার বিধানই আমরা মাথা পাতিয়া লইতেছি।"

নরসুন্দার পশ্চিম তটে কৃষ্ণদাসের জীর্ণগৃহের প্রাঙ্গণে এই অট্টালিকা ও মন্দির নির্ম্মিত হইল।

অতিথি শালা ও শিব বাড়ী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উত্থানের কথা।

সৌভাগ্য লক্ষ্মী কখন কি সূত্রে আগমন করেন, কেহ তাহা জানিতেও পারে না; আবার কখন কি সূত্রে তাঁহার অন্তর্ধান হয়, তাহাও কেহই বুঝিতে পারে না। কথায় আছে "দশ হাতে দেয়—দুহাতে কত নিবে, দশ হাতে নিবে—দুহাতে কত রাখবে"। দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিক হইতে কৃষ্ণদাসের অর্থাগম হইতে লাগিল। যশে চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইল। সৌভাগ্য দীপ্তিতে উৎফুল্ল কৃষ্ণদাস আমাকে ভুলিতে পারিল না। সে নিত্যই তাহার অভিনব অর্থাগমের পথ আমাকে বলিতে লাগিল, আমি তখন অবাক হইয়া শুনিতে লাগিলাম।

কৃষ্ণদাস তাঁহার সাধুতা ও বিশ্বস্ততা দ্বারা ক্রমে স্থানীয় ইংরেজ কুঠীর একমাত্র এজেন্ট নিযুক্ত হইল এবং বিশ্বস্ততার চিহ্নস্বরূপ প্রামাণিক উপাধি লাভ করিল।

আর এক দিন দেখিলাম, সে ক্ষুদ্র পল্লি একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। অন্তরে সুখ, মুখে হাসি, বুকে উৎসাহ ও সঙ্গে জ্যেষ্ঠপুত্র নন্দকিশোরকে লইয়া কৃষ্ণদাস নৌকায় উঠিলেন। শুনিলাম—সম্মান ও যশ প্রতিষ্ঠার জন্য কৃষ্ণদাস নাটোর যাইতেছেন। কৃষ্ণদাস বিপুল উপঢৌকন দ্বারা নাটোর রাজকে পরিতুষ্ট করিলেন। রাজা রাম

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পত্তনের কথা।

চঞ্চলা যখন বাম হন, তখন মানুষ বুদ্ধি হারায়। প্রামাণিকের সৌভাগ্যলক্ষ্মী যখন অলক্ষিতে অদৃশ্য হইলেন, তখন পরিবারে আত্মকলহ উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তমিত হইল। বিবাদের সূচনায় একুশরত্নের আকাশস্পর্শি চূড়া ধ্বসিয়া পড়িল। তার পর আর এক দিন—আসিল। সে দিন কি দেখিলাম—যাহা দেখিবার তাহাই দেখিলাম। দেখিলাম—কৃষ্ণদাসের সাধের পুরী ভগ্ন ইষ্টক স্তূপে পরিণত!

এখন সেই বিরাট প্রাঙ্গনের বিজনভাব বিগত গৌরবের স্মৃতি বক্ষে লইয়া বিষন্নতাই বিকীর্ণ করিতেছে।

চক্ষের সম্মুখে প্রামাণিকদিগের সৌভাগ্যলক্ষ্মী তিন পুরুষ মাত্র থাকিয়া এতদ অঞ্চলের লোককে একটী উৎকৃষ্ট প্রত্যক্ষ শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছে। সেই একুশরত্ন সমন্বিত সৌধশ্রেণীর স্থানে আজ অযত্নবর্দ্ধিত কণ্টকগুল্ম বিস্তার লাভ করিতেছে, আর সেই কণ্টকবন সমাচ্ছন্ন ভগ্ন জীর্ণ গৃহে তাহার দুর্ভাগ্য বংশধর অতীত সম্পদ-স্মৃতির দীর্ঘনিশ্বাসকে সম্বল করিয়া চিরসত্য প্রচার করিতেছেন; আর আমি আজ তাহারই সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহাদের উত্থান পতনের ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি"। *

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সে বেশী সুন্দর!

(কবি-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের "কে বেশী সুন্দর ?" কবিতাটি পাঠান্তে)

সে বেশী সুন্দর!

অনাঘ্রাত যুথিকার, তুলনা কি মিলে আর?
গন্ধরাজে?—না হিসাজে—ঘ্রাণ উগ্রতর!
দু'ই হাসে সাদাহাসি, তবু তারে ভাল বাসি
অতবড় ফোটা ফুল দেখে লাগে ডর!
সে বেশী সুন্দর!

জবার রক্তিম রাগে দেখে মনে ভয় লাগে
একেবারে এত লাল চোখের উপর!
কচিহতে দেখে তায়, মোর বুকে স'য়ে যায়
শিরায় শিরায় বহে প্রেম তরতর।
সে বেশী সুন্দর!

ছোট বেলা হতে সেই, শিখেছে ধরিতে এই
মৃণাল বাহুতে তার প্রিয় সহচর
(নাহি প্রাক্‌টিক্যাল জ্ঞান), যুবতী ধরিলে, প্রাণ-
গুরুভারে বড় বুঝি হইত কাতর।
সে বেশী সুন্দর!

"অনাবিল প্রেমধার", তুমি(ই) বল বালিকার
আবার জিজ্ঞাসা কেন কে বেশী সুন্দর?
ও ধারেই তৃপ্তপ্রাণ, কে চাহে পদ্মার গান
স্রোতের প্রখর বেগে হতে মর মর।
সে বেশী সুন্দর!

সে যেগো মলয়াধীর, মৃদু শ্বাস বাসন্তীর
পাতাতলে দুলে দুলে খেলে মনোহর!
এ ছাড়ি, ঝটিকা-শ্বাসে যেই জন ভাল বাসে
নমস্কার তার পায় যোড়ি দুই কর।
সে বেশী সুন্দর!

উপবনে তরু থাকে, লতিকা জড়ায় তাকে
শৈশবে শ্যামল ডোরে বাঁধে কলেবর
আগে যদি লতা মরে, তরু হৃদে দাগ ধরে
উন্মূলিতা লতা যবে পড়ে তরুবর।
শৈশবে না দোঁহে বাঁধি, যৌবনে বাঁধহ যদি
সে কেমন খাপ ছাড়া ঠেকে নিরন্তর
এই যেন মিশে মিশে এই যায় ভেসে ভেসে
পদ্মপত্রে জল যথা—দোঁহে স্বতন্তর।
সে বেশী সুন্দর!

শরতের সরোবরে সরোজিনী শোভা ধরে
সুধীরে সমীর চুমে—চুমে মধুকর।
লতা লজ্জাবতী হাসে, নিভৃত কোণের পাশে
একটি চুমায় হয় শিহরে ফাঁফর।
সে বেশী সুন্দর!

---

* ময়মনসিংহ কাহিনীর পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে লিখিত।

জলদে বিজলীবালা সত্য দিশি করে আলা
সে রূপে আঁধার আরো হয় গাঢ়তর।
এ-হতে জোনাকী ভাল, মিটি মিটি দেয় আলো
চলিতে জীবন-পথ করি নির ভর।
সে বেশী সুন্দর!

ফোটাফুল যদি দেখি, মুগ্ধ বটে হয় আঁখি
ভয় হয় এই বুঝি ঝরে ঝর ঝর
কুমারী কলিকা সই তাই কোলে তুলে লই
এবে কলি ফোটা শোভা হবে এর পর।
সে বেশী সুন্দর!

যুবতী ভাদ্রের নদী একটু উছলে যদি
দুকূল ভাঙ্গিয়ে বেগ ধায় খরতর
সে যে কি প্রচণ্ড ঢেউ সাম্‌লাতে পারে কেউ?
কোথায় এমন বীর অবনী ভিতর?
যুবতী দেখিলে তাই, আমি দূরে সরে যাই
নিকটে যাহারে দেখি, বলি সর সর।
বালিকা শিশির প্রায় দূর হতে শোভা পায়
যেই ছুঁই গ'লে যায় আদরে কাতর!
সে বেশী সুন্দর!

বালিকা গোলাবী নেশা থেকে থেকে বাড়ে তৃষা
যুবতী-স্পিরিট টানে সার ধড় ফড়
অল্পেতে মাতাল হই, তাই তারে ভাল কই
ডুবুক্ যে ডোবে দেখে এক্‌সা সাগর।
সে বেশী সুন্দর!

"বালিকা অতনা বোঝে, চোখে চোখে চোখ্ বোজে"
স্বর্গীয় মাধুরী এ যে মনোমোহকর!
যুবতী আঁখির ঘায় হাত পা ভাঙ্গিয়ে যায়
কে তাহারে সাধে চায় বল কবিবর?
তারে বেশী ভাল বাস সে বেশী সুন্দর!

৺মনোমোহন সেন।

ময়না।

বিশ্বস্রষ্টার শিল্পচাতুর্য্যে ও রচনা নৈপুণ্যে তাঁহার অপার মহিমারাশি বিকসিত। স্রষ্টার অনন্ত-সৃষ্টি অনন্তের ছায়া মাত্র। সুনিয়ন্ত্রিত ও সুবিন্যস্ত নিয়মাবলী সেই অনন্তের মহিমারাজি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া রাখিয়াছে। অভিনিবেশ পূর্ব্বক তৎপ্রতি মনঃসংযোগ করিলে হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ও অতুলনীয় আনন্দরসের উদ্রেক হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র বালুকণা হইতে সুবৃহৎ গ্রহ, অনন্ত সৌর জগৎ, সকলই যেন পরস্পর একই সম্বন্ধ সূত্রে গ্রথিত হইয়া একই অনন্তত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। জগতের তুলনায় জীব ক্ষুদ্র হইলেও জীবত্ব ক্ষুদ্র নহে বৃক্ষ লতা, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, জড় ও মানব প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ মহিমময় বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মিত পথে নিয়ন্ত্রিত এবং জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে পরস্পরের হিতসাধনে দীক্ষিত হইয়া প্রতিনিয়ত জগতের মঙ্গল বিধান করিতেছে। ইহাই সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও মহিমার অনন্তত্ব। মনুষ্য মতিমান্; তাই সে শ্রেষ্ঠ জীব। বুদ্ধি তাহার বৃত্তি, তত্ত্বপরিচালনা তাহার সাধনা, উন্নতি তাহার পরিণতি। গুরুতর কর্ত্তব্যভার লইয়াই মনুষ্যত্ব, আমার জন্য জগৎ, আমি জগতের জন্য, তাই ভগবান সকলের সার-ভূত উপাদানেই যেন মনুষ্য দেহের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই অযাচিত ভগবদ্দত্ত তত্ত্বানুসন্ধান বৃত্তির পরিচালনার অভাবেই আমরা অনন্ত হইতে দূরে সরিয়া পরিতেছি। মানুষের আত্মচিন্তা ও আত্মসেবার ন্যায় ইতর জীবের প্রতিও একটা গুরুতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে। জ্ঞান শুধু সাহিত্য বা ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে আবদ্ধ নহে, প্রকৃতিই জ্ঞানের রাজ্য; মনুষ্যজ্ঞান তাহার অন্তর্ভুক্ত। জগতের প্রতি পদার্থে জ্ঞান ও বাসনা, প্রেম ও সৌন্দর্য্যে মিলাইয়া দিয়া মানুষকে ভক্তির দিকে টানিয়া লয়। ভক্ত-মানব, প্রেম ও সৌন্দর্য্যে অনন্তত্ব লাভ করে।

পক্ষী, সৌন্দর্য্য জগতে ভগবানের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। উহার পক্ষবিন্যাসে সৌন্দর্য্য ও স্বর মধুর্য্যে তাঁহার মহিমা পূর্ণ বিভাসিত রহিয়াছে। বিহগকুল যখন শাখি-শাখে অথবা লতাকুঞ্জে বসিয়া সুস্বরে বায়ু ও বনমণ্ডলী তরঙ্গায়িত করিতে থাকে, তখন তদীয় স্বরমাধুর্য্যে কোন্ পাষাণ

হৃদয়ে ভগবদ্‌ভক্তির অমৃতধারা সিঞ্চিত না হয়? কাহার মন অনন্ত আনন্দ রসে আপ্লুত না হইয়া থাকিতে পারে? বিহগ-কাকলী মৃতদেহেও অমৃত সঞ্চার করে।

ভারতবর্ষ নানাপ্রকার সুগায়ক ও সুদৃশ্য পাখীর উৎপত্তি ও বসতিস্থান। এখানে মনুষ্য স্বরের অনুকরণ কারী পাখীর সংখ্যাও নিতান্ত বিরল নহে। ময়না, মদ্‌না, ভীমরাজ প্রভৃতি অনেক সুগায়ক ও সুন্দর পাখী এদেশে জন্মিয়া থাকে। তন্মধ্যে ময়নার অনুকরণ ও সুস্পষ্ট উচ্চারণ শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাদের স্বর এতই সুস্পষ্ট যে, অনেক সময় মানুষের স্বর বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে।

ময়না দুইপ্রকার, সিঙ্গাপুরী ও আসামী। সিঙ্গাপুরী অপেক্ষা আসামী ময়নাই অধিক সুন্দর। এই ময়নার সুবর্ণ বিনিন্দিত কর্ণ, সুবিন্যস্ত ও সুরঞ্জিত পক্ষাবলী, হরিদ্রাভ পদদ্বয়, আরক্তিম চঞ্চু অতীব চিত্তরঞ্জক। আসাম, গারোহিল খসিয়া প্রভৃতি পার্ব্বত্য ভূমি ইহাদের বাসস্থান। ইহারা পার্ব্বত্য প্রদেশ ছাড়িয়া নিম্নভূমিতে আসিতে চায় না; পর্ব্বতের সংলগ্ন অরণ্যে কখন ময়না পাখী দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা সচরাচর সুনির্ম্মল স্রোতস্বতী তীরে বাস করিতে ভালবাসে এবং বিরল-পত্র উচ্চবৃক্ষ কোটরে সন্তান উৎপাদন করিয়া থাকে। অর্থ-লোলুপ মনুষ্যগণ অর্থলাভের আশায় ঐ সকল উচ্চ বৃক্ষে বংশ নির্ম্মিত কৃত্রিম কুলায় প্রস্তুত করিয়া দেয়; অনেক পাখী, তাহা সুদৃঢ় ও জল প্রবেশের সম্ভাবনা নাই মনে করিয়া তাহাতে আসিয়া সন্তান উৎপাদন করে।

চৈত্র ও বৈশাখ মাস ইহাদের সন্তান উৎপাদন কাল। বয়সের আধিক্য অনুসারে সন্তান উৎপাদন কালেরও অগ্র পশ্চাৎ হইয়া থাকে। ১ম বৎসরের ময়না জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ব্বে সন্তান প্রসব করেনা। কিন্তু ২|৩ বৎসরের ময়না চৈত্র অথবা বৈশাখ মাসেই শাবক উৎপাদন করিয়া থাকে। পুরাতন ও অধিক বয়স্ক ময়নার শাবক অগ্রে জন্মে বলিয়াই তাহার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ভাল হয়। অল্প বয়স্ক পাখীর শাবক দুর্ব্বল সুতরাং শিক্ষা শক্তির পরিমাণও অপেক্ষাকৃত অল্প। সেই জন্যই সর্ব্বত্র বৈশাখের বাচ্চার আদর অধিক। অধিক বয়স্ক পাখী চৈত্র বৈশাখ মাসে একবার এবং আষাঢ় শ্রাবণ মাসে দ্বিতীয় বার সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। ইহারা একবারে ৩|৪টী অণ্ড প্রসব করে। শেষ অণ্ড প্রসবের দিন হইতে ১৮ দিন তা দেওয়ার পর শাবক জন্মিয়া থাকে। এক সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতেই অল্প অল্প পক্ষাঙ্কুর উদ্গত হইতে আরম্ভ হয়। সপ্তাহের পর পিতা মাতার সহিত উড়িয়া বেড়াইতে ও ধীরে ধীরে আহার অন্বেষণ করিতে শিক্ষা করে; পুনরায় পিতা মাতার সন্তান উৎপাদন কাল নিকটবর্ত্তী হইলেই তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে। ইহারা আরণ্য অবস্থায় কীট পতঙ্গ ফল পত্র ইত্যাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করে এবং সচরাচর ২৫,৩০ বৎসর বাঁচিয়া থাকে। আরণ্য অবস্থায়ও ইহারা অন্যান্য পশু পক্ষীর স্বর অনুকরণ করিয়া থাকে।

ময়নাকে মনুষ্য স্বরের অনুকরণ শিক্ষা দিতে হইলে শৈশব হইতেই লোকালয়ে আনিয়া প্রতিপালন করা আবশ্যক, নচেৎ বড় হইলে ইহারা প্রভুর প্রতি অনাসক্ত ও সর্ব্বদাই স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যাকুল থাকে। পোষণ অবস্থায় ছোলার সাতুর সহিত শীতল জল মিশাইয়া দিনে তিন বার খাইতে দেওয়া প্রয়োজন। মধ্যে মধ্যে আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি নানা প্রকার ফল খাইতে দিতে হয়। মৎস্য মাংস ও কিছু কিছু দেওয়া প্রয়োজন। মধ্যে মধ্যে বিম্বফল (তেলাকুচ) খাইতে দিলে বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ও কোষ্ঠ পরিস্কার থাকে, কিন্তু অধিক মাত্রায় ব্যবহার ভাল নহে। বিম্বফল অগ্নিমান্দ্য রোগের মহৌষধ। অগ্নিমান্দ্য রোগে থানকুনী পাতাও উপকারী। সকালে ও বিকালে অল্প সূর্য্য কিরণ ভোগ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

পাখীদিগের সচরাচর দুইটী অবস্থা দেখা যায়। জন্ম হইতে পক্ষ পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত সময় শৈশব; তৎপর যৌবন। শৈশব অবস্থার স্বর, বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হইতে থাকে। এই দুই অবস্থায় আহার বিহারের পার্থক্য রাখা আবশ্যক; নচেৎ স্বাস্থ্য অপ্রতিহত রাখা সম্ভব নহে। শৈশবে মৎস্য মাংস ও জল মিশ্রিত সাতু; নানাবিধ ফল ও সামান্য পরিমাণে কীট পতঙ্গ খাইতে দিলে ভাল হয়। বয়োবৃদ্ধি সহকারে কীট পতঙ্গাদি আহার বন্ধ করা আবশ্যক। পক্ষ পরিবর্ত্তনের পর হইতে জল মিশ্রিত সাতুর সহিত ঘৃত, মাখন বা স্নেহ

পদার্থ মিশ্রিত করিয়া দিলে শারীরিক বলবিধান ও বর্ণের চাকচিক্য রক্ষিত হইয়া থাকে। পানীয় জল ও জল পাত্র সর্ব্বদাই পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। ধাতু নির্ম্মিত জল পাত্র ভাল নহে, তাহাতে পক্ষের সৌন্দর্য্যের হানি জন্মে। উহা এত বৃহদায়তন হওয়া আবশ্যক যে পাখী অনায়াসে উহাতে অবতরণ করিয়া ইচ্ছানুসারে স্নান পানাদি করিতে পারে। মুহূর্ত্ত মাত্র পানীয় জলের অভাব হইলে গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইতে পারে। সুস্থাবস্থায় প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে সুন্দর পরিষ্কৃত জলে ইচ্ছানুরূপ স্নান করিতে দেওয়া প্রয়োজন। প্রাতে ৭ টা হইতে ৯ টা ও বৈকালে ১টা হইতে ৩ টার মধ্যে সমস্ত পাখীই স্নান করিয়া থাকে। শীতকালে প্রাতে ও গ্রীষ্মকালে বৈকালে স্নান করাই পাখীদিগের প্রাকৃতিক নিয়ম। পাখীগুলি প্রথম একবার জলে স্নান করিয়া ডালে বসিয়া পুচ্ছের পশ্চাৎ ভাগস্থিত একটী স্বাভাবিক তৈলাধার হইতে চঞ্চু দ্বারা তৈলবৎ পদার্থ বাহির করিয়া সমস্ত পক্ষেই মাখাইয়া পুনরায় স্নান করে। ইহাতে স্নান জন্য আর্দ্রতা হইতে রক্ষিত ও পক্ষের মসৃণতা হইয়া থাকে। অনেক সময় বর্ষার প্রাবল্যে অথবা শীতের আধিক্যে স্নান বন্ধ করায় পাখীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া থাকে। অনেকে অনেক সময় পাখীকে রুগ্ন বা দুর্ব্বল দেখিলে কিম্বা ভ্রান্তি বশতঃ অগ্নিমান্দ্যাদি পীড়ার প্রকৃত কারণ স্থির করিতে না পারিলে ঐ স্বভাবজাত তৈলাধারকেই রোগ চিহ্ন (প্রবাদ কথায় যাহাকে পাখীর গেঁজ বলে) মনে করে। সময় সময় অনেকে পাখীর পোষণোপযোগী ঐ স্বাভাবিক তৈলাধারকেই রোগের কারণ মনে করিয়া উহা দগ্ধ বা কর্ত্তন করিয়া স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে পাখী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আমাদের দেশে পশু পক্ষীর অচিকিৎসায় মৃত্যু অপেক্ষা এইরূপ রোগ নিদান অবধারণের অভাবে কুচিকিৎসায় মৃত্যুর সংখ্যাই অধিক। ভগবান শীতাতপ উপভোগের জন্য পাখীদিগের প্রতি অতি সুব্যবস্থা করিয়াছেন। গ্রীষ্মের আতিশয্যে অর্থাৎ আষাঢ় শ্রাবণ মাসে পক্ষ পরিবর্ত্তন কার্য্য আরম্ভ হইয়া শীতাগমের পূর্ব্বে অর্থাৎ ভাদ্র আশ্বিন মাসে সম্পূর্ণ নূতন পক্ষ উদ্গত হয়। পাখীদিগের এই পক্ষ পরিবর্ত্তন অবস্থাকে 'কুরিজ' বলে। এই সময় ইহাদিগকে বিশেষ সাবধানে রাখা আবশ্যক। নচেৎ পাখী নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই সময় ছোট বড় সমস্ত পাখীর প্রত্যেকটী নূতন পাখা উদ্গত না, হইলে পাখীর স্বাস্থ্য ভাল নয়, বিবেচনা করা উচিত। অপরিবর্ত্তিত পক্ষের বর্ণের রূপান্তর হইয়া থাকে। যাঁহাদের পক্ষী পালনে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা সহজেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। কোন কোন পাখীর পক্ষ পরিবর্ত্তন বৎসরে দুইবারও হইয়া থাকে। দুই বার পক্ষ পরিবর্ত্তন সময় কেবল বর্ণাত্মক পক্ষই পরিবর্ত্তন হয়। যাহা হউক, আমরা যে পাখীর কথা বলিতেছি, তাহার একবার মাত্র পক্ষ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকিলে প্রায় তৃতীয় মাস (বয়স) হইতেই পক্ষ পরিবর্ত্তন কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথম বৎসর পক্ষ পরিবর্ত্তন কার্য্য অতি ধীর ভাবে এবং ২য় বৎসরে সেরূপ না হইয়া অপেক্ষাকৃত শীঘ্রই সম্পন্ন হয়। পাখীর এই পক্ষ পরিবর্ত্তন কালে স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। এই সময় প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া, শীতল বায়ু হইতে সাবধানতা নেওয়া ও মধ্যে মধ্যে সূর্য্যাতপ ভোগ করিতে দেওয়া আবশ্যক। এই পক্ষ পরিবর্ত্তন বিলম্বে বা অনিয়মিত সময় হইলে পাখীকে দুই তিন দিন বৃষ্টির জলে স্নান করিতে দিবে; ইহাতে উপকার হইয়া থাকে। শীতল ও আর্দ্র বায়ু হইতে সতর্ক রাখা আবশ্যক; হঠাৎ শীতল বায়ু লাগিলে পক্ষ পরিবর্ত্তন কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মে। যদিও ভগবান পাখীদিগকে মলিনতা হইতে দূরে রাখিবার অন্যতর উদ্দেশ্যে বৃক্ষের উচ্চ শিখরে আবাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন. তথাপি এই সময় পতিত পক্ষগুলি খাচা হইতে অন্তরিত না করাই সঙ্গত। ইহাতে অবশিষ্ট পক্ষ পতনের সাহায্য হইয়া থাকে। এই সময় স্নানের মাত্রা অল্প করা মন্দ নয়। কিন্তু পক্ষোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে শীতল জলে স্নানের সুবিধা করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ময়না পাখীর স্নান সর্ব্বদাই প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন। অনেক পাখী স্নান ও পানীয় জলের অভাবে হঠাৎ আক্ষেপ

রোগে পতিত হয়। পাখী এই রোগে আক্রান্ত হইলে প্রচুর পরিষ্কৃত পাখীর জল ও স্নান দেওয়া এবং প্রতিদিন মৎস্য ও মধ্যে মধ্যে মাংস খাইতে দিলে রোগের উপশম হইয়া থাকে। গৃহ পালিত পশুপক্ষী যত নানা বর্ণের হইয়া থাকে, আরণ্য গুলির সেরূপ দেখা যায় না। আরণ্য পশুপক্ষী প্রায়ই এক বর্ণের হইয়া থাকে। সুতরাং আহার্য্য পদার্থ ও জল বায়ু দ্বারা যে সহজেই বর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। ময়না পাখীতে এই প্রমাণ অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। সচরাচর ময়নার সোণাকাণ ও রূপাকাণের কথা প্রচলিত আছে। বাস্তবিক তাহা আর কিছুই নহে, আট দশ দিন সোণা কাণ ময়নাকে দুধ ও ভাত খাইতে দিলে, কর্ণের বর্ণ ক্রমে শুভ্র হয় এবং রূপা কাণ ময়নাকে হরিদ্রা ঘৃত মিশ্রিত সাতু কিম্বা বিল্বফল খাইতে দিলে, সোণা কাণ হইয়া থাকে। পাখীর খাদ্য সাতুর সহিত অল্প হরিদ্রা চূর্ণ ও সামান্য লঙ্কা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

আর্য্য ঋষিগণও আহারীয় পদার্থ দ্বারা যে বর্ণের ও মানসিক প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। নৈষধ চরিত রচয়িতা কবিবর শ্রীহর্ষের কাব্যে আছে, নল রাজা সুবর্ণ পক্ষ বিশিষ্ট হংসকে ধরিয়া যখন তাহার সুবর্ণময় পক্ষ লাভের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, তখন হংস প্রত্যুত্তরে বলিয়া ছিল যে, আমরা স্বর্গ-গঙ্গার স্বর্ণ মৃণালের অগ্রভাগ আহার করিয়াই সুবর্ণ বর্ণ পক্ষবিশিষ্ট হইয়াছি।

"স্বর্গাপগা-হেম-মৃণালিনীনাং,
নালা-মৃণালাগ্র-ভুজো ভজামঃ।
অন্নানুরূপাং তনু-রূপ-ঋদ্ধিং,
কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণান ধীতে॥"

আমার বোধ হয় আর্য্য ঋষিরা গুণ ও কর্ম্মানুসারে জাতি নির্ণয় করিয়া বিভিন্ন জাতির মানসিক বৃত্তি গুলির সম্যক পরিস্ফুটন উদ্দেশ্যেই জাতি গত আহার ভেদের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন।

শ্রীশিবকৃষ্ণ সিংহ শর্ম্মা।
রাজধানী—সুসঙ্গ।

ফৌজদারী আদালতে অনুপ্রাস

বঙ্গবাসী বিদ্যালয়ের বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয় অনেক দিন অবধি অনুপ্রাস অবলম্বনে গভীর গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহার উদ্যম ও উৎসাহে অনুপ্রাসের অশেষ প্রকার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। অনুপ্রাসের অধিকার যে রাজ দরবারেও প্রসার লাভ করিয়াছে, সে বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার অভিপ্রায়েই আমার আজকার প্রবন্ধের অবতারণা।

ফৌজদারীর কাচারীতে অনুপ্রাসের অধিকার প্রত্যক্ষভাবে লক্ষিত না হইলেও, ক্রিমিনেল কোর্টে অনুপ্রাসের কি পরিমাণ রসিকতা আছে, তাহা ভুক্তভোগীরা সবিশেষ অবগত আছেন। দণ্ডবিধি কার্য্যবিধি আইনের নাম নির্ব্বাচনে আইন কর্ত্তারা অনুপ্রাসের অধিকার অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তারপর কনস্পিকেসী কেস হইতে সুরু করিয়া কনটেমমট্ অব্ কোর্ট পর্য্যন্ত—অনুপ্রাসের ক্রম বিকাশ বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া মারামারি, বাকবিতণ্ডা, জোর জুলুমে অনুপ্রাসের আবেগ কিছুমাত্র হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সর্ব্বপ্রকার চুরি চামারিতে, অপচয়-অনধিকার প্রবেশে, খুন খরাবতে, গালিগালাজে, বকাবকিতে, বেয়াইনি জনতায়, দাঙ্গা হাঙ্গামায়, সমন অমান্যে, কিংনেপিং কেসে, কাউনটার ফিট্ কয়েন কেসে, পরস্ত্রীহরণে, সিডিশনে, মানহানিতে—অনুপ্রাসের অট্টহাস আছে।

দণ্ডবিধি ছাড়িয়া দিয়া কার্য্যবিধি হাতড়াইলেও, মুচুলিকার মামলায়, সদাচরণের জন্য জামিন গ্রহণে, জামিন যাচাই কার্য্যে, জামিন জব্দে, শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনায় অনুপ্রাসের তির্য্যক দৃষ্টি পড়িয়াছে! এমন কি পাঁচ আইনের প্যাঁচে পড়ার মধ্যেও যে অনুপ্রাসের কারসাজি আছে, তা কে না স্বীকার করিবে!

ফৌজদারী আদালতের কায-কর্ম্মে আগা-গোড়া অনুপ্রাসের আদার অক্ষুণ্ণ আছে;—নালিশি পিটিসনে, পুলিশ কেসে, ক্রশ কেসে, খোরপোষ খেসারতে, সর্ব্বসাধারণের রাস্তা খোলাসায় অনুপ্রাসের অত্যন্ত সমাদর দেখা যায়।

হাজির জামিনে, সাক্ষী-সাক্ষিস-মান্ডে, আপোষের অচলনামায়, সাক্ষীর সমনে, জেরা জবানবন্দীতে, সোয়াল জবাবে অনুপ্রাস। উকীলের ওকালত নামায় এবং মোক্তারের মোক্তার নামায় অনুপ্রাসের রজত টঙ্কার টুকু বেশ স্পষ্ট শোণা যায়। এভিডেন্স এক্টেও অনুপ্রাসের একটু খর-দৃষ্টি না পড়িয়াছে এমন নয়!

মাছিমারা কেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া আমলা ফয়লা, সেরসদার, নায়েবনাজির বকসি বাবু, নকল নবিস, পেয়াদা আর্দালী, মোক্তারের মহুররীর, টল্লি-টাউট্, বাদী প্রতিবাদী, সাক্ষী আসামী, পক্ষাপক্ষ, প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত, চৌকীদার দফাদার, বাদী বিবাদী—সকলে বিনা বাক্যব্যয়ে অনুপ্রাসের দাসত্ব করিয়া আসিতেছে। এমন কি বেঞ্চ ও বারের সম্পর্কটাও সম্পূর্ণ অনুপ্রাস ঘটিত।

আরো অভিনিবেশ সহ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে জজের এজলাসে, দলিল দস্তাবেজে,নাম বকলমে দাখিল দস্তখতে, দণ্ডবরদারি বারবরদারি আদি দাখিলে, কাগজে কলমে, কাল কালিতে, লাল কালিতে বিবাদীর বর্ণনায়, সহি মোহরে, সরাসরি বিচারে, নথি-নজিরে, বার-লাইব্রেরীতে, জজে জুরীতে, কার্টিজ কাগজে, হলপান জবানবন্দীতে অনুপ্রাসের আদর আবহমানকাল রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

জেল আপীলগুলি যে প্রায়ই "সামারিলি ডিসমিস" হয় সে অনুপ্রাসের অনুরোধ: মোক্তার মহাশয়গণ যে বাদীবিবাদীর প্রতিনিধি স্বরূপ গতিবিধি করিয়া থাকেন, সেও অনুপ্রাসের প্রতি অতি মাত্রায় অনুরাগ বশতঃ। আজ কাল যে বাঙ্গালী হাকিমেরা হ্যাট কোট ধরিয়াছেন, উকীল বাবুরা যে আজো চোগা চাপ্‌কাণের মায়া পরিত্যাগ করেন নাই, সে নিতান্তই অনুপ্রাসে আশক্তি আছে বলিয়া। ছোট খাটো হাকিমদিগকে যে মস্ত মস্ত মামলা মোকদ্দমা সেসনে সোপর্দ্দ করিতে হয়, সেও অনুপ্রাসের বিধিতে। হাকিমের হিম্মতে, হোমরা চোমরা উকীল মোক্তারের বাদপ্রতিবাদে অনুপ্রাস সশরীরে মূর্ত্তিমান।

বিবাদ বিসম্বাদ লইয়াই মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি, এবং মামলা মোকদ্দমায় আইন আদালতই আশ্রয়। অথচ আইন আদালতে রীতিমত তদ্বির তালাফি না করিলে কোনও ফল হয় না, এ সকলের মূলেই অনুপ্রাসের ইঙ্গিত আছে।

পুলিশ প্রতিকূল হইলে তিলকে তাল করিয়া নারাজি দরখাস্ত দখিল না করিলে মামলা ফাঁশিয়া যায়, ফিল ফাজিল তুড়িয়া, কড়াক্রান্তি আদান প্রদান করিতে গিয়া উকীলের মহলে বেয়াক্কেল মক্কেল অনেক সময় জেরবার, নাস্তা নাবুদ হয়। তার চাইতে আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া গোলমাল মিটমাট করা ভাল।—এ সমুদয় ব্যাপারেই অনুপ্রাসের রস আস্বাদন করা যায়।

বলিতে কি বিচার বিভাগের সকল রকমের আবেদন নিবেদনে দেনা পাওনায় দরদস্তুরে, তদন্ত-তদারকে, প্রমাণ পর্য্যালোচনায়, সাক্ষ্য সমালোচনায়, প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের প্রস্তাবনায় অনুপ্রাসের কাণ্ড-কারখানা জাজ্জল্যমান। তিনি সাক্ষীর বাক্সে দাঁড়াইয়া জবানবন্দী করেন, আসামীর টিক্‌টিকিতে দাঁড়াইয়া একরার করেন। তিনি উকীলের সামলায় সশরীরে বিরাজ করেন। আইন-কানুনেও তাঁর স্বায়ত্তশাসন বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে! এমন কি অনুপ্রাস-প্রিয় হাকিমেরাই বিচার-বিভ্রাট করেন।

জেল জামিন হওয়ায়, হুজুরে হাজির হওয়ায়, হাজতের হুকুম দেওয়ায়, গ্রেপ্তারী পরোয়ানায়, জেল জরিবানায়, পুলিশের পোষাকে, সর্ব্বত্র অনুপ্রাসের মূর্ত্তিপ্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়!

হাকিমের রায় দেওয়ায়, ডেপুটীর "ডিপোজিসন" লেখায়, শুনানির দিন নিরূপণে অনুপ্রাসের আত্মপ্রকাশ জাজ্জল্যমান হইয়া থাকে। সাক্ষী-সাবুদে, আপীল আদালতে, বায়নার টাকায়, সেয়ানা সাক্ষীতে অনুপ্রাসের আভাস আছে। শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগ দ্বিভাগ করিবার জন্য যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, সে কেবল শাসনে বিচারে অনুপ্রাসের অভাব হেতু।

অস্ত্র আইনে, নূতন সিডিসন আইনে, অনুপ্রাসের মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। সশ্রম কারাবাসে, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, এমন কি ফাঁসিকাষ্ঠেও অনুপ্রাসের দন্ত-বিকাশ লক্ষিত হয়। শুধু তাই নয়, বেকসুর খালাসেও অনুপ্রাস বর্ত্তমান!

কোর্টের বড় বাবু যে হাকিমের কাছে 'প্রথম এতেলা' 'পেশ' করিয়া থাকে, ঠৈক বসাইয়া যে আপোষের আলাপ আরম্ভ হয়, সে সমুদয় কিছুই অনুপ্রাসের অগোচর নয়। বলা বাহুল্য, মোকদ্দমা মুলতুবি রাখায়, জামিনের প্রার্থনা নামঞ্জুর করায়, অনুপ্রাস। প্রকাশ থাকে যে সাক্ষীর শিখানে ও ভাগানে অনুপ্রাস ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। আইনে অপরাধীকে যে আত্মরক্ষার অধিকার দেওয়া হইয়াছে সে কার অনুরোধে?

আদালতের পুলিশ পাহারায়, আসল দলিলের নকল লওয়ায়, প্যাদার পরোয়ানায়, কৈফত-তলপে, অনুপ্রাসের আদেশ আছে! কাঠগড়ার খাড়া করিয়া হাকিম যে আসামীর নাম ধাম বাপের নাম, ইত্যাদি লিখিয়া লন, তাতেও অনুপ্রাস। পুলিশের চার্জসীটে অনুপ্রাসের স্বরূপ প্রত্যক্ষ না হইলেও তাদের ফাইনেল ফারামে তিনি পুরাদস্তরভাবে বিদ্যমান!

দোহাই দস্তর দেওয়ায়, অনুপ্রাসের করতালি বাজে। জমিভূমির সীমা সরহদ্দ ঘটিত মামলাগুলি যে ক্রিমিনেল কোর্টে টেঁকে না, সেও অনুপ্রাসের মাহাত্ম্যে।

অধিক আর বলা নিষ্প্রয়োজন—কারণ কাছারী কমপাউণ্ডস্থিত পানের দোকানে, সোডালেমোনেডের আড্ডায়, রুটী বিস্কুটের দোকানে, সিগার সিগারেটের ষ্টলে, এমন কি বার লাইব্রেরীর টিকে তামাকের মধ্যে পর্য্যন্ত অনুপ্রাসের মাল-মশলা বিরাজিত।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ।

শুভ-দৃষ্টি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কর্ম্ম।

বুঝিলাম—ভাবরাজ্য হইতে প্রকৃত বিষয়কর্ম্মে মনকে বিব্রত না করিলে আর চলিবে না। আর বুঝিলাম—অর্থই জীবনের সার পদার্থ—অর্থই সম্মান, অর্থই কুল, অর্থই প্রেম; অর্থই জগতে মূর্খকে বিদ্বান, অযোগ্যকে যোগ্য ও অকুলীনকে কুলীন করিয়া দেয়। মাতাপিতা, স্ত্রী পুত্র কেহই অর্থ ব্যতীত স্নেহ-ভালবাসা দেয় না। অর্থ চাই। আপাততঃ একটীন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অর্থ উপার্জ্জনের জন্য আসাম ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টে (বনবিভাগে) কার্য্য লইয়া গেলাম।

অগ্রহায়ণে আসাম যাই, মাঘ মাসেই মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যুসংবাদ আমার নূতন আশা ও উদ্যমের পথে ভয় ও বিভীষিকার ছায়ারূপে উপস্থিত হয়।

১৩ই মাঘ। টেলিগ্রাম পাইয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। অদ্য সুরেশের সুদীর্ঘ লিপি পঁহুছিল। চিঠিতে জানিলাম, মৃত্যুকালে মা আমাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার এই শেষ অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার জন্য নিজকে শত সহস্র ধিক্কার দিলাম। উপায় নাই। সুরেশ লিখিয়াছে—"পিতামাতা লইয়া চিরকাল কেহ বাস করিতে পারে না। তোমাকে বর্ত্তমান রাখিয়া যে তোমার বৃদ্ধা জননী স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন, ইহা তাহার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তোমার পরিতাপের বিষয় কিছুই নাই। খুড়ীমার সেবা শুশ্রূষার কোনই ত্রুটী হয় নাই। তোমার স্ত্রী যেরূপ অক্লান্তভাবে ও প্রসন্ন মনে শাশুড়ীর সেবা ও শুশ্রূষা করিয়াছে, তুমি সেইরূপ নিশ্চয়ই করিতে পারিতে না। তবে মৃত্যুকালে তুমি তাঁহাকে দেখিতে পাইলে না, তিনিও তোমাকে সম্মুখে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না—এই যা দুঃখ।

"তোমার মার মৃত্যুর পর তোমার শ্বশুর মহাশয় আসিয়া তোমার স্ত্রীকে লইয়া গিয়াছেন, তোমার বাড়ীরও বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন।"

সুরেশের চিঠিতে আরও অনেক সংবাদ ছিল।

শ্রাদ্ধ করিবার জন্য বাড়ী আসিবার আর প্রয়োজন দেখিলাম না। বন্ধুবান্ধবের উপদেশ অনুসারে কর্ম্মস্থলেই মাতৃকার্য্য সম্পন্ন করিলাম।

২৩শে ভাদ্র। কলিকাতা পঁহুছিলাম। আসামের জলবায়ু আমার স্বাস্থ্যের অনুকূল হইল না। প্রথম ছয় মাস বেশ ছিলাম। বর্ষায় Forest-এর হাওয়ায় আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া আরও কতক দিন দেখিলাম। দিন দিনই শরীরের অবস্থা শোচনীয় হইতে লাগিল। শেষ চারি মাসের বিদায় লইয়া স্বাস্থ্য সংশোধনের জন্য কলিকাতায় আসিলাম।

(২)

বিবাহের সময় শ্বশুর মহাশয়ের অর্থে আমার পৈত্রিক বাস্তুভিটা রক্ষিত হইয়াছিল—এই সূত্রে তিনি আমার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই সংসারের বন্দোবস্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন মনে করিয়া আমার বড়ই অভিমান হইল। এই প্রবল অভিমান আমাকে গৃহে যাইবার সঙ্কল্পে প্রতিনিবৃত্ত করিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম—

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি, ভার্য্যা চ ——
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্।

যাই হউক মহাজনের পন্থা অনুসরণ করিয়া পুনরায় আরও গভীরতম অরণ্যে না গিয়া, কোলাহল মুখরিত কলিকাতা নগরীতেই আসিয়া উপনীত হইলাম।

কিছুকাল ডাক্তার কবিরাজের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া রহিলাম। শরীর একটু সুস্থ হইলে ব্যয়িত অর্থ পুনঃ সঞ্চয়ের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ইচ্ছা কয়েক দিন কলিকাতা থাকিয়া শীতের প্রাক্কালে মহাজনবাক্যের অনুসরণ করিয়া বনে গমনের ব্যবস্থা করিব।

৪ঠা কার্ত্তিক। অল্প চাকুরীর চেষ্টা ফলবতী হইল। Burn কোম্পানীর বাড়ীতে এক কেরাণীগিরী লইয়া কিছুদিন কলিকাতা থাকিবার সুবিধা করিলাম।

(৩)

Burn Co.র হেড্‌বাবুর সহিত শুভদিনে শুভদৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং কলিকাতা পরিত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাওয়া আমি আমার একটী প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য করিয়া, বেলা ৪ ঘটিকার সময় তাঁহার বাসায় পঁহুছিলাম। সে দিন রবিবার। তিনি বাসায় ছিলেন। আমি যাইয়া নমস্কার করিয়া বসিলাম।

তিনি বলিলেন "আপনি আজই চলে যাচ্ছেন?" আমি বলিলাম—"আজ্ঞ না, আমি কাল যাব।". তিনি একটু আগ্রহের সহিত বলিলেন—"তা বেশ, আমি আপনাকে একটু কষ্ট দিতে ইচ্ছা কচ্ছি—আপনাদের কবে পর্য্যন্ত যেয়ে পঁহুছাতে হবে?"

আমি বুঝিলাম, তিনি কি যেন বলিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন, লজ্জাবশতঃ বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। আমি আগ্রহের সহিত বলিলাম—"আমার আরও এক সপ্তাহ বিদায় হাতে রহিয়াছে। আমার

"রুগ্ন-শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইলাম।"

দ্বারা আপনার কোন কার্য্য হইলে, আমি আরো দু'এক দিন থাকিয়া যাইতে পারি। আপনি নিঃসঙ্কোচে বলুন।"

তিনি বলিলেন—"আমার ভগ্নী কাল ঢাকা যাচ্ছেন। আপনার ন্যায় একজন বন্ধু ব্যক্তির সহিত তাঁহাকে পাঠাতে পাল্লে নিশ্চিন্ত হ'তে পাত্তুম্। অবশ্যি তাঁর সহিত আরও, দু'জন লোক যাচ্ছে। তবে, মেয়ে ছেলে নিয়ে যাতায়াত—

আমি বলিলাম "তা আমি তাঁহাদিগকে ঢাকায় রাখিয়া যাইব। এ আর কষ্ট কি? আমি ঢাকা হইয়াই বরং আসাম যাইব।"

হেড্ বাবু আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন—"তবে কাল প্রাতঃকালেই বিদেয় হয়ে আমার বাসায় আস্‌বেন্, এখানেই আহার হবে—এই কথা র'লো।" আমি সম্মতি প্রদান করিয়া বিদায় হইলাম।

বড় রাস্তায় প'ড়িয়াই দেখি—সুরেশচন্দ্র। "একি তুমি এখানে কেন"? যুগপৎ উভয়কে উভয়ে প্রশ্ন করিলাম। সুরেশ আমাকে একেবারে অনেকগুলি প্রশ্ন করিল, আমিও সেই প্রশ্নগুলিই পুনরায় তাহার প্রতিবর্ষণ করিয়া উভয়ে উভয়ের উত্তর প্রতীক্ষায় রহিলাম।

রাস্তায় দাঁড়াইয়া দুইজনে কুশল, মঙ্গল, বাড়ী, ঘর, সংসার, পরিবার, আত্মীয়স্বজন, চাকুরী ব্যবসায় প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের জিজ্ঞাসাবাদ হইল। ভাব অভাব সম্বন্ধীয় কথাও যে না লইল, তাহা নহে।

অনেক কথাবার্ত্তার পর সুরেশ বলিল, "আমাদের রাধারমণ বাবু পীড়িত হইয়া এখানে চিকিৎসার্থে আসিয়াছেন, চল একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসি। তিনি তোমার একজন উপকারী বন্ধু। অতি শোচনীয় অবস্থা—বাঁচিবার আশা নাই। আমি সেখানেই যাচ্ছি।"

রাধারমণ বাবু আমাদিগের প্রতিবেশী। বাবার মৃত্যুর পর তিনি আমাদিগকে একরূপ রক্ষাই করিয়াছিলেন। সুতরাং সুরেশের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিলাম না। আমরা ট্রাম কার ধরিলাম।

বাগবাজারের একটী ভাড়াটে গৃহে আমরা প্রবেশ করিলাম। সুরেশের অপেক্ষা রাধারমণ বাবু আমার অধিক আত্মীয়, পিতৃবন্ধু। আমি অগ্রবর্ত্তী হইয়া যাইয়া বাড়ীর ভিতর একখানা রুগ্নশয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। শয্যায় রোগী শায়িত, পার্শ্বে একটী যুবতী ও একটী প্রৌঢ়া রমণী। যুবতী আমাদিগের আগমনে অবগুণ্ঠনটী অপেক্ষাকৃত অধিক টানিয়া দিল। প্রৌঢ়া অল্প অবগুণ্ঠন টানিয়া সুরেশকে ইঙ্গিতে বসিবার আসন দেখাইয়া দিল।

আমি রাধারমণ বাবুকে চিনিতেই পরিলাম না। রোগীর চেহারার প্রতি আমি অবাক্ হইয়া তাকাইয়া রহিলাম। সুরেশ আমার অবস্থা বুঝিতে পারিল। সে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

"যোগেশ, তোমার শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রণাম কর।"

আমি অজ্ঞাতসারে যেন আকাশ হইতে পড়িয়া গেলাম। আমার অন্তরের ভিতর একটা তুমুল ঝটিকা বহিয়া যাইতে লাগিল। সুরেশের চক্রান্তে বড়ই বিরক্তি বোধ হইয়াছিল বটে কিন্তু রোগীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি নিজকে মুহূর্ত্ত মধ্যে সংযত করিলাম এবং শিষ্ট ছেলেটীর ন্যায় সুরেশের আদেশ প্রতিপালন করিলাম।

মুহূর্ত্ত মধ্যে একটা চঞ্চল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। রুগ্নশয্যা যেন এক অভিনব আনন্দ হিল্লোলে হিল্লোলিত হইয়া উঠিল। গৃহখানায় নূতন অতিথির পুণ্য আগমনে যেন অপূর্ব্ব পুলক বিরাজ করিতে লাগিল। চারিদিকের সাগ্রহদৃষ্টি সেই পুলক শতগুণে জাগাইয়া তুলিল। (ক্রমশঃ)

তাম্রকূট প্রসঙ্গ।

কল্কিপুরাণ বলিয়া সংস্কৃতে যে একখানা উপপুরাণ আছে—যাতে কলির অবতার কল্কির বীরপণা বর্ণনা করা হইয়াছে—তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। কিন্তু বাংলায় যে ঐ নামে একখানা বই আছে, তাহা বোধ হয় সকলের জানা নাই। ইহার গ্রন্থকারের বা প্রকাশকের নাম আমি জানিনা এবং প্রাপ্তিস্থান কোথায় তাহাও বলিতে পারিব না, কিন্তু বই খানা আমি দেখিয়াছি, তাহা বলিতে পারিব। সে কল্কিপুরাণেও কল্কির কথাই বলা হইয়াছে;—কিন্তু সে চেতন কল্কি নহে, মৃত্তিকা নির্ম্মিত হুঁকার শিরোভূষণ কল্কি।

কবি বলিয়াছেন, সৌন্দর্য্য বিষয়ে শকুন্তলা বিধাতার আদ্যা সৃষ্টি। আমাদের গ্রন্থকার বলিয়াছেন, কেবল সৌন্দর্য্য বিষয়ে নয়, মাহাত্ম্য বিষয়েও কল্কিই বিধাতার আদ্যা সৃষ্টি। এ মত ভেদের মীমাংসা কে করিবেন জানিনা, কিন্তু তামাকু সেবীদিগের যদি ভোট গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে কল্কিকে অসুন্দর ব'লিবার সাধ্য নাই। পাদ্রীরা বলেন, যীশুকে যদি বুঝিতে চাও, আগে তাঁহাতে বিশ্বাস কর এবং ভক্তি কর। না বুঝিলে বিশ্বাস ও ভক্তি হয় কিনা জানি না, এবং বিশ্বাস ও ভক্তি হইয়া গেলে, বুঝিবার কোন দরকার থাকে কিনা, তাহাও বিচার্য্য নয়। কিন্তু আমাদের গ্রন্থকার বলিতেছেন, এবং তামাকের উপাসক মাত্রেই অবশ্য বলিবেন—"কল্কির সাহায্য যদি বুঝিতে চাও, আগে তার সেবক হও। বিধাতা কত কষ্টে এবং কত তপস্যার ফলে কল্কির স্বরূপ জানিয়াছেন। মৃত্তিকা যে এই আকার গ্রহণ করিতে পারে এবং তাহাতে যে বিধাতার সমস্ত বিধান শক্তি গুপ্ত থাকিতে পারে, কে আগে তাহা জানিত? বেদ যেমন নিত্য, কল্কিও তেমনি নিত্য;—বিধাতা ইহাকে সৃষ্টি

করেন, এমন কি সাধ্য তাঁর। তিনি ইহাকে 'লোকেতে প্রচার' করিয়াছেন মাত্র!"

আত্ম ভিন্ন দেহের মাহাত্ম্য নাই, প্রাণ ভিন্ন জীবের মাহাত্ম্য নাই;—তেমনি তামাক ভিন্ন কল্কির মাহাত্ম্য নাই। এই যে পদার্থটীর নাম করা হইল, আমাদের গ্রন্থকার বলিয়াছেন, ইহার মাহাত্ম্য বাসুকি সহস্র মুখেও গাহিয়া উঠিতে পারেন নাই!—ব্রহ্মার ত মোটে চারটী মুখ—বিশ্বেশ্বরেরও পাঁচটীর অধিক নয়! এই যে সৌম্য সুদর্শন, সুগন্ধ, সুরস, সুস্পর্শ, সুস্বর, বিধি-বিষ্ণু-মহেশ্বর বন্দিত মহাশক্তি সম্পন্ন পদার্থটী কলিতে জীবগণের একান্ত দুর্দশা দর্শনে করুণা-সিক্ত হইয়া কল্কি বাহনে মর্ত্যে বিচরণ করিতেছেন, ইনি এতই মহান্ যে ইহার বাহনের ও বাহন রহিয়াছে! এবং ইহাঁর বাহন যেমন লোক পরিচিত, বাহনের বাহনটী ও তেমনি লোক পরিচিত ও লোক বন্দিত। তাহার নাম 'হুকা'। এমন যে তামাক তাহাকে যে অজ্ঞান বশতঃ সেবা না করে, মরিয়া সে শৃগাল হয় এবং 'হুকা হুকা' করে! শৃগালের প্রতি যদি কাহারও ঘৃণা থাকে, তাহার প্রতি গ্রন্থকারের উপদেশ সরল।

তামাকের মাহাত্ম্য এখন জগৎ জুড়িয়া প্রচার হইয়াছে। একজন পাশ্চাত্য ঔপন্যাসিককে একবার একজন সম্পাদক জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, আপনি কি প্রণালীতে লিখেন? উত্তরে একটী হিসাব আসিয়াছিল, তাহ ১লা আগষ্টের T. P.' S. weekly হইতে সযত্নে উদ্ধার করিয়া দিলাম।

পত্রিকার জন্য যখন লেখা হয়।

২	নল তামাকে	=	১	ঘণ্টা।
২	ঘণ্টায়	=	১	বিষয়।
১	বিষয়ে	=	৩	প্যারাগ্রাফ।
৩	প্যারাগ্রাফে	=	১	প্রবন্ধ।

উপন্যাস যখন লেখা হয়।

৮	নলে	=	১	আউন্স তামাক।
৭	আউন্সে	=	১	সপ্তাহ।
২	সপ্তাহে	=	১	অধ্যায়।
২০	অধ্যায়ে	=	১	নিব।
২	নিবে	=	১	উপন্যাস।

সাহিত্যিকগণের বিশেষরূপে এই হিসাবটী দেখা উচিত।

তামাকের উপাসনায় নানাদেশে নানাপ্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে। ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বে এদেশে পঞ্চোপচারের পূজা হুকা দ্বারাই হইত; ষোড়শোপচারের বেলা আলবোলার দরকার হইত। হুকাটী ভারতীয় পূজার বিশেষত্ব। অন্যত্র সব জায়গাই নলের প্রভাব দৃষ্ট হয়।

এই নল আবার সব দেশে সমান নয়; ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। আফ্রিকাতে লোহার এবং কাচের নল দৃষ্ট হয়। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে নানা রকমের নল দৃষ্ট হয়। জায়গায় জায়গায় মাটীর নল ও ব্যবহৃত হয়। ভারতে শ্বেতমুখে কি কি পদার্থের নল শোভা পায়, চাপরাসিগণ তাহা বলিতে পারে!

উপাসনায় যাঁরা উন্নত হন, তাঁহাদের ঋষিত্ব লাভ হয়। ভক্ত অনেক ক্ষণ ধরিয়া ভগবান্কে স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারেন না; তামাকের বাস্তবিক সেবক যিনি, তিনিও বেশীক্ষণ তাহার সেবা না করিয়া থাকিতে পারেন না। একজন বিচারক একদা বলিয়াছিলেন—"কি অবিচার! এতক্ষণ ধরিয়া আদালতে নল-বিহনে বসিয়া থাকা!"

তামাক সেবনে কার্লাইলের বোধ হয় ঋষিত্ব লাভ হইয়াছিল। তাঁহার যকৃতের দোষ ছিল বলিয়া ডাক্তার তাঁহাকে তামাক খাইতে বারণ করেন। কিন্তু তা সত্বেও তাঁর কোন উপকার হয় নাই। একদা মাঠে বেড়াইতে ২ একটী নল এবং কিছু তামাক দেখিতে পাইয়া কার্লাইল আর থাকিতে পারিলেন না। সেই হই ত তিনি তামাকের চির সেবক ছিলেন।

দেবতার নিন্দা উপাসকের প্রাণে সয় না; এবং ধর্ম্মে আঘাত করিলে প্রজা রাজভক্তি ছাড়িয়া দেয়;—তাই যখন কিছুদিন পূর্ব্বে Sir G. Feetwood Wilson ভারতবর্ষে বিদেশী তামাকের উপর টেক্স বসাইলেন, তখন ভারতসাম্রাজ্য প্রায় ডুবুডুবু হইয়াছিল।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গত সংখ্যায় প্রকাশিত
"আমাদের কোন পন্থা অবলম্বনীয়"
প্রবন্ধের শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পং	স্তম্ভ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	৩২	২য়	সহকারী	সহকারে
৩	২২	১ম	জ্ঞানত	জ্ঞানতঃ
,,	৯	২য়	পাশ্চাত্য	প্রাচ্য
৪	৭	১ম	সহকারী	সহকারে
,,	,,	,,	বেবালব্ধ	যোগলব্ধ
,,	১৮	,,	ভেদ	ভোগ
,,	১৯	,,	ভূময়	ভূময়ঃ
,,	৩০	,,	কর্ম্মণিয়ঃ	কর্ম্মণিয়

—বিভিন্ন বয়সে—

কবিবর—রবিন্দ্রনাথ।

Asutosh Press, Dacca.

সৌরভ

দ্বিতীয় বর্ষ। } ময়মনসিংহ, পৌষ, ১৩২০। { তৃতীয় সংখ্যা।

প্রাচীন ভারতে পশু চিকিৎসা।

(Veterinary Science in Ancient India.)

হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ।

(কলিকাতা সাহিত্য সভায় পঠিত।)

প্রাচীন ভারতে পশুচিকিৎসা বিষয়ে কীদৃশ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটী কথা আলোচনার জন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত অস্মদ্দেশীয় অনেকেরই বোধ হয় এই বিশ্বাস যে প্রাচীন ভারতের ঋষি সম্প্রদায় মানবের ব্যাধি উপশমার্থ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের কতক প্রচার করিয়া থাকিলেও গৃহপালিত পশুচিকিৎসা বিষয়ক আলোচনা ও তৎসংক্রান্ত গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। এবং এসম্বন্ধে তাঁহারা কোনও গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক তাহাই আমরা যথাসাধ্য প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব। উক্ত মহাত্মারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিগণ ধ্যান নিমিলিতনেত্রে কেবল মাত্র পারলৌকিক ও অধ্যাত্মবিষয়ের আলোচনাতেই কালাতিপাত করতঃ ইহলৌকিক সর্ব্ববিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ভারতবর্ষের ঐহিক উন্নতির পথ একবারে রুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; এই উক্তি কতদূর বিচারসহ সত্য বটে, আর্য্য ঋষিগণ "ব্রাহ্মবিদ্যা"কেই 'পরা' (শ্রেষ্ঠ) বিদ্যা নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহারা বলিয়াছেন যে "পরা যয়া তদক্ষরমাধিগম্যতে" এবং তদ্ব্যতিরিক্ত সর্ব্ববিধ লৌকিক শাস্ত্রকে তাঁহারা "অপরা" বিদ্যা আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছিলেন; পরন্তু যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধায়ী তাঁহারা অবগত আছেন যে লোকহিতৈষণা প্রণোদিত প্রাচীন ভারতীয় ঋষিসঙ্ঘ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ সাধনোপযোগী বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করতঃ জগতের অশেষ কল্যাণ সাধনে যত্ন ও পরিশ্রমের ক্রটি করিয়া যান নাই। অবশ্য, আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ এই সমস্ত গ্রন্থের অধিকাংশই নানা বিপ্লবে কালের করাল কুক্ষিগত হইয়াছে; তথাপি অদ্যাপি যাহা অবশিষ্ট আছে তদ্বারাই বিলক্ষণরূপে প্রতীতি জন্মে যে পরম কারুণিক ঋষিগণ একদিকে অধ্যাত্ম বিষয়ে চিন্তারত থাকিয়াও, অপরদিকে লোকহিতকর নানা বিদ্যালোচনায় পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তাঁহারা যেমন ষড়ঙ্গবেদ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ এবং ছন্দঃ এই ছয়টী বেদের অঙ্গ) উপনিষদ্ প্রভৃতির আলোচনা দ্বারা অধ্যাত্ম জ্ঞানের উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং ষড়দর্শন আলোচনাতে সূক্ষ্ম বিচারশক্তি এবং তীক্ষ্ণ মনীষার পরিচয় দিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে লোকহিতকর আয়ুর্ব্বেদ, (মনুষ্যায়ুর্ব্বেদ, পশ্বায়ু-

ত্রিকোণমিতি, পরিমিতি, খগোল প্রভৃতি) গান্ধর্ব্ববেদ, (সঙ্গীতশাস্ত্র) ধনুর্ব্বেদ, শিল্পশাস্ত্র, বাস্তুবিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা, কাব্য, অলঙ্কার, নাটক, কথা প্রভৃতি, ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা, কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিদ্যার আলোচনা দ্বারা ঐহিক উন্নতির পথও উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

চতুঃষষ্ঠী কলাবিদ্যা (আমরা এগুলিকে fine arts বলিয়াই আখ্যাত করিলাম) প্রাচীন ভারতে রীতিমত আলোচিত হইত। বাৎস্যায়ন প্রণীত "কাম সূত্র" গ্রন্থের সাধারণাধিকরণের তৃতীয় অধ্যায় পাঠে কলাবিদ্যার প্রত্যেকটির নাম অবগত হওয়া যায় এবং যশোধর কৃত উক্ত গ্রন্থের টীকায় চতুঃষষ্ঠী কলাবিদ্যার ব্যাখ্যাও দেওয়া আছে। এই সমস্ত নিবিষ্টান্তঃকরণে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, প্রাচীন ভারত এক সময়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ত কথাই নাই, পরন্তু ঐহিক শাস্ত্রাদির আলোচনাতেও উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতাভিমানী বুধবৃন্দ ভারতের জ্ঞানগভীরতার অবিসংবাদিত পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছেন। ভারতের নানা স্থানে প্রাচীন মন্দির প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া ভারতীয় স্থপতিবিদ্যার প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সমস্ত বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমাদের অভিপ্রেত নহে; প্রাচীন ভারতে পশুচিকিৎসা বিষয়ক আলোচনাই আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ ((১) শল্যতন্ত্র, (২) শালক্যতন্ত্র, (৩) কায়চিকিৎসা (৪) কৌমার ভৃত্য, (৫) অগদতন্ত্র, (৬) ভূতবিদ্যা (৭) রসায়নতন্ত্র, (৮) বাজীকরণ তন্ত্র এই আটটী আয়ুর্ব্বেদের অষ্টাঙ্গ) প্রচার দ্বারা যেমন মানবের আগন্তুক দোষ সমূহ এবং কর্ম্মজ এই ত্রিবিধ ব্যাধির উপশমার্থ ঋষিগণ নানাপ্রকার ভেষজ আবিষ্কার করতঃ মানবজাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন তদ্রূপ পশ্বায়ুর্ব্বেদ (অশ্বায়ুর্ব্বেদ, গজায়ুর্ব্বেদ, বৃষায়ুর্ব্বেদ প্রভৃতির) প্রচার দ্বারাও মানবের নিত্যপ্রয়োজনীয় গবাশ্বাদির রক্ষা ও ব্যাধি প্রশমের উপায় চিন্তা করিতেও বিরত ছিলেন না। কেবল ইহাই নহে, তাঁহারা বৃক্ষাদিকেও (উদ্ভিজ্জ মাত্রকেই) জীবশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করতঃ তাহাদের ব্যাধি প্রতিকারের জন্য "বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ" প্রচার করিয়া বুদ্ধিমত্তার ও অনুসন্ধিৎসার প্রকৃষ্ট নিদর্শন প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদে প্রাণীগণ চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে; যথা,—

(১) জরায়ুজ (মানুষ, বানর প্রভৃতি ও অন্যান্য চতুষ্পদী স্তন্যপায়ী জীব)

(২) অণ্ডজ (পক্ষী ও কীট পতঙ্গ, মৎস্য ও সরীসৃপাদি)

(৩) স্বেদজ (মশক, দংশ, উৎকুনাদি) এবং

(৪) উদ্ভিজ্জ (বৃক্ষ, লতা, তৃণ ও গুল্মাদি)। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি মনু গম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন —"বৃক্ষাদিরও প্রাণ আছে এবং তাহারাও সুখদুঃখানুভব করে; যথা—"অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখ সমন্বিতাঃ।" আমাদের শাস্ত্রে বৃক্ষাদির শ্রাদ্ধ ও তর্পণের বিধান আছে, অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় এই যে, জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহোদয় অধুনা আবার প্রাচীন ঋষি বাক্যেরই সত্যতা তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণিত করতঃ পাশ্চাত্য জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছেন। বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে "সার্ঙ্গধর পদ্ধতি", "কেদার কল্প", "কৃষি পরাশর" প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে অনেক বিবরণ জানা যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ আলোচ্য বিষয় নহে, অতএব তাহা পরিত্যক্ত হইল।

পাঠকবর্গ বোধহয় বিলক্ষণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন যে, ভারতীয় ঋষিগণ লোকহিতকর কোনও বিষয়ের আলোচনাতেই ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা যে কেবলই পারলৌকিক চিন্তারত যোগী ছিলেন, তাহা নহে, অপিচ পার্থিব উন্নতি চিন্তায়ও রতছিলেন, একথা বলিতে বোধহয় কোনও আপত্তি হইবে না এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মহাত্মাগণের উক্তি যে বিচার সহ নহে তাহাও বোধহয় প্রতিপন্ন হইবে।

অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনায় আমরা প্রকৃত প্রস্তাব হইতে একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি; এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। সংস্কৃত কাব্যাদির টীকা এবং নানাপুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ ও অশ্বায়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ প্রাচীনভারতে প্রচারিত ছিল। প্রমাণস্বরূপ আমরা অগ্নি-

পুরাণের ২৭৬ অধ্যায়ের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি যথা—

"পালকাপ্যোঽহঙ্গরাজায় গজায়ুর্ব্বেদমব্রবীৎ।
শালিহোত্রঃসুশ্রুতায় হয়ায়ুর্ব্বেদমুক্তবান॥"

এতদ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে—মহর্ষি পালকাপ্য অঙ্গাধিপতির নিকট গজায়ুর্ব্বেদ এবং মহর্ষি শালিহোত্র সুশ্রুতের নিকট অশ্বায়ুর্ব্বেদ বলিয়াছিলেন; অতএব পালকাপ্য এবং শালিহোত্র, এই দুই মহাত্মা যে গজায়ুর্ব্বেদ ও অশ্বায়ুর্ব্বেদের আদি প্রচারক তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

পালকাপ্য প্রণীত হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ অতি বিস্তীর্ণ। ইহা—(১) মহারোগস্থান (২) ক্ষুদ্ররোগস্থান (৩) শল্যস্থান এবং (৪) উত্তরস্থান এই চারিটী ভাগে বিভক্ত। প্রথমে, (মহারোগস্থানে) ১৮টী, দ্বিতীয়ে (ক্ষুদ্ররোগস্থানে) ৭২টী, তৃতীয়ে (শল্যস্থানে) ৩৪টী এবং চতুর্থে (উত্তরস্থানে) ৩৬টী অধ্যায় আছে, অর্থাৎ সমগ্রগ্রন্থ ১৬০টী অধ্যায় যুক্ত। অন্যান্য আয়ুর্ব্বেদ সংহিতার ন্যায় হস্ত্যায়ুর্ব্বেদের ভাষাও গদ্য পদ্যময়ী এবং ইহাতে দুই সহস্রের অধিক শ্লোক নিবদ্ধ আছে! গ্রন্থে হস্তীর ৩১৫ প্রকার বিভিন্ন ব্যাধির নিদান ও চিকিৎসাদি বিষয় বর্ণিত আছে। গ্রন্থের ভাষা আর্ষ, গভীর, প্রাঞ্জল এবং প্রাসাদগুণবিশিষ্ট। ইহাও এই গ্রন্থের প্রাচীনত্বের অন্যতম প্রমাণ। শল্যস্থানের ত্রিংশাধ্যায়ে হস্তীর অস্ত্রচিকিৎসা সাধনার্থ যে সমস্ত যন্ত্র শস্ত্রাদির বর্ণনা আছে, তাহা প্রায় সুশ্রুত সংহিতা বর্ণিত যন্ত্রশস্ত্রাদিরই অনুরূপ, হস্তীর অবয়ব প্রভৃতির পার্থক্যানুসারে যাহা কিছু বিভিন্নতা আছে, ইহা হওয়াই স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক যুক্তি সঙ্গত। ফলতঃ এই অধ্যায়টী অতিবিস্ময় জনক। এইগ্রন্থে অস্ত্র-কর্ম্ম সাত প্রকার কথিত হইয়াছে। যথা—

(১) ছেদ্য (Incesion) (২) ভেদ্য (puncturing) (৩) লেখ্য (Scratching) (৪) বিস্রাবণীয় (Evactuting fluids) (৫) বিদারণীয় (বোধ হয় Boring) (৬) এষ্য (probing) এবং (৭) সেবনীয় (sewing)। সুশ্রুত সংহিতায় এতদতিরিক্ত আহার্য্য (Extracting) নামক একটি অধিক ক্রিয়ার উল্লেখ আছে।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক অস্ত্র সাধ্য রোগ চিকিৎসার বর্ণনকালে তত্তৎস্থানে কীদৃশ অস্ত্র কি প্রকারে প্রয়োগ করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে বিশদ উপদেশ সন্নিবেশিত আছে। হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে হস্তীর শারীর স্থান (anatomy, phisiology প্রভৃতি বিষয়), মূঢ়গর্ভ বিদারণ, দন্তোৎপাটন অস্ত্রচিকিৎসার্থে হস্তীকে নানাপ্রকার বন্ধন, কবল (Poultice) স্বেদকর্ম্ম, বাস্তকর্ম্ম (application of syrenge &enima) অগ্নিকর্ম্মবিধান, ক্ষারকর্ম্ম (alkaline treatment) নস্য, ধূপ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে বিস্তৃত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। হস্তি-শালা নির্ম্মাণ, হস্তী-প্রতি পালন, হস্তি-শিক্ষা এবং শাস্ত্রাধ্যয়নের প্রণালী বিষয়েও এই গ্রন্থে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এক কথায় বলিতে গেলে বলা যায় যে হস্তী সম্বন্ধে এমন কোনও জ্ঞাতব্য বিষয়ই নাই, যে সম্বন্ধে হস্ত্যায়ুর্ব্বেদগ্রন্থে আলোচিত হয় নাই। হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ গ্রন্থখানা মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিলে বাস্তবিকই বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয় এবং স্মরণাতীত কাল পূর্ব্বেও যে মহর্ষি পালকাপ্য কতদূর অনুসন্ধিৎসা জ্ঞানগভিরতা এবং সুক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিলক্ষণ রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। এই গ্রন্থখানা ১৮৯৪ খৃঃ চারি খানা হস্ত-লিখিত পুস্তকাবলম্বনে পাঠান্তরাদি সহ শ্রীযুক্ত মহাদেব চিমনজী আপ্তে মহোদয় পুনা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত করতঃ জন সমাজে প্রচারিত করিয়াছেন। প্রচারক মহাশয় ইহাতে ভারতবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন ও ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। গ্রন্থে কোনও টীকা সংযোজিত না হওয়ায় এবং হস্তলিখিত আদর্শ পুস্তকগুলির স্থানে স্থানে ত্রুটি থাকা নিবন্ধন, কতক শ্লোক অসম্পূর্ণ ভাবে মুদ্রিত হওয়ায় গ্রন্থের বোধ সৌকার্য্যের কথঞ্চিৎ অন্তরায় ঘটিয়াছে। ইহা প্রকাশক মহাশয়ের দোষ নহে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রানুশীলনকারী সুধীবর্গ যদি এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও ভারতীয় অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করেন, তবে হস্তীপালনকারী ব্যক্তিগণের বিশেষ উপকার হয়। ভারতবর্ষের নানাস্থানে রাজন্য ও ভূম্যধিকারীগণ হস্তী প্রতিপালন করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনুবাদে হস্তক্ষেপ

করেন। পদ্মগর্ভের পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতে তৎকৃত "ক্রমদীপিকার টীকা" "পৈঙ্গী রহস্য" "উপ-নিষদ্ভাষ্য" প্রভৃতি গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। † পরম পণ্ডিত ও পরম বৈষ্ণব এই পদ্মগর্ভই পুরুষোত্তমের জনক।

পদ্মগর্ভ পরে জন্মভূমি ভিটাদিয়াতে আগমন করেন ও তথায় আরও দুই বিবাহ করেন। সেই দুই বিবাহেও তাঁহার অনেক পুত্র কন্যার উদ্ভব হয়। "ময়মনসিংহে শ্রীচৈতন্য' প্রবন্ধে আমরা যে লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী নামক এক সাধু ব্যক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছি, তিনিই পদ্মগর্ভের দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভসম্ভূত পুত্র—পুরুষোত্তমের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন।

সার্দ্ধ ত্রিপাত্রের একতম—এই বিশিষ্ট ও প্রধান গৌরপার্ষদ এই ময়মনসিংহের লোক ছিলেন, পূর্ব্ববঙ্গের বৈষ্ণববর্গ ইহা স্মরণে গৌরব অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।

আমাদের স্বর্গীয় প্রতিবেশী ইরু।

প্রবন্ধের নাম দেখিয়া যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন যে আমরা 'ইরু' নামক আমাদের কোন প্রতিবেশীর স্বর্গ প্রাপ্তির প্রসঙ্গ লইয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, তবে তিনি নিতান্ত অন্যায় মনে করিয়াছেন কিনা তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি না।

তারারা কারা? এই প্রশ্ন লইয়া বহু যুগ যাবৎ তর্ক চলিয়াছে। ঠাকুর মা, দিদি মা প্রভৃতির নিকট শুনিয়াছি, মানুষ মরিয়াই স্বর্গে যাইয়া তারা হয়। সুতরাং আমরা যে ইরুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি, এই ইরুও হয়ত এক-দিন আমাদেরই কাহারও নিতান্ত নিকট প্রতিবেশী ছিলেন, স্বর্গ প্রাপ্তি বশতঃ এখন তারা হইয়া সম্প্রতি ইরু (Eros) নামে পরিচিত হইয়াছেন।

বাস্তবিক ইরু মর্ত্তধামে বাস করিতেন কি না এবং করিলেও তিনি আমাদিগের কারো প্রতিবেশী ছিলেন কিনা—তাহা আমরা অবগত নহি। সম্প্রতি তিনি স্বর্গের যে লোকে বাস করিতেছেন, তাহা জর্ম্মণ পণ্ডিত Dr. Witt দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে আবিষ্কার করিয়াছেন।

এই আবিষ্কারে ডাক্তার প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, অন্তরীক্ষে যতগুলি গ্রহ বা লোক সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে, তন্মধ্যে ইরুই আমাদিগের ভূলোকের নাকি সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশী। এতদিন আমরা শুক্র গ্রহকে এবং মঙ্গল গ্রহকে আমাদিগের নিকটবর্ত্তী জানিতাম। মঙ্গলের অধিবাসীদিগের সহিত সম্বন্ধ সংস্থাপন প্রয়াসে বৈজ্ঞানিক সমাজও আকাশ পাতাল কল্পনা করিতেছিলেন। ইরু (Eros) আবিষ্কৃত হওয়ায় ইহাকে লইয়াই বেশ একটু আলোচনা চলিয়াছে। আমরাও আমাদিগের পাঠকগণের নিকট আমাদের এই স্বর্গীয় প্রতিবেশীটীর পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

---

† "সেই পদ্মগর্ভ কৃষ্ণভক্তোত্তম।
ক্রমদীপিকার টীকা করিল রচন॥
পৈঙ্গীরহস্য, ব্রাহ্মণের ভাষ্য কৈলা।
উপনিষদের দ্বৈত ভাষ্য তাহা বিরচিলা।
অধ্যয়ন শেষ করি পদ্মগর্ভ মহামতি।
জন্মস্থান ভিটাদিয়া করিলা বসতি। (প্রেমবিলাস)

এ পর্য্যন্ত যে নয়টী গ্রহের অস্তিত্বের বিবরণ আমরা অবগত আছি, তাহারা সূর্য্য হইতে যথাক্রমে এইরূপ নিয়মে দূরে অবস্থিত। সূর্য্যের অতি সান্নিধ্য প্রতিবেশী বুধ, বুধ সূর্য্যের তিন কোটী ষাট লক্ষ মাইল নিকট অবস্থিত। তারপর শুক্র, তারপর পৃথিবী, তারপর মঙ্গল, তারপর গ্রহপুঞ্জ, তারপর বৃহস্পতি, তারপর শনি, তারপর উরেনস, সর্ব্বশেষ নেপচুন। নেপচুনের পর জ্যোতির্ব্বিৎগণের দুরদৃষ্টি পুনঃ পুনঃ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।
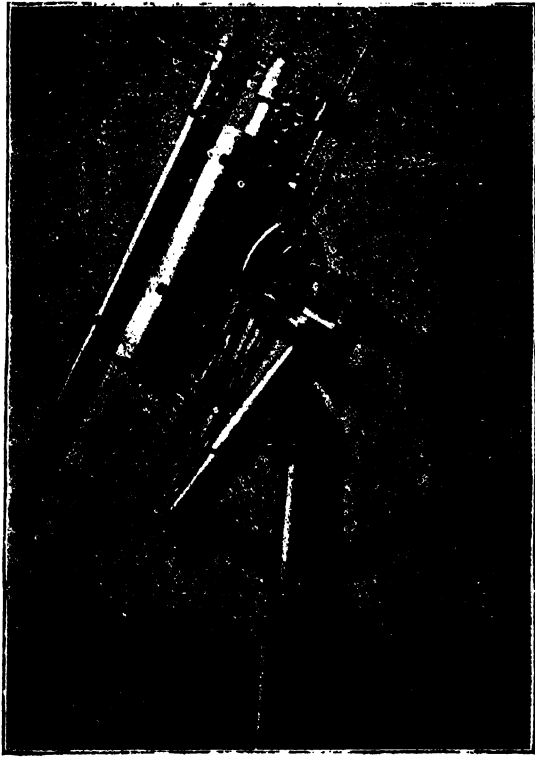
ডাঃ উইটের ফটোগ্রাফিক টেলিস্কোপ।

আর কত দুরই বা যাইবে?—কেন না নেপচুনটী আমাদের প্রতি যখন খুব সুপ্রসন্ন হইয়া আসিয়া আত্মীয়তা সংস্থাপন করেন, তখনও তাহার দুরত্ব আমাদের নিকট হইতে দুই শত আটাত্তর কোটী মাইলের বেশী থাকে। সময় সময় তিনি আমাদের নিকট হইতে ৯।১০ কোটী মাইল দূরেও চলিয়া যান।

বৃহস্পতি ও মঙ্গলের মধ্যে ১৮৯৮ সনের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ৪৩২টী গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহারা সংখ্যায় এত অধিক হইলেও জ্যোতির্ব্বিৎ সমাজ ইহাদিগকে একটী সাধারণ 'গ্রহপুঞ্জ" নামেই পরিচিত করিতেছেন।

গ্রহপুঞ্জকে লইয়া এত দিন "নবগ্রহ" ছিল, সম্প্রতি ইরুর আবিষ্কারে তাহা "দশ গ্রহে" পরিণত হইল।

ইরু কি প্রকারে লোক-লোচনে আবদ্ধ হইলেন, তাহার ইতিহাস বেশ কৌতুহলাবহ। আমরা নিম্নে অতি সংক্ষেপে তাহার ইতিহাস বিবৃত করিলাম।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে এক রাত্রিতে বার্লিনের মানমন্দির হইতে ডাক্তার উইট আকাশের একখানা ফটো গ্রহণ করেন। তিনি সাধারণ কেমেরার পরিবর্ত্তে ফটোগ্রাফিক টেলেস্কোপ (আলোক চিত্র গ্রাহী দুরবীক্ষণ) ব্যবহার করেন।

মনুষ্য চক্ষু এক দৃষ্টে দূরবর্ত্তী নক্ষত্রের দিকে স্থাপন করিলে ১০ সেকেণ্ডের মধ্যে পরিশ্রান্ত হইয়া যায়। কিন্তু ফটোগ্রাফিক টেলিস্কোপ কখনও পরিশ্রান্ত হয় না। এই যন্ত্র অনেকক্ষণ আকাশের দিকে খুলিয়া রাখা যায়। এইরূপে রাখিলে যন্ত্রের আয়ত্ত অনুসারে দুর আকাশের নক্ষত্র গুলির অবিকল ফটো উঠিবে। যে নক্ষত্র প্রথম দৃষ্টি নিক্ষেপেই ধরা না দেয়, তাহাকে তখন অধিক চেষ্টা করিলেও ধরা যায় না।

ইরু যন্ত্রাবদ্ধ হইয়া ধরা পড়িলেন। তাহার শরীরের বিশেষ রেখাকৃতিগুলির পরীক্ষাদ্বারা ডাঃ উইট বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার কলে একটী নূতন জগৎ ধরা পড়িয়াছে। তিনি তাহার ফটো লইয়া এবং তাহার অবস্থিত স্থানের দুরত্বের পরিমাণ লইয়া শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন, যে, তাঁহার কলে আবদ্ধ এই নূতন স্বর্গীয় মহাত্মাটী আমাদের অত্যন্ত নিকটে থাকিয়াও এ পর্য্যন্ত জ্যোতির্ব্বিদগণের 'চোখে' ধুলাদিয়াই ফিরিতেছিলেন।

ইরু ধরা পড়িয়াই যে এই উপাদেয় নামটী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। ইরুর আত্মপ্রকাশের পূর্ব্বে নক্ষত্র পুঞ্জে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৪৩২টী নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল; সুতরাং ইরু জ্যোতির্ব্বিদ সমাজ কর্ত্তৃক "৪৩৩ নং ১৮৯৮ D. Q." এই চিহ্নিত নামে অভিহিত হইলেন।

এই ৪৩৩ নং ডি কিউ মহাশয়ের আবিষ্কারে

জ্যোতির্ব্বিদ সমাজে যে একটু আলোচনা চলিয়াছিল, তাহা, তাহার বিশেষ গুণের বা আকারের জন্য নহে। তাহার একমাত্র কারণ—চন্দ্র ব্যতীত তিনিই আমাদিগের একান্ত নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশী।

ইরুর আবিষ্কারের পূর্ব্বে শুক্রকেই আমরা আমাদের নিকটবর্ত্তী বলিয়া জানিতাম। শুক্র যখন পৃথিবীর অত্যন্ত নিকটে আসেন, তখন আমরা শুক্রের দুইকোটী পঞ্চাশ লক্ষমাইল নিকটে
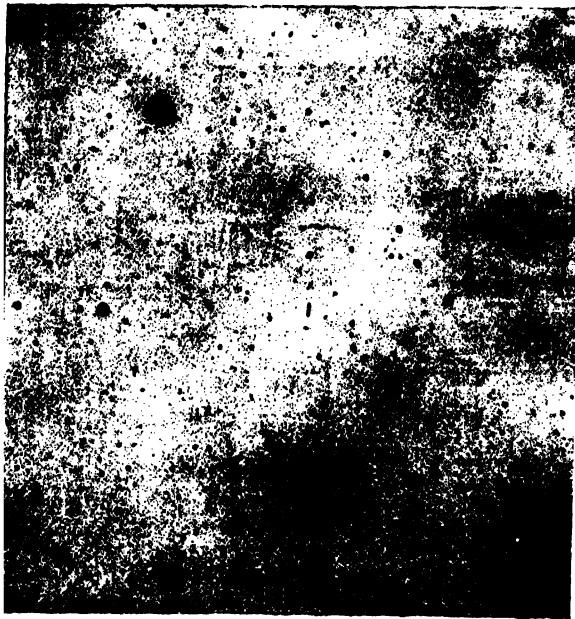
আকাশের আলোকচিত্র।

(চিত্রের ঠিক মধ্যস্থলে এইরূপ— আকৃতি যুক্তটাই ইরু।)

যাই। ইহার পর মঙ্গল—সময় সময় তিনকোটী ৫০ লক্ষ মাইল নিকটে আসেন। কিন্তু ইরু যখন আমাদের খুব নিকট আসে তখন আমরা তাহা হইতে মাত্র এককোটী ত্রিশলক্ষ মাইল দূরে থাকি!

এত নিকটে আসিলেও ইরুকে নগ্ন চক্ষে দেখা অসম্ভব। ইহাকে দেখিতে খুব উচ্চশ্রেণীর দূরবীক্ষণের প্রয়োজন। ইহার কারণ—ইরুর আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ইহার ব্যাস Crommalin এর মতে ১৭ মাইল মাত্র। Sir Robert Ball গণনাদ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে চন্দ্রকে দশলক্ষ খণ্ডে বিভক্ত করিলেও এক এক খণ্ড চন্দ্র, ইরুর আকারের দ্বিগুণ থাকিবে।

কোন জিনিস তাহার আকারের পাঁচ হাজার গুণ পর্য্যন্ত দূরে থাকিলে দেখা যায়। ইরু তাহার আকারের পাঁচ হাজার গুণ অপেক্ষা বহু অধিক দূরে অবস্থিত। সুতরাং চর্ম্মচক্ষে তাহাকে দর্শনের আশা বৃথা।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে এই যে—এই ক্ষুদ্র গ্রহটীর আবিষ্কার হইতে জ্যোতির্ব্বিদ সমাজ কি উপকার বা নূতন সত্য লাভ করিতে পারিয়াছেন? অবশ্য কিছু যে না করিয়াছেন তাহা নয়। পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব এ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই। আধুনিক জ্যোতিষীদিগের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার মানমন্দিরের অধ্যক্ষ মিঃ গিল সূর্য্যের ব্যবধান যথা সম্ভব নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার গণনাই শেষ গণনা। তিনি বলেন সূর্য্য পৃথিবী হইতে ৯২৮৭৪০০০মাইল দূরে অবস্থিত। এই সর্ব্বাপেক্ষা শেষ বিশুদ্ধ (?) গণনাতেও ৫০ হাজার মাইলের গোলমাল রহিয়াছে। ইরুর আবিষ্কারে এই ৫০ হাজারী গোলমাল ২৫ হাজারে আসিয়া নামিয়াছে। এখন অনেকের আশা হইয়াছে যে এই ২৫ হাজারেরও সুসমাধান হইবে। আপাততঃ ইহাই কম সত্য লাভ কি?

কেহ কেহ মনে করেন, ইরু অধুনা আসিয়া আমাদের সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন না, তাহা নহে। সৌরজগতের সৃষ্টি হইতেই ইহা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। যাহাই হউক, ইরু ধৃত হওয়ায় জ্যোতির্ব্বিদগণ অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন এবং আশা করিতেছেন যে তাহার সাহায্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আরও অনেক নূতন তত্ত্ব উদ্ভাসিত হইবে।

— ———

মায়ার খেলা।

রায় চৌধুরী ও বন্দোপাধ্যায়েরা এক পল্লীগ্রামেই বাস করেন। এখন আর রায় চৌধুরীদের বাড়ীর ভাঙ্গা দেয়ালের জীর্ণ সংস্কার হয় না। নানা প্রকার ঝোপ ঝাড় ও আগাছা বন জঙ্গলে কোনও রকমে ভাঙ্গা বাড়ীটীর আব্রু রক্ষা হইতেছে। আর নদীর কূলে বন্দোপাধ্যায়-দের নূতন চূণ ফেরাণো প্রকাণ্ড পাকা ইমারত—যেন নক্ষত্রালোকের পানে সাদা ধপ ধপে ডানা দু'টী মেলিয়া রহিয়াছে। আগে এ অঞ্চলের লোকেরা রায় চৌধুরীদেরই রীতিনীতি, আদব কায়দার অনুকরণ করিত। এখন আর সে দিন নাই। আপাততঃ সম্পদ লক্ষ্মী বন্দোপাধ্যায় দের বাড়ীতেই কিছু দিনের জন্য আশ্রয় লইয়াছিলেন।

এই রায় চৌধুরীদের বাড়ীতে কর্ম্ম করিয়াই কিন্তু বন্দোপাধ্যায় পরিবার সুদিনের মুখ দেখিয়াছেন। সে বড় বেশী দিনের কথাও নয়, বন্দোপাধ্যায় কুলের বর্ত্তমানে বংশধর অমরনাথের পিতা অহিভূষণ এই রায় চৌধুরী-দের বাড়ীতেই জমা সেরেস্তায় একটী মহুরীর পদে অধিষ্ঠিত হন। ক্রমে মহুরী হইতে জমানবীস, জমানবীস হইতে ডিহির নায়েব এবং শেষকালে বাবুদের অনুগ্রহভাজন হইয়া সদর নায়েবী পদে উন্নতি লাভ করেন। অহি ভূষণ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিতে কখনো কসুর করেন নাই; কিন্তু তিনি কখনো লবণের মর্য্যাদা বিস্মৃত হন নাই। বরং বরাবর রায় চৌধুরীদের সম্মান রক্ষা করিয়াই চলিয়াছেন। প্রতিবেশী-দিগের মধ্যে ছোট বড় সকলের বাড়ীতেই সর্ব্বদা যাতা-য়াত ছিল। পাড়ার সকলের সহিত কুটুম্বিতা রক্ষা করিয়াই চলিয়াছেন। ও পাড়ার গোলকের পিসিকে কখনো টাকাটা সিকিটা না দিয়া প্রণাম করিতেন না। প্রতি বৎসরই পূজার সময় হরকুমারের খোঁড়া নাতনীটি তাঁর নিকট হইতে একখানা ডুরে চারখানা শাড়ী পাইয়া আসিত। এবং কোনও বছরই মৈত্রদের জটা দোল যাত্রা উপলক্ষে অহিভূষণের নিকট হইতে এক শিশি মেজেণ্টারং এবং এক মালসা আবির হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

অহিভূষণ মৃত্যুকালে নগদ টাকা রাখিয়া যান যথেষ্ট। অমরনাথের আর এখন তাঁর বাপের মত সাদাসিধে চাল চলন নহে। তাঁর এখনকার আদব কায়দা সবই পাকা বুনেদি ধরণের। তিনি বলিতেন—বাবা ছোট থেকে বড় হয়েছিলেন, তাই ভাবটা একেবারে বদলাতে পারেন নি; কিন্তু আমি তো রূপার চামচে দাঁতে করেই ভূমিষ্ঠ হয়েচি। এমন কি রায় চৌধুরীরা এখন পর্য্যন্ত রিটার্ণ ভিজিট দিতে শিখে নাই বলিয়া অমরনাথ তাঁহাদের বাড়ীতে যাতায়াত একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সেবার দুর্গোৎসবে প্রতিমা বিসর্জ্জনের মিছিলে বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ী হইতে যে সব আসা ছোটা ও জরি জহরতের আস-বাব বাহির হইয়াছিল রায় চৌধুরারা কোন পুরুষে ওরূপ জিনিষ পত্রচোখেও দেখে নাই।

রায় চৌধুরীদের যখন প্রতিপত্তি ছিল, তখন তাদের বাড়ীতেও বারো মাসে তের পার্ব্বণ রীতিমত জাকজমকের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। নাট মন্দিরের কাচের ঝাড়ের ঠেনের টুংটাং ধ্বনির সহিত ঝিঁঝিটের সুমিষ্ট আলাপ মিশ্রিত হইয়া পল্লীর হৃদয় এখন আর অপূর্ব্ব পুলক রসে মদির হইয়া উঠে না। সাবেক কর্ত্তারা নিজেদের মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় দিতে গিয়া যে ভাবে ব্রহ্মোত্তর নাখেরাজ দান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এখনকার কর্ত্তাদের সদর খাজানা চালাইয়া মোটামুটকম অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিতেই আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়া পড়ে। তবু এখনো এ বাড়ীতে দাস দাসীর অন্ত নাই। খানসামারা এখনো সাবেক নিয়মে চাকরাণ জমি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিয়া আস-তেছে। এখনো মাসিক সাড়ে ছয় মুদ্রা বেতনের কর্ম্ম-চারীর বাড়ীতে পাকা ইমারত তুলিবার প্রথা একেবারে উঠিয়া যায় নাই।

বাবুরা দুঃসময় নিকটবর্ত্তী দেখিয়া পূর্ব্ব সম্পদের কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেন কিন্তু কি করিয়া আয় অনুসারে ব্যয় সংক্ষেপ করিতে হয়, কি করিয়া নিজের অবস্থার উন্নতি করিতে হয়, নিমজ্জমান সংসারের এখনো যতটুকু অবশিষ্ট আছে, সে দিকে কিছু মাত্র দৃষ্টি ছিল না। তা থাকিবেই বা কি করিয়া। ইহাঁরা এত কাল বাই

নাচ দেখিয়া, ফুলবাগান সাজাইয়া, বুলবুল পাখীর লড়াই করাইয়া এবং সুমিষ্ট আম্বুরী তামাক সেবন করিয়াই দিন পাত করিয়া আসিতেছেন। এ বাড়ীর ছেলেপিলেদের লেখাপড়ার দিকে কোনও কালেই অতিরিক্ত ঝোক দেওয়া হয় নাই। ইহারা তো আর সাধারণ ভদ্র ইতর সকল লোকের ছেলেদের সঙ্গে এক বেঞ্চে বসিয়া এক বই পড়িয়া লেখাপড়া শিখিতে স্কুলে যাইতে পারে না! তারপর তালুক মুলুক কি আছে, না আছে, কাগজ পত্রের অবস্থা কিরূপ—নিজেদের যদি এসব খুঁটি নাটিও দেখিতে হইবে, তবে এত নায়েব গোমস্তা, লোক লস্কর বেতন দিয়া ভরণ পোষণ করিবারই বা প্রয়োজন কি!

সম্প্রতি এক টুকরা জমি লইয়া বন্দোপাধ্যায় ও রায় চৌধুরীদের মধ্যে ভারি রকমের একটা মামলা বাঁধিয়া গেল। উভয় পক্ষ হইতেই খুব সঙ্গিন ভাবে মামলা চলিতে লাগিল। রায় চৌধুরীরা এখন দৈন্য দশায় পড়িয়াছেন বটে কিন্তু তাই বলিয়া জেদ ও ইজ্জতের জন্য টাকা খরচ করিতে কখনো কুণ্ঠিত নন। আর বন্দোপাধ্যায়দের টাকার কথা তুলিয়াই কাজ নাই। গ্রামে প্রবাদ যে একটা পড়ো দালানে যক্ষের গুপ্তধন পাওয়ার পর হইতে নাকি তারা সত্য সত্যই দিনে তারা দেখিতে পায়।

রায় চৌধুরীরা নিম্ন আদালতে মামলাটী হারিয়া যাওয়াতে এখন তাঁহাদের জেদ আরো বাড়িয়া গিয়াছে। বাড়ীতে বড় উকিল আসিয়া খুব ঘটা করিয়া আপীলের দরখাস্তের মুসাবিদা করিতে ছিল। এমন সময় পান চিবাইতে চিবাইতে ভূত মহাশয় রায় চৌধুরীদের বৈঠকখানায় দেখা দিলেন।

আমাদের এই "ভূত মহাশয়" ঠিক প্রেতাত্মা না হইলেও নরাকার রক্ত মাংসধারী ঐ জাতীয় একটী দুষ্প্রাপ্য জীব; "ভূত" ইঁহার বংশগত উপাধী। আসল নাম-রাজীব লোচন ভূত। ইনি সেকালের দুর্ম্মুখের বিংশ শতাব্দীর নূতন সংস্করণ। এপক্ষের খবর ও পক্ষের নিকট পঁহুছাইয়া যেমন একদিকে কলহটি সজীব রাখিতেন, অপরদিকে উভয় পক্ষের নিকট হইতে নিজের খোরাকীর ও বন্দোবস্ত করিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উভয় পক্ষই এই আশ্চর্য্য গ্রাম্য অপ-দেবতাটাকে আপনাদের অকৃত্রিম সুহৃদ বলিয়াই মনে করিতেন! এ হেন রাজীব-লোচনকে দেখিয়া রায় চৌধুরীদের বড় বাবু উমাচরণ আলবোলার রূপার নলটা মুখে পুরিয়া মৃদু হাস্যে বলিলেন—

"ওদিককার খবর কিহে রাজীব?"

রাজীবলোচন নিতান্ত ন্যাকার মত একটু হাসিয়া বলিল:—"কর্ত্তা পিঁপড়ের পাখা হয় উড়বার জন্যে নয়, মরবার জন্যে।" উমাচরণ এই মুখরোচক মন্তব্যটা আস্বাদন করিয়া বলিলেন:—"কি রকম?"

রাজীব লোচন—"আজ্ঞে ওরা কি এখনো আপনাদের সঙ্গে এটে উঠতে পারবে। এখনো আপনাদের হারতে হারতে জিৎ—কি আজ্ঞে করেন উকীল বাবু?

উকীল ভবতারণ বাবুর আপীলের দরখাস্ত মুসাবিদা করিতে করিতে কপাল ঘামিয়া উঠিয়াছিল। ইনি রায় চৌধুরীদের ঘরের বাঁধা উকীল। ভূতটা ভয়ানক ধূর্ত্ত! ভবতারণ বাবু উপস্থিত নগদ ফিসের লোভটা সামলাইতে পারিবেন না মনে করিয়াই সে সহসা তাঁহাকে এমন সাঙ্ঘাতিক প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল!

ভবতারণ বাবু এই রায় চৌধুরীদের সংসারের অনেক নিমক্ খাইয়াছেন এবং আরো অনেক খাইবেন, এরূপ আশা রাখেন। কিন্তু ভবিষ্যতে আরো খাইবার আশা রাখিলেও সম্প্রতি নগদ ফিসের আশু লোভটা কিছু সম্বরণ করিয়া বাবুদের পৈত্রিক সম্পত্তির যে ডগা-খানা এখনো বিনাশ জলধির উপরে ভাসমান আছে, সেটাকে রক্ষা করা প্রয়োজন! কবি চণ্ডীদাস বলিয়াছেন "কি হইবে গোড়া কাটি আগে জল দিয়া!" ভবতারণ বাবু একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া উমাচরণ বাবুকে খাঁটী কথাই বলিলেন:—

"দেখুন, আপীলে যে এমামলায় আমরা বড় যুৎকরে উঠতে পারবো, এমনতো মনে হচ্চে না!"

উমাচরণ বাবু বিবর্ণমুখে আলবোলার নলটা খট্ করিয়া ফরাসের উপর ফেলিয়া দিয়া উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন:—"কেন কেন, না হয়, বড় ব্যারেষ্টার দিন, টাকা যত লাগে আমি আছি!"

ভবতারণ বাবু পাকা উকীলের মত হাসিয়া বলিলেন:—"টাকা খরচ করে নথি দুরুস্ত করার সময়

আপনারা লোয়ার কোর্টে হারিয়েছেন। এখন টাকায় আর নথি বদলাবে না"!

তারপর ভবতারণ বাবু সাক্ষীগণের উক্তির পরস্পরের অনৈক্য ও বিরুদ্ধতা দেখাইয়া মোকদ্দমার অবস্থা ও আইন ঘটিত তর্ক সমুদয় বাবুদের নিকট যথাযথ বিবৃত করিয়া উপসংহারে বলিলেন ঃ—"আপনাদের এ মামলা জিৎবার আশা খুবই কম। ওপক্ষেও মামলা করে যে টাকাটা খরচ হবে তাতে ঐ রকম দশগুণ জমি কিনে ফেলা যায়। এখন মানে মানে আপোষ না করলে আপনাদের আর ইজ্জত বজায় থাকে না"!

বাস্তবিক, বর্ত্তমান অবস্থায় আপোষের প্রস্তাবটী যে সত্য সত্যই যুক্তিসঙ্গত, এবং উভয় পক্ষেই লাভজনক এই সোজা কথাটা দুই পক্ষকে বুঝাইতে গিয়া উকীল বেচারীকে দুই বাড়ীতে যে পরিমাণ হাঁটাহাটী করিতে হইয়াছিল, তাহাতে একটী পুরাতন অজীর্ণ গ্রস্থ রোগী অনায়াসে বিনা চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিতে পারিত। যাহোক, ইহা উকীল বাবুর পরম সৌভাগ্য যে অবশেষে উভয় পক্ষই আপোষের প্রস্তাবে এক রকম 'নিমরাজি' হইলেন।

(২)

বিখ্যাত রায় চৌধুরীদের পরিবারে এখন দুই সহোদর বর্ত্তমান। উমাচরণ ও বামাচরণ। দুই ভাই একান্নবর্ত্তী, উমাচরণই জ্যেষ্ঠ। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক ব্যয় বাহুল্য এখন যথাসম্ভব সংক্ষেপ করা হইয়াছে। কিন্তু এ বাড়ীতে জ্যৈষ্ঠে জামাই-ষষ্ঠী, ভাদ্রে মন্থান ষষ্ঠী এবং অগ্রাণে গুহ ষষ্ঠী প্রভৃতি মা ষষ্ঠীর তুষ্টি-বিষয়ক ব্রতগুলি খুব ঘটা করিয়াই বরাবর সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। তার ফলে এ বাড়ীতে ষষ্ঠী দেবীর বাৎসল্য দৃষ্টিটা যে খুব তীক্ষ্ণ ছিল, কিছুতেই এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইবে না। বংশতত্ত্ব আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, দত্তকপুত্র দ্বারাই এ পরিবারের এতদিন বংশরক্ষা হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময়েও রামাচরণ নিঃসন্তান। উমাচরণের একমাত্র কন্যা কিরণশশী। হৃদয়ের সমুদয় স্নেহধারা এই একটী মাত্র কন্যার উপর অপরিমিত ভাবে সিঞ্চন করিয়াও দুই ভাইএর বাৎসল্যের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হইত না। দেখিতে দেখিতে কিরণশশী ডাগর হইয়া উঠিল। এ বাড়ীতে কন্যাকে অষ্টমবর্ষে গৌরীদান করিয়া পরলোকে অক্ষয় পূণ্যসঞ্চয় করাই কৌলীক প্রথা। তবু যে কেন কিরণ শশী নবযৌবনে পদার্পণ করিয়াও পিতৃ-গৃহে এতদিন আইবড় অবস্থায় ছিল, তার একটী ছোট্ট ইতিহাস আছে। কথাটা আর কিছু নয়, কিরণশশীর বিবাহ হইয়া গেলে উমাচরণ আর কি লইয়া সংসারে ভুলিয়া থাকিবেন? এক নন্দ-কুল-চন্দ্র বিনা যে তাঁর সাধের বৃন্দাবন অন্ধকার হইয়া যাইবে!

কিরণ শশীর চোখের আড়াল হইবার দিন নিকট-বর্ত্তী হইয়া আসিতেছে দেখিয়া শ্রীশ্যামাসুন্দরীও এখন হইতেই দিনে দুইবার করিয়া কান্নাকাটির "মহলা" দিতে সুরু করিয়া দিয়াছেন। অথচ, নিতান্ত বাড়ীর ফুল বাগানের পাশেও তো কোন সুশ্রী, বিদ্বান, বিনীত, অর্থশালী, তরুণ সৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর নয়। এ সমুদয় না হইলেই বা কেমন করিয়া ঘুম হইতে উঠিয়া যার মুখ দেখা যায় তার হাতে এমন ক্ষীরের পুতুল বিলাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। দেশের এমনি দুরবস্থা যে সুশ্রীবর মিলে ত সে সচ্চরিত্র হয় না। সচ্চরিত্র হয় ত সে বিদ্বান হয় না। যদিবা একাধারে এই তিন গুণ মিলিত হয়, তবে সে বরের লেজে হাতে দেয় কার সাধ্য। তার পণের কড়ি ও যৌতুকের আসবাব পত্র যোগাইতে গেলে, জমাজমি বাড়ী ঘর মহাজনের শ্রীকরকমলে সমর্পণ করিয়া স্ত্রীপুত্র সহকারে মুস্কিল আসানের চেরাগ লইয়া একেবারে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইতে হয়!

কিরণ শশী নবযৌবনের প্রেমোজ্জ্বল নাট্যশালায় প্রথম পদার্পণ করিয়াই অনুভব করিল, যেন ভগবান পুষ্পধনুর একটী মাত্র মধুর ইঙ্গিতে সমুদয় প্রকৃতি এক অকাল বসন্তের বিচিত্র ফুল-পল্লব, গন্ধ-গুঞ্জন, মোহ-মদিরা লইয়া তার চারিধারে সজীব হইয়া উঠিয়াছে! যে বনফুলটীর দিকে সে এতদিন চোখ তুলিয়াও তাকায় নাই, এখন তারি শোভা দেখিয়া সে মুগ্ধ হয়। আয়না সম্মুখে করিয়া চুল বাঁধিবার সময় আপনার কপোলরক্তিমা আয়নার ভিতর সে প্রতিফলিত দেখিতে পাইয়া নিতান্ত অকারণে

লজ্জিত হইয়া পড়ে! কখনোবা তার সান্দ্র-নিবিড়-নেত্র-পল্লবের উপর অশ্রুর মুক্তাঝালর আপনি সাজিয়া উঠিয়া এক সমীপাগত বিরহ বেদনার সুমধুর পূর্ব্বাভাষ জাগাইয়া তোলে।

(৩)

ভবতারণ বাবুর মধ্যস্থতায় স্থির হইল যে, উভয় পক্ষ আপীল আদালতে রফানামা দাখিল করিয়া মামলাটী আপোষে তুলিয়া লইবেন। কিন্তু এ আপোষের মূল সর্ত্ত—উমাচরণ বাবু, অমরনাথের পুত্র সচীন্দ্রনাথের সহিত কন্যা কিরণশশীর বিবাহ দিবেন। আইন ঘটিত ব্যাপারে প্রজাপতি ঠাকুর্দ্দার এরূপ রহস্য পূর্ব্বে আর কখনো শোনা যায় নাই। উমাচরণবাবু প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। কারণ, হাজার হোক, বন্দোপাধ্যায়েরা হালের বড় মানুষ; কুলেশীলে এরা কখনো রায় চৌধুরীদের সমকক্ষ নয়। কিন্তু এদিকে আবার অমরনাথেরও ধনুর্ভঙ্গ পণ—এ প্রস্তাবে রায়চৌধুরীরা রাজি না হইলে, তিনি কিছুতেই এ মামলা আপোষ করিতে দিবেন না। যথাসময়ে সাক্ষাৎ ভূতমহাশয়, সশরীরে বন্দোপাধ্যায়দের "আলটিমেটাম্" উমাচরণের নিকট উপস্থিত করিয়া বলিলেন :—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়!"

অমরনাথের মতলব—মেয়েটীকে একবার কোন-রকমে সাত পাক ফিরাইয়া অন্দরখানায় পুরিতে পারিলে চাঁদেরা আর যান কোথায়! উহাদের আর সকল রকমেই জব্দ করা গেছে, এখন কৌলীন্যের গর্ব্বটুকু মাটি করিয়া দিতে পারিলেই বন্দোপাধ্যায়দের কিস্তিমাৎ।

উমাচরণও অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে স্থির করিলেন যে, মোকদ্দমাটা এখন আপোষ না করিলে মোকদ্দমার "জাবেদা ও বেজাবেদা" খরচা হইতে এ নিমজ্জমান সংসারটী ভাসাইয়া তোলা নিতান্ত সহজ হইবে না! তার পর শচীন্দ্র ছেলটী তেমন লেখাপড়ায় "চৌকষ" না হইলেও নিরেট গো-মূর্খ নয়; বিশেষ ঘরে খাওয়া পরার কোনও দুঃখ নাই! এরূপ বর্দ্ধিষ্ণু ঘরে মেয়ে পড়িলে তা তার সুখে থাকিবারই কথা! আসল কথা, উমাচরণ যখন দেখিলেন বন্দোপাধ্যায়দের ঘরে মেয়ের বিবাহ হইলে তিনি মেয়েটীকে যখন তখন দেখিতে পাইবেন, তখন এই ভরসাই অন্য সকল যুক্তির অকাট্যতা অতিক্রম করিয়া নিরতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল! যাহা উহক এমন অবস্থায় বিবাহের মত পাক হইতে কোনও পক্ষেই অযথা বিলম্ব হইল না।

একদিন শুভক্ষণে উজ্জ্বল দীপালোকের সাহানার আলাপে চারিটী মিলনোৎসুখ নয়নের দৃষ্টি মিলিত হইল! সচীন্দ্রের সহিত কিরণশশীর বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হইয়া গেল।

এ বিবাহে কোনও পক্ষেই ধুমধাম কম করিয়া করা হইল না। কন্যাপক্ষ হইতে মথুর ভট্টাচার্য্যের যাত্রার দল বায়না করা হইয়াছিল। বহুকাল পরে রায়চৌধুরীদের নাটমন্দিরের ছাউনি মেরামত করিয়া, আলিসার ঝুল ঝাড়িয়া, চামচিকাদের নিরুপদ্রব বাসাগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাতে ঝাড়-ফানুস, মৃদু পবনে কাচের দোলক দুলাইয়া টুং টাং শব্দে মধুর আর্ত্তনাদ করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল! এবাড়ীতে সেরূপ আমোদ প্রমোদের ফোয়ারা অনেক দিন খেলে নাই! বরপক্ষ হইতেও লক্ষ্ণৌ হইতে ইহুদী বাইজী বায়না করিয়া আনা হইয়াছিল। এবং এতই হরেক রকম বাজি বারুদ পোড়ান হইয়াছিল যে করোনে-শনের সময়ও নাকি লোকে কলিকাতায় এরূপ আশ্চর্য্য তামাসা দেখেনাই।

ধীরে ধীরে রঙ্গালয়ের অভিনয়ের মত বিবাহের আনন্দোৎসব চলিয়া গেল। বিবাহের পরেই রফানামা রেজেষ্টরী হইয়া আপীল আদালত হইতে মামলাটী তুলিয়া লওয়ার কথা, কিন্তু বন্দোপাধ্যায়দের তরপ হইতে রফানামায় লিখিত আরেকটী সর্ত্তের আলোচনা উপলক্ষ্যে এমন সব ব্যাসকূটের অবতারণা করা হইল, যে তাহাতে সমুদয় আপোষের প্রস্তাবটা একেবারে বাতিল হইয়া গেল। রায় চৌধুরীরা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, বটে, কেবল আমাদিগকে জব্দ করিবার জন্যই এ বিবাহের ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল! বন্দ্যোপাধ্যায়রা শুকনী পরিলে-হন করিয়া বলিলেন—আপোষের নাম করিয়া, ফাঁকি দিয়া বেয়ারিং পোষ্টে মেয়েটী গছাইয়া দিয়া আবার অত মুখনাড়া—ব্যাপারখানায় হাত ছাপাই আছে বটে!" রায় চৌধুরীরা তর্জ্জনী দেখাইয়া বলিল—বুঝা যাবে।

বন্দোপাধ্যায়রাও অঙ্গুষ্ঠ নাড়া দেখাইয়া বলিল "আচ্ছা।"

রফানামার কথা শুনিয়া অবধি আমাদের পরিচিত ভূত মহাশয়ের অন্ন উঠিবার যো হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে দুশ্চিন্তায় তাঁর আহার নিদ্রা লোপ পাইল! বেচারি গলবস্ত্র হইয়া মা কালীর বাড়ীতে গিয়া সাশ্রু-নয়নে জোড় পাঠা 'মানস' করিয়া আসিল, যেন রফা-নামাটা বাতিল হইয়া যায়। মা কালীর আম মাংসের উপর অত্যধিক অভিরুচি বসতই হউক অথবা ভূত মহাশয়ের প্রাক্তন কর্ম্মফলবসেই হউক আপোষের প্রস্তাব শরতের মেঘের মত বায়ুলোকে মিশাইয়া গেল।

ভূত মহাশয় আবার অন্নসংস্থানের উপায় হইল দেখিয়া পুনরায় ভাল রকমে কোমর বাঁধিয়া লইয়া রীতিমত, এবাড়ীর কথা ও বাড়ীতে এবং ও বাড়ীর কথা এ বাড়ীতে গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

বিবাহের গোলযোগ মিটিয়া যাওয়ার কিছু দিন পরে একদিন বিকাল বেলা রায় চৌধুরীদের বাড়ীর লোকজন খুব ঘটা করিয়া আসিয়া বন্দো-পাধ্যায়দের বাহের বাড়ীর উঠানে পালকী নামাইল। সঙ্গে রায় চৌধুরীর বৃদ্ধ গোমস্তা লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, কিরণশশীকে বাপের বাড়ী লইয়া যাইতে আসিয়া-ছেন। অমরনাথ তাঁহাকে কলের জলের মত অতি পরিষ্কার ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন যে, যৌতুকের জিনিষ পত্র বরাদ্দমত কিছুই বরকে দেওয়া হয় নাই। এবং পান-ভরা মেকী গহনা দিয়া মেয়েকেও ভারি ঠকানো হইয়াছে। এ ব্যাপারে তিনি নাকি আত্মীয় কুটম্বের নিকট অতিশয় অপদস্থ হইয়াছেন। মোট কথা—ক্ষতি-পূরণের টাকাটা নগদ হস্তগত না হওয়া পর্য্যন্ত বন্দো-পাধ্যায় পত্নী কিছুই বৌমাকে বাপের বাড়ী ছাড়িয়াদিতে রাজি নহেন ইত্যাদি।

কর্ম্মচারিটী যথাসম্ভব বিনয় সহকারে বলিল 'বাবুর শরীর অসুখ, তাই মেয়েটীকে ছাড়িয়া দিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া বলিয়া দিয়াছেন।

অমর বাবু বলিলেন "বেহাইকে বলিও, মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন; এখন মেয়ে ছেড়ে দেওয়া না দেওয়া আমাদের ইচ্ছা। এখানে অত হুকুম জারি চলিবে না।" লক্ষ্মীকান্ত লোক জন ও শূন্য পালকী লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বাবুদের নিকট সব কথা বলিলেন।

এরূপ স্পষ্ট জবাবের পর, উমাচরণ আর কিরণ-শশীকে আনিবার জন্য সহসা লোক পাঠাইতে পারি-লেন না। ভাবিলেন এরূপ ভাবে লাঞ্ছিত হইয়া মেয়ে আনিতে যাওয়া অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। দিন দিন তিল তিল করিয়া লোক চক্ষুর অন্তরালে বাপের বুক কেমন করিয়া ফাটিতে লাগিল, হতভাগিনী কন্যার পিতা বই তা আর কেহ বুঝিবে না। কিরণশশী দিনে দুবার করিয়া বাপের নিকট ঝি পাঠাইতে লাগিল। ঝিকে দিয়া বার বার বাপের কাছে আব্দার করিয়া বলিয়া পাঠাইল—বাপের বাড়ী তাহাকে শীঘ্র না লইয়া গেলে, তাঁরা আর তাকে দেখিতে পাইবেন না। তবুও যখন বাপের বাড়ী হইতে মেয়েকে লইয়া যাওয়ার কোনও উদ্যোগ দেখা গেল না, তখন মেয়ে অভিমান করিয়া বাপের বাড়ী লোক পাঠান বন্ধ করিয়া দিল। কিছুদিন পর যখন ভগ্নহৃদয় উমাচরণ শয্যাশায়ী হইলেন, তখন সুযোগ্য জামাতার প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া ভূত মহাশয় আসিয়া একদিন বলিয়া গেলেনঃ—ওরা বলিতেছে—এখন কেমন জব্দ!

এদিকে কিরণশশী'ও লাঞ্ছনা ভোগ আরম্ভ হইল। উঠিতে বসিতে শাশুড়ী মোক্ষদা কিরণশশীর এত দোষ দেখিতে লাগিলেন, যে তাতে প্রকৃতিবাদ অভি-ধানের মত একখানা মূল গ্রন্থের অবতারণা করা যায়। একদিন শ্যামা গোয়ালিনী শাশুড়ীকে প্রসন্ন করিবার ছলেই পুত্রবধূর রূপের সুখ্যাতি করিয়াছিল। গিন্নী মোক্ষদাসুন্দরী অত্যুন্নত নাসিকাস্থিত বৃত্তাকার বৃহৎ নথটাতে একটা ভীষণ নাড়া দিয়া বলিয়া উঠিলেনঃ— "তোমাদের যে সবই বেশীর ভাগ বাপু! এরি নাম রূপ! বালাই নিয়ে মরে যাই! মুখুয্যেদের কণক-চাঁপার বাঁ পায়ের দাসী হবারও তো এর যোগ্যতা নেই, তার আবার অত কথা!"

যদি কিরণশশী বাপের কথা মনে করিয়া কখনো ঘরে বসিয়া গোপনে দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলে, তবে

আর রক্ষা নাই। গিন্নী অমনি তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠেন:—'বৌমা, একি নির্লজ্জ বেহায়াপণা তোমার!—চব্বিশটা ঘণ্টা ঘেনর ঘেনর আর—থামে না! ফের যদি তুমি চোখের জল ফেলে আমার ছেলের অকল্যাণ কর, তবে কিন্তু ভালো হবে না, আমি আগু থাকতেই বলে রাখ্‌চি কিন্তু!'

কিরণের ভারি সর্দ্দি করিয়াছিল—এই তার অপরাধ। বাপের বাড়ীর অভ্যাস মত কিরণের বাপের বাড়ীর ঝি পাতকুয়া হইতে জল তুলিয়া গরম হইবার জন্য বালতিটা রোদে রাখিয়া দিয়াছিল। ব্যাপার দেখিয়া অমরনাথ একেবারে বাতাহত দীপশিখার ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন,—"ইস্! কোথাকার মেম সাহেব যেন! এ সব বাবুগিরী এখানে চলবে না!" এই বলিয়া পদাঘাতে উঠানের উপর বালতির জল উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিলেন।

কিরণশশীর স্বামী শচীন্দ্রনাথ স্কুলে পড়িবার সময় হইতেই রীতিমত তালেম দিয়া একটু আধটু উড়িতে শিখিয়াছিলেন। এণ্ট্রেন্সফেল করিয়াই একেবারে পাখী হইয়া পড়িয়াছেন। অমরনাথের নিকট সম্প্রতি বিষয় কর্ম্ম শিক্ষালাভ করিতেছিলেন। এবং ইয়ার কোম্পানীর অনুরোধে গ্রামে একটা সখের নাট্যশালা খুলিয়া তালিমদিতে ছিলেন। গ্রামের বকাটে ছোকরা-গুলিকে দিয়া স্ত্রীলোকের পাট্‌গুলি ভাল অভিনীত হইতেছিল না। তাই কি করিয়া সহর হইতে থিয়েটারের স্বনামধন্যা দুএকটী অভিনেত্রী ভাগাইয়া আনিয়া পল্লীর নাট্যশালা জমকাইয়া তুলা যায়, সেই ভাবনায় আজকাল শচীন্দ্রনাথের রাত্রে ঘুম হইতনা, তাই রাত্রে আহারের পূর্ব্বে প্রাতাদনই একটু সুরঞ্জিত ভাবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এমন অবস্থায় যদি শচীন্দ্রের পত্নীচর্চ্চার অবসর না ঘটে, তবে তাঁকে বোধহয় খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না।

শচীন্দ্রের মানসিক অবস্থা তরল হইবামাত্র তাঁর মাতৃভক্তির উচ্ছ্বাসটা সহসা দামোদরের বন্যার মত একেবারে রাতারাতি বাড়িয়া উঠিত। সময় বুঝিয়া শচীন্দ্রের রত্নগর্ভা মাতা মোক্ষদাসুন্দরী কিরণশশীর যতগুলি বেহায়াপণা ও বড়মানুষী রকম সকম আছে, সেগুলি টীকাভাষ্য সহকারে পুত্রের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেন। আর শচীন্দ্রনাথও উত্তেজিত অবস্থায় রায় চৌধুরীদের যে চৌষট্টি রকম বজ্জাতি আছে, সেগুলি কিরণশশীকে বিশেষ ভাবে শুনাইয়া শুনাইয়া, অমিত্রাক্ষর ছন্দে মারকাছে অনর্গল বর্ণনা করিয়া যাইতেন। বেড়ার আড়ালে বসিয়া কিরণশশীর বুকটা যে ছিন্নমুণ্ড কপোতের মত ধড়ফড় করিয়া মরিত, সে জন্য একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবার মানুষও সে বাড়ীতে ছিল না! এমনি করিয়া, পতিপুত্র লইয়া মোক্ষদাসুন্দরী প্রতিদিন কিরণশশীকে তুষানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

এমন সময় একদিন অপরাহ্নে বাপের বাড়ী হইতে কিরণের নিকট খবর পৌছিল—উমাচরণের ব্যামো টা আজ হঠাৎ বেজায় বাড়িয়া গিয়াছে আজকার কাল-রাত্রি বুঝি আর পার হয় না!

(৪)

সূর্য্যদেব যেন অস্তাচলে ডুবিয়া যাইবার পূর্ব্বে করতলে চিবুক ন্যস্ত করিয়া পশ্চিমদিগন্তের উপরদিয়া শ্যামায়মান পৃথিবীর পানে বার বার প্রেমারুণ চক্ষে চাহিতেছিলেন। পশ্চিম আকাশটা তখনো স্বর্ণজালে জড়িত হইয়া জ্বলিতেছিল। মোক্ষদাসুন্দরী রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া নথ নাড়াইয়া, হাত দুলাইয়া, পাড়ার বৌঝিদের অনেক রকম কুৎসা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ—বক্তৃতা করিতেছিলেন। নিকটে যে ঝিটী বঠির গোড়ায় বসিয়া মাছ কুটিতেছিল, সে মাঝে মাঝে এমনি ভাবে দু একটা হুঁ হুঁ ঠুকিতেছিল যে, তাহাতে বুঝা যায়, বিশ্ববাংলার সমুদায় বৌঝিই মন্দ, সেওয়াই মোক্ষদাসুন্দরী—বক্তৃতা-কারিণীর এই যে বক্তৃতার মর্ম্মটুকু সে তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেছিল। মোক্ষদাসুন্দরীর দ্বিতীয় শ্রোতা একটী ভিজে বিড়াল। সে লেজের উপর বসিয়া ঝির হস্তস্থিত মাছটীর পানে অতিভক্তের মত তাকাইয়াছিল। মোক্ষদাসুন্দরীর বক্তৃতা শুনিতে সে আসে নাই। এমন সময় কিরণশশী সহসা তীরের মত ছুটীয়া আসিয়া মোক্ষদার পায়ের কাছে তরঙ্গের মত আপনাকে লুটাইয়া দিল। শুধু কোমল বেদনা-কম্পিতস্বরে 'মা' এইটুকু

উচ্চারণ করিতেই যেন কষ্টে তার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিতেছিল ;—আর কিছু বলিতে পারিল না। মোক্ষদা ঈষৎ ব্যঙ্গের সহিত কৃত্রিম ব্যস্ততা দেখাইয়া, পা গুটাইয়া লইয়া বলিলেন—"কর কি, কর কি বৌমা ! বড় ঘরের মেয়ে তুমি, আমার পা ছুঁতে আছে, মা বলতে আছে ?—ছিঃ ! আমরা তোমার ঘুটেকুড়োনী দাসীরো যোগ্যতা রাখিনা !"

পুত্রবধূর সহিত শাশুড়ীর মিষ্টালাপ প্রায় এই রকমেরই হইত। কিন্তু কিরণ আজ মিষ্টালাপের প্রত্যাশায় শাশুড়ীর কাছে আসে নাই। তার বুকের ভিতরে যে আশঙ্কার ঝড় বহিতেছিল, তার নিকট অপমান অতি তুচ্ছ জিনিষ। বাণবিদ্ধ বনের হরিণীটীর মত অশ্রুপূর্ণ কাতর দৃষ্টি শাশুড়ীর মুখের উপর রাখিয়া অতি ক্ষীণ কণ্ঠে কিরণ বলিল—"একবার বাবাকে শেষ চোখের দেখা দেখে আসতে দাও মা' বাবা বুঝি আর বাঁচেনা !"

কথা শেষ করিয়া, কিরণ শাশুড়ীর পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। গিন্নী অবিশ্বাসের সুরে বলিলেনঃ—"আমাদের কোন খবরাখবর নেই—তুমি জানলে কেমন করে ?"

কিরণ অপরাধিণীর মত শুষ্ক বিবর্ণ মুখে উত্তর করিল—"কাকীমা ঝি পাঠিয়েছিল মা !—সেই এসে বলে গেল !"

আর একটা সমালোচনার বিষয় পাইয়া গিন্নী মুখে একটা প্রবল ঝামটা দিয়া বলিয়া উঠিলেনঃ—

"ওমা ! কি লজ্জার কথা ! এমনি করে মথুরার দূত চুপ করে আসেন যান, তার কোন খবর রাখিনা আমরা; এ সব বাপের বাড়ী যাওয়ার ফন্দি ! আমরা কি এ সব চালাকিও বুঝিনা !"

কিরণ তখন মর্ম্মর মূর্ত্তির মত উঠানে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়াছিল। চোখে তার জল ছিল না। বুঝি বা জমিয়া বরফ হইয়াগিয়াছিল। মাথার ভিতরটা যেন রিম্ রিম্ করিতেছিল এবং সেই সঙ্গে তরুলতা, গৃহপল্লী, আলো অন্ধকার, স্বামী ভবিষ্যত, সবি যেন একে একে মুছিয়া যাইতে লাগিল—সে এমনি একটা অনুভব করিল। যেন সমুদয় জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া কিরণশশীর বুকের ব্যথা ঢেউ খেলিতেছে এবং সেই নীল ঢেউএর চূড়ায় চূড়ায় যেন তার পিতার রোগ-শীর্ণ, নিরাশা পাণ্ডুর, স্নেহ-মধুর কাতর মুখখানি ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

এমন সময় রায় চৌধুরীদের বাড়ীর দিক হইতে একটা উচ্চ ক্রন্দনের রোল পড়িয়াগেল। কিরণ তখন সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান শূন্য। তার চোখের জল শুকাইয়া গিয়াছে, মাথার কাপড় পড়িয়া গিয়াছে। সে যে বন্দোপাধ্যায়-দের বাড়ীর বধূ সে কথাও সে ভুলিয়াগেল ! কেবল তার মনে হইতে লাগিল—এ জগতে সকলি মিথ্যা,কেবল ক্রন্দনই সত্য। মানুষের স্নেহ ভালবাসা, সকলি পদ-দলিত করিয়া মরণরথের চক্রনেমি হাহাকার শব্দে বিশ্বচরাচর পরিভ্রমণ করিতেছে।

কিরণ আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। সে ঐ ক্রন্দনের রোল লক্ষ্য করিয়া পাগলিনীর মত পিতৃভবনের দিকে ছুটিতে লাগিল। সে যতই তাহার বাপের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, রোদনধ্বনি ততই সে স্পষ্টতর শুনিতে পাইল। সে যখন শিথিলবেশ, মুক্তকবরী ও অশ্রুসিক্ত কাতর নয়ন দুটী লইয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, তখন উমাচরণের মৃতদেহ তুলসী তলায় আনীত হইয়াছে। কিরণের মা মৃতস্বামীর পদ প্রান্তে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া-ছেন। বামাচরণ পাগলের মত মাথা কুটিতেছেন। দাসদাসীরা কাঁদিতেছে। মনে হয় যেন গৃহে পশু পক্ষী ও অঙ্গনের তরুলতা গুলিও যেন কাঁদিতেছে।

চলন্ত পথিকের মাথায় যখন আকাশের বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন তার মর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু তবু সে দাঁড়াইয়া থাকে। অন্তঃপুরের সে ভীষণ দৃশ্য দেখি কিরণশশী চলিতে চলিতে হঠাৎ নিস্পন্দ হইয়া থামিয়া গেল। তার পর,ধীরে ধীরে মন্ত্রমুগ্ধার মত সে আসিয়া উমাচরণের মৃতদেহের পাশে বসিল। বিবাহের পর কন্যায় পিতায় এই প্রথম সাক্ষাৎ ! কিন্তু যে ব্যক্তি সহস্র যাতনার ভিতরেও কিরণের মুখখানি দেখিলে আর সকল দুঃখ ভুলিয়া গিয়া শিশুর মত খুসী হইয়া উঠিতেন, সেই উমাচরণ আজ তুলসী তলায় কি করিয়া কিরণকে এত নিকটে পাইয়াও সে মিলনের তীব্র আনন্দ বেগ অনায়াসে সম্বরণ করিয়া লইলেন, এ পৃথিবীর লোকের কাছে সে তত্ত্ব চিরকাল রহস্যাবৃত !

কিরণ ধীরে ধীরে নির্ব্বাক নিস্পন্দ মর্ম্মর নির্ম্মিত তরুণ মাতৃমূর্ত্তিটীর মত মৃণালশুভ্র বাহুদুটী দিয়া পরমস্নেহভরে শুভ্র শ্মশ্রু মণ্ডিত, ধ্যানস্তিমিত লোচন বৃদ্ধ শিশুটীকে আপনার কোলের উপর টানিয়া লইল। আজ বহুকাল পরে, মৃত্যুনদীর পরপারে বাঞ্ছিত মাতৃ অঙ্কের পরশ পাইয়া বুঝি সে বয়স্থ শিশুটীর সমুদয় পার্থিব ক্ষুধা তৃপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাই বুঝি সে আরামলোভী নিদ্রাতুর, ক্লান্ত শিশুটী মাতৃকোল পাইয়া এ বিচিত্র জগতের পানে আর একবার চোখ মেলিয়াও তাকাইল না! কেমন সুন্দর, অথচ করুণ মাতৃ মূর্ত্তি বুঝি চিত্রকর র‍্যাফেলও আঁকিতে পারিতেন না!

একটা প্রচণ্ড ঝড়ের অকরুণ স্মৃতি যেমন কুসুমবাগানের ছিন্নপল্লব ও লুণ্ঠিত পুষ্পরাশির মাঝে রাখিয়া যায়, রায়-চৌধুরী পরিবারে উমাচরণও তেমনি শোকের সদ্য স্মৃতি রাখিয়া পরপারে চলিয়াগিয়াছেন। যথা সময়ে উমাচরণের পারলৌকিক ক্রিয়া কাণ্ড নিরানন্দে সম্পন্ন হইয়া গেল। তখনো কিরণশশী বাপের বাড়ীতেই ছিল। বামাচরণ কিরণকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইয়া দিবার জন্য কোনওরূপ ব্যস্তত৷ দেখাইলেন না। বন্দোপাধ্যায়দের তরপ হইতেও কেহ কোন উচ্চ বাচ্য করিল না। সেখানে অমরনাথ ও মোক্ষদা সুন্দরী পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, এ হেন স্বেচ্ছাচারিণী বধূকে আর বাড়ীতে ফিরাইয়া আনা হইবে না। শচীকে এখন আর একটী বধূ আনিয়া দিলেই রায়চৌধুরীদের নির্য্যাতন পালা সমাপ্ত হয়। স্ফটিকা-চ্ছাদিত দীপের চারিধারে পতঙ্গ যেমন ঘুরিয়া মরে, শচীন্দ্রও একটী অভিনেত্রীর চতুর্দ্দিকে সেইরূপ ছুটাছুটি করিতে-

(৫)

ছিলেন। একটী লক্ষ্মীমন্ত বউ দেখিয়া দিবার জন্য অমরনাথ বৈঠকখানায় ঘটককে ডাকাইয়া আনিয়া পরামর্শ করিতে-ছিলেন এমন সময় তারে খবর আসিল আপীল আদালতে পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় বন্দ্যোপাধ্যায়দের হার হইয়াছে, আর রায় চৌধুরীরা মূলখরচ ডিক্রি পাইয়াছেন। এ মামলায় যে বন্দ্যোপাধ্যায়দের হার হইতে পারে, একথা মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পূর্ব্বে কোন পক্ষের উকীল অনুমানও করিতে পারেন নাই। অমরনাথ ক্ষোভে, ও অপমানে জ্বলিতে লাগিলেন। মোকদ্দমা খরচা যাহা ডিক্রী হইয়াছে, তাহাও নিতান্ত সামান্য নয়, সে কথাটাও থাকিয়া থাকিয়া মনে হইতেছিল। এমন সময় ভূত মহাশয় আসিয়া অমরনাথকে খবর দিলেন যে উমাচরণ জীবিত থাকিতেই, উমাচরণ ও বামাচরণ দুই ভাইএ মিলিয়া সমুদয় সম্পত্তি কিরণের নামে উইল করিয়া দিয়াছেন। এখন কিরণশশীই রায় চৌধুরীদের সংসারের মালীক—কিরণের নামেই মোকদ্দমা খরচার জন্য বন্দোপাধ্যায়দের সম্পত্তি ক্রোক করা হইবে। ভূত মহাশয় উপসংহারে বলিলেন :—"আপনাদের উপযুক্ত বৌ মা আর এদিকে মাড়াচ্চেন না! বলেছেন নাকি—বন্দোপাধ্যায়দের ভিটের উপর তিনি ঘুঘু চরাবেন!

অমরনাথ স্নানাহার পরিত্যাগ করিয়া হাইকোর্টে আপীল দায়ের করিবার অভিলাষে তৎক্ষণাৎ সহরে রওনা হইয়া গেলেন। টাকাকড়ি সহরে, বড় একটী ব্যাঙ্কে মজুত ছিল। দেশে চোর ডাকাতের প্রাদুর্ভাব বাড়িয়া যাওয়াতে তিনি টাকাকড়ি ইস্তক মেয়েদের গহনাপত্র সমুদয় ব্যাঙ্কেই রাখিতেন। সে ব্যাঙ্কে লোহার সিন্ধুক বোঝাই করিয়া রাখা হইত। এবং বন্দুকের উপর সঙ্গীন চড়াইয়া সিপাহীরা সেই ব্যাঙ্কের মজুত টাকার পাহারা দিত। সুতরাং অমরনাথ আপনার নগদ টাকা-কড়ি সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন।

সহরে পহুছিয়া অমরনাথ শুনিলেন ব্যাঙ্কের অবস্থা অন্যরূপ। মা লক্ষ্মী রাতারাতি তাঁহার নিশাচর বাহনটীর পীঠে চাপিয়া ব্যাঙ্কের ত্রিসীমানা ছাড়িয়া যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন, তার ঠিকানা নাই। এমন কি, যাইবার সময় তাঁর বাহনটী শুদ্ধ সে ব্যাঙ্ক ঘরে ভুলেও একটী সোণার পালক ফেলিয়া যায় নাই!

* * * *

এই ঘটনার কয়েক দিন পর একদিন সন্ধ্যারাত্রে একখানি পালকী রায় চৌধুরীদের ভিতর বাড়ীর দেউড়ীর সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাজা ঘাসের উপর সবুজ জ্যোৎস্না ঝকঝক করিতেছিল। হাওয়া লাগিয়া সুপারি গাছের পাতা শির্ শির্ করিতেছিল। পালকী হইতে

বাহির হইয়া মোক্ষদা সুন্দরী বরাবর চৌধুরীদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

তখন লাল চেলী পরিয়া, সিঁথিতে সিন্দুর মাখিয়া পবিত্র মনে ঠাকুর ঘরে বসিয়া কিরণশশী মদনমোহনের চরণযুগল আর্দ্র হৃদয়ে ধ্যান করিতেছিল। ঠাকুর ঘর নীরব লোকশূন্য—গৃহে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে! আর কোমর পর্য্যন্ত ফুলে ঢাকা মদনমোহন মুরলীটী মুখে ধরিয়া তাঁর তরুণ পূজারিণীর পানে তাকাইয়া তাকাইয়া যেন হাসিতেছেন!

"বৌ মা! বৌ মা!"

কিরণশশী সহসা চমকিয়া উঠিল, চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখে শাশুড়ী—মোক্ষদাসুন্দরী, তার পাশে দাঁড়াইয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিতেছেন—"বৌমা, ও বৌমা!" কিরণ সুপ্তোত্থিতের মত আসন ছাড়িয়া উঠিয়া শাশুড়ীর পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল, মুখে একটু ম্লান হাসি ফুটাইয়া বলিল:—"কেন মা?"

মোক্ষদাসুন্দরী কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন:—"ঘরের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েচে মা। এখন তুমি ফিরে না গেলে ও বাড়ীর আর কল্যাণ হবে না।" কিরণশশী শ্বশুর বাড়ীর সমুদয় দুর্ঘটনারই খবর পাইয়াছিল। তাই সে সম্বন্ধে আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিরণকে নীরব দেখিয়া মোক্ষদা আবেগ ভরে কিরণকে আপনার বুকের মাঝে টানিয়া লইয়া বলিলেন:—বৌমা, আর আমায় লজ্জা দিও না! তুমি না হলে শচীনকে আর কেউ ঘরে রাখতে পারবে না, বাছা আমার বিরাগী হয়ে চলে যাবে।"

কিরণের বড় ইচ্ছা হইল একবার জিজ্ঞাসা করে—সে অভিনেত্রীটার কি হইল? কিন্তু শাশুড়ীর কাছে তার মুখ ফুটিল না। তবে শচীন যে ঘরে ফিরিয়া তার জন্য চঞ্চল হইয়াছেন, তাতেই বুদ্ধিমতী কিরণ বুঝিতে পারিল, ওদিকে ব্যাপারখনা বড় সুবিধাজনক নয়। মোক্ষদা আবার আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন:—এস, এস, মা লক্ষ্মী আমার! তুমি এসে তোমার সংসার বুঝে নাও!" কিরণশশী আবার ভক্তিভরে মদনমোহনকে লুটাইয়া প্রণাম করিয়া শাশুড়ীকে বলিল:—

"তা যাবো বই কি মা! তুমি পালকী ডাকাও—আমি ততক্ষণ কাকাবাবু ও কাকীমার পায়ের ধূলো নিয়ে আসি!

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ।

মুরাদের নিকট অউরঙ্গজেবের পত্র

(উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের দিনাজপুর অধিবেশনে পঠিত।)

ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বিদিত আছেন যে সম্রাট সাজাহানের চারি পুত্র মধ্যে দারা সেঁকো সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, সুজা মধ্যম, অউরঙ্গজেব তৃতীয়, এবং মুরাদ বকস সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলেন। ইঁহারা সকলেই সাজাহানের এক মহিষীর সন্তান। আগ্রার তাজ যাহার নাম চির জীবিত রাখিয়াছে, ইঁহারা সকলেই তাঁহারই গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন ও তাঁহারই অঙ্কে বর্দ্ধিত হন। ভারতের মোগল রাজবংশে কি অভিসম্পাত ছিল—পিতৃভক্তি, অপত্যস্নেহ, সৌভ্রাত্রের দৃষ্টান্ত ইহাতে বিরল। জাহাঙ্গীর, সাজাহান এবং অউরঙ্গজেব তিন জনেই পিতৃদ্রোহী ছিলেন, জাহাঙ্গীর আপন পুত্র খসরুকে ক্রমাগত নির্য্যাতন করিয়া এবং কারারুদ্ধ রাখিয়া হত্যাই করিয়াছিলেন বলিতে হয়, এবং অউরঙ্গজেব তাঁহার পুত্রগণকে এত অবিশ্বাস করিতেন যে বৃদ্ধাবস্থায় অন্তিমব্যাধির কালেও তিনি তাঁহাদের কাহাকেও আপনার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিতে দেন নাই। শূরবংশীয় সের-সাহ কর্ত্তৃক নানা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যখন হুমায়ুন বিশ্ব অন্ধকার দেখিতেছিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ তখন তাঁহাকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, তাঁহার ঘোর বিপক্ষতাচরণই করিয়াছিলেন। কথিত আছে, রাজ্য হারাইয়া পারশ্য অভিমুখে পলায়ন কালে কান্দাহারে তাঁহার শিশুপুত্র আকবর পিতৃব্য মির্জা অস্কোরির হস্তে পতিত হন। বৎসল পিতৃব্য তাঁহাকে কামানমুখে স্থাপিত করিয়া হুমায়ুনকে ভীত করিয়া কান্দাহার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। জাহাঙ্গীরের পুত্রগণ ভ্রাতৃ-বিদ্বেষ-বিষে জর্জ্জরিত হইতেন। যুবরাজ পরভেজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা খুরমকে আগ্রা হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে সমস্ত দাক্ষিণাত্যে এবং পূর্ব্বাভিমুখে কলিঙ্গ, বঙ্গ ও বেহারে ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দুলবৎ তাড়না করিয়াছিলেন এবং অউরঙ্গজেব ভ্রাতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের রক্তে পদ প্রক্ষালন করিয়া ময়ূরাসনে আরোহন করেন। সর্ব্বত্রই যদি

বংশানুক্রমে চরিত্র গঠন হইত, তবে যে বাবর পুত্র হুমায়ুনের জীবন রক্ষার্থ তাঁহার রোগশয্যা- পার্শ্বে আপন জীবন বিনিময় করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ পুত্রদ্বেষী হইলেন কেন? এবং যে হুমায়ুন ভ্রাতৃবাৎসল্য বশতঃ পিতার সাম্রাজ্য অম্লান বদনে আপন ভ্রাতৃগণ মধ্যে বিভক্ত করিয়া দিয়া ছিলেন,তাঁহার উত্তর পুরুষগণ মধ্যে ভ্রাতৃশোণিত পিপাসা এত প্রবল হইল কেন? সে যাহাই হোক, আমি এই প্রবন্ধে অউরঙ্গজেব-মুরাদ জীবন বৃত্তের একটীমাত্র ঘটনার বর্ণনা করিব।

প্রিয়তমা মহিষী মমতাজমহলের মৃত্যুর পর হইতেই শোকে প্রৌঢ় সম্রাট সাজাহানের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল, তথাপি তিনি অসাধারণ মানসিক তেজে দৈহিক দৌর্ব্বল্য উপেক্ষা করিয়া যথোচিত বিধানে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। ক্রমে তাঁহার জীবনের ষষ্টিতম বর্ষ অতিক্রান্ত হইল; পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরে তিনি আরও শোক পাইলেন; প্রিয়তম বন্ধু, ধীমান মন্ত্রী, ও চিরসহায় কুশল সেনাপতি জাফরজঙ্গ, সাদুল্লা খাঁ এবং আলিমর্দ্দান তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিলেন। তখন সাজাহান বার্দ্ধক্যের করাল অঙ্গুলী-স্পর্শ অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বেই জ্যেষ্ঠপুত্র দারাকে স্বকীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন এবং অন্য তিন পুত্রকে রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশত্রয়ে শাসন কর্ত্তৃত্বে নিয়োজিত করিয়া তাঁহাকে নিজের পার্শ্বে রাখিয়াছিলেন। খ্রীষ্টিয় ১৬৫৭ অব্দে যখন তিনি পুনরায় পীড়িত হইয়া পড়িলেন তখন তিনি আপন মন্ত্রীসভার সদস্যগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের সমক্ষে দারাকে উত্তরাধিকারিত্বে বরণ করিলেন। দারা পিতৃবৎসল, ও প্রপিতামহ আকবরের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ এবং উদারচিত্ত ছিলেন। আরব্য, পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, এবং তিনি ধর্ম্মবিষয়ে কয়েকখানি গভীর তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। একে তিনি পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র, তাহাতে বহুগুণালঙ্কৃত; তাঁহার সিংহাসন লাভ করায় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণের ক্ষোভের কোনই কারণ ছিল না। তথাপি মোগল কুলাধিষ্ঠাত্রীর অভিসম্পাত বশতঃ তাঁহারা জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য রাজদণ্ড স্বায়ত্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তখনও দারা রাজদণ্ড প্রাপ্ত হন নাই; কেননা, সাজাহান তখনও জীবিত।

বাল্যকাল হইতেই অউরঙ্গজেব ও মুরাদ, দারার ভয়ঙ্কর বিরোধী ছিলেন, ইহারা তাঁহাকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতেন, এবং সর্ব্বপ্রযত্নে ইহার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিতেন। সুজা দারার তত আততায়ী ছিলেন না, কিন্তু রাজ্যলোভে তিনিও জ্যেষ্ঠভ্রাতার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। অউরঙ্গজেব নিজে সংকীর্ণ হৃদয় ও ধর্ম্মোন্মাদ মুসলমান ছিলেন; এবং ধর্ম্মবিষয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উদারতাকে তিনি অবর্ণনীয় ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিতেন; কিন্তু মুরাদের ভ্রাতৃবিদ্বেষের মূলে কেবল তাঁহার বিস্ময়কর আত্মম্ভরিতা ও অউরঙ্গজেবের প্ররোচনা ছিল। বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই অউরঙ্গজেব, মুরাদ ও সুজা ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন এবং পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের অভিপ্রায় জ্ঞাপক লিপি পরিচালনের জন্য আপন আপন অধিকারে দলে দলে লিপিবাহক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন অউরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে বর্হানপুরে, মুরাদ গুজরাটে, এবং সুজা বাঙ্গলায়। গুজরাট ও বার্হানপুরের মধ্যে লিপিবাহকগণের গমনাগমন যেমন সহজ সাধ্যছিল, বঙ্গদেশের পথে সেরূপ ছিল না। সেই জন্য অউরঙ্গজেব ও মুরাদের মধ্যে মন্ত্রণাই প্রথমে পরিপক্ক হইল। তখন তাঁহারা দুইজনে সুজার সহায়তা প্রাপ্তির চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন। সাজাহান অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলেন। দেশময় সে কথা বিদ্যুদ্বেগে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন, দারা সে সংবাদও রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিলেন; কিন্তু মুরাদ ও অউরঙ্গজেব আপনাদের কু-অভিপ্রায়ের প্রতিকূল সে সংবাদ ইচ্ছা করিয়াই বিশ্বাস করিলেন না এবং আপনাদিগের অনুচর ও সহচরগণকেও বিশ্বাস করিতে দিলেন না। তাঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে প্রচার করিতে লাগিলেন যে পিতার মৃত্যু হইয়াছে; কাফের দারা সিংহাসন অধিকার করিয়াছে। যে পর্য্যন্ত সে সিংহাসনে সুদৃঢ়

হইতে না পারিবে সে পর্য্যন্ত এই মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখিয়া আরোগ্যের মিথ্যা সংবাদে সকলকে ভুলাইতেছে।

সাজাহানের চারি পুত্রের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ মুরাদ সর্ব্বাপেক্ষা অদূরদর্শী ও নির্ব্বোধ ছিলেন; তিনি রাজকার্য্যেও পারদর্শী ছিলেন না এবং সর্ব্বদা বিলাসস্রোতে ভাসিয়া থাকিতেন। যে যত অকর্ম্মণ্য হয়, গর্ব্বও তাহার তত অধিকমাত্রায় হইয়া থাকে; মুরাদেরও তাহাই হইয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার সাহস ছিল না—তাহা নহে, বরং তিনি অসমসাহসিক ছিলেন; কিন্তু সমরপরিচালনার কূটরীতি ও কৌশল তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিলনা। তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় এই যে, অউরঙ্গজেবের সঙ্গে মন্ত্রণা সমাপনের ও তাঁহার সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি আপন শাসনাধিকৃত গুজরাটের রাজধানী অহম্মদাবাদে মরুওয়াজুদ্দিন নাম ধারণ পূর্ব্বক রাজমুকুট পরিধান করিয়া বসিয়াছিলেন।

মুরাদ যেমন স্বল্পধী, বিলাসী, অলস ও আত্মম্ভরী ছিলেন, অউরঙ্গজেব তেমনি সূচ্যগ্র-তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী, কূটনীতিপরায়ণ, কঠোরশ্রমী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। যদিও কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদের সহিত মন্ত্রণারম্ভকাল হইতেই অউরঙ্গজেব তাঁহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহের ভাণ করিতেছিলেন, তথাপি অল্পবুদ্ধি-মুরাদ একথা বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি একেবারে নিঃস্বার্থভাবে সমগ্র সাম্রাজ্যের সিংহাসন প্রাপ্তি বা সাম্রাজ্যের অংশ বিশেষ লাভ বিষয়ে তাঁহার সহায়তা করিবেন না। সেই জন্য তিনি ভ্রাতাকে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, উভয়ের মধ্যে একটি সর্ত্ত-পত্র লিখিত হোক্, তাহাদ্বারা উভয়ে পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিবেন যে, কাহার কি উদ্দেশ্য, কাহার কত আশা এবং আগামী মহাতাণ্ডবে কে কি তালে নৃত্য করিবেন। কোন কোন ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে, অউরঙ্গজেব প্রথম হইতেই মুরাদকে বলিতেছিলেন যে, সমগ্র সাম্রাজ্যে বা উহার খণ্ড বিশেষে তাঁহার কোনই আকাঙ্ক্ষা নাই; তদপেক্ষা পবিত্রভূমি মক্কার কোন অজ্ঞাত কোণে ফকীর বেশে অধিষ্ঠান করার লোভই তাঁহার অধিক। তিনি অপধর্ম্মী, পৌত্তলিক দারাকে বিতাড়িত করিয়া হিন্দুস্থানে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করার একমাত্র উদ্দেশ্যেই স্বধর্ম্ম পরায়ণ, পরমস্নেহ ভাজন মুরাদের সহিত মিলিত হইতেছেন। আমি যে প্রামাণ্য গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া এই যৎসামান্য প্রবন্ধ রচনা করিতেছি, তাহাতে দেখিতে পাই যে, অউরঙ্গজেবের দারাকে অপসৃত করিয়া মুসলমান ধর্ম্মের গৌরব অক্ষুন্ন রাখার বাসনার ভান করা সত্য, কিন্তু ফকিরী গ্রহণ করিয়া মক্কার কোন নিভৃত কোণে জীবন কর্ত্তন করার অভিপ্রায় প্রকাশ—সত্য নহে। তিনি একখানি দীর্ঘপত্রে মুরাদের নিকট আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পত্র মুরাদের সহিত মিলিত হইবার অব্যবহিতপূর্ব্বে, খ্রীষ্টীয় ১৬৫৮ অব্দের প্রথমভাগে লিখিত ও প্রেরিত হইয়াছিল। নিম্নে উহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল। কপটতার লীলা এইপত্রে যতদূর বিস্তৃত হইয়াছে এবং ভগবানের এবং কোরাণের পবিত্র নামের সহিত মিথ্যা ও ছলনার বাক্য ইহাতে যেরূপ সংযুক্ত হইয়াছে, এরূপ আর কোথাও হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের সম্বন্ধে এরূপ কথিত আছে যে, তিনি এরূপ খল-প্রকৃতি ছিলেন যে স্বয়ং যদি কার্য্য ব্যপদেশে তাঁহার নিকটে আসিতেন, তবে তিনি তাহাকেও প্রবঞ্চনা করিতে ছাড়িতেন না। অউরঙ্গজেব সম্বন্ধেও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করা যাইতে পারে। এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত পত্রখানি এই—

"প্রাণাধিক প্রিয় কনিষ্ঠ সহোদর যুবরাজ মুরাদ বক্স,

দেখিতেছি যে, পিতৃ পরিত্যক্ত সাম্রাজ্য লাভের অভিপ্রায় বিশদরূপে প্রকটিত হইয়াছে এবং পয়গম্বরের পতাকাসমূহ লক্ষ্যাভিমুখে প্রসারিত হইতেছে; এধর্ম্মযুদ্ধ জেহাদের বজ্রনির্ঘোষ দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হউক। আমার অন্তর নিহিত ঐকান্তিক বাসনা এই যে, ইসলামের প্রিয় বসতিভূমি এই মোগলসাম্রাজ্য হইতে অপধর্ম্ম ও পৌত্তলিকতার কণ্টক সমূলে উৎপাটন করিয়া এবং এই অপধর্ম্ম ও পৌত্তলিকতার প্রধান পুরোহিত অবাচ্যনামা শয়তানের ধ্বংশ সাধন করিয়া সত্যধর্ম্মের মহিমা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করি। অধর্ম্ম ও অপধর্ম্মের ধূলি তাহা হইলে আর জনগণের মনকে কলুষিত করিবে

না; ইরাণ, তুরাণ, রুম ইত্যাদি জনপদবাসিগণ তাহা হইলে আর আমাদিগকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিবে না; হিন্দুস্থান শস্য সমৃদ্ধিশালী হইবে; প্রজাগণ রোগ শোকের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে এবং স্বচ্ছন্দে সুখ শান্তি উপভোগ করিবে। তুমি আমার প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা; তুমি এই পবিত্র মহদভিযানে আমার সহিত সম্মিলিত হইয়াছ এবং খোদাতালার নাম গ্রহণ করিয়া ও কোরাণ স্পর্শপূর্ব্বক বহু শপথ করিয়া স্বীকৃত হইয়াছ যে, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে, যুদ্ধক্ষেত্রে ও রাজপ্রাসাদে, দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যে, সর্ব্বত্র ও সর্ব্বাবস্থায় তুমি আমার সহচর ও সহায় থাকিবে, এবং সনাতন ধর্ম্মের ও এই ধর্ম্মরাজ্য-হিন্দুস্থানের পরম শত্রু নিপাত হইলেও তুমি চিরদিন আমার বন্ধু এবং আমার বন্ধুগণের বন্ধু এবং আমার শত্রুগণের শত্রু হইয়া বিরাজিত থাকিবে। তুমি তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় নিজের জন্য সাম্রাজ্যের যে যে অংশ প্রাপ্তি ও চিরাধিকারের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছ, তাহার অধিক আকাঙ্ক্ষা করিবে না ও লাভের চেষ্টা করিবে না। তোমার সরল হৃদয়ের অভিব্যক্তি আমাকে অত্যন্ত তুষ্ট করিয়াছে; তোমার আকাঙ্ক্ষা অতি ন্যায্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তুমি ও আমি চিরদিন একচিত্ত থাকিব; একই অভিপ্রায় সাধনের জন্য আমাদের মিলিত শক্তি প্রযুক্ত হইবে, এবং তুমি কখনও তোমার কোন কার্য্যদ্বারা আমার অভিপ্রায় সাধনের প্রতিকূল হইবে না। আমাদের উভয়ের মঙ্গল পথ এক। আমি জানি তুমি সত্য প্রতিজ্ঞ; তুমি এ পথ হইতে বিচলিত হইবে না। তোমার প্রতি আমার স্নেহ ও অনুগ্রহ ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, তোমার লাভ ও ক্ষতিকে আমি আমার লাভ ও ক্ষতি বলিয়া মনে করিতেছি ও চিরকাল করিব। ঈশ্বর পরিত্যক্ত ও কুকর্ম্মান্বিত এই দারা সেঁকো-পৌত্তলিক হিন্দুর গোলাম, ভক্ত বিশ্বাসীর শত্রু। ইহার বিনাশের পর তোমার প্রতি আমার কৃপা আরো বর্দ্ধিত হইবে। আমি নিরাবিল মনে তোমার প্রতি আমার অঙ্গীকার সততই রক্ষা করিব; অর্থাৎ সাম্রাজ্য অধিগত হইলে তুমি পাঞ্জাব, কাশ্মীর এবং সিন্ধুদেশ গ্রহন করিয়া এই তিন প্রদেশের সম্মিলনে যে বৃহৎ রাজ্য সংঘটিত হইবে তাহাতে একাধিপতি নৃপতি হইবে, তাহাতে আমি কিছুমাত্রও আপত্তি করিব না; বরং ঐ রাজ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে আমি যথাসাধ্য তোমার সহায়তা করিব। তুমি তোমার রাজ্যে স্বাধীন নৃপতির ধ্বজা উত্তোলন করিবে, নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করিবে; এবং নিজ নামে খোদ্‌বা প্রচারিত করিবে। অবশ্যম্ভাবী ধর্ম্মযুদ্ধে জয়লাভ করিলে আমাদের হস্তে যে সকল ধনরত্নাদি মূল্যবান বস্তু, দাস, দাসী, অশ্ব, গবাদি যে সকল জীব, এবং যুদ্ধের যে সকল উপকরণ পতিত হইবে, তাহার এক তৃতীয়াংশ তোমাকে দিব এবং অবশিষ্ট আমি গ্রহণ করিব। আমি কোরাণ শরিফ শিরে ধারণ করিয়া এবং আল্লাতালা ও পয়গম্বরকে সাক্ষী করিয়া লিপি যোগে এই সকল অঙ্গীকার করিতেছি। পয়গম্বর যেমন খোদার প্রত্যাদেশে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, তুমিও তেমনি আমার এই প্রতিজ্ঞাপত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিও। ধর্ম্মের কণ্টক এবং গাজীর চক্ষুশূল পৌত্তলিক দারা বিনষ্ট হইলে এবং রাজ্য নিরাময় হইলেই তুমি তোমার স্বরাজ্যে সিংহাসন স্থাপন করিও; আমি আপত্তি করিব না এবং কাহাকেও আপত্তি করিতে দিব না।

আমি অউরঙ্গাবাদ হইতে সবাহিনী যাত্রা করিয়া সত্বরেই নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইব; তুমিও তোমার সৈন্য সামন্ত লইয়া অভিযান আরম্ভ কর, যেন বড়মণ্ডলের নিকট কোন স্থানে আমরা মিলিত হইতে পারি।”

অউরঙ্গজেব তাঁহার পুনঃপুনরুচ্চারিত অঙ্গীকার কতদূর রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার “প্রাণাধিক প্রিয়” কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদ তাঁহার অপরিসীম স্নেহের কি প্রকার নিদর্শন পাইয়াছিলেন, তাহা ঐতিহাসিকগণই লিখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী।

হাজং জাতির বিবরণ।

সুসঙ্গ পরগণা ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত; ইহা ময়মনসিংহের উত্তর পূর্ব্বাংশে বঙ্গদেশের শেষ সীমায় অবস্থিত। গারো পাহাড় পূর্ব্বে সুসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল; পরে ভারতগবর্ণমেণ্টের ১৮৬৯ খৃঃ অব্দের ২২ আইনানুসারে ইহা আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বর্ত্তমান সময় গারো পাহাড়ই সুসঙ্গের উত্তর সীমারূপে পরিণত হইয়াছে। এই গারো পাহাড়ের সানুদেশের সমসূত্রপাতে নিম্নভূমিতে একপ্রকার অর্দ্ধসভ্য জাতির বাস আছে; ইহারা হাজং নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই জাতি ময়মনসিংহ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে নাই। ইতঃপূর্ব্বে ইহারা সেরপুরের অন্তর্গত করইবাড়ীর অধিবাসী ছিল। হাজংদিগের মধ্যে এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ইহাদের আদিম বাসস্থান উত্তর পশ্চিম প্রদেশান্তর্গত আজমগড় নামক স্থানে। পূর্ব্বে ইহারা ক্ষত্রিয় ছিল। যখন পরশুরাম ক্ষত্রিয় লোপ সাধনে উদ্যত হন, তখন ইহারা প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক করইবাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। এই প্রবাদ সম্পূর্ণ রূপে ভিত্তিহীন বলিয়াই অনুমান হয়। সুসঙ্গ রাজ্য পূর্ব্বে অধিকাংশ স্থলেই গভীর অরণ্যানী দ্বারা পরিবৃত ছিল; নিশিযোগে পার্ব্বত্য ভূমি হইতে নানাবিধ আরণ্য জন্তু আসিয়া ক্ষেত্রের শস্যাদির অপচয় করিত ও নানারূপ উপদ্রব করিত। গারো পর্ব্বতের পাদদেশে লোকালয় স্থাপিত হইলে এই সমস্ত উপদ্রব নিবারণ হইবে, ইহা মনে করিয়া সুসঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পবিত্রাত্মা সোমেশ্বর ঠাকুর হইতে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষিয় রাজা কিশোর সিংহ করইবাড়ী হইতে হাজংদিগকে আনাইয়া নিজরাজ্যে গারো পর্ব্বতের পাদদেশের সমসূত্রপাতে উপনিবিষ্ট করান।

হাজং স্ত্রীপুরুষ।

আকৃতি। হাজংদিগের নাসিকা চাপা, স্ফুচ ক্ষুদ্র, হনুদেশ উচ্চ, শ্মশ্রু ও গুল্ফ বিরল; ইহারা মধ্যাকৃতি। ইহাদের মধ্যে গৌরবর্ণ বিশিষ্ট লোকের সংখ্যা অতি অল্প পরিমাণে আছে বটে কিন্তু গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের সংখ্যা অতি বিরল; স্থূলকথা ইহাদের আকৃতি অনেকটা অন্যান্য অনার্য্য জাতীয় মনুষ্যেরই ন্যায়।

অলঙ্কার পরিচ্ছদ হাজংদিগের পুরুষগণ সাধারণতঃ হাঁটুর উপর পর্যন্ত বস্ত্র পরিধান করে; অধুনা ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কিছু কিছু শিক্ষা লাভ করতঃ বাঙ্গালীর ন্যায় বস্ত্রাদি পরিধান করিতে এবং সার্ট, কোট ও নানা প্রকার বিলাস সামগ্রী ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাদের স্ত্রীলোকগণ নিজেদের প্রস্তুত একপ্রকার বস্ত্র বক্ষদেশের উপরিভাগে স্তনমণ্ডলী পরিবেষ্টন করতঃ হাঁটুর নিম্ন দেশ পর্য্যন্ত লম্বমান ভাবে পরিধান করে। এই সমস্ত বস্ত্র প্রস্তুতের

জন্য পূর্ব্বে ইহারা নিজেরাই চরকা দ্বারা সূতা কাটিত; সম্প্রতি অনেকেই বিলাতী সূতা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্ত্রীলোকগণ অলঙ্কারের মধ্যে সাধারণতঃ শাঁখা ও পয়ালের মালা ব্যবহার করিয়া থাকে।

হাজংগণ মৃদুস্বভাব বিশিষ্ট ও ইহাদের কণ্ঠস্বর মিষ্ট।

প্রকৃতি।

ইহাদের পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকগণ সাধারণতঃ অধিক পরিশ্রম শালিনী। ধান্য রোপণও ছেদন, মৎস্য ধৃত করা, বস্ত্র বয়ন ও অন্যান্য গৃহ কর্ম্মাদি স্ত্রীলোকগণই করিয়া থাকে। পুরুষগণ হলচালনা, গো-চারণ, হাট বাজার করা প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে। ইহারা অতিশয় অতিথি সেবা পরায়ণ। বাড়ী ঘর ইহারা সর্ব্বদাই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। ইহারা সাধারণতঃ শান্তিপ্রিয়; ইহাদের মধ্যে একতার ভাব প্রবল ও কলহ বিবাদ অত্যন্ত কম। কেহ কেহ তীর ধনুক ও বন্দুক চালনায় অতিশয় নিপুন।

হাজং তাঁত।

ভাষা।

ইহাদের ভাষা বাঙ্গলারই অপভ্রংশ। নিম্নে ইহাদের ব্যবহৃত ভাষার ২।৪টী দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

বাঙ্গালা ভাষা	হাজংদিগের ব্যবহৃত ভাষা।
আমি যাইব না	ময় না যাং অথবা ময় না যাবো।
ছেলে পেলে	হাপাল।
হাঁস	অহিস।
তোমার	তলাক।
আমার	মলাক।
এই দিকে	ইংকে।
কোন্ দিকে	কোন্ দিকে।
কে গিয়াছে	কাই গেছে।
এখনই	এলাই।
মা	মাও।
মা দিয়াছে	মাওরা দেছে।
বাবা দিয়াছে	বাবারা দেছে।
আসিতেছি	যায় যায়। ইত্যাদি।

ধর্ম্ম আচার ব্যবহার খাদ্য ইত্যাদি।

ইহাদের আচার ব্যবহার অনেকাংশে হিন্দুদিগের ন্যায়। ইহারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে শাক্ত বৈষ্ণব উভয়ই বিদ্যমান আছে। ইহারা অধিকারী, বৈরাগী ও হাজং এই তিন ভাগে বিভক্ত। খড়দহ ও কালীগঞ্জ নামক স্থানের গোস্বামীগণ ইহাদের মধ্যে কাহাকে কাহাকে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া শিষ্য করেন; এই শিষ্যগণই অধিকারী বলিয়া কথিত হয়। অধিকারীগণ হাজংদিগের পৌরহিত্যের কার্য্য করিয়া থাকে। অধিকারিগণ হলচালনা করেনা কোন প্রকার মাংস ভক্ষণ বা মদ্যপান করেনা; ভেক ধারণ করে। অধিকারিগণ খড়দহের গোঁসাইগণের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যান্যকেও মন্ত্র প্রদান করে। অধিকারীর বংশধরগণ বৈরাগী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বৈরাগীগণও হলচালনা করেনা; হরিণ কচ্ছপ প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করে কিন্তু হংস, কপোত ও ছাগ

মাংস ভক্ষণ করেনা; তুলসীর মালা ধারণ করে। অধিকারী ও বৈরাগী ব্যতীত অন্যান্য সকলে হাজং নামে অভিহিত হয়। ইহারা হলচালনা করে, মাংস খায়। কুক্কুট মাংস ভক্ষণ করে না। কিন্তু বন্য বরাহের (গৃহ-পালিত বরাহের নয়) মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। হিন্দু বলিয়া পরিচিত হওয়ায় গোমাংস যে ইহাদের সকলেরই অভক্ষ্য তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র। অধিকারী বৈরাগী ও হাজং সকলেই মৎস্য ভক্ষণ করিয়া থাকে; শুষ্ক মৎস্য ইহাদের অতীব প্রিয় খাদ্য। শাক্তগণ মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে ও কামাখ্যা দেবীর পূজা করিয়া থাকে। হাজংদিগের স্ত্রীলোকগণ পুরুষদিগের উচ্ছিষ্ট ধৌত করে না। অধিকারী ও বৈরাগীগণ হাজংদিগকে মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক বৈরাগী করিয়া পরে তাহাদের কন্যা বিবাহ করিতে পারে কিন্তু এরূপ বিবাহ সুসঙ্গের রাজ-পরিবারের অনুমতি লইয়া প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কন্যাকে গঙ্গোদক পান করায় ও তাহার কেশ অল্প পরিমাণে ছেদন করতঃ তাহাকে বৈরাগী করিয়া লয়।

বিবাহ।

হাজং দিগের মধ্যে কন্যা সন্তানের বিবাহ সাধারণতঃ ৮ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যেই হইয়া থাকে। পুরুষদিগের বিবাহের কোন নির্দ্দিষ্ট বয়স নাই। বিবাহ পিতামাতা বা অপর কোন আত্মীয় কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়। যে গ্রামের যে ব্যক্তির কন্যার সহিত বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হয়, বরের পিতা বা অপর কোন আত্মীয় ঐ গ্রামে যাইয়া কন্যার ও তাহার বংশাদির সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করে। তৎপর উভয় পক্ষের বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা থাকিলে ঐ গ্রামের কোন লোক মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া দেয়। হাজংদিগের মধ্যে যে সমস্ত কন্যা বস্ত্র বয়ন কার্য্যে নিপুনা তাহারাই সাধারণতঃ বিবাহে পছন্দনীয়া ও নির্ব্বাচিতা হইয়া থাকে; এই কারণে কন্যাসন্তানদিগকে শৈশবকাল হইতেই সূতা কাটা ও বস্ত্র বয়ন কার্য্য শিক্ষা করিতে হয়। ইহা একটী অতীব সুন্দর প্রথা। হাজংদিগের স্ত্রীলোকগণ প্রায়ই নিজেদের প্রস্তুত বস্ত্র পরিধান করে। সুসঙ্গে আসিবার পূর্ব্বে করই বাড়ীতে অবস্থান কালে যে গ্রামে বাস করিত বর ও কন্যা পক্ষের পূর্ব্ব পুরুষগণ যদি সেই এক গ্রাম বাসী হয়, তাহা হইলে বিবাহ হইতে পারে না; ভিন্ন গ্রামবাসী হইলে বিবাহ হয়। হাজংদিগের মধ্যে বর পক্ষ কন্যা পক্ষকে পণ প্রদান করে। এই পণের পরিমাণ পূর্ব্বে ৩০।৪০৲ টাকার অধিক ছিল না; অধুনা বৃদ্ধি পাইয়া ১০০।১৫০৲ পর্য্যন্ত হইয়াছে। বিবাহের প্রস্তাবে উভয় পক্ষ সম্মত হইলে কন্যাপক্ষ তাহার গ্রামের কতিপয় লোককে ও পাত্র পক্ষের লোকদিগকে কিছু কিছু পান শুপারি ও চিনি দিয়া বিদায় করে। তৎপর ঐ রাত্রিতে উভয় পক্ষ কোন স্বপ্ন দর্শনের আশায় নিশি যাপন করে। কোন প্রকার স্বপ্ন না দেখিলে অথবা কোন সুস্বপ্ন দেখিলে বিবাহ হওয়ার পক্ষে আর কোন বিঘ্ন থাকেনা, কিন্তু কোনরূপ কুস্বপ্ন দেখিলে বিবাহ প্রস্তাব ভঙ্গ হইয়া যায়। এইরূপ স্বপ্নদর্শনের পর যদি বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরিকৃত হয়, তাহা হইলে বিবাহের জন্য একটী শুভ দিন স্থির হয়। বিবাহের পূর্ব্বে একদিন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দৈ, দধি, পান, চিনি, শুপারী ইত্যাদি সহ পাত্র পক্ষীয় বহু স্ত্রীলোক ও পুরুষ পাত্রীর বাড়ী গিয়া ঐ গ্রামস্থ লোক দিগকে খাওয়ায়। সেই দিবস বিবাহে কত টাকা পণ দিতে হইবে তাহার পরিমাণ ঠিক হয়। যে দিন বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়, ঐ দিন কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করতঃ সকলকে আনিয়া দেখায় ও প্রণাম করায়। বিবাহের পূর্ব্বদিবস অধিবাস হয়। অধিবাসের দিবস পাত্রের বাড়ীতে সত্যনারায়ণের সেবা হয় ও গ্রামস্থ লোকদিগকে খাওয়ায়। বিবাহের দিবস প্রত্যুষে এক খানা পাল্কী ও বাদ্যাদি সহ কতিপয় পুরুষ ও স্ত্রীলোক (এই স্ত্রীলোকদিগকে হাজংগণ তাহাদের প্রচলিত ভাষায় 'আইরো' বলিয়া থাকে) পাত্রীর বাড়ীতে গমন করে। তথায় গেলে পাত্রীর অভিভাবকগণ ইহাদিগকে খাওয়ায়। তৎপর পণের সমস্ত টাকা দিয়া কন্যাকে স্নান ও ক্ষৌরকর্ম্ম করাইয়া ঐ গ্রামস্থ অন্যান্য লোকজন সহ পাত্রের বাড়ীতে লইয়া যায়। ইহারা পাত্রের বাড়ীতে গিয়া বহির্ব্বাটীতে অপেক্ষা করে, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারেনা! পাত্রীর বাড়ী হইতে যে সমস্ত লোক আসে, তাহাদিগকে প্রচলিত

ভাষায় 'দারুণী' বলে। পাত্রী পক্ষীয় লোকজনদিগকে পাত্রের বাড়ীতে আসিলে আহারাদি প্রদান পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করে ও সধবা স্ত্রীলোকদিগকে তৈল, সিন্দূর ও পান প্রদান করে। পাত্রের বাড়ীর বহিঃপ্রাঙ্গণে একটী মণ্ডপ প্রস্তুত হয়; এই মণ্ডপে বর আনীত হইলে 'আইরোগণ' কন্যাকে স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করায় এবং তৎপর কন্যাকেও বিবাহ মণ্ডপে লইয়া যায়; পাত্রী বিবাহ মণ্ডপে আনীতা হইলে পাত্রের কনিষ্ঠা ভগ্নী অথবা ভ্রাতুষ্পুত্রী আসিয়া তাহার পদপ্রক্ষালন করিয়া দেয়। পাত্রের পিতা অথবা অন্য কোন অভিভাবক পাত্রীকে যে সমস্ত অলঙ্কারাদি প্রদান করিতে ইচ্ছা করে, তাহা কোন একটা পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক এই সময় পাত্রীর সম্মুখে উপস্থিত করে; পরে ঐ অভিভাবকের স্ত্রী আসিয়া পাত্রীকে সিন্দূরাদি দিয়া ঐ সমস্ত অলঙ্কারাদি পরিধান করায়। তৎপরে দারুণীগণের মধ্যে দুই জন পুরুষ আসিয়া এক খানা পিঁড়ির উপরে বসাইয়া কন্যাকে বরের চতুর্দ্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করাইয়া বর ও কন্যার বস্ত্রের অগ্রভাগ দ্বয় গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া দেয় এবং তাহাদের উভয়ের হস্ত অন্যোন্যপরি স্থাপন করতঃ স্বীয় স্বীয় অবস্থানুসারে যাহার যাহা দিবার ইচ্ছা হয় তাহা তাহাদিগকে প্রদান করে এবং ধান্য দূর্ব্বা দ্বারা আশীর্ব্বাদ প্রদান করে। পরে বস্ত্রগ্রন্থি খুলিয়া দেয়, এই সময়ও সকলেই আবার কিছু কিছু বর ও কন্যাকে প্রদান করে। বস্ত্রগ্রন্থি খুলিয়া দেওয়ার পর বর ও কন্যাকে আনিয়া সকলকেই প্রণাম করায় ও দেখায়। তৎপর সমস্তকে আহারাদি প্রদান করে। বিবাহের পর একদিন পাত্রপক্ষ কন্যাপক্ষীয় লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ায় এবং তাহার পর আবার আর একদিন কন্যাপক্ষও পাত্রপক্ষীয় লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ায়। এই দিবস বর ও নবপরিণীতা বধূসহ যায় ও তথায় সিন্দুর, কাপড় ও অর্থ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে ইহাদের বিবাহ ব্যাপার নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন স্থলে বিধবা বিবাহ ও বহু বিবাহেরও প্রচলন আছে। বিবাহের পর যদি কোন স্ত্রীলোকপর পুরুষগতা হয় তবে তাহার স্বামীকে ত্যাগকরতঃ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এবং সুসঙ্গ রাজপরিবারের অনুমতি লইয়া ঐ পুরুষকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ইহাকে প্রচলিত ভাষায় 'দাইমারা' বলে। এরূপ স্থলে তাহার স্বামী পত্নান্তর গ্রহণ করিতে পারে। ইহাদের বিবাহ সন্ধ্যার সময় গোধূলি লগ্নে হইয়া থাকে।

শ্রাদ্ধ ও মৃত সৎকার

কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে গ্রামস্থ সকল লোককে ডাকিয়া মৃত ব্যক্তিকে তিল ও তুলসী সহ জলদ্বারা স্নান করাইয়া নববস্ত্র পরিধান করায়। তৎপরে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্মশান ঘাটে লইয়া যায়। তথায় পুত্র অথবা অপর কোন আত্মীয় মুখ অগ্নি করিয়া বাড়ীতে চলিয়া আসে এবং মৃত ব্যক্তির পরিহিত বস্ত্রদ্বারা ধরা গ্রহণ করে; এই দিবস ঐ ব্যক্তি অনাহারে থাকে, পরদিন ভালধান্যদ্বারা খৈ প্রস্তুত করতঃ রাত্রে সমস্ত নিদ্রাভিভূত হইলে একটী অলাবু নির্ম্মিত পাত্রে করিয়া জল আনয়ন পূর্ব্বক গৃহের কোন এক নিভৃত কোণে বসিয়া নিঃশব্দে তাহা ভক্ষণ করে; আহারের সময় যদি কোন ব্যক্তি, এমন কি কোন পশু পক্ষী হঠাৎ কোন প্রকার শব্দ করে, তাহা হইলে আর আহার করিতে পারে না। তৎপর দিবস পূর্ব্বোক্তরূপে অলাবু নির্ম্মিত পাত্রে করিয়া জল আনয়ন করতঃ একটা নূতন হাঁড়িতে অন্ন প্রস্তুত করে। রন্ধনাদি ক্রিয়ার জন্য শ্মশান ঘাট হইতে আসিবার সময় খড় দ্বারা একটী লম্বা বেণী প্রস্তুত করতঃ তাহাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া লইয়া আইসে। এই আগুন নিভিয়া গেলে আবার নূতন অগ্নি জ্বালাইয়া রন্ধনাদি করিতে পারে না। কেহ কেহ ৩ দিন অথবা ১০ দিন অশৌচ ধারণ করে। অশৌচ ধারণ কালে ইহারা নিরামিষ ভক্ষণ করে, পান তামাক খায় না, খড়ের বিচালির উপর নিদ্রা যায়। যাহারা ৩ দিনের পর শ্রাদ্ধ করে, তাহারা প্রথম দিবসেই তিন বেলা তিনটা নূতন পাতিল পোড়ায়; আর যাহারা ১০ দিবস পর শ্রাদ্ধ করে, তাহারা তিন দিনে তিনটা নূতন হাঁড়ি পোড়ায়। ইহারা শ্রাদ্ধের দিবস মস্তকমুণ্ডন করতঃ ধরা ত্যাগ করে ও নূতন বস্ত্র পরিধান করে। শ্রাদ্ধের দিবস কোন একটা পরিষ্কৃত ভূমিতে তিল ও তুলসীসহ একটী নূতন জলপূর্ণ ঘট স্থাপন করিয়া তাহার উপর জল ও পয়সা দেয় এবং অধিকারীকে দক্ষিণা প্রদান করতঃ

প্রণাম করে; পরে বাড়ী আসিয়া সত্যনারায়ণের সেবা দেয় ও সংকীর্ত্তন করায়। শ্রাদ্ধের দিবস নিজে মৎস্য খায়না কিন্তু অন্যান্য লোক মাছ মাংস খায় এবং অধিকারীর চরণামৃত পান ও প্রসাদ ভক্ষণ করে। শ্রাদ্ধের পরদিবস মহোৎসব করে ও শক্তি অনুসারে দান দক্ষিণাদি করিয়া থাকে। শ্রাদ্ধে ও বিবাহাদিতে অধিকারিগণই পৌরোহিত্য করিয়া থাকে।

ইহাদের কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হইলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ আহার্য্য দ্রব্য (খৈ, দধি ইত্যাদি) সঙ্গে লইয়া যায় ও পয়সা দেয়, কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তিগণ আহারের দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া যায়না এবং পয়সাও দেয়না। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে কেহই পয়সা দেয়না।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

গারোপাহাড় যখন সুসঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্তছিল, তখন সুসঙ্গের রাজপুরুষগণ প্রায় প্রতিবৎসরই উক্ত পাহাড়ে খেদাকরিয়া অনেক হস্তীধৃত করিতেন। এই খেদার কার্য্যে হাজংগণই কুলীর কার্য্য করিত। এই উদ্দেশ্যে ইহারা 'রায়ত' ও 'ওয়ালা' এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল; সাধারণতঃ রায়তগণই কুলীর কার্য্য করিত; এই কারণে ইহারা যে সমস্ত জমি ভোগ করিত তাহার কোন কর গ্রহণ করা হইত না; ওয়ালাদিগকে অতি সামান্য পরিমাণে করদিতে হইত। রায়তদিগের মধ্যে কুলী না পাওয়া গেলে সময় সময় ওয়ালাগণ দ্বারাও কুলীর কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। হাজংদিগের প্রত্যেক গ্রামে অথবা ২।৩টী গ্রাম লইয়া এক এক জন মণ্ডল থাকিত। মণ্ডলদিগকে সংবাদ প্রদান করিলেই তাহারা কুলী সংগ্রহ ও অন্যান্য আবশ্যক সমস্ত কার্য্যাদি সম্পাদন করিত। হাজংগণ গ্রামের মণ্ডলের উপর এতদূর নির্ভর করিত যে ইহাদের কাহারও পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলিত আমি জানিনা, মণ্ডল জানে। অবশ্য এখন শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ অবস্থার বহুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে সুসঙ্গের রাজপুরুষগণ জালদ্বারা ব্যাঘ্র, হরিণ প্রভৃতি আবদ্ধ করতঃ শিকার করিতেন। ইহা অতীব কৌতুকাবহ ও বিপদসঙ্কুল বলিয়া ইহাতে যথেষ্ট সাহসের আবশ্যক ছিল। এই সমস্ত কার্য্যেও হাজংগণ জাল ও কুলী সরবরাহ করিত। সুসঙ্গরাজ পরিবারস্থ কেহ কোন স্থানে যাতায়াত করিলে হাজংগণ ভারবাহীর কার্য্য করিত। ইঁহারা রাজবাড়ীতে বৎসরের অনেক সময় প্রহরীর কার্য্যও করিত।

বিগত কতিপয় বৎসর অতীত হইল ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ সামান্য পরিমাণে শিক্ষালাভ করতঃ পূর্ব্বোল্লিখিত কার্য্যাবলী ঘৃণিত ও অপমান সূচক মনে করিয়া ঐ সমস্ত কার্য্যত্যাগ করিয়া রাজপরিবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ভাবাবলম্বন করিয়াছিল। উহাদের দখলীয় ভূমির পরিমাণ ও স্বত্ব সাব্যস্থ হইয়া কর ধার্য্য হওয়ায় এখন ইহারা ইহাদের ভূমির জন্য রীতিমত কর প্রদান করিতেছে। গারো প্রভৃতি অনেক অসভ্য জাতি আজকাল বহু পরিমাণে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিতেছে, কিন্তু অতীব বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আজ পর্য্যন্ত হাজংদিগের মধ্যে একজনও স্বীয়ধর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক অপর কোন ধর্ম্মাবলম্বন করে নাই। দীপান্বিতার সময় হাজংগণ নানারূপ বেশ-ধারণ করতঃ রাজবাড়ীতে ও অন্যান্য ভদ্রলোকের বাড়ীতে রামরাবণেরযুদ্ধ প্রভৃতি প্রদর্শন পূর্ব্বক ও রাম মঙ্গল ও অন্যান্য গান করিয়া পয়সা আদায় করে; ইহাকে প্রচলিত ভাষায় 'চরমাগা' বলে। এইরূপ তামাসা দেখাইয়া ও গান করিয়া যে অর্থলাভ করে তাহাদ্বারা বাস্তু পূজা ও মহোৎসবাদি করিয়া থাকে।

সুসঙ্গে গারো পাহাড়ের পাদদেশে হাজংদিগের ন্যায় আর একপ্রকার অর্দ্ধসভ্য জাতির বাস আছে; ইহাদিগকে বানাই বলে। ইহাদের আচার ব্যবহার অনেকাংশে হাজংদিগেরই ন্যায়, কিন্তু বানাইগণ কুক্কুট ও শূকরের মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। গোমাংস ভক্ষণ করে না। হাজংদিগের ও বানাইদিগের মধ্যে ষণ্ডের ক্লীবত্ব সম্পাদন করিবার প্রথা আছে; ইহা তাহারা দোষ বলিয়া মনে করে না। ইহাদের মধ্যে সতীত্বের ভাবও খুব প্রবল বলিয়া মনে হয়না। হাজংগণ হিন্দুদিগের ন্যায় নবান্নশ্রাদ্ধ করিয়া থাকে; এই সময় ইহারা মদ্যপানও করিয়া থাকে। হাজংগণ অত্যধিক পরিমাণে মদ্যপায়ী নয়।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্ম্মণঃ।

অশ্রু-জল

সুবিমল প্রাতে বিধি একদিন বসি কল্প তরুমূলে,
দিক্‌দূত গনে নিকটে ডাকিয়া, আদেশ করিলা ছলে।
"মম প্রয়োজনে যাও মর্ত্ত্য ভূমে, নির্ম্মল পবিত্র যাহা
এমর জগতে, আমার নিকটে আনিয়া দেখাও তাহা।"
আজ্ঞা মাত্র তাঁর দূত ছয় জন, চৌদিকে ছুটিয়া গেলা;
পূরবে পশ্চিমে, উত্তরে দক্ষিণে, উর্দ্ধে অধঃ মিশাইলা।
নিমেশ ভিতরে ঘূরি দশদিক্, আসি দিক্‌দূতগণ,
শির লুটাইয়া করিলা বন্দনা, বিধাতার শ্রীচরণ।
হাসি কন প্রভু—'কোন দ্রব্য কেবা এনেছ দেখাও মোরে,'
একে একে সব যে যাহা আনিলা, দেখাইলা বিধাতারে।
কেহ তীর্থ রেণু, কেহ গঙ্গাজল, কুসুম, কেহ চন্দন,
শ্মশান মৃত্তিকা রাখিলা সম্মুখে, এইরূপে পঞ্চজন।
বাকি একজন বিনীত বচনে কহিলা বিধিরে—ভব।
ব্রহ্মাণ্ড ঘূরিয়া না পাইনু কিছু, পূজিতে চরণ তব।
তীর্থ কলঙ্কিত, কীট দষ্ট ফুল, কলুষিত গঙ্গাজল,
পবিত্র শ্মশানে পিশাচের বাস, কিছু নাই নিরমল।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, কোন স্থানে দেখি, মহাপাপী একজন,
আত্মকৃত পাপে মনের সন্তাপে তুষানলে দহে মন।
আপনার দেহ দশনে কাটিছে, কভুবা হানিছে শির;
কতক্ষণ পরে শান্ত মূর্ত্তি ধরে, করিলেক মন স্থির।
মহাঝড় শেষে স্তবধ প্রকৃতি, বিধি প্রেমে মাতোয়ারা,
লইতে তোমার শান্তিময় নাম, নয়নে বহিল ধারা।
এক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এর চেয়ে কিছু নাপাইনু নিরমল;
মধুপের বেশে এনেছি হরিয়া, প্রেমিকের অশ্রুজল।"
বলিতে বলিতে, ভিজিল নয়ন, কাঁদিলা সে অনুচর,
শান্তির আবাসে কাঁদে পশু পাখী, কল্প বৃক্ষে বহে ঝড়।
কহিলা বিধাতা, '—দাও মোর মাথে, প্রেমিকের অশ্রুজল,
এর চেয়ে কিছু নাহি এ সংসারে, সুপবিত্র নিরমল।"

শ্রীচন্দ্রকুমার দে।

—•—

নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগা।

ময়মনসিংহ জিলার কেল্লা বোকাই নগর একটি পরিচিত স্থান। সহর হইতে ইহা ১৩ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এক দিন যে স্থান ধনে, জনে, ঐশ্বর্য্যে ও সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ ছিল এক্ষণ তাহার সে শোভা সমৃদ্ধি বিদূরিত হইয়াছে। সেই প্রাচীনতার নিদর্শন স্বরূপ মৃৎ প্রাচীর, গৃহ ভিত্তি, সেতু প্রভৃতি দুর্গের কঙ্কাল চিহ্ন অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। খ্রীষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মোগলরাজ এই স্থানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, এমত জানা যায়। তখন ব্রহ্মপুত্র নদ এই স্থানের সন্নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত। সেই জন্য বোধ হয় এই স্থান দুর্গ স্থাপনের জন্য নির্ব্বাচিত
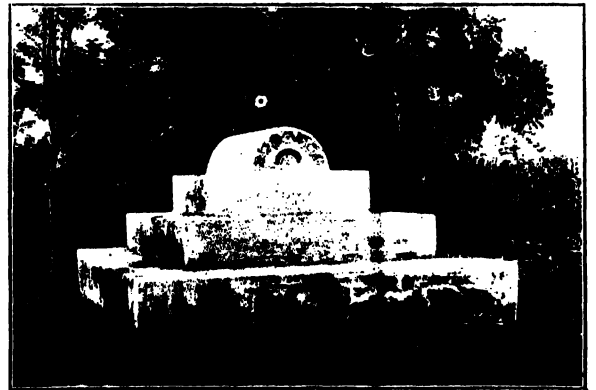
নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সমাধি।

হইয়াছিল। এই দুর্গ মধ্যে নিজামুদ্দীন আউলিয়া নামক এক সিদ্ধ পুরুষের সমাধি অবস্থিত। কোন্ সময়ে ইহা নির্ম্মিত হয় তাহা নিরূপণ করা কঠিন। স্থানীয় লোক মুখে শ্রুত হওয়া যায় যে, এই স্থানে সিদ্ধ পুরুষ নিজামুদ্দীন আউলিয়া আগমন করিলে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ একটী আস্তানা (আশ্রম) স্থাপিত হয়। উহাই দরগা নামে পরিচিত। নিজামুদ্দীন আউলীয়া আপন কার্য্যান্তে দিল্লী অঞ্চলে গমন করেন এবং সেখানেই সমাধিস্থ হন। তিনি ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্যেই এতদ্দেশে আগমন করেন। আমরা যে কবরটী দেখিতে পাই তাহাতে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দেহ রক্ষিত নাই বলিয়া প্রকাশ। কেবল তাঁহার স্মৃতি

রক্ষার্থই কবরাকারে গঠিত হইয়াছিল। তিনি বহু কোচ মেচ জাতিকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। পূর্ব্বে পরগণা ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে কোচ মেচ জাতির বসবাস অধিক ছিল। এমন কি বোকাইনগরেও একটী শক্তিশালী কোচ রাজা বাস করিতেন। কালক্রমে কোচদিগের রাজত্বের অবসান হইলে ক্রমে মোগল আধিপত্য স্থাপিত হয়। এখনও কোচদিগের বৃহৎ দীর্ঘিকাগুলি অতীত যুগের সাক্ষ্য দিতেছে। নিজামুদ্দীন আউলিয়ার এই সমস্ত অসভ্য জাতিকে ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত করতঃ নূতন সভ্যতালোকে আনয়ন করা অসম্ভব নহে।

এই মহাপুরুষ কোন সময় উদ্ভূত হইয়াছিলেন তাহা আলোচনা করা কর্ত্তব্য। দিল্লীতে সমাধিস্থ নিজামুদ্দীন আউলিয়া একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ইনি বদাওন জেলায় ১২৩৬ খৃঃ অঃ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সফরগঞ্জের সেখ ফকিরউদ্দীনের শিষ্য এবং সৈয়দ আহ্মদের পুত্র। মুসলমান সম্প্রদায় মধ্যে নিজামুদ্দীন আউলিয়া বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন এবং বিখ্যাত সাধু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। খ্যাতনামা কবি আমীর খস্রুর গুরু বলিয়া নিজামুদ্দীন আউলীয়া জনসমাজে আরও খ্যাতিলাভ করেন। আমির খস্রু বাহ্লীক দেশ হইতে ভারতের উত্তর পশ্চিমে পাতিয়ালা নগরে আসিয়া বাস করেন। যখন সম্রাট গায়েসউদ্দীন তোঘলক ভারতের সিংহাসন উজ্জ্বল করিতেছিলেন, সেই সময় আমীর খস্রু "তোঘলক নামা" ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তিনি সর্ব্বসমেত ৯৯ খানি গ্রন্থ লিখেন, এমত প্রমাণ পাওয়া যায়। শিষ্যের মৃত্যুর ৬ মাস পূর্ব্বে ১৩২৫ খৃঃ অঃ গয়াসপুরে (পুরাতন দিল্লী) সিদ্ধ পুরুষ নিজামুদ্দীন আউলিয়া ইহলীলা সম্বরণ করেন। ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এই ব্যক্তির বোকাই নগরে আগমন অসম্ভব নয়।

দিল্লী নগর হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে নিজামবাদ নামক স্থানে আর এক নিজামুদ্দীন আউলিয়ার কবর দৃষ্ট হয়। এই কবরের উপর পারস্য ভাষায় খোদিত ১৫৬১ খৃষ্টাব্দের শিলালিপি দেখা যায়। এইরূপ প্রবাদ যে, ঐ নিজামুদ্দীন হইতেই এই নগরের নাম 'নিজামবাদ' হইয়াছে। এই ব্যক্তিই বোকাইনগরে আসিয়াছিলেন কিনা কে বলিতে পারে? ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায়, খৃষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ কিম্বা মধ্যবর্ত্তী সময়ে ৩৬০ জন আউলিয়া (সাধু) পদ্মানদী পার হইয়া পূর্ব্ব বঙ্গের দিকে আগমন করেন। শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানের প্রায় পরগণায়ই এক এক জন 'আউলিয়ার' সমাধি দেখা যায়। ইঁহারা ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারার্থই এতদঞ্চলে আগমন করেন।

পূর্ব্বোক্ত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সহিত শেষোক্ত নিজামুদ্দীনের অনেক দিনের পার্থক্য হইয়া পড়ে। এক্ষণে কোন্ ব্যক্তি বোকাই নগরে আসেন তাহা অনুমানের উপর স্থির করা কঠিন। অধিবাসিগণের নিকট হইতে এই সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট (সন্তোষ জনক) বিবরণ পাওয়া যায় না। আমরা বোকাই নগরের সন্নিকটে একটী নিজামাবাদ গ্রামও দেখিতে পাই। ইহা হইতে কতকটা শেষোক্ত ব্যক্তিকে অনুমান করা যায়। এইরূপ দরগা এতদ্দেশে আরও দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন দরগার নিয়ম প্রণালীর সহিত ইহার নিয়মের ঐক্য হয় কিন্তু ঐ সমস্ত দরগার ইতিহাস ও এরূপই তমসাচ্ছন্ন।

বোকাইনগরের সমাধিক্ষেত্র এ অঞ্চলের একটী পবিত্র স্থান বলিয়া খ্যাত। কালের আবর্ত্তনে সমাধিটী নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হওয়ায় ইহার পুনঃ সংস্কার হইয়াছে। সমাধিটী প্রাচীর বেষ্টিত; প্রাচীন প্রাচীরের কতকাংশ ও আলো দিবার প্রাচীন পাকা স্তম্ভটী বিদ্যমান আছে। প্রতিদিন দরগার জন্য নিযুক্ত ফকির সন্ধ্যার সময় আলো দিয়া থাকে। বেষ্টিত প্রাচীরটীর দৈর্ঘ্য ১৫ হাত এবং প্রস্থ ১০ হাত। এই দরগাটীকে যে কেবল মুসলমানগণ সম্মান করিয়া থাকেন এমন নহে, হিন্দুগণও যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন। বেষ্টনীর মধ্যে হিন্দু মুসলমান সকলেই সম্মনার্থ কুর্ণীশ করিয়া থাকেন। সমাধির দক্ষিণ ভাগে বহুকালের একটী কূপ আছে। উহার জল এখনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কতকগুলি শ্রেণীবদ্ধ বটবৃক্ষ স্থানটীকে ছায়াময় ও মনোরম করিয়া রাখিয়াছে। দরগার সম্মুখস্থ ভূমিতে প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসের বৃহস্পতিবার ও রবিবার মেলা হইয়া থাকে।

শ্রীশৌরীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী।

মুক্তি

কত গ্রহ-উপগ্রহ রবি-শশি তারা
খচিত এ মুক্ত মহাকাশ,
ব্যাকুল কল্পনা ফিরে হ'য়ে দিশাহারা
অসীমের লভিতে আভাস।
কতটুকু এ জগৎ! ক্ষুদ্র কারাগারে
বন্দী মোরা কাটাই জীবন।
বাহিরে অনন্ত বিশ্ব; রহিয়াছে দ্বারে
অচঞ্চল প্রহরী মরণ।
পিঞ্জরের পাখীসম আমার অন্তরে
জাগে তবু মুক্তির স্বপন;
বিচিত্র-অপরিজ্ঞাত—মহা চরাচরে
যাব নাকি টুটিয়া বন্ধন!
জানি, মৃত্যু, একদিন আসি' শুভক্ষণে
মুক্ত করি' দিবে রুদ্ধ দ্বার;
চির স্বাধীনতা লভি' অনন্ত ভুবনে
বাহিরিব প্রসাদে তোমার।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

তিব্বত অভিযান।

গ্যাটং—এভারেষ্ট ও গৌরিশঙ্কর-শৃঙ্গ।

৫ই ডিসেম্বর আমরা গ্যাটং উপস্থিত হইলাম। পথিমধ্যে সেই পর্ব্বত, বরফ ও হাড়-ভাঙ্গা শীত। গ্যাটং প্রায় তের হাজার ফিট উপরে, কিন্তু আমাদের অগ্রবর্ত্তী সিপাহীরা এখানে একটা কাষ্ঠের আবাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিল বলিয়া আমরা অনেক দিবস পরে ঘরের মধ্যে শয়ন করিলাম। মনে হইল যেন নরকে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা স্বর্গরাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি। ঘরের একদিকে একটা বড় লোহার পাত্রে আগুণ থাকাতে বিশেষ আরাম বোধ করিলাম। তাহার পর মহারাজ যখন পাত্রে পাত্রে গরম লুচি ও মাংস আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল তখন মনে হইল মহারাজকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করি। ক্রমাগত প্রায় মাসাবধি কাল বরফের মধ্যে থাকিয়া আলুর তরকারি ও মোটা রুটি খাইবার পর যদি এইপ্রকার গরম ঘরে গরম গরম রসনা-তৃপ্তিকর দ্রব্যাদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে এমন ইন্দ্রিয়বিজয়ী কে আছে যে আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া না পড়ে?

গ্যাটং যেন—প্রাচীন কালের স্বর্গদ্বার। রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর তিব্বতকে পাণ্ডবদের স্বর্গরাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার কল্পনা শক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না তিব্বতের কয়েকটি স্থান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। গ্যাটং ইহাদের অন্যতম। আমরা এখান হইতে হিমালয়ের যে শোভা দেখিয়াছিলাম তাহা কখনও ভুলিব না।

আমাদের বাসার ঠিক সম্মুখেই এক হ্রদ। শুনিলাম গ্রীষ্মের সময় ইহাতে অতি গভীর জল থাকে। তখন ইহার উপর বোট যাতায়াত করে। এখন কিন্তু উহা প্রায় ১॥০ ফুট পুরু বরফে আচ্ছন্ন। মনে হয় যেন এই পর্ব্বতময় স্থানে সহসা এক সুবিস্তৃত ময়দানের আবির্ভাব হইয়াছে। নৈনিতালেও এক হ্রদ দেখিয়াছি। ইহা কিন্তু তাহার অপেক্ষা অনেক বড়,—শীতকালে জমিয়া যায় না।

এই প্রকাণ্ড বরফের মাঠ দেখিয়া আমাদের সাহেবেরা স্কেটিং করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সাজ সজ্জা সঙ্গেই ছিল। এক ২ জোড়া খড়ম পায়ে বাঁধিয়া সেই হ্রদের উপর দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। আমাদের ছোট ডাক্তার বিশেষ নিপুণ বলিয়া মনে হইল। তিনি যাইতে যাইতে সমকোণ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত, ত্রিভুজ, প্রভৃতি জ্যামিতির নানা প্রকার বিষয় সকল বেশ স্পষ্ট দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। বড় ডাক্তার কিন্তু আমারই মত পণ্ডিত। বার পাঁচ সাত আছাড় খাইবার পর কোনও রকমে ৮। ১০ হাত গমন করিয়া আবার ধরাতল আলিঙ্গন করিলেন। একবার এই সখের খেলায় যোগ দিবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু ডাক্তারের অবস্থা দর্শনে মনের সাধ মনেই মিটাইলাম। এইখানে একটা কথায় প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বড় ডাক্তারের বয়স পঞ্চাশের কাছা কাছি। কিন্তু তাঁহার—উৎসাহ আমাদের যুবকদের মধ্যেও বড় একটা দেখা যায় না। ভাল জানেন না, বারবার বিফল মনোরথ হইতেছেন, কিন্তু তথাপি নিবৃত্ত

হইলেন না। এ বয়সে এ রকম ভাব আমাদের দেশে কয়জনের আছে?

এখানকার লোকদের মুখে শুনিলাম, এই হ্রদের মধ্যে নানা জাতীয় মৎস্য বাস করে। বড় বড় মহাসের অসংখ্য জন্মিয়া থাকে। এক একটা মাছ দেড়মণ পর্য্যন্ত হয়। বাঙ্গালীর প্রাণ! এই সব কথা শুনিয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। একটা লোককে এক টাকা ইনামের লোভ দেখাইলাম। লোকটা ঐ দেশীয় নিতান্ত দরিদ্র বলিয়া মনে হইল। এক টাকা বোধ হয় জীবনে সে কখনও এক সঙ্গে দেখে নাই। সে ঘণ্টা দুইএর মধ্যে একটা বৃহৎ মহাসের আনিয়া হাজির করিল। মাছটা ওজনে ২৭ সেরের উপর। স্বাদের কথা আর কি লিখিব। জীবনে তেমন মাছ আর কখনও খাই নাই। শীত কালে হ্রদ বরফ ঢাকা থাকে বটে, কিন্তু তাহার জন্য মাছ ধরা বন্ধ হয় না। খানিকটা স্থানের বরফ কাটিয়া মাছধরা হয়। আর এইরূপ ভাবে বরফ ঢাকা না থাকিলে ভীষণ শীতে একটা মাছও বাঁচিয়া থাকিত না। শীত প্রধান দেশের ফুলের গাছ গুলিও এই উপায়ে রক্ষা পায়।

একদিন আকাশ বেশ পরিষ্কার থাকাতে আমরা বেড়াইতে বাহির হইলাম। সঙ্গে এক জন পথ প্রদর্শক চলিল। গ্যাটংএর নিকট একটী অনতি উচ্চ শৃঙ্গ আছে। আমরা তাহার উপর আরোহণ করিলাম। দক্ষিণ পশ্চিম দিকে যাহা দেখিলাম, তাহা অনির্ব্বচনীয়। অদূরে ধবলগিরি বিশাল মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়-মান। সার্থক ইহার নাম! সমস্ত দেহ অনন্ত বরফ রাশিতে ঢাকা থাকাতে সাদা ধব ধব করিতেছে। কি বিশাল, কি মহান, কি অনন্ত সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছে! প্রাচীন ঋষিরা যে কি জন্য এই সমস্ত স্থানে আসিয়া অনন্তের আরাধনা করিতেন তাহা এই বিরাট ব্যাপার দর্শনে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। ধবল গিরির অনতি দূরে (মনে হয় অনতিদূরে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহাদের মধ্যে ব্যবধান অনেক)—গৌরিশঙ্কর অবস্থিত। কিন্তু উহা কতকটা দূরে বলিয়া উহার সৌন্দর্য্য বেশ ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারিলাম না। দারজিলিং হইতে একবার ধবলগিরি দেখিয়া ছিলাম বটে, কিন্তু এতটা স্পষ্ট নহে।

এই স্থানে গৌরিশঙ্কর পর্ব্বত সম্বন্ধে দুই একটি কথার উল্লেখ অসঙ্গত হইবে না। সকলেই জানেন, হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গ এভারেষ্টকে অনেকে গৌরীশঙ্কর বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আজ-কাল বহুবিধ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। ইহার সংক্ষেপ ইতিহাস এই:—১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এভারেষ্ট শৃঙ্গ সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়, এবং ইহাই যে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ তাহা স্থির নিশ্চয় হয়। সে সময়ে ইহার প্রকৃত দেশী নাম না জানা থাকাতে, ইহাকে পঞ্চদশ শৃঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়। এই সময়ে এভারেষ্ট সাহেব সার্ভে বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা। অবশেষে তাহার নামানুসারে উহার এভারেষ্ট নাম নির্দ্ধারিত হয়। তখন হজসন্ (Hodgson) সাহেব নেপালের রেসিডেণ্ট। তিনি বলিলেন যে, কাষ্ঠমণ্ডপ (Khatmandu) হইতেও ঐ শৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাকে সেখানকার লোকে "দুধগঙ্গা" বলে। ঠিক ঐ সময়ে আর দুইজন সাহেব জানাইলেন যে, উহা নেপালে গৌরীশঙ্কর নামে প্রসিদ্ধ। তখন উক্ত শেষ নাম বিলাতের Royal Geographical Society কর্ত্তৃক গৃহীত ও প্রচারিত হয়। এই মতই তখন জন সমাজে চলিতে থাকে। তাহার পর ১০৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ওয়াডেল সাহেব (Lt. Colonel L. A. Waddell) Among the Himalyas নামক একখানি অতি উপাদেয় পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি হিমালয় সম্বন্ধে অনেক নূতন ও অজ্ঞাত কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার এক স্থানে ইনি বলেন—এভারেষ্ট শৃঙ্গ কাষ্ঠমণ্ডপ হইতে দেখিতে পাওয়া অসম্ভব। অপিচ গৌরীশঙ্কর হিমালয়ের এক সাধারণ শৃঙ্গ। ইহা কখনও এভারেষ্ট হইতে পারে না। তাঁহার মতে প্রকৃত এভারেষ্টকে তিব্বতীয়েরা "যশকঙ্কর" বলিয়া উল্লেখ করে। তাহারা ইহাকে তাহাদের দেবতাদের আবাস স্থান ভাবিয়া অত্যন্ত ভক্তিও করে। তিব্বতীয় ভাষায় "যশ কঙ্কর" শব্দের অর্থ "তুষার পর্ব্বতের শুক্লবর্ণা দেবী।" ওয়াডেল সাহেবের এই কথায় ভারতগবর্ণমেণ্ট কাপ্তেন উড্‌কে প্রকৃত তত্ত্ব

নির্ণয়ের জন্য নিযুক্ত করেন। তিনি প্রায় এক বৎসর কাল বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া স্থির করেন যে, প্রকৃত এভারেষ্ট কাঠমণ্ডপ হইতে আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা ঐ স্থান হইতে দেখা যায় তাহার নাম "গৌরী শঙ্কর।" ইহা কাঠমণ্ডপ হইতে মোটে ৭৮ মাইল দূরে অবস্থিত এবং ইহা হিমালয়ের এক নগণ্য শৃঙ্গ। ইহার পর নির্দ্ধারিত হয় "গৌরীশঙ্কর" ও এভারেষ্ট এক নহে।

গ্যাটংএর সমস্তকার্য্য শেষ করিবার জন্য আমাদিগকে কয়েকদিন ঐ স্থানে থাকিতে হইয়াছিল। অবশেষ ১০ই ডিসেম্বর আমরা উহা ত্যাগ করিয়া চুম্বি অভিমুখে রওয়ানা হইলাম।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

সাহিত্য সেবক।

শ্রীঅমগানন্দ বসু—১২৭৫ সালে ঢাকা জেলার অন্তর্গত জয়কৃষ্ণপুর গ্রামে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺ বিদ্যানন্দ বসু। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, উপাধি লইয়া জমিদারী সেরেস্তায় কার্য্য লইয়াছেন। বাল্যকালে গীতিমালা, সরোজবাসিনী ও সত্যনারায়ণের পাঁচালী প্রভৃতি পুথি লিখিয়াছিলেন। 'উপাসনা' পত্রে তাঁহার রামেশ্বরের দুর্গ,' 'ছত্রশাল' ও 'দেবী নিবাস' নামক তিনখানা ঐতিহাসিক উপন্যাস, বাহির হইয়াছিল। রামেশ্বরের দুর্গ পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। ইনি বিভিন্ন মাসিক পত্র—পত্রিকায় গল্প উপন্যাস ও প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত—১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ২৫ শে জানুয়ারী বরিশাল জেলার অন্তর্গত বাটাজোর গ্রামে শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দত্ত জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺ব্রজমোহন দত্ত। অশ্বিনীবাবুর পিতা সামান্য বেতনের চাকুরি হইতে বৃদ্ধ বয়সে সবজজ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। অশ্বিনী বাবু ১৮৭৯ সনে এম,এ, ও ১৮৮০ সনে বি এল পাশ করিয়া বরিশালে উকালতি আরম্ভ করেন। অশ্বিনীবাবুর শিক্ষানুরাগ আদর্শ স্থানীয়। তিনি ১৮৮৪ খৃঃ স্বীয় পিতার নামে বরিশালে ব্রজমোহন ইনিষ্টিটিউসন নামে একটী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সেই স্কুলটী তাঁহারই উদ্যোগে ১৮৮৯ সনে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয় এবং তিনি বিনা বেতনে তাহার কার্য্য করিতে থাকেন। ১৮৯৮ সনে ঐ কলেজ প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে।

অশ্বিনী বাবু সাহিত্য সেবী। ১২৯৯ সালে তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "ভক্তি যোগ" প্রথম মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের এখন সপ্তম সংস্করণ চলিতেছে। ভক্তিযোগ ব্যতীত অশ্বিনী বাবু "প্রেম" এবং "দুর্গোৎসব তত্ত্ব" নামক আরও দুইখানা পুস্তক লিখিয়াছেন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস—শ্রীহট্ট করিমগঞ্জ হাই স্কুলের শিক্ষক। 'বৈষ্ণবাচার কৌমুদী"নামে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার শর্ম্মা—পিতার নাম ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। নিবাস শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত ছাতক, ইনি "মঙ্গলা" নামে একখানা মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। প্রবাসী, প্রতিভা, বিজয়া প্রভৃতিতে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে ঢাকা ট্রেইনিং কলেজে কার্য্য করেন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার বর্ম্মণ ঃ—ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত নোয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম স্বর্গীয় কৃষ্ণকমল বর্ম্মণ রায়। অশ্বিনী বাবু শৈশব হইতে চিত্র শিল্পে বিশেষ অনুরাগীছিলেন। বিগত তিন বৎসর যাবত তিনি ইতালিতে থাকিয়া চিত্র বিদ্যার অনুশীলন করিতেছেন। বাঙ্গালা মাসিক পত্রে চিত্রশিল্প সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। বয়স অনুমান ৩০ বৎসর।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য ঃ—১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বরিশাল জেলার অন্তর্গত তারপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺ গিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। অশ্বিনী বাবু ১৮৯৬ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এফ এ পড়িতে থাকেন। এই সময় হইতে ঢাকার "শিক্ষক সুহৃদ" নামক পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন এবং "নির্ব্বান" নামক এক খানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা তাহাতে মুদ্রিত হয়। তিনি "জ্যোৎস্না" নামে অন্য একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ১৩১০ সালে তিনি "নিরাশ প্রেম" নামক এক খানা ক্ষুদ্র উপন্যাস প্রকাশ করেন। অশ্বিনী বাবু এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ।

আজ বাঙ্গালার সর্ব্বত্র আনন্দের উচ্চ কোলাহল শুনা যাইতেছে। জননী বঙ্গ ভাষার আজ আনন্দের সীমা নাই। ভাষা-জননী প্রতীচ্যের জ্ঞান গগনে তাঁর দীপ্ত রবিকে মাহেন্দ্রক্ষণে প্রেরণ করিয়া যে উজ্জল আলোকে ইউরোপ উদ্ভাসিত করিয়াছেন, তাহাতে প্রাচ্য জগৎ বহু উর্দ্ধে উঠিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভাষা জগতের ভাষার ইতিহাসে এক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। রবি কিরণে আজ বঙ্গ ভাষা উদ্ভাসিত।

ঐহিক সুখ-নিরত প্রতীচ্য জাতি রবীন্দ্র নাথের "গীতাঞ্জলির" উচ্চ ভাব মাহাত্ম লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। গীতাঞ্জলির ভাব এদেশে নূতন নহে। উপনিষদের আধ্যাত্মতত্ত্বের রেণু কণা লইয়াই ভারতভূমি গঠিত। বেশী দিনের কথা নহে, বিবেকানন্দের বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনিয়া আমেরিকা স্তম্ভিত হইয়াছিল, ইউরোপও সে তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়াছিল। এবার রবীন্দ্রনাথ এক নূতন তান তুলিয়াছেন। উহা বেদ মন্ত্রের প্রতিধ্বনি। উহার ঝঙ্কার ইউরোপের প্রাণ স্পর্শ করিয়াছে, তাই ইউরোপ তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার এবার রবীন্দ্রনাথকে প্রদান করিয়া তাঁহার সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। এই পুরস্কার ইউরোপ ও আমেরিকার মনস্বীগণের সাধনার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সম্মান।

সুইডেনের সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাইনামাইটের আবিষ্কর্ত্তা আলফ্রেড বার্ণহার্ড নোবেল মৃত্যুকালে (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে) কয়েক জন ট্রষ্টীর হস্তে দুই কোটি বাষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা রাখিয়া একটা উইল করেন যে, তাঁহার এই টাকা হইতে প্রতি বৎসর (১) প্রকৃতি বিজ্ঞান (২) রসায়ন (৩) আয়ুর্ব্বেদও শারীর বিদ্যা (৪) সাহিত্য (৫) শান্তি প্রতিষ্ঠাঃ—মানবের চেষ্টায় জগতের হিতকর যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য প্রতিবৎসর হইবে, তাহার জন্য ব্যয়িত হইবে। সাহিত্য বিভাগের পুরস্কার এবার আমাদের রবীন্দ্রনাথ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ষ্টকহলমের সাহিত্য পারিষদ পুরস্কারের যোগ্য পাত্র নির্ণয় করিয়াছেন। এই পুরস্কারের পরিমাণ এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা।

রবীন্দ্রনাথের গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত। রবীন্দ্রনাথের যশঃ সৌরভ দিগদিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া বঙ্গ ভাষার ও বঙ্গ জননীর মুখ উজ্জল করিয়াছে।

সেদিন দেশের পক্ষ হইতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সমবেত হইয়া রবীন্দ্রনাথকে বোলপুর শান্তি নিকেতনে সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। ইহা জাতীয় শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অভিভাষণের প্রত্যুত্তরে যে ভাষায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের অভিমান, তাঁহার নিজ ভাষায় এইরূপ প্রকাশ পাইয়াছে—"দেশের লোকের হাত থেকে যে অপযশ ও অপমান আমার ভাগ্যে পৌঁছেচে তার পরিমাণ নিতান্ত অল্প হয়নি এবং এতকাল আমি তাহা নিঃশব্দে বহন করে এসেছি।" অর্থাৎ তাঁহার স্বদেশ তাঁহার জ্ঞান গরিমার উপযুক্ত পূজা করিয়া তাঁহাকে চিনিয়া লইতে পারে নাই, বরং এতদিন বিদ্বেষের চক্ষেই রহিয়াছে, তাই তিনি তাঁহার সেই unrecognised প্রতিভার পণ্য সম্ভার সাজাইয়া "গুণিগণের রস বোধের জন্য" প্রতীচ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন, এখন তৎ বিনিময়ে "পূর্ণ মনস্কাম" হইয়া জগতের জ্ঞানী জনের চরম সম্মান লাভ করিয়া ফিরিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বদেশকে জগতের নিকট গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁর নিজের কথায় বলিতেগেলে—"আজ ইয়ুরোপ আমাকে সম্মানের বরমাল্যদান করেছেন। তার যদি কোন মূল্য থাকে তবে সে কেবল সেখাকার গুণিজনের রসবোধের মধ্যেই আছে। আমাদের দেশের সঙ্গে তার কোন আন্তরিক সম্বন্ধ নাই।"

রবীন্দ্র নাথ যখন প্রতিভার পসরা লইয়া বিদেশ যাত্রা করেন, তাহার বহুপূর্ব্বেই বঙ্গজননী রবীন্দ্রনাথকে আপনার স্নেহ ও আদর দানে আপ্যায়িত করিয়া বাণীর বরপুত্র রূপে ঘোষণা করিয়া যশের বিজয়মাল্য প্রদান করিয়াছিলেন। আজ ইয়ুরোপ খণ্ডে রবীন্দ্র নাথের গীতাঞ্জলির আদর দেখিয়া, তাহার কবিপ্রতিভার সম্মান সংবর্দ্ধনা দেখিয়া, তাঁহাকে জগত বিশ্রুত নোবেল পুরস্কারে পুরস্কৃত

দেখিয়া যে বাঙ্গালি তাঁহার প্রশংসা গীতি গাহিতেছে, তাহাকে সংবর্দ্ধনা করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে। বঙ্গবাসী ইহার পূর্ব্বেই তাঁহাকে কবি সম্রাট রূপে বরণ করিয়া কমলদলে তাঁহার অভিষেক নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। বঙ্গ সাহিত্যের মুখপাত্র "সাহিত্য পরিষদ" বিদেশ যাত্রার পূর্ব্বেই তাঁহার মস্তকে মুকুট পরাইয়া দিয়া স্বীয়গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। জগতের কোন কবিই বোধ হয় জীবিত কালে এরূপ সম্মান তাহার স্বদেশ ও সমাজ হইতে প্রাপ্ত হন নাই।

বিজয়ী রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বাঙ্গালী আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ কবি. বাঙ্গালির গৌরব। কিন্তু জনসমাজের নেতাগণের সমক্ষে, যাঁহারা তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতে সমবেত, সেই সম্বর্দ্ধনা-কারীদিগের মুখের উপর এরূপ অহমিকা প্রদর্শন তাঁহার পক্ষে সমীচীন হয় নাই। তিনি বাঙ্গালির আনন্দোচ্ছ্বসিত হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতার কমনীয় পুষ্পহার সাদরে গ্রহণ না করিয়া হেলায় পদদলিত করিয়া স্বদেশ-বাসীকে যেরূপ অপমানিত করিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে বোধ হয় এরূপ উদাহরণ আর দুটী নাই। আমরা কবিবরের এই শ্লেষ বাণী ভুলিতে পারিব না।

ভগবান রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘজীবী করিয়া বাঙ্গালির ও বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করুন।

শ্রী—

বাঙ্গালীর বাহুবল।

সম্প্রতি বাঙ্গালীর বাহুবলেরও কতকটা পরিচয় হইয়া গিয়াছে। এই দুর্ব্বল বাঙ্গালী জাতিরই একজন আজ কয়েক মাস হইল য়ুরোপে গিয়া সেখানকার নামজাদা কুস্তিগীর পলোয়ানদিগকে একে একে পরাজিত করিতে-ছেন। এই বাঙ্গালী বীরের নাম যতীন্দ্রচরণ গুহ, ডাক নাম গোবর।

যতীন্দ্রচরণ ১৮৯২ সনে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বাবু রামচরণ গুহ হোর মিলার কোম্পা-নীর মুৎসুদ্দি, তাঁহার পিতামহ স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ গুহ—অম্বুবাবু নামে পরিচিত। অম্বুবাবু তৎকালে প্রসিদ্ধ পালো-য়ানছিলেন এবং তাঁহার অন্যতম পুত্র, গোবরের জ্যেষ্ঠতাত, স্বর্গীয় ক্ষেত্রচরণ গুহও একজন বিখ্যাত পালোয়ান ছিলেন। ক্ষেত্র বাবুই গোবরের শিক্ষা গুরু। গোবরের বয়স এখন মাত্র কুড়ি বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই

শ্রীযতীন্দ্রচরণ গুহ ওরফে গোবর।

বয়সেই তিনি অসাধারণ শক্তি লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডবাসী তাঁহার সে শক্তির পরিচয় পাইয়াছেন। আশা করা যায় কালে সমগ্র জগৎ এই বাঙ্গালী যুবকের শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইবেন।

গোবর বিখ্যাত ইংরাজ পলোয়ান দুই জনকেই পরা-জিত করিয়াছেন। গত ৩০শে আগষ্ট গ্লাসগো নগরে গোবর খ্যাতনামা কুস্তিগীর কাম্বেল (Campbell) সাহেবকে পরাজিত করিয়াছেন। তারপর এডিনবরার ওলিম্পিয়া ক্রীড়ামঞ্চে তিনি প্রসিদ্ধ পলোয়ান জিমি এসনের (Jimmy Esson) সঙ্গে লড়িয়াছিলেন। জিমি

এসন সেই দেশে "অজেয় জিমি এসন" (The unconquerable Jimmy Esson) নামে পরিচিত। গোবর কিন্তু সেই অজেয় জিমি এসনকেও পরাস্ত করিয়াছেন। গোবর ইংলণ্ডে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন হইয়া আসিয়া ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অবস্থান করিতেছেন ও কুস্তি দেখাইয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। তিনি শীঘ্রই আমেরিকার প্রসিদ্ধ পালোয়ানগণের সঙ্গে লড়িবার জন্য আমেরিকা যাত্রা করিবেন। গচকে নাকি পৃথিবীর কোন পালোয়ান আজ পর্য্যন্ত পরাজিত করিতে পারে নাই। গোবর যদি গচকে পরাস্ত করিয়া আসিতে পারেন, তবেই তিনি বিশ্ব বিজয়ী পালোয়ান হইলেন সন্দেহ নাই।

গোবরের শরীরের দৈর্ঘ্য ৬ ফুট ১ ইঞ্চি, বুক—৪৮ হইতে ৫০ ইঞ্চি, কোমর ৪২ ইঞ্চি, গলা ১৮॥০ ইঞ্চি, জানু ৩০ইঞ্চি, ওজন তিন মণ। তাঁহার দুই জোড়া মুদ্গর আছে এক জোড়ার প্রত্যেকটার ওজন ২৫সের; আর এক জোড়ার প্রত্যেকটার ওজন একমণ দশ সের। তিনি যখন খোলা শরীরে এই দ্বিতীয় জোড়া মুদ্গর লইয়া ব্যায়াম করিতে থাকেন তখন তাঁহার দৈত্যের মত প্রকাণ্ডকায় চেহারা দেখিয়া ভীমসেনের কথা মনে উদয় হয়। তিনি বৃক নামক অগ্নিকে উদরস্থ করিয়াছেন এরূপ অবগত নহি। কিন্তু তাঁহার খাদ্যের পরিমাণ বৃকোদরের খাদ্যের মতই কি না নিম্নলিখিত তালিকা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। বাঙ্গালীর সাধারণ দৈনিক খাদ্য ছাড়া গোবর কলিকাতায় নিম্নলিখিতরূপ আহার করিতেন। "তিন পোয়া ঘি মিশ্রিত মাংসের আকনি; ৪০০ বাদাম ও এক ছটাক ছোট এলাচ, দেড় সের বেদানার রস; একটাকার সোনার পাত ও দু আনার রূপার পাত, বাদাম ও মসলা মিশ্রিত ঠাণ্ডাই ও এক সের দুধ এবং প্রত্যহ একটাকার ফল।" খাদ্যের পরিমাণ শুনিয়া নহে, খাদ্যের মূল্যের কথা ভাবিয়া যে সকল চিন্তাশীল মস্তিষ্ক

প্রস্তরবলয় স্কন্ধে গোবর।

বৃথা আলোড়িত হইবে তাহাদের অবগতির জন্য আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে গোবরের পিতামহ গোবরের উদর পালনের পক্ষে প্রচুরের অপেক্ষাও অনেক বেশী সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। গোবর সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান।

ভগবান এই বাঙ্গালী বীরকে জয়যুক্ত করুন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কবিবর দীনেশচরণ বসু।

নূতন যুগে বঙ্গদেশে যে সকল সুকবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, দীনেশ চরণ তাঁহাদের মধ্যে একজন। ঢাকা জিলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন শ্রীবাড়ী গ্রাম তাঁহার পৈত্রিক বাস স্থান। তাঁহার পিতা ৺অভয়চরণ বসু পূর্ণিয়ার সেরিস্তাদার ছিলেন। এই পূর্ণিয়া নগরে
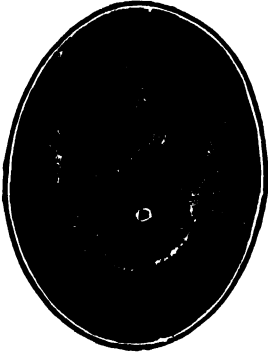
কবিবর দীনেশচরণ বসু।

দীনেশচরণ ১২৫৭ সনের ১২ই ফাল্গুন জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা অভয়চরণ ৩৫ বৎসর পূর্ণিয়ায় ছিলেন; তৎপর ভাগলপুরে স্থানান্তরিত হয়েন। দনেশচরণের বাল্য-জীবন শ্রীবাড়ী, পূর্ণিয়া এবং ভাগলপুরে অতিবাহিত হয়।

বাল্যের বাসস্থান এবং বাল্য-সহচর বাল্য-জীবনে অতিশয় প্রভাব বিস্তার করে এবং এই প্রভাব অনুসারে মানুষের জীবন গঠিত হইয়া থাকে। শ্রীবাড়ী, পূর্ণিয়া এবং ভাগলপুর কবির জীবন গঠনে কিরূপ সহায়তা করিয়াছিল, আমরা ক্রমে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব।

শ্রীবাড়ী তৎকালে অতি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ সম্ভ্রান্ত ধনী লোকে গ্রামটী পূর্ণ ছিল। প্রায় প্রতি সম্ভ্রান্ত লোকেরই দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকা ছিল। ফল ফুলের উদ্যানে নগর সুশোভিত ছিল। ইষ্টক সোপানে সুশোভিত বহু জলাশয় গ্রামের শোভা বর্দ্ধন করিত। সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী ৺হৃদয়নাথ রায়ের গৃহ,বিদ্যালয়,দেবালয়, নাট্যশালা, রং মহল, বৈঠক খানা, সরোবর, উদ্যান ইত্যাদিতে একটী রাজপুরী বিশেষ ছিল। এক শ্রেণীর সুদীর্ঘ ঝাউ তরু এই পুরীর এক বিশেষ শোভা ছিল। কবি তাঁহার কবি কাহিনীতে "প্রত্যাগত প্রবাসী" কবিতায় এই রায়পুরীর এক উজ্জ্বল বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন।

এই রায় বাড়ীর রং মহলের পাঠশালায় কবিবরের প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয়। উক্ত কবিতার একস্থলে তিনি আপনার বাল্য-চিত্র এইরূপ আঁকিয়াছেন—

"এই ঘরে কতদিন উচ্চতম স্বরে
"পাখী সব করে রব" পড়েছি হরষে
কশেছি স্লেটে অঙ্ক গুরু অগোচরে
একেঁছি আরবী অশ্ব সাবধানে ব'সে
সহসা শিক্ষক যদি দিত দরশন,
"এক"; "দুই" হাতে "চার" ভরসা তখন।"

পাঠশালায় কিছুদিন পাঠ করিবার পর অনেক বৎসর তিনি শ্রীবাড়ী গ্রামে আইসেন নাই; পূর্ণিয়াই পড়িতেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺ভগবতী চরণ বসু ভাগলপুরের কমিশনারের সেরেস্তাদার হন। দীনেশচরণ পূর্ণিয়া হইতে ভাগলপুর তাঁহার ভাই এর সহিত বাস করিতে থাকেন। ভাগলপুর এণ্ট্রান্স স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ মহাশয়ের ইনি অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে সহসা তিনি তাঁহার এক বাল্য সুহৃদের সহিত দেশ ভ্রমণার্থ পলায়ন করেন। দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিবার পর বৎসর১২৭৭ সনে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। ডাক্তারী শিক্ষার অধিকাংশ সময় তিনি রাণী স্বর্ণময়ীর বাগানে ছাত্রাবাসে বাস করিতেন। বাল্যকাল হইতে বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং ইংরেজী সাহিত্যের অনেক উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অবকাশের সময়ে তিনি শ্রীবাড়ী আসিতেন। শ্রীবাড়ী গ্রামে তাঁহার সমবয়সের ছাত্রদের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই বৈঠক হইত। এই বৈঠকে ৺হরিদয়াল গুহ (রাজা চন্দ্রনাথের সহকারিতায় ইনি সৈনিক বিভাগে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছিলেন) দ্বারকা নাথ বসু, (সব-ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট) এবং আমরা অনেকে সমবেত হইতাম। এই বৈঠকে সাহিত্যামোদের একটী প্রধান বিষয় এই ছিল যে, একজনকে একটী কবিতার এক চরণ বলিতে হইত। ঐ কবিতা যে অক্ষরে শেষ হইয়াছে বক্তার দক্ষিণ পার্শ্ববর্ত্তীকে ঐ অক্ষর প্রথম করিয়া কবিতা বলিতে হইত। প্রভাকর, মাইকেল, হেমচন্দ্র, বিহারী লাল প্রভৃতির কবিতা যাঁহাদের কণ্ঠস্থ ছিল না তাঁহারা সমস্যা পূরণে অসমর্থ হইতেন। কবি দীনেশ চরণের বহু কবিতা কণ্ঠস্থ ছিল; তাঁহাকে প্রায় ঠকিতে দেখা যায় নাই। তিনি নিজেও তখন কবিতা লিখিতেন। কখন লিখিতেন,কি লিখিতেন, তাহা কাহাকেও জানাইতেন না। দেখা যাইত দিবসের অনেক সময় তিনি তাঁহার হাতে একখানি খাতা ও একটী পেন্সিল রাখিতেন। পরে জানা

গিয়াছে তাঁহার, পিতৃদেব শাণ বাঁধা ঘাটের উপর যে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন সেই শিব মন্দিরের সম্মুখে বসিয়া এবং তাঁহাদের দ্বিতল গৃহের ছাতে বসিয়া দীনেশ চরণ অধিকাংশ সময় কবিতা লিখিতেন।

রাণী স্বর্ণময়ীর বাগানে তাঁহার "মানস বিকাশের" জন্ম। অতি গোপনে লেখা তাঁহার অভ্যাস ছিল। ক্রমাগত কয়েক দিন কবিতার কয়েকটী চরণ পূরণ জন্য শব্দের আলোচনায় উহা ধরা পড়িয়া যায়। আমি তখন তাঁহার মহিত ঐ ছাত্রাবাসেই থাকিতাম। তখন দিনেশ চরণ "প্রাচীন ভারত যন্ত্রে" তাঁহার কবিতার কতক কপি দিয়াছেন কিন্তু তখনও পুস্তকের নাম স্থির হয় নাই। যখন ধরাই প'ড়িয়া গেলেন তখন গ্রন্থের নামের আলোচনা হইল। আমি কতকগুলি নাম বলিলাম। তিনি উহার মধ্য হইতে "মানস বিকাশ" গ্রহণ করিলেন। ঐ নামেই উহা প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হইবার পর তিনি সমালোচনার্থ উহার এক খণ্ড বঙ্গদর্শন সম্পাদক ৺বঙ্কিমচন্দ্রকে পাঠাইয়া দেন। বঙ্গদর্শনে একটী স্বতন্ত্র সন্দর্ভে যখন সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তখন তিনি পীড়িত হইয়া দেশে ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনার একস্থলে লিখেন "মিলন" নামক কবিতার প্রথমাংশ এমন সুন্দর যে তাহা হেমবাবুর যোগ্য বলা যায়। এই কবি বিশেষ আদরের যোগ্য সন্দেহ নাই।" পৌষ ১২৮০। এই সমালোচনার সংবাদ পাইয়া দীনেশ বাবু আমাকে যে পত্র লিখেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

সুখী হইলাম। বঙ্গদর্শনে আমার "মানস বিকাশের" অনুকূল সমালোচনা বাহির হইয়াছে। উহা দেখিতে অধীর হইয়াছি। এক খণ্ড বঙ্গদর্শন অতি সত্বর পাঠাইয়া দিবেন। ইতি

৩১।১২।১৩ আপনার

[signature]

শুভ-দৃষ্টি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জ্ঞান।

(১)

আমি নির্দ্দিষ্ট দিনেই চণ্ডীবাবুর পত্নী ওরফে মার্টিন কোম্পানীর হেড্ বাবুর ভগিনীকে লইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম।

সে ঘটনার পর অনেক দিন গত হইয়াছে। ইতি মধ্যে জীবন, কর্ম্ম ও ভাব রাজ্যে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। প্রাকৃতিক এবং রাজনৈতিক রাজ্যেও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই সকল পরিবর্ত্তন প্রভাবে জাতীয় জীবনের ন্যায় ব্যক্তিগত জীবন ও গঠিত হয়, ধ্বংসও হয়। এই নিয়মে আমার ব্যক্তিগত জীবন গঠন ও ধ্বংসের ভিতর দিয়া যাইয়া এক নূতন পথে দাঁড়াইয়াছে।

আসামের বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া, নিস্তব্ধতার সহবাসে, জীবনের সেই প্রাথমিক বিকার ভাব কাটিয়া গিয়াছিল। অর্থের জন্য কর্ম্মকেই জীবনের অবলম্বন করিয়া লইয়াছিলাম। ইহার পর রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনে যখন কর্ম্মস্থল শিলং ও অতঃপর বুড়ীগঙ্গার তীরে পরিবর্ত্তিত হইল, তখন এক অপূর্ব্ব সংসর্গে আমার এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল।

ঢাকা রাজধানী স্থাপিত হইলে পর আমাদিগকে শীতের ছ'মাস ঢাকায় থাকিতে হইত। এখন চণ্ডীবাবু আমার মুরুব্বী। ঢাকায় আসিয়া চণ্ডীবাবুর বাড়ীতে উঠিলাম। তাঁহার স্ত্রীকেই আমি কলিকাতা হইতে ঢাকায় রাখিয়া গিয়াছিলাম।

ঢাকায় আসিয়া চণ্ডীবাবুর নিকট গীতা, উপনিষদ, ভাগবৎ প্রভৃতি প'ড়িতে লাগিলাম।

চণ্ডীবাবুর সহবাসে আমি আমার আত্মশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইলাম। ন্যায়, অন্যায়, ভাল, মন্দ, সকল কার্য্যই আমি মানুষবুদ্ধির অতীত ও বিশ্বপতির ইঙ্গিত বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলাম—ভগবান্ ইচ্ছাময়— "ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথানিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

ভোর বেলা গীতা পাঠ করিতাম। চণ্ডীবাবুর ছেলে মেয়েরা কখন কখন আসিয়া আমার নিকট বসিয়া পড়িত। সন্ধ্যার পর চণ্ডীবাবুর বড় মেয়ে শৈবাল হারমনিয়মে ব্রহ্ম সঙ্গীত গাইত, আমি ও চণ্ডীবাবু একাগ্র চিত্তে তাহা শুনিতাম। শৈবালের মিষ্ট-রাগিনী যখন তান লয়ে গাইয়া উঠিত :—

"আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল
সকলি ফুরায়ে গেল মা॥
জনমের শোধ ডাকি মা তোরে,
কোলে তুলে নিতে আয় মা॥
পৃথিবীর কেহ ভালত বাসেনা,
এ পৃথিবী ভালবাসিতে যানে না
যেথা আছে শুধু ভালবাসাবাসি,
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা।
বড় দাগা পেয়ে বাসনা ত্যজেছি,
বড় জ্বালা সয়ে কামনা ছেড়েছি।
অনেক কেঁদেছি কাঁদিতে পারিনা,
আমার বুক ফেটে ভেঙ্গে যায় মা।"

"শৈবাল উঠিয়া গিয়া হারমোনিয়মে গান ধরিল।"

তখন তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া আত্মহারা হইয়া যাইতাম। শৈবালের সঙ্গীত ক্রমে আমার এমন প্রিয় হইয়া উঠিল যে, যখন তখন আমি শৈবালকে ডাকিয়া সঙ্গীত শুনিতাম। চণ্ডীবাবু বা তাঁহার গৃহিনীর তাহাতে কোন আপত্তি দেখিতাম না। বরং সঙ্গীত শুনিয়া সময় সময় চণ্ডীবাবুও আসিয়া তাহাতে যোগ দিতেন। এইরূপে সৎসঙ্গে ও সৎপ্রসঙ্গে দিন চলিতেছিল।

(২)

২৭শে পৌষ রবিবার। অদ্য চণ্ডীবাবুর বিশ্রামের দিন। তিনি রবিবার মোয়াক্কেলের কাজ করিতেন না। দিনের বেলা আহারের পর ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা করিতেন। আমরা তাহা শুনিতাম। আজ তাহাই হইতেছিল।

শৈবাল আসিয়া আমার শরীর ঘেসিয়া বসিয়া আমার হাতের আঙ্গুল মসকাইবার চেষ্টা করিতেছিল। শৈবালের এই আচরণে আমি নিতান্ত সঙ্কোচিত ভাবে আমার হাত টানিয়া লইয়া সরিয়া বসিলাম। চণ্ডীবাবু তাহা লক্ষ্য করিলেন। এই সময়েই চণ্ডীবাবু ভাগবতের বিশ্বপ্রেম ব্যাখ্যা করিতেছিলেন।

চণ্ডীবাবু আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"যোগেশ, তুমি সঙ্কোচিত হইলে কেন?"

আমি মাথা অপেক্ষাকৃত নীচু করিয়া বলিলাম—"শৈবালের বয়স হইয়াছে—ইহাতে মনে সঙ্কোচ আসে বই কি?"

চণ্ডীবাবু হাসিয়া বলিলেন—"তোমার একথাটী আমাকে বুঝাইয়া বলিতে পার কি?"

আমি বলিলাম—"কেন সঙ্কোচ বোধ হয়, ঠিক বুঝাইয়া বলিতে পারিব না, তবে আমি ইহা ভাল মনে করি না।"

চণ্ডীবাবু বলিলেন—"আমাদের মন সর্ব্বদা পাপ চিন্তায় সঙ্কোচিত,—বিশ্বপ্রেম আমাদের সম্ভবেনা। তাই স্ত্রীজাতির প্রতিও আমরা সম্মানের চক্ষে তাকাইতে জানিনা।"

আমি বলিলাম—"এ সম্বন্ধে আমার মত বড়ই রক্ষণ-

বলিলেন—"তোমাদের ন্যায় শিক্ষিত লোকের গোড়ামিতেই সমাজ আরও অধঃপাতে গিয়াছে।

ভাগবত পাঠ চলিল। শৈবাল ঠিক সেই ভাবেই বসিয়া রহিল। চণ্ডীবাবুর গৃহিনী আসিলেন, আরও ২১ জন আসিলেন, শৈবাল নড়িলও না। আমি ফাঁফর হইয়া উঠিলাম। মনে মনে ভাবিলাম—"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"

সন্ধ্যা ৫টা। চণ্ডীবাবুর যুক্তি আমার নিকট নিতান্তই অসঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছিল। বুড়ীগঙ্গার তীরে পায়চারি করিতে করিতে বিষয়টী মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলাম। এতক্ষণে বুঝিলাম, চণ্ডীবাবুর মন্তব্যই যথার্থ। আমরা স্ত্রীলোককে যথার্থই উচ্চভাবে দেখিতে জানিনা। স্ত্রীলোকের মুখপানে চাইতেই আমাদের প্রাণে দুর্ব্বলতা আইসে। মনে বিভীষিকা দেখাদেয়। দুর্ব্বলতাও বিভীষিকা কুচিন্তার ফল। বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, শৈবাল আমার বিছানায় শুইয়া শুইয়া 'সঙ্গীত মুক্তাবলী' দেখিতেছে। আমি নিঃসঙ্কোচে বলিলাম—"কর্ত্তা কোথায়? বেড়িয়েছেন কি?"

শৈবাল বলিল—"না, তিনি আপনাকে খুঁজিতেছিলেন।"

চণ্ডীবাবু আসিলেন। শৈবাল তখনো বিছানায় গা ঢালিয়া পুথির পাতা উল্টাইতে লাগিল। আমি কোনই সঙ্কোচভাবে দেখাইলাম না।

চণ্ডীবাবু বিছানায় উপবেশন করিলে শৈবাল উঠিয়া গিয়া হারমোনিয়মে গান ধরিল।

প্রথমেই শৈবাল আমার সেই প্রিয় সঙ্গীতটা গাইল, "আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল"—এটী আমি বড়ই ভালবাসিতাম। শৈবালও এটী সর্ব্বাগ্রে গাইত।

সৌরভ —

স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী।

N. M. Press, Dacca.

সৌরভ

দ্বিতীয় বর্ষ। } ময়মনসিংহ, মাঘ, ১৩২০। { চতুর্থ সংখ্যা।

প্রাচীন ভারতে পশু চিকিৎসা।

শেষাংশ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অগ্নিপুরাণের রচনানুসারে জানা যায় যে "শালিহোত্র" সুশ্রুতের নিকট হয়ায়ুর্ব্বেদ বলিয়াছিলেন, অতএব শালিহোত্র যে অশ্বচিকিৎসা গ্রন্থের আদি প্রচারক তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সুশ্রুত এবং প্রসিদ্ধ শারীর শাস্ত্রবিৎ—সুশ্রুত সংহিতাকার মহর্ষি সুশ্রুত অভিন্ন ব্যক্তি কিনা, তাহা বলা দুরূহ। আমাদের কিন্তু মনে হয় যে, ইঁহারা দুইজন একনামধারী বিভিন্ন ব্যক্তি। পূর্ব্বকালে গ্রন্থকারের নামানুসারেই গ্রন্থের নামাকরণ হইত। আয়ুর্ব্বেদ প্রচারক অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, ক্ষারপাণি, পরাশর, হারীত প্রভৃতি ঋষি প্রণীত গ্রন্থগুলি স্বীয় স্বীয় নামানুযায়ী সংহিতা বলিয়াই প্রচারিত হইয়াছিল। অগ্নিবেশ তন্ত্রই উত্তরকালে মহর্ষি চরক কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত হইয়া "চরক সংহিতা" নামে লোক সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। তদ্রূপ শালিহোত্র প্রণীত অশ্বশাস্ত্রও "শালিহোত্র সংহিতা" নামেই বিখ্যাত। এই গ্রন্থ আজও পূর্ণাবয়বে প্রকাশিত হয় নাই। কচিৎ দুই চারিটি অধ্যায় মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে। শুনা যায় এই গ্রন্থও বিশাল এবং অশ্বচিকিৎসা বিষয়ক অতি প্রাচীন ও বিশদ গ্রন্থ। গ্রন্থখানা সমগ্রভাবে মুদ্রিত হইলে এ সম্বন্ধে, আলোচনা করিবার অবকাশ হইবে।

কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে Bengal Asiatic Society হইতে কবিরাজ উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহোদয় চতুর্থ পাণ্ডব মহাত্মা নকুল প্রণীত অশ্ব-শাস্ত্র এবং জয়দত্ত কৃত "অশ্ব বৈদ্যক" মুদ্রিত করতঃ প্রচারিত করিয়াছিলেন। মহাভারত পাঠকগণ অবগত আছেন যে মহাত্মা নকুল অশ্বচিকিৎসায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন। বিদর্ভাধিপতি মহারাজ নলও এ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি বোধ হয় অশ্বচিকিৎসাপেক্ষা অশ্বপালন ও অশ্বশিক্ষা বিষয়ে সমধিক দক্ষ ছিলেন। এবং সূপ (পাক) শাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। প্রাগুক্ত কবিরাজ মহাশয়ের প্রকাশিত গ্রন্থে প্রাচীন অশ্বায়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের একটি বিস্তৃত সূচী দেওয়া হইয়াছে, গ্রন্থখানি সম্প্রতিক আমাদের নিকট না থাকায় সে গুলির নাম উল্লেখ করিতে পারিলাম না। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অশ্বচিকিৎসা সম্বন্ধেও প্রাচীন ভারতে বহু গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল এবং অশ্বেরও অশ্বচিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। ইংরেজী ভাষায় এ বিষয়ে বহুগ্রন্থ আছে, তথাপি সংস্কৃত গ্রন্থ গুলিরও প্রচার এবং সেগুলির অনুবাদ প্রচার প্রয়োজন; হয়ত তাহাতে অনেক অভিনব বিষয়ও জানা যাইতে পারে এবং এতদ্দেশীয় ভৈষজ্য দ্বারা অশ্বের রোগ প্রতীকারও অধিক মাত্রায় সম্ভাবিত হইতে পারে। অশ্ব প্রতিপালন ও তাহার শিক্ষা প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়ে অনেক প্রকার উপদেশ আছে।

কুতূহলী পাঠক বৃন্দ উক্ত গ্রন্থ দ্বয় পাঠে প্রাচীন ভারতে অশ্বচিকিৎসা বিষয়ে কি পরিমাণ উন্নতি হইয়াছিল,তাহার কতকটা আভাস পাইতে পারেন।

ইতঃপর আমরা গো চিকিৎসা বিষয়ে প্রাচীন ভারতের জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিব। মহাভারত পাঠে অবগত হই যে পঞ্চম পাণ্ডব শ্রীমৎসহদেব গোপালনে ও তাহাদের চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ নিপুন ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ পর্য্যন্ত আমরা তৎকৃত গো চিকিৎসা বিষয়ক কোনও গ্রন্থই দেখিতে পাই নাই। অশ্বশাস্ত্র নিপুণ তদীয় ভ্রাতার গ্রন্থ যখন এখনও বিদ্যমান তখন তাঁহার প্রণীত গোপালন বিষয়ক কোনও গ্রন্থ যে ছিল না, একথা বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। হয়ত তৎপ্রণীত গ্রন্থ একদাই নষ্ট হইয়া গিয়াছে অথবা তাহা আজও অনাদরে ও অবহেলায় লোক লোচনের অন্তরালে ভারতের কোনও প্রদেশের নিভৃত কক্ষে ধূল্যবলুণ্ঠিত ও কীটদষ্টাবস্থায় বর্ত্তমান আছে। আসমুদ্রহিমাচল বিশাল ভারত ভূমির কোন্ দেশের কোন্ রত্নভাণ্ডারে কত অমূল্য রত্ন লুক্কায়িত আছে, তাহা কে বলিতে পারে? বৈদেশিকগণ যে সকল রত্ন আহরণ করতঃ ধনী হইতেছেন, আমরা সে গুলিকে অবহেলায় হারাইতেছি। ইহা আমাদের দশা বিপর্য্যয়েরই পরিচায়ক। "প্রায়ঃ সমাপন্নঃ বিপত্তিকালে। ধীরোঽপি পুংসাং মলিনী ভবন্তি।"

সম্প্রতি Colonel S. A. Waddel নামক জনৈক বিদ্যোৎসাহী ইংরেজ মহাত্মা তিব্বতের প্রধান নগরী লাসা হইতে সহস্রাধিক হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া নিয়াছেন। সেগুলি অধুনা লণ্ডন নগরীর ইণ্ডিয়া আফিসস্থিত পুস্তকাগারে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় যে, এ গ্রন্থ গুলির অধিকাংশই আয়ুর্ব্বেদ সংক্রান্ত। এ সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে পশুচিকিৎসা সম্বন্ধে কোনও গ্রন্থ আছে কি না তাহা বলিতে পারি না। কালে বোধ হয় ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে এই সকল গ্রন্থ রাশি হইতে অনেক তত্ত্বই প্রকাশিত হইবে; কিন্তু আমরা তাহার ফলভাগীহইব কি না সন্দেহ।

অগ্নিপুরাণ ও অন্যান্য পুরাণে গো চিকিৎসা বিষয়ে সামান্য সামান্য ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু এই মহোপকারী জীবের রক্ষার্থ আর্য্য ঋষিগণ যে প্রকার আগ্রহাতিশয্য ও ঐকান্তিক যত্ন প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তদনুযায়ী বৃষায়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে কোনও প্রণালী বদ্ধ গ্রন্থ অদ্যাপি আমাদের নয়ন বা শ্রুতি গোচর হয় নাই। ইহার কারণ বুঝিতে পারা যায় না। পুরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থ এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শ্লোকাদি একত্র করিলেও গো চিকিৎসাদি বিষয়ে কতক বিবরণ জানা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা গজাশ্বাদি চিকিৎসা গ্রন্থের ন্যায় প্রচুর নহে এবং তাদৃশ বিশদও নহে। গোজাতির উন্নতি ও অবনতির সহিত ভারতবর্ষের উন্নতি অবনতি অবিচ্ছেদ্যরূপে সম্বদ্ধ। "গোষু লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ"একথাতে কোনও সন্দেহ নাই। পরিতাপের বিষয় এই যে, আমরা এই মহতী বাণীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিতেছি না এবং তন্নিবন্ধন ক্রমেই আমরা দুর্দ্দশা গ্রস্থ হইতেছি। সময়োচিত সতর্কতা অবলম্বন বিধেয়। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একথাগুলি বলিতে বাধ্য হইলাম। অনেকের ধরণা এই যে গো-চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়াটা একটা বড়ই হেয় এবং ঘৃণ্য কার্য্য; এমন কি আমরা গো চিকিৎসককে "গোবদ্দি" বলিয়া গালি দিতে ও কুণ্ঠিত হই না। ইহার পরিণাম এই দাঁড়াইয়াছে যে, জগতের একটী মহোপকারী জীবের চিকিৎসা প্রভৃতির ভার কতকগুলি অর্ব্বাচীন ও মূর্খের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে এবং ইহার পরিণাম যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। চিকিৎসার্থ গোশরীরে অস্ত্রাদি প্রয়োগ করিলে প্রায়শ্চিত্তই করিতে হয়—এই ভ্রান্তি বশতঃ অনেক হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি গো চিকিৎসায় বিরত থাকেন; কিন্তু প্রায়শ্চিত্তাধিকারে স্মৃতি শাস্ত্রে যে ব্যবস্থা আছে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আর এ ভ্রম থাকিতেই পারে না। আমরা স্মৃতির দুইটি বচন এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, এতদ্বারাই প্রকৃত তত্ত্ব জানা যাইবে—

"দাহচ্ছেদং, শিরাবেধং প্রযত্নৈরুপকুর্ব্বতাং।
দ্বিজাণাং গোহিতার্থায় প্রায়শ্চিত্তং নবিদ্যতে॥১॥
অপিচ—"যন্ত্রণে গোচিকিৎসায়াং মূঢ়গর্ভ বিদারণে।
যদি কার্য্যে বিপত্তিঃ স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তং নবিদ্যতে॥২॥

উপর্য্যুক্ত শ্লোকদ্বয়ের সরলার্থ করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয়

যে, গাভীর হিতার্থ (রোগ প্রশমনার্থ) যত্নের সহিত গো শরীরে দাহ, ছেদ (অস্ত্রাদি প্রয়োগ) প্রভৃতি করিলে এবং অস্ত্রাদি দ্বারা শিরা বেধ করিলে ব্রাহ্মণের (অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই) কোনও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। ব্রাহ্মণ জাতির পক্ষে ত কোনও কথাই উত্থাপিত হইতে পারে না। অতঃপর গোকে চিকিৎসার্থ বন্ধন করিতে গিয়া (অবশ্য ইহাও যত্নের সহিত করিতে হইবে) অথবা গর্ভস্থ মৃতবৎস অস্ত্রপ্রয়োগে বহির্গত করিবার সময় যদি গাভী দৈবাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে কোনও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নাই। কূটতর্কজাল বিস্তার করতঃ হয়ত কেহ কেহ বলিবেন যে, দ্বিজানাং শব্দে উদ্ধৃত শ্লোকে ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করা হয় নাই, ইহা ব্রাহ্মণ স্বামিত্ব সূচকমাত্র। তথাস্তু, আমরা কোনও তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ না হইয়া একথা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে প্রাচীন ভারতে গাভীর শরীরে ব্রণাদি বিদরণার্থ এবং মূঢ়গর্ভ বিদারণ জন্য অস্ত্র প্রয়োগ প্রথা প্রচলিত ছিল, অন্যথায় শাস্ত্রের পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার অবসর কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে ? শাস্ত্রকার বিশেষ বিবেচনা ও ভবিষ্যদ্দর্শিতার সহিতই এই ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয় কাহারও বিপ্রতিপত্তি হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে সদাশয়, গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের নানা স্থানে পশুচিকিৎসা শাস্ত্রাধ্যয়নার্থ বিদ্যালয় স্থাপিত করতঃ দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। এই বিদ্যালয় গুলিতে আব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেই অধ্যয়ন করিতে পারে এবং ব্রাহ্মণ সন্তানও গবাদির অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা করিতেছেন এবং তদর্থে গাভীর শরীরে অস্ত্রাদিও প্রবেশ করাইতেছেন ; ইহাতে কোনও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইতেছে না এবং গোচিকিৎসায় ভদ্রসন্তানগণ আর "গোবৈদ্য" বলিয়া উপেক্ষিত ও উপহসিত হইতেছেন না। আমার বিবেচনায় ইহা সাময়িক শুভ লক্ষণ বটে। প্রসঙ্গাধীন আমরা কতকগুলি অনাবশ্যক কথার আলোচনা করিয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছি, আশা করি পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন। শুনিতে পাই "বারাহী সংহিতাতে" গৃহপালিত ছাগ, মেষ, কুকুর প্রভৃতির চিকিৎসা প্রণালী বিষয়ে সংক্ষেপে উপদেশ দেওয়া আছে ; এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কোনও জীবই করুণ হৃদয় ঋষিদের অসীম দয়ালাভে বঞ্চিত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

প্রাচীন ভারতে "গারুড় বিদ্যা" নামক একপ্রকার গুরু মুখী বিদ্যা প্রচলিত ছিল, ইহা বিহগ সম্বন্ধীয়। এ বিদ্যা বিধায়ক কোনও গ্রন্থ আছে কিনা তাহা আমরা অবগত নহি। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ মহোদয় এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে "শৈয়েনিক শাস্ত্র" নামে একখানা অভিনব ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট অতি বিশদ ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করাইয়াছেন। এ গ্রন্থখানাতে শ্যেন পক্ষীর (বাজপক্ষীর) প্রতিপালন, চিকিৎসা ও তদ্বারা মৃগয়া (পাখী শিকার) শিক্ষা প্রভৃতির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার কমায়ুনাধিপতি রাজা রুদ্রদেব। এই মহাত্মার আবির্ভাব কাল নির্ণয়ের জন্য শাস্ত্রী মহাশয় গ্রন্থের ভূমিকায় বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। কুতূহলী পাঠকবর্গ তাহা পাঠ করিলেই সবিশেষ বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে প্রাচীন ভারতে পক্ষীপালন ও তাহাদের চিকিৎসা বিষয়ও যে আলোচনা হইত তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে উক্ত ধর্ম্মাবলম্বী নরপতি বৃন্দ বিশেষতঃ দেবাণাং প্রিয়দর্শী ভারতের একচ্ছত্রী সম্রাট মহারাজাধিরাজ অশোক পশু চিকিৎসার নানাবিধ সুব্যবস্থা প্রচলন দ্বারা অহিংসা পরমধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন এবং ইতর জীবের প্রতি অসীম করুণার নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন, ইতিহাস পাঠক মাত্রেই একথা অবগত আছেন। জৈন ধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মারাও ইতর জীবের প্রতি অপরিসীম করুণা পরবশ হইয়া ভারতের নানা স্থানে পশু রক্ষা কল্পে "পিঞ্জরা পোল" স্থাপন করতঃ দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় বোম্বাই প্রদেশে প্রাচীন ভারতের পশুচিকিৎসালয়ের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এতাবতা সংক্ষেপে যে সমস্ত কথা

বলা হইল, তাহাতে বোধ হয় প্রতিপন্ন হইতেছে যে প্রাচীন ভারতে গৃহ পালিত পশু চিকিৎসার বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ঋষিগণ মনুষ্যায়ুর্ব্বেদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পশ্বায়ুর্ব্বেদ প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, মানবের হিতাহিত গৃহপালিত পশু পক্ষীর হিতাহিতের সহিত অবিমিশ্র-ভাবে জড়িত। এখন বোধ হয় একথা বলা অন্যায় হইবে না যে, প্রাচীন ভারতের অধিবাসীগণ লৌকিক সমস্ত বিষয়েই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া জগতের হিতকামনাতেই তাঁহাদের সমগ্র শক্তি ও বুদ্ধি নিয়োযিত করিয়া গিয়াছেন।

আমরা তাঁহাদেরই বংশসম্ভূত আর্য্যসন্তান; আমাদেরও কর্ত্তব্য তাঁহাদেরই পবিত্র পদাঙ্কানুসরণ করতঃ নিষ্কামভাবে নানা লোক হিতকর শাস্ত্রাদি আলোচনাদ্বারা জগতের হিতসাধন করা। অবশ্য বর্ত্তমানকালে ঋষিদের ন্যায় একেবারে নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ ভাবে শাস্ত্রালোচনা ততটা সম্ভবপর নহে; তথাপি তাঁহাদের মহান্ আদর্শ সর্ব্বদা আমাদের নয়নপথবর্ত্তী করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া সমীচীন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে পশ্বায়ুর্ব্বেদ সংক্রান্ত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থগুলির প্রচার ও সে গুলির বঙ্গানুবাদ সঙ্কলনের জন্য বিশেষ চেষ্টা কর্ত্তব্য। এতাদৃশ কার্য্যে দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই সহায়তা করা সর্ব্বথা সঙ্গত। আয়ুর্ব্বেদানুশীলনকারী পণ্ডিতবর্গ মধ্যে যদি কেহ কেহ গজায়ুর্ব্বেদ, অশ্বায়ুর্ব্বেদ, ও বৃষায়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি পশ্বায়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের অধ্যয়ণ অধ্যাপণা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন তবে বিশেষ উপকার হয়। এতাদৃশ কার্য্যদ্বারা যে তাঁহারা নিন্দার্হ ও একেবারেই উপেক্ষিত হইবেন এমন আশঙ্কার কোনও কারণ দেখা যায় না। অপিচ পশ্বায়ুর্ব্বেদ অনুশীলন দ্বারা যে অর্থাগমের সম্ভাবনা নাই, এ কথাও সাহস করিয়া বলা যায় না। জৈন সম্প্রদায়ের অনুকরণে বঙ্গদেশের নানা স্থানে "পিঞ্জরা পোল" স্থাপনের চেষ্টাও অকর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য এতাদৃশ কার্য্যে সমবেত চেষ্টা ও বহু অর্থব্যয় সাপেক্ষ্য হইলেও, বর্ত্তমান কালে নানা প্রকার দেশ হিতকর কার্য্যে অস্মদ্দেশীয় ব্যক্তিবর্গের যে প্রকার আগ্রহ ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে কতকটা আশার সঞ্চার হইয়াছে। আমাদের অনুরোধ এই যে শত প্রকার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান মধ্যে গৃহপালিত পশ্বাদির রক্ষা প্রতিপালন ও চিকিৎসাদির সুব্যবস্থা বিধানও যেন একটা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

গো জাতির উন্নতি ও রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন ও প্রয়াস সর্ব্বদা বিধেয়; কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে "গোষুলোকঃ প্রতিষ্ঠতঃ"। ইংরেজী ভাষায় গৃহপালিত গো, অশ্ব, ছাগ, মেষ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি জন্তুর চিকিৎসা ও প্রতিপালন বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ আছে। এতদ্‌ব্যতীত অন্যান্য নানাবিধ পশুপক্ষী প্রতিপালন সম্বন্ধেও বিস্তর গ্রন্থ আছে। বঙ্গ ভাষাতেও এতাদৃশ গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা ভাষার অঙ্গ পুষ্টি সাধন করা সর্ব্বথা বিধেয়। সুখের বিষয়, অধুনা কেহ কেহ গোপালন সম্বন্ধে ২।৪ খানা গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। সেগুলি বিষয় গৌরবে প্রচুর না হইলেও আদরণীয় এবং এবম্বিধ গ্রন্থপ্রচারের পথ প্রদর্শক।*

আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠে যদি কাহারও প্রাচীন সংস্কৃত পশ্বায়ুর্ব্বেদ আলোচনার এবং বঙ্গ ভাষায় সেগুলির অনুবাদের ও বঙ্গ ভাষায় পশুপক্ষী পালনের গ্রন্থ প্রচারের সদিচ্ছা উন্মেষিত হয়, তবে লেখনী ধারণের উদ্দেশ্য সফল হয় এবং তৎসহ পরিশ্রমেরও সার্থকতা হয়।

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহশর্ম্মণ।

(সুসঙ্গ)

---

* মদীয় পিতৃব্য রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ প্রণীত "গো-পালন" ও "অশ্ব-তত্ত্ব", শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "গো-জীবন" (৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ) "গোজাতির উন্নতি"। শ্রীগদাধর রায় প্রণীত "গো-চিকিৎসা", শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত "গো-পালন" এই কতিপয় গ্রন্থের নাম এতৎপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

তিব্বত অভিযান।

স্বামী দুর্গাভিমুখে।

গ্নাটং ত্যাগ করিবার পর আমরা ভীষণ জেলেপ গিরিপথে (pass) প্রবেশ করিলাম। ছেলে বেলায় ইহার নাম ভূগোলে মুখস্থ করিয়া ছিলাম বটে, কিন্তু আসল জিনিষটা যে কি. ভীষণ তাহার আভাষ পর্য্যন্ত মাষ্টার মহাশয় দিতে পারেন নাই। দুই দিকে অভ্রভেদি-পর্ব্বত-শাখা সমুদ্র প্রবাহের মত দূর দূরান্তরে চলিয়া গিয়া কোন এক অজ্ঞাত রাজ্যে যাইয়া শেষ হইয়াছে। মধ্যে সামান্য পথ—সম্পূর্ণ ভাবে বরফে আবৃত। সৌভাগ্যের কথা এই যে. আকাশে মেঘ ছিলনা এবং মর্ম্মভেদী ঠাণ্ডা হাওয়া এক রকম বন্ধ ছিল। তথাপি কষ্ট খুবই হইয়াছিল। এই সময়ে আমাদের সঙ্গে প্রায় ৭০০ লোক ও ২৩০টা অশ্বতরী ছিল। ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ভারতের গ্রীষ্ম প্রধান স্থানের অধিবাসী। এমন সর্ব্বনেশে শীত বা বরফ তাহারা কখনও অনুভবও করিতে পারে নাই। তাহারা বিশেষ কষ্টের সহিত ও অতি ধীরে ধীরে পদচালনা করিতেছিল। আমরা কয়েকজন ঘোড়ার উপর ছিলাম কিন্তু তাহাদের জন্য আমাদের সকলকে খুব ধীরে ধীরে যাইতে হইতেছিল। খচ্চরগুলা নেপালের কিন্তু তাহারাও বোধ হয়—কখনও এমন দুরন্ত শীত সহ্য করে নাই। অনেক গুলা এই গিরিপথে চিরতরে দেহ-রক্ষা করিল। আমরা কোনও মতেই তাহাদিগকে বাঁচাইতে পারিলাম না।

চুম্বি।

একটা কথা বলি নাই। এক দল লোক শিলিগুড়ি হইতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তারের লাইন বসাইয়া যাইতেছিল। দারজিলিংএর সহিত ইহার যোগ ছিল। ইহারা এই কর্ম্ম এত শীঘ্র শীঘ্র সমাধা করিতেছিল যে এপর্য্যন্ত ইহাদিগকে ছাড়াইয়া যাইতে পারি নাই। ইহারা বরাবর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল। যাহাহউক, আমরা অনেক কষ্টের পর এই গিরিপথের সর্ব্বোচ্চ স্থানে উপস্থিত হইলাম। কি বিষম হাড়ভাঙ্গা শীত! জামার একটা দোকানই প্রায় আমি আমার অঙ্গে জড়াইয়াছিলাম—পায়ে দুই জোড়া খাঁটিউলের ফুল মোজা, তাহার উপর মোটা একটা উলের ড্রয়ার্স, তাহার উপর খুব গরম ও মোটা কাপড়ের প্যাণ্ট। পা হইতে হাটু পর্য্যন্ত কাশ্মীরার পট্টি। গায়ে প্রথমে একটা শোয়ে-টার, তাহার পর আসল ফ্ল্যানেলের কামিজ, ইহার উপর ক্রমান্বয়ে আর একটা গরম কামিজ, ওয়েষ্টকোট, দুইটা গরম কোট সকলের উপর বিষম মোটা কাশ্মীরার, ওভারকোট এক-বারে পা পর্য্যন্ত। মস্তক এমন ভাবে আবৃত করিয়া ছিলাম যে, সুধু চক্ষু ও নাসিকার ছিদ্রপথ ছাড়া আর কিছুই খোলা ছিল না। কিন্তু ইহাতেও শীতের বিশেষ কিছু করিতে পারিলাম না। বুকের ভিতরটা যেন বরফ হইয়া গেল। শীতের প্রকোপে রীতিমত কাঁপিতে আরম্ভ করিলাম। সেন মহাশয়ের অবস্থা আরও শোচ-নীয়। তিনি ঘোড়ার উপর বসিয়া থাকিতে না পারিয়া

পদব্রজে গমন করিতেছিলেন। ছোট ডাক্তার সাহেব এই সময়ে আমাদের কাছে উপস্থিত ছিলেন; তিনি আমাদের অবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি পকেট হইতে একটা ছোট ব্রাণ্ডির বোতল বাহির করিয়া তাহার খানিকটা আমাদের পান করাইলেন। তখন কিযে আরাম পাইলাম, তাহা আর কি বলিব! যেন নবজীবন লাভ করিলাম।

এই গিরিপথ পার হইয়াই আমরা চুম্বি উপত্যকায় প্রবেশ করিলাম। আমরা যে এখন খাস তিব্বতের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি তাহা মনে করাইয়া দিবার জন্যই যেন ঠিক এই সময়ে চুম্বির তিব্বতীয় গভর্ণর ও কয়েকজন চীন কর্ম্মচারী আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন।

এই খানে দুই একটা আনুসঙ্গিক কথার উল্লেখ আবশ্যক। আমরা শিলিগুড়ি হইতে রওনা হইবার পূর্ব্বে কয়েকজন কর্ম্মচারী, কয়েক শত সিপাহী কতক পরিমাণ খাদ্যাদিসহ তিব্বত অভিমুখে রওনা হইয়াছিল। ইঁহারা সকলেই আমাদের কয়েক দিবস অগ্রে গ্নাটংএ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং আদেশ না থাকাতে আর অগ্রসর হয় নাই। আমরা গ্নাটংএ আসিয়াই চুম্বির গভর্ণরের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলাম. কিন্তু তিনি কোনও উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই। তখন সর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারীর আদেশ অনুসারে ৩০০ সিপাহী সঙ্গে লইয়া আমরা ভীষণ জেলেপ্‌গিরি পথ অতিক্রম করিয়া তিব্বতে প্রবেশ করি। অতএব এই অভিযানে আমরাই সর্ব্বপ্রথম তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছিলাম।

গভর্ণর ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ সকলেই পদ ব্রজে আসিয়াছিলাম। প্রত্যেকের মস্তকের উপর এক একটি সুবৃহৎ ও কারুকার্য্যময় রেশমের ছাতা। সকলের আগে চারি জন উন্মুক্ত অসিধারী শরীর রক্ষক। তাহার পর কয়েকজন কর্ম্মচারী ও তাঁহাদের পশ্চাতে গভর্ণর। তাঁহার পশ্চাতে ক্রমান্বয়ে কর্ম্মচারী ও শরীর রক্ষক। অভিবাদন প্রভৃতি (ইংরাজি প্রথায়) হইবার পর গভর্ণর মহাশয় আমাদের উপস্থিত প্রধান কর্ম্মচারী মহাশয়কে বিশেষ বিনয়ের সহিত ভারতে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। এই সমস্ত গোলোযোগ হইবে. ভাবিয়াই বোধ হয় এই অভিযানের সর্ব্বপ্রধান সামরিক কর্ম্মচারী

পাৰ্ব্বত্য পথে।

কর্ণেল্‌ ইয়ংহজ্‌ব্যাণ্ড সাহেব আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তিনিও বিশেষ নম্রতার সহিত গভর্ণরকে জানাইলেন যে, উপস্থিত অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব, কেন না, তাঁহার উপর আদেশ আছে যে, যে পর্য্যন্ত না তাঁহার সহিত প্রধান (দলাই) লামার সাক্ষাৎ হইতেছে, তিনি যেন ফিরিয়া না আসেন। যদি লাসা পর্য্যন্ত যাইতে হয়, তিনি প্রস্তুত আছেন। গভর্ণর সাহেব আরও দুই চারিটী শিষ্টালাপের পর সদল বলে প্রস্থান করিলেন।

আমরা সেদিন ঐ স্থানে (ল্যাংগ্রাম্‌) বিশ্রাম করিয়া পরদিবস রওনা হইলাম। এই সব স্থান এমন ভয়ানক যে গ্নাটং হইতে এ পর্য্যন্ত মানুষ ত দূরের কথা, কোনও প্রকার পশুপক্ষীও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। চারিদিক পর্ব্বতময়—তাহাতে বৃক্ষ বা লতা গুল্মের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। এমন নীরস

স্থান জীবনে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ঐ দিবস সন্ধ্যার পর আমরা ইয়াটং গ্রামে উপস্থিত হইলাম। তিব্বতীয়েরা ইহাকে নাতং বলে। আমরা এ গ্রামে জন মানব দেখিতে পাইলাম না। অনেকগুলি দগ্ধাবশিষ্ট বাড়ী ঘর দেখিলাম। বোধ হয় আমাদের শুভাগমনের সংবাদ পাইয়া গ্রামবাসীরা গ্রামে আগুণ লাগাইয়া দিয়া সরিয়া গিয়াছে। উদ্দেশ্য বোধ হয়—যাহাতে আমরা কোনও প্রকার সাহায্য না পাই। বাস্তবিক, আমরা যদি প্রয়োনীয় সমস্ত দ্রব্যাদি সঙ্গে না লইয়া যাইতাম, তাহা হইলে আমাদিগকে নিশ্চয়ই অনাহারে মরিতে হইত। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া আমরা ইয়াটুং দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। দুর্গটি ঠিক রাজ পথের মধ্যস্থলে নির্ম্মিত হইয়াছে।

যাতায়াতের পথ এইসব দুর্গম স্থলে 'একমেবদ্বিতীয়'। সুতরাং অগ্রসর হইতে হইলে, ইহার ভিতর দিয়া ভিন্ন অন্য পথ নাই। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দুর্গের দ্বার উন্মুক্তই ছিল। তিব্বতীয়েরা যদি এই দুর্গের উপর তোপ রাখিয়া আমাদিগকে সেদিন বাধা দিত, তাহা হইলে আমাদিগকে যে বিশেষ বিপদে পড়িতে হইত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

সেনাপতি ইয়ংহজ্‌ব্যাণ্ড সদলবলে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় কয়েকজন তিব্বতীয় সিপাহী আসিয়া তাঁহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে একজন অল্প বয়স্ক তিব্বতীয় কর্ম্মচারী আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শুনিলাম, ইনি এই দুর্গের প্রধান কর্ম্মচারী। তিনি বলিলেন যে, তিনি প্রধান লামার নিকট একজন দুত পাঠাইয়াছেন। যতদিন না তিনি ফিরিয়া আসেন, ততদিন আমাদিগকে ঐ স্থানে অপেক্ষা করিতে হইবে। তাঁহার সহিত কয়েকজন চীন কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, দলাই লামার সর্ব্বপ্রধান চীন কর্ম্মচারী অখন্ স্বয়ং ঐ স্থানে উপস্থিত হইবেন। তাহার পর যাহা হয় করা যাইবে। আমাদের সেনাপতি বলিলেন যে, তাঁহারা যে দলাই লামার লোক তাহার কোনও নিদর্শন নাই। এতএব তিনি সুধু তাঁহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারেন না।

দলবলসহ তিব্বতীয় কর্ম্মচারী।

তখন দুর্গস্বামী বলিলেন "আমার কর্ত্তব্য আমি করিলাম। এখন আপনাদের যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। এ সময় আপনাদের লোক বল অধিক, আমাকে অগত্যা নীরব থাকিতে হইবে। কিন্তু মনে রাখিবেন, আপনারা জোর করিয়া আমাদের স্বাধীন দেশে প্রবেশ করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত আমরা আপনাদের সহিত কোনও প্রকার অসদ্ব্যবহার করি নাই" তাঁহারা চলিয়া গেলেন। আমরা দুর্গের ভিতর দিয়াই অগ্রসর হইলাম।

পরদিবস আমরা রিনচেন্‌গং নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। চুম্বি উপত্যকার ইহাই প্রথম উল্লেখ যোগ্য স্থান। এইস্থানে বলিয়া রাখা ভাল, এই উপত্যকা সিকিম ও ভোট রাজ্যের ঠিক মধ্যস্থানে অবস্থিত। ভৌগলিক হিসাবে ইহা তিব্বতের বাহিরে। ইহার কোনও স্থানই ৯০০০—১০০০০ ফুটের অধিক উচ্চ নহে। ইহার অধি-

কাংশ স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য, সৌন্দর্য্য ও জল বায়ু কাশ্মীরের মত। এসময়ে এখানে শীত খুব প্রবল বটে, কিন্তু জেলেপ গিরি পথের সহিত তুলনায় এখানে এখন বসন্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বরফের ও বিশেষ অত্যাচার নাই।

এ প্রদেশে রিন্‌চেন্‌গং একটী গণ্ড গ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে অনেক বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাস আছে বোধ হইল। প্রায় ৩০।৩৫ খানা বেশ ভাল অট্টালিকা দেখিলাম। শুনিলাম,সমগ্র সিকিম রাজ্যে এমন কি দারজিলিংএ পর্য্যন্ত এমন সুন্দর বাড়ী নাই। গ্রামের অধিবাসীর সংখ্যা ২০০০ এরও অধিক হইবে। সুখের বিষয় এই যে, এখানকার কেহই আমাদের ভয়ে গ্রাম ত্যাগ করিয়া যায় নাই। খাদ্যদ্রব্য গ্রামে যথেষ্ট দেখিলাম। আমাদের সহিত খাদ্য দ্রব্য ছিল কিন্তু ভবিষ্যতের চিন্তায় আমরা কয়েক শত মণ চাউল, কয়েক মণ আলু ও আরও কিছু দ্রব্য খরিদ করিলাম। অধিবাসীরা কিন্তু আমাদের উপর বড় সন্তুষ্ট দেখিলাম না। আমাদের সহিত কোনও প্রকার অসদ্ব্যবহার করে নাই বটে, কিন্তু আমাদের নিকট হইতে সর্ব্বদা দূরে২ অবস্থান করিত। পথের মধ্যে কোনও ভদ্রলোকের সহিত দেখা হইলে, তিনি প্রায়ই মুখ ফিরাইয়া লইতেন।

এ দেশের অভিবাদনের প্রথা জিহ্বা বাহির করিয়া দেখান। ভদ্রলোকদের সহিত আলাপ করিবার জন্য সাহেবদের পরামর্শমত আমরা প্রায়ই কালী মূর্ত্তির অভিনয় করিতাম; কিন্তু তাহার প্রতিদান প্রায়ই পাইতাম না। আমাদের সহিত তাহারা বড় একটা আলাপ করিত না।

পর দিবস (১৪ই ডিসেম্বর) আমরা ঐ গ্রাম ত্যাগ করিলাম। ঐ দিন অপরাহ্নে আমরা চুম্বি গ্রামে উপস্থিত হইলাম। বলা বাহুল্য,সমস্ত উপত্যকা এই গ্রামের নামে পরিচিত। অধিবাসীরা কিন্তু এই উপত্যকা ও গ্রামকে 'টোমো' বা 'গোধূম' প্রদেশ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। শুনিলাম, সমগ্র তিব্বতের মধ্যে এইস্থানে গম খুব অধিক উৎপন্ন হয়, সেইজন্য ইহার এই নাম।
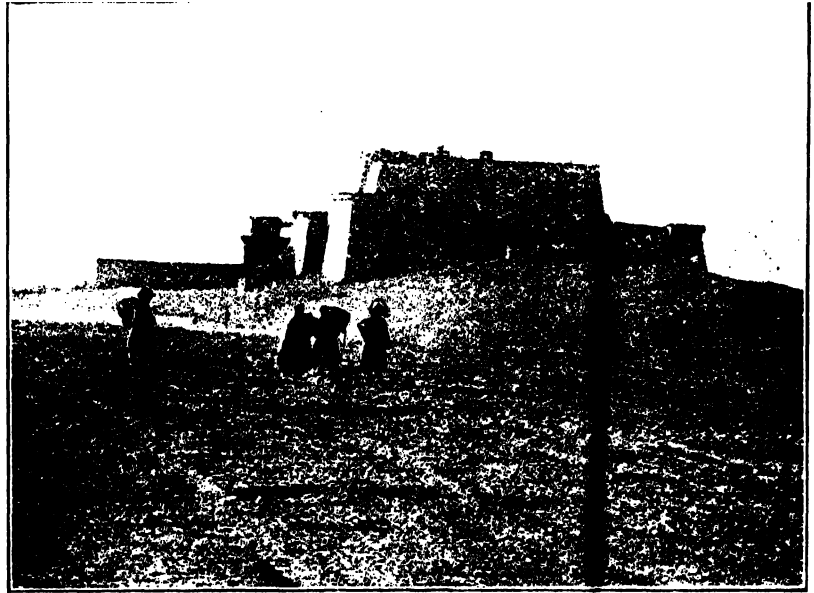
ফারী দুর্গ।

এতদিন পরে আমাদের পথের উভয় দিকে বৃহৎ ময়দান সকল দেখিতে পাইলাম। ইহাতে গম, ধান, যব, আলু প্রভৃতি নানা প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাষ হইতেছে। তিব্বতের প্রায় সমস্ত অভাব চুম্বি হইতে সরবরাহ হয়। কয়েক স্থানে গম ভাঙ্গিবার কলও দেখিলাম। কলগুলি জলের দ্বারা চালিত হয়। পথের ধারে২ অনেক প্রাচীন স্তূপ দেখিলাম। সেগুলি প্রাচীন লামাদের সমাধি স্থান। এই স্তূপ সকল নানা প্রকারের; কোনটা গম্বুজের মত, কোনটা আমাদের দেশের প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপের মত, কতকগুলি চতুষ্কোণ। সকলগুলিতেই কিন্তু একই কথা খোদিত দেখিলাম "ওঁ মণিপদ্মে হুং"। পরে জানিয়াছিলাম, সমগ্র তিব্বতের ইহাই মূলমন্ত্র। ইহার ইতিহাস ও অর্থাদি অন্য স্থানে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইবে।

ইহার পর আমরা বেশা গ্রামে পঁহুছিলাম। এখানে

যেন এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী চীনপ্রবাসী। ইহারা বাণিজ্য উপলক্ষে এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। অনেকে এদেশে বিবাহ করিয়া স্থায়ী হইয়াছে; অনেকে মধ্যে মধ্যে দেশেও গমন করে। বাড়ীগুলি চীন দেশের মত আগাগোড়া কাষ্ঠ নির্ম্মিত। অনেকেই জানেন, সমগ্র জগতের মধ্যে চীনাদের মত সূক্ষ্ম কাঠের কাজ আর কেহই করিতে পারেন না। তিব্বতের এই ক্ষুদ্র গ্রামেও ইহার যথেষ্ট নিদর্শন পাইলাম। বাহিরের দালান ও প্রাচীরের স্তম্ভগুলি এমন সুন্দর যে, দাঁড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। পথের দুইধারে সমস্তই দোকান। কয়েকজন ফিরিওয়ালা ভারের মধ্যে ভাত, মাংস, তরকারী প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছে। ৪৫ পয়সায় একজনের আহারের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য দেয়।

আমরা একটা চীনা দোকানে প্রবেশ করিলাম। রাস্তার উপর প্রথমেই একটী বিস্তৃত দালান। উহার দেয়ালের উপর চীনা ভাষায় নানা প্রকার জিনিষের নাম লিখিত রহিয়াছে। যাঁহারা ঐ ভাষার অক্ষরাদি কখনও দেখেন নাই, তাঁহারা লেখাগুলিকে নানাপ্রকারের ছবি বলিয়া মনে করিবেন। চীনারা বড় ফুল ভাল বাসে। ঐ দালানের চারিদিকে নানা জাতীয় ফুলের ছোট ছোট টব সকল তারের শিকার উপর অতি নিপুণভাবে সাজান রহিয়াছে। উহার কাছে কাছে নানা প্রকার পাখীর দাঁড় ও খাঁচা। এইরূপ ভাবে দোকানের সামনের দালানটি এমন সাজাইয়াছে, যে দোকান বলিয়া মনে হয় না। কলিকাতায় ও বোম্বাইএ বড় বড় ইংরাজ সওদাগরের দোকান দেখিয়াছি। কিন্তু এমন ভাবে সাজাইতে কেহ পারে নাই।

আমরা দালানে প্রবেশ করিয়া দেখি, দোকানদার মহাশয় একখানা আরাম কেদারায় আরামের সহিত বসিয়া আফিংএর ধুম-পান করিতেছেন। ঐ কেদারারঠিক সম্মুখে একখানি ক্ষুদ্র গোল টেবিলের উপর চার পাত্র। চণ্ডু খাইতে খাইতে কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে, আর চার বাটিতে চুমুক দিতেছেন। চণ্ডু আর চা এই দুইটী ভিন্ন চীনারা নাকি এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না।

আমাদের ইচ্ছা ছিল, দোকানদার মহাশয়ের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া সমস্ত ভাল করিয়া দেখিব। কিন্তু তাহা হইল না। তিনি একজন অপরিচিতকে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে দিলেন না। আমাদের মত ইহারাও পর্দা রাখিয়া থাকেন। ভদ্রলোকের বাড়ীর মেয়েরা অন্দর ছাড়িয়া অন্য কোথাও যায় না।

এই গ্রাম ত্যাগ করিবার পর আমরা একটী নাতিউচ্চ পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিলাম। ইহার একস্থানে সিকিম রাজের গ্রীষ্মাবাস অবস্থিত। সিকিমরাজ চুম্বী উপত্যকার কিয়দংশ খরিদ করিয়া এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। এখন কিন্তু ইহার মধ্যে কেহই থাকেন না। শুনিলাম, সিকিম রাজ এই খানে আসিয়া তিব্বতীয়দিগের সহিত ভারত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করিতেন, ইহা প্রকাশ হওয়ায় এখন আর এখানে আসিতে চান না। এই জন প্রবাদ যে কতদূর সত্য, তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না।

এইবার আমরা একটা অস্থায়ী দুর্গ নির্ম্মাণের উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম: অনেক অনুসন্ধানের পর খাংতু উপত্যকার একটী স্থান মনোনীত করা হইল। স্থানটীকে আমরা নূতন চুম্বি নামে অভিহিত করিলাম। স্থানটী একটী ক্ষুদ্র শৈলের উপর। পর্ব্বতের ঠিক নীচে য়ুসক গ্রাম। ইহার পশ্চিমে টংকর গিরিপথ। স্থানটার একটা বিশেষ দোষ এই যে, ইহার পূর্ব্বদিকে একটা উচ্চ পার্ব্বত থাকাতে সূর্য্যালোক বড় একটা পাওয়া যাইত না।

আমরা এইস্থানে দুর্গাদি নির্ম্মাণের আয়োজন করিতেছি, এমন সময় অভিযানের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী জেনারেল ম্যাকডোনাল্ড। General Macdonald আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাদের নূতন চুম্বির উপর বিশেষ সদয় ভাব প্রকাশ করিলেন না। তিনি বলিলেন যে, এখান হইতে ২৮ মাইল দূরবর্ত্তী ফারী দুর্গ আমাদের পক্ষে অতি উপযুক্ত স্থান। উহা চুম্বি ও নিজ তিব্বতের প্রায় মধ্যস্থানে অবস্থিত। চুম্বি হইতে যাইতে হইলে উহা অতিক্রম করিতেই হইবে; বিশেষ উহা যথেষ্ট সুরক্ষিত ভাবে নির্ম্মিত। এমন দুর্গ থাকিতে বৃথা কতক গুলা অর্থব্যয়ের কোন প্রয়োজন নাই। ইয়ংহজ-

ব্যেণ্ড্ সাহেব বলিলেন যে, উহা এখন ও পর্য্যন্ত তিব্বতীয় দিগের হাতে এবং উহার মধ্যে বহুসংখ্যক তিব্বতীয় সৈন্য অবস্থিতি করিতেছে। এমন অবস্থায় উহা অধিকার করিতে আমাদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে। জেনারেল সাহেব কিন্তু দমিলেন না। তিনি সেই দিনই আদেশ দিলেন যে, পরদিবস প্রাতঃকালে যেন ৬ দিনের খাদ্যসহ ৮০০ সৈন্য ও ৪টি তোপ ফারী অভিমুখে রওনা হয়। আমার সাহেব ঐ সৈন্য দলের নায়ক নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে আমিও তাঁহার সহিত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

পর দিবস যে আমরা ফারী দুর্গ আক্রমণ করিতে যাইব, তাহা সকলেই অবিলম্বে জানিতে পারিলেন। তিব্বতের নাম যে কি প্রকার ভীতিপ্রদ তাহা আমরা এতদিন বুঝিতে পারি নাই। আজ তাহা স্পষ্ট জানিতে পারিলাম। পর দিবস প্রাতঃকালে আমরা উঠিয়া দেখি যে, আমাদের সঙ্গেকার সিকিমি লেপচা ও তিব্বতীয় কুলিরা প্রায় সকলই অদৃশ্য হইয়াছে। তাহারা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছিল যে, তিব্বত সাক্ষাৎ সমনপুরী। ঐ স্থানে গমন করিলে কাহাকেও আর ফিরিয়া আসিতে হইবে না।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

কবে।

বসন্ত আসার আগে প্রমত্ত পবন
ছুটে আসে ঊর্দ্ধ-শ্বাসে বন্যার মতন
উদ্বেলিয়া দশদিশ, বিশীর্ণ মলিন
বিশুষ্ক পত্রেরে করি বন্ধন-বিহীন
উড়াইয়ে নিয়ে যায় ব্যাকুল-উচ্ছ্বাসে
দূর হতে দূরান্তরে!—'ঋতুরাজ আসে
কে রহিবে ম্লান দীন, আনন্দে শোভায়
সাজি অভিনব বেশে বরি লহ তায়
ওরে মুগ্ধ বসুন্ধরা!'—সে যেন ইঙ্গিতে
সবারে ডাকিয়ে কহে! হায়রে চকিতে
আগমন-বার্ত্তা তব ঘোষি হে রাজন্,
কখন আসিবে হেন মদির-প্লাবন
জীর্ণ দীর্ণ প্রাণে মোর, রচিতে কেবল
সকল কালিমা-মুক্ত অর্ঘ্য নিরমল!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

মঙ্গলের কথা।

পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে প্রকৃতির বৃহৎ পুস্তকে যে সত্য লিখিত আছে, আমাদের দেশে তাহা কেহ বড় পড়িতে চাহে না। চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া পুস্তকাকারে যখন কোন বিষয় প্রকাশিত হইবে এবং সে পুস্তক যখন পাঠ্য-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে, তখনই আমাদের তাহা জানিবার প্রবৃত্তি হইবে, তার পূর্ব্বে নয়। আকাশের গ্রহ তারার জ্ঞানলাভ করিতে হইলে নানারূপ যন্ত্রের সাহায্য প্রয়োজন; তাহা বহুব্যয় সাপেক্ষ।—সুতরাং এবিষয়ে যে আমরা কেবলমাত্র কথার প্রমাণের উপর নির্ভর করিব তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

গত জুলাই মাসের Windsor Magazine নামক পত্রিকায় H. C. O'Neill মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা লিখিয়াছেন; তাহা আশ্রয় করিয়া আমরা মঙ্গলের কথা ভাবিবার অবসর পাইয়াছি। অনেকেই জানেন যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর এত নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল যে, তখন তাহার সহিত কথাবার্ত্তা চালাইবার বন্দোবস্তের জন্য আমেরিকাতে মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। পর্ব্বতাকার আয়না তৈয়ার করিয়া তাহা দ্বারা সঙ্কেত প্রেরণ করা হইবে; একজন বিজ্ঞানবিৎ বেলুনে চড়িয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়া মঙ্গলের জবাব গ্রহণ করিয়া তাহা পৃথিবীতে প্রেরণ করিবেন ইত্যাদি অনেক প্রস্তাবই তখন হইয়াছিল। এত যে সব কাণ্ড হইয়াছিল, তাহার কারণ,অনেক জ্যোতির্ব্বিদেরই মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, মঙ্গলগ্রহে মানুষ অথবা মানুষেরই মত বুদ্ধিমান্ কোন জীব আছে। এই 'বুদ্ধিমান প্রাণী'কে কেহ কখনও চক্ষে দেখিতে পান নাই। দূরবীক্ষণের সাহায্যে পণ্ডিতেরা মঙ্গল গ্রহের মধ্যে কতকগুলি রেখা মাত্র দেখিতে পান—এবং মনে করেন, এই সমস্ত কৃত্রিম খাল। কৃত্রিম খাল মানুষের মত বুদ্ধি না থাকিলে কেহ খনন করিতে পারে না; সুতরাং ঐখানে মানব-জাতীয় কোন প্রাণী আছে। কিন্তু খাল থাকিলেই যে মানুষ থাকিবে, আর না থাকিলেই মানুষ থাকিবে না, তা নয়। কৃত্রিম খালের অস্তিত্ব ছাড়া মঙ্গল গ্রহে যে

জীবিত প্রাণী আছে, তাহার অন্য কোন প্রমাণ নাই। তবে সেখানকার বায়ুমণ্ডলের অবস্থা হইতে এইমাত্র প্রমাণিত হয় যে তাহাতে জীবিত প্রাণী থাকিতে পারে। বাস্তবিকই আছে কি না, তাহা বলা যায় না।

টেলিস্কোপে গৃহীত মঙ্গলের দৃশ্য।
(১০ ফেব্রুয়ারী ১৯০১)

দূরবীক্ষণের সাহায্যে যে রেখা-জাল মঙ্গলগ্রহে দেখা যায়, সে গুলি যে পয়ঃপ্রণালী এবং কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালী তাহা মনে করিবার কতকগুলি যুক্তি আছে। প্রথমতঃ, এ গুলি কৃত্রিম :—কারণ, অধ্যাপক Lowell বলেন, প্রথমে মাত্র ১১৩টী এইরূপ রেখা দেখা গিয়াছিল, তার পর, তিনি ঐ ১১৩টী ছাড়া আরও ৩২৩টী রেখা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাদের সকল গুলিরই একটী বিশেষত্ব এই যে প্রত্যেকটীই অত্যন্ত সরল। ইহাদের অনেকগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ ; একটী প্রায় ৩৪৫০ মাইল লম্বা। প্রত্যেকেরই এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিসর প্রায় সর্ব্বত্রই সমান। এমন কোন স্থান নাই, যেখান হইতে ৩০০ মাইলের ভিতরে ঐরূপ একটী রেখা না আছে। এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয় যে, এই রেখাগুলি কৃত্রিম। প্রকৃতি কখনও এমন সুন্দর এবং সুশৃঙ্খলভাবে খাল কাটিতে পারে না।

কিন্তু কৃত্রিম জিনিস মাত্রেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে। "প্রযোজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে।" কোন বুদ্ধিমান্ জীব যদি এগুলি খনন করিয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই এদের একটা সার্থকতা আছে। এই সার্থকতাটা কি ?

এগুলি পয়ঃপ্রণালী এবং জলকষ্ট নিবারণের জন্যই খনন করা হইয়াছে। বাঙ্গালার গ্রামের চেয়েও মঙ্গলে জলকষ্ট বেশী। মঙ্গলগ্রহের জল নাকি প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে—যাহা, আছে তাহাও অনেক স্থান হইতে দুরধিগম্য। এই খাল গুলি দ্বারা নাকি এই জলকষ্ট নিবারণের চেষ্টা হইতেছে।

খাল গুলি মেরুপ্রদেশ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে ; এবং শীতকালে, যখন মেরুদেশে প্রচুর বরফ জমে, তখন এই গুলিকে স্ফীত দেখায় ; আর,গ্রীষ্মে বরফ গলিয়া গেলে ইহারাও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। যখন ঐ খালগুলি দিয়া প্রচুর জল বহিতে থাকে, তখন চতুর্দ্দিকের ভূমিতে উদ্ভিদের শ্যামল ছায়া ফুটিয়া উঠে ; কিন্তু সে—বছরের অতি অল্প সময়েরই জন্য। এই সমস্ত হইতে মনে করা হয় যে,এই রেখাগুলি পয়ঃপ্রণালী ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি বাস্তবিকই মেরুদেশ হইতে জল এই সমস্ত খাল দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মানুসারে তাহা বিষুবরেখার দিকেই অগ্রসর হইবে ; প্রকৃত প্রস্তাবেও তাহাই হয়। সুতরাং, অধ্যাপক Lowell এর মতে এগুলি যে পয়ঃপ্রণালী তাহাতে সন্দেহ করিবার আর কোন কারণই রহিল না। পরন্তু, যারা এ সমস্ত খনন করিয়াছে, তারা যে খুবই বুদ্ধিমান্ জীব তাহাও প্রমাণিত হইল। কিন্তু এত বুদ্ধি সত্ত্বেও ইহারা যে বেশী দিন টিকিতে পারিবে, এরূপ ভরসা হয় না। কারণ, মেরুদেশের সঞ্চিত বরফ এবং তাহার ফলে এই খালগুলির জল এত তাড়াতাড়ি ফুরাইয়া যায় যে, তাহাতে মনে হয়—উক্ত গ্রহে জলের পরিমাণ বড়ই কমিয়া গিয়াছে। এই জল কষ্টকে নিবারণ করিবে ? এবং কেই বা এদের প্রাণরক্ষা করিবে ?

এই রেখাগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও, কোন ২ পণ্ডিত এগুলি খাল নয়, এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বলেন, এগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সীমা মাত্র।

আবার কেহ বলেন, এগুলি বাস্তবিক রেখাই নয়, কতকগুলি পৃথক্ পৃথক বিন্দু-সমষ্টি মাত্র; অনেক দূর হইতে দেখা যায় বলিয়া এই বিন্দুগুলির মধ্যে ব্যবধানটুকু আর দেখা যায় না। আবার কেহ বলেন, এগুলি এমন কতকগুলি জটিলতার সমষ্টি যে, সেগুলিকে আর কখনও পৃথক্‌ভাবে দেখিবার আশা নাই।

কতকগুলি ব্যবহিত বিন্দুকে দূর হইতে দেখিলে যে একটী রেখার মত দেখাইবে তাহা ঠিক; এবং এই যুক্তির বলে অনেকেই মঙ্গলগ্রহে দৃশ্যমান রেখাগুলির এরূপ ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা হইলেও সমস্যার মীমাংসা হইল না। এই রেখাকার বিন্দু-সমষ্টির সংখ্যা প্রথমে যা দেখা গিয়াছিল তারচেয়ে এখন অনেক বাড়িয়াছে, এবং আরও বাড়িতে পারে। ইহার ব্যাখ্যা কি? আর এই বিন্দুগুলিই বা কি?

মীমাংসা হইয়া পুস্তকে সন্নিবিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত, আমাদের কিছু বলিবার নাই।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

দশচক্র।

১

ওকালতি আরম্ভ করার ৩।৪ বৎসরের মধ্যেই একরকম পশার হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহার সহিত অলক্ষ্যে যে দারুণ ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগও বাড়িয়া উঠিতেছিল, তাহা কে জানিত!

অবশেষে শরীর যেন একান্ত অপারগ হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল, তখন ডাক্তার বলিলেন—আর নয়, এইবার একবার পশ্চিম বেড়াইয়া আসুন!

আমার পশ্চিমের সীমা বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত। আমার এক ভগিনীর বিবাহ সেখানে হইয়াছিল, তাই এইটুকু জানা আছে! সুতরাং ডাক্তার যখন বলিলেন পশ্চিম বেড়াইয়া আসুন, তখন আমার চোখের সম্মুখে এক সীমাহীন, নির্দ্দেশহীন, রাজ্য জাগিয়া উঠিল!

কিন্তু তখনই মনে হইল, আমার এক বন্ধু এলাহাবাদে ওকালতি করে। সে আমাকে ক্রমাগতই তাহার নিকট যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছিল,—সেখানে গেলেও ত হয়। ডাক্তারও বলিলেন, তা' মন্দ হয় না, আপনার এখন প্রয়োজন, পরিবর্ত্তন ও প্রীতিকর কার্য্যে মনোনিবেশ! দেখিবেন, সেখানে গিয়া যেন ওকালতি আরম্ভ করিবেন না—বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন।

সে হাসির অর্থ উকীল মাত্রেই বুঝিবেন। আমি বলিলাম—না, সে ভয় নাই। তবে প্রীতিকর কার্য্যের অর্থ কি!

ডাক্তার বলিলেন—অর্থাৎ যে কাজ করিতে ভাল লাগিবে, যাহাতে মানসিক চর্চ্চা বেশী না হয়, মোটের উপর হাল্কা কাজ! এই যেমন বেড়ান, গল্পগুজব করা ইত্যাদি।

সুতরাং তাহার ২।১ দিনের মধ্যেই এলাহাবাদ যাত্রা করিলাম।

২

অতুল ষ্টেশনে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, আমাকে দেখিয়া মহাখুসী হইল।

সে কহিল—তুমি একা যে?

আমি কহিলাম—একা মানে?

সে কহিল—তোমার স্ত্রী,—স্ত্রী কোথায়? তোমার অসুখে পরিচর্য্যা করিবে কে?

আমি কহিলাম—আমার পরিচর্য্যা কে করিবে, সে কথা আমার বন্ধু-পত্নীকে জিজ্ঞাসা করগে, উত্তর পাইবে। আর আমার স্ত্রীর কথা এইটুকু বলিতে পারি যে, এই অল্পদিনের মধ্যে তাড়াতাড়িতে কাহাকেও ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই।

অতুল আমার মুখের দিকে বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া কহিল—সত্যই বিবাহ কর নাই?

আমি কহিলাম—সত্যই! তুমি আমার যে কথাটাকে বরাবর মিথ্যা ভাবিয়াছিলে, সেটা বরাবর সত্যই ছিল!

অতুল কহিল—আশ্চর্য্য! তবে আর তোমার ডিস্‌পেপ্‌সিয়া না হইবে কেন? পৃথিবীতে সমস্ত উপভোগের জিনিসই যাহারা একলা খায়, অপরের সহিত ভাগ করিয়া

লইবার মত যাহাদের পরার্থপরতা নাই, তাহাদের অগ্নিমান্দ্য না হওয়াই যে আশ্চর্য্য !

আমি কহিলাম—ব্রাভো !

অতুল কহিল—সত্যই, আমার থিওরি এই যে, অন্ততঃ ডিসপেপসিয়াটা সারাইবার জন্য ও লোকের বিবাহ করা উচিত !

অতুলের বাড়ীতে পৌঁছিয়া দেখিলাম, আমার সুবিধার সে সর্ব্বপ্রকার বন্দোবস্তই করিয়া রাখিয়াছে। এমন কি, আমি সস্ত্রীক আসিতেছি মনে করিয়া বাড়ীর ভিতরকার একটা ঘর ও আমার জন্য সাজাইয়া রাখিয়াছিল।

আমি যে সস্ত্রীক আসি নাই, এমন কি আমার সস্ত্রীক আসিবার সম্ভাবনাই নাই, এ সংবাদটা বাড়ীর ভিতর একটা অশান্তি জাগাইয়া তুলিল, বেশ বুঝিতে পারিলাম। গৃহ কর্ত্রী যখন একটি আসন্ন বন্ধু লাভের আশায় উৎসুক হইয়া জানালার পার্শ্বে গাড়ী হইতে অবতরণশীলা বন্ধুটির প্রথম দর্শন লাভের আশায় অপেক্ষা করিতেছিলেন. সেই সময়ে এই সংবাদটায় নিশ্চয়ই তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইয়াছিল! একটা অসহিষ্ণু চুড়ির আওয়াজ, ক্ষিপ্র চাবির ঝনঝনা. এ সত্য টাকে আমার নিকট প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিল। খানিক পরেই অতুল হাসিতে হাসিতে আসিয়া কহিল—তুমি স্ত্রী আনো নাই এই অপরাধে, আমার স্ত্রীটিকেও যে আমি হারাইতে বসিলাম! তাঁহার অভিমান ও ক্রোধের সীমা নাই, গৃহ কার্য্য অচল হইবার উপক্রম !

৩

সেবা কাহাকে বলে এতদিনে ভাল করিয়া বুঝিলাম ! অতুলের স্ত্রী আমার জন্য যাহা করিয়াছিলেন, আমি নিজের স্ত্রীর নিকটও তাহা আশা করিতে পারিতাম না। ডাক্তারের অদ্ভুত বিধান ও অদ্ভুততর পথ্যের ব্যবস্থা মূহূর্ত্তের মধ্যে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইত, সিকি-গরম ও তিন-পোয়া ঠাণ্ডা স্নানের জল হইতে আরম্ভ করিয়া সিকি ভরি আন্দাজ জোয়ান ও দেড়খানি লবঙ্গ দেওয়া পানটি পর্য্যন্ত—ইন্দ্রজালের মত যথাসময়ে ও যথা-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইত !

রীতিমত ঔষধ সেবন ও তদপেক্ষা বেশী শ্রান্তিহীন সেবায়, পনর দিনের মধ্যেই শরীর টা অনেক ভাল বোধ হইল।

সেদিন বিকালে অতুলের বাড়ীর সম্মুখে দুইটা চেয়ার লইয়া আমরা বসিয়াছিলাম। আমি কহিলাম—তোমার স্ত্রীর জন্যই আমি নূতন করিয়া জীবন পাইলাম !

অতুল কহিল—তোমার জীবন পাওয়ার সম্বন্ধে তার যতখানি উৎসুক্য, তার চেয়ে বেশী উৎসুক্য তোমার একটি জীবনার্দ্ধ জুটিয়ে দেওয়ায় ! সেইটি দিতে পারিলেই সে নিশ্চিন্ত হয় !

আমি কহিলাম—কেমন করে ?

অতুল কহিল—তার সাধ্য আর কতটুকু! কিন্তু আজকাল will-powerএর কথা শোনা যায়। প্রবল ইচ্ছার যদি কোন ক্ষমতা থাকে, তা বোধ হয় তোমাকে একলাটী না ফিরে যেতেও হ'তে পারে !

আমি কহিলাম—তাঁকে বহু ধন্যবাদ। কিন্তু স্ত্রী জিনিষটাকে চিরদিনই আমি একটা অপ্রয়োজনীয় ভার বলিয়া মনে করি—সে মতের যতদিন না পরিবর্ত্তন হয়, ততদিন আমি একা!

অতুল খুব জোরে হাসিয়া উঠিয়া কহিল—তুমি এখনও আগাগোড়া ছেলে মানুষ! মত—মত মানুষের জীবনের কতটুকু? যে মতটাকে তুমি মস্ত বড় সত্য বলে আজ পোষণ করচ্ছ—সময় যখন আসবে, তখন সেটা ঝড়ের মুখে তুলোর মত একমুহূর্ত্তে উড়ে চলে যাবে! তাকে পরিবর্ত্তন করিবার দেরী তোমার সইবে না! —সেই অবসরের অপেক্ষা মাত্র !

আমি কহিলাম—অলীক কথাগুলোকেও তুমি এমন করে গুছিয়ে বলতে পারো যে তা' সত্যের মত শোনায় !

অতুল একটু হাসিল মাত্র। কিছু ক্ষণ পরে অতুল কহিল—হাঁ, হাঁ, তোমার সঙ্গে প্রাণকৃষ্ণ বাবুর আলাপ করিয়ে দিইগে চলো--প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়,—এই আমা-দের বাড়ীর পাশেই তাঁর বাড়ী :—তিনি এখানকার স্কুলের হেডমাষ্টার, ভারি সজ্জন ! এ কয়দিন এখানে ছিলেন না, আজ এসেছেন। আলাপ করে সুখী হবে। কি বল ?

আমি কহিলাম, বেশত' ভাল কথা। চলো।

৪

প্রাণকৃষ্ণ বাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি—অতি অমায়িক সজ্জন। আমার সহিত আলাপ হওয়াতে পরম প্রীত হইলেন।

বাড়ীর দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—"উষা পান নিয়ে আয়।"

প্রাণকৃষ্ণ বাবুর নিজের কতকগুলি বিশেষ মতামত ছিল। তাহার মধ্যে একটি এই যে আজকালকার পড়াশুনার পন্থা একেবারে ভ্রান্ত। আমার দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন—যত লোক পড়াশুনা করে, তাহার মধ্যে এক সহস্রাংশের-কেন,—তাহা অপেক্ষাও কম লোক প্রকৃত মানুষ হইতে পারে—তাহার অর্থ কি? অর্থ আর কিছুই নয়, মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের পন্থা নির্দ্দেশ করা হয় না। লেখাপড়ার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য মানুষ হওয়া, কিন্তু লেখাপড়ার সময় সে উদ্দেশ্য কটা লোকের মনে করিবার সুযোগ হয়? —সে আয়োজনই আমাদের নাই।"

আমি কহিলাম—তা ঠিক!

এমন সময় পান লইয়া উষা উপস্থিত হইল।

আমার চোখ উষার মুখের উপর নিবদ্ধ হইল। একি অপরূপ মূর্ত্তি! এত সুন্দর! আমি এত রূপ কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না! আমার অপরাধ, কি চোখের অপরাধ—জানি না, কিন্তু আমার দৃষ্টি তাহার মুখ হইতে ফিরাইতে পারিলাম না। উষাও আমার পানে চাহিয়া লজ্জায় লাল হইয়া গেল—ধীরে ধীরে পানের বাটি রাখিয়া চলিয়া গেল।

প্রাণকৃষ্ণ বাবু তখন প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের উপায় নির্দ্দেশ করিতেছিলেন। আমার মাথার মধ্যে উষার রূপের রেখা লাগিয়াছিল,—প্রাণকৃষ্ণ বাবুর কথা শুনিবার অবসর ছিল না। আমার মনে হইতেছিল—এত রূপ!

প্রাণকৃষ্ণ বাবুর বলার উদ্দেশ্য বোধহয় এইরূপ ছিল যে আজকালকার বই উঠাইয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে বাস্তব দৃষ্টান্তের দ্বারা শিক্ষা-দানই প্রকৃষ্ট উপায়। যেখানটায় তিনি অত্যন্ত ঝোঁকের সহিত বলিতেছিলেন, সেখানটাতেই বোধহয় আমি সবচেয়ে অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাই তিনি হঠাৎ থামিয়া বলিলেন—আচ্ছা নরেশ বাবু, এ সম্বন্ধে কাল আমাদের বিশেষ করে চর্চ্চা হবে,—এ সম্বন্ধে আমার নিজের অভিজ্ঞতা ও আপনাকে বলব।

আমি ও তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া সেদিনকার মত উঠিয়া পড়িলাম।

বাহিরে আসিয়া অতুল কহিল—কেমন দেখলে?

আমি কহিলাম—কি?

অতুল হাসিয়া কহিল—তা তুমি জান।

আমি ঢাকিবার চেষ্টা না করিয়া বলিলাম—সত্যই সুন্দর! এরূপ অল্পই দেখেছি।

অতুল কহিল—এ প্রাণকৃষ্ণ বাবুর মেয়ে। এই মেয়ের বিয়ে হয়নি—কেননা প্রাণকৃষ্ণ বাবু দরিদ্র! আশ্চর্য্যের কথা নয়!

আমি কহিলাম—আশ্চর্য্য!

অতুল কহিল—সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। এই মেয়েকে বিবাহ ক'রে তুমি নিয়ে যাও!

আমি হাসিলাম বিবাহ যদি করতে হয় ত ইহার মত সুযোগ কম। কিন্তু বিবাহ যে করবে না—তার পক্ষে এ একটা—এমন কিছু বিশেষ সুযোগ নয়।

উষার বয়স চৌদ্দ হইবে,—মুখ দেখিলে মনে হয় সর্গের সরলতা ও সৌন্দর্য্য একত্র মিলিত হইয়াছে।

আপনাদের নিকট এখন স্বীকার করিতে আমার লজ্জা নাই—যে উষা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। অন্ধকারের মধ্যেই আলো বেশী করিয়া জ্বলিয়া উঠিবার সুযোগ পায়, তাই বুঝি আমার কঠিন মনের মধ্যে উষার রূপ এতটা মোহ বিস্তার করিয়াছিল।

রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যে—সমস্ত স্কুল হইতে বই উঠিয়া গিয়াছে এবং প্রাণকৃষ্ণ বাবুর এই নূতন স্কুলের মাত্র—আমি ছাত্র এবং উষা ছাত্রী!

৫

প্রাণকৃষ্ণ বাবুর এই নূতন ধরণের স্কুল সম্বন্ধে অধিক জানিবার জন্য যে আমার বিশেষ কোন ঔৎসুক্য হইয়াছিল, তাহা নহে—তবু নিয়মমত সময়ে আমি প্রত্যহ তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার ভাবিষ্যৎ পাঠশালা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত শুনিতে যাইতাম। বেশী দিনই আমি একলা যাইতাম,

কারণ অতুল কাচারী হইতে ফিরিতনা। তখনকোনও দিন যদি ঊষা চকিতে পান অথবা জল লইয়া উপস্থিত হইত, তাহা হইলে মনে হইত প্রাণকৃষ্ণ বাবুর বক্তৃতা শুনা সার্থক হইয়াছে।

এমনি করিয়া—জীবনটা বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ হইতেছিল—দিনগুলা ক্ষিপ্রগতিতে যাইতেছিল। শরীর ও অনেকটা ভাল বোধ হইয়াছিল.—এমন কি ফিরিবার কথাও মনে হইতেছিল,—কিন্তু অতুলের আগ্রহাতিশয্যে আর ২। ৪ দিন থাকিতে হইল।

বেলা তিনটা আন্দাজ,—ইজি চেয়ারটায় সমস্ত দেহ ছড়াইয়া দিয়া মনটাকে কল্পনা রাজ্যে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। বাহিরে কালোমেঘ সমস্ত আকাশ আঁধার করিয়া দিয়াছিল—আর্দ্র বাতাস আমার মাথার দিকের জানালা হইতে আসিয়া দেহ শীতল করিয়া দিতেছিল।

আমার সমস্ত মনটায় যেন কিসের একটা নেশা লাগিয়াছিল—একটা রঙ্গীন নেসা! বাদী, প্রতিবাদী, আরজি, জবাব, নিলাম ইস্তাহারের রাজ্য হইতে আসিয়া একি অভিনব রাজ্য। ডাক্তার বলিয়াছিলেন, হাল্কা কাজে মনোনিবেশ করিতে! জীবনটা যেন এই দিনকতকের জন্য কোন এক অভিনব রাজ্যের মধ্য দিয়া হাওয়ার মত উড়িয়া চলিতেছে।

ভাবিতেছিলাম—ঊষা! কি সুন্দর, কি স্নিগ্ধ! ঊষাকে আশ্রয় করিয়া মনের ভিতর কি বাসনা সেই অন্ধকার আর্দ্রদিনে জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল, তাহা আলোকে প্রকাশ না করাই ভাল।

এমন সময় পিয়ন একটা চিঠি দিয়া গেল। অপরিচিত হস্তাক্ষর—সুন্দর কিন্তু অপরিপক্ক।

চিঠি খানা খুলিয়া পড়িয়া স্তব্ধ হইয়া গেলাম। ঊষা লিখিয়াছিল। চিঠিখানা এইরূপ:—

পূজনীয়—

আগে আমিই লিখিতেছি—ক্ষমা করিও। লজ্জা করিতেছিল—কিন্তু শুনিলাম তুমি নাকি চলিয়া যাইবে—তাই লিখিতেছি।

এত শীঘ্র যাইবে? তবে দুদিনের জন্য আসিয়াছিলে কেন? চিঠির উত্তর দিও। আমাদের বাইরের টেবিলের পশ্চিমকোণে টেবিলক্লথের নীচে রেখে দিও। আমি তাহ'লে পাব। দয়া ক'রো।

তোমার ঊষা।"

চিঠিখানা পড়িয়া মাথার ভিতর ঝিম ঝিম্ করিতে লাগিল। একি সত্য? চিঠিখানা উল্টাইয়া, ভাল করিয়া দেখিলাম,স্ত্রীলোকের লেখাই বটে। তাহার উপর চিঠির উত্তর যে জায়গায় রাখিবার কথা লিখিয়াছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহই থাকেনা!

চিঠির প্রত্যেক কথাগুলো যেন আমার চোখের সম্মুখে জীবিত হইয়া উঠিল। ঊষা আমাকেই চায়! "তোমার ঊষা"র অর্থ অতি সুস্পষ্ট! "এত শীঘ্র যাইবে—তবে দুদিনের জন্য আসিয়াছিলে কেন?" আসিয়াছিলাম যখন তখন কে জানিত আমার এত সৌভাগ্য সঞ্চিত ছিল! ঊষার মত লক্ষ্মী, সে স্বেচ্ছায় লিখিয়াছে "তোমার!"

আমি তখনই একটা উত্তর লিখিলাম—

"কল্যাণীয়াসু,

তুমি "তোমার ঊষা" লিখিয়া আমাকে যে সৌভাগ্যের অধিকারী করিয়াছ, তাহা আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই! তোমাকে যে আপনার করিতে পারে, সে বহু ভাগ্যবান্।

আমি মনে করিয়াছিলাম কোনও দিন বিবাহ করিবনা। কিন্তু বোধ হয় সে কল্পনা পরিবর্ত্তন করিব। তোমার মত লক্ষ্মী যার কপালে জুটে, সে যদি তাহা গ্রহণ না করে, তবে তার মত লক্ষ্মী ছাড়া আর কে?

আমি তোমার কথায় আরও কিছুদিন এখানে থাকিব।"

উত্তর যথাস্থানে রাখিয়া দিলাম। তাহার পর দিন প্রত্যুত্তর পাইলাম। এমন করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই চিঠির মধ্য দিয়া আমাদের দুজনের মতামত ও কল্পনা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

আমার শেষ চিঠিটা দেখিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন, আমরা কত দুর অগ্রসর হইয়াছিলাম। তাহা এই—

"তোমার চিঠি পেলাম। ভাগ্য তোমার না আমার? আমার মনে হয় এতদিন ভগবান তোমার জন্যেই

আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। সার্থক সে অপেক্ষা করা!

আমি যে শুধু তোমাকে বিবাহ করিব তা নয়, এই যাত্রাতেই বিবাহ করিয়া ফিরিব। অতুলকে বলিয়া বাবা কে জানাইব। এক একটা দিন আমার পক্ষে এক এক বৎসর বলিয়া মনে হইতেছে।

তোমার নরেশ।"

সেই রাত্রেই কথায় কথায় অতুল কথা পাড়িল। বলিল—তুমি যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতেছ—কিন্তু আমার একটা অনুরোধ আছে।

আমি কহিলাম—কি ?

অতুল কহিল—প্রাণকৃষ্ণ বাবুর একান্ত ইচ্ছা তুমি ঊষা কে বিবাহ কর। তুমি নিজে তাহাকে দেখিতেছ—লক্ষ্মীর মত মেয়ে! কিন্তু তুমি তার সম্বন্ধে সবটা হয়ত জাননা, গুণে ও সে তার রূপের চেয়ে কিছু কম নয়। একে বিবাহ করবার যদি কথা দাও—ত বড় ভাল হয়। —গরীব ব্রাহ্মণের মহদুপকার করা হয়—তা ছাড়া তোমারও ত ক্ষতি কিছু নেই।

মানুষ আপন দুর্ব্বলতা সহজে প্রকাশ করিতে পারেনা—তাই আমি গম্ভীর হইয়া কহিলাম—"কিন্তু বিবাহ তো আমি করবনা মনে করেছি।"

অতুল হাসিল—তাহার পর কহিল—ও তোমার ছেলেমানুষি! বিবাহ না করে কি সারা জীবন কাটাতে পারবে? মানুষের অভাব—বিচিত্র, আজ রক্তের জোর আছে, মনে করছ বিবাহে দরকার নেই, কিন্তু কিছু দিন পরে প্রয়োজন হবে। তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে প্রাণকৃষ্ণ বাবুর উপকার টা মনে করো।

সে দিন বিবাহের বিপক্ষে তর্ক করিতে বসি নাই—বিবাহের উদ্যোগেই রত হইয়াছিলাম, সুতরাং অতুলকে বেশী বুঝাইতে হইল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি এতদূর রাজী হইলাম যে—স্বীকার করিলাম, সেই যাত্রাই বিবাহ করিব।

অতুল কহিল—প্রাণকৃষ্ণ বাবুকে তা হ'লে খবর দিই গে

আমি সংক্ষেপে কহিলাম—দেওগে।

সেই মুহূর্ত্তে জানালার পাশ হইতে উচ্চ শঙ্খধ্বনি হইয়া উঠিল! শঙ্খের কম্পিত নিনাদ ও চুড়ীর আওয়াজে স্পষ্ট বুঝিলাম যে আমার আনন্দ অপেক্ষা বাদিকার আনন্দ কম হয় নাই! অতুল হাসিল, কহিল—তোমাকে দেখে আমারও যে হিংসা হচ্চে।

৬

যথাসময়ে বাবা, মা সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং এক শুভ রাত্রে ঊষার সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল।

সেদিন ফুলশয্যার রাত্রি। ঘরের ভিতরের আলো কমাইয়া দিয়াছিলাম এবং আপনার হাতে ঊষাকে ফুলে সাজাইয়া দিতেছিলাম। অস্পষ্ট আলোকে ফুলের সৌরভে ও সৌন্দর্য্যে তাহাকে অপরূপ সুশ্রী দেখাইতেছিল।

গলায় মালা পরাইয়া দিতে দিতে কহিলাম—"কিন্তু তোমার সাহস ত' খুব।"

ঊষা কহিল—"কেন ?"

আমি কহিলাম—"তুমি আগে আমাকে চিঠি দিলে কি করে ?"

বিস্ময়ে তাহার চোখদুটী বড় বড় করিয়া সে কহিল—"চিঠি, কই, আমি তো দিইনি!"

আমি হাসিলাম, কহিলাম—"বাস্, তারই জন্যে যে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে। আর তুমি দেওনি!"

ঊষার মুখ লাল হইয়া উঠিল, কহিল—"সত্যি বলছি, আমি তোমাকে একটা চিঠিও দিইনি!"

আমার ও বিস্ময়ের সীমা ছিলনা। আমি কহিলাম—ভুলে যাচ্ছ। চিঠি! আমি তার উত্তর তোমাদের বাইরের, ঘরের টেবিলের পশ্চিম কোণে রেখে দিতাম—তোমার কথামত!

ঊষা কহিল—এসব আমি কিছুই জানিনে! কি বলছ তুমি!

বাহিরে জ্যোৎস্না এবং ভিতরে সুষমার অন্ত ছিলনা এমন রাত্রি নষ্ট করিবার ইচ্ছা ছিলনা। কহিলাম,—তা বেশ সে পরে ভাবা যাবে।

পরের দিন অতুলের নিকট হইতে একপত্র পাইলাম। চিঠিখানা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দি,—তাহা হইতেই আপনারা ব্যাপার বুঝিবেন।

"ভাই-নরেশ,

তোমার বিয়েটা যখন একটা অভ্রান্ত সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে,—তখন ভেতরকার কথা বলায় আর কোন বাধা নেই।

তোমার এই বিবাহের প্রজাপতি তোমার শুশ্রূষাকারিণী, আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী, শ্রীমতী শৈল। তোমাকে দেখে অবধি তাঁর নিয়ত কল্পনা হ'য়েছিল তোমাকেও একটি অর্দ্ধাঙ্গিনী দান করা,—এবং তিনি সফলও হয়েছেন।

কেমন ক'রে—বলি। ঊষাকে দেখে তোমার মনের ভাবের কতক পরিবর্ত্তন আমি লক্ষ্য ক'রে ছিলাম, সে কথা যে যথাসময়েই তাঁর কাছে পৌঁছান উচিত ছিল এবং পৌঁছান হইয়াছিল, তা বোধ হয় তুমি এখনও বুঝতে পারচ না।

সুপ্ত সিংহ জেগে উঠ্‌ল,—শৈল সম্বন্ধে এ উপমাটা বোধ হয় ঠিক হলো। যা হোক আমার বলবার ভাব এই যে, তার ভারি উৎসাহ লেগে গেল! সে ক্রমাগতই উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করতে লাগলে, প্রেমের ডাইগ্‌নোসিস মেয়েরাই ভাল করতে পারে, অন্ততঃ তোমার কেস্‌ থেকে আমারও সে ধারণা অভ্রান্ত হয়েছে,—অবশেষে যে সময়টি সে খুব শুভ ব'লে মনে করিল, সেই সময়ে তার অমোঘ বাণ ত্যাগ করিল।

তার অভিনব কল্পনা আমাকেও আশ্চর্য্য ক'রে দিয়েছিল। সে জানিত ঊষার লেখা তুমি দেখনি, সে তার হ'য়ে তোমাকে এক চিঠি লিখলে!

রবিবাবুর কথায় বলিতে গেলে—আমি বিরাট অবোধের মত চাহিয়া রহিলাম, এবং পোষ্টাফিসে নিজ হাতে চিঠি দিয়া আসিলাম, কারণ চাকরের হাতে পাঠাইবার অনুমতি ছিল না!

মেঘান্ধকার সেই বিকালে তোমার হাতে চিঠি পরার পর, তোমার যে সকল ভাব-পরিবর্ত্তন হ'য়েছিল, শৈলর কাছে তা এখনও বায়স্কোপের ছবির মত সুস্পষ্ট। যাহোক তুমি যখন প্রাণকৃষ্ণ বাবুর বাইরের ঘরের টেবিলের পশ্চিম কোণে চিঠি রেখে দিলে, তখন শৈলের আনন্দের অবধি ছিল না। ডাক্তার রোগীকে ঔষধ দেওয়ার পর সে ঔষধে কাজ করিলে ডাক্তারের যেমন আনন্দ হয়,—শৈলের আনন্দটা সেই ধরণের!

তুমি বাহির হইয়া যাওয়ার পরই সে চিঠি শৈলর হস্তগত হইল। রাত্রে তাহা সে আমাকে দেখাইল। তোমার চিঠিখানি পড়িয়া বুঝিলাম, যে বৃথাই তুমি এতদিন অবিবাহিত ছিলে! এত শীঘ্র পরাজয় যে শুধু আমাদের মত চিরপরাজিতেরই সম্ভব!

তাহার পর—তোমার এবং ঊষা নামধারিণী শৈলর মধ্যে ঘন ঘন পত্র ব্যবহার! শৈল এত ঘন ঘন পত্র আমাকেও কোন দিন দেয় নাই। তোমার কাছে অস্বীকার করিব না, ইহাতে আমার যে একটু হিংসা হয় নাই, তাহা নহে,—কিন্তু কি করিব, আমি চাহিয়া থাকিতাম এবং নিয়ম মত পোষ্টাফিসে চিঠি দিয়া আসিতাম!

অবশেষে তোমার শেষ পত্র যে দিন আসিল, সে দিন দৌত্যের ভার আমার উপর পড়িল। সে দিনকার কথা মনে করিয়া আমার এখনও হাসি পায়। তুমি তখনও বলিতেছ, বিবাহ করিব না, অথচ তুমি তখন আগাগোড়া আমাদের কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছ, তোমার মনের ভাবগুলি তখন আমাদের কাছে কাচের মত স্বচ্ছ!

দশচক্রে তুমি ভূত হয়েছ বটে, কিন্তু এটাও বলতে হবে ভূতের ভাবটা তোমার নিজের মধ্যেও অনেকটা ছিল। বাকি প্রশংসা প্রাপ্য—চক্রান্তকারিণী শ্রীমতী শৈলবালার। পরাজয়, তোমার সম্পূর্ণ পরাজয় শৈলর কাছে। আমি ভাবিতাম, তার কাছে পরাজয়ের অধিকার কেবল আমারই, কিন্তু তুমি ও আমার অধিকারে অংশী হইয়াছ, ইহাতে আমার মন কিছুতেই সুপ্রসন্ন হইতেছে না!

কিন্তু এই পরাজয় তোমাকে চিরদিন আনন্দ দান করিবে! ঊষার মত রূপ-গুণসম্পন্ন স্ত্রী যার ভাগ্যে জুটে সে লক্ষ্মীবন্ত! যতই দিন যাবে, ততই দেখবে যে, চক্রান্ত করে আমরা তোমার চিরজীবন সুখ ও সৌভাগ্যের আয়োজন করেছি মাত্র।

শেষে একটা কথা চুপি চুপি বলি! তোমার বিবাহ

হওয়ার পর থেকে শৈলর ভারি অহঙ্কার হয়েছে, সে মনে করেছে পুরুষ জাতটাকে সে আগাগোড়া বুঝে নিয়েছে! কিন্তু আমি যদি তার চিঠি পোষ্টাফিসে না দিতাম,—ত' কোথায় থাক্‌তো সে! এ কথা সে ভুলেই যায়! ইতি—

তোমার অতুল।

পুঃ—আশা করি ডিসপেপসিয়া সমূলে নির্ম্মূল হয়েছে! আমার থিওরিটা ক অভ্রান্ত সত্য নয়? —অঃ

* * *

চিঠি পড়িয়া মনের যে ভাব হইয়াছিল, তাহা গোপন রাখাই শ্রেয়ঃ। ভাগ্যিস এলাহাবাদে ছিলাম না! শৈলর স্নেহ ব্যবহার ও শুশ্রূষা সত্বেও তাহার উপর ক্রোধ সঞ্চিত হইয়া উঠিল! মানুষকে কি এমনি করিয়া অপদস্থ করিতে হয়!

কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে আজ আর সে ক্রোধ নাই! মোটের উপর একথা বলিতে পারা যায় যে, আমার জীবন আনন্দের পথেই চলিয়াছে এবং তাহার একমাত্র কারণ শৈল! সে শুধু আমাকে রোগের হাত হইতে মুক্ত করে নাই,—সত্যই সে আমার সৌভাগ্যের আয়োজন করিয়াছিল! দেবতা যদি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, ত' সে স্নেহময়ী নারীরূপেই!

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ভিক্ষা

জীবনটারে
তোমার তরে
এম্নি করে
কাট্‌তে চাই!
কোন্ সে মায়ায়
টান্‌ছে আমায়!
বুঝ্‌তে আজো
পারি নাই!
চাইনি বিভব
দিয়েছ সব!
লজ্জাহীনের
তবু সাধ—
বারেক তরে
করুণ-করে
মুক্ত কর
মায়ার-বাঁধ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

৺কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী।

সেই একদিন গিয়াছে। তখন এই নগরে আমলা, উকীল, মোক্তার, মাষ্টার, হাকিম, ডাক্তার এবং প্রজা, জমিদার সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পরের একটা প্রীতির বন্ধন ছিল। এমন কি, সাহেব এবং বাঙ্গালীতেও সদ্ভাবে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে দেখা যাইত। অনেক ব্যাপারে উচ্চ, মধ্য ও নিম্নশ্রেণীর লোক মিলিত হইতেন। আমি গত ৫০ বৎসরের কথা বলিতেছি। উকীল ৺দাতা কালীকুমারের নাম লইলে সুপ্রভাত হইল বলিয়া লোকে মনে করিতেন। তিনি নগরের সকল শ্রেণীকে দয়া গুণে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর সেই উপাদানে গঠিত। তিনি এখন রোগে এবং বয়স গুণে পীড়িত হইয়া পরিয়াছেন।

বড় বাসা বলিতে তখন স্বর্গীয় কৃষ্ণসুন্দর ঘোষকে বুঝাইত। তাঁহার বৈঠক সর্ব্বশ্রেণীর লোকের আরাম স্থল ছিল। ৺অন্নদা প্রসাদ দাস, ৺দেবীদাস সেন এই নগরের অভিভাবক স্বরূপ ছিলেন। ব্রাহ্ম ৺গোপীকৃষ্ণ সেন, ৺গোবিন্দচন্দ্র গুহ বিপত্তিতে বন্ধু ও রোগ শয্যায় অতি সহৃদয় শুশ্রূষা কারীর ন্যায় সেবা করিতেন। চিরকুমার ছাত্রবৎসল অকুতোভয় ৺শরচ্চন্দ্র রায় সরলতা এবং সেবাপরায়ণতা গুণে রাজা প্রজা সকল শ্রেণীর প্রীতির এক বন্ধন রজ্জু স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার ব্রাহ্ম দোকান তো দোকান ছিল না—মিলনমন্দির ছিল। ডাক্তার বরদাকান্ত এখন বৃদ্ধ। যেখানে ডেগ ডেগচির শব্দ শুনা যাইত সেখানেই সরলপ্রাণ ডাক্তার বরদা কান্তের ডাক। এমন সিদ্ধ হস্ত সূপকার অধিক দেখা যায় না। তিনি এখন বার্দ্ধক্যের সীমায় উপস্থিত।

জমিদার ৺দুর্গাদাস আচার্য্য চৌধুরী, ৺অমৃত নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী তাঁহাদের উচ্চ আসন ভুলিয়া সকল শ্রেণীর সহিত কিরূপ সদ্ভাবে মিশিতেন সে চিত্র স্মরণ করিতেও মন এখন আনন্দে নাচিয়া উঠে। দেখিয়াছি, সেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী, ব্রহ্মগণের জীর্ণকুটীরে ছিন্ন আসনে বসিয়া দিন কাটাইয়া দিতেন। ১৮৮৭ সনে সারস্বত সম্মিলন-ক্ষেত্রে নৈশ মুক্ত-আকাশ তলে কাঙ্গাল

ফিকির চাঁদ যখন ভাবে বিভোর হইয়া "এই কি সেই আর্য্য ভূমি, আর্য্য সন্তান", "কেনরে ব্রহ্মপুত্র ঝরে নেত্র" গাইয়াছিলেন তখন সে গান শুনিয়া সকল শ্রেণীর সঙ্গে সমান আসনে বসিয়া রাজা সূর্য্যকান্তকে, অশ্রু জলে সিক্ত হইতে দেখিয়াছি। ডিপুটীমাজিষ্ট্রেট প্রাণ কুমার দাস, বাবু শশীকুমার দত্তকে আমরা ভুলিতে পারি না। সবজজ প্রথমনাথ প্রতি দিন প্রত্যুষে নগরের এক একদিকে আমলা, উকীল, শিক্ষক, ডাক্তারদিগের গৃহে উপস্থিত হইয়া শুভদিন জানাইয়া দিতেন। মোক্তার ৺কাশী ঘটক, ৺রামকুমার সন্যাল, ৺জগচ্চন্দ্র চৌধুরী, ইহারাও সে কালের আদর্শ স্থানীয় অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন। সহৃদয় বৃদ্ধ মৌলবী হামিদউদ্দিন কর্ম্ম ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন; তিনি হিন্দুর মন হইতে"দুরন্ত যবন"এই কথাটী মুছিয়া ফেলিবার জন্য কি প্রাণগত চেষ্টাই না করিয়াছেন। ইংরেজ হাকিম মিঃ রেনল্ডস্, আলেকজেণ্ডার, বাঙ্গালীর মা, বাপ স্বরূপ ছিলেন। আঠার বাড়ীর মোকদ্দমায় মিঃ পসির প্রতি লোকের ভাব বিরূপ হইলেও যখন তিনি রাজ পথে বেড়াইবার সময় দোলোৎসবে হুলির আবির কুম্‌কুম্ হাসিতে হাসিতে গ্রহণ করিতেন, তখন আমরা উভয় জাতির বিচ্ছেদ ভুলিয়া যাইতাম। মিঃ ব্রেড্‌বরী সাহেবকে শীমলাই ধুতি চাদর পড়িয়া রাত্রিকালে নগরের গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিয়া নানা তত্ব সংগ্রহ করিতে দেখিয়াছি। সেই সকল তত্ব লইয়া তিনি বিচার আসনে বসিয়া হাস্যামোদ করিতেন, তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইত। জজ মিঃ মানি, ষ্টীভেন্স, হার্ডিঞ্জ, বিসক্রপট্ সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। চট্টগ্রামে মিঃ কারকুডের দুর্ণাম থাকিলে ও তিনি সারস্বতে নববলের সঞ্চার করিয়া সকল শ্রেণীর লোকের হৃদয় কিনিয়া লইয়াছিলেন। মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত, মিঃ অম্বিকাচরণ সেন—তাঁহাদের কথা আর কি বলিব? তাঁহারাত আমাদেরই লোক ছিলেন। ডাক্তার ধর্ম্ম দাস বসু এবং ডাক্তার কলভার্টকে আমরা ভুলিতে পারি না। এই শ্রেণীর লোক এখন আর অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। কেন এমন হইল?

এখন আমলা-উকীল, মোক্তার-ডাক্তার, বিচারক-ব্যবহার জীবে আর তেমন সদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। এক শ্রেণী যদি মর্ত্তবাসী, অন্য শ্রেণী শনৈশ্চর বাসী। এমন বিভিন্ন শ্রেণীর ইহারা যে একই গ্রহে পালিত নয় বলিয়া অনেক সময়ই ভ্রম হইয়া থাকে।

১৮৮৫ সনে প্রজা ভূম্যধিকারী আইনের সৃষ্টিতে উচ্চ এবং নিম্নস্তরে একরূপ মনো মালিন্য উপস্থিত হয়। ঐ ১৮৮৫ সনে জাতীয় মহা সমিতির প্রতিষ্ঠা। ধীরে ধীরে ঐ সময় হইতেই কি ইংরেজ বিচারক, কি বাঙ্গালী বিচারক ইহাঁদের অনেকেই অন্য শ্রেণী হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। পরস্পরে সদ্ভাবের অভাবের অন্য কারণ জীবণ সংগ্রাম। খাদ্য দ্রব্যের মহার্ঘ্যতার জন্য এখন সর্ব্ব শ্রেণীর লোক কিম্বা একই শ্রেণীর বহুলোক নিমন্ত্রণাদিতে মিলিত হইতে পারেন না। আমি এই নগরে ভাল চাউল প্রতিমণ ১৸০ আনা, উৎকৃষ্ট ঘৃতের সের ৷৵০ আনা দেখিয়াছি। মৎস্য মাংস অতি সুলভ ছিল। দিঘারকান্দার বেগুন কে কত খাইবে! ৺যোগেন্দ্র নারায়ণ ও ৺অমৃত নারায়ণ যখন নৈমিষারণ্যের পাতলা চিড়া আনাইয়া ওপার মূলার সঙ্গে পরিবেশন করিতেন, তখন উহা দ্বারা কি সুন্দর প্রাতরাশই না হইত। বেগুনবাড়ীর চিড়া প্রসিদ্ধ ছিল।

এখন সে চিড়া চিবাইতেও আক্কেল দাঁত জবাব দেয়। ঔপন্যাসিক বুলওয়ার লীটন বলিয়াছেন "Stomach is the seat of sympathy" খাদ্য দ্রব্যের মহার্ঘ্যতায় উদর পূজার আর সে সমারোহ নাই। ৺শ্রীকণ্ঠবাবুর "কণ্ঠু মেলায়" বন ভোজনের যে ভুরি আয়োজন হইত তাহার আর এখন সম্ভবনা কি? দুই এক স্থানে দুই পাচ জন বন্ধুলোকের সান্ধ্যসমিতি হইলেও পূর্ব্বের সে আনন্দ সেখানে মিলে না। দুই এক জন সহৃদয়ের গৃহে দুই এক পেয়ালা চাতে চিত্তের সে প্রসন্নতা জন্মায় না। এই নগর হইতে জানকীনাথ ঘটকের অন্তর্ধানে সমাজের অমায়িকতায় একটা শক্ত বাঁধ ছিড়িয়াগিয়াছে। জনহিতৈষী, ভারত মিহিরের প্রতিষ্ঠাতা কালীনারায়ণ সান্যালের গৃহ সর্ব্বশ্রেণীর লোকে পূর্ণ থাকিত। দেবনিবাসের দেবেন্দ্রকিশোরের তো দোশর দেখি না।

উপরে সর্ব্বশ্রেণীর পরস্পর প্রীতির যে একটি চিত্র

দিলাম। ৺ কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী তাঁহার এক প্রধান পুরুষ ছিলেন। ইনি ভূম্যধিকারী, ইনি উকীল, ইনি মুন্সেফ, ইনি রাজনীতি বিৎ, ইনি সমাজতত্ত্ব বিৎ। সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিলিয়া তিনি সকল শ্রেণীকে এক প্রীতিসূত্রে সংবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় আতিথেয় ছিলেন। কখনও একাকী আহার করিতে পারিতেন না। বৃষ্টি বাদলের আধারে যে রাত্রিতে তাঁহার গৃহে বন্ধু সমাগমের ব্যাঘাত ঘটিত, সে দিন তিনি ভিজিয়া হইলেও বন্ধু সংগ্রহ করিতেন এবং একত্র আহারের আনন্দ উপভোগ করিতেন। আমরা তাঁহার বাল্য জীবনের কথা আর উল্লেখ করিতে চাই না। তিনি মুক্তাগাছার জমিদার পরিবারের সুসন্তান। বাল্যকাল হইতে শিকারের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। জমিদার গর্ব্ব ভুলিয়া শিক্ষার সাধারণ ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইতে তিনি কখনও কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। তিনি বহুযত্ন ও বহু আয়াস স্বীকার করিয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টের ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ময়মনসিংহে ওকালতী ব্যবসা আরম্ভ করেন। এখন যেখানে সারকিট হাউস, সেটী তখন আদালত গৃহ ছিল। উকীলদের গৃহ উহারই এক পার্শ্বে। ঐ গৃহ অনেকেই উকীলদের যোগ্য বলিয়া মনে করিতেন না। ভারত মিহিরে "হরিদাসের গোশালা" বলিয়া উহার এক গ্লানি সূচক প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

"হরিঘোষের গোয়াল যেমন
হাইকোর্টের লাইব্রেরী তেমন
কেহ আসৃছে কেহ যাচ্ছে—নজীর বগলে।"

মুখে মুখে তখন এই কবিতারও আবৃত্তি শুনা যাইত। কেশব বাবু ঐ উকীল গৃহ পছন্দ করিলেন না। তিনি তাঁহার জন্য এক স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া লইলেন। সেখানে তক্তপোষ, তোষক, তাকিয়া, তামাক ইত্যাদির অতি সুবন্দোবস্ত ছিল। ওকালতীতে স্বাধীন বুদ্ধির পরিচয় দিয়া তিনি যথেষ্ট সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি কখনও আত্ম সম্মান বিসর্জ্জন করিতেন না।

তাঁহার জীবনের আত্ম-সম্মান-বুদ্ধির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ঢাকায় প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহা তাঁহার উকীল জীবনের পূর্ব্বের ঘটনা। ওয়াইজ সাহেব ঢাকার একজন প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারী মিঃ ডন। একদা ঢাকার রাজপথে ভ্রমণকালে ডন সাহেবের গাড়ীর সঙ্গে ৺কেশবচন্দ্রের গাড়ীর সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে ডন সাহেব কেশব বাবুকে আক্রমণ করেন। ডন সাহেব কেশব বাবুর হস্তে যথেষ্ট প্রহৃত হন। এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া তিনি কেশব মহারাজ নামে অভিহিত হন। মিঃ ডন ইহার প্রতিশোধ লইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে ছিলেন। ১৮৬৬ সনে ময়মনসিংহে কৃষিপ্রদর্শনী মেলা হয়। ঐ মেলার কার্য্যভার মিঃ ডনের হস্তে অর্পিত হয়। ঐ মেলা ক্ষেত্রে উদ্ঘাটনের দিন বহু জমিদারের সমাগম হইয়াছিল। কেশব বাবুও নিমন্ত্রিত ছিলেন। প্রবেশ পথে তাঁহাকে অপমান করা হয়। বকলণ্ড সাহেব তখন ঢাকার কমিশনার। তিনি প্রদর্শনী ও অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। তদ্‌ঘটনা দর্শী বয়ঃবৃদ্ধ শ্যামাচরণ রায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া কলিকাতার Indian Mirror পত্রে একটী অগ্নিবর্ষী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই মেলার সময়ে ব্রহ্মানন্দ মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন এই নগরে উপস্থিত ছিলেন। অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন, এই প্রবন্ধ ঐ মহাত্মারই লিখিত। ঐ প্রবন্ধের ফলেই হউক কিম্বা অন্য কারণেই হউক বকলণ্ড সাহেবকে ত্রুটী স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ময়মনসিংহ নগরেও কেশব আচার্য্য —কেশব মহারাজ বলিয়া অভিহিত হইতেন।

রাজনৈতিক সভায় আমরা তাঁহাকে অগ্রগণ্য দেখিয়াছি। ময়মনসিংহ রেলওয়ে আন্দোলনের পুরোভাগে তাঁহাকে পাইয়াছি। তাঁহার গৃহ রাজনৈতিক অধিবেশনের কেন্দ্র স্থান ছিল। ভূম্যধিকারী সভা তাঁহার যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ময়মনসিংহের সারস্বত সমিতির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বহু বৎসর দক্ষতার সহিত সারস্বত সমিতির সভাপতিত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এক বিরাট লাইব্রেরী ছিল। উহাতে ইংরেজী বাঙ্গালা সংস্কৃত বহু ভাষার গ্রন্থ ছিল। তিনি গ্রন্থ ক্রয় করিয়া আপনার বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিবার জন্য আলমারী সজ্জিত করিতেন না। তিনি

তাহার প্রত্যেক খানি পুস্তক পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পাঠ করিতেন। তিনি "আফগান বিবরণ" প্রণেতা, "Law of Adoption" যাহা By a Hindustane Hindu Vakil কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, কেশবচন্দ্রই তাহার গ্রন্থ কর্ত্তা।

ইনি সাহিত্যিকদিগকে সম্মান করিতে জানিতেন। এই নগরের প্রধান সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিশ্বাস, আদি মানবের বাসস্থান লেখক পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাস তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। যে কমিটী কর্ত্তৃক "ময়মনসিংহ ইনষ্টিটিউসন (বর্ত্তমান সিটী স্কুল) প্রতিষ্ঠিত হয়—যাহার পরিণতি আনন্দমোহন কলেজ—সেই কমিটীর সভাপতি ছিলেন ৺আনন্দমোহন বসু, সহকারী সভাপতি ছিলেন ৺কেশবচন্দ্র আচার্য্য।

শিকারে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাহার অনেক শিকার কাহিনী স্থানীয় মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইত। তিনি অসম সাহসী পুরুষ ছিলেন। ৺গগনচন্দ্র চৌধুরীকে বহু মুদ্রা সহ ইনি কলিকাতায় পৌছাইয়া দেন। সে কালে কলিকাতা যাত্রা সামান্য সঙ্কট সঙ্কুল ছিল না। এখানে অবান্তর হইলেও এ কথাটী উল্লেখ করিতে চাই—৺গগনচন্দ্র চৌধুরী তাহার অগণিত মুদ্রা জলে ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইতেন।

কেশবচন্দ্র একজন মুক্তহস্ত দাতা ছিলেন। একদিন এক জন ভিখারিণী তাঁহার নিকট ভিক্ষার জন্য উপস্থিত হয়। তিনি বলিলেন—"আজ ওকালতীতে যাহা পাইব, সব তোকে দিব।" এমনি সময় এক জন লোক আসিয়া এক মুঠা টাকা দিল। এই এক মুঠা টাকাই তিনি ভিখারিণীকে দিয়া ফেলিলেন। অনেক দরিদ্র ছাত্র এবং অন্য শ্রেণীর লোক তাঁহার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পাইত।

জীবনের শেষ ভাগে তিনি ওকালতী ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হন। ১২৯৮ সালের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ কাশীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুতে ময়মনসিংহ একজন শিক্ষিত, সৎসাহসী, অমায়িক সদাশয় ভূম্যধিকারী হারাইলেন। জানি না তাঁহার স্থান কত দিনে পূর্ণ হইবে।

শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত।

নারায়ণ দেব।

আজ তিন বৎসর যাবৎ 'নারায়ণ দেব','নারায়ণ দেব' বলিয়া বঙ্গ সাহিত্য মহলে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ, "এক যায় আর আসে, সাগর তরঙ্গ যথা।"

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩১৮, ষষ্ঠভাগ, ২য় সংখ্যা) "নারায়ণ দেব ও পদ্মাপুরাণ"শীর্ষক একটি প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে সতীশ বাবু শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বাবু মহাশয় দ্বয়ের পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রবন্ধে প্রকাশিত নারায়ণ দেব সম্বন্ধীয় বিষয়ের প্রতিবাদ করেন। আর্য্যাবর্ত্ত পত্রিকায় (১৩১৯) 'মনসা মঙ্গল' নামীয় এক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় নারায়ণ দেব সম্বন্ধে এক অভিনব মত প্রকাশ করেন। সতীশ বাবুর এবং দীনেশ বাবুর প্রবন্ধ দ্বয়ের প্রতিবাদে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (ত্রৈমাসিক, সপ্তমভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা) শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ মহাশয় একপ্রবন্ধ এবং বর্ত্তমান অগ্রহায়ণ মাসের সাহিত্য সংবাদ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অচ্যুত বাবু একপ্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় সতীশ বাবুর, আর্য্যাবর্ত্ত পত্রিকায় দীনেশ বাবুর এবং নব্যভারতাদি পত্রিকায় অচ্যুত ও পঞ্চানন বাবুর প্রবন্ধ সকল আমি পাঠ করি নাই ; তবে বিরজা বাবু ও অচ্যুত বাবু তাঁহাদের শেষোক্ত প্রবন্ধদ্বয়ে যাহা যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং যেরূপ সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতেই সকল প্রবন্ধের মূল কথা এবং স্থূল মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়। এই অবগতি অনুসারেই বর্ত্তমান প্রস্তাব বিবক্ষিত হইল।

অগ্রে সতীশ বাবুর এবং বিরজা বাবুর বাদপ্রতিবাদের আলোচনা করিব। যত দূর বুঝিতে পারিয়াছি, সতীশ বাবু নারায়ণ দেবকে ময়মনসিংহ জেলার কবি বলিয়া, তাঁহার উক্তি, তিনটি সুদৃঢ় প্রমাণের উপর সংস্থাপন করিয়াছেন।

১ম। নারায়ণ দেবের নাম ময়মনসিংহে আবালবৃদ্ধ-বণিতার নিকট সুপরিচিত।

২য়। নারায়ণ দেবের নিজের উক্তি—

"পূর্ব্ব-পুরুষ মোর অতি শুদ্ধমতি।
রাঢ় ত্যজিয়া বুড় গ্রামেতে বসতি॥"

বুড়গ্রাম ময়মনসিংহ জেলায়।

৩য়। বুড়গ্রামে নারায়ণ দেবের বংশধরগণ বাস করিতেছেন, তাঁহাদের বংশাবলীতে নারায়ণ দেবের ও তাঁহার কথিত পূর্ব্ব-পুরুষগণের নাম আছে।

এই তিন প্রমানে দোষারোপ করিতে বসিয়া বিরজা বাবু বহু বাক্য বিন্যাস করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার বাক্য সতীশ বাবুর অনুকূল ভিন্ন প্রতিকূল হয় নাই। প্রথম প্রমান সম্বন্ধে তিনি দুই দফা প্রতিবাদ করিয়াছেন। এক দফায় উক্তি করিয়াছেন,—"ইহা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, "বংশীদাসের পদ্মাপুরাণের সংস্করণ বাহির হইবার পূর্ব্বে ময়মনসিংহবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে শতকরা ৫ জন লোকেও জানিতেন না যে, দ্বিজ বংশীদাসের পৃথক পদ্মাপুরাণ আছে। তাহারা সুধু এই জানিতেন যে, নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে বংশীদাসের ভণিতা আছে এবং নিজে এই পদ্মাপুরাণ নকল করিবার সময় স্থানে স্থানে স্বীয় নামটি বসাইয়া দিয়াছেন। বংশীদাস কোথাকার লোক, তাহা অনেকেই জানিতেন না। নারায়ণদেব কোন জেলার লোক জানিতে চাহিয়া ময়মনসিংহের কয়েক স্থানের টোলের অধ্যাপক হইতে এই উত্তর পাইয়াছি যে তিনি পূর্ব্ব দেশের লোক, ময়মনসিংহের কিনা তাঁহারা জানেন না।" বিরজা বাবু তাঁহার প্রবন্ধে সতীশ বাবুর প্রবন্ধের যে অংশ উদ্ধৃত করিয়া সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে বংশীদাসের পৃথক পদ্মাপুরাণ থাকা না থাকার কথা নাই। সতীশ বাবু এই মাত্র বলিয়াছেন যে নারায়ণদেব এবং দ্বিজবংশীদাস ময়মনসিংহবাসীর চিরপরিচিত। একথা বিরজা বাবুর উপরের উদ্ধৃত উক্তি দ্বারা দৃঢ় হইতেছে।

দ্বিজবংশীদাসের পৃথক পদ্মাপুরাণ ছিল বলিয়া ময়মনসিংহবাসী জানিতেন বা নাই জানিতেন, তাহারা বংশীদাস ও নারায়ণদেবকে জানিতেন। সুতরাং বংশীদাস ও নারায়ণদেব তাঁহাদের চির পরিচিত। টোলের অধ্যাপকগণ নারায়ণদেবের বাড়ী কোন্ জেলায়, তাহা জানুন্ বা নাই জানুন্ কিন্তু নারায়ণদেবকে জানেন, নারায়ণদেব তাঁহাদের চির পরিচিত। বিরজা বাবুর নিজের কথা মতেই ইহা প্রমাণিত হয়। এস্থলে বিরজা বাবুকে একটি কথা আমাদের জিজ্ঞাস্য আছে,—"বংশীদাস নিজে নারায়ণদেবের পদ্মাপুরণ নকল করিবার সময় স্থানে স্থানে স্বীয় নামটি বসাইয়া দিয়াছেন, বলিয়া জানিতেন", একথা কোন ময়মনসিংহবাসী স্বীকার করিবেন কি? স্বীকার করিতে পারেন কি? ইহাই আবার তিনি "সাহস করিয়া" বলিয়াছেন, তাঁহার "সাহস"টা ব্যসন নহে কি? কোন মৃত মহাত্মা সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে, সংযত ভাষায় সঙ্গত কথা বলিতে হয়, বিরজা বাবু এস্থলে এ বিবেচনা করেন নাই, ইহাই দুঃখ।

বিরজা বাবুর আর এক দফা এই,—সতীশ বাবু লিখিয়াছেন, "শৈশবে মাতৃ স্তন্যের সহিত যাঁহার কবিতার পরিচয়, তাঁহাকে আপনার লোক বলিয়া বিশ্বাস করা ময়মনসিংহবাসীর পক্ষে অতি মাত্র স্বাভাবিক।" বিরজা বাবু বলেন, ইহা কি যুক্তি? যদি এই প্রকার বিশ্বাস স্বাভাবিক হয়, কবিগুরু বাল্মীকি, মহামতি-চাণাক্য, মদন মোহন তর্কালঙ্কার, ইহাদিগকেও ময়মনসিংহবাসী বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, কারণ তাহাদের গাথার সহিত অন্য স্থানের ন্যায় ময়মনসিংহের শিশুদিগের পরিচয় হইয়া থাকে।" দেখিতেছি বিরজা বাবু সতীশ বাবুর বাক্যের সরল ভাব গ্রহণ করিতে বড়ই নারাজ। তিনি বক্র পথ ধরেন, আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া সোজা পথেই আইসেন। এখানে তিনি নিজেই নিজের বিতর্ক খণ্ডন করিয়া, সতীশ বাবু যা বলিলেন তাই বলিতেছেন। তিনি নিজেই বলিতেছেন, বাল্মীকি, চাণাক্য, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের গাথা অন্যান্য স্থানের শিশুর ন্যায় ময়মনসিংহের শিশুরও পরিচয় হয়, কাজেই একা ময়মনসিংহবাসী তাঁহাদিগকে আপনার বলিয়া ভাবতে পারে না। কিন্তু নারায়ণদেবের গাথার সহিত একা ময়মনসিংহের শিশুর পরিচয় হয়, সুতরাং তাঁহাকে ময়মনসিংহবাসী আপনার বলিয়া ভাবা স্বাভাবিক। সতীশ বাবুর কথার এই

সুন্দর ও সঙ্গত যুক্তি। মাতৃস্তন্যের সহিত পরিচয় হয় কথা অতিরঞ্জিত ভাবিয়া বিরজা বাবু সতীশবাবুকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। কথাটা একটু অতিরঞ্জিত হইলেও হইতে পারে; কিন্তুআমরা দেখিয়াছি মাতা স্তন্যপায়ী শিশু ক্রোড়ে করিয়া এবং সঙ্গে লইয়া পদ্মপুরাণের পাঁচালী শুনিয়াছেন।

সতীশ বাবুর দ্বিতীয় প্রমাণের প্রতিবাদে বিরজাবাবুর নিজের কিছুই বলিবার নাই। পঞ্চানন বাবু একটি প্রবন্ধে অহেতুক অতর্কিত ভাবে বলিয়াছিলেন, "বুড়গ্রাম পূর্ব্বে শ্রীহট্ট সরকারের অন্তর্গত ছিল।" সতীশ বাবু তাঁহার প্রবন্ধে পঞ্চানন বাবুর এই কথার প্রমাণ চাহিয়াছিলেন। পঞ্চানন বাবু ভ্রমবশতঃ হঠাৎ এই কথা বলিয়াছেন, বুঝিতে পারিয়াই, বোধ করি, বিজ্ঞজনোচিত মৌন অবলম্বন করিয়াছেন, কোন উত্তর দেন নাই। মনুষ্য মাত্রেই ভ্রম করে। ভ্রম করা মনুষ্যের স্বভাব। কিন্তু ভ্রমের সমর্থন করিতে যাওয়া নিতান্ত অবিজ্ঞের কার্য্য, কারণ ভ্রম ব্যতীত ভ্রমের সমর্থন হয় না। তাই বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা করেন না। বিরজা বাবু পঞ্চানন বাবুর সেই কথা সমর্থন করিতে অগ্রসর হইয়া প্রথমেই সতীশ বাবুকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোন প্রমাণের বলে ঠিক করিলেন বুড়গ্রাম চিরদিন ময়মনসিংহের অন্তর্গত ছিল?" এরূপ প্রশ্ন বিরজাবাবুর মুখে দূরে থাকুক, আজ কাল কোন শিশুর মুখে শুনিলেও আমরা ব্যথিত হইতাম। বুড়গ্রাম যখন ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত, তখন চিরদিনই উহার অন্তর্গত আছে, এ ধারণা স্বাভাবিক। ইহার প্রমাণ প্রয়োজন করে না। কিন্তু যিনি বলিবেন বুড়গ্রাম কোন সময়ে শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছিল, সে কথার প্রমাণের ভার তাঁহারই উপর পড়িবে। এ কথাও আমাদিগকে বলিতে হইল! না বলিলে নয় বলিয়া, বড় অনিচ্ছার সহিত একটী কথা আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, লেখক মহাশয়দ্বয় ক্ষমা করিবেন। "সত্যম্ ব্রূয়াৎ প্রিয়ম্ ব্রূয়াৎ নব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।" বচনটীর অর্থ আমি করি,— সত্য বলিবেই কিন্তু প্রিয় ভাবে বলিবে, অপ্রিয় ভাবে সত্য বলিবে না। অন্য এক জ্ঞানী অন্য ভাষায় বলিয়াছেন,—Truth pleases less when it is naked. অর্থাৎ সদা সত্য কথায় মনস্তুষ্টি কমই হয়। আমি বোধ হয় সেরূপ প্রিয়ভাবে বলিতে পারিব না; এই জন্য ক্ষমা চাহিতেছি। বিষয়টি এই,—বিরজা বাবুর এবং অচ্যুত বাবুর প্রবন্ধদ্বয়ের একটা বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইল। যে বিষয়ের আদৌ কোন প্রমাণ নাই, সে বিষয় প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া মূল প্রবন্ধে লিখা হয়। পাদটিকায় যবেস্তবে যাহা কিছু একটা লিখিয়া, প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রকারান্তরে অকৃতকার্য্যতার পরিচয় দেওয়া হয়। পঞ্চানন বাবু স্বয়ং যে বিষয়ে নিরব আছেন, বিরজা বাবু স্বয়ং আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিয়া স্পর্দ্ধার সহিত বলিলেন,—"পঞ্চানন বাবুর কৈফিয়ৎটা আমরাই দিতেছি।" সে কৈফিয়ৎ দিলেন, মূলপ্রবন্ধে এই—"শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের ময়মনসিংহের বিবরণে এবং শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয়ের শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে আছে—ময়মনসিংহের জোওয়ানসাহী পরগণা সরকার শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছিল।" নিম্নে নোটে লিখিলেন,—"বোরগ্রাম জোওয়ানসাহী পরগণার অন্তর্গত, ইহা আমি জানিতে পারিয়া, সত্য অনুসন্ধান করিয়া জানাইবার জন্য কেদার বাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি (এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর) কেদার বাবু একখানা চিঠিতে তাঁহার ভ্রম স্বীকার করিয়া, আমাকে জানাইয়াছেন যে বোরগ্রাম নসিরুজিয়াল পরগণার মধ্যে অবস্থিত।" বিরজা বাবু স্পর্দ্ধার সহিত যাহা আরম্ভ করিয়াছিলেন, আক্ষেপের সহিত তাহা নিজেই খণ্ডন করিয়া পরিসমাপন করিলেন। আমাদের বলিবার আর কি আছে? তবে এই মাত্র বলি, বিরজা বাবু যখন প্রকৃত বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন এবং কেদার বাবুও আপনার ভ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন, তখন, ঐ ভ্রমাত্মক বিষয় মূল প্রবন্ধে সত্য স্বরূপ লিখিয়া পাঠকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার প্রয়াস পাইলেন কেন? এবং বঙ্গ সাহিত্যের প্রতিইবা এ অত্যাচার করিলেন কেন? এবং কেদার বাবুর উত্তর পাইয়া তিনি টিকা লিখিতে পারিলেন, অথচ মূল প্রবন্ধের ভ্রম রহিত করিলেন না। ময়মনসিংহের জোওয়ানসাহী পরগণা কোন সময় শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছিল কিনা, সে মীমাংসা এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে

বলিয়া আমরা তাহার আলোচনা করিলাম না, কিন্তু বিরজা বাবু তাহাও প্রমাণ করিতে পারেন নাই। কারণ, পঞ্চানন বাবু প্রভৃতি যাঁহার কথার "বশবর্ত্তী" এবং যিনি সকলের অগ্রবর্ত্তী সাহিত্যকার, সেই দীনেশ বাবু এমন কথা তাঁহার গ্রন্থে লিখেন নাই।

সতীশ বাবুর তৃতীয় প্রমাণ সম্বন্ধে বিরজা বাবু বলেন,—"নারায়ণ দেবের বংশধরগণের বংশতালিকা একটু সন্দেহ জনক বলিয়া বোধ হয়।" এই সন্দেহের কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে, "সতীশ বাবুর কথায় বুড়গ্রামের বিশ্বাসেরা নারায়ণ দেব হইতে সপ্তদশ পুরুষ অধস্তন, আর পদ্মাপুরাণের প্রস্তাবনায় (এই প্রবন্ধের লেখকের লিখিত) নারায়ণদেব হইতে তাঁহার বর্ত্তমান বংশধর ২০ পুরুষ ব্যবহিত বলিয়া লিখিত আছে।" বিরজা বাবু বলেন,—"পরস্পর বিরোধী দুইটি কথার উভয়টি সত্য হইতে পারে না।" সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, বলিব, উভয়টিই সত্য হইতে পারে। এক প্রকারে নহে, একাধিক প্রকারে পারে। নারায়ণ দেবের বংশধরগণ সকলেই কি সকল কালেই সম পর্য্যায়ের থাকিবেন? আজ যে গণনা হইবে, ৫০ কি ১০০ বৎসর পূর্ব্বের গণনায় তাহার ন্যুনাধিক্য হইতে পারে না কি? তৎপর যাহার বংশ সপ্তদশ অথবা বিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার বংশতরু অবশ্য একাধিক শাখায় বিস্তীর্ণ হইয়াছে। সকল শাখাতেই কি পুরুষের সংখ্যা সমান হইবে? তৎপর কোন কোন পুরুষ পুত্র পৌত্রাদি সহ বর্ত্তমান থাকেন, এরূপ স্থলে, কেহ পুত্র পৌত্রাদি সহ গণনা করেন। কেহ বা পুত্র পৌত্রাদি গণনায় ধরেন না, তাহাতেও উভয় মধ্যে সংখ্যার কম-বেশী হয়। হইলেও উভয় গণনা সত্য। আমাদের উভয় গণনায় যদি কেহ ভুল ও করিয়া থাকি, তাহা আমাদের একের ক্রটী ব্যতীত নারায়ণ দেবের বংশাবলীর প্রতি সন্দেহের কারণ হইতে পারে না। বংশাবলী কি কখন বিশিষ্ট বিরুদ্ধ প্রমান নাপাইলে অগ্রাহ্য হইতে পারে? উহা স্বতঃসিদ্ধ প্রমান, অন্য প্রমানের অপেক্ষা করে না। পিতৃ পিতামহের নাম কি কেহ কৃত্রিম লিখিয়া থাকে?

বিরজা বাবু আর একটি কথা বলেন, "বুড়গ্রামের বিশ্বাসেরা দেশে বিশিষ্ট সম্মানিত কায়স্থ নহেন। শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় তাহাকে জানাইয়াছেন যে, তিনি অনুসন্ধানে অবগত হইয়াছেন, বুড়গ্রামে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ নাই। কিশোরগঞ্জের মোক্তার বুড়গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গগণচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় এক পত্রে আমাদিগকে জানাইয়াছেন, "আমি বুড় গ্রামের নারায়ণ দেবের বংশোদ্ভব। আমরা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ। স্বর্গীয় মহেন্দ্রচন্দ্র দে (বিরজা বাবুর প্রবন্ধের উল্লেখিত মহেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস) আমাদের জ্ঞাতি নহে, সে আমাদের জনৈক সিংহের ছেলে।" গগণচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের এই কথার পর কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের অনুসন্ধান ঠিক বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না, কারণ গগণচন্দ্র হোম মহাশয় তাঁহার সহধ্যায়ী মহেন্দ্র দেকে নারায়ণ দেবের বংশধর বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। অথচ মহেন্দ্র দে নারায়ণ দেবের বংশধরের দাসের ছেলে। যাঁহাদের দাসের পুত্র বর্ত্তমানে ভদ্রলোক হইয়া অন্যান্য ভদ্র বালকের সহিত চলিতেছেন, তাঁহারা যে বহু প্রাচীন মৌলিক সম্মানিত কায়স্থ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে কি? বিরজা বাবু বুড়গ্রামের বিশ্বাস মহাশয়দের বংশাবলী সম্বন্ধে কেদার বাবুর নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন, কেদার বাবু তাঁহাকে জানাইয়াছন, "নারায়ণ দেবের পিতা মাতার নাম বংশাবলীর সহিত মিলিয়াছে—আমার বিশ্বাস। ধনপতি, নরসিংহ, প্রভাকর—বিশ্বাসদের বংশাবলীতে আছে।" এইরূপ লিখাতে বিরজা বাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বংশাবলীতে মাতামহের নাম থাকে কিরূপে? দেখা যাইতেছে কেদার বাবু বংশাবলী দেখিয়া পত্রের উত্তর দেন নাই, নাহইলে "বংশাবলীর সহিত মিলিয়াছে আমার বিশ্বাস" একথা লিখিতেন না। বোধ হয়, নারায়ণ দেবের বংশধরের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিয়াছিলেন। নারায়ণ দেবের মাতামহের নাম প্রভাকর ছিল, ইহাও উক্ত বংশধরে বলিয়াছিল, তাই ধনপতি, নরসিংহ নামের এক সঙ্গে উক্ত নাম লিখিয়াছিলেন। যাহা হউক এ প্রশ্নের উত্তর কেদার বাবুর দেয়, তিনি দিবেন। বিরজা বাবু

যে তর্কই করুন না কেন, নারায়ণ দেবের বংশীয়গণ যে, বুড়গ্রামে আছেন, একথা সর্ব্ববাদী সম্মত—কেহই অস্বীকার করেন নাই। বিরজা বাবুর সহকারী লেখক অচ্যুত বাবু তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "ময়মনসিংহ জেলার ভিতরে নারায়ণ দেবের বংশীয়গণ বাস করিতেছেন" তাঁহার এই কথার সাক্ষী রামধন ভট্টাচার্য্য বলেন,—"নারায়ণ দেব ময়মনসিংহ জেলার বুড়গাঁও নামক স্থানে যাইয়া বাস করেন।" বুড়গ্রামের বিশ্বাস মহাশয়েরা নারায়ণ দেবের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেছেন এবং তাঁহাদের পিতা পিতামহের নাম সম্বলিত বংশাবলী দেখাইতেছেন; তাঁহারা ভিন্ন নারায়ণ দেবের বংশধর আর কাহারা হইতে পারেন? (আগামী বারে সমাপ্য।)

শ্রীরামনাথ চক্রবর্ত্তী।

কুমারী ব্রতের স্মৃতি।

মাঘ মণ্ডল।

সে শৈশবের কথা। তখনও ভোরের পাখী ডাকিয়া যায় নাই, কুয়াসায় চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া আছে, তার উপর অন্ধকার। পিসিমার ডাকে ঘুম ভাঙ্গিল। পৌষ মাসের হাড় ভাঙ্গা শীতে লেপ ছাড়িয়া উঠিলাম, তখন ও চোখের ঘুম যায় নাই। সেই শীতের মধ্যে প্রবল উৎসাহ লইয়া আমাদের বাড়ীর সম্মুখের বেনুকুঞ্জ সমাচ্ছন্ন পেনা পঁচা পুকুরের শীতল জলে স্নান করিতে গেলাম। দেখিলাম—আমাদের পাড়া প্রতিবেশী বহু ছেলে মেয়েও নববধু উৎসাহ ভরে জলে নামিয়া ডুবাইতেছে, আমিও তাহাদের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম, কি আনন্দ! সে দিন উত্তরায়ণ সংক্রান্ত। মাঘের করে রাজ্যভার দিয়া পৌষ মাস বিদায় মাগিতেছে।

উৎসাহ ভরে স্নান করিয়া উঠিলাম। তখন আমাদের বহিঃপ্রাঙ্গনে পুকুরের ধারে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। গ্রামের ছেলে বুড়া আসিয়া সমবেত হইয়া সুখে আগুনে হাত পা গরম করিতে লাগিল। কত গল্প গুজব চলিতে লাগিল। আনন্দে উৎসাহে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। তখনও রাত্রি প্রভাত হইল না।

যখন পূর্ব্বদিক নবীন রাগে রঞ্জিত হইবার আভাষ পাওয়া গেল, তখন আমি দীঘীর ঘাটে গেলাম; পূর্ব্বদিবসই আমার ছোট দিদি আমার জন্য দূর্ব্বা বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। আমি তাহা হাতে করিয়া ঘাটে গিয়া কাক ও বককে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে জল দিতে লাগিলাম।

কাকে না ছুঁইতে বকে না ছুঁইতে
ছুঁইলাম ছুঁইলাম দূর্ব্বার আগে
দূর্ব্বা সরস্বতী কিবর মাগে
আইবর ভাইবর বিয়ার বর মাগে।

এইমন্ত্র বলিতে বলিতে জল নাড়িতে লাগিলাম ও পরে দূর্ব্বাজলে ফেলিয়া চলিয়া আসিলাম। নিত্য নূতন নূতন দূর্ব্বা বাঁধিতে হইত। কাক ও বককে জল দিয়া পরে ফল ভাসাইতে হইত। সাত দিনে সাত প্রকার ফল। ফল ভাসাইবার মন্ত্রও এইরূপ:—

"সুশীলা আইতে সুশীলা যাইতে, কইও চিত্র গুপ্তের মায়ে বার বছর পরে ফলটা পাঠাইয়া দেয়।"

ব্রতের প্রথম সাত দিন আমি নিরামিষ আহার করিলাম। অষ্টম দিনে ভেরুয়া (ভেলা) প্রস্তুত করিয়া তাহা পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করিয়া যখন বাড়ীর ঘাটে ভাসাইতে যাইতাম, তখন কত খেলার সাথী আসিয়া জুটিত। বড় সুখে ভেলা নিয়া ঘাটে ভাসাইতাম। সে শৈশব স্মৃতি কত মধুর।

ইতিমধ্যে বাড়ীর প্রাঙ্গনে পঞ্চবর্ণ চূর্ণদিয়া কত চিত্র বিচিত্র মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া যাইত। মধ্যে গোলাকার মণ্ডল আঁকিয়া তাহার পূর্ব্বদিকে সূর্য্য, পশ্চিমে চন্দ্র, অঙ্কিত হইত; বামে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে উদয় আঁকিয়া তাহার পূর্ব্বে সূর্য্য পশ্চিমে চন্দ্র, তাহার পার্শ্বে একটী পুষ্করিণী—পাড়ে একটী পাখী জল পান করিতেছে, একখানি খাট, দোলা, ত্রিকোণা পৃথিবী, এক জোড়া মখড়, পান গুপারীর গাছ পানের বাটা, শাটী, হস্তী, অশ্ব, ছত্র, পত্রিকা, পুঁথি, দর্পণ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনিয় দ্রব্য অঙ্কিত করিয়া একটী তুলসী পত্রদ্বারা স্পর্শ করিয়া পূজাকরিতে হয়। এইগুলি সবই ভবিষ্যতে সংসার পাতিবার আসবাব পত্র। এগুলিকে পূজিবার মন্ত্র এইরূপ:—

প্রথম—মণ্ডল স্পর্শ করিয়া :—

মাধ মণ্ডল সোণার কুণ্ডল বাপ রাজা ভাই প্রজা
মা পাটেশ্বরী আপনি বিদ্যাধরী
থালে ভাত ভৃঙ্গারে পাণি—জন্মে জন্মে এয়োরাণী।

(চাঁদে হাত দিয়া)—চান্দ পূজি চন্দনে

(সূর্য্যে হাত দিয়া) সুরুজ পূজি বন্দনে, চাঁদ পূজিয়া ঘরে যাই,
সুরুজ পূজিয়া ঘি ভাত খাই।
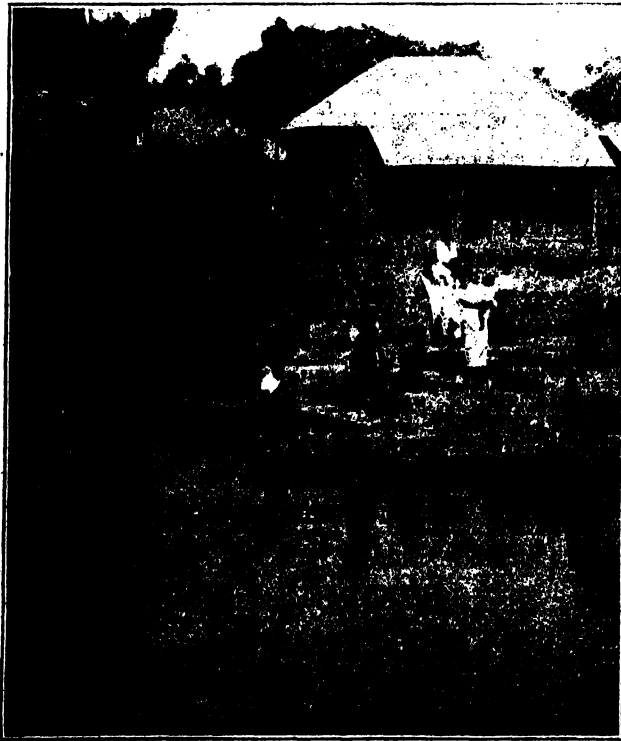
পুকুর ঘাটে ভেরুয়া ভাসান।

(উদয়ে হাত দিয়া)—উঠ উঠ ললিতা সোহাগের ঝলিতা
ঘৃত—ভাত কর্পূর হাত
মুই পূজি উদয় হাত।

(ঘাটে হাত দিয়া)—ঘাটে আইলাম ঘাটে গেলাম
বাপের বাড়ী গিয়া দুধ ভাত খাইলাম।

পুষ্করিণী—মামায় দিল পুষ্করিণী ভাগিনায় দিল পাড়
সোয়া পাখী পাণি খায় দেখরে সংসার।

পান—পান গঙ্গাজল গুয়া ঋষি ফল
তারে খাইয়া বর্ত্তী বইনে বর্ত্ত কর।

আমি পূজি গুঁড়ির শাড়ী আমার লাগিয়া আইব
পাটের শাড়ী

আমি পূজি গুঁড়ির আয়না " " " আভের আয়না
" " কটুয়া " " " কাঠের কটুয়া
" " কাঁকই " " " হাড়ের কাঁকই
" " মচকা " " " কাঠের মচকা
" " শাঁখা " " " শঙ্খের শাখা

খড়মে—পুষ্কড়মে দিয়া পাও সুস্বামীর ঘরে চলে
যাও।

পাঁজি—পাঁজি পুঁথি পাঁজিশ্বর, বাপ ভাই লক্ষেশ্বর॥

ত্রিকোণা—তিন কোণা পৃথিবী যায় ভাসিয়া
মুই বর্ত্তীর বর্ত্ত করি সিংহাসনে বসিয়া।

কুরাল :—ওরে ওরে কুরাল ডালে তোর বাসা
খালে তোর আশা
মুই বর্ত্তী গুঁড়ি খাইতে তোর বড় আশা

তালগাছ—তাল পূজি তালেশ্বর
বাপ ভাই লক্ষেশ্বর।

ঘোড়া—উতল ঘোড়া নকল ঘোড়া
ষোল ভাইয়ের ষোল ঘোড়া
তেল কলসী হাতে ঘি কলসী মাথে
প্রথম পুতে করে কাজ
প্রথম বউ ভোগে রাজ
অন্ত কালে শ্রী কৈলাশ।

মণ্ডল পূজিয়া গুঁড়িগুলি একত্র করিয়া রাখিতাম। ইহার পর সূর্য্যোদয় হইলে আবার পুকুর ঘাটে যাইয়া সূর্য্য প্রণাম করিয়া সূর্য্যকে অন্য এক গুচ্ছ দূর্ব্বা দ্বারা জল দিতে হইত। তাহার মন্ত্র এইরূপ :—

লও সূর্য্যাই লও তোমার পাণি
লেখিয়া জুখিয়া ছয় কুড়ি পাণি
ছয় কুড়ি পাণির মধ্যে এক কুড়ি উনা
উনা দোনা ভরিয়া দিলাম মেঘের কাণের সোণা।
মেঘের কাণের সোণা নারে নাড়িয়া পিত্তল
ধাক্কা দিয়া ফালাইয়া দিলাম বাড়ীর ভিতর ?
বাড়ীর ভিতর নারে আড়ু গাড়ু পাণি
তাতেকা দিয়া আইলাম সূর্য্যের পাণি।

সুরুজ ঠাকুর সুরুজ ঠাকুর দিয়া যাও বর
বাপ ভাই হউক লক্ষেশ্বর।

সাত দিন অন্তর ভেরুয়া ভাসাইবার রীতি। ভেরুয়ার সঙ্গে মণ্ডলের সঞ্চিত চূর্ণগুলি ও প্রতিদিনের ৭ গুচ্ছ দুর্ব্বা দিতে হয়। ভেরুয়া ভাসাইয়া স্নান করিতে হয়। ৮ম দিনে সন্ধ্যার পূর্ব্বে খাইয়া উদয়ের ও নক্ষত্রের পূজা করিতে হয়। সাত দিনের সাত নক্ষত্র ও সাত উদয় পশ্চিম দিকে আঁকিয়া পূজিতে হয়।

মন্ত্র এইরূপ :—

প্রাঙ্গনে মণ্ডল।

উদয় পূজি অর্থ না জানি
সন্ধ্যা হইলে ভাত না খাই
গোয়ালে গাই-গরু বাঁধি
ঘৃত—ভাত কর্পূর হাত
মুই পূজি উদয় হাত।
(চাঁদে হাত দিয়া) চান্দ পূজি চন্দনে
(সূর্য্যে হাত দিয়া) সুরুজ পূজি বন্দনে।

নক্ষত্রে হাত দিয়া :—

ওরে ওরে তারা তুই মোর সাক্ষী ঘৃত মাখি পঞ্চ গ্রাসী
এই ঘরে কে জাগে তারা বালি দু ভইন জাগে
জাগে বালি মাগে বর খুঁজিয়া লইলাম বিয়ার বর।
শান্তাশান্তি বাড় ভাতন্তি মাইল পুতন্তি
তারা পূজিয়া ঘরে যাই যে বর মাগি সেই বর পাই।

এই দিন রাত্রিতে আহার নিষেধ। এমন কি ঘরের বাহির হইতেও পিসিমা নিষেধ করিলেন, পাছে নক্ষত্র দেখিয়া ফেলি।

মাঘ মাসের শীতে প্রতি দিন ভোরে উঠিয়া স্নান করিতাম ও ব্রত করিতাম। মাঘের সংক্রান্তি দিন উঠানে বৃহৎ মণ্ডল আঁকা হইল। ব্রাহ্মণ আসিয়া পূজা করিয়া গেলেন তারপর ভেরুয়া ভাসাইতে চলিলাম। গ্রামের ছেলে বুড়া সকলে আসিয়া পুকুর পাড় বেড়াও করিয়া দাঁড়াইল। আমি ভেরুয়া ভাসান হইয়া গেলে বাড়ী আসিয়া সেই অঙ্কিত মণ্ডলের মধ্যস্থলে একটা পাইলের উপর বসিলাম। আমার ছোট ভাই বোন ও সমবয়সীরা আমার চতুর্দ্দিকে সমবেত হইল। আমি একটা ছাতি ধরিয়া ঘুরাইতে লাগিলাম; তখন আমার ছোট ভাই পুটু আমার মাথায় খৈ ও দুধের "লাড়ু" ঢালিতে লাগিলে যেন চতুর্দ্দিকে লাড়ু ও খৈ বৃষ্টি হইতে লাগিল। সকলে লাড়ুগুলি তুলিয়া মুখে দিতে লাগিল। তারপর মণ্ডপে বসিয়া সকলকে লইয়া দধি-চিড়া ভক্ষণ করিলাম। এইরূপে চারি বৎসর করিয়া এই ব্রত প্রতিষ্ঠা করিলাম। এক বৎসর করিয়া ব্রত প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে।

এখনও আমাদের পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের অনেক পরিবারের মেয়েরা এই সকল ব্রত করিয়া থাকে।

শ্রীমতী———————দাসী।

———

শুভ-দৃষ্টি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

৩

আমি ক্রমে সঙ্কোচ ভাব অনেক পরিমাণে কমাইতেছি দেখিয়া ও বুঝিয়া চণ্ডী বাবু ও তাঁহার গৃহিণী যেন আমাকে আরও একটু অধিক আপনার করিয়া লইলেন।

শৈবাল ও এখন, যখন তখন আসিয়া অন্যান্য ছেলে-পেলেদের ন্যায় আমার আঙ্গুল মসকাইত, পিঠে হাত বুলাইত, মাথা আঁচড়াইত, সময় সময় ইহা অপেক্ষা আরও একটু অতিরিক্ত মাত্রায় উপদ্রব করিত। আমি নিঃসঙ্কোচে সে সকল অত্যাচার সহ্য করিতাম। সময় সময় চণ্ডীবাবু ও তাঁহার গৃহিণী তাহা দেখিতেন; কিন্তু কোন কিছু বলিতেন না। আমি মনে মনে স্মরণ করিতাম—"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি"।

৪ঠা মাঘ রবিবার। প্রাতঃকালে বড়ই বিরক্তি বোধ করিলাম। গত কল্য ভয়ানক অসুখ হইয়াছিল। সমস্ত দিন লঙ্ঘন, আফিসেও যাই নাই। চণ্ডীবাবু ও তাঁহার গৃহিণী শৈবালকে আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমার একান্ত নিষেধ সত্ত্বেও শৈবাল সারাদিন রাত আমার সুখ সাচ্ছন্দ্য বিধানের চেষ্টা করিতেছে। শৈবালের পরিচর্য্যায় রাত্রিতে আমার বেশ সুনিদ্রা হইয়াছিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি, শৈবাল আমার শয্যা পার্শ্বে নিদ্রিতা! ইহাতে মনে বড়ই বিরক্তি বোধ হইল। চণ্ডীবাবুর নিকট এই বিষয় উত্থাপন করিয়া প্রতিবাদ করিলাম। চণ্ডীবাবু অন্যান্য বাজে কথা উত্থাপন করিয়া আমার উত্থাপিত কথায় একেবারেই কর্ণপাত করিলেননা। তাঁহার এইরূপ ব্যবহারে আমি নিজকে ঘোরতর মায়া-জালে বেষ্টিত বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম। যাহা হউক, সময়ে আমি ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিব বলিয়া স্থির করিলাম এবং নিজের আভ্যন্তরীণ ভাবগুলির প্রতি একটু সতর্ক দৃষ্টি গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হইলাম।

দ্বিপ্রহরে আহার ও বিশ্রামের পর চণ্ডীবাবুর খাস কামরায় যাইয়া দেখি, তিনি স্ত্রী ও কন্যা লইয়া ভাগবতের স্থান বিশেষের ব্যাখ্যা করিতেছেন। আমি যাইয়া এক খানা পৃথক আসনে উপবেশন করিলাম। ব্যাখ্যা ও পাঠ চলিতে লাগিল। ভাগবতের কৃষ্ণলীলার প্রতি আমার তেমন শ্রদ্ধা ছিলনা। বলিতে কি, স্ত্রী-কন্যার সহিত একত্র উপবেশন করিয়া ভাগবতের ঐ সকল অংশ পাঠ করিতেছেন দেখিয়া আমি একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলাম। এই সময় চণ্ডীবাবুর স্ত্রী কার্য্য কারণে প্রকোষ্ঠান্তরে গেলেন। আমি চণ্ডীবাবুর নিকট ধীরভাবে কৃষ্ণলীলার প্রতি আমার বক্তব্য বলিলাম।

চণ্ডীবাবু ঈষৎ হাস্য করিয়া আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। তাঁহার চাহনির ভিতর অমায়িকতা ও সহানুভূতির চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকিলেও, আমার বুক দুর্ দুর্ করিয়া কম্পিত হইতে লাগিল। মনে হইল যেন আমি কোন অন্যায় বিষয়ের অবতারণা করিয়া ফেলিয়াছি, জ্ঞান বৃদ্ধ এবং বয়োবৃদ্ধের প্রতি অবজ্ঞা করিয়াছি।

চণ্ডীবাবু আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি তাঁহার দিকে তাকাইয়া আর কোন কথা বলিতে পারিলাম না। নীরবে রহিলাম। এই সময় শৈবালও উঠিয়া তাহার মাতার অনুসরণ করিল। আমি অবসর বুঝিয়া বলিলাম কৃষ্ণলীলা আমাদের মনে যে সকল অসংযত ভাব প্রকটিত করে, এইরূপ ভাবের অধিক বিস্তৃতি বোধ হয় সমাজের পক্ষে কল্যাণ কর নহে।

চণ্ডীবাবু যেন একটু বিরক্তির ভাবে বলিলেন—তোমাদের ন্যায় যাঁহারা রুচি বাগীশ—জগতের কোন কিছুই তাঁহারা সুনজরে দেখিতে পারেন না। চণ্ডীবাবুর ভাব বুঝিয়া আমি নীরব হইয়া রহিলাম।

চণ্ডীবাবু বলিতে লাগিলেন—ভগবৎভক্তি ও ভগবৎ-প্রেমের বিকাশ জগতে আর কোন গ্রন্থেই এত দেখিতে পাওয়া যায়না। কিন্তু তোমাদের ন্যায় সুরুচি বাগীশ দিগের চক্ষে কিনা তাহা মহা অশ্লীল। যাই হউক, মেয়েরা যখন চলিয়া গিয়াছে, তখন আর শান্তিভঙ্গের কোন আশঙ্কা নাই। চল আমরা আজ সুরুচির মাপকাঠি ধরিয়া দেখি ভাগবতে কি পরিমাণ কুরুচি আছে।

চণ্ডীবাবু পুস্তক খুলিয়া বলিতে লাগিলেন—"এই 'বন বিহার' অধ্যায় ভাগবতের এক নম্বর কুরুচি। তুমিও

অবশ্যই সেই অধ্যায়টীর কথাই মনে করিতেছ। যাহা হউক, মনে করিয়া লও যে গোপীগণ কামভাবেই কৃষ্ণকে পাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ কি তাহাদের এই কার্য্যে—উচ্ছৃঙ্খল ও যদি বল—অনুমোদন করিয়াছিলেন? কৃষ্ণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত গোপীগণের মনোভাব বুঝিতে না পারিয়াছিলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে সদোপদেশ প্রদান করিতে ক্রটী করেন নাই। সে উপদেশ অমূল্য। হিন্দুর সাহিত্য ব্যতীত অন্য কোন জাতির সাহিত্যে এইরূপ উপদেশ নাই; থাকিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ বনমধ্যে বিহার করিতেছেন, গোপীগণ তাঁহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতেছেন না। তখন কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ ভ্রাতরঃ পতয়শ্চৈব।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মাকধবং বন্ধু সাধ্বসং॥

*　　*　　*　　*

"দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধোজড়ো রোগ্যধনোপিবা।
পতি স্ত্রীভির্নহাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী॥

*　　*　　*　　*

"অস্বর্গময় শস্যঞ্চ ফল্গুকৃচ্ছ্রং ভয়াবহং।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হোপপতং কুলস্ত্রিয়াঃ॥"

ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রী-ধর্ম্ম বুঝাইতেছেন—

"ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরোধর্ম্মোহ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধুনাঞ্চ কল্যাণ্যং প্রজানাং চানুপোষণং॥"

এগুলি কি লম্পটের প্রলোভন?

তারপর দেখাযাক গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের এবম্বিধ উক্তির পর কি বলিলেন? তাঁহারা বলিলেন—

চণ্ডীবাবু আত্মহারা হইয়া বাঙ্গালাতেই বুঝাইতে লাগিলেন—

"হে ভগবান! পতি, পুত্র, সুহৃৎদিগের সেবা পরিচর্য্যা যে তুমি স্ত্রীধর্ম্ম বলিয়া বলিতেছ, তোমার ঐ উপদেশ বাক্য তোমাতেই থাকুক। আমরা বুঝিয়াছি, তুমি ঈশ্বর, তুমি আত্মারূপে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছ। কে কাহার পতি, কে কাহার বান্ধব, কেই বা পুত্র।"

চণ্ডীবাবু এইমাত্র বুঝাইয়াই বলিলেন—এখন মনে ভাব দেখি, এই সকল উক্তিকে কি লম্পটের উপদেশ ও অভিসারিকাগণের উক্তি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে? চণ্ডীবাবু আরও অনেক কথা বুঝাইয়া ছিলেন।

চণ্ডীবাবুর বুঝাইবার ভঙ্গিতে ও বিষয়ের গুরুত্বে আমার মন আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছিল। আমি লজ্জিত হইলাম।

চণ্ডীবাবু বলিতে লাগিলেন—গোপীদিগের এই ভাবকে ভক্তেরা বলিবে—"প্রেমোন্মত্ততা", তত্ত্বদর্শীরা বলিবে "ভগবানে তন্ময়তা", আর নিকৃষ্টশ্রেণীর কামুকেরা বলিবে—লাম্পট্য বা কামোন্মত্ততা। রুচি বাগীশেরা শুনিবেওনা, পড়িবেওনা—তাহাদের শ্লীলতায় আঘাত লাগিবে ভয়ে　　*　　*　　*

আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম—আমার নিকট বেশ ভাল লাগিতেছে, বলুন তারপর কি হইল?

চণ্ডীবাবু পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে সংক্ষেপে বলিতে লাগিলেন—অন্তর্য্যামী ভগবান যখন বুঝিলেন, গোপীগণের সাধনা পূর্ণ হইয়াছে, তখন তিনি সকলেরই অন্তরে প্রবেশ করিলেন অর্থাৎ তখন গোপীগণ ভগবানকে অন্তরে অনুভব করিল। তাঁহার সহিত মনে মনে রমণ সুখ লাভ করিতে লাগিল।

কত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবত্যো গোপ যোষিত।
ররাম ভগবাংস্তাভিরাত্মা রামোহপি লীলয়া॥

ভগবান ভক্তের হৃদয়ে যে ভাবে লীলা খেলা করেন অথবা ভক্ত যে ভাবে আত্ম হৃদয়ে ভগবানের চিন্ময় মূর্ত্তি গঠিত করিয়া তাহার প্রতি হৃদয় মন সমর্পণ করে, তাহা ভক্ত ভিন্ন অন্যের পক্ষে ধারণা করা কঠিন। অন্যের পক্ষে সে "ররাম লীলয়া" অশ্লীলতার একশেষ।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি টীকাকারগণ বলিয়াছেন, ভগবান ঠিক অগ্নির ন্যায়। অগ্নির নিকট যেমন ভাল মন্দ বিচার নাই, মিত্র অমিত্র জ্ঞান নাই, সকলকেই দগ্ধ করিয়া রূপান্তরিত করিয়া ফেলে, ভগবান ও ঠিক সেইরূপ—তাহাতে আত্ম সমর্পণ কর, তোমার তুমিত্ব ভাব থাকিবেনা।

ভগবান গোপীদিগকেও তাহাই বলিতেছেন—

"নময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতাঃ কর্ত্তিতা ধান্যা প্রায়োবীজায় নেশতে॥"

অর্থাৎ ভর্জ্জিত ও সিদ্ধ ধান্যের যেমন শক্তি দগ্ধ হইয়া

যায়, তদ্রূপ আমাতে যাহাদের বুদ্ধি সমর্পিত হইয়াছে, তাহার কাম আর কাম-ভোগের (সংসার বন্ধনের) নিমিত্ত নহে।

গীতাতেও ভগবান তাহাই বুঝাইয়াছেন—

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।"

চণ্ডী বাবু এই পর্য্যন্ত বুঝাইয়া বলিলেন—"যাই হউক, এই সকল বিষয় যার যে প্রকার বিশ্বাস, তৎসম্বন্ধে সে সেই প্রকার ভাব মনে পোষণ করিয়া থাকে। ভাগবতের এক স্থানে আছে, শ্রীকৃষ্ণ কংসালয়ে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে মল্লগণ বজ্রের ন্যায়, সাধারণ লোক রাজার ন্যায়, স্ত্রীগণ কামদেবের ন্যায়, গোপগণ আত্মীয়ের ন্যায়, অসাধুগণ প্রচণ্ড শাসন কর্ত্তার ন্যায়, বাসুদেব ও দৈবকী নিজ পুত্রের ন্যায়, কংস যমের ন্যায়—দর্শন করিতে লাগিলেন। যাহারা মূর্খ তাহারা কৃষ্ণকে জড়ের ন্যায়, যোগিগণ পরম তত্ত্বজ্ঞের ন্যায়, যদু বংশীয়েরা পরম দেবতার ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ যাহার মন যেমন, তিনি কৃষ্ণকে ঠিক তেমন দর্শন করিতে লাগিলেন। তুমিও তত্ত্বদর্শী হইয়া যদি কৃষ্ণলীলা দেখিতে চাও, দেখিবে কৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম—আর যদি আদিরস প্রিয় কবির বর্ণনা পাঠ করিয়া ও আর্ট ষ্টুডিওর চিত্র দর্শন করিয়া কৃষ্ণলীলা বুঝিতে চাও——দেখিবে——যাক। আজ আর সময় নাই।" বলিয়া চণ্ডী বাবু ভাগবত বন্ধ করিলেন।

দেখিলাম আমার কুতর্কেই আজ আমাদিগের এই বরিবাসরিক ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ক্রিয়া অঙ্গহীন হইয়া গেল। নিজ কৃত-কর্ম্মের জন্য মনে মনে বড়ই অনুশোচনা হইল। আমি চণ্ডী বাবুকে বলিলাম, বস্ত্র হরণ ব্যাপারটা তবে কি কোন আদিরসের কবির উদ্ভট বর্ণনা, না তাহার ভিতর সত্য আছে? চণ্ডী বাবু বলিলেন—কৃষ্ণলীলা সত্য কি মিথ্যা, এস্থানে আমরা তাহার কিছুই বিচার করিতেছিনা আমাদের বিচার্য্য বিষয়ও তাহা নহে। কৃষ্ণ ভগবান ছিলেন কি মানুষ ছিলেন আমাদের সে সত্যানুসন্ধানের কোন প্রয়োজনও নাই। ভগবানের নাম করিয়া প্রাচীন ঋষিগণ যে ভগবৎ-ভক্তি প্রচার করিয়াছেন, তাহাকে যদি সাত্বিক ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে ও তাহা দ্বারা বিষয়াসক্ত মনকে একটু ভগবানের চিন্তায় নিরত করা যাইতে পারে, তবে এই আলোচনায় ইহাই যথেষ্ট।" বস্ত্র হরণে যদি ভগবৎ প্রেমের উচ্চভাব থাকে, তবে তাহা উপেক্ষনীয় হইবে কেন?

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈকং সৌহৃদ্যমেবচ।
নিত্যং হরৌ বিদ ধতো যান্তি তন্ময়তাং হিতে॥

যাহারা এ সকল বৃত্তির কোন একটীও ভগবানে অর্পণ করিতে পারে, তাহারা ঈশ্বরত্ব (তন্ময়ত্ব) প্রাপ্ত হয়। গোপীগণ কৃষ্ণে কাম সমর্পণ করিয়া, শিশুপালাদি ক্রোধ, কংসাদি ভয়, পাণ্ডবগণ স্নেহ, তত্ত্বদর্শী যোগিগণ জীব ব্রহ্মের ঐক্য সাধন ও ঋষিগণ সৌহৃদ্য করিয়া মুক্তি লাভ করিয়া গিয়াছিলেন। ভগবানের নিকট সু কু নাই।

কবি—দেশ কাল পাত্র বিচার করিয়া কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। আদি রসের রসিক কবির হস্তে পড়িয়া এই গোপীগণের কাম সমর্পণই "বস্ত্র হরণ' রূপে চিত্রিত হইয়াছে। কামুক লম্পট তাহা পাঠ করিয়া চরিতার্থতা লাভ করে, জ্ঞানিগণ তাহা পাঠ করিয়া তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করেন, আর রুচি বাগীশগণ তাহার নাম শুনিয়া ঘৃণায় লজ্জায় ভ্রূকুটী করেন। তবে এই পর্য্যন্ত মনে করাই ভাল—যে "কৃষ্ণ কেমন? না যার মনে যেমন।"

* * * *

অপরাহ্ণ ৪½ ঘটিকা। চণ্ডী বাবুর সহিত বুড়ী গঙ্গার তীরে সান্ধ্য ভ্রমণ করিতেছিলাম। চণ্ডী বাবু সেই ভাগবতের কথার আলোচনা করিয়া অবশেষে বলিলেন— 'দেখ যোগেশ, তুমি পবিত্র হও, জগৎ তোমার নিকট ততোধিক পবিত্র বলিয়া বোধ হইবে। তুমি অপবিত্র হও, জগতের প্রতি পদার্থ তোমার নিকট ততোধিক অপবিত্র বোধ হইবে। তুমি আজ প্রাতে আমার নিকট যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলে, কেন বল দেখি তোমার মনে এ অভিযোগের প্রয়োজন উপস্থিত হইল? তুমি যদি সৎ হও, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তোমাকে টলাইতে পারিবেনা, ইহা মনে রাখিও। রাজ পথে মণি মুক্তা পড়িয়া থাক, সাধু তাহার প্রতি দৃকপাতও করিবেনা। অসাধু তাহা দেখিয়া চমকিয়া উঠিবে।"

চণ্ডী বাবুর উপদেশ সারবান হইলেও ইহার বিরুদ্ধে বলিবার অনেক ছিল। আমি আজ সাহস করিয়া তাহা

বলিলাম না। চণ্ডী বাবু অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন,—"যোগেশ! আর এক কথা, আমাদের দেশে যাহারা একান্ত রুচি বাগীশ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় তাহাদের মধ্যে অনেকেই সমাজের অধঃপতনের মূল ও কুকাণ্ডের অগ্রদুত।" আমরা কথায় কথায় আসিয়া সমাজের মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। চণ্ডী বাবু সমাজে গেলেন। আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

বৈশাখ মাসে আমরা ঢাকা ছাড়িয়া শিলং আসিয়াছি। চণ্ডীবাবু, তাঁহার পত্নী ও শৈবালের কথা সর্ব্বদাই মনে পড়িতে লাগিল।

যে সময় হইতে শৈবালের উচ্ছৃঙ্খল ভাব আমাকে নিজ আভ্যন্তরীণ ভাব নিচয়ের প্রতি সতর্ক যত্ন লইতে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল, তাহার পর হইতে বাস্তবিক আমি একটু একটু করিয়া সাবধান হইতেছিলাম এবং সময়ের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে আরও একটু অধিকতর মনোযোগী হইয়াছিলাম। প্রাতঃকালে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়াই কোঠার দরজাটী বন্ধ করিয়া গ্রন্থপাঠে নিযুক্ত হইতাম। ৯টায় উঠিয়া স্নানাহার করিয়া আফিসে যাইতাম। বৈকালেও যতক্ষণ প্রয়োজন মনে করিতাম নিঃসঙ্গ বসিয়া গ্রন্থপাঠ করিতাম! সন্ধ্যায় চণ্ডীবাবু আসিলে শৈবালের সঙ্গীতে মনোনিবেশ করিতাম।

আমার এই মনোযোগ ও আত্মরক্ষার চেষ্টা অল্পে অল্পে অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তাই চণ্ডীবাবু প্রভৃতির দৃষ্টিতে তাহা বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় হইয়া উঠে নাই।

এখানে আসিয়া প্রাতঃকালে গীতা প্রভৃতি পাঠ করিতাম। অপরাহ্ণে শিলংএর অভ্রভেদী শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া পৃথিবীর নগ্ন সৌন্দর্য্য দেখিয়া পুলকিত হইতাম। সন্ধ্যার পর যখন অবসন্ন প্রাণে গৃহে ফিরিতাম, তখন শৈবালের সঙ্গীত ধ্বনি যেন কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত। তখন আকুলভাবে হারমোনিয়াম সাহায্যে সেই প্রিয় সঙ্গীতটী গাইতাম।

"আমার সাধ না মিটিলই আশা না পূরিল"—

শিলং আসিয়া প্রথম প্রথম চণ্ডীবাবুর ২।১ খানা চিঠি পাইয়াছিলাম। শৈবাল সর্ব্বদাই লিখিত। আমি কখনও কাহার চিঠি পত্রের উত্তর দিতাম না চিঠি পত্র ব্যবহারও একপ্রকার বন্ধ। আমি সে বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক ছিলাম না।

অবস্থা বুঝিয়া চণ্ডীবাবু চিঠিপত্র লিখা বন্ধ করিয়া দিলেন। শৈবালের চিঠি বন্ধ হইল না। সে রীতিমত লিখিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার বহু চিঠি খামের ভিতরই নিবদ্ধ থাকিত; খুলিয়া পড়িবার অবসর হইত না। দুই একখানা কদাচিৎ খুলিয়া পাঠ করিতাম। তাহার ভাষা সংযত, ভাব উচ্চ। চিঠিগুলি মন্দ লাগিত না; তথাপি কিন্তু সে চিঠি পত্রের অধিক আদর আমার নিকট ছিল না।

শিলংএর দিনগুলি এমনি ভাবে কর্ত্তিত হইয়া যাইতে ছিল।

১২ই শ্রাবণ। চণ্ডীবাবুর রেজেষ্টরী করা চিঠি পাইলাম। তাঁহার নিকট আমি চিঠিপত্র লিখা বন্ধ করিয়া দিয়াছি, তাই তিনি তাহার এই প্রয়োজনীয় চিঠিখানা রেজেষ্টরি করিয়া পাঠাইয়াছেন। চিঠিখানা রেজেষ্টরী করা, তাই বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিলাম। শৈবালের বিবাহে আমাকে উপস্থিত থাকিতে চণ্ডীবাবু অনুরোধ করিয়াছেন।

২৫শে শ্রাবণ। দাসত্ব-শৃঙ্খল — গুরুতর শৃঙ্খল। তার পর শিলং হইতে নামিয়া যাওয়াও সামান্য কথা নহে—ইচ্ছা করিলেও তাহা হয় না। শৈবালের বিবাহে উপস্থিত থাকিতে যথেষ্ট যত্ন করিলাম—পারিলাম না। অন্য ছুটীর দরখাস্ত অগ্রাহ্য হওয়ায়—চণ্ডীবাবুর পত্রের জবাব দিলাম। পত্রে নবদম্পতীর প্রতি আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলাম এবং শুভকার্য্য সুসমাপ্তির জন্য ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিলাম। (ক্রমশঃ)

গ্রন্থ-সমালোচনা।

মেয়েলি ব্রত কথা—শ্রীযুক্ত পরমেশ প্রসন্ন রায় বি. এ. প্রণীত। প্রকাশক-আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

গ্রন্থে ঢাকা জেলার প্রচলিত মেয়েলি ব্রতের কথা সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এই শ্রেণীর গ্রন্থ যত

প্রকাশিত হয় ততই মঙ্গল। এগুলি আমাদের জাতীয় সমাজ-ইতিহাসের ধ্বংসাবশেষ, কত যুগ যুগান্তরের সাক্ষী তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এই ব্রতকথাগুলির ভিতর আমরা হিন্দু রমণীর একখানা অপূর্ব্ব-চিত্র দেখিতে পাই। গার্হস্থ্য জীবনের উপর এই ব্রতকথা গুলি একটা অসীম শক্তি বিস্তার করিয়াছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার খর স্রোতে, ভোগ বিলাসের প্রবল বন্যায় আমাদের অন্তপুর হইতে সে সংযম, আচার, নিষ্ঠা সব ধীরে ধীরে ভাসিয়া চলিয়াছে। এসময় যিনি অতীতের তিমির গর্ভে প্রবেশ করিয়া লুপ্ত প্রায় রত্নগুলির সারোদ্ধার করিয়াছেন এবং ঐ সকল রত্ন সুনিপুণ হস্তে গাথিয়া মাতৃভাষার কণ্ঠে উপহার প্রদান করিয়াছেন, তিনি ধন্যবাদের পাত্র। গ্রন্থকারের গল্প বলিবার ক্ষমতা আছে। ছবি ও চিত্রে গ্রন্থখানি বেশ হইয়াছে। বাঁধাই সুন্দর

সুভদ্রা—শ্রীযুক্তবরদাকান্ত মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা মূল্য এক টাকা।

এইগ্রন্থ প্রকাশে প্রকাশক মহাশয় অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। গ্রন্থের চিত্রগুলি বিলাত হইতে ছাপাইয়া আনিয়াছেন ও গ্রন্থখানি তিন কালিতে ছাপাইয়াছেন। এরূপ চারু মুদ্রন বড় দেখা যায় না। গ্রন্থকার সুভদ্রার চিত্রও বেশ নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। গ্রন্থে তিনখানি ত্রিবর্ণ-চিত্র ও দুই খানা অন্য ছবি আছে। গ্রন্থ-সিল্কে বাঁধাই।

আদর্শ নারী চরিতঃ—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ, ও শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় প্রণীত। মূল্য ১৷৹ এখানি সচিত্র গ্রন্থ। প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী; কলিকাতা। আমরা পুস্তক খানি দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়েরই আদর্শ রমণীগণের চিত্র একত্র গ্রথিত হইয়াছে। আমাদের এই নৈতিক অধঃপতনের দিনে এরূপ গ্রন্থের প্রচার শুভ। দুঃখ ও দৈন্য পীড়িত বাঙ্গালির হৃদয় জুড়াইবার একটী মাত্র স্থান অন্তঃপুর, তাহাও ঐহিক ভোগ বাসনারই কাম্যবস্তু হইয়া উঠিয়াছে। আধ্যাত্মিক শিক্ষার অভাবেই এই অবনতি। এ গ্রন্থের আদর্শ চরিত্র গুলি রমণী সমাজের বহু উপকার সাধন করিবে। গ্রন্থের ভাষা সরল ও চিত্তাকর্ষক। ছাপা সুন্দর। আমরা এরূপ গ্রন্থের সর্ব্বদাই অভিনন্দন করি।

বিদ্যাসাগর—শ্রীঅমূল্য কৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত, মূল্য৶৹ আনা। কলিকাতা ব্রাহ্মমিশন প্রেসে মুদ্রিত। পুস্তক খানার ছাপাই, কাগজ উৎকৃষ্ট। বিদ্যাসাগর, তাঁহার জনক, ও জননী এই তিন জনের তিন খানি হাফটোন্ চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আকারে আরও কয়েক খানি প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও,আলোচ্য গ্রন্থখানি মহাপুরুষের পবিত্র জীবনের সংক্ষিপ্ত পুণ্য কাহিনী বলিয়া আমরা সাগ্রহে পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বৈচিত্র্যময় জীবনের এক একটী আখ্যায়িকা এরূপ সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর ভাবে গ্রথিত করা হইয়াছে যে, তাহা উজ্জ্বলে মধুরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থখানি শিশুদিগের উপযোগী প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। আশা করি গৃহে গৃহে পুস্তকখানি সমাদৃত হইবে।

মৃত্যুর স্বরূপ।

নগরে লেগেছে মারী ;—চারিদিকে ত্রাস।
মৃত্যু ফিরে লোকালয়ে করি অট্টহাস !
থেমে গেছে হাসি-গান,—চলেছে সমানে
মৃত লয়ে শোভা-যাত্রা শ্মশানের পানে !
মৈত্র মহাশয় বাঁধি জিনিষ পত্তর
স্ত্রীপুত্র সহিত ত্বরা ছাড়েন নগর।
পতি পত্নী পাংশু মুখে চায় দোঁহা পানে,
অবাক্ কোলের শিশু,—মৃত্যু নাহি জানে !
করে কমণ্ডলু কাল ব্রাহ্মণের বেশে
মৈত্রে শুধালেন "কিহে, চলেছ কি দেশে ?"
মৈত্র কন শুষ্ক মুখে, "নাগো মহাশয়,
সম্প্রতি চলেছি যেথা নাহি মারীভয়।"
কাল মৃত্যু-রূপ ধরি হেসে কহে তায়—
"আমার শাসন ছাড়ি পালাবে কোথায় ?"

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ।

"যাই তবে আর কেন, চপলা বারেক হান,
একি ! একি ! দেখি ওকি—সেই মুখ খানি !
পারি না ভাবিতে আর, হা অদৃষ্ট—অভাগার,
—এই দুটী হয় যদি সেই দুটী প্রাণী।"

আশুতোষ প্রেস। (চিত্র—শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত "শৈব্যা" হইতে গৃহীত)

দ্বিতীয় বর্ষ। } ময়মনসিংহ, ফাল্গুন, ১৩২০। { পঞ্চম সংখ্যা।

বাজুর কায়স্থ সমাজ।

আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষগণ কান্যকুব্জ হইতে এদেশে আনীত হইয়াছিলেন। পাল ও সেন বংশীয়দিগের সময় এই কনোজিয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের বংশ-বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল। পালনৃপতিগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন না। তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকেই মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিতেন, ভূমি দান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতেন। বহু কায়স্থ, পালরাজগণের রাজত্বে অমাত্য পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বল্লাল সেন, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের মধ্যে নব-গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে কৌলিন্য-মর্য্যাদা প্রদান করেন। তাঁহার প্রদত্ত এই মর্য্যাদা ব্যক্তিগত ছিল, বংশগত ছিল না। কুলীনের পুত্র হইলেই কুলীন হইবে, বল্লাল এমন বিধি করেন নাই। বল্লালের দিগ্‌বিজয়ী পুত্র লক্ষ্মণ সেনের সময়ে ও গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রদত্ত হয়। লক্ষ্মণের পুত্র কেশবসেন, মুসলমানদিগের ভয়ে বরেন্দ্রভূমি পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গে আগমন করেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বঙ্গে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। কেশবসেন কাহাকেও কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রদান করেন নাই। বোধ হয় তিনি, এইরূপ মর্য্যাদা প্রদান সঙ্গত মনে করিতেন না। কেশবসেনের পৌত্র দনুজমাধব চন্দ্রদ্বীপে রাজপাট স্থাপন করিয়া তথায় এক সুনিয়মবদ্ধ কায়স্থ সমাজ স্থাপন করেন এবং স্বয়ং সেই সমাজের সমাজ-পতি। দনুজ-মাধব কেবল যে কায়স্থ সমাজেরই সমাজ-পতি ছিলেন তাহা নহে, তিনি ব্রাহ্মণ-সমাজেরও সমাজ-পতি ছিলেন। তাঁহার সভায় দুইবার কুলীনদিগের সমীকরণ হয়। এই দুই বারে ৮ জন ব্রাহ্মণ কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। দনুজমাধবের সভায় পঞ্চগোত্রের ৫৬ গ্রামীণ ৫০৮ জন ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। ইহারা কুলীন, সাধ্য শ্রোত্রীয়, সিদ্ধ শ্রোত্রীয়, সুসিদ্ধ শ্রোত্রীয় এবং কষ্ট শ্রোত্রীয় এই কয়েক ভাগে বিভক্ত হন। খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দনুজ রায়ের সভায় এই সমীকরণ হইয়াছিল।

দনুজ মাধবের সময়ে চন্দ্রদ্বীপ সমাজের কায়স্থগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন ঃ—

(১) কুলীন—ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র।

(২) মধ্যল্য—দত্ত, নাগ, নাথ দাস।

(৩) মহাপাত্র—সেন, সিংহ, দেব, রাহা।

(৪) নিম্নমহাপাত্র—কর, দাম, পালিত, চন্দ, পাল, ভদ্র, ধর, নন্দী, কুণ্ড, সোম, রক্ষিত, কুরু, বিষ্ণু, আঢ্য ও নন্দন।

এই চারি শ্রেণীর সাতাইশ বংশের আদিপুরুষগণ আদিশূরের সময়ে তিন বারে এদেশে আগমন করেন।—

১ম বারে—মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু, বিরাট গুহ, কালিদাস মিত্র, ও পুরুষোত্তম দত্ত এই ৫ জন।

২য় বারে—দেবদত্ত নাগ, চন্দ্রভানু নাথ, ও চন্দ্রচূড় দাস...এই তিন জন।

৩য় বারে—জয়ধর সেন, ভূমিঞ্জয় কর, ভূধর দাস, জয়পাল, চক্রধর পালিত, চন্দ্রধ্বজ চন্দ, রিপুঞ্জয় রাহা, বীরভদ্র ভদ্র, দণ্ডধর ধর, তেজধর নন্দী, শিখিধ্বজ দেব, বশিষ্ঠ কুণ্ড, ভদ্রবাহু সোম, বীরবাহু সিংহ, ইন্দুধর রক্ষিত, হরিবাহু কুরু, লোমপাদ বিষ্ণু, বিশ্বচেতা আঢ্য মহীধর নন্দন...এই ১৯জন।

আদিশূর এই সাতাইশ জনের বসতির জন্য ২৭ খানি গ্রাম—রাজরাট্, সপ্তপুর, রাজপুর, বটগ্রাম, মল্লপুর, পদ্মদ্বীপ, লোহিত, মল্লকোটি, লক্ষ্মীপুর, কেশিনী, কুমার. কীর্ত্তিমতী, নন্দীগ্রাম, দোগ্রাম, বাটাজোড়, স্বর্ণগ্রাম, দক্ষপুর, মাণ্ডব, মণিকোটি, ভল্লকোটি, শম্ভুকোটি, সিংহপুর, মৎস্যপুর, মেঘনাদ, ভল্লকুলি, ও সিন্ধুরাঢ়, প্রদান করেন। এই গ্রামগুলির বর্ত্তমান অবস্থান নির্ণয় সুকঠিন। তবে উহারা যে গৌড়ের নিকটবর্ত্তী ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

বলিতে গেলে চন্দ্রদ্বীপই কায়স্থগণের আদি সুব্যবস্থিত সমাজ। এই জন্যই—

"চন্দ্রদ্বীপং শিরঃস্থানং যত্র কুলীনমণ্ডলং" কথিত হইয়া থাকে। দনুজ মাধবের সময়ে অধিকাংশ কুলীন কায়স্থই চন্দ্রদ্বীপে বাস করিতেন। সেনরাজগণের সময়ে সরকার বাজুহাতে কায়স্থ সমাজ স্থাপিত হয় নাই। বোধ হয় তৎকালে এই স্থানে বৌদ্ধাচারের প্রাবল্য ছিল। এ প্রদেশে কোন হিন্দু নৃপতি—বিশেষতঃ কায়স্থ নৃপতি বা ভৌমিক তৎকালে ছিলেন না বলিয়াই এ দেশে সেই সময়ে কনোজাগত কায়স্থগণের বংশধর কেহ আগমন করেন নাই। কেবল রামচন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দুই ঘর বাজুহার অন্তর্গত আটীয়াপরগণার ভাদড়া ও দেউলি গ্রামে বসতি করিয়া ভাদড় ও দেউলি গ্রামিণ (গাঁঞী) হইয়াছিলেন।

দনুজ মাধবের পরবর্ত্তী সময়ে ও বহুকাল পর্য্যন্ত সরকার বাজুহা কায়স্থবাসের অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি পরমানন্দ বসু রায়, দনুজ মাধবের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। তাঁহার সময়ে বাজুহাতে কায়স্থ বসতি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু তখনও বাজুর বসতি প্রশংসনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। পরমানন্দ রায় নিয়ম করিয়াছিলেন—"পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র, উত্তরে ইচ্ছামতী, পশ্চিমে মধুমতী,দক্ষিণে সমুদ্র—এই চতুঃসীমার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কায়স্থগণ বাস করেন। অন্য স্থানস্থিত কায়স্থদিগকে ইতর বলা হয়।"

"সেলিমাবাদ, ফতেআবাদ, ঘোড়াঘাট, বাজুহা, তেলিহাটী, চতুর্ম্মণ্ডল, চাঁদনী, ও বেজগ্রামাদি স্থানে বাস করিলে কুলীন, কুলভ্রষ্ট হইবেন।"

"পাণ্ডব বর্জ্জিত স্থান (ব্রহ্মপুত্রনদের পূর্ব্বতীর হইতে পূর্ব্বদিগ্ বর্ত্তী স্থান সমূহ) ম্লেচ্ছাচার (বোধ হয় বৌদ্ধাচার) পূর্ণ। এই স্থানবাসিগণকে 'বাঙ্গাল' বলা হয়। বাঙ্গালের সহিত কার্য্য করিলে বঙ্গজ জাতিভ্রষ্ট হইবে।"

পরমানন্দের এই সাশনে বাজুতে কোন কায়স্থ সহজে বসতি করিতে চাহিত না। নিতান্ত বিপন্ন বা প্রলুব্ধ না হইলে কেহ বাজুতে আসিত না। এই জন্য বাজুতে কায়স্থ সমাজ স্থাপিত হইতে বহু বিলম্ব ঘটিয়াছিল। শেষ কেহ বা প্রলুব্ধ হইয়া, কেহ বা বিপন্ন হইয়া বাজুতে বাস করেন। কিন্তু ৺চন্দ্রদ্বীপের দনুজ মাধব যশোহরের প্রতাপাদিত্য বা শ্রীপুরের কেদার রায়ের মত কোন সমাজস্থাপয়িতা ভূপতি বাজুতে না থাকায় তখনও সুশৃঙ্খলরূপে সমাজ স্থাপিত হইতে পারে নাই। পলায়িত ও বিপন্নগণের অনিয়মিত সমাজ বলিয়া বাজুর সমাজ চিরদিনই বঙ্গজ কায়স্থগণের অন্যান্য সমাজের নিকট অনাদৃত রহিয়াছে।

বঙ্গ কায়স্থগণের পাঁচটি সমাজ—(১) চন্দ্রদ্বীপ, (২) যশোহর, (৩) বিক্রমপুর (৪) ফতেআবাদ (৫) বজুহা। চন্দ্রদ্বীপ সমাজের স্থাপয়িতা ও সমাজ-পতি দনুজ মাধব, যশোহর সমাজের স্থাপয়িতা ও সমাজপতি প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুর সমাজের স্থাপয়িতা ও সমাজপতি কেদার রায়, ফতেআবাদ সমাজের স্থাপয়িতা মুকুন্দ রায়। বাজু সমাজের স্থাপয়িতা বা সমাজপতি কেহ ছিল না। এক সময়ে খলসীর শ্রীবৎসরাহা বাজুর সমাজের কুলীনগণের পরিতুষ্টি-কালে গোষ্ঠীপতি পদবী পাইয়া এ সমাজের সমীকরণ ও শৃঙ্খলা-বিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু

তিনিও বাজুর কলঙ্ক ভঞ্জন ও মর্য্যাদা-স্থাপন করিতে পারেন নাই। যে সকল ঘটক শ্রীবৎসারাহাকর্ত্তৃক আহুত হইয়া পুঁথি পত্র সঙ্গে লইয়া সমীকরণ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা দেখিলেন এ সমাজের সমীকরণ অসম্ভব; কুলীন বলিয়া যাহারা এদেশে কথিত হন, তাঁহাদের সকলেরই একটা না একটা কুলচ্যুতির দোষ আছে। এজন্য ঘটকেরা এক 'কারিকা' লিখিয়া রাখিয়া রাত্রিযোগে স্বদেশে পলায়ন করিলেন। সে কারিকা এই

"কুশা-পোড়া, বৈরাগী হরণ, নেড়া নেড়ীর দলে,
কেউ লালের বিষে জরজর, কেউ আপনিই মোড়ল।
আদির পক্ষে বিশেষ শঙ্কা, মূলে পড়্‌ল বাধা,
আর যে কয় ঘর বাকী রৈল, তাদের কুল আধা।

দরগ্রামের ঘোষ দিগের 'কুশা পোড়া' দোষ, আদাজানের ঘোষদিগের 'বৈরাগী হরা' দোষ, সিংহরাগীর বসু দিগের 'নেড়ানেড়ী' অপবাদ, শিমূলিয়ার গুহ রায়েরা, "নাগের বিষে" জর্জ্জর, আঘৈদের গুহ মজুমদারেরা "আপনি মোড়ল" বলিয়া এবং কাহারও আদি পুরুষ সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ না থাকায় ঘটকগণ কাহাকেও কুলীন বলিয়া স্বীকার করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই কয়েক ঘর ব্যতীত আরও যাহারা সে সময়ে বাজুতে কুলীন বলিয়া আপনাকে পরিচিত করিতেন, তাহাদিগকে অর্দ্ধকুলীন বলিয়া ঘটকেরা লিখিয়া গিয়াছেন।

বাজুর অধিকাংশ কায়স্থের পূর্ব্ব পুরুষই ষোড়শ শতাব্দী ও তৎপরে এ প্রদেশে আগমন করেন। অনেকেই চন্দ্রদ্বীপ হইতে বিক্রমপুর হইয়া বাজুতে প্রবেশ করেন। কেহ কেহ যশোহর হইতে ও আসিয়াছিলেন। এই পলায়িত ও বিপন্ন ভদ্র লোকদিগের প্রথম আশ্রয় দাতা আমডালার কর বংশ। যখন বাজুর অধিকাংশ স্থান জলমগ্ন ছিল, তখন আমডালার করগণই এ প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ছিলেন। আমডালার করের অবনতির পর ভারেঙ্গার 'কাইলাই' বংশ বাজুর সমাজ পতি হন। ইঁহারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। 'কাইলাই' বংশের অবনতির পরে রোয়াইলের কাশ্যপগণ বাজুর সমাজে আধিপত্য করিতেন: ইহারা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। এই তিন বংশই অবদান-প্রসিদ্ধ ছিল। এজন্য প্রবাদ আছে:—

"কর, কাইলাই, কাশ্যপ,
তিনই বাজুর সৌষ্ঠব।"

কাইলাই ও কাশ্যপ ব্রাহ্মণ, ইহাদের দ্বারা কোনও কায়স্থ কুলীন স্থাপিত হইয়াছিলেন এমন জানা যায় না। আমডালার কর, খলশীর রাহা, বাকলার রায়, তিল্লীর দত্ত, বাজুর সমাজের অধিকাংশ কুলীন ও মৌলিকের প্রতিষ্ঠাপয়িতা। অভ্রপুরের (শ্রীবাড়ীর) বসু মজুমদার, পাটপশার পরগণার (লটা খেলার) বসু মজুমদার, শিমুলিয়ার রায়, এ সমাজের প্রাচীন মনসবদার কায়স্থ ভৌমিক। মুসলমান ভৌমিকদিগের মধ্যে আটীয়া পরগণার আদিম ভূপতি সইদ খাঁ ও তদীয় বংশধরগণ, বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আটীয়া পরগণায় স্থাপিত করেন। সইদ খাঁ ও তদীয় বংশধরগণ, "আটীয়ার পাঠান" নামে বিখ্যাত। ইঁহাদের অবদানে আটীয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

তিব্বত অভিযান।

ফারীদুর্গ অধিকার।

১৮ই ডিসেম্বর আমরা 'নূতন চুম্বি' ত্যাগ করিলাম। আমরা 'শো' নদীর পাশ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। শুনিলাম, আজ পর্য্যন্ত কেহই এপথে তিব্বতে গমন করেন নাই। পথ বড়ই বন্ধুর দুই ধারে উন্নত পর্ব্বত, মধ্যে অতি সামান্য পথ। পথের অধিকাংশ স্থান কাঁকরে পরিপূর্ণ। এক এক স্থানে একদিকে গভীর খাদ। ঈষৎ পদ খলন হইলেই একবারে ৪০০.৫০০ ফুট নীচে যাইয়া পড়িতে হয়। নুতন চুম্বি ত্যাগ করিয়া কয়েক মাইল পরে আমরা 'গ্যাবজং' নামক এক উন্নত পর্ব্বত শৃঙ্গে উপস্থিত হইলাম ইহার উপর চীনারা এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছে। এইস্থানে সর্ব্বদা একশত চীনা সৈন্য অবস্থান করে। কিন্তু আমাদের আগমনের সংবাদ পাইয়া ইহারা পূর্ব্বেই দুর্গত্যাগ করিয়া গিয়াছিল।

ইহার পর গ্যালিংকা গ্রামে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানের উন্নত পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর অনেক গুলি বৌদ্ধ

মঠ দেখিলাম। এক একটা এত উচ্চপাহাড়ের উপর যে, আমাদের নিকট উহা পায়রার খোপের মত বোধ হইতেছিল। শুনিলাম, ঐ সকলের মধ্যে তিব্বতীয় লামারা (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুক) বাস করেন। আরও কয়েক মাইল দূরে এক উচ্চ প্রস্তর স্তূপ দেখিলাম। বহুকাল পূর্ব্বে একবার এই স্থানের একটী পর্ব্বতের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তজ্জন্য এই পথ বহুকাল পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল।

পরদিবস আমরা লিংকোর সুন্দর অধিত্যকা ভূমি অতিক্রম করিয়া এক ভীষণ স্থানে উপস্থিত হইলাম। সমস্ত পথ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড এবং কাঁকরে পূর্ণ। তাহার উপর আবার বরফের উপদ্রব। বরফ নিতান্ত নরম ছিল বলিয়া আমাদের চলিবার বড় অসুবিধা হইয়া পড়িল কখনও বা পা জানু পর্য্যন্ত বরফে ডুবিয়া গেল, কখনও বা বরফঢাকা পাথরের উপর পা পিছলিয়া পড়িয়া গেলাম। সে দুর্গতির কথা আর কি বলিব। ৪০।৫০টা খচ্চর জনমের মত খোঁড়া হইয়া গেল।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। সিলিগুড়ি হইতে নূতন চুম্বি পর্য্যন্ত ঘোড়ার উপর আসিয়াছি। এই ফারী দুর্গ আক্রমণ অভিযানে কিন্তু কাহাকেও ঘোড়া দেওয়া হয় নাই। আমাদের সহিত ১১ জন সাহেব কর্ম্মচারীও ছিলেন। তাঁহারাও সকলে পদব্রজে আসিতে ছিলেন। এ প্রকার পথে হাঁটিয়া যাওয়া যে কি কষ্টকর তাহা অনেকটা অনুমান করা যাইতে পারে।

ক্রমে ক্রমে আমরা ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে লাগিলাম। চড়াইএর উপর চড়াই, আবার চড়াই, ক্রমাগত চড়াই। বেলা একটার সময় আমরা ১৪,০০০ ফুট ঊর্দ্ধে উপস্থিত হইলাম। আবার সেই অনন্ত বরফের রাজ্য চারিদিক অমল ধবল আকাশ পৃথিবী সবই যেন একাকার হইয়া গিয়াছে। চুম্বি উপত্যকায় প্রবেশ পর্য্যন্ত পাহাড়ে শীতের নিকট হইতে একপ্রকার বিদায় গ্রহণ করিয়া ছিলাম। আজ আবার বিলক্ষণ আলাপ পরিচয় হইল। সেদিন ঐ পর্ব্বতের এক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলাম। সে দিন সেই কাপড়ের ঘরের মধ্যে যে শীত ভোগ করিয়া ছিলাম তাহা শীঘ্র ভুলিব না। তাঁবুর ভিতর আগুন জ্বালিয়া যথাসাধ্য কাপড় জড়াইয়া ছিলাম। কিন্তু তবুও অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। আমার পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা ছিল খানিকটা ব্রাণ্ডি পান করিলাম। বলা বাহুল্য অনেকটা আরাম পাইলাম। আমাদের একজন সাহেব একবার উত্তর মেরু প্রদেশে শীতকালে বাস করিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন। তিনি বারম্বার বলিলেন যে, সেখানকার শীত এই হিমালয়ের শীত অপেক্ষা অধিক নয়।

পরদিবস সূর্য্যোদয় হইবার পর আমাদের সেই ভীষণ যন্ত্রনার অনেকটা লাঘব হইল। প্রাতরাশ হইবার পর আমরা আবার অগ্রসর হইলাম। এবার অবতরণের পালা। প্রায় তিন মাইল উতরাই অতিক্রম করিবার পর আমরা আবার উপত্যকা ভূমিতে উপস্থিত হইলাম। ইহারই নাম 'ফারী উপত্যকা'। ইহার প্রায় ১২ মাইল দূরে প্রসিদ্ধ 'চুমলহরি' শৃঙ্গ। এই তিব্বতীয় শব্দের অর্থ 'দেবী পর্ব্বত'। পথিমধ্যে অনেক হরিণ দেখিলাম। কিন্তু উপায় নাই আমাদিগকে বাধ্য হইয়া হরিণ শীকারের

প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে হইল। আমরা খাস বৌদ্ধ দেশে প্রবেশ করিলেই আমাদের কর্তৃপক্ষ বিশেষ আদেশ প্রচার করিয়া শীকার বা প্রাণ হত্যা করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। হরিণ শীকারের এমন সুবর্ণ সুযোগ ত্যাগ করিতে হইল বলিয়া সাহেবেরা প্রায় সকলেই বিলক্ষণ অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

বেলা দুইটার সময় আমরা ফারী দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। দুর্গের ঠিক সম্মুখে একটি পথ দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়া ঐ স্থানে শেষ হইয়াছে। এই পথ ভোটরাজ্যের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষে গিয়াছে। বোগল টর্নর্ এবং ম্যানিং সাহেব প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে এই

পথে তির্ব্বতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন। আমরা দুর্গের প্রধান প্রবেশ দ্বারের নিকট উপস্থিত হইবা মাত্র কয়েকজন তির্ব্বতীয় কর্ম্মচারী আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আমাদিগকে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। সেদিন সন্ধ্যার আর অধিক বিলম্ব ছিল না বলিয়া আমরা দুর্গের সম্মুখে একটি উপযুক্ত স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলাম। পর দিবস প্রাতঃকালে জেনারেল সাহেব স্বয়ং আসিলেন। তিনি যে সহসা কেন আসিলেন তাহা আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

যাহাহউক, আমাদের তিব্বতীয় পথপ্রদর্শকদিগের বারম্বার নিষেধ সত্ত্বেও আমরা ঐ দিন (২০শে ডিসেম্বর) দুর্গ অধিকার করিলাম। যুদ্ধাদি কিছুই হইল না। দুর্গের দ্বার উন্মুক্তই ছিল। আমরা উহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম অথচ তিব্বতীয় সৈন্যেরা উহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল! অনতিবিলম্বে ব্রিটিস পতাকা দুর্গের সর্ব্বোচ্চ শিখরের উপর পত২ রবে উড়িতে লাগিল। আমরা সকলে সমবেত কণ্ঠে ভারত সম্রাটের বিজয় ঘোষণা করিলাম। নিজ তিব্বতে ইহাই আমাদের প্রথম অধিকার। অবশ্য ইহার জন্য বিন্দুমাত্র রক্তপাতের আবশ্যক হয় নাই।

আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, দুর্গের মধ্যে বন্দুক, বারুদ, ও অন্যান্য অস্ত্রাদি প্রচুর রহিয়াছে। তথাপি যে আমরা বিনা রক্তপাতে দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম তাহার কারণ এই—আমরা নূতন চুম্বি হইতে এত তাড়াতাড়ি ও সঙ্গোপনে বাহির হইয়াছিলাম যে তিব্বতীয়েরা আদৌ আমাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারে নাই। উহাদের অনেক সৈন্য খাম্বাজং নামক স্থানে একত্র হইতেছিল। বিন্দুমাত্র সংবাদ পাইলে উহারা কখনও এত সহজে আমাদিগকে ফারী দুর্গ অধিকার করিতে দিত না।

দুর্গের ভিতরের অবস্থা বড়ই শোচনীয় দেখিলাম। বহুকালাবধি মেরামত না হওয়াতে অনেকগুলি কক্ষ ও দালান একেবারে পতনোন্মুখ। আর আবর্জ্জনার কথা কি বলিব। বোধ হইল ৪।৫ বৎসরের ময়লা আদৌ পরিষ্কার করা হয় নাই। প্রায় প্রত্যেক কক্ষের আবর্জ্জনা ঐ কক্ষের একদিকে স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। তাহার কাছে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য। দেখিলাম, কোনও কোন ঘরের মধ্যে বিষ্ঠা ত্যাগ করা হইত। মানুষের যে এত পিশাচ প্রবৃত্তি হয় তাহা জানিতাম না। এই সকল ময়লা

দূর করিতে আমাদিগকে কয়েক দিবস পর্য্যন্ত অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু একটা বদ চাম্‌সে গন্ধ কোনও মতেই দূর হইল না। অগত্যা আমরা হাল ছাড়িয়া দিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের সহিত ফেনাইল বা ধুনার কোনও বন্দোবস্ত ছিল না।

দুর্গটি অতি প্রাচীন। নির্ম্মাণের সময় ঠিক কেহই জানে না। তবে ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইহার অধিকাংশ স্থান যে পুনঃ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ঐ সময়ের পূর্ব্বে ইহার নাম 'নম্‌জিয়াল্‌ করূলো' বা 'বিজয়ী শ্বেতদুর্গ' ছিল। নিকটে চির-তুষারাবৃত চুমলহরি অবস্থিত বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছিল। উক্ত পুনঃ নির্ম্মাণের সময় ইহাকে 'ফগ্‌রী' বা 'বিশাল পর্ব্বতদুর্গ' নামে অভিহিত করা হয়। ইংরাজ এখন ইহাকে 'ফারী' নামে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন।

দুর্গের চারিদিকে কয়েকশত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসভবন দেখিলাম। ইহার নাম ফারী গ্রাম। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ দুর্গের দক্ষিণ দিকে। ইহার অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। গ্রামের মধ্যে দেখিলাম, প্রত্যেক বাড়ীর সমস্ত ময়লা সম্মুখস্থ রাজপথের উপর ফেলা হয়। তাহা স্থানান্তরিত করার প্রথা নাই। এইভাবে চলিতে ২ রাস্তার দুই দিক অনেক উচ্চ হইয়া পড়িয়াছে। এমনকি নিম্ন তালার ঘর সকল রাস্তার level হইতে অনেক নীচু হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল ঘর রাস্তা হইতে ৮।১০ ফুট উপরে ছিল, এখন উহারা রাস্তার সহিত প্রায় সমান হইয়া পড়িয়াছে। তিব্বতের লোক যে কি প্রকার নোংরা এবং অপরিস্কার তাহা পাঠক হয়ত কতকটা বুঝিতে পারিয়াছেন। চুম্বি উপত্যকার চীনারা কি প্রকার পরিস্কার, তাহা আমরা বিবৃত করিয়াছি। তাহাদের প্রতিবাসী তিব্বতীয়েরা যে কেন এত অপরিস্কার তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

ফারী গ্রামে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক অধিক বলিয়া মনে হইল। তাহার কারণ, পুরুষদের মধ্যে অনেকেই আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য খম্বাজংএ চলিয়া গিয়াছে। আমি ভারতের ও বর্ম্মার অনেক অসভ্যজাতি দেখিয়াছি। কিন্তু তিব্বতের লোকের মত ময়লা ও কুশ্রী জাতি আর কখনও দেখি নাই। নাক সকলেরই চাপা—নাই বলিলেও হয়। খর্ব্বাকার, ময়লা রং। বহু দিনের মাটি, কাদা, ধোয়া প্রভৃতি মুখের উপর অঙ্কিত হওয়াতে চেহারা কি রকম হইয়াছে তাহা বোধ হয় অনুমান করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। শরীরের মধ্যে অন্যান্য ভাগ দিবারাত্রি আবৃত থাকে বলিয়া আমি স্থধু মুখের কথা বলিলাম। শুনিলাম, তিব্বতে অঙ্গাদি ধৌত বা পরিস্কার করা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ইহা করিলে সমাজচ্যুত হইতে হয়। পাঠক, ইহা আরবোপন্যাসের অলীক কথা বলিয়া মনে করিবেন না। সত্য সত্যই এদেশে জল পানীয় মাত্র—অঙ্গাদি ধৌত বা মার্জ্জনা করা নিষিদ্ধ। এ অবস্থায় এখানকার লোকের মুখে বা গায়ে যে কি প্রকার ভীষণ ঘৃণাকারজনক দুর্গন্ধ বাহির হয় তাহা সকলেই

বুঝিতে পারেন। রমণীরা কিন্তু অত্যন্ত অলঙ্কারপ্রিয় দেখিলাম। নানাপ্রকার ধাতু ও হাড়ের বিচিত্র আকারের বহুতর গহনার দ্বারা স্ত্রীলোকদের সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ। এই সকল গহনার বাঙ্গালা নাম নাই বলিয়া আমি তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত দিতে পারিলাম না।

ফারী ব্যবসায়ের এক প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। ভারত হইতে তিব্বতে দ্রব্যাদি আমদানী বা রপ্তানি করিতে হইলে ফারী হইয়া যাইতেই হইবে। পশম, লবণ, সোরা, শিলাজতু, সুবর্ণ, চামর। প্রভৃতি তিব্বতের প্রধান পণ্যদ্রব্য। ইহার বদলে নানাপ্রকার গরম কাপড়, লৌহদ্রব্য, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি ভারত হইতে প্রেরিত হয়। ভারতবর্ষীয় দুই জন মাড়োয়ারি ও একজন মুসলমান সওদাগর আমাদের সঙ্গে আসিয়া ফারীতে দোকান খুলিয়াছিলেন। আমরা প্রায় তাহাদের দোকানে যাইয়া বসিতাম। শুনিলাম তাহারা খুব লাভ করিতেছেন। আমাদের দেশের যুবকেরা যদি এই প্রকার কর্ম্মে যোগ দেন তাহা হইলে নিজের ও দেশের অনেক উপকার হয়। দেশের যুবকেরা যদি অনেকে মিলিয়া একত্রে কোম্পানী স্থাপন করেন ও সাহসী এবং কার্য্যক্ষম লোকদিগকে তিব্বত, বর্ম্মা, সিঙ্গাপুর, কাবুল, চীন প্রভৃতি স্থানে পাঠাইয়া বাণিজ্যাগার সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে অতি অল্প দিনের মধ্যে দেশের অবস্থা ফিরিয়া যায়। আমি নিজে উল্লিখিত কোনও ২ স্থানে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছি যে তথায় আজ পর্য্যন্তও বাণিজ্যের খুব সুবিধা আছে। সামান্য কয়েক সহস্র টাকা ও কয়েক জন উদ্যোগী কার্য্যপটু লোক হইলে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করা যায়।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

তপোবন।

শান্ত তটিনীর তীরে, শান্ত তপোবন,
সুপ্ত মাতৃবক্ষে সুপ্ত, শিশুটী যেমন।
স্নিগ্ধ শ্যাম তরু রাজি,
ফুল্ল ফলে ফুলে সাজি,
শাখা প্রশাখায় রচি প্রেমের বন্ধন,
রয়েছে ঘিরিয়া এই পুণ্য নিকেতন।

প্রভাতে প্রসন্ন প্রাণে, তাপস-কুমার,
শুদ্ধ, স্নাত, সুসংযত, চিত্ত নির্ব্বিকার
পূরব গগণে রাখি
ভক্তি বিস্ফারিত আঁখি
নিরখিয়া সবিতার, উদয় মহান্
উচ্চারেন সবিস্ময়ে সামবেদ গান।

দলে দলে মৃগকুল, করে বিচরণ,
নহে ভীত, নহে ত্রস্ত, বিশ্বস্ত এমন।
পক্ষপটে সুচিত্রিত
অলকা ঐশ্বর্য্য কত,
নাচিছে ময়ূর দল ময়ূরীর সনে,
তালে তালে, তাপসীর নেত্র সঞ্চালনে।

অদূরে তাপস-বালা, হরিণ শাবকে,
সাজাইছে মাতৃস্নেহে কুসুম স্তবকে,
চঞ্চল হরিণ শিশু,
নহে যেন বন্য পশু,
মানবীর মমতায়, ভুলে গেছে বন,
আঘ্রাণিছে কুমারীর কর্ণ আভরণ।

সুপ্ত শার্দ্দূলের পাশে উটজ প্রাঙ্গনে,
পূর্ণোদরা পয়স্বিনী বিশ্রাম শয়নে,
করি গ্রীবা উন্নমিত,
নেত্র অর্দ্ধ নিমিলিত,
ক্বচিৎ সঞ্চারে পুচ্ছ, করে রোমন্থন,
শায়িত শাবকে কভু করিছে লেহন।

নাহি হেথা হিংসা দ্বেষ, স্বার্থ কোলাহল,
বিষয়-বাসনা-স্রোত বহেনা গরল।
শুধুই পাখীর তান
তাপসের সাম গান
নীরবে আকাশে উঠি প্রীতি প্রস্রবন
অনন্তের প্রতিবিম্ব করিছে চুম্বন।

উদার আকাশ তলে উদার হৃদয়
জগতের মহাসত্য করিছে নির্ণয়।
মানবের এ জীবন,
আমিত্বের এ বন্ধন,
আত্মার দারুণ দৈন্য——অন্ধতা কেবল;
জীবন জগত ব্যাপী নির্ম্মুক্ত উজ্জ্বল।

শান্ত এ আশ্রমে বসি ঋষির হৃদয়,
মহিমায় হিমালয়, করি পরাজয়,
সৃজিয়া সহস্র-ধারা,
জ্ঞানগঙ্গা পুণ্যতরা,
করেন পশুত্ব নাশি দেবত্ব স্থাপন
মানবের মহাতীর্থ এই তপোবন।

৺তারাপ্রসন্ন সিংহ

মহিলা কবি চন্দ্রাবতী।

বনে অনেক সময় এমন ফুল ফুটে, রাজোদ্যানেও তাহার তুলনা মিলেনা, সে বনফুলের সৌন্দর্য্য কেহ উপলব্ধি করিতে, কিম্বা সে সৌরভ কেহই ভোগও করিতে পারে না, বনের ফুল বনে ফুটে বনেই শুকায়। চন্দ্রাবতী এইরূপ একটি বনফুল, ময়মনসিংহের নিবিড় অরণ্যে, এক সময়ে এই সুরভি কুসুম ফুটিয়াছিল।

বহুদিন পূর্ব্বে ময়মনসিংহের এক ক্ষুদ্রপল্লিতে বসিয়া, অমর কবি বংশীবদন পদ্মাপুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। কবি দ্বিজবংশী বা বংশীবদন একজন সাধক পুরুষ ছিলেন, তিনি কেবল পদ্মাপুরাণ নহে, পৌরাণিক আরও অনেক গুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, ময়মনসিংহের সাহিত্য ভাণ্ডার বোধ হয় সেগুলি চিরদিনের জন্য হারাইয়াছে। সেগুলি খুঁজিয়া লইতে পারিলে, ময়মনসিংহের প্রাচীন ইতিহাস লিখিতে অনেক সাহায্য পাওয়া যাইত।

শ্রীগৌরাঙ্গ বাহির হইয়াছিলেন জগতের মুক্তি মন্ত্র হরি নাম প্রচারের জন্য, পাপী তাপী অসহায় কলির জীবের উদ্ধারের জন্য, আর কবি দ্বিজবংশী কবিতা লিখিয়াছিলেন তাঁহার দেশবাসীকে কবিতারূপ অমৃত উৎস্যের জলপান করাইতে কিন্তু তদানিন্তন ময়মনসিংহ-বাসী তাহা বুঝিলেননা, কেহই সেই অমৃতপ্রস্রবণের সুরভি শীতল জলধারা পান করিয়া অমর হইতে চাহিলেন না। বংশীবদন বুঝিয়াছিলেন—সঙ্গীত ভিন্ন গত্যন্তর নাই, সঙ্গীতে বনের পশু মুগ্ধ হয়। তাই পরার্থে উৎসর্গীকৃত জীবন কবি বংশীবদন শিষ্যগণ লইয়া ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে, যাচিয়া যাচিয়া অমৃতেরকণা বিলাইবার জন্য বাহির হইলেন। সে অমৃত বিন্দু যে পান করিল সেই অমর হইল, গ্রামে গ্রামে দলে দলে সুকণ্ঠ গায়কগণ দল বাঁধিয়া কবিকৃত মনসার ভাসান গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল, কবিও স্বয়ং ভাসান গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রথমে লোকে সখ করিয়া ধান, চাল, পয়সা কড়ি দিয়া গান শুনিত। তারপর ক্রমে ক্রমে দেশ মাতিয়া উঠিল, কোথাহইতে এক প্রবলভাবের বন্যা আসিয়া দেশের সমস্ত কুরীতি কুপ্রথা অদল বদল করিয়া দিল। প্রাণ মন ভাবের স্রোতে উৎসর্গীকৃত করিয়া দিল। পূর্ব্ববঙ্গ নূতন ভাবের বন্যায় ভাসিয়া গেল এমন কি সেই অমর সঙ্গীতে দস্যু কেনারামের পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া গেল। সে তাহার পাপার্জ্জিত ধনরাশি ব্রহ্মপুত্রের গভীর স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া, কবির পদাশ্রয় গ্রহণ করিল।

বহু শতাব্দী পার হইয়া গিয়াছে, আজও পূর্ব্ববঙ্গ সে স্বর্গীয় সুধার আস্বাদ ভুলিতে পারে নাই, আজও মনসা পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা, আজও মেঘভরা আকাশ তলে, পল্লীকুটীরে বসিয়া লোকে সেই অমর সঙ্গীত গান করে। আজও সেই গীত শুনিয়া বরিষার ধারার ন্যায় কুলকামিনীগণ অশ্রুধারা বর্ষণ করেন। আজও ময়মন-সিংহের শিক্ষিতা অশিক্ষিতা ও অর্দ্ধশিক্ষিতা কুললনাগণ নাটক নভেলের কথা দূরে রাখিয়া, পদ্মাপুরাণের নায়িকা বেহুলার পূত চরিত্রের কথা ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া পড়েন। আজও তাঁহারা সীতা সাবিত্রী অপেক্ষাও জন্ম দুখিনী বেহুলাকে অধিক চেনেন, অধিকতর ভাবে আপনার বলিয়া মনে করেন। আজও ময়মনসিংহবাসীর কানে সেই গান, নূতনতররূপে দিন নাই, রাত নাই, অবিরাম, অবিশ্রান্ত ভাবে, রণিয়া রনিয়া ধ্বনিত হইতেছে।

"বেহুলার ক্রন্দনেতে শিলা ধ্বংশ পায়,
ধারাস্রোতে জল বহে দ্বিজবংশী গায়॥

সেই দিনের কথা ময়মনসিংহের পক্ষে এক অতীত গৌরবের কথা। সেইদিন হইতে ময়মনসিংহ চিনিল, বুঝিল কবি কি! কবিত্ব কি? সেই দিন হইতে ভাবে তন্ময় চিত্ত কতিপয় লোক এই কবির পদানুসরণ করিলেন।

যাঁহার কবিতা লোকের প্রাণের মধ্যে মনের মধ্যে সর্ব্বদা প্রিয়জনের স্মৃতির ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়, ছোট বড় নাই, স্থান অস্থান নাই, ঘাটে মাঠে যেখানে সেখানে, যাহার সঙ্গীত সর্ব্বদা মানুষের মুখে মুখে ফেরে, তিনিই সাধারণের প্রাণের কবি, চন্দ্রাবতী পূর্ব্ব ময়মনসিংহের সর্ব্বসাধারণের প্রাণের কবি ছিলেন। বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি—সেই অপূর্ব্ব মন প্রাণ মাতান সঙ্গীত। মাঠে কৃষকেরা শিশুর মুখে, আঙ্গিনায় কুলকামিনীদের মুখে, ঘাটে বাটে,

মন্দিরে, প্রান্তরে, বিজনে, নদীর পুলিনে সেই সঙ্গীত; বিবাহে, উপনয়নে, অন্নপ্রাশনে, ব্রতে, পূজায় সেই সঙ্গীত ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া কানে আসিয়া বাজে, মরমের ভিতর প্রবেশ করে, তারপর সেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর শব্দ স্বর্গরাজ্যের কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব বিহঙ্গিনীর ন্যায়, স্রোতের মত তরঙ্গ ছুটাইয়া উর্দ্ধলোকে মিলিয়া যায়, সেই মুহূর্তের শেষ চরণ টুকুতে সেই মহিলা কবির স্মৃতিটুকু আনিয়া দেয়। প্রায়ই শুনি চন্দ্রাবতীভনে, চন্দ্রাবতী গায়। শ্রাবণের মেঘ ভরা আকাশতলে ভরা নদীতে যখন বাইকগণ সাঁঝের নৌকা সারিদিয়া বাহিয়া যায়, তখন শুনি সেই চন্দ্রাবতীর গান, বিবাহে কুল কামিনীগণ নব বরবধূকে স্নান করাইতে জল ভরণে যাইতেছে সেই চন্দ্রাবতীর গান, তারপর স্নানের সঙ্গীত, ক্ষৌরকার বরকে কামাইবে তার সঙ্গীত, বরবধূর পাশা খেলা, তার সঙ্গীত সে কত রকম। পাশা খেলার একটী সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীত উপস্থিত করিলাম।

কি আনন্দ হইল সইগো রসবৃন্দাবনে,
শ্যামনাগরে খেলায় পাশা মনমোহিনীর সনে।
আজি কি আনন্দ......।
উপরে চান্দোয়া টাঙ্গান নীচে শীতলপাটি,
তার নীচে খেলায় পাশা জমিদারের বেটী
আজি কি আনন্দ......।

*　　*　　*　　*

চন্দ্রাবতী কহে পাশা খেলায় বিনোদিনী
পাশাতে হারিল এবার শ্যাম গুণমণি।
আজি কি আনন্দ......।

এত গেল সঙ্গীত। তারপর মেয়েলী ব্রতের ছড়া, তাহারও অধিকাংশ চন্দ্রাবতীর রচনা, ইহা ছাড়াও প্রাচীন আচার পদ্ধতি অবলম্বনে চন্দ্রাবতীর হাসিকান্না মিশ্রিত বহুবিধ কবিতা, বাদশার শাসন, "কাজীর বিচার ডাকাত কেনারামের গান, দেওয়ান বড়া" প্রভৃতির রচনা নীরবে বিস্মৃতির অন্ধকারে লুকাইত হইয়া যাইতেছে।

দ্বিজবংশীর পদ্মাপুরাণের সঙ্গে কবি চন্দ্রাবতীর অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দেখিতে পাই। দ্বিজবংশীকৃত পদ্মাপুরাণের বহু দোহা, নাচারী চন্দ্রাবতীকৃত। আমরা ক্রমে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

এখন দেখা যাউক এই চন্দ্রাবতী কে? শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতেছে, আজও যাঁহার গান, যাঁহার ছড়ায় লোক ভাবে বিভোর হইয়া রহিয়াছে, তিনি কে? ময়মনসিংহের জন্য তিনি এমন কি করিয়াছেন যে আজও তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয় ময়মনসিংহবাসী তাঁহার চরণোদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন। আজও ময়মনসিংহের ক্রিয়াকাণ্ড উৎসব সকলে চন্দ্রাবতী-স্মৃতি বিজড়িত, সমস্ত পূর্ব্ব ময়মনসিংহ প্লাবিত করিয়া চন্দ্রাবতীর গান। সে গানে আনিয়া দেয় পৃথিবীর অদেয় বস্তু, শীতল করে তাপিত প্রাণ—যুক্ত করে স্বর্গমর্ত্তের বিপুল ব্যবধান।

চন্দ্রাবতী দ্বিজবংশীদাসের একমাত্র কন্যা, আমরা চন্দ্রাবতীকৃত রামায়ণ গীত হইতে আমাদের এই উক্তির সমর্থন করিব। চন্দ্রাবতী তাঁহার রচিত রামায়ণে এইরূপ লিখিয়াছেন।

ধারাস্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায়
ভট্টাচার্য্য বংশে জন্ম, অঞ্জনা ঘড়ণী
বাঁশের পালায় ঘর ছনের ছাউনী।
ঘট বসাইয়া সদা পুজে মনসায়
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।

*　　*　　*　　*

দ্বিজবংশী পুত্র হৈলা মনসার বরে,
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে।
ঘরে নাই ধান চাল চালে নাই ছানি,
আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পাণি
ভাসান গাহিয়া পিতা বেড়ান নগরে,
চালকড়ি যাহা পান আনি দেন ঘরে।
বাড়াতে দরিদ্র জ্বালা কষ্টের কাহিনী
তার ঘরে জন্ম নৈল চন্দ্রা অভাগিনী
সদাই মনসা পদ পুজে ভক্তিভরে
চালকড়ি পান কিছু মনসার বরে।

*　　*　　*　　*

দুরিতে দরিদ্র দুঃখ দিলা উপদেশ
ভাসান গাহিতে স্বপ্নে করিলা আদেশ।

বন্দনায় চন্দ্রাবতী লিখিয়াছেন:—

সুলোচনী মাতা বন্দি দ্বিজবংশী পিতা,
যার কাছে শুনিয়াছি পুরাণের কথা

মনসা দেবীরে বন্দি করি কর যোড়,
যাহার প্রসাদে হলো সর্ব্ব দুঃখ দূর।
মায়ের চরণে মোর কোটী নমস্কার
যাহার কারণে দেখি এ তিন সংসার,
শিব শিবা বন্দি গাই ফুলেশ্বরী নদী,
যার জলে তৃষ্ণা দূরে যায় নিরবধি।
চন্দ্র সূর্য্য বন্দিগাই দিবস রজনী,
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দি বিষ্ণুর ঘরণী।
গয়া কাশী বন্দিলাম যত তীর্থ স্থান
গঙ্গা ভাগীরথী বন্দি জমিন আসমান।
ব্রহ্মপুত্র নদ বন্দি সর্ব্ব দেবময়
যাঁর জলে স্নানে নাহি পুনঃ জন্ম হয়।
... ...
বিধিমতে প্রণাম করি সকলের পায়
পিতার আদেশে চন্দ্রা রামায়ণ গায়।

কবি চন্দ্রাবতী দ্বিজবংশীদাসের একমাত্র কন্যা কল্প-বৃক্ষের সুধাফল। পুরাণ রচনায় তিনি পিতার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। চন্দ্রাবতী পরমা সুন্দরী ছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে কবিতা রচনা করিতেন। দেশময় তাহার সঙ্গীত, কবিতা রচনা ও সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা শুনিয়া, বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার পাণিগ্রহণে উৎসুক হইলেন, কিন্তু চন্দ্রাবতীর প্রাণের দেবতা ছিলেন তাঁহার স্বগ্রাম-বাসী ব্রাহ্মণ যুবক জয়ানন্দ। উভয়ে একত্রে লেখাপড়া করিতেন, খেলা করিতেন। কালক্রমে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। সে সকল কবিতা তাঁহাদের উভয়ের ভালবাসার দান প্রতিদান। ক্রমে তাঁহারা অন্যান্য বিষয় লইয়াও কবিতা রচনা করিতে থাকেন। দ্বিজবংশীকৃত পদ্মাপুরাণে উভয়েরই রচনা আছে। প্রণয় যখন গাঢ় হইয়াছিল, চন্দ্রাবতী তখন মনে মনে তাঁহার প্রাণের দেবতার পদে সমস্ত জীবন যৌবন ঢালিয়া দিলেন। বিবাহের কথাবার্ত্তা একরূপ স্থির হইয়া গেল, এমন সময় এক বিষম অনর্থ ঘটিল। অলক্ষ্য হইতে নিদারুণ বিধাতা কল ঘুরাইলেন। মূর্খ যুবক এক মুসলমান রমণীর প্রেমে আত্মবিক্রয় করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিল। সে বুঝিল না কি অমূল্য রত্নই হেলায় হারাইল!!

অদৃষ্টের সেই-ঘাত প্রতিঘাতে চন্দ্রাবতীর কোমল হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বহুদিন পর মন স্থির করিয়া শিবপূজায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি স্নেহময় পিতার চরণে দুইটী প্রার্থনা জানাইলেন, একটি নির্জ্জন ফুলেশ্বরী তীরে শিবমন্দির স্থাপন, অন্যটি তাহার চিরকুমারী থাকিবার বাসনা। কন্যাবৎসল পিতা উভয় প্রার্থনাই পূর্ণ করিলেন। সেই সঙ্গে তিনি দুহিতাকে সংসারের

সুখ দুঃখের অনিত্যতা বুঝাইয়া দিলেন। চন্দ্রাবতী কায়মনোবাক্যে শিবপূজা করিতেন ও অবসরকালে রামায়ণ লিখিতেন। তাহার এই রামায়ণ এ অঞ্চলে মুখে মুখে গীত হইয়া থাকে—মুদ্রিত হয় নাই। পূর্ব্ব ময়মনসিংহের কুলবালাগণ, সূর্য্য ব্রতের দিন উদয়াস্ত পর্য্যন্ত এই রামায়ণ সুরে গান করিয়া থাকেন। কি

শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত প্রায় সকলেই ইহা সঙ্গীতে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। এই কথা রামায়ণ বংশপরম্পরা ক্রমে চলিয়া আসিতেছে। প্রচলিত কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ অপেক্ষা এই রামায়ণ তাহাদের কাছে অধিকতর মধুর বলিয়াই মনে হয়। কীর্ত্তিবাসের রচনা যেমন সরল মিত্রাক্ষরে লিখিত, কবি চন্দ্রাবতীর রামায়ণও ঠিক তদ্রূপ। তবে সুরে গীত হয় বলিয়া রচনায় কিছু বৈলক্ষণ্য আছে। প্রায় সবগুলি ছত্রেই "গো" শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় সুন্দর শুনা যায় বলিয়াই এই "গো" শব্দটি তুলিয়া দিলে, ঠিক কীর্ত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে প্রায় মিলিয়া যায়। ঘটনাও ঠিক একরূপ তবে দুই চার যায়গায় কথঞ্চিৎ অমিলও দৃষ্ট হয়। সীতার বনবাসের কারণটি অন্যরূপ। পূর্ব্ব ময়মনসিংহের স্ত্রীলোকদের নিকট ইহাই সমধিক বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে। তাহা এই।

শয়ন মন্দিরে একা গো সীতা ঠাকুরাণী,
সোনার পালঙ্কপরে গো ফুলের বিছানী।
চারিদিকে শোভে তার গো সুগন্ধী কমল,
সুবর্ণ ভৃঙ্গার ভরা গো সরযুর জল।
নানা জাতি ফল আছে সুগন্ধে রসিয়া,
যাহা চায় তাহা দেয় গো সখীরা আনিয়া।
ঘন ঘন হাই উঠে গো নয়ন চঞ্চল,
অঙ্গ অবশ অঙ্গ গো মুখে উঠে জল।
উপকথা সীতারে শুনায় আলাপিনী,
হেনকালে আসলো তথায় গো কুকুয়া ননদিনী।
কুকুয়া বলিছে বধু গো মম বাক্য ধর।
কিরূপে বঞ্চিলা তুমি গো রাবণের ঘর?
দেখি নাই রাক্ষসে গো শুনিতে কাঁপে হিয়া,
দশমুণ্ড রাবণ রাজা গো দেখাও আঁকিয়া।
মূর্চ্ছিতা হইলা সীতা গো রাবণ নাম শুনি,
কেহবা বাতাস দেয় গো কেহ মুখে পাণি।
সখীগণ কুকুয়ারে কাইল বারণ,
অনুচিত কথা তুমি গো বল কি কারণ।
রাজার আদেশ নাই বলিতে কুকথা,
তবে কেন ঠাকুরাণীর গো মনে দিলে ব্যথা।
প্রবোধ না মানে গো কুকুয়া ননদিনী,
বার বার সীতারে বলয়ে সেই বাণী।
সীতা বলে আমি তারে গো না দেখি কখন,
কিরূপে আঁকিব আমি গো পাপিষ্ঠ রাবণ।
যত করি বুঝান সীতা গো কুকুয়া না ছাড়ে,
হাসি মুখে সীতারে সুধায় বারে বারে।
বিষলতার বিষফল বিষ গাছের গোটা,
অন্তরে বিষের হাসি গো বাঁধাইল লেঠা।
সীতা বলে দেখিয়াছি গো ছায়ার আকারে,
হরিয়া যখন দুষ্ট লয়ে যায় মোরে।
সাগর জলেতে পরে গো রাক্ষসের ছায়া,
দশ মুণ্ড কুড়ি হাত রাক্ষসের কায়া।
বসে ছিল কুকুয়া গো শুইল পালঙ্কেতে,
আবার সীতারে কয় গো রাবণ আঁকিতে।
এড়াতে না পারে সীতা গো পাখার উপর
আঁকিলেন দশমুণ্ড গো রাজা লঙ্কেশ্বর।
শ্রমেতে কাতর সীতা গো নিদ্রায় চলিল,
কুকুয়া তালের পাখা গো বুকে তুলি দিল।
... ...

এই কুকুয়া কৈকেয়ীর গর্ভজাত কন্যা। যেমন মা, তেমন ঝি; তায় আবার ছোটকাল হইতে মন্থরা কর্ত্তৃক শিক্ষিতা। সেও রাম সীতাকে বিষের মত দেখিত। অযোধ্যা যখন ভরতের হইল না তখন তাহা শ্মশান হউক এই ছিল তাহার কামনা। ফলেও তাহাই হইল। এইমাত্র দুর্ম্মুখ আসিয়া রামচন্দ্রকে সীতাপবাদ শুনাইয়া গিয়াছে, পরক্ষণেই কুকুয়া যাইয়া বলিল দাদা, তুমি কাকে ভালবাস? যে তোমার চখের তারা, বুকের নিধি, সে আজি দশমুণ্ড রাবণ পাখার উপর আঁকিয়া, বুকে তুলিয়া, চক্ষু বুজিয়া আছে। বিশ্বাস না হয় স্বচক্ষে দেখিতে পার। একেত বজ্রাঘাত বিচ্ছিন্ন তরু, তার উপর আবার দাবাগ্নির দহন। ধীরে ধীরে রাম শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন—ঠিক তাহাই। রঘুকুলকমলিনী তখন অলসভাবে ফুলশয্যার উপর পড়িয়া ঘুমাইতেছিলেন। তাহার চক্ষের উপর দশমুণ্ড অঙ্কিত পাখা। হায়, হায় জানকী জানিতেন না—কুকুয়া কালসাপিনী তাহার শিয়রে বসিয়া দংশন করিবে!

তারপর সীতার বনবাস। অতি বড় পাষাণ হৃদয় যে, সীতার ক্রন্দনে তাহাও গলিয়া যায়। কি যুবতী কি বর্ষিয়সী কেহই সেই সময় অশ্রু-সংবরণ করিতে পারেন না।

অতি বড় দুরন্ত মেয়েও তখন গীত শুনিয়া তন্ময় হইয়া পড়ে। চন্দ্রাবতী এই রামায়ণ শেষ করিতে পারেন নাই। সীতার বনবাস পর্য্যন্তই লিখিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে আর এক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। চির অনুতপ্ত চন্দ্রাবতীর সেই প্রণয়ী যুবক তুষানলে পুড়িয়া পুড়িয়া, দুর্ব্বিসহ জীবন ভার সহ্য করিতে না পারিয়া, চন্দ্রাবতীর উদ্দেশ্যে একখানা পত্র লিখিয়া তাহার সাক্ষাৎ কামনা করিল। চন্দ্রাবতী পিতাকে সমস্ত জানাইলেন। পিতা অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তুমি যে দেবতার পূজায় মন দিয়াছ তাহারই পূজা কর। অন্য কামনা হৃদয়ে স্থান দিও না। চন্দ্রাবতী যুবককে একখানা পত্র লিখিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিলেন, এবং সর্ব্বদুঃখহারী ভগবান শিবের চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে উপদেশ দিলেন। অনুতপ্ত যুবক পত্র পাঠ করিয়া তৎক্ষণাৎ চন্দ্রাবতীর স্থাপিত শিব মন্দিরের অভিমুখে ছুটিল। চন্দ্রাবতী তখন শিবপূজায় তন্ময়, মন্দিরের দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ। হতভাগ্য যুবক আসিয়াছিল চন্দ্রাবতীর কাছে দীক্ষা লইতে, অনুতপ্ত দুর্ব্বিসহ জীবন প্রভুপদে উৎসর্গ করিতে। কিন্তু পারিল না, চন্দ্রাবতীকে ডাকিতেও সাহস হইল না। আঙ্গিনার ভিতর সন্ধ্যামালতীর ফুল ফুটিয়াছিল তারই দ্বারা কবাটের উপর চার ছত্র কবিতা লিখিয়া চন্দ্রাবতীর নিকট, বসুন্ধরার নিকট, শেষ বিদায় প্রার্থনা করিল।

পূজা শেষ করিয়া চন্দ্রাবতী দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন। আবার যখন দ্বার রুদ্ধ করেন তখন সেই কবিতা পাঠ করিলেন, পাঠ করিয়াই বুঝিলেন—দেব-মন্দির কলঙ্কিত হইয়াছে। চন্দ্রাবতী জল আনিতে ফুলিয়ার ঘাটে গেলেন, যাইয়া বুঝিলেন, সব শেষ হইয়া গিয়াছে, অনুতপ্ত যুবক ফুলিয়ার স্রোত ধারায় নিজের জীবনস্রোত ভাসাইয়া দিয়াছে।

বনফুল শুকাইয়া উঠিল। ইহার পর চন্দ্রাবতী আর কোন কবিতা লিখেন নাই, এইরূপে রামায়ণ অপরিসমাপ্ত রহিয়া গেল। তারপর একদিন শিবপূজার সময় সহসা তাহার প্রাণবায়ু মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল। আমরা যে উজ্জ্বল কোহিনুর রত্ন চিরদিনের তরে হারাইলাম তাহা আর পাইলাম না।

আমরা এবার চন্দ্রাবতীর কাব্যের আভাস মাত্র দিলাম। বারান্তরে ইহার কবিত্বের বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীচন্দ্রকুমার দে।

বিশ্ববার্ত্তা।

আকাশ পথে।

দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানিস্‌বর্গ স্থিত ইউনিয়ান অব্‌জরবেটরীর ডিরেক্টর অধ্যাপক আর, টী, এ, ইনিস্ (R. T. A. Innes) ন্যাশনাল অব্‌জরবেটরীতে যে এক রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন সেই রিপোর্টের মর্ম্ম এই যে বিশ্বের সীমা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সংবাদে পৃথিবীর সমস্ত জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের কৌতুহল উদ্দীপ্ত হইয়াছে।

অধ্যাপক ইনিস বলেন যে বিশ্ব (অর্থাৎ যাবতীয় সূর্য্য চন্দ্র, পৃথিবী, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতির সমষ্টি) ছায়াপথের মধ্যবর্ত্তী আকাশে অবস্থিত ; এবং সেই আশ্চর্য্য বেষ্টনীর মধ্যে পৃথিবী হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী নক্ষত্রের দূরত্ব ৫৪০ আলোক সংবৎসরের সমান। অর্থাৎ অধ্যাপক ইনিসের গণনানুসারে বিশ্বের ব্যাসার্দ্ধের মান ৬,১৩৪, ৯৫১, ৬৮০, ০০০, ০০০ মাইল ; যেহেতু জ্যোতির্ব্বিদেরা বিশ্বাস করেন যে ছায়া পথ দ্বারা পরিবেষ্টিত আকাশাংশের কেন্দ্রের নিকটেই পৃথিবীসনাথ গ্রহমণ্ডলী অবস্থিত এবং যেহেতু আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল অথবা এক বৎসরে পৌণে ছয় কোআড্রিলিয়ন (quadrillian) মাইলের ও অধিক গমন করে। সুতরাং ১০৮০ বৎসরে আলোকের গতি ৬,৩৩৪,৯৫১,৬৮০,০০০,০০০ মাইল। * একটী আলোক-রশ্মির পৃথিবীর ভ্রমণ কক্ষের ব্যাস পর্য্যটন করিতে ষোল মিনিট ছত্রিশ সেকেণ্ড লাগে।

জোহানিশ্‌বর্গের জ্যোতির্ব্বিদ্ আরও বলেন যে ভ্রম

---

* এই গণনায় কিছু ভুল আছে বলিয়া বোধ হয়। একের পর চব্বিশটা শূন্য বসাইলে এক ইংরেজী কোআড্রেলিয়ন এবং একের পর ১৮টা শূন্য বসাইলে এক ফ্রেঞ্চ

বশতঃ যে নক্ষত্রগুলি হিলিয়ম্ (helium) নক্ষত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে সেই গুলি পৃথিবী হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরবর্ত্তী। হিলিয়ম্ নক্ষত্রগুলিই ছায়া পথের বিশেষত্ব।

বিশ্বমণ্ডলীর বহির্ভাগে কি কিছু আছে? এই বিষয়ে অধ্যাপক ইনিস কোন স্পষ্ট মত প্রকাশ করেন নাই কিন্তু তিনি ইহা বলিয়াছেন যে অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবীক্ষণ দ্বারা আমাদের দৃষ্টি বিশ্বের বাহিরে আকাশের বহু দূরবর্ত্তী স্থান ভেদ করিয়া থাকে; কিন্তু সেই স্থানে কিছুই দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ আমাদের এই বিশ্বের মত তারকামণ্ডলী পরিবৃত অন্য কোন বিশ্বের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না।

দক্ষিণ আফ্রিকার বায়ু অতি স্বচ্ছ। অধ্যাপক ইনিস সেই বায়ুর মধ্য দিয়া বিশ্বের বহির্ভাগে অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চালাইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার দূরবীক্ষণ আকাশের সেই গূঢ়তম প্রদেশে নেবেউলি (Nebulae) নামক অস্পষ্ট মেঘের লেশ মাত্র আবিষ্কার করিতে পারে নাই। জ্যোতির্বিদেরা বলিয়া থাকেন নেবিউলিই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আদিম অবস্থা। অনেক গুলি নেবিউলি দেখিতে পেঁচের মত ঘুরান এবং এরূপ অনুমিত হয় যে তাহারা অতি প্রচণ্ডবেগে অবিরাম ঘুরিতেছে এবং ক্রমে ঘণীভূত হইয়া সংঘাত গোলকে পরিণত হইতেছে, যাহাতে উত্তরকালে জীবের আবির্ভাব হইতে পারে।

অধ্যাপক ইনিসের মতে নক্ষত্রের সংখ্যা অসীম নহে পৃথিবীর জন সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অল্প। তিনি বিবেচনা করেন যে বিশ্বের উপাদান বা পরমাণুসমষ্টি সূর্য্যের উপাদানের ৪৪১,০০০ গুণ অধিক। অর্থাৎ বিশ্বের ছোট বড় সমস্ত গোলকের গুরুত্ব ৪৪১,০০০ সূর্য্যের গুরুত্বের সমান। এমন ৩০০ নক্ষত্র আছে যাহার প্রত্যেকটা ১০০ সূর্য্যের সমান; এমন ৫,০০০ নক্ষত্র আছে যাহার প্রত্যেকে ১০টা সূর্য্যের সমান; এবং সূর্য্য অপেক্ষা ছোট ৩৬,০০০,০০০ নক্ষত্র আছে যাহার মধ্যে ১,০০০,০০০টা নক্ষত্র প্রত্যেকে সূর্য্যের এক দশমাংশের সমান; ৫,০০০,০০০টা নক্ষত্রের প্রত্যেকটা সূর্য্যের এক শততমের সমান এবং ১০,০০০,০০০ নক্ষত্রের প্রত্যেকটা সূর্য্যের এক সহস্রতমের সমান। এই সমস্ত ব্যতীত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রপুঞ্জ আছে যাহাদের উপাদানের সমষ্টি ১,০০০ সূর্য্যের উপাদানের সমান।

অধ্যাপক আরও বলেন যে সম্ভব অধিক সংখ্যক নক্ষত্রের উপরি ভাগের ঔজ্জ্বল্য সূর্য্যের ঔজ্জ্বল্য অপেক্ষা অধিক। অতএব সৌরমণ্ডলীতে যেমন পরমাণু সমষ্টি অল্প সংখ্যক গোলকে নিবদ্ধ বিশ্বের অন্যত্র ও সেইরূপ। পরমাণু সমষ্টির অল্প অংশই বড় বড় গোলকে আছে। নক্ষত্রগুলি প্রায় সমান ভাবে বিক্ষিপ্ত আছে—যেখানে বৃহদাকার নক্ষত্র আছে সেখানে ক্ষুদ্র নক্ষত্রও আছে এবং যেখানে ক্ষুদ্র নক্ষত্র আছে সেখানে বৃহৎ নক্ষত্রও আছে।

অধ্যাপক ইনিসের আরও কয়েকটা সিদ্ধান্ত এই যে আকাশে আলোকের বিকীরণ তেমন অধিক নহে। সূর্য্য এবং নক্ষত্রগণের তাপ যে শূন্য আকাশে বিকীর্ণ হয় ইহা প্রমাণিত হয় নাই; এবং আলোকহীন সূর্য্যের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই যেহেতু আলোকহীন সূর্য্য একটীও জানা যায় নাই।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

সমুদ্র গর্ভ।

সারজন মারে নামক প্রখ্যাতনামা পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমুদ্রগর্ভ বিষয়ক এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থকার এই পুস্তকে অনেক নূতন নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি ২৯.৫০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এবং নানা প্রকার মানচিত্র ও ছবিতে পরিপূর্ণ। গ্রন্থখানি সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিনী সাধনার ফল। ইহার আদ্যন্ত নানাবিধ মনোরম তথ্যে সজ্জিত এবং বিজ্ঞান অধ্যয়ন নিরত পাঠকদের প্রীতিকর। আমরা সংক্ষেপে সাহিত্য সমাজে এই গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করিতেছি।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সারজন মারে এবং গ্রেটবৃটেনের কয়েক জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক "Challenger" নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া সাগর-গর্ভ পরিদর্শনের নিমিত্ত বহির্গত হন। ক্রমাগত চারি বৎসর কাল তাঁহারা উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া সমুদ্র বিষয়ে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ভূমণ্ডলের

অধিকাংশই যেমন জলে আচ্ছাদিত, সেইরূপ জলজ উদ্ভিদ্ এবং জীবের সংখ্যাও অধিকতর বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত Huxley সাহেবের বেথিবিয়াস্ সিদ্ধান্ত (Bathybius theory) বৈজ্ঞানিকদিগের বিস্ময় জন্মাইয়াছিল। তিনি কতকগুলি সমুদ্রজ পদার্থ পরীক্ষা করিয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, সমুদ্রের অতল জলেও—এমন এক শক্তি বিদ্যমান আছে, যাহা উদ্ভিদ্ এবং জীবের প্রাণদান করিতে পারে; এবং যদি এক রাত্রিতেই ভূমণ্ডলের সমস্ত প্রাণীও বিনষ্ট হয়, তাহা হইলেও এই প্রাণদায়িকা শক্তি হইতেই জগত আবার প্রাণী সমাকীর্ণ হইবে। কিন্তু সার জন মার্‌রে এই সিদ্ধান্ত অপনোদন করিয়া অন্য মত প্রকাশ করিয়াছেন। মাররে এবং তাঁহার দলভুক্ত বৈজ্ঞানিকদিগের মতানুসারে সমুদ্রের অতলগর্ভই জীবের সর্ব্বশেষ বসতি। মৎস্যাদি জলজন্তু সর্ব্বপ্রথমে অল্প জলেই বাস করিত, অধিক নিম্নে কোন প্রকার জীব অথবা উদ্ভিদের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু ক্রমে যখন তাহাদের সংখ্যা অধিক হইতে লাগিল এবং খাদ্যাভাবের নিমিত্ত ঈর্ষা এবং প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল, তখন অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল এবং ক্ষুদ্র জন্তুগুলি গভীর জলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। ক্রমে ক্রমে তাহাদের দেহ এবং জীবনযাপনপদ্ধতি স্ব স্ব স্থানোপযোগী হইয়া উঠিল। এইরূপেই সমস্ত সাগরগর্ভ জীবের আবাস স্থান হইয়াছে। মাররে নির্ণয় করিয়াছেন যে ৫ মাইল কিম্বা ততোধিক গভীর জলের নিম্নেও প্রাণী বিদ্যমান থাকিতে পারে কিন্তু ৩০০ ফুটের অধিক নিম্নে উদ্ভিদের উৎপত্তি সম্ভব নহে। ভূপৃষ্ঠ যেমন নানা দেশ এবং প্রদেশে বিভক্ত সমুদ্রে জলেরও সেইরূপ নানা স্তর আছে। প্রথমস্তরে বৃহদাকার জন্তু বাস করে; তাহারা সাধারণতঃ উদ্ভিদ্ ভক্ষণ করিয়াই প্রাণধারণ করে। উক্ত স্তরবাসী কাহারও মৃত্যু হইলে, তাহার দেহ তন্নিম্ন স্তরে পতিত হয়, এবং তথাকার অধিবাসী তাহার দেহ ভক্ষণ করে। এইরূপে সকলেরই খাদ্যবস্তু সংগৃহীত হয়। নিম্নতম স্তরের প্রাণীরা পুরীষ এবং আবর্জ্জনা ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করে। অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন, সমুদ্রের জল সকল স্থলেই একরূপ কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; স্তর ভেদে জলেরও গুণ ভেদ আছে।

আমরা যেমন নিরন্তর বায়ুর ভার বহন করিতেছি কিন্তু তাহা অনুভব করিতে পারি না, জলজন্তুরাও সেইরূপ ভার বহন করিতেছে, কিন্তু ইহা তাহাদের বোধগম্য নহে। দুই মাইল সমুদ্রের নিম্নে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে দুই টন ভার আছে, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র মৎস্যও সেই ভার অবহেলায় বহন করিতেছে। কোন মৎস্যই আপনার নির্দ্দিষ্ট স্তর পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাইতে পারে না। যদি কোন ক্রোধান্ধ মৎস্য অন্য মৎস্যের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ঊর্দ্ধ স্তরে আগমন করে, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত। জলের ভার লঘু হওয়াতে সে স্ফীত হইতে আরম্ভ করে, এবং ক্ষণেক পরেই তাহার দেহ বিদীর্ণ হইয়া যায়। অনেক ক্রোধান্ধ মৎস্যের মৃতদেহ সমুদ্রে ভাসিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। প্রবলের আক্রমণ হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্য সৃষ্টিকর্ত্তার এ অতি অদ্ভুত উপায় বটে। জীবের প্রাণ ধারণের নিমিত্ত অক্সিজেন বায়ু (Oxygen) নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু দুই মাইল জলের নিম্নে কি প্রকারে এই বায়ুর যাতায়াত ঘটে তাহা প্রথমতঃ একটী গুরু-সমস্যা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই ক্রিয়া অতি সহজে সম্পাদিত হয়। নদীর যেমন স্রোত আছে সমুদ্রেরও সেইরূপ স্রোত আছে; সমুদ্রের এই স্রোত দুই প্রকার একটী আমাদের নয়নগোচর হয়; ইহা জলের উপর দিয়াই প্রবাহিত হয়। কিন্তু অপরটী দুই তিন মাইল কিম্বা ততোধিক গভীর জলের নিম্নে প্রবাহিত। এই প্রকার স্রোত একস্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া অতল জল ভেদ করিয়া অন্য এক স্থানে প্রবাহিত হয় এবং ইহার সাহায্যেই (Oxygen) বায়ু জলের নিম্নে প্রবেশ করে। আবার মেরু প্রদেশের শীতল জল বায়ু আকর্ষণ করিতে সমর্থ এবং তৎসাহায্যেও মৎস্যেরা প্রাণধারণের উপযোগী বায়ু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সমুদ্রের সহিত কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই বলিয়া Black seaতে কোন প্রকার জল স্রোত নাই এবং গভীর জলোপযোগী কোন প্রাণীও তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ নহে।

কখন কখন প্রবল ঝটিকায় সমুদ্রের জল স্থানান্তরিত হওয়ায় অতি নিম্ন প্রদেশের শীতল জল উপরে উত্থিত হয়। তখন স্তরভ্রষ্ট হইয়া সহস্র সহস্র মৎস্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৮৮৮ সালে উত্তর আমেরিকার পূর্ব্ব উপকূলে প্রবল ঝড়ে বহুসংখ্যক প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। বহুবর্গ মাইল ব্যাপিয়া মৃতের সংখ্যা ৬ ফিট উচ্চ হইয়াছিল।

মনুষ্য কখনও সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশে গমন করিয়া নানাবিধ জন্তু এবং উদ্ভিদ্ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিবে কিনা ইহা বৈজ্ঞানিকদিগের এক গুরু-চিন্তার বিষয় হইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তরে সার জন্ মারে দৃঢ়ভাবে "না" বলা যুক্তি সঙ্গত মনে করেন নাই, কিন্তু তিনি এই বলিয়াছেন—"মানব চক্ষু সমুদ্রের অতি গভীর স্থান দেখিতে পারিবে না, ইহাই আমার মনে হয়"।

শ্রীমনোরঞ্জন রায়।

ময়মনসিংহের ভক্ত রূপচন্দ্র।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের সীমা প্রাচীন কালে যতদূরই বিস্তৃত থাকুক, বর্ত্তমান গৌহাটী প্রভৃতি স্থান ইহার সীমার অন্তবর্ত্তী ছিল বলিয়া অবধারিত। আয়তনের সঙ্কোচ সহকারে প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যই কামরূপ নামে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া নির্দ্ধারিত। রঘুবংশে লিখিত হইয়াছে যে রঘু লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) পার হইলে প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর কম্পিত হইয়াছিলেন। (৪।৮১) যোগিনী তন্ত্রে কামরূপের পশ্চিমসীমায় করতোয়া নদীর নাম উল্লেখিত আছে; কিন্তু ঐ তন্ত্রেই শ্রীহট্টের পশ্চিম সীমা স্থলে লৌহিত্যের নাম লিখিত রহিয়াছে। যোগিনী-তন্ত্রে কামরূপের যে সীমা লিখিত হইয়াছে, উহা যদি রাষ্ট্রীয় সীমা নাও হয়, তথাপি কামরূপের সীমা যে অনেক বিস্তৃত ছিল, তার সন্দেহ নাই।

প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, পাঠান রাজত্বের পূর্ব্বেও কামরূপের অধিকার বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে ছিল। এক সময় ময়মনসিংহের এগারসিন্ধুর নগরটি কামরূপ রাজ্যের অধিকৃত ছিল বলিয়া উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে। উহা ব্রহ্মপুত্র তীরেই অবস্থিত।*

পূর্ব্বে আমরা এই এগারসিন্ধুরের সন্নিকটবর্ত্তী ভিটাদিয়া গ্রামবাসী লক্ষ্মীকান্ত লাহিড়ীর নামোল্লেখ করিয়াছি; এ প্রস্তাবে তাঁহারই পুত্র রূপচন্দ্রের কথা অতি সংক্ষেপে কথিত হইবে।

রূপচন্দ্র বাল্যকালে লেখা পড়ায় মনোযোগী ছিলেন না বলিয়া পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হন, এবং একদিন কাহাকেও না বলিয়া নবদ্বীপ গমন করেন। নবদ্বীপে কিছুদিন মধ্যেই তিনি অতুল অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়ন পূর্ব্বক ছাত্র বর্গের মধ্যে প্রভূত প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহার পরিশ্রম ও প্রতিভার পুরস্কার স্বরূপ পণ্ডিত সমাজ তাঁহাকে "আচার্য্য" উপাধি প্রদান করেন। যখন রূপচন্দ্র এই উপাধি প্রাপ্ত হন, তখন নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ ন্যায় শাস্ত্র লইয়া উন্মত্ত, ধর্ম্ম বলিয়া কিছু আছে, তদ্বিষয়ে পণ্ডিতবর্গের মন তখন ধাইত না, তদবস্থায় রূপচন্দ্রও একরূপ নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। রূপচন্দ্রের অধ্যয়ন লিপ্সা নবদ্বীপে নিবৃত্ত না হওয়ায় ততোধিক অধ্যয়নের জন্য তিনি পুণা নগরে যাত্রা করেন। তৎকালে নীলাচলের পথেই দক্ষিণদেশে যাইতে হইত, রূপচন্দ্রও শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন ও সংকীর্ত্তন-নিরত নদীয়ার নিমাইচাঁদকে দূর হইতে দেখিতে পাইলেন। নিমাইর নর্ত্তন-কীর্ত্তন দর্শনে রূপচন্দ্রের তর্ক-নিষ্ঠ কঠোর চিত্তও বিচলিত হইল; তাঁহার বোধ হইল, জগতের সার এই নবীন সন্ন্যাসী—আর তাঁহার কীর্ত্তনই একমাত্র অনুকরণীয়। কিন্তু সুচতুর রূপচন্দ্র নিজ হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া আত্মরক্ষার উপায় করিলেন, তাড়াতাড়ি শ্রীচৈতন্যকে দূর হইতেই প্রণাম করিয়া জগন্নাথ দর্শন পূর্ব্বক পলাইলেন ও তথা হইতে পুণাতে পৌঁছিয়া বেদাদি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিক্রমশালী জিগীষু রাজন্যগণের ন্যায় প্রখর পণ্ডিত বর্গও পূর্ব্বকালে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন ও প্রতিদ্বন্দ্বী

---

* "বঙ্গদেশে কামরূপ রাজ্য অতি শুদ্ধ।
পাঠানে লইল তাহা করি মহাযুদ্ধ॥
সে দেশের রাজধানী এগারসিন্ধুর।
ব্রহ্মপুত্র পারে স্থিত অতি মনোহর॥"
প্রেমবিলাস গ্রন্থ।

পরাজয়ে জয়পত্র সংগ্রহে সমুৎসুক ছিলেন। পুণাতে অধ্যয়ন সমাধা পূর্ব্বক এই পণ্ডিত প্রবরও সেই রীতি অনুসারে পণ্ডিত-পরাজয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। পুণা হইতে যাত্রা করিয়া, পথে যথায় যে পণ্ডিতের নাম শুনেন, বিচারার্থ তৎসমীপে উপস্থিত হন ও তাঁহাকে পরাজয় পূর্ব্বক জয়পত্র সংগ্রহ করেন। এইরূপে পণ্ডিত সমাজের ভয়োৎপাদন করিয়া তিনি বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। বৃন্দাবনের রূপসনাতনের নাম দূর হইতে শুনিয়াছিলেন, তাই বিচারার্থী হইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হন।

গৌড়াধিপতি হুসেনশাহের ভূতপূর্ব্ব অন্যতম সচিব রূপসনাতন মহাপণ্ডিত হইলেও, তাঁহারা ঐশ্বর্য্যত্যাগী দীনচরিত্র সন্ন্যাসী ছিলেন; বিদ্যাগর্ব্বিত রূপচন্দ্রের সহিত তাঁহারা বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন কেন? তাঁহারা তাঁহার 'আটোপ টঙ্কার' শ্রবণে মাত্র ঈষদ-হাস্য করিলেন ও বাক্য ব্যয় ব্যতিরেকে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন; বহির্ম্মুখ তার্কিক সহ বৃথা সম্ভাষণে সময়ক্ষেপ করিলেন না।

রূপচন্দ্র ভাবিলেন যে ভয়ে ভ্রাতৃযুগল তৎসহ বিচারে রত না হইয়া স্বতঃ জয়পত্র প্রদান করিয়াছেন; তাই তিনি তদ্রূপ আলাপ করিতে করিতে যমুনার তীরপথে যাইতে ছিলেন। শ্রীরূপের শিষ্য (ও ভ্রাতুষ্পুত্র) শ্রীজীব যমুনার ঘাট হইতে গুরুনিন্দা শুনিতে পাইলেন; গুরু-নিন্দা শ্রবণে তাঁহার কর্ণরন্ধ্র যেন দগ্ধ হইতে লাগিল, তিনি আর সহিতে পারিলেন না, গর্ব্বিত পণ্ডিতকে বিচারার্থ আহ্বান করিলেন।

সেই যমুনা ঘাটেই ঘোরতর বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সপ্তমদিনের বিচারে রূপচন্দ্র পরাজিত হইলেন; রূপচন্দ্র তখন রূপসনাতনের স্বেচ্ছায় জয়পত্র প্রদানের প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিলেন। রূপচন্দ্রের তখন অনুতাপ জন্মিল, রূপসনাতনকে মনে মনে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন বলিয়া, প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি শ্রীরূপের শিষ্যত্ব গ্রহণে প্রয়াসী হইলেন। কিন্তু তখন তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না; বৈষ্ণবীয় মন্ত্র দীক্ষালাভের তখনও তাঁহার যোগ্যতা জন্মে নাই বুঝিয়া শ্রীরূপ দীক্ষা দিলেন না, শুধু হরিনাম গ্রহণের উপদেশ মাত্র প্রদান করিলেন। কিন্তু তাহাতেই রূপচন্দ্রের জীবনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল, নারায়ণে অবিচলিত-চিত্ত রূপচন্দ্র তদবধি রূপনারায়ণ নামে পরিচিত হইলেন।

বহুদিন রূপচন্দ্র গুরুসন্নিধানে বৃন্দাবনে ছিলেন, তাহার পর তিনি বঙ্গদেশে আগমন করেন। বঙ্গদেশে পক্কপল্লীর রাজা নরসিংহ রায় সহ প্রথমেই তাঁহার পরিচয় হয় এবং রাজানুরোধে তিনি তথায় অবস্থিতি করেন।* ঐ সময়ে খেতরীতে নরোত্তম ঠাকুরমহাশয়, পদকর্ত্তা গোবিন্দদাসের জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র কবিরাজ সহ অবস্থিতি ক'রতেছিলেন, ঠাকুরমহাশয় কায়স্থসন্তান হইলেও তাঁহার অসাধারণ গুণে আকৃষ্ট হইয়া অনেক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। ইহাতে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু সমাজে তখন এক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

পক্কপল্লীর রাজসভায় অনেক পণ্ডিত ছিলেন, দিগ্বিজয়ী রূপচন্দ্রের নামও দেশ বিদেশে বেশ প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল; ইহাতে নানাদেশের বিশিষ্ট জনগণ নরসিংহের দরবারে উপস্থিত হইয়া ঠাকুরমহাশয়কে দমনের প্রার্থী হন। সমাগত লোক সকলের সাগ্রহ অনুরোধে ও প্রার্থনায় পণ্ডিতমণ্ডলী সহ রাজা নরসিংহ খেতরীতে আগমন করেন। কিন্তু ফল বিপরীত হইল; রূপচন্দ্রের পাণ্ডিত্য, ভক্তির মাহাত্ম্যে ডুবিয়া গেল,—তিনি এবং রাজা নরসিংহ নরোত্তমের শিষ্য হইলেন।

রূপচন্দ্র তৎপর যখন জন্মভূমি ময়মনসিংহে আসিলেন, তখন তিনি সাধু পিতার উপযুক্ত পুত্র রূপেই, পরমগুরু রূপেই আসিয়াছিলেন। এদেশে অনেকেই যে তাঁহার কাছে ভক্তি সিদ্ধান্ত শ্রবণে কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।

---

* "সঙ্কীর্ত্তনে কৈলা মহাপ্রভুর দর্শন।
দূরে থাকি শ্রীচৈতন্যে প্রণাম করিয়া।
জগন্নাথ দর্শন কৈলা আনন্দিত হৈয়া॥
সেথা হৈতে মহারাষ্ট্র পুণা নগরীতে।
বেদাদি পড়িতে গেলা হরষিত চিতে॥"
প্রেমবিলাস গ্রন্থ।

* প্রেমবিলাস গ্রন্থ ১৫২২ শকাব্দে রচিত হয়, গ্রন্থকার পক্কপল্লীতে উপস্থিত হইয়া রূপচন্দ্রের নিকট কিছুদিন যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

আনন্দ সম্মিলন।

ময়মনসিংহ আনন্দ সম্মিলনে পঠিত।

এস সবে এস আজি শোক দুঃখ ভুলি,
এসহে আনন্দ মনে, এ আনন্দ সম্মিলনে,
মুছিয়া মনের মলা ঘৃণা গ্লানি গুলি!
ভুলি হিংসা ভুলি দ্বেষ, শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষ,—
সরল প্রসন্ন মনে এস প্রাণ খুলি,
উদার আকাশ সম, হৃদয় বিশালতম,
বিরাট বিশাল বিশ্বে দেই কোলাকুলি,
এস ভাই এস আজি শোক দুঃখ ভুলি!

এস মুছে অশ্রুজল—লাজ লজ্জা ভুলি,
আনন্দের জন্মভূমি, আনন্দের দেশে তুমি
জন্মিয়াছ, মহানন্দে এস বাহু তুলি,
আনন্দ চরিত্রে ধর্ম্মে, আনন্দ পবিত্র কর্ম্মে,
এ দেশে আনন্দতীর্থ,—পুণ্য পদ ধূলি
পাইয়ে কৃতার্থমন্য, ধরণীতে ধন্য ধন্য!
তুমিও আনন্দ ময় দেখ চক্ষু খুলি,
হেথা নাই দুঃখ ক্লেশ, কেন ম্লান হীন বেশ,
বক্ষ যে ভরসা হীন কক্ষে ভিক্ষা ঝুলি,
কেন যে পরের দ্বারে, কৃপাপ্রার্থী বারে বারে,
আমেরিকা আফ্রিকায় কেন তুমি কুলি?
এ দেশ কি অন্ন নাই, এ দেশে কি নাই ঠাঁই?
ভবিষ্য আনন্দ ডাকে হেলায়ে অঙ্গুলী,
এস ভাই ঐক্যে সখ্যে করি কোলাকুলি!

কেন তুমি মোহমুগ্ধ, কেন আছ ভুলি,
আনন্দের ন্যায় সত্য, শিক্ষা দীক্ষা সে মহত্ব,
আয়ত্ত করিয়া লও গুণ-কর্ম্ম গুলি!
অতুলন ভ্রাতৃভাবে, মহাশক্তি প্রাণে পাবে,
বিশ্বাসে নিঃশ্বাসে যাবে নাগপাশ খুলি,
উদ্যম উৎসাহে তার, দূরে যাবে অন্ধকার,
পাইবে আনন্দ পথ যাহা গেছ ভুলি!
এমন আনন্দ ভরা, রত্ন আহরণ করা,
সংযমী সম্রাট্ সম যত্নে পর তুলি,
এ নব আনন্দ দৃশ্যে, আনন্দ জাগিবে বিশ্বে,
না রহিবে শোক দুঃখ—ঘৃণা গ্লানি গুলি,
এস ভাই ঐক্যে সখ্যে করি কোলা কুলি!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

১৮ই মাঘ, ১৩২০।

শুভ-দৃষ্টি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(৪)

১৫ই অগ্রহায়ণ, ঢাকা। এখানে আসিয়াই শুনিলাম, শৈবালের বিবাহ হয় নাই। বর পক্ষের ব্যবহারের দোষে, অকারণ পণের দাবিতে—বিবাহ ফিরিয়া গিয়াছে। চণ্ডীবাবুর অবস্থা এমন নহে যে তিনি তাহার কন্যা জামাতাকে ২।৪ হাজার টাকা নগদ না দিতে পারেন। দান সামগ্রীতে দিবার ব্যবস্থাও ছিল, ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক। চণ্ডীবাবু জিদের লোক নহেন; অন্যায় দাবি রক্ষা করিবারও পক্ষপাতী নহেন; বিশেষ মেয়ে বিবাহে পণ দেওয়া ও ছেলে বিবাহে পণ লওয়া। তাঁহার মেয়ে বিবাহে পণের কথা ছিলনা, অকস্মাৎ বিবাহ সভায় ছেলের পিতা গুঁ ধরিলেন—নগদ কিছু দিতে হইবে। চণ্ডীবাবু বলিলেন—তবে কসাইর সহিত সম্বন্ধ করিব না। বিবাহ ফিরিয়া গেল।

সাক্ষাতে চণ্ডীবাবু বলিলেন—কসাইর সহিত সম্বন্ধ হইতে ভগবান দেন নাই—ভগবানের অভিপ্রায় মঙ্গলময়।

১৯ শে অগ্রহায়ণ। বিকালে আফিস হইতে আসিয়া দেখি, টেবিলের উপর জল খাবার রাখিয়া শৈবাল আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। শৈবালের ঘনিষ্টতার উপর এখন আর আমার সঙ্কোচ ভাব নাই। আমি কাপড় ছাড়িতে না ছাড়িতেই অর্গেণ বাজিয়া উঠিল। অবসন্ন প্রাণে শয্যায় পড়িয়া শৈবালের সঙ্গীত সুধা পান করিতে লাগিলাম।

চণ্ডীবাবুর আসিতে বিলম্ব হইলে আমার নিকট তিনি যেন কত দায়ী—এইরূপ ভাবে বিলম্বের কৈফিয়ত দেন—অতি সরল সে কৈফিয়ত।

আজও কৈফিয়ত দিলেন। কিছুক্ষণ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আমি ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহার মত জিজ্ঞাসা করিলাম। দেখিলাম, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার মত অত্যন্ত উদার। তিনি সকল ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ট বলিয়া মনে করেন। তাঁহার ভিতর গোঁড়ামী নাই, নেকামি নাই।

তাঁহার মতের সার ভাগ এইরূপ।

"সৎগুরুর উপদেশ ব্যতীত কোন ধর্ম্মেরই মূল তত্ত্ব লাভ করা যায় না। ভগবানকে জানা বা তাঁহার নিকট পঁহুছার পথই ধর্ম্ম পথ। সে পথ বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে কিন্তু সকলেরই চরম লক্ষ্য বা গন্তব্য স্থান এক। সেই প্রশস্ত ধর্ম্ম ক্ষেত্রের দ্বার পথের চাবি—সৎগুরুর নিকট হইতে লাভ করিতে হইবে। ধর্ম্ম মন্দিরের সোপান শ্রেণী নিষ্কণ্টক নহে! গুরুর নিকট হইতে চাবি গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম ক্ষেত্রের অর্গল মুক্ত করিতে হইবে। তার পরেই সোপান শ্রেণী। সোপানের নিম্নপংক্তি অতিশয় পিচ্ছল; এই সোপান অতিক্রম করিতে দৃঢ়তা চাই, লক্ষ্য স্থির চাই, সুতরাং অবলম্বন ব্যতীত অতিক্রম করা কঠিন। এখানেই কেহ কেহ প্রতিমা পূজার আবশ্যতা উপলব্ধি করেন; কেহ নিরাকার ব্রহ্মের কল্পনা করেন, কেহ ভগবানের প্রতিনিধি স্বরূপ দ্বিতীয় কোন মহাত্মাকে অবলম্বন করিয়া এই সোপান পংক্তি অতিক্রমের ব্যবস্থা করেন, ফলে সকলই এক। এখানে কোন অবলম্বন চাইই। এতদ্ব্যতীত এখানে ভীত ও তরল মন স্খলিত হইবার পদে পদে সম্ভাবনা আছে, তাই কতক পরিমাণে লৌকিক অনুষ্ঠানের এই স্থানে আবশ্যকতা আছে। প্রাথমিক উদ্যমে লৌকিক অনুষ্ঠান ব্যতীত চিত্ত শুদ্ধি হয় না। পুষ্প বিল্ব পত্রে নয়নকে, ধূপ-চন্দনে চিত্তকে, হস্ত পদ প্রক্ষালনে মনের নিকট শরীরকে, বিশুদ্ধ করিতে হইবে। পূজার ঘর বা উপাসনা মন্দির, জুম্মা বা চার্চ বেশ পরিষ্কার রাখিবে; তারপর বিহীত অনুষ্ঠানের সহিত আশ্রয় স্মরণ করিয়া ভগবানের পাদ পদ্মাভিমুখে ভক্তি বৃত্তি পরিচালনা করিতে হইবে।

"ভক্তিবৃত্তি দৃঢ় হইলে লৌকিক অনুষ্ঠান আবশ্যক হইবেনা। তখন ভক্ত দ্বিতীয় সোপানে উঠিতে সমর্থ হইবে। তখন ভগবানের অযাচিত দান—জগতের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া নয়ন চরিতার্থ ও মন শান্ত করিতে চেষ্টা করিবে। তীর্থ ভ্রমণ, ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ, মহাপুরুষগণের উপদেশ শ্রবণ করিয়া ভগবানকে লাভ করিবার উপায় অন্বেষণ করিবে। এই সোপানে ভক্তের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে।

"তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে আর কোন কিছুর আবশ্যক হইবে না। তখন তাঁহার নিকট সাকার নিরাকার নাই, প্রতিনিধি গুরু নাই। ভক্ত তৃতীয় সোপানে আরোহণ করিয়া ভগবানের সমীপবর্ত্তী হইবে! এই সোপানে যোগ সাধনার ক্ষেত্র।

"জীবাত্মা—পরমাত্মারই অংশ; জীবাত্মা মল সংযুক্ত পরমাত্মা নির্ম্মল। যোগ সাধনায় জীবাত্মা মল শূন্য হইয়া পরমাত্মার সমকক্ষতা লাভ করিবে। তখন ভক্ত চতুর্থ সোপানে উঠিবে- তাঁহার "অহংব্রহ্ম" বলিবার অধিকার হইবে,ইহাইধর্ম্ম জগতের শ্রেষ্ঠস্থান,এই পন্থাই সর্ব্বজাতির ব্রহ্ম বা ভগবান লাভের পন্থা।"

বাস্তবিক চণ্ডীবাবুর ধর্ম্ম মত অদ্ভুত. আমি তাঁহাকে এপর্য্যন্ত কোন নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া জানিতে পারি নাই। হিন্দু ব্রাহ্মণ খৃষ্টীয়ান সকল সম্প্রদায়েই তিনি আগ্রহে যোগদান করিয়া থাকেন। আমি নিজে যে কোন সম্প্রদায় ভুক্ত তাহাও বুঝিতে পারিতেছিনা। কোন কোন বিষয়ে আমি চণ্ডীবাবুর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি সকল স্থানেই যাতায়াত করেন, আমি কোনস্থানেই যাই না; ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, হিন্দু কোন সম্প্রদায়ের সহিতই আমার বিশেষ সহানুভূতি নাই। সৎপথে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন ও ভগবানের নাম স্মরণ—আমি মানুষের সৎধর্ম্ম বলিয়া মনে করি।

১৯ শে অগ্রহায়ণ রাত্রি ৯টা। আহারের পর শয্যায় শুইয়া শুইয়া কতক্ষণ এক মনে চণ্ডীবাবুর ধর্ম্ম ব্যাখ্যা চিন্তা করিতেছিলাম; শেষ বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্ম ব্যাখ্যা খানা লইয়া একটু উচ্চৈস্বরে পাঠ করিতে লাগিলাম।

শৈবাল কখন আসিয়া আমার নিকট বসিয়া ছিল, আমি টের পাই নাই। পাশ ফিরিতে যাইয়া দেখি—শৈবাল। বড়ই ঘৃণা হইল। আমি বলিলাম "শৈবাল এত রাত্রে তুমি এখানে কেন"?

শৈবাল বলিল—"তাহাতে দোষ কি?"

আমি বলিলাম "দোষ"ক্ষতি আছে বৈ কি।"

শৈবাল - ' আমাকে না বলিলে আমি বুঝিব কি করে?"

আমি—"সে কথা কাল, বলিব, এখন বলিবার সময় নহে। লোক চক্ষে অন্ততঃ এটা ভাল দেখায় না?"

শৈবাল—"লোকের কথায় কি হইবে? আমি নিজেতো কোন অন্যায় দেখিতেছি না।"

আমি কোন উত্তর করিলাম না, দেখিয়া শৈবাল বলিল—"আমার আসাটা কি তবে দুরভিসন্ধির বলিয়া মনে করেন?"

আমি—"এরূপ—অনুমান করা অন্যায় কি?"

শৈবাল উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার চক্ষে অশ্রুধারা; সে আস্তে আস্তে বলিল—"তবে আমি যাই।"

আমি প্রত্যুত্তর করিলাম না।

"শৈবাল যাইতে যাইতে কি যেন বলিবে বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।"

শৈবাল যাইতে যাইতে কি যেন বলিবে বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। অপমানে ও ধিক্কারে যেন তাহার বক্ষ-পঞ্জর বিদীর্ণ হইয়া যাইতে ছিল। কিছু না বলিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

অশান্ত-হৃদয়ে "গীতা" খানা খুলিলাম এবং একমনে ভগবানের উদ্দেশ্যে বলিলাম—

"ভগবান তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

নারায়ণ দেব।

শেষ অংশ।

অপর এক বিষয় সম্বন্ধে সতীশ বাবু এবং অচ্যুত বাবু ও বিরজা বাবুর মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হইয়াছে। নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে ভণিতা আছে—

"নারায়ণ দেবে কয়, সুকবি বল্লভ হয়,
নারীগণে দিতেছে জোকার।"

সতীশ বাবু বলেন"কবিবল্লভ"নারায়ণ দেবের উপাধি। অচ্যুত বাবু ও বিরজা বাবু বলেন, কবিবল্লভ ভিন্ন এক ব্যক্তির নাম, সু নামের বিশেষণ। বিরজা বাবু অধিকন্তু বলেন, নামটি কবিবল্লভ হইতে পারে এবং কেবল বল্লভও হইতে পারে। তাঁহার মতে নাম বল্লভ এবং সুকবি বিশেষণ হইলে যোজনাটা ভাল মানায়। সরল ও সহজ ভাবে বুঝিতে গেলে কবিবল্লভ উপাধি বলিয়াই বুঝা যায়। কবিবল্লভ নাম কাহারও শুনা যায় না এবং এমন নাম রাখিতেও দেখা যায় না। অচ্যুত বাবু লিখিয়াছেন পূর্ব্বে কবিবল্লভ নামে কোন ব্যক্তি ছিল, এমন সন্ধান তিনি পাইয়াছেন। যদি সন্ধান পাইয়া থাকেন, বাস্তবিক তাহা নাম নহে, উপাধি। উপাধিতেই সেই ব্যক্তি বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত হইয়াছিলেন, তাই নাম লোপ পাইয়া উপাধিটি রহিয়া গিয়াছে। চণ্ডী কাব্যের রচয়িতাকে সর্ব্বসাধারণে কবিকঙ্কণ বলিয়াই জানে। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী নাম অল্প ব্যক্তির নিকটই পরিচিত। আলোচ্য পদোক্ত 'কবিবল্লভ' নাম হইতে পারে না। পূর্ব্বের সু টি ইহার বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষ কোন নামের পূর্ব্বে 'সু' ব্যবহৃত হয় না; হইতেও পারে না। সুমুকুন্দরাম, সুভারতচন্দ্র হয় না;

উল্লিখিত পদটির কি অর্থ হয়, এখন দেখা যাউক। আমরা দেখি ইহার সরল অর্থ এই হয়,—নারায়ণ দেব, যে সুকবিবল্লভ হয়, সে কয়—নারীগণে জোকার দিতেছে। অচ্যুত বাবু বলেন, কেহ এই অর্থ করে, "নারায়ণ দেব কবিতা লিখিয়া স্বীয় বন্ধু কবিবল্লভ নামক ব্যক্তিকে শুনাইতেন, শুনিয়া তিনি 'হয়' বলিয়া অনুমোদন করিতেন।" অচ্যুত বাবুর অর্থটি হাস্যজনক হউক বা না হউক, রহস্যজনক বটে। কেননা কবিবল্লভ নারায়ণ দেবের বন্ধু ছিলেন, নারায়ণ দেব কবিতা লিখিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন, তিনি হয় করিতেন—এ সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব তত্ত্বনিধি মহাশয় কোথায় পাইলেন? উল্লেখিত পদটিতে বা পদ্মাপুরাণের কোন স্থলে এ সকল কথারতো লেশও নাই।

কবিবল্লভ যে নারায়ণ দেবের উপাধি ছিল, সতীশ বাবু তাহা নারায়ণ দেবের অন্যান্য স্থানের উক্তি দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তবে সতীশ বাবু যে লিখেন, নারায়ণ দেবের স্বহস্ত লিখিত পদ্মাপুরাণ হইতে পরিচয় সূচক কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, একথা আমরা বিরজা বাবুর সহিত এক মত হইয়া অত্যুক্তিই মনে করি। নারায়ণ দেবের স্বহস্ত লিখিত ৫০০ কি ৪৫০ বৎসরের পুঁথি এইক্ষণ কখনই বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। আমরা যে সকল পুঁথি এইক্ষণ প্রাপ্ত হই, বিপরীত প্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহা নারায়ণ দেবের নিজ পুথি হইতে হস্ত পরম্পরায় লিখিত হইয়া আসিয়াছে, মনে করিব এবং সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব। সতীশ বাবু নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ হইতে এই এই কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন—

(১) "কায়স্থ পণ্ডিত বড় বিদ্যা বিশারদ।
সুকবি বল্লভ খ্যাতি সর্ব্বগুণ যুত॥"

(২) "সুকবি বল্লভ হয়ে দেব নারায়ণ।
এক লাচাড়ী কহে অনাদি জনম॥"

এই দুইটি কবিতা দ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে 'কবিবল্লভ' নারায়ণ দেবের উপাধি ছিল। প্রথম কবিতাটি সম্বন্ধে বিরজা বাবুর বিতর্ক এই,—বিদ্যাবিশারদ, সর্ব্বগুণ যুত ইত্যাদি আড়ম্বর পূর্ণ আত্মশ্লাঘা সূচক শব্দগুলি এক জন প্রাচ্য কবির পক্ষে অসম্ভব বোধ হয়। ইহা নিশ্চয়ই পরবর্ত্তী যোজনা।" নারায়ণ দেবের লেখায় স্থানে স্থানে ইহা অপেক্ষা অধিকতর শব্দাড়ম্বর দৃষ্ট হয়। নারায়ণ দেব বিনয়ভাবে যাহাই বলিয়া থাকুন না কেন, তিনি পণ্ডিত ছিলেন। বিনয় এবং আত্মশ্লাঘা এ দুইই কবিগণ করিয়া থাকেন। আত্মশ্লাঘা না করিয়াছেন, এমন কবি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন্। আত্মগরিমার প্রতিমূর্ত্তি শ্রীকণ্ঠ ভবভূতি গ্রন্থ লিখিয়া বলিয়াছিলেন, আমি এ গ্রন্থে যে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলাম, তাহা বুঝে, আমার সমকালে এমন পণ্ডিত জন্মে নাই। তবে—"কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলাচ পৃথ্বী।" সুতরাং কোন কালে এই পৃথিবীর কোন স্থলে কেহ জন্মিতে পারে। আমাদের বাঙ্গলার কৃত্তিবাস এবং মুকুন্দরাম আপন আপন কাব্যে স্বীয় স্বীয় পাণ্ডিত্যের বড়াই করিয়া গিয়াছেন। ভারতচন্দ্র নিজেই মহাকবি বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছেন,—

"শুনি স্বরে মহাকবি ভারত ভারত।
এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত॥"

বাঙ্গলার কবি কেশরী শ্রীমধুসূদন নিজের কল্পনাকে (প্রকারান্তরে নিজকে) আদেশ করিয়াছেন,—

"—রচ মধুচক্র গৌড় জন যাহে.
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

যদি সকল কবিই আত্মশ্লাঘা করিতে পারেন, তবে সে কালের প্রাচীন কবি নারায়ণদেব করিয়াছেন দোষ কি? দ্বিতীয় কবিতাটার সম্বন্ধে বিরজা বাবু সতীশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"উদ্ধৃত পংক্তি দ্বয়ের তিনি কিরূপ ব্যাখ্যা করেন? 'হয়ে' পদের অর্থ কি, ইহা কাহার সহিত অন্বিত? তৎপর অচ্যুত বাবু যেরূপ রহস্যকর অর্থ করিয়াছেন, তিনিও উক্ত পদ দ্বয়ের সেইরূপ অর্থ করিয়াছেন। অর্থাৎ "আমি নারায়ণদেব অনাদি জনম বিষয়ে এক লাচাড়ী করিতেছি, এই বিষয়ে সুকবিবল্লভ 'হয়ে' অর্থাৎ হাঁ করেন।" কথিত কবিতাটির এই অর্থ হয় কি? আমারা ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করি,—দেব নারায়ণ সুকবিবল্লভ হয়ে (হয়), সে অনাদি জনম বিষয়ে এক লাচাড়ী কহে। দেব নারায়ণ কর্ত্তা, হয়ে ক্রিয়া এবং সুকবিবল্লভ বিশেষণ। হয় এবং হাঁ এক শব্দ বা একার্থ বোধক নহে। 'হয়'

ক্রিয়া; 'হাঁ' অব্যয়। 'হয়ে' শব্দ উচ্চারণে সংক্ষিপ্ত হইয়া, হয় হইয়াছে। * প্রাচীন বাঙ্গলায় হয়েই ছিল।

এই 'সুকবিবল্লভ' বাক্যটির আলোচনায় বিরজা বাবু আমাদিগের এক কৈফিয়ত তলব করিয়াছেন। আমাদের সম্পাদিত বংশীদাসের পদ্মাপুরাণের প্রস্তাবনায় আমরা লিখিয়াছি, নারায়ণ দেব পদ্মাপুরাণ রচনা করিয়া যশস্বী হয়েন এবং কবিবল্লভ উপাধি লাভ করেন।" এইরূপ লিখাতে তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "গ্রন্থ রচনা পূর্ব্বে না উপাধি লাভ পূর্ব্বে, উপাধি লাভ যদি পরে হয়, তাহা হইলে 'সুকবিবল্লভ' পদটা কি ভবিষৎ উপাধি প্রাপ্তির প্রত্যাশায় নারায়ণ দেব গ্রন্থ মধ্যে যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন?" ইহার উত্তর একেবারেই দেওয়া যাইতেছে। গ্রন্থ রচনা পূর্ব্বে, এবং উপাধি লাভ পরে হইলেও, নারায়ণ দেব সুকবিবল্লভ পদটা ভবিষৎ উপাধি প্রাপ্তির প্রত্যাশায় গ্রন্থ মধ্যে দেন নাই, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াই দিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্তার জীবৎমানে গ্রন্থের কোন স্থানের পরিবর্ত্তনে বা পরিবর্দ্ধনে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার থাকে এবং গ্রন্থকার তাহা করিয়া থাকেন। নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের হস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি ছিল; তাহাতে হ্রস্বদীর্ঘ হওয়ারই কথা; যে সকল গ্রন্থ মুদ্রিত হয়, তাহাতেও সংস্করণে সংস্করণে গ্রন্থকার পরিবর্ত্তন করেন। কবি বর্ত্তমানে মেঘনাদ বধের দ্বিতীয় সংস্করণে স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের 'বৃত্র সংহারে' প্রথম সংস্করণে প্রথম পংক্তি ছিল—

"বসিয়া পাতাল পুরে সর্ব্ব-দেবগণ।"

দ্বিতীয় সংস্করণে কবি স্বয়ং তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন,—"তাড়িত পাতাল গর্ভে দেবতা সকল।" মুদ্রিত গ্রন্থেই যদি এই হয়, তবে নারায়ণ দেব তাঁহার হস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপিতে 'সুকবিবল্লভ' পদটি পরে বসাইয়া দিবেন, বিচিত্র কি? বিরজা বাবু কেবল পরের দোষোদ্ঘাটনে অশেষ যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বীয় মত সমর্থন পক্ষে বিন্দু মাত্রও প্রমাণ দিতে পারেন নাই।

এইক্ষণ 'মগধ' পর্ব্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। এই মগধই উপরের লিখিত সকল প্রবন্ধের মেরুদণ্ড বলিয়া বোধ হইতেছে। যতদূর বুঝিতে পারা যায়, এই সম্বন্ধীয় সমুদয় বাক বিতণ্ডা এই 'মগধ' শব্দটার উপর নির্ভর করিতেছে। 'মগধ' হইতেই বেহার, কামাখ্যা, শ্রীহট্ট, কবিবল্লভ, ইত্যাদি বাহির হইয়াছে। অতএব 'মগধ' সকল অনর্থের মূল। উহার আলোচনা প্রয়োজনীয়। কোনও পদ্মাপুরাণে নাকি—

"নারায়ণ দেবে কয় জন্ম মগধ।"

এই পদ পাওয়া গিয়াছে। যিনি এই পদটি পাইয়াছেন, তিনি অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, দিগ্বিদিগ জ্ঞান না করিয়া, এক লম্ফে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, নারায়ণ দেবের জন্ম 'মগধে' হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় "আর্য্যাবর্ত্তে" তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"নারায়ণ দেব তাঁহার পদ্মাপুরাণের এক স্থানে লিখিয়াছেন চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সনকা বেহারীয়া রাজার কন্যা ছিলেন। দ্বিজবংশী লিখিয়াছেন মগধের নিকটবর্ত্তী কোন প্রদেশের হলবাহক জাতীয় বছাই নামক রাজা মনসা দেবীর পূজা প্রবর্ত্তিত করেন। নারায়ণ দেব স্বয়ং মগধে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাঢ় হইয়া পূর্ব্ব বঙ্গে ময়মনসিংহের বুড়গ্রামে বাস করেন। সুতরাং এই তিন প্রমাণ দ্বারা অনুমতি হয় যে, মনসা মঙ্গলের উপাখ্যান আদৌ মগধ অঞ্চলের কথা ছিল।" দীনেশ বাবুর তিন প্রমাণের এক প্রমাণ, নারায়ণ দেব বলিয়াছেন, চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সনকা বেহারীর রাজার কন্যা ছিলেন, সুতরাং নারায়ণ দেব বেহারীয় এবং পদ্মাপুরাণের উপাখ্যানটিও বেহার অঞ্চলের বটে। আমরা ইহার ঠিক বিপরীত ভাব বলি। দীনেশ বাবু নারায়ণ দেবের অথবা বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ হইতে কিছু উদ্ধৃত করেন নাই; করিলে ভাল হইত। যাহা হউক তিনি নিজে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ধরিয়াই

* সংস্কৃত 'ভবতি' শব্দ, উচ্চারণ 'ভঅতি'। প্রথম পরিবর্ত্তনে 'ভঅদি' হইয়াছে। বর্গীয় লঘু প্রাণ বর্ণ গুলিতে হকার যুক্ত হইয়া মহাপ্রাণ বর্ণগুলি হইয়াছে, যথা ব্‌হ=ভ। সুতরাং 'ভঅদি'=ব্‌হঅদই। এই ব্‌হঅদই দ্বিতীয় পরিবর্ত্তনে বা প্রাকৃতে ব্‌ দ্‌ গুলি লুপ্ত হইয়া হঅই হইয়াছে। তৃতীয় পরিবর্ত্তনে বাঙ্গলায়, হঅ+ই=হএ বা হয়ে হইয়াছে। তাহাই সংক্ষিপ্ত করিয়া আমরা 'হয়' বলি।

আমাদিগের বলিতে হইবে। 'বেহারীয়া' রাজার কন্যা বলাতেই কবি অথবা উপাখ্যান বেহার অঞ্চলের হইতে পারে না। সনকার পিতার নাম শঙ্খপতি সাধু। এই শঙ্খপতি সাধুকে রাজা বলা হইয়া থাকিলে বুঝিতে হইবে, তিনি বেহারের সাধুগণের প্রধান ছিলেন। বেহার একটি প্রদেশ। এই প্রদেশের কোন বিশেষ স্থানে শঙ্খপতি বাস করিতেন। এক প্রদেশের লোকে অন্য প্রদেশের কোন বিশেষ স্থানের কোন ব্যক্তির নাম বলিতে হইলে, প্রদেশ উল্লেখে বলিয়া থাকে, কিন্তু নিজ প্রদেশের কোন স্থানের কোন ব্যক্তির নাম বলিতে উক্ত বিশেষ স্থান উল্লেখে বলে। যেমন, বঙ্গের লোকে সুরেন্দ্র বাবুর নাম বলিতে বাঙ্গালার সুরেন্দ্র বাবু বলে; বাঙ্গালার লোকে বালগঙ্গাধর তিলকের নাম বলিতে বম্বের বালগঙ্গাধর তিলক বলে। কিন্তু বাঙ্গালার লোকে সুরেন্দ্র বাবুকে কলিকাতার বা বরাহনগরের, এবং বম্বের লোকে বালগঙ্গাধর তিলকে পুনার তিলক প্রভু বলে। পদ্মাপুরাণকার নারায়ণ দেব অথবা তাঁহার উপাখ্যান বেহার অঞ্চলের হইলে, তিনি 'সনকার' পিতার বিশেষ বাসস্থান উল্লেখ করিতেন, বেহারীয়া রাজার বা সাধুর কন্যা বলিতেন না। দীনেশ বাবুর আর এক প্রমাণ, দ্বিজবংশী লিখিয়াছেন মগধের নিকটবর্ত্তী কোন প্রদেশের বাছাই নামক হলবাহক রাজা মনসা দেবীর পূজা প্রবর্ত্তিত করেন। মগধের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাছাই রাজা ছিল, বিরজা বাবু এ কথা অস্বীকার করিয়া দ্বিজবংশীর পদ্মাপুরাণের ঐ অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন বাছাই রাজার নগর নিষধ ও কালঞ্জরের মধ্যে। এই নিষধ ও কালঞ্জর ভারতবর্ষের দক্ষিণে—মান্দ্রাজে, বেহারে নহে। আমরা দীনেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি 'নিষধ' স্থলে মগধ বলিয়া পড়েন নাইতো? ভ্রম প্রমাদ সকলেরইতো হইতে পারে। দীনেশ বাবুর শেষ প্রমাণ, নারায়ণ দেব স্বয়ং মগধে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কেননা, "নারায়ণ দেবে কয় জন্ম মগধ।"

এই 'জন্ম মগধ, সম্বন্ধে রহস্য আছে, তাহা অচ্যুত বাবুর কথা আলোচনার পর উদ্‌ঘাটিত হইবে। এইক্ষণ এই মাত্র বলি যে, নারায়ণ দেব তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ হইতে বাসস্থানের পরিচয় অন্যত্র দিয়াছেন, ভণিতায় 'জন্ম মগধ' কথাটা অসংলগ্ন, খাপ ছাড়া দৃষ্ট হয়।

শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় দীনেশ বাবুর 'মগধ' অস্বীকার করেন না। তিনি এই 'মগধ' বেহারে না হইয়া, শ্রীহট্টে হওয়ার পক্ষে একান্ত আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, "শ্রীহট্টে মগধ বলিয়া একটা বিলুপ্ত-রাজ্য ছিল।" এই কথার প্রমাণার্থে ষ্টার চিহ্ন দিয়া, পাদটিকায় কামাখ্যা তন্ত্রের এক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সে বচন এই,—

ত্রিপুরা কোক্কিকা চৈব জয়ন্তী মণিচন্দ্রিকা।
কাছারী মাগধী দেবী অস্থামী সপ্তপর্ব্বতাঃ।

ইহাতে দেখা গেল, যে সপ্তপর্ব্বত লইয়া কামাখ্যা তন্মধ্যে মাগধী নামে একটা পর্ব্বত আছে। তৎপর দেখাইয়াছেন শ্রীহট্টের এক প্রাচীন কবির পাঁচালীতে আছে,—"শ্রীহট্ট নগর বাস মগধ নৃপতি।" তৎপর বলিয়াছেন,—"জল সুখার নিকটবর্ত্তী আজমীরগঞ্জ যে এক সময় এক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী ছিল, ষ্টুয়ার্ট সাহেবের বাঙ্গলার ইতিহাসে তাহা লিখিত। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতিভা পত্রিকায় প্রকাশিত হস্তাঙ্কিত এক খানা মেপে কি সূত্রে শ্রীহট্ট সহরের উত্তরে মগধ নির্দ্দেশিত হইয়াছে বুঝিতে পারা গেল না।" অচ্যুত বাবু কি বলিলেন আর কি প্রমাণ করিলেন, তিনিই বুঝিয়া দেখুন। বলিলেন শ্রীহট্টে মগধ নামে এক লুপ্ত রাজ্য ছিল। প্রমাণ করিলেন, প্রথমে, কামাখ্যায় মাগধী নামে এক পর্ব্বত আছে। তৎপর শ্রীহট্টে মগধ নামে এক নৃপতি ছিল। তৎপর আজমীরগঞ্জে এক সময় এক ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। তৎপর একখানা মেপে কি সূত্রে শ্রীহট্ট সহরের উত্তরে (অর্থাৎ কামাখ্যায়)মগধ নির্দ্দেশিত হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন না। সুতরাং আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইয়াছে, তিনি কি সূত্রে এই সকল অপ্রমাণ লইয়া শ্রীহট্টে'মগধ'প্রমাণ করিতে প্রস্তুত হইলেন, আমরাও বুঝিতে পারিলাম না। অচ্যুত বাবু আরও বলেন,—নগরের রামধন ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে লিখিয়াছেন নারায়ণ দেব তাঁহাদের নগর গ্রামে ছিলেন, পরে ময়মনসিংহ জেলার বুড়গ্রামে যাইয়া বাস

করেন। নারায়ণ দেবের সময় ৪৫০ বৎসরের পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হয়, বর্ত্তমান সময়ের রামধন ভট্টাচার্য্যের কথা গুলি প্রত্যক্ষের মত বোধ হইতেছে। এই সকল কথা অচ্যুত বাবু বিনা প্রমাণে অম্লান চিত্তে বিশ্বাস করিয়া, আমাদের বিশ্বাসের জন্য তাঁহার প্রবন্ধে স্থান দিয়াছেন। এই সকল কথার কোন মূল্য আছে কি? অচ্যুত বাবুর সহকারী লেখক বিরজা বাবু দেখাইয়াছেন, "মাগধী নামে একটা পর্ব্বত কামরূপ বা কামাখ্যা দেশে আছে। শ্রীহট্ট ও সেই কামরূপের অন্তর্গত ছিল।" অতএব তাঁহার মতে মাগধী শ্রীহট্টের অন্তর্গত। অপরূপ যুক্তি। এই যুক্তি অনুসারে দীনেশ বাবুর পক্ষ হইতে বলা যাইতে পারে, ময়মনসিংহ নামে একটা জেলা বাঙ্গলা প্রদেশে আছে। বেহারও সেই বাঙ্গলা অন্তর্গত ছিল, সম্প্রতি পৃথক হইয়াছে; অতএব ময়মনসিংহ বেহারের অন্তর্গত ছিল। এইরূপ, প্রমাণ ও যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই অচ্যুত বাবু তৎপ্রণীত শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে লিখিয়াছেন,—"ময়মনসিংহ যে কবিকে লইয়া গৌরব করিতে প্রয়াসী, জলসুখা পরগণার নগর গ্রামে সেই নারায়ণ দেব জন্ম গ্রহণ করেন, ইহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।" এই সকল দেখিয়া অবাক হইতে হয়। যুক্তি প্রমাণের এই অশেষ বিড়ম্বনা দেখিয়া, এই সাহিত্য বিভ্রাটের সংশ্রবে আসি, আমাদের ইচ্ছা ছিলনা। কিন্তু মগধের অন্বেষণে এক শ্রীহট্টেই যখন এত গণ্ডগোল; তখন ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল ইত্যাদি জেলার লোক মগধের তল্লাসে প্রবৃত্ত হইলে এবং ঐ ঐ জেলার সাহিত্য রথিগণ একত্র হইলে, তখন সাহিত্যে একটা কুরুক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইবে, এই ভাবিয়া নীরব থাকিতে পারিলাম না।

নারায়ণ দেবের নিজের উক্তি—

"পূর্ব্ব পুরুষ মোর বড় শুদ্ধমতি।
রাঢ় ছাড়িয়া বুর গ্রামেতে বসতি"

আবার 'জন্ম মগধ'ও পাওয়া গিয়াছে, তাই, বোধ হয়, দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন, নারায়ণ দেব মগধে জন্ম গ্রহণ করিয়া, রাঢ় হইয়া বুরগ্রামে আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন। কিন্তু নারায়ণ দেবের উক্তিমতে বুঝা যায়, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ রাঢ় ছাড়িয়া বুড়গ্রামে যান। এখানে তিনি মগধের নাম উল্লেখ করেন নাই। অবস্থা মতে 'মগধের' সহিত নারায়ণ দেবের জন্মের কোন সম্বন্ধ থাকা দৃষ্ট হয় না। সম্বন্ধ রাখিতে গেলে, আমরা আনুমানিক এক সংস্থা করিয়া দিতে পারি, তাহা এই,—নারায়ণ দেবের পূর্ব্বপুরুষগণ রাঢ় ছাড়িয়া বুড়গ্রামে আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা নরসিংহ দেব মগধে কোনও কারবার কি চাকরী করিতেন, তিনি মধ্যে মধ্যে তথায় সস্ত্রীক বাস করিতেন, তাহাতে নারায়ণ দেবের জন্ম মগধে হয়। এরূপ সংস্থায় সকলদিক রক্ষা হয়।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—শব্দটা কি সত্য সত্যই মগধ? দ্বিজবংশীর পদ্মাপুরাণ সম্পাদন সময়ে আমরা অনেক পদ্মাপুরাণ চর্চ্চা করিয়াছি। কোন কোন পদ্মাপুরাণে এই পদটি পাইয়াছি, কিন্তু 'মগধ' শব্দ পাই নাই, মুগধ শব্দ পাইয়াছি। সন্দেহ ভঞ্জনার্থে এখনও কয়েকখানি পদ্মাপুরাণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, এক খানিতে কবিতার এই পদদ্বয় পাওয়াইছি,—

"নারায়ণ দেবে কয় জন্ম মুগধ
ভট্ট মিশ্র নহে পণ্ডিত বিশারদ

মুগ্ধ শব্দের একটি অর্থ মূর্খ। প্রাচীন কবিগণ অনেক স্থলেই মূর্খ শব্দ স্থলে মুগ্ধ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। অনেক প্রাচীন পুঁথিতে তাহা পাওয়া যায়। কবি নারায়ণ বিনয়ার্থে এই শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, ফলে তিনি জন্মমূর্খ ছিলেন না। উদ্ধৃত কবিতার দ্বিতীয় চরণের শব্দাবলীতেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিরজা বাবু বলিয়াছেন বিষয়টি ক্রমে রহস্যময় হইয়া উঠিতেছে। আমরা এখানে একটু রহস্য করিতে ইচ্ছা করি, কেহ কিছু মনে করিবেন না। সাহিত্যে এ প্রকার রহস্যের চলন্ আছে। বাঙ্গলার সুরসিক নাটককার দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের ডিপুটী বাবু মুচিরামকে ঘটিরাম পড়িয়া, চাপরাসীকে বলিয়াছিলেন, বোলাও ঘটিরামকো। এখানে মুগধ পড়িতে মগধ পড়া হয় নাই ত? পূর্ব্বে ঘ (মু) এইরূপে লিখা হইত। মুগধ শব্দে এইরূপ 'ঘ'ই পাইয়াছি। এই 'ঘ'কে ম বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্য কি? অথবা পুঁথিলেখক 'ঘ' কে পরিষ্কার 'ম' লিখিয়াও রাখিতে পারে। তাহাতেই এই রহস্যের উদ্ভব হইয়াছে। আর

একটা রহস্যের কথা বলি—এক কাঞ্চা বাবুর দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, আজমীর প্রভৃতি স্থানে কারবার ছিল। তিনি এক দিবস দিল্লী হইতে আজ্‌মীর গিয়াছিলেন। তাহার গোমস্তা বাবুর বাটীতে চিঠি লিখিলেন, "বড় বাবু আজ্‌-মীর গয়া"। কাঞ্চা নাগরীতে আকার, ইকার, বড় থাকে না, তাই চিঠি পড়িতে বড় গোল যোগ বাঁধে। অনেকে একত্র হইয়া পাঠ উদ্ধার করেন। এখানেও অনেক কাঞ্চা বাবু একত্র হইলেন এবং পড়িতে লাগিলেন, আজমর, আজ্‌মর—পড়িতে পড়িতে সিদ্ধান্ত করিলেন, বড় বাবু আজ্‌মর্‌ গয়া। এস্থলেও বোধ হয়, মুগধ স্থলে মগধ লিখা হইয়াছে। এবং তাহাতেই বিভ্রাটের উৎপত্তি।

শ্রীরামনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইতর প্রাণীর মনোবৃত্তি।

ঘোড়ার গণিত-জ্ঞান।

ঘোড়ায় পুস্তক পড়িতে পারে, অঙ্ক কষিতে পারে, এমন কি মনের কথা ভাবায় প্রকাশ করিতে পারে ;—এইরূপ আজগুবি কথা আমরা সময় সময় শুনিতে পাই।

মহম্মদ ও জরিফ।

এই সকল বিবরণ যদি বিশস্ত, বিশেষজ্ঞ ও সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হয়, তবে সাধারণের তাহাতে

কিছুদিন পূর্ব্বে হারভন্‌ অষ্টেন নামক এক সাহেব হ্যান্‌স্‌ নামধারী তাহার একটী ঘোড়ার বিবিধ কৌশল প্রদর্শন করিয়া সমগ্র ইউরোপকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছিলেন। ঐ সকল ক্রীড়া কৌশল ঘোড়ার বুদ্ধি বৃত্তির পরিচায়ক বলিয়া সুধীবৃন্দ এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ফাংষ্ট এই কার্য্যে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিলেন এবং তীব্র সমালোচনা প্রকাশ করিয়া বুঝাইলেন যে অশ্বপালক অষ্টেনের সঙ্কেত অনুসারে ঐ ঘোড়া প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়া থাকে। মনে করুন্‌ ঘোড়াটি তাহার খুরের আঘাত দ্বারা শব্দ উৎপাদন করিয়া সংখ্যা বাচক প্রশ্নের উত্তর দিতেছে,—ঠিক সংখ্যাটীতে উপনীত হইবা মাত্র উপস্থিত জন মণ্ডলীর অজ্ঞাতে অঙ্গভঙ্গী দ্বারাই হউক কি অন্য কোনও প্রকারে ঘোড়াকে উহা সঙ্কেতে জানাইলেই ত হইতে পারে। ডাক্তার ফাংষ্টের এই মত প্রকাশ হইলে পর অষ্টেনের সকল কৌশল ও শিক্ষা পণ্ড হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি কেহ কেহ জেদ্‌ করিয়া বলিলেন যে, এইরূপ সঙ্কেত গ্রহণেও যদি উত্তর নির্ভুল হয়, তবুও ঘোড়াটীর চাতুর্য্যের প্রশংসা করিতে হইবে।

সংবাদ পত্রে এই সকল সমালোচনা ও বিরুদ্ধ মত পাঠ করিয়া ক্রল নামক মনস্তত্ত্ববিৎ এক ব্যক্তি অতিশয় কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তিনি ১৯০৫ খৃঃ অব্দের মে মাসে অষ্টেনের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহার ঘোড়ার কৌশল ও শিক্ষার পরিচয় গ্রহণ করিলেন, এবং ঐ সকল বিরুদ্ধ মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এবার বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হইল, ঘোড়ার সম্মুখে সঙ্কেত প্রকাশ করার সর্ব্বপ্রকার সুযোগ নিবারিত করা হইল, তথাপি হ্যান্‌স্‌ পূর্ব্ববৎ নির্ভুল ভাবে প্রশ্নগুলির উত্তর দিল।

ক্রল ভাবিতে লাগিলেন, হ্যান্‌সের এই কার্য্য কি উহার বিশেষ ক্ষমতার পরিচায়ক, না অশ্বজাতির বুদ্ধি বৃত্তির নিদর্শন ? এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ক্রল দুইটী

মহম্মদ ও জরিফ্। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২রা নবেম্বর তারিখ হইতে ঘোড়া দুইটীর রীতিমত শিক্ষা আরম্ভ হইল। অষ্টেনের শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে প্রত্যেক সংখ্যা বুঝাইতে হইলে ঘোড়ার খুর দ্বারা সমান সংখ্যক আঘাত করিতে হয়। কিন্তু ক্রল এইরূপ শিক্ষা দিলেন যে দশক বুঝাইতে হইলে বামপদের এবং একক বুঝাইতে হইলে দক্ষিণ পদের খুর দ্বারা আঘাত করিতে হইবে। তিন দিন মাত্র শিক্ষাদানের পর দেখা গেল যে অশ্ব দুটী শিক্ষকের উচ্চারণ অনুসারে বোর্ডের উপর লিখিত ১, ২, ৩, প্রভৃতি প্রথম সংখ্যাগুলি মুখের দ্বারা স্পর্শ করিয়া দেখাইতে পারে! দশ দিন অতীত হইলে পর মহম্মদ ৪ পর্য্যন্ত গণনা করিতে সক্ষম হইল। কয়েক দিবস গত হইলে

ক্রল জরিফকে অঙ্ক শিখাইতেছেন।

পর শিক্ষক তাহাকে দশকের অর্থ বুঝাইয়া দিলেন; এবং দশক বুঝাইতে কিরূপে বামপদ ব্যবহার করিতে হইবে, এবং একক বুঝাইতে হইলে দক্ষিণ পদ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলেন। ১৪ই নবেম্বর তারিখে অর্থাৎ শিক্ষারম্ভের ১২ দিন পরে মহম্মদ শুদ্ধরূপে সহজ সহজ যোগ ও বিয়োগ অঙ্ক কষিতে পারিল, যথা ১+৩, ২+৫ ইত্যাদি, ৮−৩ ইত্যাদি। ১৮ই নবেম্বর তারিখে ক্রল সাহেব পূরণ ও ভাগ অঙ্ক শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং ২১শে তারিখে ভগ্নাংশ ও ভগ্নাংশের যোগ শিক্ষাদিতে লাগিলেন। ডিসেম্বর মাস মধ্যে মহম্মদ কিছু ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিল, এবং ফরাসী এবং জর্ম্মাণ উভয় ভাষায় জিজ্ঞাসিত গণিতের প্রশ্নের সমাধান করিতে সমর্থ হইল। পরবর্ত্তী বৎসরের যে মাসে মহম্মদ বর্গ ফল ও ঘন ফল বাহির করিতে এবং গণিতের কঠিনতর প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হইল।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পুস্তক পাঠ ও শব্দ উচ্চারণ শিক্ষা আরম্ভ হইল। চারি মাস শিক্ষা গ্রহণের পর জরিফ্ তাহার সম্মুখে উচ্চারিত সকল শব্দই মুখে প্রকাশ করিতে পারিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, দুইটী ঘোড়াই স্বরানুরূপ উচ্চারণ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিত। ঘোড়া দুইটী কিরূপ কথোপকথন অভ্যাস করিয়াছিল, নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল। মহম্মদ তাহার পশ্চাতের এক পদে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কাতর হইয়া পড়ে তাহার চিকিৎসার্থ পশুচিকিৎসক মিঃ মিট্‌ম্যান্ আনীত হন এবং ক্ষত স্থানে জলপটীর ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যান। পর দিন ডাক্তার ডেকার ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে পর তাঁহাকে জরিফের সমীপে এইরূপে পরিচিত করাইয়া দেওয়া হয়—"গতকল্য মহম্মদকে দেখিবার জন্য যে ডাক্তার মিট্‌ম্যান্ আসিয়াছিলেন, উঁহার ন্যায় এই ভদ্রলোকটীও একজন ডাক্তার। ইনি মানুষের চিকিৎসক, ঘোড়ার নহেন।" প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ব্যাপি গণনা ও উচ্চারণ অনুশীলনের পর জরিফ্‌কে জিজ্ঞাসা করা হইল—

"এই ভদ্রলোকের নামটী কি এখনও তোমার স্মরণ আছে?"

জরিফ্ তাহার নিজের ভাষায় উত্তর দিল—

"Dgr" (ড্‌গ্‌র্)

প্রশ্ন—"এই ভদ্রলোকটী কি করেন?"

উত্তর—"Dgtr" (ড্‌গ্‌ট্র্)

প্রশ্ন—"একটা অক্ষর ভুল করিতেছ নয়?"

উত্তর—"O"

প্রশ্ন—"কোন্ স্থানটাতে?"

উত্তর—"২"

সম্প্রতি ক্রল আরও কয়েকটী ঘোড়া সংগ্রহ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটী ঘোড়া অন্ধ, এবং ঘ্রাণ শক্তিহীন। কিন্তু ঘোড়াটী আশ্চর্য্যরকম গণিতবিদ্। উহার শ্রবণ শক্তি এবং স্পর্শ জ্ঞান এরূপ প্রখর যে সহজ সহজ গণিতের প্রশ্ন তাহাকে শুনাইলে কিম্বা তাহার চর্ম্মের উপর লিখিয়া দিলে, অনায়াসে উত্তর সমাধান করিতে পারে।

ক্রল সাহেব তাঁহার অভিজ্ঞতার ফল গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তকখানির নাম—"Thinking Animals; contributions to the Animal Psychology on the basis of Personal Experiments." *

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়।

তামাকু তত্ত্বে বিপত্তি।

উদীয়মান সাহিত্যসেবী ললিতকৃষ্ণ 'অরুণের' সহকারী সম্পাদকের কার্য্যভার লইয়া নব উৎসাহে সাহিত্যসেবায় মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। এতখানি অতিশয়োক্তির কারণ এই, ললিতকৃষ্ণ একটি চতুর্দ্দশী বালিকাকে সঙ্গিনী করিবার সুযোগ পাইয়াও সাহিত্য সেবাকে ভুলিয়া যান নাই। বরং কিরণশশীর সহচর্য্য অপেক্ষা বাণীর সেবাতেই তাহার সময় ও মন, শক্তি ও স্মৃতি অধিক ব্যয়িত হইত।

কিরণশশীর তাহাতে অধিক আপত্তি ছিল না। তবে রাত্রি ৯টার পর নীরিহ প্রদীপটির প্রতি তাহার যে বিতৃষ্ণা ভাব ছোটবেলা হইতেই জাগরিত ছিল—এখন বয়োবৃদ্ধির সহিত সে ভাব ঈর্ষায় পরিণত হইয়াছিল।

সে দিন রাত্রির আহারাদির পর যখন কিরণ শয়নগৃহে আসিল,"তখন ললিতকৃষ্ণ সোহাগ-কম্পিত স্বরে বলিলেন—আচ্ছা কিরণ তুমি একটু তামাক সাজ দেখি—ততক্ষণে আমি—মগজে একটা আর্টিকেল চাষ করে ফেলি!

কিরণ একটু দার্শনিক রাগের প্রয়োগ দেখাইয়া বলিল—"ও আমি পারিব না। খেতে হয় নিজে সেজে খাও। মেয়ে মানুষ তামাক সাজে এ আমি কখনো দেখি নাই।"

ললিতকৃষ্ণ বলিলেন—"মেয়ে মানুষ বাইসিকল চড়বে, চুরট খাবে, গাঙ্গ সাঁতরাবে, হারমনিয়ম বাজাবে, থিয়েটারে রাজা সাজবে—আর স্বামীর আদেশ প্রতিপালন করিয়া নির্জ্জন গৃহে তামাকটা সাজিতে পারিবে না?"

স্বামীর বাক্যব্যয়ের পূর্ব্বেই কিরণ আলবোলার উপর হইতে কলিকাটি লইয়া তামাক সাজিবার আয়োজন করিতেছিল—তামাক সাজিতে সাজিতে সে বলিল—"সেগুলি যারা করে, তারা তামাকও খায়, না খেলেও দুদিন বাদে খাবে। আমরা এও করবো না, তামাকও সাজবো না।"

কিরণ তামাক সাজিয়া কলিকাটি আলবোলার উপর রাখিয়া—ঘৃণা ও সোহাগ মিশ্রিত স্বরে বলিল—কি বিশ্রী গন্ধ—এও লোকে খায়? দেখ দেখি কোথায় হাত ধুই—এখন।"

ললিতকৃষ্ণ সোহাগের মাত্রা আরও একটু বাড়াইয়া বলিলেন—"আমার মাথায়ই হাতটা মুছে ফেল না।"

মুচ্‌কি হাসিয়া কিরণ হাত ধুইয়া ফেলিল।

ললিতকৃষ্ণ নল মুখে দিয়া টানিতে টানিতে কিরণের দিকে চাহিয়া তন্ময়ভাবে বলিলেন—তামাক অতি উপাদেয়—সর্ব্ব চিন্তার প্রসূতি—তোমরা না থাকিলেও জগৎ চলিবে—কিন্তু তামাক না থাকিলে—এক দিনও—না। যাই হউক আজ তামাক সম্বন্ধেই—একটা প্রবন্ধ লিখে তোমাকে তামাকের উৎপত্তি—স্থিতি—বিস্তৃতি—ও কার্য্য দেখাইয়া দিব। বসো তুমি—ঘুমাও যদি—"

কিরণ প্রমাদ গণিল। সে বলিল—"ও হবে না। বিছানায় প্রদীপ রেখে সারারাত কাটান হবে না।"

ললিতকৃষ্ণের মগজে তখন তামাকের চাষ হচ্ছিল। তিনি পত্নীর সহিত "সওয়াল জবাব" করিয়া তামাকু-চিন্তার বিচ্ছেদ ঘটান আপাততঃ সঙ্গত মনে করিলেন না। সুবোধ বালকটীর ন্যায় মাদুর টানিয়া মৃত্তিকার আশ্রয় লইলেন।

কিরণ অনন্যোপায় হইয়া শয্যায় গা ঢালিয়া পড়িয়া রহিল। ললিতকৃষ্ণ কাগজ কলম—লইয়া বসিলেন—কিরণকে বলিলেন "ঘুমাইও না—প্রবন্ধ শুনিতে হইবে।"

ললিতকৃষ্ণ যখন প্রবন্ধের খসরা প্রস্তুত করিয়া উঠিয়া

---

* Scientific American হইতে।

ঘড়ীর দিকে চাহিলেন—তখন রাত্রি সাড়ে দশটা হইয়া গিয়াছে। তিনি খসরা পড়িয়া শুনাইবার জন্য কিরণকে ডাকিলেন—কিরণ তখন গভীর নিদ্রায় থাকিয়া তাহার সকল ঔৎসুক্য ব্যর্থ করিয়া দিল।

বহু ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতেও যখন ললিতকৃষ্ণের অরসিকা পত্নী তাহাকে 'রস নিবেদনের' সুযোগ দিলেন না, তখন নবীন সাহিত্যিক বররুচির শ্লোক স্মরণ করিয়া রসজ্ঞ পাঠকের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন।

ভবদেব ঘোষও সাহিত্যিক। তবে "অরুণের" সুযোগ্য সম্পাদকের ন্যায় প্রবীণ নহে, সহকারী ললিত কৃষ্ণের ন্যায় নবীনও নহে। মাঝামাঝি সাহিত্যিক। ভবদেব প্রত্নতত্ত্ববিদ। ভবদেবের সাহিত্যচর্চ্চা প্রত্নতত্ত্বেই সূত্রপাত নহে। তিনি প্রথম জীবনে কবি ছিলেন। পয়ার মিলাইয়া মিলাইয়া রাশিকৃত কবিতা লিখিয়াও যখন ভবদেব দেখিতেন, সে কবিতা গুলিকে গদ্যে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলেও ঠিক তাহাই থাকে—তখন তিনি কিছু নিরাশ হইতেন। তারপর যখন পত্রিকা সম্পাদকগণ তাহার কবিতা গুলি স্ব স্ব পত্রিকায় প্রকাশ করা দূরে থাকুক তাহার রিপ্লাই টিকেট দেওয়া পত্র গুলিরও পর্য্যন্ত সন্তোষ জনক জবাব দেওয়া উচিত মনে করিল না, তখন তিনি একেবারেই নিরাশ হইলেন। কিন্তু তথাপি হাল ছাড়িলেন না। তাঁহার কবিতাপুঞ্জ লইয়া স্থানীয় "অরুণ" সম্পাদকের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অরুণের প্রবীণ সম্পাদক তাঁহার কবিতাগুলি একে একে পাঠ করিয়া একদিন অতি সহানুভূতির ভাষায় তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন—যে (১) কবিত্ব একটী ভগবৎ প্রদত্ত বিশেষ গুণ, তাহা সকলে পায় না, এবং যে কেহ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া লাভ করিতে পারেনা। (২) আমাদের নিত্য নৈমিত্যিক কার্য্যকলাপকে ছন্দে মিলাইয়া লিখিলেই তাহা কবিতা হইবে না। (৩) কবিতায় উচ্চভাব চাই, ওজন করা ভাষা চাই। (৪) ভাষা এবং ভাব সম্পদে সম্পদশালী হইলেও তাহা কবিতা হইবে না—যদি না ঐ কবিতা মানুষের কাণে ও প্রাণে রস সৃষ্টি না করিতে পারে,—

অতএব আপনি কবিতা মিলাইবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া গদ্য লিখিতে আরম্ভ করুণ। আপনার গদ্য লেখা আমি "অরুণে" প্রকাশ করিব।"

অরুণ সম্পাদকের সহানুভূতি সূচক উপদেশ শ্রবণ করিয়া ভবদেব বলিলেন—তবে তাহাই হউক।—কবিতা ব্যতীত আর কি সহজ বিষয় আছে—যাহা পুথি পত্র না পড়িয়াও লিখা যায়—?

সম্পাদক বলিলেন—আপনি প্রত্নতত্ত্ব লিখুন। প্রত্ন তত্ত্বে পুথি পুস্তক পড়িতে হয় না। তবে পুথি পুস্তকের নামগুলি জানা দরকার—সে একটা কেটালগ দেখিয়া বরং মুখস্থ করিয়া লইবেন। 'অরুণ' কার্য্যালয়ে এরূপ বহু কেটেলগ আছে,—দিব আপনাকে।

সেই হইতে ভবদেব কবি যশাকাঙ্ক্ষা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্ হইয়া বসিয়াছেন। এখন ভবদেবের সাহিত্যপ্রভা মধ্যাহ্ন গগণে না যাইতে পারিলেও গগণের চতুরাংশে সমুদিত বলা যাইতে পারে। ললিতকৃষ্ণ প্রভৃতি নবীন সাহিত্যিকগণ তাহার সাহিত্যিক উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চলেন। অরুণের প্রত্নতত্ত্ববিদ্বেষী রাজনৈতিক সম্পাদক ভবদেবের প্রত্নতত্ত্ব প্রবন্ধ সাদরে তাঁহার পত্রে স্থান প্রদান করেন। অলমতি বিস্তরেন।

ললিতকৃষ্ণ তামাকু প্রবন্ধটী লিখিতে যে গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, কিরণ সে গবেষণার মর্য্যাদা রক্ষা করিল না, দেখিয়া তিনি একেবারে যাইয়া সাহিত্য সুহৃদ ভবদেবের গৃহে হাজির হইলেন।

ভবদেব বাম হস্তে হুকাটী মুখে ধরিয়া রাখিয়া তাকিয়ায় বক্ষ স্থাপন করতঃ 'অরুণের' জন্য "মানবের আদি বাসস্থান"গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা লিখিবার প্রয়াস করিতেছিলেন। এমন সময় "তামাকুতত্ত্ব" লেখক ললিত কৃষ্ণ যাইয়া তাহার গবেষণায় বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিলেন।

ভবদেব মাথা তুলিয়া বলিল—"এস—এইতো তোমাদের খাটুনিই খাটুচি—তিলকের একখানা গ্রন্থ যদি যোগাড় করে দিতে, তবে সমালোচনাটা—হতো বেশ্।

ললিতকৃষ্ণ ভবদেবের হাত হইতে হুকাটী লইয়া বলিলেন—সে কোথা পাব? যাই হউক সে গ্রন্থ না পাওয়া গেলেও—আপনার সমালোচনায় আমরা নুতন তত্ত্ব কিছু পাবই পাব।

ভবদেব উৎকট অভিজ্ঞতার বড়াই-বিকৃত-স্বরে বলিলেন—"সেত নিশ্চয়। নূতন কিছু তত্ত্ব আমার প্রবন্ধে থাক্‌বেই—"

ললিতকৃষ্ণ কথা বুঝি করিলেন না। বলিলেন—এত রাত্তেও আপনাকে একটু ত্যক্ত না করিয়া পারিলাম না। যে দিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ না হয়, সে দিন যেন লেখাতেও জমাট বাঁধে না। মনটা গুমট বাধিয়া থাকে—

ভবদেব—সত্তি নাকি ?

ললিতকৃষ্ণ কথাপারিলেন—"আজ এই কতক্ষণ হলো একটা প্রবন্ধ লিখিবার চেষ্টা করিয়া কতটা কি করিয়াছি বলিতে পারি না। আপনি আমার প্রবন্ধটা না শুনিলে চলিবে না।"

ভবদেব আগ্রহ দেখাইয়া বলিল—"কি বিষয় লিখেছ, দেখি! অবশ্য দেখিব।"

ললিতকৃষ্ণ ভবদেবের হস্তে প্রবন্ধটী দিয়া হাস্যবিকসিত বদনে ভবদেবের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভবদেব পাতা উল্টাইয়া বলিলেন—বড় অপরিস্কার লেখা দেখচি—ফেয়ার করনি—তুমি পড়—আমি শুনি।

ললিতকৃষ্ণ ধীরে ধীরে প্রবন্ধটী পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। প্রতি পেরাগ্রাফে তাঁহার হৃদয়ের পুঞ্জিভূত আবেগ ভার বাহির হইয়া যেন তাহা শূন্য করিয়া দিতেছিল।

"তামাকু জগতের সুখ ও শান্তির প্রসূতী। এই সুখ ও শান্তির নিদান মহাশয় কি কারণে যে ভারতীয় তাপস-ঋষিগণের চক্ষে ধূলী নিক্ষেপ করিয়া এতকাল তাঁহাদিগের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অতীত রাজ্যে বিরাজিত ছিলেন, তাহা বলা যায় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তা ও গবেষণার ফলে দৃশ্য জগতে যে আবিষ্কার প্রতি নিয়ত সংঘটিত হইতেছে—তামাকু আবিষ্কার কাহিনী তাহার মধ্যে অন্যতম।

প্রত্নতত্ববিদ পণ্ডিত মিঃ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা বলিয়াছেন তামাকু আমেরিকার নিজস্ব সম্পত্তি। আমেরিকাই তাম্রকুটের গর্ভধারিণী জননী।

১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই সুমহান পদার্থ আমেরিকা বিজয়ী স্পেনিয়ার্ড দিগকর্ত্তৃক প্রথম আমেরিকায় আবিষ্কৃত হয়। এবং তাহাদিগ কর্ত্তৃক ঐ সময়েই তাহা ইয়ুরোপে আনীত হয়। আমেরিকার অন্তর্গত ইউকাটন প্রদেশস্থ তাবাকো নামক স্থানে এই পত্রের উৎপত্তি হেতু বিজেতা স্পেনিয়গণ এই পত্রকে তাবাকো নামে অভিহিত করেন। তৎপূর্ব্বে ইহা অন্য নামে অভিহিত হইত। কথিত আছে সুপ্রসিদ্ধ সার ওয়াণ্টার রেলি ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহাকে ইংলণ্ডে পরিচিত করেন ও কি প্রকারে ব্যবহার করিতে হয় তাহা প্রদর্শন করেন।— * * * *

ভবদেব অধৈর্য্য হইয়া বলিলেন—তোমার প্রবন্ধ দেখিতেছি ঐতিহাসিক হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে ভারতীয় প্রত্ন তত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধ করিয়া না লইলে—পণ্ডশ্রম।

প্রবন্ধের প্রারম্ভেই ভবদেবের এইরূপ মন্তব্য ললিত কৃষ্ণের জমাট উৎসাহ একদম মাটি করিয়া দিল—ললিত কৃষ্ণ আত্মসমর্পণের ভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"তবে এখন কি করিতে হইবে?" প্রবন্ধের বাকীটা শুনিবেন না কি?"

ভবদেব—ও আর শুনিয়া কি হইবে? তুমি—ভারতবর্ষে তামাকু ছিল না—এ লিখিয়াই সব মাটি করিয়া দিয়াছ

ললিত বলিল—মিঃ এনসাইক্লোপিডিয়া ত ভারতের নামও করেন না। বরং তামাকু নামটাকেও তিনি খাস বিদেশী বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।"

ভবদেব অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিলেন—"ইংরেজী লেখা দেখিলেই—তোমাদের মাথা ঘুরিয়া যায়—বলি—কল্কীপুরাণটা কি কিছুই নহে।"

ললিত কৃষ্ণ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"কল্কীপুরাণে কি আছে? আপনি পড়িয়াছেন কি।"

ভবদেব বলিল—কল্কীপুরাণে কল্কী মাহাত্মই বিবৃত হইয়াছে। তাহাতে তাম্রকুটেরই চর্চ্চা করা হইয়াছে। কল্কীপুরাণে আছে ভগবান শঙ্কর তাম্রপত্র প্রথম আবিষ্কার করেন। এবং তাহা অতি গোপনে সমুদ্র গর্ভে রক্ষা করেন। সমুদ্র মন্থনে যখন কালকূট উত্থিত হয়, তখন তাম্র পত্র কালকুটের সংমিশ্রনে কূট ভাব প্রাপ্ত হয় এবং ইহাতেই তাহার নাম তাম্র কূট হয়।"

ললিত উৎসাহের সহিত বলিল—বাঃ বাঃ এতো জানতাম না। আপনি শ্লোকটা বলিতে পারেন কি?

ভবদেব সেই ভাবে বলিলেন—"সবই বলিব। রামায়ণের সময় যে তামাকের প্রচলন ছিল, তাহার প্রমাণ অবশ্যই আছে। মহীরাবণ তামাক খাইতেন। সেখানে গিয়া হণুমান ও তামাক খাইয়াছিলেন। তাহার পাতাল পুরীই এখন আমেরিকানামে পরিচিত। মহীরাবণের চিহ্নই এখন বৈদেশীক জাতির গর্ব্বের কারণ।

তারপর—রামায়ণে আছে—"তাম্র কূটে, হেমকূটে চিত্রকূটেচ বৈদেহি।" বৈদেহি কিনা সীতা—তাম্রকূট, চিত্রকূট এই তিনটাই পছন্দ করিতেন। তবে তিনি তামাক সাজিয়া খাইতেন, কি পাতা খাইতেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। বোধ হয় তিনি তামাক পাতাই খাইতেন—আনুসঙ্গিক প্রমাণ—রামসীতার উপাসকগণ—এখন তামাক পাতার প্রিয় সেবক।

মহাভারতে কথিত আছে ভৃকোদর কল্কী হারাইয়া ছিলেন বলিয়া পাণ্ডবেরা পাশা খেলায় পরাজিত হইয়া ছিলেন। কল্কী হারান সেই হইতেই পাপ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

যাত্রাগানের ভীম-অর্জ্জুন তামাক খায়, ইহা সমীচীন প্রমাণ না হইলেও আনুসঙ্গিক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। নারদ ঋষির সু-প্রাচীন তাম্রকূট-ধূম্র-রঞ্জিত শ্মশ্রুও তাহার প্রমাণ।

তুমি এইগুলির আলোচনা করিয়া প্রত্নতত্ত্বের হিসাবে প্রবন্ধটীকে জমকালো করিয়া তুল—আমি একটী গবেষণা মূলক ভূমিকা লিখিয়া দিব।"

অষ্টমীর চন্দ্র অস্ত গিয়াছে।

ললিতকৃষ্ণ যখন ভবদেব বাবুর সাহিত্যিক বৈঠকে হৃদয়ের প্রাচীন ভাবগুলি বিসর্জ্জন দিয়া তৎস্থানে নূতন চিন্তা সঞ্চয় করিয়া লইয়া রাস্তায় বাহির হইলেন, তখন অষ্টমীর চন্দ্র অস্তমিত হইয়া গিয়াছে। ললিত কৃষ্ণের কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। ললিতকৃষ্ণ তখনো তামাকুতত্ত্ব সম্বন্ধেই চিন্তা করিতে ছিলেন।

ঠিক এমনি সময় তিন দিক হইতে কতগুলি লোক আসিয়া তাহাকে একেবারে জড়াইয়া ধরিয়া ফেলিল। একজন লোক বলিল—"চীৎকার করিলে এই রিভলভারে একেবারে ফায়ার করিয়া দিব।" ললিত ভয়ে চুপ করিয়া রহিল। একজন একখানা বস্ত্র দ্বারা তাহার চক্ষু বাঁধিয়া ফেলিল। ললিত লোক গুলিকে একবার দেখিবারও অবসর পাইল না। তাহারা তাহাকে লইয়া চলিতে লাগিল।

কিছু দূরে আসিয়া তাহারা তাহাকে একখানা গাড়ীতে তুলিল। ললিতকৃষ্ণ বুঝিল, যেন গাড়ী খানা তাহাদের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। গারোয়ান আসিল তারপর কতক্ষণ পরে গাড়ী চলিতে লাগিল।

ললিতকৃষ্ণ কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"আমাকে তোমরা কোথায় লইয়া যাইতে চাও—আমার নিকট যে একটী কপর্দ্দকও নাই।" ভয়ে ললিত কাঁদিয়া ফেলিল।

একজন গর্জ্জন করিয়া বলিল—"চুপরাও।"

গাড়ী আসিয়া থামিল। সকলে আবার অল্প হাটিয়া চলিল। ১০।১৫ পা হাটীয়াই একখানা গৃহে আসিয়া একজন তাহার চক্ষু খুলিয়া দিল। গৃহ অন্ধকার।

ললিত কৃষ্ণকে একখানা বিছানায় শুইতে দিল। একজন তাহার সহিত একত্র শয়ন করিল। আর সকলে ফিসফিস করিয়া কি কথা বার্ত্তা বলিয়া চলিয়া গেল।

(৪)

যখন ললিত কৃষ্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হইল তখন সূর্য্যদেব বেলা চারি দণ্ডের সীমা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। ললিত চক্ষু মেলিয়াই দেখে—এ কি—এ কি হইল? এ কোন স্থান—যেন তাহার চির পরিচিত স্থান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পার্শ্ব ফিরিয়া দেখিল, পার্শ্বেই একখানা খাম-মুক্ত চিঠি। চিঠিখানা কিরণের নামে লিখিত। বিস্ময়ের সহিত চিঠিখানা পড়িতে লাগিল। চিঠি এইরূপ—

বৌদি,

এই সময়ে ও যদি তুমি তোমার ঘরের ষাণ্ড ঘরে না রাখিতে পার, তবে তোমার কেমন শাসন; আমরা আর কত নিজের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইব?

কাল রাত ১২½ টায় তোমার ভাই নিবারণ এসে খবর দিয়ে নিয়েছিল, তাই রক্ষা—না হলে ব্যাপার খানা কি হয়ে দাড়াতো বল দেখি! রাতদুপরে যে ঘরে যুবতী স্ত্রী ফেলে রেখে সাহিত্য-সুন্দরীর অভিসারে ভোঁ ভোঁ করিয়া

ঘুরিতে পারে, সেই বা কেমন, আর তার সেই স্ত্রীটীই বা কেমন ?

যাক্, আমরা আর কিছু বলব না, তোমার জিনিস তুমি শাসন করে দেখে শুনে রাখতে পার রাখ, না পার মাঠে মারা যাবে !

কল্যকার পালার জন্য আমাদের বখ্‌সিস চাই—কিন্তু। তোমাদের—নীলু।

অপর পৃষ্ঠায় লেখা ছিল ঃ—

ললিত,

দুঃখিত হইলাম—তুমি কাল ঘোর বিপদে পড়ে ছিলে! কিন্তু তুমি ভাই বড় কাপুরুষ কাঁদিয়া গাড়ী না ভাসাইলে কি তোমার এই মূল্যবান সাহিত্যিক জীবন রক্ষার আর উপায় ছিল না? যাক্, তোমার স্ত্রী নিবারণের নিকট যে টাকাটী কেশতৈল ক্রয়ের জন্য দিয়াছিল, তাহার অর্দ্ধাংশ ব্যয়ে তাহার জন্য অন্য একটী শিশি আনিয়া বাকী অর্দ্ধাংশ তোমার উদ্ধারের জন্য কল্য গাড়ী ভাড়ায় ব্যয়িত হইয়াছে। দরিদ্র সাহিত্যিকের গুরু দণ্ড অবিধের বিধায় মবলক আষ্ট গণ্ডা মাত্র দণ্ডের ব্যবস্থা করা গিয়াছিল। ফণি, মণি, নিবারণ সকলেই এ ব্যবস্থায় ভোট দিয়াছিল। আমরা যে তোমাকে উদ্ধার করিয়া ছিলাম, সে জন্য মিষ্ট-মুখ করাতে হবে কিন্তু। বলি অর্দ্ধাঙ্গিনী অপেক্ষা সাহিত্য-সঙ্গিনী বড় কি? এখন আসি ইহাতে আত্রানন্দ হয় বিশেষ, না হয় তাহাও বিশেষ, কেন না আমি তোমার নীলু।"

গত রাত্রের ইতিহাস পাঠ করিয়া ললিত কৃষ্ণ লজ্জায় একেবারে যেন মরিয়া গেলেন। কিরণ নিশ্চয় চিঠি পড়িয়া এখানে রাখিয়া গিয়াছে, চিন্তা করিয়া ললিতের মুখ একেবারে শুকাইয়া গেল। এমন সময় কিরণের মৃদু মধুর ঝঙ্কার তাহার কর্ণ কুহরে আসিয়া সুধা বর্ষণ করিল—

"সারা রাত আর্টিকল চাষ কর্লে আর দিনে দুপর পর্য্যন্ত ঘুমালেই খাওয়া দাওয়ার কাজ হবে নাকি? বাজার হবে না? ঠিকা লোকটা তো জল দিতে এখনো আসে নাই—চাল নাই। কয়লা ও আনতে হবে—"

কথার ভাবে ললিত কৃষ্ণ বুঝিলেন কিরণ এখনও চিঠিটা পড়িয়া দেখে নাই। তিনি আরও বুঝিলেন, সাহিত্যের প্রভাব অপেক্ষা স্ত্রীর প্রভাব বাস্তবিকই অধিক।

"সুবুদ্ধি উড়ায়" হেসে ললিত তেম্নি ভাবে হাসির লহর তুলিয়া বলিলেন—তৈল-তণ্ডুল-বস্ত্র-ইন্ধন—বলে যাও, বলে যাও, বলি এগুলি না থা কলেও তোমার তেল তো এসেছে। আর আমার তামাক--সেতো অবশ্যি আছে।

তেল আর তামাক যখন আছে, তখন আর চিন্তা কি? আজ থেকে তুমিই আমার আর্টিকেল, তুমিই আমার ধন দৌলত "ঘরে লক্ষ্মী সরস্বতী, আমি অখিলের পতি,
হোক গে এ বসুমতী যার খুসিতার।"

সাহিত্য সেবক।

আ

শ্রীআনন্দনাথ রায়—১২৬২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত জপসা গ্রামে শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম স্বর্গীয় হরনাথ রায়। আনন্দনাথের সপ্তম বৎসর বয়ক্রমে জপসা বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, এই সময় তিনি ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ণ জন্য প্রেরিত হন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়ক্রম কালে ঐ বিদ্যালয় ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং তিনি তাহাতে ভর্ত্তি হন। এইরূপে কিছুকাল ইংরেজী স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া অকস্মাৎ মাতৃবিয়োগে পাঠ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

এই সময় হইতে তিনি সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদি পাঠ করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং কিছু কিছু লিখিতে চেষ্টা করিতেন ও তাহা 'ঢাকার হিন্দুহিতৈষী' পত্রিকায় প্রকাশ করিতেন। ১২৮৮ সালে আনন্দবাবু "ললিত-কুসুম" নামে একখানা নাটক লিখেন। এই সময় ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের সহিত এই গ্রন্থ উপলক্ষে তাঁহার পরিচয় হয়। রাজকৃষ্ণ বাবু তাঁহার বীণাপ্রেসে নাটকখানা মুদ্রিত করিয়া দেন। এই গ্রন্থ তাঁহার তৎকালীন পরিচিত—রমাকান্ত সেন নামে প্রকাশিত হয়। এই সময়

রাজস্থানের ইতিহাস প্রকাশিত হইলে তাহা পাঠ করিয়া আনন্দ বাবুর দেশের ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা হয় এবং তিনি ঐতিহাসিক তত্ত্বালোচনায় ব্রতী হন। ফলে তিনি ভারতীতে "বিদুষী আনন্দময়ী", নব্যভারতে "সাধক কবি রামগতি", নির্ম্মাল্যে "কবি শিবচন্দ্র সেন" প্রভৃতি প্রবন্ধ বাহির করেন। ঐ প্রবন্ধগুলিও রমাকান্ত সেন নামে প্রকাশিত হয়। অতঃপর আনন্দ বাবু বঙ্গীয় বার ভৌমিকগণের ইতিহাস সংগ্রহে নিযুক্ত হন। এবং বিবিধ সাময়িক পত্রে ঐ সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সম্প্রতি তাঁহার 'বার ভূঞার' ইতিহাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ফরিদপুরেরও একখানা ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করিয়া তাহার কতক অংশ প্রকাশ করিয়াছেন।

আবদুল ওয়াহেদ :—নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত চরমটুয়া গ্রামে ১৮৮৪ সনে মৌলবী আবদুল ওয়াহেদ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম মৌলবী আবদুল্লা। মৌলবী সাহেব এফ,এ পর্য্যন্ত পড়িয়া ১৯০৩সনে শিক্ষা বিভাগে কার্য্য আরম্ভ করেন ও ৯বৎসর নোয়াখালী জেলা স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া বর্ত্তমানে চট্টগ্রাম নর্ম্মাল স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন। তিনি "মোরাতোমা প্রতিভা", "আহ্‌মদ চরিত" কোরাণের উপদেশ, সুধাবিন্দু প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

আবদুল করিম বি, এ, :—১৮৬৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীহট্ট সহরে মৌলবী সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। এবং তথায় শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ, পাশ করিয়া কলিকাতা মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষকের কার্য্য করিতে থাকেন ও পরে মুসলমান শিক্ষার সহকারী স্কুল ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। সেই পদ হইতে ক্রমে বিভাগীয় ইনস্পেক্টরের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

মৌলবী সাহেব "ভারতে মুসলমান রাজত্ব" নামক একখানা ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায়ও তাঁহার দুইখানা স্কুল পাঠ্য "ভারতবর্ষের ইতিহাস" গ্রন্থ আছে।

আবদুল করিম—জেলা চট্টগ্রামের অধীন পটিয়া থানার সুচক্রদণ্ডী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত বংশে ১২৭৮ সালে মৌলবী আবদুল করিম জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার পিতার নাম সেখ নুরুদ্দিন। তিনি পটিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে ১৮৯৩সনে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এফ,এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তিনি পাঠ্যাবস্থাতেই সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিতেন। ১৮৯৫ সনে তিনি কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার উৎসাহে সাহিত্য চর্চ্চা আরম্ভ করেন এবং বিবিধ মাসিকপত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। কিছু দিন ইনি 'কহিনুর এবং নব-নুর" পত্রিকা সম্পাদনেও সহায্য করিয়াছেন। ইনি প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের অলোচনায় বহুদিন ব্যয় করিয়াছেন। এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁহাকে বিশেষ সদস্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। তিনি নরোত্তম ঠাকুর কৃত "রাধিকার মানভঙ্গ" নামক একখানি প্রাচীন পুথি সম্পাদন করিয়াছেন।

কলেজ পরিত্যাগ করিয়া মৌলবী সাহেব প্রথমে সরকারী আদালতের কেরানী গিরি গ্রহণ করেন। এই কার্য্য হইতে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন তাহাকে চট্টগ্রাম কমিসনর আফিসে লইয়া যান। পরে কিছুদিন শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া ১৯০৬ সনে চট্টগ্রাম স্কুল ইনস্পেক্টারের আফিসে নিযুক্ত হন।

আবদুল জব্বর :—ময়মনসিংহ জেলার গফরগাও থানার অধীন বনগ্রামে ১২৮৯ সালে মৌলবী আবদুল জব্বার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুনসী সেখ মোহম্মদ নেকবর।

মৌলবী সাহেব মধ্য বাঙ্গালা স্কুলে কতক দিন অধ্যয়ন করিয়া আরবী ও পার্শী পড়িতে প্রবৃত্ত হন।

পাঠ্য অবস্থা হইতেই মৌলবী সাহেব সাহিত্য চর্চ্চায় ব্রতী হন। তিনি বহু মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। ১৩১৩ সালের কার্ত্তিক মাসে তাহার প্রথম গ্রন্থ "মক্কা শরীফের ইতিহাস" বাহির হয়। তৎপর "ইসলাম চিত্র" মদিনা শরীফের ইতিহাস", "ইসলাম সঙ্গীত", "আদর্শ রমণী" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

হরিশ্চন্দ্র।

ওহো,

মসী লিপ্ত বসুন্ধরা, সকলি আঁধারে ঘেরা,
আঁধারে আবৃত ঘোর অভাগার হিয়া,
হেন নৈশ অন্ধকারে, কে আসে ও ধীরে ধীরে,
করুণ বিলাপে কেঁদে বুকে কারে নিয়া ?
শ্মশানে আমার বাস, আমি চণ্ডালের দাস,
করেছি চণ্ডাল সম আচার বিচার,
চণ্ডাল আমার প্রভু বারে বারে কেন তবু
মায়া দয়া দেয় উকি হৃদয়ে আমার ?
কাঁদে ওই অভাগিনী, হারায়ে হৃদয়মণি,
কেহ নাই বুঝি ওর দিবে যে সান্ত্বনা ;
ওই শুন ওকি বলে, "বাছা ঘুমায়েছে কোলে",
অভাগী নিজেই করে আত্মপ্রতারণা !
ওগো ঘুমায়েছে বটে, এ ঘুম সবারি ঘটে,
আজ ছেলে, কাল মাতা, ঘুমাবে সকলে।
চিরদিন জেগে রবে, হঠাৎ ঘুমিয়ে যাবে,
আমিও ঘুমায়ে যাব সে দিন আসিলে।
চিরদিন এ রমণী, ছিল না ত অভাগিনী,
ক্ষণমাত্র আগে ছিল পুত্রের জননী,
আহা স্বপনের প্রায়, এই আসে এই যায়,
অভাগার মনে পড়ে পুরাণ কাহিনী।
ছিল, ছিল—সবি ছিল, কোথা সব লুকাইল,
বড় জ্বালা মনে এলে অতীত রাগিনী,
অঙ্গারের মাঝে থেকে অঙ্গার চাপিয়ে বুকে,
বেঁচে আছি, ভুলে গেছি—কে আমি আপনি।
যাই তবে আর কেন, চপলা বারেক হান,
একি একি ? দেখি ওকি ! সেই মুখখানি !
পারি না ভাবিতে আর হা অদৃষ্ট অভাগার.
এই দুটী হয় যদি সেই দুটী প্রাণী।
তাই ওগো,তাই—তাই,একি ! রোহিতাশ্ব নাই ?
কাঁদে অভাগিনী শৈব্যা কারে কোলে নিয়ে।
এখনো রয়েছি বেঁচে, রোহিতাশ্ব ছেড়ে গেছে,
অভাগারে রেখে গেল বুকে শেল দিয়ে।
কি ভীষণ কর্ম্মফল, শৈব্যা, মুছ আঁখি জল,
অভাগার কোলে দাও অভাগার ধন,
এস দেই এ শ্মশানে, পূর্ণাহুতি দুটী প্রাণে,
বিশ্বামিত্র, মনোরথ হউক পূরণ।

শ্রীহৈমবতী দেবী।

সে কালের চিত্র।

ময়মনসিংহ সভা ও ছাত্রসভা।

১৮৭৮ সন ; তখন ঢাকা ময়মনসিংহ রেলওয়ে লাইন হয় নাই ; ষ্টীম নেভিগেসন কোম্পানীর ষ্টীমার সার্ভিস ও এত প্রশস্ত ও বিস্তৃত ছিল না। অনিশ্চিত ও অনিয়মিত ২।১ খানা ষ্টীমার মাঝে ২ সুবর্ণখালী অথবা ঢাকা যাইয়া ধরা যাইত। সে সময়ে ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতা যাতায়াত নিতান্ত অসুবিধা জনক ছিল, আমাদের দেশের লোক সেদিকে যাইতে সহজে সম্মত হইত না। সরকারী কোন কার্য্যোপলক্ষে কালেক্টরী হইতে জনৈক কর্ম্মচারীর কলিকাতা যাওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল, কেহই যাইতে সম্মত হইল না। আমি গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে যাতায়াত করিয়া কলিকাতা দেখিতে পাইব এটা এক শুভ সুযোগ মনে করিলাম এবং আগ্রহ পূর্ব্বক যাইতে সম্মত হইলাম। নৌকা-পথে ঢাকা পর্য্যন্ত যাইতে ৬ দিন লাগিয়াছিল, তার পর তথা হইতে ষ্টীমারে দুই দিনে গোয়ালন্দে পঁহুছিয়া ছিলাম। বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র ও বাবু কালীশঙ্কর সুকুল তখন কলেজে পড়িতেন, আমি যাইয়া তাঁহাদের মেছেই অবস্থিতি করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সবে মাত্র সিভিল সার্ভিস হইতে বরখাস্ত হইয়া স্বাধীন জীবনে পদার্পণ করিয়াছেন ; তাঁহার প্রথম বক্তৃতা England's duty towards India প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণকুমার ও কালীশঙ্কর বাবুর সমভিব্যাহারে সুরেন্দ্রবাবুর তালতলার বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম এবং দেশের উন্নতিকল্পে আমরা কি করিতে পারি সে সম্বন্ধে তাঁহার নিকট হইতে অনেক উপদেশ লইয়াছিলাম। সুরেন্দ্র বাবু আমাদিগকে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ

কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন এবং "ভারত মিহিরের" প্রতিনিধি বলিয়া আমাদিগকে পরিচিত করিয়াছিলেন। ময়নসিংহের "ভারত মিহির", তখন সাপ্তাহিক পত্রিকা সকলের মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কাগজ বলিয়া পরিচিত ছিল, এবং তাহার সহিত আমাদেরও সংশ্রব ছিল। কৃষ্ণদাস বাবু ভারত মিহির সম্বন্ধেই সংক্ষেপে কিছু উপদেশ দিয়া আমাদিগকে বিদায় করিয়াছিলেন, কিন্তু সুরেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে আমরা ক্রমাগত কয়েক দিন যাতায়াত ও জলযোগ করিয়াছিলাম, এবং তাঁহার উদার ও অমায়িক ব্যবহারে নিতান্ত আপ্যায়িত হইয়াছিলাম। তিনি তখনই বলিয়াছিলেন যে দেশের জন্য আমরা যাহা কিছু করিব তাহা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইবেনা। ভারত সাম্রাজ্য শাসন করা অতি কঠিন ও সমস্যাপূর্ণ ব্যাপার, সুতরাং গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করা আমাদের কর্ত্তব্য, এবং তাহাদেরও এ সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। এই কথা উভয় পক্ষকে অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট এবং দেশবাসীদিগকে বুঝাইবার জন্যই তিনি Indian association (ভারতসভা) স্থাপন করিয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবু বাঙ্গাল দেশের লোকদিগকে এবং ব্রাহ্মসমাজের যুবকদিগকে খুব কাজের লোক বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন, এবং প্রাচীন সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল লোকেরা যে উন্নতির কাজ মাত্রেই নানা বিঘ্ন বাধা উপস্থিত করেন তাহা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে তিনি তখন বলিয়াছিলেন—"আর ২০ বৎসর পরে দেখিবেন, এক দল লোক আসিবে যাহারা আমাদিগকে old fools বলিয়া পেছনে ফেলিয়া চলিয়া যাইবে, তাহাদের সঙ্গে যোগ রাখিয়া চলা আমাদের পক্ষে কঠিন হইবে।" বিশ বৎসর না হউক ত্রিশ বৎসর পর দেখিলাম সুরেন্দ্র বাবুর ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল।

কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া, 'ময়মনসিং এসোসিয়েসন,, নাম দিয়া, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের এক শাখা সভা স্থাপন করিয়াছিলাম। বাবু শরৎচন্দ্র চৌধুরীর যত্নে ময়মনসিংহ সহরে একটী মাইনর স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। শরৎ বাবু কতক দিন পর্য্যন্ত সহরের নানাস্থানে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে কাহারো অনুগ্রহদত্ত বাড়ীতে স্কুলের কাজ চালাইয়া শেষে স্কুলের মাঠে এক বাঙ্গলা উঠাইয়াছিলেন। সেই স্কুলঘরে ময়মনসিংহ সভার প্রথম অধিবেশন হয়, এবং স্থানীয় উকীল স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল, মহোদয়কে সে অধিবেশনের সভাপতির আসনে বরণ করিয়া সভার কার্য্য প্রণালী এবং কার্য্যকারক নির্দ্ধারণ করা হয়। উপস্থিত সভ্যগণ সম্পাদকের পদে আমাকেই নিযুক্ত করেন। ১৮৮০ সনের পুলিস বিভাগে প্রবেশ করিয়া সহর হইতে মফস্বলে চলিয়া যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি উক্ত সম্পাদকের পদে নিযুক্ত থাকিয়া আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে ময়মনসিংহ এসোসিয়েসনের কাজ চালাইয়াছিলাম। পরে বাবু অনাথবন্ধু গুহ উকীলকে এই কাজের ভার দিয়া আমি জামালপুর চলিয়া যাই।

কলিকাতা হইতে আসিয়া আমার দ্বিতীয় কাজ Students association স্থাপন করা। সেই মনোরঞ্জিকা ক্লাব উঠিয়া যাওয়ার পর হইতে ছাত্রদিগের সাধারণ সম্মিলনের আর কোনস্থান ছিলনা। এবার ছাত্র সমাজ খুব জাঁকাল রকমের হইল। ছাত্রও জুটিয়াছিল কয়েকজন উৎকৃষ্ট লোক, তাই তাহাদিগকে লইয়া মনের মত কাজ করিতে পারিয়াছিলাম। তাহারা আমাকেই তাহাদের সভার সভাপতির পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত করিয়াছিল আমিও আহ্লাদের সহিত তাহাদের কার্য্য পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় গগনচন্দ্র দাস, আনন্দমোহন কলেজের প্রিন্সিপাল স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠকিশোর চক্রবর্ত্তী, তারিণীচরণ নন্দী, শ্রীমান উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, শ্রীমান গগনচন্দ্র হোম, শ্রীমান নবকুমার সমাদ্দার, শ্রীমান মহেশ্বর চক্রবর্ত্তী, স্বর্গগত হরেন্দ্রচন্দ্র তালুকদার, শ্রীমান বৈকুণ্ঠনাথ সোম প্রভৃতি ছাত্রগণ এই সভার অগ্রণী ছিলেন। ইঁহারা সকলেই পড়া শুনাতে যেমন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন, তেমনি বাহিরের কাজে উৎসাহ উদ্যমের জলন্ত মূর্ত্তি এবং কর্ত্তব্য পালনে কঠোর নীতিপরায়ণ ছিলেন। যে কোন সৎকাজের অনুষ্ঠান করা গিয়াছে, তাহাতেই এই সকল যুবক প্রাণ মন দিয়া খাটিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে যেরূপ প্রীতির বন্ধন ও ভ্রাতৃভাবের সম্মিলন দেখিয়াছি, সেরূপ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

ছাত্র সভায় মাঝে মাঝে উৎসব করা যাইত তাহাতে সহরের গণ্য মান্য শিক্ষিত লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইত। তাঁহারা ছাত্রগণের রচিত প্রবন্ধাদি শ্রবণ করিয়া ও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইতে নির্ব্বাচিত বিষয় যে ছাত্রগণ দক্ষতার সহিত অভিনয় করিত তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন।

এই সকল যুবকের সংসর্গে থাকিয়া, তাহাদিগকে লইয়া নিত্য নূতন কাজ করিয়া, কত যে বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগ করিয়াছি, কত আনন্দ আহ্লাদে যে কাল কাটাইয়াছি, তাহা আজ এই জীবনের শেষ ভাগে স্মরণ করিয়াও সুখবোধ হয়। সেবাব্রতে ইহারা সর্ব্বদাই অগ্রসর ছিল। সহরে কোথাও রোগীর সংবাদ পাইলে তাহারা দলবলে যাইয়া সেখানে উপস্থিত হইত এবং রাত্রি জাগিয়া ও দিনে খাটিয়া, শুশ্রূষা ও চিকিৎসা দ্বারা রোগীকে সুস্থ করিয়া তুলিত। এস্থলে আর একটি লোকের নাম উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। বাবু শরচ্চন্দ্র রায়। সেই ধর্ম্মপ্রাণ কর্ম্মবীর শরচ্চন্দ্র রায় সকল কাজে আমাদের সহযোগী ছিলেন। তিনি এই ছাত্রগণের যে শুধু পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাহা নহে। তিনি ইহাদের পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু একাধারে সকলই ছিলেন। ইহারা তাঁহার কাছে সকল প্রকার আবদারই করিত, তিনিও যথাসম্ভব তাহাদের মন যোগাইতে চেষ্টা করিতেন। ইহাদের কল্যাণ কামনায় শারীরিক পরিশ্রম, মানসিক চিন্তা এবং কত অর্থ ব্যয় করিতেন! আমরা তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সকল কাজ করিতাম এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অদম্য উৎসাহ উদ্যমে প্রত্যেক কাজে মাতিয়া যাইতাম। তিনি তাঁহার এ জগতের কার্য্য শেষ করিয়া স্বর্গরাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অন্তিমকালে তাঁহার সহধর্ম্মী ও সহকর্ম্মী বন্ধুগণ মনের আনন্দে তাঁহার চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা করিয়া এবং পরিচর্য্যার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে তাঁহার প্রাণের প্রিয়তম ব্রহ্মনাম শুনাইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

শ্রীকালীকৃষ্ণ ঘোষ।

সৎসঙ্গ।

সাবানে শুধালো নারী বল কি মায়ায়,
অদৃশ্য গোলাপ বাসে বেঁধেছ হিয়ায়!
সাবান কহিল তারে মোর জন্মক্ষণে
এক নিশি কেটেছিল গোলাপের সনে।

গোলাপ শুকালো যবে, গন্ধটুকু তারি।
বন্ধুত্বের স্মৃতি সম, বক্ষে লয়ে ফিরি!
তৈল মাত্র আমি সার;—সুজনের সনে
সহবাসে পুষ্পলাভ ঘটেছে জীবনে!

শ্রীসুরেশ চন্দ্র সিংহ।

গ্রন্থ—সমালোচনা।

পদ্মিনী—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশক গ্রন্থ খানাকে যতদূর সম্ভব নয়নাভিরাম চিত্রে ও বেশ ভূষায় সজ্জিত করিয়াছেন। গ্রন্থে রাজপুত-কুল গৌরব ভীম সিংহের পত্নী পদ্মিনীর উপাখ্যান সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার সেই চিরপুরাতন রাজপুত গাঁথাকে ভাষার সৌন্দর্য্যে ও ভাবের মাধুর্য্যে নূতন করিয়া পাঠকের সমক্ষে স্থাপন করিয়াছেন। গ্রন্থখানি বঙ্গ মহিলাদিগের উপহারের পক্ষে মনোজ্ঞ হইয়াছে। গ্রন্থকার স্ত্রী পাঠ্য গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এ গ্রন্থে তাহার যশো সৌরভ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র সেন।

Asutosh Press, Dacca.

সৌরভ

দ্বিতীয় বর্ষ। } ময়মনসিংহ, চৈত্র, ১৩২০। { ষষ্ঠ সংখ্যা।

দস্যু কেনারাম।

(চন্দ্রাবতীর গীত অবলম্বনে লিখিত)

কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে একদিন চৈত্রমাসের অপরাহ্ণ বেলায় এক দল ভাসান গায়ক ভয়ে ভয়ে প্রান্তর পথ অতিক্রম করিতেছিল।

ভয়ে ভয়ে কেননা তদানিন্তন দেশের অবস্থা বড় ভাল ছিল না। লোকসংখ্যা ও বসতি অতি বিরল ছিল। যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া দীর্ঘ প্রান্তর হেমন্তে বৃক্ষলতা সমাবৃত "নল খাগরে" আচ্ছাদিত মহাবনে পরিণত হইত, আবার গ্রীষ্মাবসানে সেই বিপুল বনভূমি বর্ষার জলে দিগন্ত পর্য্যন্ত ডুবিয়া মহাসাগরের মত কল্‌কল্ করিত। সমধিক উচ্চভূমিতে বহুলোক একসঙ্গে মৌমাছির ন্যায় বাস করিত। এই-রূপ বসতিকে লোকে সেকালে "আটী" বলিত। পরিণয়াদি যাহার তাহার আটীতেই সম্পন্ন হইত। দুচার মাইল দূরের এক আটীর লোক অন্য আটীর লোককে চিনিত না, অথবা চিনা দিতে ইচ্ছাও করিত না। লোক চলাচলের তেমন রাস্তা ঘাট ছিল না, প্রকাশ্য রাস্তা অপেক্ষা গোপনে জঙ্গলের ভিতর দিয়া চলাফিরা করার রীতি ছিল। বড় বড় বৃক্ষতল মনুষ্যের অতিথিশালা ছিল। তেমন বৃক্ষ অধুনা আর দেখা যায় না। দূরদেশে যাইতে হইলে পান্থগণ প্রায়ই বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিত। প্রাণান্তেও কেহ কোন গৃহস্থের বাসভূমিতে আশ্রয় লইত না; পাছে গৃহস্থ নিদ্রিত পান্থের বুকে ছুরি বসাইয়া ধন প্রাণ হরিয়া লয়, আবার গৃহস্থও কোন দিন স্বীয় বাসভবনে অতিথিকে আশ্রয় দিত না, পাছে সেই অতিথি দস্যুরূপ ধরিয়া গৃহস্বামীর ধন প্রাণ লুণ্ঠন করে। রাজ্য একরূপ অরাজক ছিল। কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিত না। মানুষ দস্যুর নামান্তর ছিল মাত্র। দূরদেশে যাইতে হইলে জীবনের আশা ছাড়িয়া দিতে হইত। মাসাধিক পূর্ব্ব হইতে আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাওয়ার সুরু হইত। যাত্রার দিন মহাযাত্রার ন্যায় কান্না কাটির রোল পড়িয়া যাইত। ডাকাত দেশের সর্ব্বময় প্রভু ছিল। লোকে টাকা পয়সা মাটির নীচে পুতিয়া রাখিত। কিন্তু তাহাও নিরাপদ ছিল না।

> "টাকা পয়সা রাখে লোকে মাটিতে পুতিয়া
> ডাকাতে কাড়িয়া লয় গামছা মোড়া দিয়া।
> ডাকাত দেশের রাজা বাদশায় না মানে,
> উজার হইল রাজ্য কাজীর শাসনে।
> "দৈছত' পাইয়া সবে ছাড়ে লোকালয়,
> ধনে প্রাণে মরে প্রজা চন্দ্রাবতী কয়।"

দেশের অবস্থা যতই অরাজক হউক না কেন, মানুষ তখন একেবারে অসুখী ছিল না। পেটের দায়ে লোকে এক্ষণে যেমন উঠান পর্য্যন্ত চষিয়া খায়, তখনকার অবস্থা তেমন ছিল না। ভূমি প্রচুর শস্য দান করিত, অতি সামান্য মাত্র স্থানে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত। পালিত পশুর সংখ্যা অত্যধিক ছিল—গরুতে প্রচুর দুগ্ধ দান করিত, দুধের কোনও মূল্য ছিল না, চাহিলেই পাওয়া যাইত।

"বাথানে মহিষ আর পালে যত গাই
কত যে চড়িত তার লেখা জোখা নাই।"

সেই বিপদ সঙ্কুল সময়ে গায়কগণ ধীরে ধীরে প্রান্তর পথ অতিক্রম করিতেছিলেন। তাঁহাদের কাহারও হাতে মৃদঙ্গ, কাহারও হাতে করতাল,কাহারও হাতে একতারা; সকলেরই বেশভূষা সন্ন্যাসীর মত। ইহাদের মধ্যে যিনি দলের নায়ক, তাঁহারই উপর সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয়। তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি নিশীথ-যজ্ঞানল-শিখার ন্যায় উজ্জ্বল। প্রশান্ত মহাসাগর তুল্য অচঞ্চল। যেমন শান্ত, তেমনি গম্ভীর। মুখমণ্ডলে উজ্জ্বল জ্যোতি বিভাসিত। বিশাল ললাটে চন্দন পুণ্ড্র, দেখিলেই মহাপুরুষ বলিয়া ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়। মনে হয়—সশিষ্য দুর্ব্বাসা যেন অতিথি বেশে পাণ্ডব সদনে চলিয়াছেন।

বিশাল প্রান্তর পুতনা রাক্ষসীর মতন যোজনব্যাপী দেহ লইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, দিগন্তে বনরাজি নীলা কালো পাহাড়ের মত আকাশ প্রান্তে মিশিয়াগিয়াছে, স্থানে স্থানে মঞ্চোপরি বসিয়া কৃষক শিশু গান ধরিয়াছে। শালী ধান্য সকল প্রায় পাকিয়া উঠিয়াছে। স্থানে স্থানে বিশাল প্রান্তর-তরু ক্ষুদ্র বনের পিতৃতুল্য সুদীর্ঘ সুপত্র শোভাময়, তাহাতে বসিয়া প্রকৃতির পোষমানা পাখী সকল গান গাহিতেছিল—তাহা সরল, সুন্দর, মর্ম্মস্পর্শী ও ভাবময়।

গায়কগণের মধ্যে কেহ কেহ সেই তানে তান মিলাইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্যের বিপুল দুরতা যুক্ত করিয়া দেবতা ও মানুষের মাঝখানে একটী মিলন রেখা টানিয়া দিতেছিল। ক্রমে তাঁহারা একটী নিবিড় বনের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন সময় সহসা পার্শ্ববর্ত্তী "নল খাগরা" বন নড়িয়া উঠিল, পাছে কোনও হিংস্র জন্তু দল বাঁধিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে, সেই ভয়ে সকলেই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু কোথায় হিংস্র জন্তু! সহসা একদল বন্য লোক আসিয়া তাঁহাদের চারিদিক ঘেড়াও করিল। দস্যুদিগের প্রত্যেকের হাতে শানিত খাণ্ডা, পরিধানে "মাল কোচা" ধুতি, যেমন দৃঢ় দেহ, তেম্‌নি বলিষ্ঠ চেহারা; তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দলপতি সে দেখিতে একটি কালো পাহাড়ের মত; দীর্ঘ দেহ, সুদৃঢ় মাংসপেশী, আজানুলম্বিত ভুজ, দীর্ঘ নাসিকা, বিশাল ললাটের উপর যেন নরহন্তা নাম লেখা রহিয়াছে। সুদৃঢ় বক্ষস্থল যমপুরীর কবাটের মত দয়ামায়াশূন্য নিরেট পাষাণ।

দলপতি অগ্রসর হইয়া বলিল—"চিনিতে পারিতেছ আমরা কে?"

মহাপুরুষ বলিলেন—"বিষধর সর্পকে কে না চেনে? বেশ চিনিয়াছি, তোমরা নরহন্তা দস্যু।"

দস্যুপতি বলিল—"তবে দাও সঙ্গে যাহা আছে—টাকা কড়ি।"

মহাপুরুষ বলিলেন—"কিছুই নাই, এই কয়েকখানা ছেঁড়া কাপড় মাত্র।"

দস্যু কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"সেকি! বাড়ী বাড়ী গান গাহিয়া ফির, পয়সা পাওনি?"

মহাপুরুষ বলিলেন—"গান শুনিয়া পয়সা দিবে এ অঞ্চলের লোক আজও তেমন হয়নি; দেবতার লীলা গাহিয়া সবে মানুষের মন গলাইবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র।"

রুক্ষস্বরে দলপতি বলিল—"তা হউক, কিছু চাই না, নরহন্তার নরহত্যাই পরমানন্দ। আমরা তোমাদিগকে হত্যা করিব। জয় মা কালী! জয় মা শ্মশানকালী!"

দস্যুগণের বিকট করতালি ও হুহুঙ্কারে বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইল। মহাপুরুষ বলিলেন—"সাধু! নরহত্যা মহাপাপ তা তুমি জান না?"

বিকট হাসিয়া দস্যুদলপতি বলিল—"পাপ? নরহত্যা পাপ? নরহত্যা যদি পাপ হয়, তাহলে আমার পাপ ওজন করিলে পৃথিবীর চাইতেও অধিক হইবে। জীবনের তিন ভাগ নরহত্যা করিয়া কাটায়েছি; এই অল্প কয়েক দিনের জন্য তোমার কাছে ধর্ম্ম শিক্ষা করিব? আমি পাপ পুণ্য মানি না।"

মহাপুরুষ বলিলেন—"সাধু, তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

আবার সেই হাসি। প্রান্তরের পশু পক্ষী কাঁপিয়া উঠিল—"হো হো আমাকে চেন না? আমি কেনারাম।"

নাম শুনিয়া যেন গাছের শুক্‌নো পাতা ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িয়া গেল। ডালের পাখী সট্‌কে পালাইল। ভীত ত্রস্তভাবে অন্যান্য গায়কগণ পেছন ফিরিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। বোধ হয় সশরীরে কৃতান্তকে দেখিলেও তাঁহারা এতদূর চমকিত, এম্‌নি ধারা ভয়-ত্রস্ত হইতেন না। সকলেরই মুখ শুকাইয়া উঠিল। মহাপুরুষ কিন্তু স্থাণুবৎ অচল অটল, হিমাদ্রি শৃঙ্গবৎ অকম্পিত। কেনারাম চমকিত হইয়া বলিল,—"সে কি ঠাকুর! বসুন্ধরার যদি চেতনা থাকিত,তা হলে সেও আমার নামে শিহরিত, আর তুমি ঠাকুর একটুকুও চম্‌কাইলে না?"

মহাপুরুষ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"ভয়? জীবনে —ভয় কা'কে বলে জানিনা, আমি মৃত্যুকে পর্য্যন্ত ভয় করিনা, তোমাকে ভয় করিব?"

কেনারাম, তাঁহার সহাস্য বদন মণ্ডল, প্রশান্ত চন্দন চর্চ্চিত চিন্তা বর্জ্জিত ললাটের দিকে চাহিয়া যেন বিস্মিত ভাবে বলিল—"ঠাকুর তুমি কে?"

ঠাকুর বলিলেন—"আমি ব্রাহ্মণ।"

কেনারাম বলিল—তা'ত দেখিতেছি, নাম বল না!"

উত্তর হইল—"দ্বিজবংশী।"

নিস্তব্ধ প্রান্তরের উপর দিয়া বায়ু হা হা করিয়া বহিয়া গেল।

কেনারাম আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল—ঠাকুর তুমিই দ্বিজবংশী! তোমার গানেই না নদী উজান বয়, পাষাণ গলিয়া যায়, আকাশের মেঘ কাঁদিয়া বর্ষে?

মহাকবি বলিলেন— "পাষাণ গলান সহজ কথা, কিন্তু মানুষ যদি একবার পাষাণ হইয়া দাঁড়ায়, তবে তাকে গলান তেম্‌নি কঠিন হইয়া পড়ে।"

কেনারাম বেশ বুঝিতে পারিল, একথা কেবল তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে, বুঝিয়াও কোন উত্তর দিল না, মুগ্ধ ভাবে মহাপুরুষের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ঠাকুর বলিলেন—"কেনারাম" তুমি ধন লইয়া কি কর?"

কেনারাম বলিল—"কি করিব?"

ঠাকুর বলিলেন—"ভোগ কর—না পরকে বিলাও।"

কেনারাম বলিল—"কা'কে বিলাব, বাঘ ভাল্লুককে? তা'রা ধন লয়ে কি করিবে?

মহাপুরুষ উত্তর করিলেন—"কেন দরিদ্রকে।"

কেনারাম বিরক্তির সহিত বলিল—দরিদ্রকে দান করিব? দেখ ঠাকুর, ধন পাইলে দরিদ্র আর দরিদ্র থাকিবে না। সে তখন অহঙ্কারী অবিনয়ী—ধরার কলঙ্ক স্বরূপ হইবে। ধনে লোভ, লোভে মত্ততা। আমি ধন লোভে মত্ত হইয়া যে কুকার্য্য করিতেছি, তা'র জন্য নিজকে নিজে অনেক সময় ধিক্কার দেই।

মহাপুরুষ বলিলেন—"তবে ভোগ কর!"

কেনারাম বলিল—"তাই ভাবি, যে ধন উপার্জ্জন করিয়াছি, বসিয়া খাইলে সাত পুরুষেও ফুরাইবেনা। কিন্তু লোভের এম্‌নি টান, তবু কেবল উপার্জ্জনই করিতেছি, ভোগ করিবার অবসর কোথায়?"

ঠাকুর বলিলেন—"তবে কর কি?"

কেনারাম বলিল—"যার ধন তা'র কাছে লুকাইয়া রাখি।"

ঠাকুর আবার বলিলেন—"ধন কা'র?"

কেনারাম বলিল—"কেন? বসুন্ধরার ধন বসুন্ধরার কাছে লুকাইয়া রাখি।"

ঠাকুর—"তাতে লাভ কি?"

কেনারাম—"লাভ ক্ষতি আমি ঠাকুর জানিনা। দেশে এত এত ধনী লোক পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদের ধনে কাঙ্গাল গরীবের কি লাভ হইতেছে? কথায় কথায় অনেকটা সময় বহিয়া গেল, এইবার ঠাকুর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।"

মহাকবি বলিলেন—"কেনারাম একটু সবুর কর, আজ আমার জীবনের শেষ দিন, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছি, একবার জন্ম শোধ গাহিয়া লই, জীবনের শেষ গান।" কেনারাম বলিল তবে গাও ঠাকুর যতক্ষণ পর্য্যন্ত আবার খাণ্ডা হাতে না লই।" তখন—

"আকাশ চাঁদোয়া হইল,শুনে পশু পাখী
কেনারাম বসিল হাতের খাণ্ডা রাখি,
উড়ে যায় পাখী আসি বসিল ডালেতে,
মনসা ভাসান গায় অঙ্গনার সুতে।"

বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর দূর্ব্বা শ্যামল গালিচা পাতার, তার উপর কেনারাম দলবলসহ বসিয়া গেল। গীত আরম্ভ হইল। আজিকার এই গান ইহ জীবনের শেষ গান। তাহার প্রতি কথায়, প্রতি অক্ষরে, অশ্রুধারা বহিতে লাগিল, শ্রোতা গায়ক সকলেরই মন গলিয়া গেল। আজিকার এই গান কেনারামের জন্য নহে, এ মর জগতের জন্য নহে, আকাশ প্রান্তর প্লাবিত করিয়া চন্দ্র সূর্য্যকে পিছন ফেলিয়া গায়কের কণ্ঠস্বর বিধাতার সিংহাসন তল পর্য্যন্ত পৌছিল। সন্ধ্যা মিলাইয়া গেল, নীল চন্দ্রাতপ তলে হীরার ঝার জ্বলিতে লাগিল। অন্ধকার যখন ঘণীভূত হইয়া আসিল, তখন প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া দস্যুগণ মশাল জ্বালিয়া দিল।

গীত চলিল। ঐশ্বর্য্যের উচ্চচূড়ে প্রতিষ্ঠিত মহাবাহু চন্দ্রধর। তাঁর ছয়পুত্র চৌদ্দডিঙ্গা, জলে স্থলে অক্ষুণ্ণ প্রভাব। সে রাজম্বতী চম্পক, দেবতারও আকাঙ্খিত। এত সুখ এত সৌভাগ্য জগতে আর কাহারও নাই। শত শত সামন্ত রাজা তাঁহার আজ্ঞাবহ দাস। দাম্ভিক, অঘোর পন্থী, চিরনির্ব্বিকারহৃদয় মহাবাহু চন্দ্রধর, অদ্বিতীয় রাজ রাজেশ্বর!

পরক্ষণেই আবার একি! মহাস্রোতে চন্দ্রধরের সেই ষড়ৈশ্বর্য্য কোথায় ভাসিয়া গেল। চির চঞ্চলা লক্ষ্মী তাঁহার ধনরত্ন সুখসৌভাগ্য লইয়া পলাইয়া গেলেন। হতভাগ্য চন্দ্রধরের ছয়পুত্র মরিল, চৌদ্দডিঙ্গা ডুবিল, একুশরত্ন ভাঙ্গিয়া পড়িল। কোথায় গেল সেই সুখ সৌভাগ্য? মহা-স্রোতে নিপাতিত বালীর জাঙ্গালের মত দেখিতে দেখিতে কোথায় ভাসিয়া গেল। রাজম্বতী অমর বাঞ্ছিত চম্পক আজ শ্মশান। সামন্ত পতি চন্দ্রধর আজ পথের ভিখারী। ঝড়ে পড়া ফুলের মত রহিল কেবল তাঁহার ছয়টী বিধবা পুত্রবধূ!

ঐদেখ ধীরে ধীরে, বাণিজ্য লক্ষ্মী আবার চন্দ্রধরের অঙ্কগতা হইলেন। সপ্ত সমুদ্র চন্দ্রধরকে আবার ভাণ্ডার ভরিয়া ধনরত্ন দান করিল। কমলা আবার রত্ন-ভাণ্ডার জমকাইয়া বসিলেন। অভ্রভেদী একুশরত্ন আবার সূর্য্য কিরণের গতি রোধ করিয়া দাঁড়াইল। অসীম সমুদ্রও তাঁহার প্রভাবে সসীম। বায়ু তাঁহার আজ্ঞাবহ। বানিজ্য লক্ষ্মী তাঁহার করতল গত। সুখ যখন আসে, তখন মানবের কোন আকাঙ্খাই অপূর্ণ থাকিতে দেয় না।

শ্মশানে আবার ফুল ফুটিল। একদিন পূর্ণিমার চাঁদের মত একটী নবকুমার পাটেশ্বরী সনকার শূন্য অঙ্ক যুড়িয়া বসিল, জয়-জোকার ও মঙ্গল গীতে আবার চন্দ্রধরের নব নির্ম্মিত পুরী মুখরিত হইয়া উঠিল।

আবার সেই কাল স্রোতের টান, আবার সব ভাসিয়া গেল। যুবরাজ লক্ষীন্দর সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিলেন। কোথায় রহিল তার লোহার মাঞ্জস! দাম্ভিক রাজা আগে বুঝিতে পারে নাই যে, জগতে কাল-অগোচর কোন পদার্থই নাই।

"দ্বিজবংশী গায় গীত, বেউলা হইল রাড়ী,
কেনারামের চক্ষের জল বহে দর দরি।
যখন গাহিল পিতা বেহুলা ভাসান,
হাতের খাণ্ডা ভূমে থইয়া কান্দে কেনারাম"

পাষাণ গলিয়া গেল। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, দস্যুগণের মশাল জ্বলিয়া জ্বলিয়া আপনা হইতেই নিবিয়া গিয়াছে, আকাশের হীরার ফুল শিশিরাকারে দূর্ব্বাবনের উপর ঝড়িয়া পড়িয়াছে। কেনারাম বলিল—"ঠাকুর তোমার দান অমূল্য, বুঝি দেবতার ভাণ্ডারেও তাহার মূল্য মিলিবেনা। আমি তোমাকে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিব, যদি দস্যু বলিয়া ঘৃণা না কর—কিন্তু জানিও আজ হতে আর আমি দস্যু নহি, যে খাণ্ডা ত্যাগ করিয়াছি, ইহ-জীবনে আর তাহা গ্রহণ করিব না।"

প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া দস্যুগণ বনভূমি হইতে ঘড়ায় ঘড়ায় ধন বহিয়া আনিতে লাগিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে কেনারাম কুবেরের ভাণ্ডার সাজাইয়া বলিল—"ঠাকুর এই লও।"

মহাপুরুষ দস্যুর রক্ত মাখা ধন ভাণ্ডার হইতে চকিত দৃষ্টিতে নয়ন ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন—"কেনারাম! তোমার এধন বসুন্ধরার অঙ্কেও স্থান পাইবেনা, এ মহা-পাপেরধন আমি লইয়া কি করিব? তোমার ধন তুমিই লও, গৃহস্থের মুষ্টিভিক্ষাই আমার পক্ষে সুবর্ণ মুদ্রা।"

কেনারাম অনেকক্ষণ নির্ব্বাকভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সে যেন দাঁড়াইয়া ২ তাহার জন্মার্জ্জিত পাপের সংখ্যা এক দুই করিয়া গণিতেছিল। তাহার বিশাল ললাটে আত্ম-গ্লানির বিষম জ্বালা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। সে

কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"তবে চল ঠাকুর, আজ আমার পাপার্জ্জিত ধনের সদ্ব্যবহার করিব।"

বিপুল জলরাশি লইয়া ভৈরব কল্লোলে মহানদী ফুলেশ্বরী (বর্ত্তমানে ফুলিয়া) বহিয়া যাইতেছে, মহাস্রোতে ঐরাবত ভাসিয়া যায়, ঐ দেখ কেনারাম তাহার জীবনের উপার্জ্জিত সমস্ত ধন রাশি মহাস্রোতে একে একে ভাসাইয়া দিতেছে, কত টাকা কড়ি মোহর জহর কতছিন্ন কণ্ঠা কামিনীর রত্নালঙ্কার, একে একে সব ভাসিয়া গেল। কেনারাম তাহার নরঘাতী ভীষণ খাণ্ডা মহাস্রোতে ফেলিয়া দিয়া বলিল—"ঠাকুর,সব বিসর্জ্জন দিয়াছি, বাকী মাত্র এই জীবন,দাঁড়াও ঠাকুর আজ তোমার সম্মুখে, তোমার ঐ পুণ্যময় দেহ দেখিতে দেখিতে কেনারাম তাহার জীবন স্রোত এই মহাস্রোতে মিশাইবে।"

মহাকবি বাধা দিয়া বলিলেন—"আর তোমাকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইবে না, তোমার জীবনের দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইল, সে নরঘাতী দস্যু কেনারাম আর নাই। ফুলেশ্বরীর জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। পুণ্যস্রোতে অবগাহন করিয়া এসো, আমি তোমাকে মুক্তিমন্ত্র প্রদান করি, আজ হতে তুমি আমার প্রিয়তম শিষ্য মধ্যে পরিগণিত হইলে।"

কেনারাম স্নান করিল, পুণ্যস্রোতে যেন তাহার পাপজীবনের সমস্ত কলঙ্ক ধৌত হইয়াগেল; মনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আকৃতিরও সহসা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিল। এইরূপে মহাপুরুষ-সংস্পর্শে কেনারাম অচিরেই নবজীবন লাভ করিল, এবং মহাকবির প্রিয়তম শিষ্য ও সুকণ্ঠ গায়ক বলিয়া দিনদিন প্রসিদ্ধি লাভ করিতে লাগিল। তার পর প্রভুর সমস্ত সদ্গুণ রাশির অধিকারী হইয়া একদিন—

"কেনারাম কহে প্রভু ঘরে যাও তুমি
চাউল কড়ি যাহা পাই লয়ে আসি আমি।"

মহাকবি তাঁহার জীবনের সমস্ত কার্য্য ভার কেনারামের উপর অর্পণ করিয়া ঘরে গেলেন, কেনারাম নগর ঘুরিয়া "মনসা ভাসান" গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। যে কেনারামের নাম শুনিলে লোকে প্রাণভয়ে শিহরিয়া উঠিত, সেই কেনারামের গানে আজ সমস্ত দেশ পুলকে রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল।

"এইরূপে ভাসান প্রচারে ঘরে ঘরে,
পাষাণ গলিয়া জল বহে শত ধারে,
কেনারাম গায় গান ঝরে বৃক্ষের পাতা,
পয়ার প্রবন্ধে ভনে দ্বিজবংশী সুতা।"

যে প্রান্তরে মহাকবি দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহার নাম "জালিয়ার হাওর"। সেই বিশাল প্রান্তর ময়মনসিংহ জেলায় আজও বর্ত্তমান আছে, কবি চন্দ্রাবতী লিখিয়াছেন—

"জালিয়া হাওর নাম ব্যক্তত্রিভুবন,
দিনেকের পথ যুরি নলখাগর বন।
ভাসান গাহিতে পিতা যান দেশান্তরে,
পথে পেয়ে কেনারাম আগুলিল তারে।"

"দস্যু কেনারামের পালা" এতদঞ্চলের একটী কৌতুহলপূর্ণঘটনা। সুকণ্ঠ গায়কগণ আজও কেনারামের পালা গাহিয়া বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করেন। ইহার সঙ্গে দেশের বহু কালের বিগত স্মৃতি বহু পরিমাণে জড়িত আছে। আজ আমরা তাহার কিঞ্চিম্মাত্র আভাস প্রদান করিলাম।

শ্রীচন্দ্রকুমার দে।

তিব্বত অভিযান।

ভীষণ রজনী।

—:০:—

ফারী হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে নারাং নামক হ্রদ আছে। শীতের প্রকোপে ইহার অধিকাংশ বরফে জমিয়া গিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে কয়েকটা স্থানে জল ছিল। ঐ সকল স্থানে নানাপ্রকার মৎস্য প্রচুর পরিমাণে ছিল বলিয়া সাহেবেরা প্রায়ই তথায় যাইতেন। আমি ও মাঝে মাঝে যাইতাম। এই হ্রদে আমরা প্রায়ই যাইতাম বলিয়া আমরা তথায় একটা ক্ষুদ্র ঘর প্রস্তুত করাইয়া ছিলাম। ইহার প্রাচীর দারুময় এবং ছাতের উপর টিন দেওয়া হইয়াছিল। কোনও কোনও দিন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ গল্প করিয়া ঐ স্থানে রজনী অতিবাহিতও করিতাম।

একদিন বেলা একটার সময় আমরা ঐ স্থানে উপস্থিত হইলাম। সে দিন আমাদের সহিত তিন জন সাহেব, দুইজন বাঙ্গালী (আমি ও সেন মহাশয়)—দুই জন শিখ কর্ম্মচারী, তিনজন গুর্খা ও একজন তিব্বতীয় ভৃত্য ছিল। সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক ছিল। সামান্য বিশ্রামের পর প্রায় সকলেই মাছ ধরিতে বসিলাম। প্রথমেই সেন মহাশয় এক প্রকাণ্ড রুই মাছ গাঁথিয়া ফেলিলেন। খেলাইয়া যখন মাছটা তুলিয়া ফেলা হইল, তখন দেখা গেল যে, ওজনে উহা পনর সেরের কম নয়। ছিপে এত বড় মাছ খায়, তাহা আমার ধারণা ছিল না। তাহার পর একজন গুর্খা কর্ম্মচারীর পালা। ইহার হুইলে কত বড় মাছ খাইল তাহা অবশ্য আমরা প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। মাছটা—গাথা ইইবা মাত্র অতি ভীষণ বেগে হ্রদের অন্যদিকে যাইতে লাগিল। শেষে এমন হইল, বুঝি ছিপ ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার পর সহসা মাছটা যেন খুব নিস্তেজ হইয়া পড়িল। গুর্খা এই সময় হ্রদের ধারে এক খানা উচ্চ পাথরের উপর দাঁড়াইয়া ছিল। মাছটা নিস্তেজ থাকিবার পর আবার সহসা এমন ভীম বেগে ছুটিল যে, গুর্খা সামলাইতে না পারিয়া জলের মধ্যে পড়িয়া গেল। নিকটেই আমাদের বড় ডাক্তার সাহেব দাঁড়াইয়াছিলেন। গুর্খা যে সাঁতার জানেনা, তাহা তিনি জানিতেন; চক্ষুর নিমিষে তিনি কোট ও শ্লিপার ছাড়িয়া হ্রদের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন। এই সময়ের মধ্যে গুর্খা কিন্তু দুই বার ডুবিয়া গিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছিল ও খানিক দূর চলিয়া গিয়াছিল। তৃতীয় বার ডুবিবার অগ্রেই সাহেব যাইয়া তাহার গ্রীবা দেশ চাপিয়া ধরিলেন। গুর্খার বাহাদুরী এই যে, এ অবস্থাতেও সে ছিপটা ছাড়িয়া দেয় নাই। সাহেব তাহাকে উহা ছাড়িবার জন্য পুনঃ ২ অনুরোধ করাতেও সে কর্ণপাত করিল না। এই সময় আর একটা ঘটনা উপস্থিত হইল, গুর্খার একটা অতি প্রকাণ্ড পাহাড়ী কুকুরও হ্রদের তীরে উপস্থিত ছিল। সে প্রভুকে জলে পড়িতে দেখিয়াই জলে ঝাঁপ দিয়াছিল। প্রথমে সে অন্যদিকে ভাসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু শেষে বিশেষ চেষ্টার পর সে প্রভুর নিকট উপস্থিত হইল। যে সময়ে সাহেব আসিয়া গুর্খাকে ধরিলেন, ঠিক সেই সময়ে কুকুরটা ও তাহার প্রভুর কোটের পশ্চাদিক মুখে চাপিয়া ধরিল। এখন ব্যাপার বুঝুন—সাহেব গুর্খাকে ধরিয়াছেন—গুর্খার এদিকে এক প্রকাণ্ড মাছ, অপরদিকে এক বিপুল দেহ কুকুর। সেই ডিসেম্বরের শীতে এই ভাবে জড়া জড়ি করিতে করিতে সাহেব অতি কষ্টে গুর্খাকে তীরে উঠাইলেন। কিন্তু মাছটা তখনও পর্য্যন্ত কাবু হয় নাই। অনেক চেষ্টার পর তাহাকে জল হইতে উঠান হইল। এত বড় মাছ বোধ হয় কখনও দেখি নাই। মাছটা মহাসের—ওজনে ২৮ সের ২ ছটাক। কেবল মাথাটাই প্রায় ৮ সের। শুনিলাম, এই হ্রদে ৪০।৪২ সের ওজনের পর্য্যন্ত মাছ অনেক আছে।

আমাদের দেশে জামাইর পাতে আস্ত রুইএর মুড়া দেওয়া হয়। বাবাজীদের পাতে এই রকম একটা মুড়া পড়িলে বোধ হয় তিনি তৎক্ষণাৎ শ্বশুর বাড়ী ত্যাগ করেন—সহসা ইহাকে মহিষ বা ঐরূপ কোন ও জন্তুর মাথা বলিয়া ভ্রম হওয়া বিচিত্র নহে!

অপরাহ্নে আমরা মাছধরা বন্ধ করিলাম। সে রাত্রি ঐখানে কাটাইব বলিয়া পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়াছিলাম। আহারের আয়োজন প্রস্তুতই ছিল। আমরা সেন মহাশয়ের মৎস্যটা রন্ধন করিয়া মনের সাধে আহার করিলাম। আমরা আহারাদি করিয়া ধূমপান করিতেছি, এমন সময় একজন সংবাদ দিলেন যে, খুব শীঘ্র একটা প্রবল ঝড় আসিবার বিশেষ সম্ভাবনা। কথাটা বড় একটা কেহ কানে তুলিলেন না। ইহার মিনিট কয়েক পরেই সহসা অদূরে এক অস্বাভাবিক শব্দ শুনিতে পাইলাম। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের ঝড়ের অভিজ্ঞতা সকলেরই কিছু কিছু ছিল। একটা ঝড় যে আসিতেছে তাহা তখন সকলেই বুঝিতে পারিলাম। আমাদের তিব্বতীয় ভৃত্য এই সময় সবেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। পর মুহূর্ত্তে বাহিরে ঝড়ের ভীষণ আস্ফালন শুনিতে পাইলাম। কি ভীষণ ব্যাপার! ঝড়ের কি গভীর নিনাদ! মনে হইল,এখনই বুঝি সমস্ত ঘরখানাকে কোনও দূর পাহাড়ের উপর উড়াইয়া লইয়া যাইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইহ জীবনের খেলা সাঙ্গ হইবে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ঘরখানা দুইটা

পাহাড়ের আড়ালে ছিল বলিয়া পবন দেব আমাদের কোনও অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। আমরা সকলে ঘরের সমস্ত গবাক্ষ ও স্কাইলাইট ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া আগুনের ধারে আসিয়া বসিলাম।

এই সময়ে হ্রদের মধ্যে যেন সহস্র সহস্র ভূত প্রেত তাণ্ডব নৃত্য করিতেছিল। ঝড়ের বেগে বরফ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পরস্পরের উপর আসিয়া পড়িতেছিল—মনে হইতেছিল বুঝি পর্ব্বত পর্ব্বতের উপর পড়িয়া সহস্র সহস্র খণ্ডে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে। হ্রদের দক্ষিণ দিকে ঠিক জলের উপর হইতে একটা পর্ব্বত মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। উহার উপর হইতে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড মাঝে মাঝে হ্রদের মধ্যে পড়িতেছিল।

এই সময়, ঠিক কি জন্য জানিনা, ছোট ডাক্তার সাহেবের পেটে বিষম বেদনা আরম্ভ হইল। সে অবস্থায় যতদূর সম্ভব আমরা চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বেদনা কোনও মতে হ্রাস পাইল না। রোগী যাতনায় ছটফট্ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বড় ডাক্তার সাহেব বলিলেন যে, উপস্থিত অবস্থায় শীঘ্র কোনও উপযুক্ত ঔষধ না দিলে উহা কোনও মতে যাইবে না। বলা বাহুল্য, সঙ্গে আমাদের কোনও ঔষধই ছিল না। এখন ফারী দুর্গে না যাইলে উপায়ান্তর নাই। কিন্তু এই ভীষণ সময়ে কে এই তিন মাইল পথ যাইতে সাহস করিবে? সকলেই মুখ চাওয়া চায়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ আমাদিগকে ভাবিতে হইল না। বড় ডাক্তার সাহেব স্বয়ং এই ভার গ্রহণ করিলেন। পরের জন্য এমন স্বার্থত্যাগ আমি খুব কম দেখিয়াছি। আমি ইংরাজ সামরিক বিভাগে অনেক দিন কাজ করিতেছি—ইংরাজ যেমন কথায় কথায় জীবনকে তুচ্ছ করিয়া ভীষণ বিপদের সম্মুখে অগ্রসর হয়, আমাদের দেশের লোকেরা তাহা পারেনা। বহুদিনের পরাধীনতাই বোধ হয় আমাদের এই ভীরুতার কারণ।

যাহা হউক, ডাক্তার সাহেব সর্ব্বাঙ্গ বিশেষভাবে আবৃত করিয়া প্রস্তুত হইলেন। একটা বরফের ছড়ি ভিন্ন সঙ্গে আর কিছুই লইলেন না। খুব গরম এক পেয়ালা চা পান করিয়া তিনি কক্ষদ্বার উন্মুক্ত করিলেন। তখনও প্রবল ঝড়ের প্রকোপে ভীষণ বেগে বরফ বৃষ্টি হইতেছিল। এই বরফ বৃষ্টির মধ্যে দরজা খুলিয়া দিবা মাত্র বোধ হয় ৩০।৪০ সের বরফ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। এমন ভীষণ ভাবে বরফ পড়িতেছিল, তাহা আমরা দরজা খুলিয়াই বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারিলাম। প্রকৃতির এই ভীষণ ভাব দেখিয়া সাহেব একবার মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমাদিগকে দ্বার বন্ধ করিতে বলিয়া সেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

এইবার আমি সাহেবের নিজের কথায় তাঁহার সে দিনকার কাহিনী বর্ণনা করিব:—"কয়েক পদ যাইতে না যাইতে আমি বুঝিতে পারিলাম যে ব্যাপার বড় গুরুতর। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাকে ঝড়ের উজানে যাইতে হইতেছিল। হাওয়ার এমন ভয়ানক বেগ যে প্রথমে অগ্রসর হওয়াই আমার নিকট সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া মনে হইল। যেন কোনও ভীষণ দানব আমায় সবলে ঠেলিয়া ফেলিতেছিল। ইহার উপর বরফ। উহা যেন তীক্ষ্ণ মোটা মোটা সূচের ন্যায় আমার মুখে (অপরাপর অঙ্গ উত্তমরূপে আবৃত ছিল) বিঁধিতে লাগিল। যতদূর সম্ভব মুখ আবৃত করিয়া চলিতে লাগিলাম। রাস্তা যদি ভাল হইত, তাহা হইলেও অনেকটা সুবিধা হইত। পার্ব্বত্য পথ—কোথাও নীচু, কোথাও উঁচু। তাহার উপর বরফ পড়িয়া এক এক স্থানে আমার হাঁটু পর্য্যন্ত বসিয়া যাইতেছিল।

"এইভাবে কতদূর গিয়াছিলাম, ঠিক বলিতে পারি না। একে ভয়ানক ঝড়, তাহার উপর ভীষণ পথ, সকলের উপর জমাট অন্ধকার,—মনে হইল অন্ধকার এক দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত আমার চারিদিকে দাঁড়াইয়া আছে। খানিক দূর গিয়া মনে হইল যেন কোনও প্রাণী আমার অনুসরণ করিতেছে। ঝড়ের বেগ মাঝে মাঝে কম হইতেছিল বলিয়া কোন জন্তুর নিঃশ্বাসের শব্দ যেন স্পষ্ট শুনিলাম। কাণ পাতিয়া রহিলাম। কিন্তু ঠিক এই সময়ে ঝড় পুনরায় প্রবল হওয়াতে আর কিছু বুঝিলাম না। এবার কিন্তু বিলক্ষণ সতর্ক হইয়া

চলিলাম। সহসা চপলার উজ্জ্বল প্রভায় চারিদিক আলোকিত হইয়া উঠিল। তখন বেশ স্পষ্ট দেখিলাম, কয়েকটা নেকড়ে বাঘ আমার দক্ষিণে ও বামে আমার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সংখ্যায় তাহারা ২৫।৩০ টার কম হইবে না।

"প্রথমে আমি একটু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। আমার নিকট কোনও প্রকার অস্ত্রাদি ছিল না। আমি জানিতাম যে, এই পাহাড়ের নেকড়েরা বড়ই দুর্দ্দান্ত এবং এক এক দলে ১০০।১৫০ পর্য্যন্ত থাকে। মানুষ দেখিয়া ইহারা মোটেই ভয় পায় না। অনুমানে বুঝিলাম, আমাকে এখনও অনেক দূর যাইতে হইবে। এ অবস্থায় নারাংত্রুদে ফিরিয়া যাওয়াই যুক্তি সঙ্গত মনে করিলাম। কিন্তু ফিরিয়া যাওয়াও এখন বড় কম বিপজ্জনক নয়। পথিমধ্যে উহারা নিশ্চয়ই আমাকে আক্রমণ করিবে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমি অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলাম। এক্ষণে সহসা মুহূর্ত্তকালের জন্য গতিরোধ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম। এই সময়ে আর একবার বিদ্যুৎ দেখা দিল। দেখিলাম আমার ঠিক বামদিকে একটা নাতি উচ্চস্থান। মুহূর্ত্তের মধ্যে কর্ত্তব্যস্থির করিয়া আমি তীরবেগে সেই দিকে ছুটিলাম। বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে নেকড়েরাও আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। আমার তখন সেদিকে লক্ষ্য করিবার অবসর ছিল না। সকলেই জানে, নেকড়েরা দৌড়িবার সময় উচ্চস্থানে শীঘ্র আরোহন করিতে পারে না। এই জন্য বোধ হয় সে গুলি আর আমার অনুসরণ করিতে পারিল না।

"খানিক দূর গিয়া আমি আবার নীচে নামিয়া পড়িলাম ও দক্ষিণদিকে ফিরিয়া আবার ছুটিলাম। এই সময় আমি ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিলাম সুতরাং আমাকে তত কষ্ট পাইতে হইল না। তাহার পর আমি যে কি প্রকারে নারাং এর গৃহদ্বারে পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম তাহা আমার আদৌ মনে নাই। দরজায় কয়েকবার সজোরে আঘাত করাতে ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া দিলে। তোমরা যদি উহা খুলিতে বিলম্ব করিতে, তাহা হইলে আমার প্রাণরক্ষা হইত না।"

এইবার আমাদের কথা বলি। ডাক্তার সাহেব চলিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরে রোগীর বেদনা কিছু কম বোধ হইল, এবং তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। আমরা তখন সকলে আগুনের চারিদিকে বসিয়া সিগার টানিতে লাগিলাম। ইহার প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে আমরা সহসা দরজার উপর ভীষণ আঘাতের শব্দ শুনিতে পাইলাম। প্রথমে আমরা সকলেই খুব ভীত ও বিস্মিত হইয়া পড়িলাম। এমন অসময়ে কে আসিল? কোনও হিংস্র জন্তু নয়ত? আবার আঘাত পড়িল—এবার উপরি উপরি কয়েকবার সজোরে ধাক্কা পড়িল। এবার বাহির হইতে কেহ অত্যন্ত ব্যস্ত ত্রস্ত ভাবে বলিয়া উঠিল—"ভগবানের দোহাই! শীঘ্র দরজা খোল।" সকলেই বুঝিলাম, বড় ডাক্তার সাহেব। নিমেষের মধ্যে দরজা খোলা হইল। সাহেব মাতালের মত টলিতে টলিতে প্রবেশ করিলেন ও তাড়াতাড়ি বলিলেন, "বন্ধ কর, বন্ধ কর। নেকড়ে বাঘ আমার পিছনে লাগিয়াছে।" তৎক্ষণাৎ দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। সাহেবের প্রবল পরমায়ুর বল! দ্বার বন্ধ করিতে না করিতে ঠিক ঘরের সম্মুখে অনেকগুলা নেকড়ের গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম। শীকার হাতছাড়া হইল দেখিয়া তাহারা ভীষণ রবে চীৎকার করিতে করিতে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল।

গৃহের দ্বারটী ছিল পশ্চিম দিকে; উহার উত্তর দিকে একটা গবাক্ষ ছিল। জানালাটা বন্ধ ছিল বটে, কিন্তু উহার দ্বার বিশেষ মজবুত ছিল না। এই গোলযোগের সময় একথাটা কাহারও মনে ছিল না। ডাক্তার সাহেব গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই আগুনের নিকট বসিলেন। একজন শিখ কর্ম্মচারী তাহার হাত ও পা আগুনে সেঁকিয়া দিল। ইহার পর এক গ্লাস ব্রাণ্ডি পান করিয়া যখন তিনি কতকটা সুস্থ হইলেন তখন বলিলেন "এই হিমালয় প্রদেশের নেকড়েগুলা বড়ই ভীষণ। ভাগ্য আজ নিতান্ত ভাল ছিল, তাই উহার হাত হইতে বাঁচিয়া আসিয়াছি।" তার পর তিনি সংক্ষেপে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "ইহারা শীঘ্র যাইবে না। আমাদের উচিত এখন হইতে বিশেষ সাবধান হওয়া। তোমরা অস্ত্রাদি ঠিক রাখ। কে জানে কিভাবে উহারা আক্রমণ

করিবে।" অনুসন্ধানে দেখা গেল যে, আমাদের সহিত সাতটা রিভলভার আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের ভৃত্যকে লইয়া আমরা সর্ব্বসমেত ১১ জন ছিলাম। তাহার মধ্যে ছোট ডাক্তার সাহেব পীড়িত। বিশেষ অনুসন্ধানে একখানা কুড়ালী, একখানা বড় দা, আগুন নাড়িবার একটা বড় লোহার দণ্ড বাহির হইল। তখন অস্ত্রাদি এই ভাবে বিভক্ত হইল--- রিভলভার সাতটা —দুই জন সাহেব, দুইজন শিখ, দুই জন গুর্খা ও আমি পাইলাম। অবশিষ্ট গুর্খাকে ও সেন মহাশয়কে দা এবং কুড়ালী ও ভৃত্যকে লৌহদণ্ড দেওয়া হইল।

এইখানে পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, আপনারা কাহার সহিত লড়াই করিবার জন্য এই সব আয়োজন করিলেন? নেকড়েরাত ঘরের বাহিরে। নেকড়া ঘরের বাহিরে বটে, কিন্তু দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে অধিক বিলম্ব হয় না। যাহা হউক নেকড়েরা যে প্রকার সজোরে দরজায় ধাক্কা দিতেছিল, তাহাতে আমরা বিশেষ শঙ্কিতভাবে অবস্থিতি করিতেছিলাম। উহারা সংখ্যায় বোধ হয় খুব অধিক ছিল। কারণ, এই সময়ে উহারা ঘরের চারিদিক হইতে আমাদিগকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এক এক বার এমন জোরে ধাক্কা দিতে লাগিল যে মনে হইল এইবার বুঝি সমস্ত ভাঙ্গিয়া পড়িল।

এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ গত হইলে সহসা এক দিকে 'সর্ সর্' শব্দ হইল। চাহিয়া দেখি, ঘরের পূর্ব্বোক্ত গবাক্ষটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। একটা বৃহৎ নেকড়ে ঐ ভগ্নপথে স্বীয় মস্তক প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে। সে সময়ে সেন মহাশয় ঐ জানলার নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন। নেকড়েকে দেখিবামাত্র তিনি দুই হস্তে কুঠার ধরিয়া সজোরে উহার মস্তকে আঘাত করিলেন। এক বিকট চীৎকারের সহিত নেকড়েটা অদৃশ্য হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে গবাক্ষের ছিদ্রপথ আরও খানিকটা বাড়িয়া গেল এবং এক সঙ্গে দুইটা নেকড়ে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিল। একজন শিখ কর্ম্মচারি উপর্য্যুপরি দুইবার গুলি করাতে সে দুইটিও অদৃশ্য হইল।

এই সময়ে বাহিরে এক লহর চপলা প্রকাশ পাওয়াতে ভগ্ন গবাক্ষ পথে দেখিলাম, বহুতর নেকড়ে বাঘ ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিল। এক দিকেই যখন এত, তখন চারিদিকে না জানি আরও কত আছে। গবাক্ষটা যে ভাবে উহারা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে ব্যাপার বড় সুবিধা জনক বলিয়া মনে হইল না। অকস্মাৎ আর এক দিকে "গড় গড়" শব্দ হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখি, ঘরের আর-এক দিকের প্রাচীর খানিকটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে ও সঙ্গে সঙ্গে দুটা নেকড়ে গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। আমি ও আমার সাহেব একত্রে বন্দুক চালাইলাম। নেকড়ে দুইটা তখনই অদৃশ্য হইল। এইখানে বলা উচিত যে, বন্দুকের প্রথম শব্দেই ছোট ডাক্তার জাগিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর অনেকটা সুস্থ বোধ হইতেছিল কিন্তু দুর্ব্বলতার জন্য তিনি আর এই অদ্ভুত যুদ্ধে যোগদান করিলেন না।

আমরা অনবরত গুলি চালাইতে লাগিলাম। এই ভাবে প্রায় এক ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল। ইহার মধ্যে আমরা কেহই এক নিমিষের জন্যও বিশ্রাম করিবার অবসর পাই নাই। তবে আমরা বিশেষ সাবধান থাকাতে নেকড়েরা আর কোনও নূতন স্থান ভাঙ্গিতে পারিল না। ইহার মধ্যে যে কতগুলা বাঘ নিহত হইয়াছিল, তাহা ঠিক জানিতাম না। অনুমানে বোধ হইল ৫০.৬০ টার কম নয়।

রাত্রি প্রায় ১২টার সময় আমরা জানিতে পারিলাম যে, আমাদের গুলি প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। সর্ব্বনাশ! হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, আর আমরা সাত জনে প্রত্যেকে মোটে সাতবার করিয়া বন্দুক চালাইতে পারি। এদিকে নেকড়েদের সংখ্যা যে হ্রাস পাইতেছে তাহা আদৌ বুঝিতে পারিলাম না। এই ভীষণ জন্তুর সহিত বিনা বন্দুকে যে কি প্রকারে সমস্ত রাত্রি যাপন করিব তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এমন ভীষণ বিপদে আর কখনও পড়ি নাই। যাহা হউক, পরামর্শ স্থির হইল যে, নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে আর বন্দুক ব্যবহার করা হইবে না। আমরা চারিজন করিয়া আট জন লোক উক্ত ভগ্ন স্থানদ্বয়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম। পূর্ব্বোক্ত কুড়ালী দা ও লৌহ দণ্ড ব্যতীত আমরা বন্দুকের মুখও সজোরে চাপিয়া ধরিয়া ঐ স্থানে নেকড়েদের জন্য অপেক্ষা করিতে

লাগিলাম। নেকড়েরা মুখ বাড়াইবা মাত্র আমরা প্রাণপণ শক্তিতে আঘাত করিতে লাগিলাম। দুই তিনবার এই ভাবে কার্য্য চলিল; কিন্তু তাহাতে ফল ভাল না পাওয়াতে আমাদিগকে পুনরায় বন্দুক ব্যবহার করিতে হইল। ভগ্ন গবাক্ষের বিস্তৃতি খুব অধিক ছিল বলিয়া একবারে তিন চারিটা বাঘ ঐ পথে প্রবেশ জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ঐ স্থানে আমি, দুইজন শিখ ও একজন গুর্খা দাঁড়াইয়াছিলাম। তিনটাকে আমরা তাড়াইলাম বটে, কিন্তু একটাকে কোনও মতে প্রতিরোধ করিতে পারিলাম না। সেটা একবারে আসিয়া ঘরের মধ্যে উপস্থিত হইল। বড় ডাক্তার সাহেব এই প্রকার ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার এক গুলিতে উহার মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল।

এইভাবে কতক্ষণ যুদ্ধ চলিত বা উহার পরিণাম কি হইত, তাহা বলা যায় না। তবে ভগবানের অসীম করুণা বলে এক সামান্য ঘটনায় ঐ ভীষণ বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিলাম। ঝড়ের বেগ তখনও সমভাবেই চলিতেছিল। এক বিন্দুও হ্রাস পায় নাই। সঙ্গে ২ বরফ পড়াও চলিতেছিল। তবে আমরা বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া ঐদিকে লক্ষ্য করিবার কিছুমাত্র অবসর পাই নাই। পূর্ব্বোক্ত নেকড়েটা যে সময়ে ঘরের মধ্যে ডাক্তারের গুলিতে নিহত হইল, সেই সময় অকস্মাৎ অতি ভীষণ শব্দে সমস্ত আকাশ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সঙ্গে ২ সমস্ত স্থানটা তীব্র আলোকে যেন ঝলসিয়া গেল। এমন বিকটশব্দ বা এ প্রকার তীব্র আলোক বোধ হয় কখনও দেখি নাই। শব্দের প্রভাবে সমস্ত ঘরটা বেশ স্পষ্ট কাঁপিয়া উঠিল। শুধু একবার নয়। ক্রমান্বয়ে চারিবার ঐরূপ ভীষণ বজ্রনাদ ও চপলার আবির্ভাব হইল। যখন সমস্ত পুনরায় নিস্তব্ধ ও অন্ধকার ময় হইয়া পড়িল, তখন আমরা আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু আমাদিগকে আর যুদ্ধ করিতে হইল না, আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, নেকড়ের দল একবারে অদৃশ্য হইয়াছে। সমস্ত রাত্রি আমরা জাগিয়া রহিলাম, তাহারা কিন্তু আর দেখা দিল না।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

রাজপুতের অধঃপতন।

পাঠানগণ দিল্লীতে তিন শত বৎসরাধিক কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহাদের শাসনাধীন হয় নাই। পাঠান শাসনকালে ভারতবর্ষে বহু সংখ্যক স্বাধীন মোসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল মোসলমান রাজ্যের পার্শ্বেই হিন্দু রাজন্যগণও সগৌরবে রাজ্য শাসন করিতেন। পাঠানগণ তরবারি বলে দেশ জয় করেন, এই তরবারি সাহায্যেই তাঁহারা দেশ শাসন করিতেন। পাঠানগণ স্বধর্ম্মের প্রচার কল্পে সাতিশয় উৎসাহী ছিলেন। তাঁহাদের উৎকট সাধনায় বঙ্গদেশের এক তৃতীয়, রাজপুতনার একার্দ্ধ, কাশ্মীর ও সিন্ধু দেশের অধিকাংশ এবং গুজরাট ও মালবের বহু অধিবাসী ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এই সকল কারণে হিন্দু জাতি পাঠান শাসনপতিদের অনুরাগী হইতে পারে নাই।

পাঠান শাসন ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে অবস্থান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। রাজনীতিজ্ঞ কুলের বরেণ্য পাদশাহ আকবর হিন্দু মুসলমানকে প্রীতি সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি বীরকুলাগ্রগণ্য রাজপুত জাতির হৃদয় অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদের রাজন্যবৃন্দের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। আকবরের উত্তরাধিকারীগণও এই নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। বহু সংখ্যক রাজপুত রাজার আত্ম বিস্মৃতি উপস্থিত হয়। তাঁহারা মোগল রাজের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন এবং দিল্লীর রাজ শক্তির গৌরব রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য আত্ম নিয়োগ করেন। কিন্তু তাদৃশ কুল বিগর্হিত সম্পর্ক সংস্থাপন জন্য সময় সময় তাঁহাদের অন্তঃপ্রকৃতি বিদ্রোহ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে পীড়িত করিত; তদুপরি তাঁহারা রাজপুত কুলচূড়া উদয়পুরের রাণা এবং তদধীন সামন্তবর্গের ঘৃণার পাত্র ছিলেন, সমস্ত দেশের হিন্দু জনপুঞ্জের অপ্রিয় ও নিন্দা ভাজন হইয়াছিলেন। এই ভাবে সময় অতিবাহিত হইতেছিল, এরূপ সময়ে পাদশাহ আওরঙ্গজেব সিংহাসন আরোহণ করিয়া হিন্দুর ধর্ম্মের ও জাতির নিপীড়ন

করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার দারুণ কষাঘাতের ফলে রাজপুত অধিপতিদের আত্ম বিস্মৃতি সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, তাঁহাদের অন্তঃপ্রকৃতি এবং হিন্দুর জন-মত জয় লাভ করে। তাঁহারা মোগল রাজের স্বর্ণ শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া পুনর্ব্বার আপনাদের কুলোচিত পবিত্রতা ও তেজস্বিতা লাভ জন্য উন্মুখ হন।

আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারী বাহাদুরশাহ রাজপুতের সহিত পুনর্ব্বার প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করিতে অভিলাষী হন এবং রাজপুত জাতির শীর্ষ স্থানীয় অম্বর ও যোধপুরের অধিপতি দ্বয়কে দরবারে আনয়ন করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট স্বীয় পুত্রকে প্রেরণ করেন। তাঁহারা মোগল দরবারে উপনীত হইলে পাদশাহ তাঁহাদের সমস্ত অসন্তোষের কারণ দূর করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। কিন্তু বাহাদুর শাহের-রাজপুত জাতির সঙ্গে সখ্য স্থাপনের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছিল। তাঁহার সমস্ত যত্ন যোধপুর ও অম্বরের অধিপতি যুগলকে মোগল রাজ্যের অনুরাগী ও হিতৈষী করিতে পারে নাই।

এই অধিপতি যুগল বাহাদুরশাহের নিকট হইতে স্বদেশে প্রত্যবর্ত্তন কালে উদয়পুরে গমন করিয়া রাণার সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই সন্ধি স্থাপন দ্বারা তাঁহারা মোগলের সহিত রাজনৈতিক এবং বৈবাহিক সম্বন্ধ পরিহার করিতে অঙ্গীকার করিলেন। সুদীর্ঘকাল অন্তে তাঁহারা রাজপুত কুলতিলক পবিত্র রাণার সঙ্গে একত্র ভোজন করিতে পারিলেন এবং বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। মহাত্মা টড নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই ত্রিবলাত্মক সন্ধির ফলে রাজপুতগণ বাবরের প্রতিষ্ঠিত সিংহাসন ভূপাতিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই সময় হইতে রাজপুত জাতির প্রাধান্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে; বাহাদুরশাহের পরবর্ত্তী ফররুখশিয়রের সময় রাজপুতের শক্তি বর্দ্ধিত এবং দিল্লীর প্রভুত্ব সঙ্কুচিত হইয়াছিল। অম্বরাধিপতি জয়সিংহ এবং যোধপুরাধিপতি অজিতসিংহ রাজপুত রাজন্য কুলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী ছিলেন। জয়সিংহ সসৈন্যে আগ্রার দ্বার দেশে উপনীত হন এবং অজিত সিংহ ফররুখশিয়রের বিধবা মহিষীকে (ইনি অজিত সিংহের কন্যা) বল পূর্ব্বক স্বভবনে লইয়া যান। মোগল সাম্রাজ্যের পরিচালক সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ইহাদিগকে প্রশমিত করিবার জন্য জয়সিংহকে সুরাটের এবং অজিতসিংহকে আজমীঢ় ও গুজরাটের কর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন; ইহাতে তাঁহাদের আধিপত্য দিল্লীর পঞ্চাশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান হইতে ভারত মহাসাগর পর্য্যন্ত সমগ্রদেশে সংস্থাপিত হয়।

বস্তুত রাজপুত জাতির ত্রিবলাত্মক সন্ধি তাহাদিগকে অধিকতর শক্তি শালী করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু অন্যদিকে এই সন্ধির ফলে কালক্রমে তাহাদের সমস্ত মহিমা ও গৌরব অন্তর্হিত হয়। উদয়পুরের রাজকুলের সহিত অম্বর ও যোধপুরের অধিপতি যুগল বৈবাহিক সম্পর্ক-স্থাপন করিয়া অঙ্গীকার করেন যে, উদয়পুরের রাজকুমারীদিগের গর্ভজাত সন্তান সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইবে। যদি পুত্র হয়, তবে রাজসিংহাসনের অধিকারী হইবে; কন্যা হইলে, সম্ভ্রান্ত রাজকুলে সমর্পিত হইবে, প্রাণ থাকিতেও তাহাদিগকে মোগলকরে অর্পণ করিয়া আত্মকুলকে কলুষিত করা হইবে না। ইহাতে তাহাদের চিরন্তন জ্যেষ্ঠ স্বত্বাধিকারের ব্যভিচার হইল। যে প্রথা আবহমান কাল অক্ষুণ্ণ ভাবে প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, তাহার আকস্মিক বিপর্য্যয়ে বিষময় ফল সমুৎপন্ন হইল। যোধপুর ও অম্বরের রাজন্যদ্বয় এই চিরন্তন প্রথার ব্যভিচার করিয়া রাজপুতনার মধ্যে অন্তর্বিচ্ছেদ সমুদ্ভাবিত করিলেন। তাহার নিবারণার্থ মহারাষ্ট্রীয়গণ মধ্যস্থ স্বরূপে রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু রাজপুত জাতির দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহাদের সংস্পর্শ মোগলের শৃঙ্খলাপেক্ষা কঠোর হইল। তাদৃশ কঠোর স্পর্শে রাজস্থান অন্তঃসার শূন্য হইল; তাহার মহিমা ও গৌরব অন্তর্হিত হইল। *

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের প্রাক্কালে তেজস্বী রাজপুত জাতি নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল, এই সময় মলহররাও হোলকার উদয়পুর রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতেই তত্রত্য রাজকার্য্য পরিচালিত হইতেছিল। জানুজি সিন্ধিয়া যোধপুর রাজ্যে প্রাধান্য স্থাপন করিয়া ছিলেন, যোধপুরের অধিপতি তাঁহার হস্তে

* যজ্ঞেশ্বর বাবু কর্ত্তৃক অনুবাদিত টডের রাজস্থান।

ক্রীড়নক মাত্র ছিলেন। অম্বরাধিপতি জয়সিংহ পরলোকগত হইলে উদয়পুরের রাজকুমারীর গর্ভজাত কনিষ্ঠ পুত্র মাধোসিংহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিক্রম করিতে উদ্যত হইলেন এবং হোলকারের সাহায্যে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিলেন, হোলকার আপন কৃতকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ অম্বর রাজ্যের বিপুল ভার আপন হস্তগত করিয়া লইলেন। ইহার তিনবৎসর পর মাধোসিংহ অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইলেন এবং তাঁহার অকর্ম্মণ্য ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক উত্তরাধিকারিগণের আমলে মহারাট্টাদের ঘোর তাণ্ডব উপস্থিত হইল, তাহাতে সমগ্র যোধপুর রাজ্য ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। এই ভাবে মহারাট্টাদের উৎপীড়নে ক্রমে ক্রমে সমগ্র রাজস্থান শ্রীহীন ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

আমেরিকার অন্ধনিবাস।

আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরে অন্ধদিগের হিতকারী এক সভা স্থাপিত হইয়াছে। সাধারণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অর্থ সাহায্যে এই সদনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। বিগত ছয় বৎসর যাবত এই মণ্ডলী স্থাপিত হইয়া থাকিলেও, ইতিমধ্যে অন্ধদিগের দুরবস্থার অপনোদন জন্য সমিতি অসামান্য চেষ্টা করিতেছেন ও যথেষ্ট সফলতা লাভ করিয়াছেন। দৃষ্টিহীনতা রোগ নিবারণ উদ্দেশ্যে এই মণ্ডলীর উদ্যোগে ব্যবস্থাপক সভা আইন প্রণয়ন করিয়াছে; স্বাস্থ্য পরিষৎ এবং চিকিৎসক-সমাজও সর্ব্বদা উহাদের সহায়তা করিয়া থাকেন। উহাদেরই চেষ্টায় নিউইয়র্কের সাধারণ বিদ্যালয়েও অন্ধ ছাত্রগণ ভর্ত্তি হইতে পারে। এক্ষণে সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট অন্ধছাত্রের সংখ্যা ১৬০। এই মণ্ডলীর উদ্যোগে অন্ধ বালক বালিকার শিক্ষাও বাধ্যতা মূলক করিয়া শিক্ষাবিধি সংশোধিত করা হইয়াছে; সুতরাং সে দেশে এক্ষণে অন্ধগণ আর অজ্ঞানতাপূর্ণ অসহায় জীবন যাপন করে না, অথবা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেনা। এই মনীষীগণেরই চেষ্টায় অন্ধগণের বোধগম্য বিশেষ অক্ষরে মুদ্রিত "Search Light" নামক একখানা সাময়িক পত্রিকাও প্রকাশিত হইতেছে। ইঁহারা এখন দৃষ্টিহীনতারূপ বিরাট সমস্যার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং বিবিধ প্রকারে অন্ধ মানবের দুরবস্থা অপনোদনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।—সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই মণ্ডলীর কর্ম্মাধ্যক্ষগণও সকলেই অন্ধ। ডাঃ জন ফিন্‌লে ইহার সভাপতি, শ্রীমতী হেলেন কেলার সহকারী সভাপতি, এবং উইনিফ্রেড্ হোল্ট্ ইহার সম্পাদিকা। ইঁহারা সকলেই অন্ধ।

ব্যায়ামাগারে অন্ধগণ ব্যায়াম ও নানাবিধ ক্রীড়া করিতেছে।

এই মণ্ডলীর উদ্যোগে নিউইয়র্ক নগরে অন্ধদিগের বাসের জন্য এক বিরাট অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই অন্ধ নিবাসে অন্ধদিগের মানসিক, শারীরিক ও নৈতিক শিক্ষাদানের অতিসুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চিরঅন্ধকারে নিমজ্জিত দৃষ্টিশক্তি হীন অন্ধদিগের উপকারার্থে এই অট্টালিকাটী উৎসর্গীকৃত—সেই জন্যই উহার নাম রাখা হইয়াছে "Light House" বা আলোক গৃহ। দৃষ্টিহীনতাকে উপেক্ষা করিয়া অন্ধেরা যাহাতে কার্য্যকরী শিল্প অভ্যাস করিতে পারে, এবং নিজেদের

তৈয়ারী শিল্প দ্রব্যের বিনিময়ে অর্থোপার্জ্জন দ্বারা আবশ্যক ব্যয়াদি নির্ব্বাহ করিতে পারে, প্রত্যেক অন্ধকে এইরূপ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিশ্ব-সমাজ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীবন যাপন করাই অন্ধের পক্ষে বিষম সঙ্কট এবং পর প্রত্যাশী ভাবে দাসত্বপূর্ণ জীবন আরও দুর্ব্বিসহ। অন্ধের জীবনের এই প্রধান অসুবিধাগুলি দূর করিবার উদ্দেশ্যে অন্ধ নিবাস এইরূপ ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে যে, প্রত্যেকেই স্বাধীন ভাবে আত্মনির্ভর করিয়া কাজে কর্ম্মে গতিবিধিতে চক্ষুষ্মান্ মানবের সমকক্ষভাবে চলিতে পারে। কর্ম্মক্ষেত্রের প্রত্যেক বিভাগে অন্ধদিগকে পরিপূর্ণ শিক্ষাদান করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য।

লাইট্ হাউস্ পাঁচতলা প্রকাণ্ড বাড়ী। উহার অভ্যন্তর এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত এবং গৃহ সামগ্রী ও তৈজস পত্র এরূপ ভাবে স্থাপিত যে অন্ধদিগের কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। আগুন লাগিলে পলায়নের পথ, রেলিং দেওয়া প্রশস্ত সিঁড়ি, স্থানে২ মুক্ত রোয়াক প্রভৃতি নির্ম্মিত হওয়াতে অন্ধনিবাসটী চক্ষুহীনদিগের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে ইচ্ছামত মুক্ত বায়ুতে চলাফিরা করিবার উদ্দেশ্যে বাড়ীর প্রত্যেক তলাতেই এক একটী মুক্ত গ্যালারী ও রোয়াক আছে। সিঁড়ি গুলি এরূপ ভাবে গঠিত যে অন্ধগণ অন্যের সাহায্য ব্যতীত অনায়াসে তাহাতে উঠিতে ও নামিতে পারে।

এই প্রাসাদের সর্ব্বনিম্নতলে বয়ন শিল্প অভ্যাসের স্থান, উপরিভাগে গ্যালারী দেওয়া আছে। প্রাসাদের এই অংশ শিল্পকার্য্যে নিপুণ পরিশ্রমী অন্ধ কারিকরগণে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে, অন্ধ রমণীগণ সুদক্ষ হস্তে অসংখ্য তাঁত পরিচালনা করিয়া থাকেন, এবং বিবিধ প্রকার শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করেন। বস্ত্রবয়ন ও ঝুড়ি নির্ম্মাণ কার্য্যে উঁহারা যথেষ্ট উন্নতি দেখাইয়াছেন। এই সকল অন্ধ নর নারীর নির্ম্মিত দ্রব্যজাত প্রতিযোগীতা ক্ষেত্রে চক্ষুষ্মান্‌দিগের নির্ম্মিত শিল্পদ্রব্যের সহিত দাঁড়াইয়া থাকে, এমনকি কোনও ২ দ্রব্য উৎকৃষ্টতর বলিয়া আদরনীয়ও হয়। আদর্শানুরূপ ছয় রঙ্গের সূতার দ্বারা উহারা নানাবিধ ছিটের কাপড় বুনিতে পারে। কয়েক দিন শিক্ষা গ্রহণের পরই উহারা অন্যের সাহায্য ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে। অন্ধ বালিকাগণ তাঁতে সূতা পরাইতে পারে, এমনকি ৪০০ সূতা পর্য্যন্ত পরাইয়া থাকে, ঐসকল সূতা মাকুতে বান্ধিয়া অনায়াসে তন্ত্র বয়ন করিয়া থাকে। কোন্ স্থানে কোন্ রংএর সূতা ব্যবহার হইবে এবং নমুনাতে কিরূপ আছে—কেবল এই টুকু সাহায্য তাহাদের প্রয়োজন। দ্বিতলে অতি সুন্দর প্রদর্শনী গৃহ। অন্ধদিগের নির্ম্মিত নানাবিধ শিল্পদ্রব্য—গৃহসামগ্রী, কার্পেট, রগ, বস্ত্র, ছিট, মশারী, লেস্, ব্যাগ, গদি, সূচীশিল্প, ঝুড়ি প্রভৃতি—তথায় বিক্রয়ার্থ রক্ষিত থাকে। সর্ব্ব পশ্চাতে সুন্দর একখানি মিউজিয়ম, উহাতে বহু পূর্ব্বকাল হইতে সংগৃহীত অন্ধদিগের নির্ম্মিত বহুবিধ শিল্পদ্রব্য ও চিত্রাদি
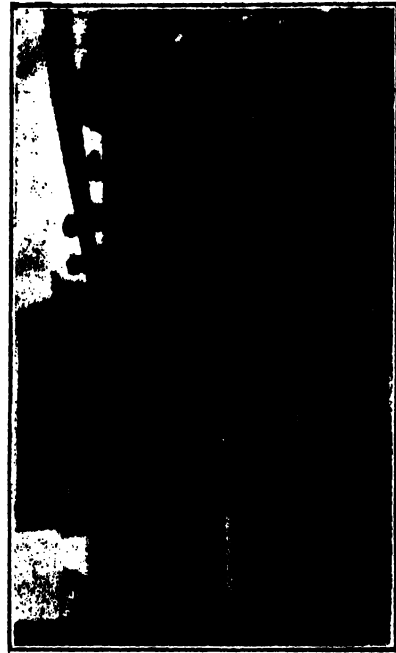
অন্ধ বালকগণ খেলা শেষ করিয়া ছাদের উপর হইতে দৌড়িয়া নামিতেছে।

রক্ষিত আছে; ঐ সকল দ্রব্যজাত এমনই শৃঙ্খলার সহিত সজ্জিত যে উহা হইতে অন্ধদিগের মানসিক ও সর্ব্ববিধ উন্নতির পরিচয় গ্রহণ করা যাইতে পারে। ত্রিতলে নানা বিভাগীয় কার্য্যালয় ও বালক বালিকা ও বয়স্ক অন্ধদিগের শিক্ষার জন্য গৃহশ্রেণী। এই স্থানে অন্ধদিগের নামের তালিকা রাখার জন্য আদমসুমারীর কার্য্যালয়। নিউইয়র্কের অন্তর্গত দশ হাজারেরও উপর অন্ধের নাম এই তালিকাভুক্ত হইয়াছে, ঐ সকল অন্ধ নর-নারীর

তত্ত্বাবধানের কার্য্য এই মণ্ডলী গ্রহণ করিয়াছেন। মিষ্টার স্কাগুলিন্ নামক এক অন্ধ এই কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়াছেন। স্কাগুলিন অন্ধ হইবার পূর্ব্বে সংবাদপত্র সম্পাদক এবং ফটোগ্রাফী কার্য্যে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এই গৃহের সর্ব্বাপেক্ষা দর্শনীয় বিষয় অন্ধদিগের জন্য নির্ম্মিত ব্যায়ামাগার ও ক্রীড়ালয়। চক্ষুষ্মান্‌দিগের অপেক্ষা চক্ষুহীনদিগের শারীরিক উপকারিতার জন্য ব্যায়াম ও ক্রীড়া অধিক প্রয়োজনীয়। অন্ধদিগের শারীরিক উন্নতি বিধান এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের জন্য ব্যায়ামাগারে বর্ত্তমানকাল প্রচলিত সর্ব্ববিধ সরঞ্জাম রক্ষিত আছে। একজন সুদক্ষ ব্যায়াম শিক্ষকের হস্তে এই কার্য্যভার ন্যস্ত আছে। এই শিক্ষক মহাশয়ও প্রায় অন্ধ হইয়া গিয়াছেন। ছাদের উপর মুক্ত আকাশতলে বিস্তৃত বাগান ও খেলার স্থান, উহাতে স্কেটিং, ড্রিল, নৃত্য প্রভৃতি খেলা হইয়া থাকে। দৌড়াদৌড়ি খেলিবার জন্য রেলিং দেওয়া প্রশস্ত ও সুদীর্ঘ রাস্তা আছে। অন্ধ বালক বালিকাগণ সাধারণ খেলোয়ারদের মত উহাতে স্বচ্ছন্দে দৌড়াদৌড়ি করিয়া থাকে। প্রাঙ্গনে বিরাট চৌবাচ্চা রাখা হইয়াছে, উহাতে অন্ধগণ সাঁতার দেওয়া অভ্যাস করে, বহু সংখ্যক স্নানাগারে উহারা স্বচ্ছন্দে অবগাহন, স্নান ইত্যাদি করিয়া থাকে। অন্ধদিগের সর্ব্ববিধ উন্নতি ও কল্যাণ কামনায় নিউইয়র্কের এই সমিতি সর্ব্বদা ব্যাপৃত আছেন। ভগবান্ এই মহানুভব নরনারীমণ্ডলীর সাধু ইচ্ছা সফল করুন।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়।

ভুবন রায়।

ত্রিপুরার অন্তর্গত শ্যামগ্রাম নিবাসী রায় (ব্রাহ্মণ) বংশে ভুবন রায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ভোলানাথ রায়। মাতার নাম লক্ষ্মী দেবী। লক্ষ্মী দেবীর অন্য নাম সর্ব্বমঙ্গলা। ১৭৫১ শকাব্দে (১২৪১ বঙ্গাব্দে) ভুবনচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার জন্মের অল্প কয়েকদিন পরেই ভোলানাথ রায় পরলোক গমন করেন। পিতৃহীন শিশু পুত্রটীকে লক্ষ্মীদেবী নিতান্ত কষ্টে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। জগজ্জননী ভুবন ভুবনচন্দ্রকে অসাধারণপ্রতিভা প্রদান করিয়া ছিলেন। শিশুকালে তিনি পাঠশালায় বাঙ্গালা ও মখ্‌তবে পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করতঃ ১২ বৎসর বয়সে কৃতবিদ্য হইয়া ছিলেন।

বাল্যকাল হইতে ভুবনচন্দ্র বিশেষ সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। প্রথমত তিনি শ্যামগ্রাম নিবাসী নটজাতীয় রামগতি সরদারের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করেন। পশ্চাৎ বহু সংখ্যক কলাবৎ ও উস্তাদের নিকট গীতবাদ্য শিক্ষা করতঃ ভুবনচন্দ্র সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশারদ হইয়া ছিলেন। সাধক মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, কিন্তু ভুবনচন্দ্রের ন্যায় এরূপ সঙ্গীত শাস্ত্র বিশারদ অন্যকেহ ছিলেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। যে রামগতি বাল্যকালে ভুবনের শিক্ষক ছিলেন সেই রামগতি শেষ জীবনে ভুবনের শিষ্য বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন।

ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে ভুবনচন্দ্র বিষয়ান্বেষণে কুমিল্লা নগরীতে গমন করেন। সৌভাগ্য বশতঃ এই সময় ত্রিপুরার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীনে একটী মোহরের পদ শূন্য হয়। ভুবন সেই পদ প্রার্থী হইয়া পারসী ভাষায় দরখাস্ত করেন। তাঁহার সুন্দর হস্তলিপি ও রচনা নৈপুণ্য দর্শনে কর্ত্তৃপক্ষ ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক ভুবনকেই সেই পদে নিযুক্ত করেন। কিছুকাল বিশেষ দক্ষতার সহিত সেই পদোচিত কার্য্য সম্পন্ন করতঃ তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সময় তিনি পুলিশ সবইন্সপেক্টরের পদ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তিনি পুলিশ কর্ম্মচারিদিগের পূতিগন্ধময় কর্ম্ম জীবনের আঘ্রাণ প্রাপ্ত হইয়া সেই পদ পরিত্যাগ করিবার জন্য লালায়িত হইলেন।

এই সময় ত্রিপুরার সঙ্গীতানুরাগী মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর কুমিল্লায় আগমন করেন। ভুবনচন্দ্র মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

তাঁহার স্বরচিত সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াও গুণাবলীর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া গুণগ্রাহী মহারাজ তাঁহাকে চাকলে রোসনাবাদের পেস্কারের পদে নিযুক্ত করেন।

এই সময় তিনি জনৈক কৌলাচারি সাধুর সঙ্গলাভ করেন এবং তাঁহার উপদেশানুসারে তিনি সুরাপানে অভ্যস্থ হন। উত্তর কালে এই সুরারাক্ষসীই তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল। সুরার প্রসাদে তিনি শেষ জীবনে কপর্দ্দকহীন ভিখারী হইয়াছিলেন।

ভুবনচন্দ্র ২।৩ বৎসরের অধিক পেস্কারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন না। কতকগুলি দুষ্ট লোকের চক্রান্তে তিনি রাজ মন্ত্রী ব্রজমোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক পদচ্যুৎ হইয়া ছিলেন। তৎপর তিনি রাজধানী আগরতলায় গমন করেন। এই সময় তিনি তাঁহার পূর্ব্বপদ লাভের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইলেন না। *

তদনন্তর ভুবনচন্দ্র ময়মনসিংহের কোন জমীদারের নায়েব হইয়া জামালপুরে গমন করেন। তথায় সঙ্গীত শাস্ত্র বিশারদ জনৈক ব্রহ্মচারীর সঙ্গলাভ করতঃ তাহার সাহায্যে সঙ্গীত শাস্ত্রে আরও অধিকতর দক্ষতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে এই ব্রহ্মচারীই ভুবনচন্দ্রের প্রকৃত গুরু বটেন। জামালপুর পরিত্যাগ করতঃ তিনি কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে গমন করয়া ভিন্ন ভিন্ন জমীদারের অধীনে নায়েবী করিয়া প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কিন্তু সুরা-রাক্ষসীর কৃপায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অবশেষে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ নবীনগরের মুন্সেফী আদালতে ওকালতি আরম্ভ করেন। লক্ষ্মীঠাকুরাণী কিন্তু তাঁহার প্রতি আর সদয় হইলেন না। ব্যবসায়ের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। জগজ্জননীর নাম গানই তাঁহার প্রকৃত ব্যবসা হইয়াছিল। তিনি মায়ের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করতঃ মুক্তির প্রশস্ত সোপান প্রস্তুত করিতেছিলেন। মদিরাপানে তিনি যখন চর্ম্মচক্ষু মুদ্রিত করিয়া পথে ঘাটে মাঠে পড়িয়া থাকিতেন, তখনই তাঁহার জ্ঞাননেত্র বিকশিত হইত। জগজ্জননী তখন তাঁহার হৃদয়ে মহাসুরা ঢালিয়া দিয়া কলুষিত নরলোক হইতে তাঁহাকে বহু ঊর্দ্ধে লইয়া যাইতেন, চিদানন্দজ সুমধুর সঙ্গীত রচনা করিয়া মায়ের গুণগান করিতেন। ধন্য ভুবনচন্দ্র! তোমার জন্ম দ্বারা শ্যামগ্রাম—ত্রিপুরা পবিত্র হইয়াছে। সর্ব্ববিদ্যা ঠাকুরের পর মীর্জ্জাহুসেন আলী, তৎপর রামদুলালের তিরোধানের পর ত্রিপুরাবাসী তোমাকে পাইয়াছিল। কিন্তু তোমার জীবিতাবস্থায় তাহারা তোমাকে চিনিতে পারিল না। অনেকে তোমাকে অনেক প্রকার যন্ত্রণা দিয়াছে, এই সকল নর পিশাচগণ এইক্ষণ কোথায়? তাহাদের নাম চিরকালতরে ডুবিয়া গিয়াছে আর তোমার নাম ও যশ দেশ দেশান্তরে ঘোষিত হইতেছে:—

"শ্যামগ্রামে রায় ভুবনমোহন,
তব গুন গানে মোহিত ভুবন;
ত্যজিয়ে এখন মর্ত্ত ভুবন
　　গিয়াছ তোমার সদনে॥"

ভুবন রায়ের শ্যামাসঙ্গীত মালসী দেশ প্রসিদ্ধ। শ্যামা বিষয়ক সঙ্গীত ব্যতীত তিনি অন্যান্য নানা প্রকার সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। কালীবিলাস, মান বিলাস, রাবণ বধ প্রভৃতি যাত্রা গাণের কতকগুলি পালা তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত হিন্দী সঙ্গীতে তাহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাবণ বধ হইতে বারণের উক্তি একটী গীত এস্থলে উদ্ধৃত হইল:—

সিন্ধু মিশ্র—ঠুংরী।

আমার হলকি বেয়ারাম
কেবল হেরিরাম, দুর্ব্বাদল শ্যাম, জটাধারী॥
বিমানে ধরাতে, সন্মুখে পার্শ্বেতে,
দক্ষিণে পশ্চাতে, (হেরি) রাম ধনুকধারী॥
(আমার) কোথা গেল তেজ, ইন্দ্রিয় নিস্তেজ,
কফপিত্ত বায়ু হইল সতেজ;
যে মকরধ্বজে নাশিবে সে তেজে,
কালবশে বিষ ক্রিয়া জয়তারি;
সুষুম্না ইড়া, পিঙ্গলা ত্রিশিরা,
বেগে বহে তারা নিবারিতে নারি,

*ভুবনচন্দ্রের সঙ্গীত প্রকাশক লিখিয়াছেন যে, এই সময় তিনি "নায়েব দেওয়ানের" পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখক এইসময় আগরতলা রাজ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ভুবনচন্দ্রকে তথায় বেকার অবস্থায়ই দর্শন করেন।

কি করি কি করি কিসে প্রাণ ধরি ;
(আমার) হইল দুর্ব্বলে সবলা নাড়ী !
সম্বিতে আবল্যে নয়ন মুদিলে
রাম বলে প্রাণ উঠে শিহরি।
ভাবিলে সে রাম, ত্রিদোষ বেরাম
হয় যে আরাম বলিতে নারি।
রাম কণ্ঠ রোগে রাম কালভোগে
রাম বিনে কি ঔষধ আছে তারি।
বটীতার রাম, পথ তার রাম
রাম অনুপানে ভুবনে তরি ॥ *

একটী সঙ্গীতে কলির প্রজাবৃন্দকে ভুবনচন্দ্র বিশেষ রূপে আপ্যায়িত করিয়াছেন। আমরা তাহার "কলির লীলা" সঙ্গীতটী এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া বিরত হইতে পারিলাম না।—

বেহাগ—আদ্ধা

কলির লীলা আজব খেলা চেয়ে দেখনা ভাই।
কল্লে হদ্দ মজা কলির প্রজা হেরে বলিহারি যাই,
মাকে পরায় নেকড়া পাচড়া, মাগকে দেয় শাড়ী ঢাকাই ॥
নব্যবাবুগণ সাহেবী ধরণ।
চাঁপ দাড়ি প্রণাম ছাড়ি কচ্ছে হেণ্ড্ সেকেন্,
কাঁটা ছেঁড়া কর্চ্চে ভক্ষণ হিন্দু যবন প্রভেদ নাই।
নব্যানারীগণ এলবার্ট ফেসান্।
টেরী সীতা বেনী বেঁধে বেড়ায় পরীগণ।
উলসুতায় ষ্টকিং বোনে শাশুড়ী-দাসী খাটাই ॥
পেটুক ব্রাহ্মণ ফোঁটায় বিচক্ষণ
চিনি সন্দেশ মণ্ডা মিঠাই খেতে বিলক্ষণ,
নম নমিয়ে চণ্ডী পড়ে শ্লোকের অর্থ বোধ নাই ॥
চোর চুট্টা মাতাল রাড় ছিনাল বৈতাল,
হরি নামের ভেক ধরিয়ে বাড়াচ্ছে জঞ্জাল।
যাতে ইচ্ছা তাতে মজে জাতিকুলের বিচার নাই ॥
সরাপ গাঁজা খোর বদমায়েস প্রচুর।
কালী শিবের ভান করিয়ে নেশাতে বিভোর।
মৎস্য মাংস * * নিয়ে আমোদ করে কাল কাটাই ॥
বেহাল ভুবনে বলে যতনে।
সার করিয়ে গুরু নাম ভাব একমনে।
দয়ালচাঁদের দয়া বিনে ভবপারের উপায় নাই।

ভুবনচন্দ্র তিনটী গীতে আত্ম দুঃখ কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। তৎশ্রবণে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তন্মধ্যে একটী গীত এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

সরফরদা—আড়াঠেকা—

মাগো ভবদারা, কি দোষে আমার
দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী ভেঙ্গে কল্লে সারা ॥
লিখা পড়া হল শান্ত, আহার কর্ত্তে প্রানান্ত,
ধর্ত্তে কর্ত্তে কতই কষ্ট জীয়ন্তে মা হলেম মরা ॥
অঙ্গনিলে, চক্ষু নিলে আঁতের * পীড়া সঞ্চারিলে,
আতুর কল্লে কালী মোরে গৃহ হল কারা ;—
করে নাহি কড়া কড়ি কিসে এ জীবন ধরি,
মেরে ফেল মা শঙ্করী, ভুবন তবে বাঁচে তারা।

যখন ভুবনচন্দ্র দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইলেন, সেই সময় জগজ্জননীর করুণা বিন্দু বিন্দু প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। দয়াময়ী আর থাকিতে পারিলেন না,

* পূর্ব্ববঙ্গের বিখ্যাত পাঠক কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের রচিত রাবণের উক্তি একটী সুন্দর গীত শ্রুত হওয়া যায়। আমরা তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

ইমন পুরবী একতালা।

আমি হারি নাই, হারি নাই, হারি নাই।
বল কিসে হারি, গোলক বিহারী,
আমি ফলেতে হারিতে পারি নাই ॥
দায় পরে তুমি এসেছ হেথায়, আমি যাই নাই অযোধ্যায়,
চেতনাময়ে রয়িয়াছ দ্বারে হারি হয় কিনা তাই ॥
ধন জন শূন্য করিয়া গোলোক, নরমূর্ত্তি ধরি এলে মর্ত্তলোক ;
জিনিয়ে তোমাকে, তোমায় হেথা রেখে আমি পুলকে
গোলোকপুরে যাই ॥
যে বলে আমার হইয়াছে হারি, বুঝিবার ভ্রম তাহারি,
হারি বলি তার, অধোগতি যার, অন্তে না পায় শ্রীহরি।
হারিতাম, যদি তোমায় মারিতাম, অপরাধ নিরয় মাঝে ডুবিতাম,
রণে হারিলাম, ভবে তরিলাম, এমন হরিনাম কোথা গেলে পাই।
আগম শ্রুতি পুরাণে প্রচার, মরণে যা মতি, সেই গতি তার ;
সমক্ষে প্রত্যক্ষ দেখে নারায়ণ, দশানন করে ধরাতে শয়ন,
জীবন চরিতার্থ করি মুদিল নয়ন, এখন হরি প্রীতে হরি বল ভাই।

* অন্ত্রবৃদ্ধি,—হার্নিয়া।

তাহার প্রিয়পুত্রকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত হইলেন। অবশেষে ১২৯৬ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন নিশীথ সময়ে দীর্ঘকায়—জটাজুট মণ্ডিত লম্বিত শ্মশ্রু তেজঃপুঞ্জ কলেবর এক মহাপুরুষ নিঃশব্দ পাদবিক্ষেপে গৃহে প্রবেশ করতঃ ভুবনচন্দ্রের শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপর অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া মৃদুস্বরে ভুবনচন্দ্রের সহিত আলাপ করিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। ভুবনচন্দ্রের মুখ কমল আনন্দে ভাসিয়া গেল। তৎপর দিবস প্রাতে জ্বালাযন্ত্রণাময় নরলোক পরিত্যাগ করতঃ ভুবনচন্দ্র আনন্দের সহিত জগজ্জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

বাল্য-বন্ধু।

শ্যামনগর মধ্য ইংরেজী স্কুলের মাইনার ক্লাশে পড়িবার সময় অজিত ও নির্ম্মল পাশাপাশি বসিত বলিয়া হেড পণ্ডিত মহাশয় তাদের দুজনকে "মাণিক জোড়' বলিয়া ডাকিতেন। সে জন্য স্কুলের ছেলেদের হাতে এই দুটী প্রাণীকে অনেক উৎপাত সহিতে হইয়াছে। কিন্তু অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পণ্ডিত মহাশয়ের উপাধিদানের পূর্ব্বে, অজিত কিম্বা নির্ম্মল কেউ তাহাদের দুজনার মধ্যে কোনও প্রকার সখ্যতাসূচক বন্ধুত্ব বন্ধনের অস্তিত্ব অনুভব করে নাই। এখন সর্ব্বপ্রকার বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করার জন্য পরস্পরের সাহায্যে এই নবাবিষ্কৃত বন্ধুত্বের দুর্গটী সুরক্ষিত করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। রাজনৈতিক ব্যাপারেই এরূপ বন্ধুত্বের প্রয়োজন ও সমাদর দেখা যায়; বিদ্যালয়ে এরূপ বন্ধুত্বের বড় বিশেষ একটা প্রভাব দেখা যায় না!

সে যা হোক, যে বন্ধুত্ব বাহিরের প্রয়োজনের ভিতর জন্ম গ্রহণ করিয়া, বাঁচিয়া থাকিবার জন্য শুধু বহির্জগতের উত্তেজনার অপেক্ষা রাখে, সে বন্ধুত্ব শিথিল বৃন্ত ফুলটীর মত নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও, উৎপাত যখন আস্তে আস্তে পড়িয়া গেল, তখন বন্ধুত্বের প্রয়োজনটীও আর সজীব থাকিল না। কাজেই দুই বন্ধুর হৃদয়-তটে স্মৃতির একটী মাত্র রজতরেখা টানিয়া রাখিয়া সে বন্ধুত্বের নির্ম্মল ধারা শব্দ গন্ধ স্পর্শের জগত হইতে অনেক খানি দুরে সরিয়া গেল।

নির্ম্মল এখন কলিকাতা সহরের একজন উপাধিধারী ডাক্তার বেশ বাঁধা 'পশার' করিয়া বসিয়াছে। সে এখন ঢের টাকা রোজগার করে। যদিও গরীব মহলেই নির্ম্মলের 'পশার', তবু সে কুটুম্বিতা টুকু বজায় রাখিতে চায়, ধনী লোকদের সহিত; জীবন-সঙ্গীতের সুরটী বাঁধিতে চায়, সৌভাগ্য লক্ষ্মীর নুপুর ধ্বনির সহিত। মানুষ সে অবস্থায় আসিয়া পঁহুছিলে অভাবটাকে আর কিছুতেই শ্রদ্ধার চোখে দেখা যায় না এবং দৈন্যাশ্রিত পরম-হংসকেও পদে পদে অপরাধী বলিয়া মনে হইতে থাকে।

অজিত এখন কলিকাতা সহরেই একটী বেসরকারী স্কুলে মাষ্টারী করে। যদিও সেখানে "সিলভার টনিক" টার ভাল রকম বন্দোবস্ত নাই, তবু, নির্ম্মল শিশুরাজ্যের চির নবীন আনন্দের মাঝে তার অনেকখানি প্রাণের ক্ষুধা চরিতার্থ হয়। সে অসচ্ছলতাটাকে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ বলিয়া মনে করে না। এই হিসাবে অজিত নির্ম্মলের চাইতে ধনী। একথা অস্বীকার করা যায় না!

* * * *

মৃজাপুর ষ্ট্রীটের ধারে একটী দোতালা বাড়ীতে নির্ম্মল বাস করে। তার পাশে স্বর্ণকমল বাবুর বাড়ী। তার পরেই একটা ছেলেদের মেস। তারি একটী কামরায় অজিত বাসা করিয়া থাকে।

দুজনার বাড়ী যদিও এত কাছাকাছি, তবু নির্ম্মলের সহিত অজিতের দেখা শুনাটা বেশীর ভাগ পথে ঘাটেই শেষ হইত। অজিত মাঝে মাঝে নির্ম্মলের বাড়ী গিয়াও দেখা শুনা করিত বটে, কিন্তু নির্ম্মল অজিতের "চাল কোঠার" মত ছোট কামরাটীর মাঝে বড় একটা দেখা দিত না। এখনকার আলাপ গুলিও যেন আগেকার মতন জমিয়া উঠে না। এখন যেন ভদ্রতার আদান প্রদানই বেশী; তার ভিতরে কোনও রূপ আন্তরিকতা দেখা যাইত না। কখনো কখনো পুরাণো সুখ দুঃখের আলোচনার ভিতর দিয়া গত শৈশব এক একবার উঁকি দিয়া পালাইয়া যাইত। কিন্তু বন-জঙ্গল-ফুল-কাঁটার

ভিতর দিয়া, দুটী হৃদয়ে গোপনে আনা গোনা করিবার যে ছোট একখানা সরু পথ পড়িয়া গিয়াছিল, সেটী আজ কোথায়? যেন বহুকালের বিস্মৃতি, অনাদি যুগের ধূলা— জমিয়া সে পথের রেখাটী এখন একেবারে মুছিয়া গিয়াছে!

অজিত ও নির্ম্মল দুইজনেই অবিবাহিত। কোনও প্রকার চিরকুমার সভার সভ্য না হইয়াও এই দুটী যুবক কেন যে এত দিন বঙ্গদেশের কন্যাদায় গ্রস্থ পিতৃকুলকে এরূপ নির্ম্মম ভাবে বঞ্চনা করিয়া আসিয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন কৈফিয়ৎ তাদের নোট বইএর কোণে লেখা ছিল না। কিন্তু আইবড় কন্যার পিতাদিগের অভিশাপেই হোক, কি মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় অন্য কোন গোলযোগ বশতঃই হোক, নির্ম্মলের নিকট তাহার সজ্জিত আসবাব পূর্ণ কামরাগুলি কিছু দিন হইল ভারি ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতে আরম্ভ হইয়াছে। মার্ব্বেল পাথরে বাঁধা ঝকঝকে ঘরের মেঝের উপর কারো দুখানি চঞ্চল পদপল্লবের সুন্দর আঘাত পড়ে না—দেয়ালে ঝুলানো ছোট বড় আয়না-গুলিতে দেখিবার মত একটী মুখের ছবি ফুটিয়া উঠে না। আলনার উপর রংবেরঙ্গের সাড়ি সাজাইয়া রাখিবার মত মানুষটী পর্য্যন্ত নাই!

গরীব স্কুল মাষ্টারের যদিও এসব উৎপাত ছিল না, তবু তার হৃদয়-কুঞ্জে আকাঙ্ক্ষার গন্ধজাল জড়িত অতৃপ্ত ফুলগুলির ফাঁকে ফাঁকে একটী জীবন সঙ্গিনীর খোঁজ পড়িয়া গেছে। বসন্তের ফুল যখন ফুটিতে আরম্ভ হয়, তখন কোকিলের কুহুবর আপনি মনে পড়িয়া যায়! হৃদয়াকাশে সবে আশার শুভ্র আলোকপুঞ্জ ফুটি ফুটি করি-তেছে সে শুভ্রতাকে বিচিত্র করিবার জন্য তখনো প্রেমা-রুণ রাঙ্গা হইয়া উঠে নাই! তরুরাজির শিরে শিরে সবে লাবণ্যের পরশ লাগিয়াছে, নীচের দিকে তখনো নিশী-থের ছায়াটুকু দেরী করিতেছিল। অজিত ও নির্ম্মলের মনোরাজ্যের অবস্থাটা যখন কতকটা এই ধরণের, তখন সহসা প্রাচীমূলে উষাতারা অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে দেখা দিল।

চিকিৎসা ব্যাপারে রোগী নিরোগ অনেকেরই অনেক প্রকার লাভালাভ হইয়া থাকে, এবং নূতন ডাক্তারেরা যে চিকিৎসা করিতে আসিয়া অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ফেলেন, সে সম্বন্ধে ছোট গল্পে দীর্ঘ বর্ক্তৃতা করা অনাবশ্যক। এই চিকিৎসা উপলক্ষেই একদিন স্বর্ণকমল বাবুর বাড়ীতে নির্ম্মলের ডাক পড়িয়া গেল। স্বর্ণকমল বাবুর মেয়ে উষার জ্বর। নির্ম্মলের কুইনাইনের জোরে উষার শরীর দুই দিনে সারিয়া গেল। নির্ম্মলের বাহাদুরী এই যে, উষা সারিয়া উঠিয়া বলিল, কুইনাইন যে এরূপ সর্ব্বপ্রকার তিক্ততা বর্জ্জিত ও সুখাদ্য হইতে পারে, তা সে ইতঃপূর্ব্বে জানিত না। স্বর্ণকমল বাবু নির্ম্মলকে ভিজিটের টাকা শোধ করিয়া দিতে গেলেন, কিন্তু সে কিছুতেই ভিজিট লইল না। অথচ কি জন্য লইবে না, স্বর্ণকমল বাবুকে তার কোনও সন্তোষ জনক কৈফিয়ত দিতে পারিল না। সে স্বর্ণকমল বাবুকে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে একটু লাল হইয়া উঠিয়া যা কৈফিয়ত দিল, তার মোটামুটি মানে—প্রতিবেশীর কাছে স্নেহের দাবীই সঙ্গত, ভিজিটের প্রত্যাশা উচিত নহে।

নির্ম্মলের কৈফিয়তে কিন্তু স্বর্ণকমল বাবুর বিস্ময় কাটিল না। তিনি মনে মনে বলিলেন—যে কলিকাতা সহরে শ্বশুর বাড়ীতে স্ত্রীকে চিকিৎসা করিয়া পর্য্যন্ত ডাক্তারেরা ভিজিট আদায় করিয়া থাকে; সেখানে প্রতিবেশীকে খাতির করিয়া ভিজিট না লওয়ার কথা আর ইতঃপূর্ব্বে শুনা যায় নাই। ছোকরাটী বোধ হয় নূতন ডাক্তার—আজো টাকার উপর তেমন মায়া বসে নাই!

সেই হইতে স্বর্ণকমল বাবুর বাড়ীতে নির্ম্মলের যাওয়া আসা আরম্ভ হইল। স্বর্ণকমল বাবুর পরিবারের সহিত এই ভাল মানুষ ডাক্তারটীর আত্মীয়তা যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঘনিষ্ট হইয়া উঠিল, তার কারণ হিন্দু হইলেও স্বর্ণকমল বাবু উচ্চ শিক্ষিত সহরের লোক; তবে তাঁর অন্তঃপুর একেবারে 'বেপরদা' এমন কথা বলা যায় না, তবে তাঁহার জানালা দরজায় লেশযুক্ত নেটের হাপ পরদাই দেখা যাইত, এবং তাদের ফাঁক দিয়া আলো এবং হাওয়া দুই-ই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিত।

সন্ধ্যাবেলা অবসর পাইলেই, নির্ম্মল নিরীহ ভক্তটীর মত স্বর্ণকমল বাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া জুটিত। সেখানে সে সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি, দেশের কথা, বিলাতের কথা লইয়া একাই আসর-গুলজার করিয়া তুলিত। কথা বলায় ও পান খাওয়ায় সে নূতন সভ্যটীর সহিত

আর কেউ আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। সময় সময় বাপের আদেশ মত, উষা আসিয়া তার পিতার বন্ধু-বান্ধবদিগকে চা বিতরণ করিয়া যাইত, কখনো বাটায় করিয়া পান আনিয়া দিয়া যাইত, চায়ের টেবিলের চারিদিক হইতে যখন বক্তৃতার ঝড় অত্যন্ত তুমুল হইয়া উঠিত, তখন উষা কখনো তার পিতার চেয়ারটির হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া সেই সব কথাবার্ত্তা শুনিত। ক্রমশঃ নির্ম্মলের অবস্থা এমন হইয়া উঠিল যে উষার খাস হাতে তৈরী চায়ের নেশা এড়াইয়া সন্ধ্যাবেলা কোনও রোগীর বাড়ী যাওয়া অসাধ্য হইয়া উঠিল। এবং যে দিন সভায় উষা উপস্থিত থাকিত, সে দিন নির্ম্মলকে তর্কযুদ্ধে কেহ হঠাইতে পারিত না।

নির্ম্মল স্বর্ণকমল বাবুর বাড়ীতে যাতায়াত সুরু করিয়াই দেখিতে পাইল, অজিত সেখানকার সান্ধ্য-সভার রীতিমত সভ্য। সে যেভাবে হাজিরা দিয়া আসিতেছে, তাতে তার নিষ্ঠা সম্বন্ধে কারো কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। নির্ম্মল সেখানে অজিতকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেল, এবং অজিতও নির্ম্মলকে দেখিতে পাইয়া লাল হইয়া উঠিল! অথচ নির্ম্মলের যেমন বিস্মিত হইবার কোনও অজুহাত ছিল না, তেমনি অজিতেরও ততটা অপ্রতিভ হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না।

কোনও একটা বিষয় লইয়া তর্ক উঠিলে, নির্ম্মল যেমন ঝড়ের মত বকিয়া গিয়া অনেকটা গায়ের জোরে নিজের মতগুলির অখণ্ডনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া বাহাদুরী লইতে পারে, অজিত তা পারিত না। সে নিজে মুখচোরা মানুষ, তার মুখ চোখের উপর কেমন একটু মেয়েলি লাজুক ভাব। তর্কযুদ্ধে সে মোটে ভিড়িতেই চাহিত না বলিয়া নির্ম্মল তাকে ভীরু কাপুরুষ প্রভৃতি বদনাম দিয়া ছলে বলে কৌশলে তর্কের মধ্যে টানিয়া আনিয়া শেষকালে তার মতগুলিকে নির্দ্দয়ভাবে গলা টিপিয়া মারিত, এবং এই অবস্থায় নির্ম্মলের সহিত অন্যায় যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও অজিত যেরূপ হাসিতে থাকিত, তাহাতে তার উপর সকলেরই মায়া হইয়া গিয়াছিল। ফলে বাস্তবিক অজিত স্বর্ণকমল বাবুর মজলিসে হারিয়াই যশস্বী হইয়াছিল!

*   *   *   *

সে দিন সন্ধ্যার পর স্বর্ণকমল বাবুর বৈঠকখানায় আমাদের দেশের বিবাহ পদ্ধতির আলোচনা হইতেছিল। নির্ম্মল আমাদের দেশের বিবাহ পদ্ধতির উপর বড় বড় জলন্ত কামানের গোলা নিক্ষেপ করিতেছিল, নির্ম্মলের অতটা উত্তেজনার কারণ এই যে বিষয়টার মধ্যে তার একটা ব্যক্তিগত স্বার্থের ছিট ছিল এবং সে সভায় বর্ষার দুর্যোগ বশতঃ নির্ম্মল ও অজিত ভিন্ন আর কোনও সভ্য সেদিন উপস্থিত ছিলেন না। বিশেষতঃ স্বর্ণকমল বাবু সে দিন বাড়ীতে ছিলেন না। সভ্য দুটীর চা'য়ের তৃষ্ণা মিটাইতে আসিয়া উষা ঠেকিয়া সভাপতি হইয়া পড়িয়াছে।

নির্ম্মল বলিতেছিল :—"বিবাহ করিবার মূলধন হচ্চে খাঁটি ভালবাসা ; আজ কালকার দিনে এ সব ব্যাপারে যদি বাপ মা হস্তক্ষেপ কত্তে আসেন, তবে আর তাঁদের পদ-মর্য্যাদা বজায় থাকবে না।"

অজিত বলিল :—"সমাজের শৃঙ্খলা জিনিষটা যখন মানুষের খেয়ালের বিরুদ্ধে যায়, তখন শৃঙ্খলাটাকেই মানুষের নিকট বন্ধনের মত শক্ত ঠেকে! কিন্তু সে ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল।"

নির্ম্মল গর্জ্জিয়া বলিল :—"তোমার আজো সত্যি-কালের সংস্কারগুলো ঘুচলো না! সমাজের শৃঙ্খলা টেঁকাতে গিয়ে, আমাদের নিজেদের রুচি যদি তাঁরা পদে পদে অগ্রাহ্য করেন, তবে শেষকালে আমাদের জীবনের বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী হবে কে?"

অজিত—"রুচিটাকে সব সময় বাপ মার অভিজ্ঞতার চাইতে বড় করে ভাবলে শীগ্‌গিরই সমাজটাকে একটা প্রকাণ্ড ডাইভোর্স কোর্ট করে খাড়া কত্তে পারো! তাহলে আগে আইন করে ডাইভোর্সের বন্দোবস্ত কর, তার আগে রুচি রুচি বলে ক্ষেপে উঠলে চলবে না।"

নির্ম্মল—"মাপ কর অজিত, বাপ মা হলেই যে তাঁরা সব সময়ই ঠিক বুঝবেন, আর আমরা সব সময়েই ভুল করবো, সেরূপ মনে করবার দিন আর নেই।"

অজিত—"আমরা যদি তা মনে না করি, তাতে আমাদের নিজেদের মর্য্যাদা যে খুব বেশী বাড়ে, তাত মনে হয় না।"

নির্ম্মল—"এখানে পদমর্য্যাদার কথা হচ্চে না, ভুল ভ্রান্তির কথাই হচ্ছিল।"

অজিত—"ভুল করার সম্ভাবনাটা যখন আমাদের দিকেই বেশী, তখন, এ ক্ষেত্রে তাঁদের চাইতে আমাদের দিকে সাবধানতার প্রয়োজনটা বেশী।"

নির্ম্মল তার বাক্যতুণ হইতে আর একটা সুতীক্ষ্ণ শর তুলিতেছিল, এমন সময় শ্রীমতী সভাপতি মহাশয়া বলিলেন :—"ডাক্তার বাবু, আপনার তর্কটা যেন আধখানা রকম হচ্চে! এ সব ব্যাপারে ছেলে মেয়ের মতামতের উপর বাপ-মার নজর থাকা উচিত কিন্তু বাপ মাকে একেবারে বাদ দিলে, ব্যাপার যে বিষম হয়ে গড়াবে।"

তর্কযুদ্ধে অজিতের এই প্রথম জিৎ! নির্ম্মল সেদিন এমন বিচলিত হইল যে তর্কে হারিয়া মানুষ কখনো এত বেপরিমাণ বিচলিত হয় না। নির্ম্মল মনে করিল, যে সভাপতিটীকে জিনিয়া লইবার জন্য সেদিনকার মল্লযুদ্ধ সে সভাপতিই নিজে স্বহস্তে অজিতের ললাটে বিজয় ফোটা টিপিয়া দিলেন!

* * * *

পরদিন সকাল বেলা দুই তিনটা কল ফিরাইয়া দিয়া, নির্ম্মল তার বসিবার ঘরে একটা খবরের কাগজ লইয়া অন্যমনস্কভাবে নাড়া চাড়া করিতেছিল। এমন সময় একটা টুইলের টেনিস-সার্ট গায়ে অজিত চটিজুতার চট চট শব্দে নির্ম্মলের শান্তিভঙ্গ করিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পরিল।

অজিতকে দেখিয়া নির্ম্মল চট্ করিয়া তার তখনকার মনের ভাবটা চাপিয়া গেল। সে বিষয়ে নির্ম্মলের ওস্তাদি বিলক্ষণ ছিল। অজিত সরল প্রকৃতির মানুষ। মুখখানি তার মনোরাজ্যের একখানি নিখুঁত স্বচ্ছ আয়না স্বরূপ। হৃদয়ের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের কণিকাগুলিও যেন তার মুখের উপর একটী প্রতিবিম্ব রাখিয়া যাইত। কিন্তু নির্ম্মল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক।

নির্ম্মল একটু বিস্ময়ের সহিত হাসিয়া বলিল :—

"একি, অজিত যে!"

অজিত প্রফুল্লভাবে বলিল :—"সেই রকমি বোধ হচ্চে"—

নির্ম্মল একটু ব্যঙ্গছলে বলিল :—"স্বর্ণকমল বাবুর বাড়ী থেকে শুভাগমন হচ্চে বোধ হয়?"

অজিত একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল :—"দিব্যি থট্-রিডিং শিখেচো-যাহোক।"

নির্ম্মল একটু বুক ফুলাইয়া বলিল :—'তুমি কি আমায় নেহাৎনাড়ী টেপা বদ্যি মনে কর নাকি?"

অজিতের মুখ আলো করিয়া স্বচ্ছ হাসি ফুটিয়া উঠিল। কারণ আজ তার সমুদয় অন্তঃকরণটা লাবণ্যে মাধুর্য্যে উছলিয়া পড়িতেছিল। সেটাকে একটা দুর্লক্ষণ মনে করিয়া নির্ম্মল মনের ভাব চাপা দিবার জন্য একটা আলস্য সূচক হাই তুলিতে তুলিতে বলিল :—"হঠাৎ সকাল বেলা কি মনে করে?"

"তোমায় একটা সুখবর দিতে এসেছি।

নির্ম্মল কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল :—"কি রকম?"

"ঈশান কোণে একটা প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ উপস্থিত!"

নির্ম্মল হাসির চেষ্টা করিয়া বলিল :—"প্রিচিয়াস ফর ওল্ড প্রজাপতি ঠাকুরদ্দা। তা-ভাই আমরা ইতর লোক মিষ্টান্নের প্রত্যাশা রাখি কিন্তু।

নিরীহ ভালমানুষটীর মত অজিত হাসিয়া বলিল— "তাহবে এখন, কিন্তু আমি যে তোমার নিকট এসেছি, আমাকে একখানা হেল্‌থ্‌ সার্টিফিকেট লিখে দিতে হচ্চে!"

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল :—"কেন, শশুর বাড়ী থেকে হেল্‌থ সার্টিফিকেট তলপ করেছে নাকি?"

অজিত বলিল :—না। ঠিক করেচি, বিয়ের আগেই একটা লাইফ ইনসিওর করে রাখবো। স্ত্রীর জন্য খোরাকীর বন্দোবস্ত না করে যে আজকালকার দিনে লোকের মরবারও অধিকার থাকে না!"

নির্ম্মল খুব এক পশলা হাসিয়া লইয়া পরে বলিল :— "ঠিক বলেচ অজিত—চিকিৎসা করবার সময় প্রায়ই দেখতে পাই, লোকগুলি স্ত্রীর জন্যে কোনও বন্দোবস্ত না করে অনবরত মারা যাচ্চে! সে তো মরা নয়, কেবল ঘরের স্ত্রীকে ফাঁকি দেওয়া!"

এরপর হাসাহাসিটা একটু থামিলে পর, অজিত বলিল :—"তা হলে আসচে কাল বিকালে তুমি আমায় এক্‌জামিন করবে, বল?"

"বিলক্ষণ! তোমার যখন খুসী, আমায় ডেকে পাঠিও!"

"তা হলে কথা থাকল তবে—কালই।"

নিশ্চয়! এতে তোমার কোম্পানির তরফ থেকে আমাদেরও যে বিলক্ষণ দুপয়সা প্রাপ্তি আছে। আমাদের গরজও সুতরাং নিতান্ত কম নয়।"

*　　*　　*　　*

পরদিন বিকাল বেলা নির্ম্মল মাঝারি রকমের একটী গ্লাডষ্টোন ব্যাগ ভরিয়া নানারকম হাতিয়ার পাতি লইয়া জুতার মস্ মস্ শব্দে মেসটী সচকিত করিয়া অজিতের কামরায় প্রবেশ করিল। অজিত জানালার রেলিংএর উপর কনুই রাখিয়া, এবং হাতের মুঠির উপর চিবুক ন্যস্ত করিয়া বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। মিলনোৎসুক হৃদয়ের সবটুকু আনন্দ তার মুখ খানা আলো করিয়া রাখিয়াছিল!

অজিত জানে তার শরীরে কোনও অসুখ বিসুখ নাই ভিতরের কোনও যন্ত্রও পীড়িত নয়। তার পর পরীক্ষার ভার পড়িয়াছে, বাল্য বন্ধু নির্ম্মলের উপর। এ অবস্থায় নির্ম্মল হয়তঃ কোনরূপ পরীক্ষা না করিয়া অথবা নামমাত্র পরীক্ষাটা সারিয়া দিয়াই হেল্‌থ সার্টিফিকেট লিখিয়া দিবে। নির্ম্মলকে ব্যাগ হস্তে ঢুকিতে দেখিয়াই অজিত বলিয়া উটিল:—"ব্যাগে পুরে অত শত কি নিয়ে আসচো! অপারেসন করবার মতলব আছে নাকি?"

নির্ম্মল অত্যন্ত পাণ্ডুর হাসি হাসিয়া অজিতের বাঁ হাত স্পর্শ করিয়া বলিল:—"আরে কি পাগল! পুরোপুরি ভিজিটটা হজম করবো, আর একটা পরীক্ষাও করবো না! চুপ করে দাঁড়াও তুমি, জামাটা খোল!

জামা খোলা হইলে পর, নির্ম্মল অজিতকে অতিশয় মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতে লাগিল। অজিত পরীক্ষাটাকে যত সহজ মনে করিয়াছিল, বাস্তবিক নির্ম্মলের পরীক্ষা তত সহজ হইল না। আধঘণ্টা ধরিয়া অজিতের শরীরটা অসংখ্যবার চাড়া চাড়া করাতে অজিতের বিরক্তি ধরিয়া গেল। তার পরেও যখন নির্ম্মল অজিতের বাম ফুসফুসের উপর তৃতীয় বার ষ্টেথোস্কোপ যন্ত্র পাতিয়া কাণের সঙ্গে লাগাইল, এবং তার পর ইনজেকসন করিয়া রক্ত পরীক্ষা করিল, তখন অজিত ধৈর্য্য রাখিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল:—

"গায়ে বড্ডো লাগ্‌চে নির্ম্মল, ওসব বাজে ফষ্টিং এখন রেখে দাও, এতো জানলে ভাই লাইফ ইনসিওরেন্স করার নামেই আমার অভক্তি হতো।"

নির্ম্মলের পরীক্ষা তখনো শেষ হয় নাই, সে অজিতের ঠাট্টাটার দিকে মন না দিয়া পরীক্ষাই করিতেছিল। অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া শেষকালে নির্ম্মল যখন থামিল, তখন অজিতের মনে হইল যেন ঘাম দিয়া জর ছাড়িল। অজিত হাসিয়া বলিল:—

"তা হলে সার্টিফিকেট খানা কখন লিখে দিচ্ছ?"

নির্ম্মল তখন তার ষ্টেথোস্কোপ যন্ত্রটা সামলাইতে ছিল। সেই গুরুতর ব্যাপারটা লইয়া সে যেন এতই ব্যস্ত ছিল যে সে অজিতের কথাটা শুনিয়াও শোনে নাই।

পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে অজিত দেখিতে পাইল। নির্ম্মল কেমন যেন নিস্তেজ ও অন্যমনস্ক। অজিত আরো একবার নির্ম্মলকে সার্টিফিকেট খানার কথা মনে করিয়া দিলে, নির্ম্মল, কি যেন চিন্তা করিতে করিতে বলিল:—

"সে আমি নিজেই পাঠিয়ে দেবো এখন। তোমার একটু পরিশ্রম হয়েছে, এটা খেয়ে ফেল।" বলিয়া একটা মেজার গ্লাসে একটা ঔষধ ঢালিয়া দিল।

দুচারটা বাজে কথা হওয়ার পর নির্ম্মল অজিতের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। কিন্তু কয়েক পা গিয়াই নির্ম্মল আবার অজিতের কাছে ফিরিয়া আসিল। তাহার চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া, মুখ খানা যেন কেমন বিবর্ণ। সে যেন কি একটা কথা অজিতকে বলিবার জন্য ফিরিয়া আসিয়াছে অথচ সে কথাটা বলি বলি করিয়া যেন তার মুখে ফুটিল না! নির্ম্মলকে ফিরিতে দেখিয়া অজিত বলিল:—"কি ফিরলে যে?" নির্ম্মল জিব দিয়া শুষ্ক ঠোঁট ভিজাইয়া লইয়া বলিল:—ষ্টেথোস্কোপটা ফেলে গেছি নাকি?"

অজিত বলিল:—না। তখন নির্ম্মল এক পা দুই পা করিয়া অজিতের কামরার বাহির হইয়া গেল!

নির্ম্মলের দুশ্চিন্তা সম্বন্ধে অজিতের কোন খেয়াল ছিল না। তখন অজিতের হৃদয়াকাশে ভাবের রাঙ্গা মেঘের কোলে উষার কণক কান্তি ফুটিয়া

উঠিয়াছে। আসন্ন সৌভাগ্যের ঘন নেশায় সে তখন বিভোর। এখন সে তার সুখচিন্তার সহিত একলা থাকিবার ছুটী পাইলে বাঁচে! নির্ম্মল চলিয়া যাওয়া মাত্র অজিত তার প্রেমের সুরভি মাখা, স্বপ্নের জ্যোৎস্না মাখা, আনন্দের নিশীথ জগতে মাতালের মত একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল! এমন অবস্থায় আমাদের তরুণ স্কুল মাষ্টারটী যদি সার্টিফিকেটটার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া থাকে, সে জন্য মনোবিজ্ঞান দায়ী!

* * * *

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ মিলাইয়া গিয়াছে। আকাশ ভরা আঁধার তারায় তারায় ছাইয়া গিয়াছে। কে যেন আকাশ ব্যাপী কালো মকমলের জমিনের উপর উজ্জ্বল তারা বসাইয়া মনোহারি জরির কায করিয়া রাখিয়াছে! নক্ষত্রালোকিত অন্ধকারে গাছপালা গুলি ছায়া স্তূপ বলিয়া মনে হয়। বাহিরে একটী ছায়াচ্ছন্ন অস্পষ্ট দালানের অর্দ্ধমুক্ত দ্বার পথে ভিতরের রক্তিমাভ আলো দেখা যাইতেছে। কোথাও অন্ধকারাচ্ছন্ন তরুলতার ফাঁকে ফাঁকে দুএকটী গৃহ দীপ ঝরা তারার মত মিট মিট করিতেছে। আকাশের কোণে অদৃশ্য মেঘে ক্ষীণ বিদ্যুৎ থাকিয়া থাকিয়া চমকিতে ছিল—আর আকাশের তারাগুলি এক একবার শিহরিয়া উঠিয়া ভয়ানক পাণ্ডুর হইয়া যাইতেছিল!

অজিতের সঙ্গে উষার বিবাহের আর তিনটী দিন মাত্র বাকী। নির্ম্মল অসুখের অজুহাত দিয়া একটা 'কল' ফিরাইয়া দিয়া, একাকী শুষ্ক রক্তহীন মুখে তার বসিবার ঘরের টেবিলের উপরিস্থিত জ্বলন্ত লেম্পটার সম্মুখে নীরবে দাঁড়াইয়াছিল।

এমন সময় একটা ঘূর্ণী বায়ুর মত অজিত বিবর্ণ মুখে সে ঘরের ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিল। অজিতকে দেখিয়া নির্ম্মলের মুখ সহসা মৃতের মত আরো রক্তশূন্য হইয়া গেল।

অজিত ধপ করিয়া একটা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া, ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল—"আমার লাইফ ওরা ইনসিওর কর্ব্বেনা, এই মাত্র ডাকে কোম্পানীর চিঠি পেয়েছি! নির্ম্মল বজ্রাহত পথিকের মত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোনও কথা বলিল না। অজিত তাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল:—"নির্ম্মল শুনলে?"

নির্ম্মল ধীরে ধীরে উত্তর করিল:—"তা খুব সম্ভব। আমায় মাফ্ করবে ভাই, আমি তোমার হেলথ্ সম্বন্ধে ভাল রিপোর্ট কত্তে পারিনি!"

অজিত বার কয়েক ঢোক গিলিয়া বলিল:—"কেন কেন, আমার তো কোন অসুখ বিসুখ নাই!"

নির্ম্মল শুষ্ক মুখে বলিল:—"তোমার দুদিকের ফুস ফুসেই ক্যাভিটী ফরম হয়েছে বলে বোধ হয়!"

"তার মানে?"

"সাঙ্গাতিক যক্ষা রোগ!"

অজিত একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যক্ষা রোগীর মতই কাহিল স্বরে উত্তর করিল:—"ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বলচি নির্ম্মল! কোন কথা লুকিওনা ভাই, ঠিক করে বল।"

নির্ম্মল স্নেহভরে অজিতের হাতখানি তার হাতের উপর তুলিয়া লইয়া বার দুই কাশিয়া উত্তর করিল—

"আর কারু কাছে হলে আমি আজ সত্য গোপন করতুম, মিথ্যা কথা বলতে একটুও লজ্জিত হতুমনা কিন্তু আজ আমার আজন্মের বন্ধুর জন্য, ভাবি বন্ধু পত্নী উষার মঙ্গলের জন্য—সত্য কথা লুকাতে পারি না, সে জন্যে আমায় মাপ করো!"

অজিত চেয়ারটার উপর গা ছাড়িয়া দিয়া নিতান্ত নিরুপায় ভাবে নির্ম্মলের পানে চাহিয়া বলিল:—"তবে আমার জীবনের আর কোন আশা নেই, নির্ম্মল?"

নির্ম্মল স্নেহ বিগলিত কণ্ঠে বলিল—"সে কথা কি মানুষে বলতে পারে! তবে এই পর্য্যন্ত বলতে পারি, আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে এ রোগের কোন চিকিৎসা নাই।"

অজিত প্রতিধ্বনির মত বলিল—"কোন চিকিৎসা নাই?"

নির্ম্মল নম্রকণ্ঠে বলিল—"আমি যত দূর জানি নেই!"

অজিত মৃত্যুশয্যাশ্রিত আসন্ন রোগীর মত কাহিল সুরে বলিল:—"তবে আর আমার কদিনের মেয়াদ?"

নির্ম্মল বলিল—"সে কথাও কি কেউ ঠিক করে বলতে পারে অজিত! ভাল চিকিৎসা হলে এ সব রোগী অনেকদিন বাঁচতেও দেখা যায়।"

অজিত অত্যন্ত ম্লান ভাবে বলিল—"আশা! আরকেন! এখন পরমেশ্বর আমায় শীগগীর শীগগীর সরালেই বাঁচি!

নির্ম্মল পাশের কামরা হইতে একটা মেজার গ্লাশে করিয়া খানিকটা ষ্টিমুলেণ্ট আনিয়া অজিত কে খাওয়াইয়া দিয়া বলিল:—"রাত হতে চল্লো; চল তোমার আমি তোমার ঘরে রেখে আসি!" এই বলিয়া নির্ম্মল অজিতকে হাত ধরিয়া চেয়ার হইতে উঠাইল। অজিত দুর্ব্বল অশক্ত রোগীর মত তার হাত ধরিয়া চলিল।

অজিত কে তার ঘরে আনিয়া শোয়াইয়া যাইবার পূর্ব্বে নির্ম্মল বলিল:—আজ তোমার ফুস ফুসের অবস্থা ভাল নয়, সাবধানে থেকো ভাই! একদিন তোমার সম্পূর্ণ বিশ্রাম চাই! কোনও রূপ পরিশ্রম বা উত্তেজনার কাযে যাওয়া হবে না! আজকের একটা সাধারণ মনের পরিবর্ত্তনের ধাক্কাই তুমি ভাল করে সামলাতে পারনি —এর উপর আবার নূতন উপসর্গ সব এসে জুট্‌লে ভারি মুস্কিলে ফেলবে আমায়!"

নির্ম্মল যাইতে ছিল। অজিত সহসা তার হাত খানি চাপিয়া ধরিয়া নিরুপায় শিশুটীর মত নির্ম্মলের মুখের পানে চাহিয়া আবেগের সহিত বলিল:— "আজ তুমি ঠিক বন্ধুর কায করেছ নির্ম্মল। উষাকে আজ তুমি আসন্ন বৈধব্যের হাত থেকে বাঁচালে! কিন্তু এত যদি করলে, তবে আমায় আর একটা শেষ উপকার তুমি করবে না?

নির্ম্মল ভাঙ্গা গলায় বলিল—"কি?"

অজিত বলিল"একবার স্বর্ণ কমল বাবুর কাছেযেতে পার?"

নির্ম্মল কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—"ইচ্ছে তো করে না; তবে তুমি যদি নিতান্ত না ছাড় তবে অবিশ্যি।"

অজিত একটু আশ্বস্থ হইয়া বলিল:—আমি এখনি স্বর্ণ কমল বাবুর কাছে খবরটা লিখে পাঠাইব! কিন্তু কাল সকালে যদি তুমি একবার তাঁকে গিয়ে সব কথা ভেঙ্গে বল, যদি বল, এতে আমার কোনও ছলনা নাই মরবার সময় কি আমার ছলনা সাজে।

নির্ম্মলে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিল:— বড় কঠিন, বড় মর্ম্মান্তিক কাজের ভার চাপাচ্চ কিন্তু, তবু, অজিত, তোমার জন্যে আমি সব কত্তে রাজি আছি!

* * * *

পরদিন সকালে অজিতের ঘরের দরজা খুলিয়া দিতেই যখন গায়ে হলদি মাখিয়া বিবাহের বেশে প্রভাতের সোণালি রোদ অজিতের বিছানার উপর হাসিয়া উঠিল, তখন আর আর দিনের মত আজ অজিত লাফ্ দিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িল না! তার মনে হইল যেন তার উঠিবার শক্তি নাই, আর বুঝি বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে হইবে না! সে ফ্লানেলের সার্টটী গায়ে দিয়া হতভাগ্য চিররুগ্ন রোগীর মত চোখ মুদিয়া বিছানার উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া রহিল।

সহসা ঘরের মধ্যে লোকের পায়ের শব্দ শুনিয়া অজিত চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখে, একটী ডাক্তার তার বিছানার পাশে আসিয়া বসিলেন। সঙ্গে স্বর্ণকমল বাবু! স্বর্ণকমল বাবু তার বিছানার নিকটে আসিলে, সে একবার তার দুর্ব্বল হাত দুখানি মেলিয়া স্বর্ণকমল বাবুর পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। বাস্তবিক এক রাত্রিতেই তার হাত দুটী এতই ক্ষীণ, এতই শিথিল হইয়া গিয়াছিল! স্বর্ণকমল বাবু তার শুষ্ক বিবর্ণ মুখ, কোটর গত চক্ষু এবং দুর্ব্বল শীর্ণ দেহ দেখিয়া বাস্তবিক শিহরিয়া উঠিলেন। এক রাত্রিতে সে এতই শুকাইয়া গিয়াছিল!

অজিত অধীর ভাবে সবলে স্বর্ণকমল বাবুর হাতখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল:—

"আমার অজ্ঞাতকৃত অপরাধের যা দণ্ড তা স্বয়ং মৃত্যুরাজের হাত থেকে নিচে বসেচি—এখন আপনারা আমায় মার্জ্জনা করুণ! আজি না জেনে, না বুঝে আপনাদের যথেষ্ট মনোকষ্টের ও অযশের কারণ হয়েচি!"

স্বর্ণকমল বাবু অজিতের বুকের উপর নিঃশব্দে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। বলিবার মত একটী কথাও যেন তাঁর মনে যোগাইতেছিল না!

কিছুক্ষণ পর, অজিত অত্যন্ত কাহিল ভাবে বলিল:— "তবু আজ নির্ম্মলকে আমি বারে বারে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারচি না। নৈলে বিবাহের পরে রোগটা ধরা পড়লে আপনাদের যে কি সর্ব্বনাশ হতো, তা ভাবতেও আমার গা শিউরে উঠছে!" অজিত যখন স্বর্ণকমল

বাবুর সঙ্গে কথা কহিতেছিল তখন স্বর্ণকমল বাবুর সঙ্গীয় ডাক্তারটী খুব মনোযোগের সহিত তাঁর পকেট ঘড়ির সহিত মিলাইয়া অজিতের নাড়ির গতি পরীক্ষা করিতে ছিলেন। নাড়ী দেখা শেষ হইলে পর, ডাক্তার অজিতের পানে তাকাইয়া বলিলেন :—তোমার অসুখের খবর পেয়ে, ঊষা তো একেবারে বিছানা নিয়েচে!"

অজিতের দীর্ঘনিশ্বাসটা যেন তার বুকের দুর্ব্বল প্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া আসিল। অজিত আর কোন কথা কহিল না দেখিয়া ডাক্তার একটু বাহাদুরী দেখাইবার ভাণ করিয়া বলিলেন :—"ঊষার বিশ্বাস আমার হাতে একবার রোগী এসে পড়লে তার আর কোনও ভয় নাই! সে মনে করে আমি ঘণ্টাখানেকের ভিতরেই তোমায় একেবারে আরাম করে দিতে পারব—কেমন, না স্বর্ণকমল বাবু?"

এই বলিয়া তিনি স্বর্ণকমল বাবুর পানে চাহিলেন। স্বর্ণকমল বাবু হাসিতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু সে হাসি অত্যন্ত ম্লান! অজিত ডাক্তারের পানে তার কাতর চোখদুটী তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল :—"কিন্তু আমার ব্যারাম যে মানুষের চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে!"

ডাক্তার অজিতের বুকে ষ্টেথোস্কোপ যন্ত্র বসাইতে বসাইতে বলিলেন :—"আমি বলচি কি তোমায়! ঊষার যেরূপ অসম্ভব ভক্তি আমার উপর, তাতে সে কি আমায় ঠিক মানুষ বলে মনে করে তোমার বোধ হয়?"

বুক পরীক্ষা করা শেষ হইলে ডাক্তার একটু হালকা হইয়া বলিলেন :—"আচ্ছা, এখন ব্যারামের হিষ্ট্রী-টা আমায় খুলে বল দেখি একবার!'

তখন নির্ম্মল তার ব্যারাম সম্বন্ধে যা যা বলিয়াছিল, সব কথা অজিত আনুপূর্ব্বিক খুলিয়া বলিলেন। ডাক্তার কিছু গম্ভীর হইয়া বসিয়া তাহা শুনিলেন। তারপর বলিলেন :—"দেখ অজিত, তোমার বন্ধুর মতের সঙ্গে আমার মতটা কিছুতেই মিলচে না!"

অজিত বলিল :—"নির্ম্মল বলচে আমার সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না!"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন :—ঊষা যেমন আমায় মানুষ মনে করে না, তুমিও দেখচি নির্ম্মল বাবুকে শাপ-ভ্রষ্ট দেবতা বলে মান দেখচি!" ডাক্তারের আশ্বাসপূর্ণ কথায় এখন অনেকটা জোর পাইয়া, অজিত যেন সত্যি সত্যি অনেকটা সুস্থ বোধ করিল!

এর পর ডাক্তার স্বর্ণকমল বাবুর কাণে কাণে ফিস ফিস করিয়া কি বলিলেন—স্বর্ণকমলের মুখখানা যেন সে গোপন সংবাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, অজিত তা দেখিতে পাইল। তার পর ডাক্তার অজিতের দিকে ফিরিয়া বলিলেন :—আমার বন্ধু স্বর্ণকমল বাবু তোমায় নিয়ে কিছু বিপদগ্রস্থ—এখন তুমি যদি রাজি হও, তবে আমি একবার তোমায় চিকিৎসা করে দেখতে পারি, কি বল।"

অজিত খুব ফুর্ত্তির সহিত বলিল :—"স্বচ্ছন্দে! সেতো আমার সৌভাগ্য—এতে আমার আপত্তি হবে কেন!" ডাক্তার আবারও অজিতের বুকটা যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন:—আমার মনে হয় তোমার পীড়া সম্বন্ধে নির্ম্মল বাবুর ধারাণটা কিছু বেশী রকম! তোমার বিছা-নায় শুয়ে থাকবার কোন দরকার দেখি না আমি! দিব্যি খেয়ে দেয়ে হাঁটা চড়া করে বেড়াতে পার এখন!"

অজিত বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া অবাক হইয়া বলিল:—"নির্ম্মল আমায় একবারে বিছানাথেকে উঠতে মানা করে দিয়াচে!"

ডাক্তার বলিলেন :—"আমার চিকিৎসার প্রণালীটা নির্ম্মল বাবুর প্রণালী থেকে সম্পুর্ণ পৃথক! আচ্ছা তিনি কি তোমায় কোন অষুধ খেতে দিয়ে গেছেন?"

অজিত কুলুঙ্গির উপর একটী ঔষধের শিশি দেখাইয়া দিয়া বলিল পূর্ব্ব রাত্রে নির্ম্মলের ব্যবস্থা মত সে ঐ ঔষধ খাইতে ভুলিয়া গিয়াছিল! শিশিটার সিপি খুলিয়া বার দুই তিন ঘ্রাণ লইয়া ডাক্তার বাবু শিশিটা জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিয়া স্বর্ণকমল বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন:—"দেখ স্বর্ণকমল, আসচে কালই বিয়েটা সেরে ফেল! তারিখ পিছিয়ে দেবার কোনও দরকার দেখচি নে আমি!'

স্বর্ণকমল বাবু হাস্য মুখে বলিলেন—'আচ্ছা।"

অজিত এবার ঠিক সুস্থ লোকের মতই বিছানা হইতে উঠিয়া দাড়াইল। গত রাত্রে যে সে একবিন্দু জলও স্পর্শ করে নাই, সেজন্য সে এখন কিছু মাত্র দুর্ব্বলতা বোধ করিল না।

*   *   *   *

যথা সময়ে অজিতের সঙ্গে উষার শুভ বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের দিন সকাল বেলা দেখা গেল, নির্ম্মলের ঘরের দুয়ার জানলা সব বন্ধ।

অজিত অনুসন্ধান করিয়া জানিল, নির্ম্মল কলিকাতা হইতে ব্যাবসা তুলিয়া হঠাৎ কোথায় চলিয়া গিয়াছে; সে কথার কেউ কোন সঠিক খবর দিতে পারে না!

বিবাহের পর দিন স্বর্ণকমল বাবুর বাড়ীর বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিয়া পূর্ব্বোক্ত ডাক্তারটী অজিতের সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন। স্বর্ণকমল বাবু বারান্দায় ফুলের টব গুলির পাশে পায়চারি করিতে করিতে বেড়াইতে ছিলেন। নিকটে ক্যানবাসের আড়ালে একখানা ছোট টেবিলের উপর উষা চা তৈরি করিতেছিল।

আকাশে চাঁদ উঠিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে অজিতবলিয়া উঠিল—আমার সঙ্গে নির্ম্মলের এ চালাকিটা করবার কি দরকার ছিল, আমি তা ঠাহর করে উঠতে পাচ্ছি না!

ডাক্তার বাবু বলিলেন—অতি সাদা কথা! উষার সঙ্গে তোমার বিয়েটা বাতিল করে দেবার জন্যে।

অজিত বলিল—এতে তার এমন কি স্বার্থ ছিল!

ডাক্তার বাবু বলিলেন—যেখানে ভালবাসার সঙ্গে হিংসা এসে জড়ায় সেখানে মানুষ কি না কত্তে পারে!

অজিত ব্যাপার খানা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়া বলিল—তার আবার কার সঙ্গে কবে ভালবাসা হলো! আর হিংসাই বা কত্তে যাবে কাকে!

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—ঐ টুকু যদি তুমি একটু তলিয়ে দেখতে যে ভালবাসা কারো একচেটে নয় তাহলে তোমায় অনর্থক এত ঝকমারি সইতে হতো না।

স্বর্ণকমল বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা ডাক্তার বাবু ভালকথা মনে পড়লো, আপনি যে সেদিন অজিতের ঘর থেকে অষুধ শুদ্দু শিশিটা ফেলে দিলেন, তার মানে?

ডাক্তার অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন—সে কথা ভাবতে আমার এখনো গা কাঁটা দিয়ে ওঠে! ওটা ছিল হাইড্রোসয়ানিক বিষ!

অজিত সেকথা শুনিয়া লঘু মেঘের আড়ালকরা চাঁদের মত অত্যন্ত পাণ্ডুর হইয়া গেল। উষার হাত হইতে পর্সিলেনের উপর ফুল কাটা সুন্দর চায়ের বাটিটা হঠাৎ মেঝের উপর পড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া গেল!

শ্রীসুরেশ চন্দ্র সিংহ।

৺ মহেশচন্দ্র সেন।

জন্ম—১২৬১ সন ৯ই পৌষ।

মৃত্যু—১৩২০ সন ১৭ই ফাল্গুন।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গতঃ কুষ্টিয়া সেনবাড়ীর সুপ্রসিদ্ধ ভুম্যধিকারী বংশে মহেশচন্দ্র সেন মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামতনু সেন। শৈশবেই মহেশচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয়। বাল্যকালে তিনি শিক্ষার্থ ময়মনসিংহ নগরে প্রেরিত হন।

মহেশচন্দ্র যখন ময়মনসিংহের তদানীন্তন হার্ডিঞ্জ স্কুলে অধ্যয়ন করেন, তখন ৺ দীননাথ চৌধুরী মহাশয় উক্ত স্কুলের জনৈক শিক্ষকছিলেন। একদিন উক্ত শিক্ষক মহাশয় মহেশচন্দ্রের রচনা দেখিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—"ইহার রচনায় বর্ণাশুদ্ধি এরূপ যে নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রের পক্ষেও লজ্জাজনক; কিন্তু ইহার রচনা কৌশল দেখিয়া অনুমান হয়, যে কালে সে একজন সুলেখক বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবে।" দীনবাবুর এই ভবিষ্যদ্বাণী উত্তর কালে অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল।

তৎকালে এ জেলায় ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন অত্যন্ত কম ছিল, সুতরাং মহেশচন্দ্র ছাত্রবৃত্তি শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়াই তাহার ধারণা জন্মিল যে, বাঙ্গালা ভাষা তাঁহার বেশ আয়ত্ত হইয়াছে। তখন তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র "বান্ধবে"র গ্রাহক হইলেন; কিন্তু প্রথমতঃ কোন প্রবন্ধেই দন্তস্ফুট করিতে সক্ষম হইলেন না, তখন তাঁহার সে ভ্রম দূর হইল; তিনি বুঝিলেন কিছুই শিখেন নাই। তখন হইতেই তিনি সাহিত্য আলোচনার প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। এবং বিপুল উদ্যম ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত নানাগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বহু মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের গ্রাহক হইয়া নিয়মিতরূপে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন; এইরূপে তাঁহার সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ হইল। ক্রমে মহেশচন্দ্রের লেখনি ধারণের বাসনা জন্মিল। তৎকালীন "আর্য্য-প্রভা" নামক মাসিক পত্রিকায় তাঁহার সর্ব্বপ্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। তৎপরে 'বান্ধব', 'নব্যভারত' 'আরতি' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার তিনি একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। একদিন যে

"বান্ধব" পত্রিকার প্রবন্ধ বুঝিতে তিনি অসমর্থ ছিলেন, কালে অনুশীলনের ফলে, মহেশচন্দ্রের প্রবন্ধ "ভারত-মহিমা" সেই গৌরবান্বিত মাসিক পত্রের গৌরব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বান্ধব-সম্পাদক স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ স্বয়ং উক্ত প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে 'বান্ধবের' সহকারী সম্পাদক হওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।

আমরা তাঁহার উক্ত প্রবন্ধটীর কয়েক ছত্র এস্থলে উদ্ধৃত করার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন "অন্যদেশে নদী আছে—গঙ্গা নাই; পর্ব্বত আছে—হিমালয় নাই; পাখী আছে—কোকিল নাই; ফল আছে—আম্রনাই; ফুল আছে—সুগন্ধ নাই; ভাষা আছে—দেববাণী সংস্কৃত নাই; ধর্ম্মগ্রন্থ আছে—বেদ ও উপনিষদ নাই; তর্কশাস্ত্র আছে—ষড়দর্শন নাই; জাতি আছে—ব্রাহ্মণ নাই; তীর্থ আছে—বারাণসী নাই। এ হেন ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের তুলনা সম্ভবে?" উল্লিখিত কথা কয়টী কত ভাবব্যঞ্জক!

মহেশচন্দ্র সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন; একান্ত গোঁড়ামি ভালবাসিতেন না। যখন এ দেশে সহবাস সম্মতি আইন সম্বন্ধে ঘোর আন্দোলন, তৎকালে তিনি "নব্য ভারত" মাসিক পত্রে 'সহবাস সম্মতি ও সমাজ' শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। উক্ত প্রবন্ধে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, চিন্তাশীলতা ও মনস্বীতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"আরতি" মাসিক পত্রিকায় 'প্রকৃতি-গ্রন্থপাঠ' শীর্ষক প্রবন্ধে মহেশচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দৃষ্ট হয়। উক্ত প্রবন্ধে তিনি দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও জ্যোতিষের আলোচনা করিয়াছেন। আরতিতে তিনি কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" উপন্যাসের যে নির্ভীক সমালোচনা করেন তাহা যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ তেমনই রসাত্মক।

মহেশচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম "আদর্শ কবি" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহার শেষ গ্রন্থ—"প্রবন্ধলহরী।" ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার কতিপয় প্রবন্ধ ও নূতন কয়েকটী সন্দর্ভ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের "প্রকৃতি-সুন্দরী" শীর্ষক সন্দর্ভটী প্রণয়ন সময়ে আমি তাহার সঙ্গে ছিলাম। সান্ধ্যভ্রমণ সময়ে উহা এক ঘণ্টায় লিখিত হইয়াছিল। উক্ত সন্দর্ভটী যে ভাষায় তিনি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই গম্ভীর ভাষাতেই তিনি অনর্গল বলিয়া গিয়াছিলেন; আমি পেন্সিলে লিখিয়া লইয়াছিলাম। সে দিন তাঁহার উপস্থিত অদ্ভুত রচনা-শক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, উপস্থিত রচনা-শক্তি ও তর্ক করিবার শক্তি তিনি কবিওয়ালাদিগের নিকট হইতে অনেকটা শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

মহেশচন্দ্রের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। একদা, তাঁহার ভবনে পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেরম্বনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত তাঁহার "জন্মান্তর" সম্বন্ধে বিচার হয়। পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হন নাই। অবশেষে পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "বৈষয়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রে এরূপ অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রায়ই দৃষ্ট হয় না।" মহেশচন্দ্র নিজে বলিয়াছেন "আমি দর্শনশাস্ত্রের কি জানি? ছিটা ফোটা যা' জানি তাহাই গুছাইয়া বলিয়া তর্ক করি।"

মহেশচন্দ্রের কয়েকটী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ "নব্যভারত" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি "বিবিধ সন্দর্ভ" নামক আর একখানা পুস্তক প্রণয়নের উপকরণ রাখিয়া গিয়াছেন।

সঙ্গীতে মহেশচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগ ছিল। তন্মধ্যে কবি গানেই তিনি সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তিনি অনেক সময় কবি গানের উত্তর প্রত্যুত্তর রচনা করিয়া দিতেন। তাঁহার প্রণীত "সঙ্গীত প্রেমাঞ্জলী" গ্রন্থেও তাঁহার কবিত্বের যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে।

কবি-গীতিকে আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রুচি সম্মত করণার্থ তিনি বহু অর্থব্যয়ে দুইটী সুপ্রসিদ্ধ কবির দলে পোষাক দান করিয়াছিলেন এবং কবিগীতির অন্যান্য আবশ্যক সংস্কার সাধন করতঃ তাঁহার উদ্দেশ্যের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। তদীয় সদ্দৃষ্টান্তের অনুকরণে ইদানীং প্রসিদ্ধ দল সমূহে পোষাকের প্রচলন হইয়াছে এবং আবশ্যক পরিবর্ত্তনও হইতেছে।

তিনি ভিন্ন ২ জেলা সমূহের শ্রেষ্ঠ কবিওয়ালাগণকে তাঁহার ভবনে আহ্বান করিয়া গান শুনিতেন।

আজীবন ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াও তিনি নৈতিক চরিত্র নির্ম্মল রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তদানীন্তন কালে, আঢ্য বংশের অধিকাংশ লোকেরা বিলাস-ব্যসনে নিমগ্ন থাকিতেন। অসংখ্য কু-লোক আসিয়া যুটীত। কিন্তু মহেশচন্দ্র কখনও সৎ-পথ হইতে পদস্খলিত হন নাই। তিনি কদাচ মাদক দ্রব্যের বশীভূত ছিলেন না। এমন্ কি জীবনে কখন ধূমপানও করেন নাই। চরিত্রহীন কু-লোক কখনও তাঁহার নিকট প্রশ্রয় পাইতনা। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও শিক্ষিত লোকদিগের যথেষ্ট সমাদর করিতেন। বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বাৎসরিক বৃত্তি দিতেন। বিচারে তাঁহার মনঃপূত হইলে তিনি পণ্ডিতের বৃত্তি দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়া দিতেন। দরিদ্র সাহিত্যসেবী ও তাঁহার নিকট যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইত। কবিবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র দাস মহাশয়কে তিনি এক সময় যথোচিত অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

আজ কয়েক বৎসর যাবতই মহেশচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। কতক কাল বায়ুর পীড়ায়, পরে অগ্নি-মান্দ্য রোগে ভুগিতে থাকেন। নানাবিধ চিকিৎসায় কোনও ফল না হওয়ায় তিনি স্বাস্থ্য লাভের আশায় বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। উহাতে ভগ্নস্বাস্থ্যের কথঞ্চিৎ উপকার দর্শিলেও অবশেষে নিদারুণ ক্যান্সার (Cancer) রোগে আক্রান্ত হইলেন। বাড়ীতে কয়েক মাস চিকিৎসার পর কোনও ফল না হওয়ায় তিনি চিকিৎসার্থ কলিকাতা গমন করেন। সেখানেও কোন ফল হইল না। অবশেষে এই দুরন্ত রোগেই তিনি ইহ জীবন পরিত্যাগ করিলেন।

মহেশচন্দ্রের পারিবারিক জীবন সুখের ছিল। তিনি কখনও প্রিয়জন-বিয়োগ জনিত শোক পান নাই। তিনি স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পৌত্রও দৌহিত্রাদিতে পরিবেষ্টিত ছিলেন। ভগবান সেই শোক-সন্তপ্ত পরিবারের শান্তি বিধান করুন্।

শ্রীরাজেন্দ্রকিশোর সেন।

শুভ-দৃষ্টি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(৫)

২০শে অগ্রহায়ণ। দিনের বেলায় আর শৈবালকে দেখিতে পাইলাম না। আফিস হইতে আসিয়া দেখি যথা স্থানে জল-খাবার রক্ষিত হইয়াছে। পঁচাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—তোর দিদি কোথা রে?" সে দৌড়িয়া দিদিকে ডাকিতে গেল; আমি বড়ই গোলে পড়িলাম। মনে মনে স্থির করিলাম, যদি শৈবাল আসিয়াই উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে মিষ্ট দু চারিটী সদুপদেশ প্রদান করিব এবং কাল এত রাত্রিতে কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসা করিব।

আমি এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময় শৈবালের মা আসিয়া আমাকে বলিলেন—"যোগেশ, তুমি একবার ভিতর কোঠায় এস দেখি, শৈবালের অসুখ করেছে, দুপুরে কিছু খায়নি।"

কর্ত্তা তখনও অফিস হইতে আসেন নাই। আমি কর্ত্রী ঠাকুরাণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাড়ীর ভিতরে গেলাম।

শৈবাল কম্বল গায়েদিয়া শুইয়া আছে। আমি নিকটে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—শৈবাল তোমার কি হইয়াছে?

শৈবাল কোন উত্তর করিল না।

গৃহিণী শৈবালের বাম হাতখানা ধরিয়া আমার হাতে রাখিয়া বলিলেন—"নাড়ী ধরিয়া দেখ দেখি।"

আমার বক্ষে ঘন ঘন স্পন্দন হইতে লাগিল। আমি বলিলাম—"আমার নাড়ী জ্ঞান নাই।" শৈবাল হাত টানিয়া লইল। শৈবাল যেন কাঁদ কাঁদ অবস্থায় পাশ ফিরিয়া শুইল। তাহার অসুখ বুঝিতে আমার বাকী রহিল না।

যে যেমনটী চায়, ঠিক তেমনটী নাপাইলে অসন্তুষ্ট হয়। আমি শৈবালের হাত পরীক্ষা করিলাম না, দেখিয়া গৃহিণী কিছু অসন্তুষ্ট হইলেন। কাহাকেও অসন্তুষ্ট করাটা আমার আদৌ ইচ্ছা নহে। আমি মনোভাব যথাসম্ভব পরিবর্ত্তন করিয়া শৈবালের কপাল ধরিয়া দেখিলাম। অভিমানে শৈবাল কপাল সরাইয়া নিল বটে, কিন্তু আমি একটা ঔষধ ব্যবস্থা করিতে ছাড়িলামনা। আমি গৃহিণীর

মনস্তুষ্টি বিধান জন্য আমার কামরায় আসিয়া measure glassএ হোমিওপ্যাথির এক ডোজ লইয়া নিয়া শৈবালকে দিলাম। গৃহিণী বলিলেন—"খেয়ে ফেল।"

শৈবাল ঔষধের কি ব্যবস্থা করিল, তাহার তদন্ত করা আর আবশ্যক মনে করিলাম না।

সন্ধ্যার পর বসিয়াছিলাম। কি যেন কি একটা অভাব বোধ হইতেছিল। প্রতিদিন এই সময় শৈবালের ব্রহ্মসঙ্গীত যেন মনের সকল অভাব অভিযোগ পূরণ করিত। বসিয়া তাহাই ভাবিতেছিলাম, এমন সময় চণ্ডী বাবু আসিয়া ডাকিলেন, আমি তাড়া তাড়ি উঠিয়া আসিলাম। তাঁহার সেই সরল কৈফিয়ত—"দেওয়ানীতে একটা বড় complicated case নিয়ে একেবারে রাত হইয়া গেল। একটু এস দেখি, শৈবালের অসুখ হইয়াছে।"

আমি বলিলাম "ও কিছু নয়; দু'পরে কিছু খায়নি, পিত্ত বেড়ে অসুখ হ'য়েছে, এখন কিছু খেলেই সেরে যাবে।

আমার কথায় চণ্ডীবাবুর মনে শান্তি আসিলনা। তিনি বাড়ীর সকল লোক একত্র করিলেন।

তাঁহার বাড়ীতে লোকের অভাব নাই। তিনি বহু লোকের অন্ন যোগাইয়া থাকেন। ১০।১২ টী দরিদ্র স্কুলের ছাত্র, ৪।৫ টী আশ্রয়হীন অল্পবেতন-ভোগী আফিসের কর্ম্মচারি, একজন ডাক্তার, একজন কবিরাজ, এতদ্ব্যতীত দরিদ্র মক্কেল ও উপরি লোকেরত অভাব নাই। তখন যাহারা বাসায় ছিলেন সকলকে ডাকাইয়া তিনি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে বসিলেন। শেষ— রজনী ডাক্তারের নিকট তাড়াতাড়ি গাড়ী পাঠানই ঠিক হইল। আমি দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়া রহিলাম।

দুটী স্কুলের ছেলে গাড়ী লইয়া ডাক্তার আনিতে গেল। আমাকে শৈবালের নিকট বসিতে বলিয়া চণ্ডীবাবু হাত মুখ ধুইতে গেলেন। আমি অনিচ্ছা সত্বেও শৈবালের নিকট বসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"শৈবাল তোমার এখন কেমন বোধ হইতেছে?"

শৈবাল মুখ গুজিয়া কাঁদিতে লাগিল—কি সর্ব্বনাশ ফুঁফাইতে ফুঁফাইতে শৈবাল বলিল "কেন আপনি আমাকে অবিশ্বাস করিলেন?"

আমার বুক দুর দুর করিয়া স্পন্দিত হইতেছিল। একটুক সামলাইয়া বলিলাম—"শৈবাল আমি তোমাকে অবিশ্বাস করিনাই। তুমি যদি সেরূপ কিছু বুঝিয়া থাক, তবে তাহা সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়াছ। আমি আজই সন্ধ্যার সময়ে সেকথা তোমাকে বুঝাইয়া বলিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমার অসুখ, তাই চেষ্টা করিয়াও তোমাকে বলিতে পারিনাই। আমার কথায় ও আচরণে মনে আঘাত পাইয়া থাকিলে ক্ষমা কর। আমি কাহারও মনে আঘাত দিতে চেষ্টা করিনা। কেবল আত্মরক্ষাই আমার উদ্দেশ্যছিল।"

শৈবাল চোখ মুখ মুছিয়া বলিল—"তবে এখন বলুন; আপনি আমাকে কাল কেন তাড়াইয়া দিয়াছিলেন?"

বিষম অভিযোগ। আমার বুকের ভিতর যেন কে হাতুরি পিটাইতেছিল। আমি মনে প্রাণে ভগবানের নাম জপিতেছিলাম এবং বলিতেছিলাম—"হে ভগবান তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

শৈবালের অভিযোগ শুনিয়া আমি বলিলাম—"ছি শৈবাল, আমি কি তোমাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলাম। তুমি নিজ হইতেইত চলিয়া আসিয়াছিলে।"

"শৈবাল—সেকি আপনার অবহেলার ইঙ্গিতে নহে?"

কথায় কথা বাড়ে। আমার এইরূপ কথোপকথনের আদৌ ইচ্ছা ছিলনা, সুতরাং আমি হার মানিতে বাধ্য হইলাম। আমি তর্কের উপসংহার মনস্থ করিয়া বলিলাম—"তুমি সুস্থ হও,আমি কাল সকল কথা তোমাকে বুঝাইয়া বলিব।

শৈবাল বলিল—"আপনি আজ না বলিলেআজ রাত্র আমার অসুখ বৃদ্ধি হইবে।"

আমি বলিলাম—"উপায় নাই।"

এই সময় চণ্ডীবাবু আসিলেন। ছেলেরা আসিয়া বলিল—ডাক্তার বাবু আসিয়াছেন।

ডাক্তার আসিয়া যথারীতি—Prescription করিয়া চলিয়া গেল।

আহারের পর চণ্ডী বাবু বলিলেন "চল আমরা শৈবালের নিকট বসিয়াই গল্প করি।" আচ্ছা বলিয়া আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। তিনি বলিলেন

"শৈবালের অসুখে বড়ই অসুখ বোধ হচ্চে। সন্ধ্যার পর কেমন ধাত হইয়াছে যোগেশ, একটু ভগবানের নাম না হ'লে যেন প্রাণটা খালি খালি বোধ হয়।"

চণ্ডীবাবুর এই মন্তব্যে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। বিশেষ আমিই বর্ত্তমান ব্যাপারে অপরাধী. আমার পক্ষে শৈবালের মানসিক ভাব পরিবর্ত্তনের সাহায্য করা কর্ত্তব্য মনে করিয়া আগ্রহের সহিত বলিলাম—"শৈবালের সঙ্গীত আমি ভুলিতে পারিব না। শিলং ছিলাম সেখানেও তাহার গান যেন কাণে সর্ব্বদাই বাজিত। কি মধুর সুর।" আমার প্রশংসা কীর্ত্তনে শৈবালের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি কেবল মুখেই বলেন—"

আমি বলিলাম—"সেকি শৈবাল, আমি কি তোমার সঙ্গীতের একজন নিয়মিত শ্রোতা নই?"

শৈবাল—"আপনি ঘর হইতে বাহির হন না বলিয়া, আমার গান শুনেন।"

আমি—"তোমার গান শুনিয়া অপরিসীম আনন্দ পাই বলিয়াই বাহির হই না।"

শৈবাল—"নিশ্চয়ই না।"

আমি বলিলাম—"তবে আর উপায় নাই।"

শৈবাল—"তবে আপনি আমার চিঠি গুলির উত্তর দেন নাই কেন?

আমি—"সে পৃথক কথা।"

চণ্ডীবাবু হাসিয়া বলিলেন "তুমি আমার দুই খানা চিঠি ও হজম করেছ।"

আমি—"আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমার চিঠি লিখিবার অভ্যাস নাই, কাহাকেও লিখি নাই।"

চণ্ডীবাবু—"তবে তোমার নিজের কাজ কর্ম্ম চলে কেমন করে? বন্ধু বান্ধব রাখতে হলে এসব কি চাই না? ভদ্রতা বিসর্জ্জন করিলে চলিবে কেন?"

আমি—"সংসারে বন্ধু বান্ধবের দায় রাখি না। বাড়ী ঘরেরও দায় রাখি না। আত্মা, অর্থ ও চাকুরী এই তিন দায় লইয়াই আপাততঃ চলিতেছি। আত্মার অবমাননা করিতে নাই, অর্থ ব্যতীত সংসারে স্থান নাই, আমার পক্ষে চাকুরী ব্যতীত অর্থ নাই—তাই এ তিনটী রাখিয়াছি।"

শৈবাল হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া আমার হাত টানিয়া লইয়া বলিল—"দেখি, আপনার হাত দেখি?"

চণ্ডীবাবু বলিলেন—"শৈবাল "হাত দেখা" পুঁথি পড়ে সামুদ্রিক শিখেছে। সে সকলেরই অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবনের অনেক ঘটনা বলিয়া দিতে পারে।"

হাত দেখিয়া শৈবাল আমার গত জীবনের অনেক ঘটনা বলিয়া যাইতে লাগিল। আমি শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। চণ্ডীবাবু গণনা মিলিতেছে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। আমি অনেক কথার উত্তর দিলাম, অনেক দিলাম না, শেষ বেগতিক দেখিয়া হাত টানিয়া লইয়া বলিলাম—"আজ থাক।"

শৈবাল আগ্রহের সহিত বলিল "কাল প্রাতে ভাল করিয়া আপনার হাত দেখিব।"

চণ্ডীবাবু আমাকে বলিলেন—"রাত্রি অধিক হইয়াছে এখন ঘুমাইতে যাও।" আমি চলিয়া আসিলাম।

শৈবাল ডাকিয়া বলিল—"কাল হাত ধুইবার পূর্ব্বে আমি আপনার হাত দেখিব। হাত ধুইবেন না কিন্তু।"

২১শে অগ্রহায়ণ। প্রতি দিনই অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গে। আজ উঠিয়া দেখি শৈবাল আমার বিছানার পার্শ্বে বসিয়া আছে। আমি বড়ই বিরক্ত হইয়া বলিলাম—"শৈবাল তোমার একটু বিবেচনা নাই, এত সকালে এখানে আসা তোমার উচিত হইয়াছে কি? তুমিতো শিশু নও, তোমার মা বাপ দেখ্‌লে কি মনে করবেন?"

"আমি মাকে না বলে এখানে আসিয়াছি—আপনার কি এই বিশ্বাস?" গম্ভীর স্বরে শৈবাল এই কথাটী বলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আমি হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। ধীরে ধীরে বলিলাম—"তবে কি তোমার মা বাপ জানেন যে তুমি এই রাত থাকতে আমার ঘরে আসিয়াছ?"

শৈবাল ছল্‌ছল্‌ নেত্রে বলিল—"আপনার কি বিশ্বাস?"

আমি বলিলাম—"তুমি না বলিলে আমি কেমন করিয়া জানিব।"

শৈবাল—"সেদিন আপনি আমাকে কষ্ট দিয়াছেন আজও কি আপনি সেরূপ ব্যবস্থাই করিবেন?"

আমি বলিলাম—"তুমি এত বড় মেয়ে পিতা মাতার অজ্ঞাতে এইরূপ যথেচ্ছা চলিলে, আমি সেরূপ ব্যবস্থা করিব তাতে আর বিচিত্র কি?"

শৈবাল—"আপনি কি আমাকে সেইরূপ মনে করেন?"

আমি রুক্ষ স্বরে বলিয়া উঠিলাম—এত কথা বলিবার ও শুনিবার সময় নাই। তুমি এখন চলিয়া যাও নতুবা আমিই তোমাদের গৃহ ত্যাগ করিব।

শৈবাল হঠাৎ আমার পায়ে ধরিয়া বলিল—"আমায় ক্ষমা করুন, আমাকে এরূপ সন্দেহ করিয়া আমার প্রাণে আঘাত দিবেন না। আমি পরীক্ষা দিয়া, প্রমাণ করিয়া আপনার নিকট বিশ্বাসী হইতে চাই না।"

শৈবালের কর স্পর্শে আমার পা হইতে মাথায় যেন একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটীয়া গেল।

আমি রুক্ষ স্বরে বলিলাম—"তুমি এখনি চলিয়া যাও।"

শৈবাল দৃঢ়স্বরে বলিল—"আমি যাইব না। আপনি ভ্রম করিয়াছেন।"

আমি বলিলাম—"তবে আমিই চলিলাম।"

আমি দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেলাম।

ক্রমশঃ।

গারো পল্লিতে একদিন।

রাজ কার্য্যে আদিষ্ট হইয়া আমাদিগকে একবার কতকদিনের জন্য দুর্গাপুর থাকিতে হয়। দুর্গাপুর সুসঙ্গ পরগনার সম্মানিত রাজাদিগের রাজধানী। সুসঙ্গ ময়মনসিংহ জেলার উত্তর সীমানায় অবস্থিত। সেখানে অনেকগুলি পাহাড় আছে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে সুসঙ্গের মহা রাজারই খাসদখলে ছিল। সে পাহাড়ে রাজাদিগের হাতীধরার খেদা ছিল; প্রতি বৎসর বহু হস্তী ধৃত হইত। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ১৮৬৯ সনে Hill Act পাস করতঃ উক্ত পাহাড়গুলি সুসঙ্গ রাজের হস্তচ্যুত করিয়া খাস করিয়া লইয়াছেন। পাহাড় গুলি গারো পাহাড়ের সংলগ্ন। গারো হিল জেলার ও ময়মনসিংহ জেলার সীমান্ত চিহ্ন এলোমেলো ভাবে উভয় পাহাড়ের মধ্য দিয়া সংস্থাপিত হইয়াছে। সেই সীমান্ত চিহ্ন। দুর্গাপুর রাজভবন হইতে ৬। ৭ মাইল অন্তর উত্তরে অবস্থিত। দুর্গাপুরের চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী প্রজাদিগের মধ্যে গারো এবং হাজঙ্গের (হাইজঙ্গের) সংখ্যাই অধিক। হাজঙ্গগণ সাধারণত সমতলক্ষেত্রে বাস করে, গারোদিগের অধিকাংশেরই বাসস্থান উচ্চ উচ্চ টিপির উপর। কোন কোন স্থানে বৃক্ষের উপরেও দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা সন্ধ্যার প্রাকালে দুর্গাপুরে পহুছিয়াছিলাম। আষাঢ় মাস। প্রাবৃট লক্ষীর ঘন জলধর সমাচ্ছন্ন সান্ধ্য গগন ক্রোড়ে নিবিড় ঘন তরুরাজি সমন্বিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পাদ দেশে ক্ষুদ্র রাজধানী খানা বড়ই মনোরম দেখাইতেছিল। রাজধানীর পাদ প্রক্ষালন করিয়া পার্ব্বতী সোমেশ্বরী তরঙ্গ ভঙ্গে অঙ্গ দোলাইয়া প্রবাহিত হইতেছিল। সাহেবেরা (মাজিষ্ট্রেট, পুলিস ও ডাক্তার সাহেব প্রভৃতি) এ পারেই রহিলেন। আমরা নদী পার হইয়া রাজধানীর ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিলাম। বর্ষায় সোমেশ্বরীর স্রোত বড়ই প্রবল হয়। তাই এখানে তখন কোন নৌকার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে না। কোন্দা নৌকাই এখানকার প্রচলিত স্রোতযান। বড় বড় গাছের এক একটী বাকল দ্বারা এক এক একটী কোন্দা প্রস্তুত হয়। গারো এবং অন্যান্য পার্ব্বতীয় জাতি ইহার পরিচালন

কার্য্যে বড়ই অভ্যস্থ। চারিটী কোন্দা একত্র বাঁধিয়া তাহার উপর তক্তার পাটাতন আঁটীয়া আমাদের পারাপারের জন্য এক খেয়া প্রস্তত করা হইয়াছিল।

পরদিন আমরা আমাদিগের নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্য সম্পাদনে তৎপর হইলাম। মহা ঘটা পড়িয়া গেল। রাজধানীতে হস্তীর অভাব নাই। রত্নমালা মণি মাণিক্য খচিত করি পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আমরা বিদ্রোহী দমনে অভিযান করিলাম। শূন্য-পৃষ্ঠ কতকগুলি হস্তীও আমাদিগের অনুসরণ করিল। আমরা পাহাড়ের পর পাহাড়, গ্রামের পর গ্রাম পার হইয়া চলিলাম। সাহেবেরা ইত্যব সরেই তহোদের স্ব স্ব গুণপনার পরিচয় দিতে ক্রটী করেন নাই। দুইটী শৃগাল শিশুকে অনায়াসেই বধ করিতে সমর্থ হইলেন।

গারো স্ত্রী ও পুরুষ।

দ্বিপ্রহরের কিছুপুর্ব্বে আমরা আসিয়া এক গারোর টঙ্গে (বাড়িতে) অতিথি হইলাম। মহারাজার বন্দোবস্ত গুণেই আমাদের কোন বিষয়ে কোন অসুখ হইতে পারে নাই। আমাদের পঁহুছিবার পূর্ব্বেই গারো ও অন্যান্য অধিবাসিরা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। গারোরা মহারাজকে দেখিয়া যথেষ্ট সম্ভ্রম সূচক অভিবাদনাদি করিল। সাহেব অন্যান্যের প্রতি যেন তাহারা ভ্রুক্ষেপই করিল না। গ্রামের বা দেশের যাহারা প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছে, তাহারাই সাহেবের সহিত অগ্রসর হইয়া আলাপ করিল। তাহাদের সহিত কথা বার্ত্তায় বুঝিলাম, তাহারা নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অকাতরে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা এমন কি নরহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অসৎ পথ অবলম্বন প্রয়াসী হইলেও তাহারা সরল বিশ্বাসের সহিত সকল কার্য্য করিয়া থাকে, কৌশলে ও মিথ্যার প্রশ্রয় দেয় না।

গারো জাতি রাজ ভক্ত। সে ভক্তি ভাবে,ভয়ে নয়। ভয় তাহাদের মনে একেবারেই নাই।

গারো দিগের বাস স্থান গুলি বড়ই অপরিষ্কার। তাহারা ঘরে টং বা মাচা বাধিয়া দোতলার উপর বাস করে। নিচে অপরিস্কার জঙ্গল, তাহাতে তাহাদের ভ্রূক্ষেপও নাই। ঘর গুলি ও অপরিস্কার এবং বায়ু গমনা গমনের পথ শূন্য।

বৃক্ষোপরি গৃহ গুলি যেন অরণ্যচর কোন মহাপ্রাণীর গৃহ বলিয়া মনে হয়। পর্ব্বতের নিম্নদেশ হইতে উত্থিত কোন বৃক্ষের সমান্তরাল কাণ্ডে পর্ব্বত গাত্র হইতে বংশ দণ্ড পাতিত করিয়া মঞ্চ প্রস্তুত করতঃ তাহার উপরে ছনের চাল ও চতুস্পার্শ্বে দরমার বেড়া আঁটিয়া স্বর্গরাজ্যে যেন একটী ক্ষুদ্র জীব নিবাস বাঁধিয়া লয়। অরণ্যচর হিংস্রক জন্তুদিগের উপদ্রবেই না কি তাহাদিগকে এরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়।

গারোদিগের মধ্যে একতা এবং একপ্রাণতার অভাব নাই। উহারা বাঙ্গালীর ন্যায় স্ব স্ব প্রধান নহে। সমাজের মধ্যে এক জনের উপর প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়া অপর সকলে নিরাপদে থাকিতে ভালবাসে। "নখম" বা প্রধান ব্যক্তি যাহা করিবে, তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকে না। সামাজিক শাসন সংরক্ষণের ভারও তাহাদের হস্তেই ন্যস্ত থাকে।

সে দিন সেই মহারণ্যের মধ্যে, সমাজের অধস্তন অসভ্য বর্ব্বর জাতি হইতে রাজপুরুষেরা যে সৎসাহস, একপ্রাণতা ও নির্ভীকতার পরিচয় পাইয়া আসিয়াছিলেন, পরাধীন ভারতের কোন জাতি হইতেই রাজপুরুষ ইংরেজ এইরূপ ব্যবহার পাইতে প্রত্যাশা করিতে পারেন না।

তাহাদের সরল বিশ্বাসের নিকট আমাদের রাজনীতির কুটসূত্রগুলি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। বিদ্রোহীদিগকে পাঁচ দিবসের জন্য চিন্তা করিতে অবকাশ দিয়া আমরা রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

গারো জাতির বাস গৃহ।

পর দিন প্রাবৃটলক্ষ্মী গড়াইয়া পড়িলেন। ঘোর ঘনঘটায় জগন্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া বারিপাত হইতে লাগিল। বিশ্বগ্রাসী আহবে সোমেশ্বরী গর্জ্জন করিয়া উঠিল। উশৃঙ্খল জল কল্লোল দেখিতে দেখিতে তট রেখা অতিক্রম করিয়া রাজধানীর উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিল। আমরা ভয়ে ভয়ে মরিয়া হইয়া রহিলাম। ভয় হইয়াছিল বটে কিন্তু সেই ভয়ের পার্শ্বেই যে একটা অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য ও কৌতুহল মনোমধ্যে জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা অতীব মনোরম।

দুই দিন অবিশ্রান্ত বর্ষণের পর বারিপাত বন্ধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে সোমেশ্বরীর বিশ্বগ্রাসী মূর্ত্তী ও অন্তর্হত হইল। আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে গারোপ্রতিনিধিরা আসিয়া রাজধানীতে সমবেত হইল। কিন্তু সে দিন ও বিশেষ কিছুই হইল না। আরও কয়েক দিনের সময় দেওয়া হইল।

ইত্যবসরে আমরা আমাদের সুদীর্ঘ দিবস গুলির একটা সদ্ব্যবহারের অনুষ্ঠান করিলাম। পাহাড় পরিভ্রমণ এবং গারোদিগের সামাজিক আচার ব্যবহার ও আভ্যন্তরিণ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার বাসনা বড়ই বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। তদনুসারে ব্যবস্থা করিয়া তৎকার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। এইরূপে এক এক দিন, এক এক দিক করিয়া আমাদের কার্য্য সমাধা করিতে লাগিলাম।

এক দিন আমরা লস্কর ভঙ্গের কুঠী দেখিতে চলিলাম। ভঙ্গ, গারোদিগের বিচারক। তাহার কুঠি গারোহিল জেলায় অবস্থিত, দুর্গাপুর হইতে ৮ মাইল উঃ পঃ কোণে। ৫।৬ মাইল চলিয়াই আমরা ময়মনসিংহ জেলার সীমানা অতিক্রম করিলাম।

আমরা ভঙ্গের বাজারে উপনীত হইলাম। আমাদের সৌভাগ্য বশত সে দিন হাট বার ছিল। বাজারে প্রবেশ করিয়া আমাদের আকবরসাহের মোহিনীমেলার প্রসঙ্গ মনে পড়িল। গারোবালিকা এবং যুবতীতে বাজার খানা ভরপূর। যুবতী বিক্রয় করিতেছে, বালিকা ক্রয় করিতেছে। বালিকা বিক্রয় করিতেছে, যুবতী ক্রয় করিতেছে; যেন এ গিরি-প্রাচীর অভ্যন্তরে আসিয়া এক অভিনব স্বর্গীয় স্বাধীনতা শিক্ষা সভ্যতা ও স্ত্রী স্বাধীনতার লীলাভূমি বৃটনের স্বাধীনতা কে ধিক্কার দিয়া এক অভিনব স্ত্রী স্বাধীনতায় রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছে।

ভঙ্গের হাটে প্রধানত গারোদিগের শিল্পজাত ও কৃষিজাত জিনিসই বিক্রীত হয়। তাহাদের কৃষিজাত জিনিসের মধ্যে ধান, চাউল, কলাই, মাকাজুন্, চিংড়া, ফুটী, আলু, তরমুজ ইত্যাদিই প্রধান। শিল্পজাত জিনিস—কাপড়, ছালা, কাপড়ের থলি, বাঁশের দরমা, বেতের জিনিস ইত্যাদি। গারো দিগের প্রস্তুত কাপড় তাহাদেরই পরিবার উপযুক্ত। ঠিক বিলাতি টিকনের ন্যায় শক্ত, বহর ১ হস্ত অপেক্ষা অধিক সাধারনতঃ হয় না। ইহাই তাহাদিগের একমাত্র লজ্জা নিবারণ পক্ষে সাহায্য করিয়া থাকে। ঐ বস্ত্র খণ্ড পুরুষগণ নেংটার ন্যায় ব্যবহার করে এবং রমণীগণ নাভীর নিম্নে কটীদেশের চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া পরিধান করে। উহা রমণীগণের জানু স্পর্শ করিতে কদাপি অধিকারী। তাহারা অন্যান্য অঙ্গে প্রায় কোন প্রকার বস্ত্র ব্যবহার করে না। তাহাতে সাক্ষাৎ কালে আমরাই লজ্জা বোধ করিলাম বটে কিন্তু তাহারা অনুমাত্রও লজ্জিত বা সঙ্কোচিত হইল না। কোন রমণী তাহার স্তন্যপায়ী শিশুটীকে পৃথক বস্ত্রখণ্ডে আবৃত করিয়া স্বীয় বক্ষস্থলে বন্ধন করত স্তন পান করাইতে করাইতে পয়সা হস্তে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। কেহ বা নিদ্রামগ্ন শিশুকে পৃষ্ঠদেশে রক্ষা করিয়া খরিদ বিক্রিতে নিযুক্ত।

এই স্ত্রীলোক গুলি হাট করিয়া যখন বক্ষস্থলে সন্তান বাঁধিয়া পৃষ্ঠে বোঝাই মোট লইয়া উর্দ্ধে পর্ব্বত গাত্রে আরোহণ করে তখন সে দৃশ্য দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

বাজারে পশু পক্ষী ও যথেষ্ট বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত ছিল। তাহাদের মধ্যে হরিণ, শূকর, ময়ুর, ময়না, মদনা, টীয়া প্রভৃতিরই আমদানি অধিক। এই সমস্ত পশু পক্ষী প্রায়ই বৈদেশিক ক্রয়কারী দিগের নিকট বিক্রীত হইয়া থাকে। গারো দিগের প্রস্তুতি বেত্ত এবং বাঁশের জিনিস বড়ই শক্ত এবং মনোরম। অনেক বৈদেশিক ক্রেতা ভঙ্গের হাটে বেত্ত বাঁশ তুলা প্রভৃতি ক্রয় করিতে আসিয়া থাকে।

গারোদিগের নিজ ব্যবহারের জিনিস তাহারা নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া লয়। তাহাদিগের প্রধান খাদ্য চাউল; তাহাও নিজেরাই কৃষিকার্য্য দ্বারা উৎপন্ন করিয়া লয়। যে পরিবারে কর্ম্মক্ষম পুরুষ লোকের অভাব বা অন্য কোন প্রতিকূল কারণে কোন বিষয় সংগ্রহ করিতে অক্ষম, তাহারা এক জিনিস বিক্রয় করিয়া তৎমূল্যে অন্য জিনিস ক্রয় করিয়া লয়।

গারোদিগের পুরুষেরা হল চালনা, শীকার এবং কাষ্ঠ সংগ্রহ ইত্যাদি পুরুষোচিত কার্য্য করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা গৃহকার্য্য করিয়া অবসরক্রমে পুরুষদিগের সাহায্য করিয়া থাকে। এমন কি হল চালনায়ও তাহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে দেখা যায়।

বাজারে উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে পঁচা মৎস্যের আমদানিই খুব বেশী। যে কোন স্থানের অবিক্রীত মৎস্য, বিক্রেতারা পঁচাইয়া ভঙ্গের হাটে বিক্রয় করিতে লইয়া যায়। পঁচা মৎস্য গারোদিগের বড়ই প্রিয়। যে কোন খাদ্য দ্রব্য তাহারা পঁচাইয়া খাইতে ভালবাসে।

গল্পচ্ছলে বর্ত্তমান মহারাজা বাহাদুরের নিকট শুনিয়াছি, স্বর্গীয় মহারাজা দিগের খেদায় বাহির হইবার দিনে রাজবাড়ীতে গারোদিগের একটা প্রকাণ্ড রকমের ভোজ হইত, সেই ভোজের পূর্ব্ব হইতে মৎস্য এবং হরিণ, ছাগ প্রভৃতির মাংস সংগ্রহ করিয়া তাহা পঁচাইয়া রাখা হইত। ভোজেরদিনে ঐ সমস্ত পঁচা মৎস্য এবং মাংস প্রচুর লঙ্কাসংযোগে অর্দ্ধ পক্ক অবস্থায় খাইয়া তাহারা বড়ই সন্তুষ্ট হইত। মধ্যে মধ্যে তাজা মৎস্যের ব্যঞ্জন দেওয়া হইত বটে কিন্তু তাহা তাহারা বড় পছন্দ করিত না। সেই পঁচা মৎস্যের দুর্গন্ধ সত্বর আমাদিগকে বাজার ছাড়িতে বাধ্য করিল। আমরা ভঙ্গের কুঠীতে উপস্থিত হইলাম।

ভঙ্গের গৃহে উপস্থিত হইয়া জানিলাম। লস্করভঙ্গ আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাজধানীতে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার জামাতা গৃহে উপস্থিত ছিল। আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। তাঁহার বিশাল দ্বিতল আটচালায় আমাদেরা বিশ্রাম স্থান নির্দ্ধারিত হইল।

গৃহটী বেশ পরিস্কার। হলটা খুব প্রসস্ত। চতুর্দ্দিকে আয়নার জানালা। প্রতি থামে থামে হরিণ-শৃঙ্গ এবং তদুপরি আর্টষ্টুডিয়োর সুরঞ্জিত দেবদেবীর চিত্র।

আমরা হলে প্রবেশ করিলাম। লস্করের যুবতী কন্যা তাহার স্বাভাবিক উলঙ্গদেহ লইয়া আসিয়া আমাদের তীক্ষ্ণ আগ্রহ দৃষ্টিকে সঙ্কোচিত করিয়া দিল ; আমরা দৃষ্টি অবনত করিলাম। হলের ভিতরের আসবাব পত্র অতি সামান্য, একখানা টেবিল, খান কয়েক চেয়ার ও এক খানা লোহখাট। জানিলাম, এ ঘর তাহাদের ব্যবহার জন্য নহে। দেখিলাম, অন্যান্য সাধারণ গারো-দিগেরন্যায় তাহাদেরও টংবা চাঙ্গ পূর্ব্ব কথিত রূপে অতি সামান্যভাবে নির্ম্মিত।

সেই স্বভাব সুন্দরী বন বালিকা আমাদের জন্য সহস্তে তাম্বুল চয়ণ করিয়া আনয়ন করিল। একখানা রিকাবিতে প্রদত্ত হইল। পান আস্ত, সুপারি অর্দ্ধকাটা চুনপাত্র বারিবিহীনে বিদীর্ণ-বক্ষ। আমরা যথা সম্ভব যত্নে সেই অপ্রত্যাশিত উপঢৌকন গ্রহণ করিলাম ও বিমল আনন্দে চর্ব্বণ করিতে লাগিলাম। এদিকে লস্কর জামাতা তামাকু লইয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন। কেহ কেহ তাহারও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে ইতস্ততঃ করিলেন না।

এই স্থানে আমরা বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া গারো-দিগের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি সম্বন্ধে অনেক কৌতুহলাবহ গল্প শুনিয়া সেদিনের জন্য বিদায় হইলাম।

বিবাহ পণে বালিকার আত্মবলি।

আমাদের হিন্দুসমাজে যে সমুদয় অশাস্ত্রীয় কদাচার অহরহ জনগণের হৃদয় শোণিত পান করিতেছে, তাহাদের মধ্যে বিবাহে পণ গ্রহণ প্রথাই বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ, বিকট দর্শন! ইহার ঘোর পীড়নে, নিদারুণ শোষণে কত শত গৃহ যে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে পীড়িত হইয়াছে ও হইতেছে, কত শান্তিময় সংসার অশান্তির আলয় হইতেছে, কত কত নর নারী দুর্ব্বিসহ ঋণভারে অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। চক্ষের উপরই আমরা সর্ব্বদা ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। নাট্যকারের লেখনী এ প্রথার বিরুদ্ধে অগ্নি উদ্গীরণ করিয়াছে, নাট্যশালার কসাই সদৃশ বরের পিতায় অভিনয়ে দর্শক বর্গ ছি ছি করিয়াছেন, সংবাদ ও সাময়িক পত্রের স্তম্ভ ইহার অনিষ্টকারিতা বিষয়ক প্রবন্ধে পূর্ণ হইয়াছে, বক্তা ইহার বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে এ প্রথার কেশাগ্রও কম্পিত হয় নাই ; দিন দিনই ইহার প্রভাব, ইহার অত্যাচার বাড়িয়াই যাইতেছে। এই দীন লেখক কর্ত্তৃকও "মানসী" পত্রিকার স্তম্ভে এই গুরুতর সামাজিক সমস্যার সমাধান কল্পে ইহার অনিষ্ট কারিতা প্রদর্শিত হইয়াছে ; কিন্তু আসলে ঐ সব উপায় ব্যর্থই হইয়াছে! তাহা না হইলে

স্বর্গীয়া কুমারী স্নেহলতা।

আজ এই কুমারীর আত্ম-বলিদানের মর্ম্মান্তিক সংবাদ আমাদিগকে শুনিতে হইত না! ভগবতীর অংশভূতা কুমারী রক্তে আজ বঙ্গভূমি কলুষিত হইত না বাঙ্গালী হিন্দুর মুখে এই চিরস্থায়ী কলঙ্ক কালিমা লিপ্ত হইত না! চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কুমারী স্নেহলতা যখন দেখিল তাহার বিবাহের ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য তাহার স্নেহময় পিতা উদ্ভ্রান্ত হইতে চলিয়াছেন, তাহার বিবাহের চিন্তায় তাহার পরম ভক্তি ভাজন পিতৃদেবের মুখমণ্ডল মসী মলিন, তখন সে পিতা মাতার মঙ্গলের জন্য, তাঁহাদিগকে

স্বীয় পৈত্রিক আবাসে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য, পিতাকে স্বীয় বিবাহ দায় মুক্ত করিতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইল! তাহার ভাবী শ্বশুরের অর্থ লালসার প্রতি ঘৃণায় সে তাহার অমূল্য জীবন স্বহস্তে সমাজের এই কুপ্রথার পায়ে বলিদান দিল! হিন্দু সমাজ হিন্দু সাধনা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, ত্যাগের পবিত্র মন্ত্রের পরিবর্ত্তে ভোগের দাসত্ব স্বীকার করিয়া আজ ব্রাহ্মণ কুমারীর হত্যাপরাধে পাতকী হইলেন! ইহাপেক্ষা লজ্জা, ইহাপেক্ষা পরিতাপ, ইহার চেয়ে অধঃপতন আর আছে কিনা জানিনা!

শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিগণও যে এই প্রথার দাসত্ব হইতে মুক্ত নহেন, তাঁহারাও যে একটি চাপরাস বাঁধা পাত্রের পশ্চাতে দশজন দাঁড়াইয়া নিলামের ডাক চড়াইতে থাকেন, আর বরের পিতা একজনকে কথা দিয়াও তাহার পর উচ্চতর প্রলোভনে সে প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করিয়াছেন এইরূপ ব্যাপার হিন্দু সমাজে বিরল নহে। এইরূপ একটা ব্যাপার লইয়া দুই বৎসর পূর্ব্বে 'নায়ক' পত্রে অনেক পত্র কাটাকাটিও হইয়াছে। স্থাবর সম্পত্তি হীন, মধ্যবর্ত্তী অবস্থার এক ভদ্রলোকের এফ এ, পাশ পুত্রের ডাক ২২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিলে তিনি "খতম্" করেন নাই এরূপ ঘটনাও জানি সুতরাং শিক্ষিতদিগের কথা আর কি বলিব?

যতই কন্যাকর্ত্তাগণ সমাজের ভয়ে এই সব জলৌকা সদৃশ বর পক্ষগণকে স্বীয় শরীরের রক্ত শোষণ করিতে দিতেছেন, ইহাদের রক্ত পিপাসা ততই বাড়িয়া যাইতেছে। যাঁহার ঘরের চালে খড় নাই, তিনিও পুত্রের বিবাহে সোণার শ্যাজ, রূপার কমোড, আর মোটরকার দাবী করিয়া বসিতেছেন, আমরা কন্যার পিতৃগণ নতশিরে তাহাতেই সম্মত হইতেছি? অর্থবান লোকেরাই এই সব অর্থ পিশাচগণের লালসা আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা দিতে সক্ষম, সুতরাং দিতেছেন বটে কিন্তু তাহার প্রভাব অক্ষমগণের মধ্যেও বিস্তৃত হইয়া তাহা দিগকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ডাকাইয়াছে!

এই অত্যাচারের পরিণতি, এই মহাপাপের সুতিক্ত ফল—এই নিষ্পাপাকুমারীর আত্মবলি! যদি এই কুমারীর জীবন আহুতিতেও এই রাক্ষস যজ্ঞের পরিসমাপ্তি না হয় তাহা হইলে অনেক ঘরেই এই স্নেহলতা নাট্যের করুণ অভিনয় চলিতে থাকিবে! মা সর্ব্বংসহা বঙ্গজননীর কোলে স্নেহলতার অভাব নাই! হিন্দু সমাজের কালিমালিপ্তমুখে আর কখন কোন কলঙ্ক দাগ পড়িবে তাই ভাবিতেছি!

এই রক্ত শোষণী প্রথারও নাকি পরিপোষক আছেন জানিয়া অতিমাত্র বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছি! তাঁহারা বলেন যে পুত্রই পিতার সব বিষয় সম্পত্তি ফাঁকি দিয়া খাইবে, কন্যা কিছুই পাইবে না এটাও বড় অন্যায় কথা! পুত্র বংশ রক্ষার ভার পাইবে, পিতৃকুলের মান, সম্মান প্রভৃতি রক্ষার দায়িত্ব তাহার উপর। কন্যা অন্যকুলে প্রদত্ত হইতেছে এই প্রদানের কি কোনই মূল্য নাই! কন্যার কি নিজের একটা মর্য্যাদা নাই! কন্যার ভরণ পোষণের ভার যেমন বরপক্ষ গ্রহণ করিবে, কন্যাও তার পরিবর্ত্তে তাহার নিজ জীবন সে সংসারের সেবায় ঢালিয়া দিবে, বংশের রক্ষা করিবে—সংসারের ধাত্রী হইবে, সেটাকি কিছুই নহে?

স্নেহলতার এই শোচনীয় আত্মবিসর্জ্জনে মৃতকল্প হিন্দু-সমাজ আবার সজীব হইয়া উঠিয়া দৃঢ় পণে স্বীয়বক্ষ হইতে এই কলঙ্ক মুছিয়া ফেলুন আমাদের এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী

অতৃপ্তি।

প্রাণের আমার কোথায় ক্ষত
বুঝিয়া কেনরে বুঝিনা।
প্রতীকার তরে বুরি ঘরে ঘরে
কিছু'ত খুঁজিয়া পাই না!
ধনের তরে ঘুরছি যত
অভাব আমার বাড়ছে তত
তৃষার জ্বালায় সাগর-বেলায়
ছুটিতে মনের বাসনা;
প্রাণের আমার কোথায় ক্ষত
বুঝিয়া কেনরে বুঝিনা!

দ্যু-লোকে-ভূলোকে কিছুত আমার
মনের মত যায় না দেখা
ধরার মাঝে প্রবাসী এমন
আমিই কিরে শুধু একা!
কি যেন এক অসীম ক্ষুধা
মিটে বুঝি পাইলে সুধা
গ্রাস করিলে বিশ্ব খানা
তবু যেন থাক্‌বে ফাঁকা ;—
ধরার মাঝে প্রবাসী এমন
আমিই কিরে শুধু একা!

কি জানি কোন্ সুদূর দেশে
বিশ্ব খানার পর পারে—
দৃশ্যটী তার মানস উজল
আকুল আজি কর্‌ছে মোরে!
সেথায় বুঝি সুধার ধারা—
অসীম সবাই সংখ্যা হারা,—
মিটায় জীবের তৃষ্ণা অসীম
ঝর্ ঝরিয়ে সদাই ঝ'রে—
কি জানি কোন্ সুদূর দেশে
বিশ্ব খানার পর পারে!

তাই ত ধরার ধনে মানে
তৃপ্তি নাইক আমার বুঝি
বিশ্ব খানার কানায় কানায়
মনের মানুষ পাই না খুঁজি!
প্রাণে আমার যাহার আশা
যেথায় আমার প্রাণের বাসা
সেথায় গেলে তৃষ্ণা ক্ষুধা
চিরতরে যাবে মজি ;
তাইত ধরার ধনে মানে
তৃপ্তি নাইক আমার বুঝি!

অয়ি অতৃপ্তি,—হোত্রী-রূপিণি,
হৃদে আমার সদাই থাক!
মহাতৃষার হোমানলে
বক্ষ খানা তপ্ত রাখ!
যেথায় গেলে ভাঙ্‌বে সুপ্তি
যাহার কোলে চির মুক্তি
সেথায় যে'তে হৃদয় আমার
দিবা নিশি তপ্ত রাখ ;—
অয়ি সজনি,—হোত্রী রূপিণি,
হৃদে আমার সদাই থাক!

শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

গ্রন্থ সমালোচনা।

পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর প্রণীত। বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাওয়াল, কাশীমপুর, চাঁদপ্রতাপ, সুলতান প্রতাপ এবং তালিপাবাদ, এই পাঁচটী পরগণার অধিকাংশ নিবিড় অরণ্য-সমাকুল; এই অরণ্যের অন্তরালে প্রাচীন ইতিহাসের বহু উপকরণ লুক্কায়িত আছে। এই প্রদেশের প্রাচীনত্বের সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ, ইহার অতি পুরাতন মৃত্তিকা। মৃত্তিকা পুরাতন বলিয়া তাহার অধিকাংশই কঙ্কর এবং তাহাতে লোহার অংশ অত্যন্ত অধিক; দ্বিতীয় প্রমাণ বহু স্থানের ইষ্টক স্তূপ, মৃৎ প্রাচীর, বৃহদায়াতন দীর্ঘিকার অবশেষ, ইত্যাদি। পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে প্রাচীন কালে এই সকল স্থানে অনেক নরপতি বাস করিতেন; তাঁহাদের কেহ কেহ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থে এইরূপ তিনজন বৌদ্ধ নরপতি (শিশুপাল, যশোপাল এবং হরিশ্চন্দ্র পাল) এবং তাঁহাদের ভগ্নাবশেষ রাজধানীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। লেখক বঙ্গ সাহিত্যের সেবায় নূতন ব্রতী, তিনি যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে জন প্রবাদ এবং ইংরাজী বাঙ্গলা ঐতিহাসিক গ্রন্থ অবলম্বনে নানা তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়, গ্রন্থের বিষয় বিন্যাস সুন্দর এবং ভাষা সরল। আমারা গ্রন্থ পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছে।

ব্রহ্মচর্য্য শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি,এ, প্রণীত। গ্রন্থকার একজন সাধুব্যক্তি, ছাত্রবৃন্দের হিত সাধন কল্পে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। গ্রন্থকার সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক ভাবে ব্রহ্মচর্য্যের উপকারিতা এবং অসংযত আচার ব্যবহারের অনিষ্ট কারিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস যে, ছাত্রগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রভূত শিক্ষা ও উপকার প্রাপ্ত হইবেন।

সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি।

মহামহোপাধ্যায়
পণ্ডিত-রাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন। * * * শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

Asutosh Press, Dacca.

দ্বিতীয় বর্ষ। } ময়মনসিংহ, বৈশাখ, ১৩২১। { সপ্তম সংখ্যা।

আবাহন।

(১)

আলো করি সকল ভুবন স্বর্ণ-বরণ গায়
হিমালয়ের শৃঙ্গ হতে আয় মা নেমে আয়!
দিগ্‌বিসারী হিমগিরি কন্যা কুমারিকা
(তোমার) শ্যামল আঁচল ছড়িয়ে দিয়ে দেওমা দেও দেখা,
নাচিয়া উঠুক সাগর বক্ষঃ হিরণ কিরণ ছা'য়
আলো করি সকল ভুবন স্বর্ণ-বরণ গায়,
আয় মা নেমে আয়!

(২)

জেগেছিলি একদিন এম্নি প্রভাত বেলা
বিন্ধ্য হ'তে হিমশৃঙ্গে কল্লি কতই খেলা;
শক্তিময়ি! শক্তির ঢেউ আকাশ জোড়া গতি
ছুটলো বেগে, দিগ্‌বিদিগে, ভুবন আলো জ্যোতি;
(উঠ্‌লো) নবীন তানে প্রণব গানে ঋষির তপোবনে
অনাসক্তি, ত্যাগের গীতি ধনীর সিংহাসনে।
(হ'লো) ভূপের মাথার কিরীট নত শীর্ণ ঋষির পায়।
আলো করি সকল ভুবন স্বর্ণ-বরণ গায়
হিমালয়ের শৃঙ্গ হতে আয় মা নেমে আয়!

(৩)

—ছু'লিয়ে দিয়ে কমলপদ, সাগর বক্ষোপরি
কাঞ্চনশৃঙ্গে, ললিত অঙ্গে মোহন মূর্ত্তি ধরি
বস্‌লে তুমি, চরণ চুমি ছুটলো সাগর জল
পেয়ে, তোমার পদ, কোকনদ গরবে বিহ্বল।
(হেরি) কোটী সুত, ভক্তি নত, স্তন্য ক্ষীর ধারা—
বইল হেসে, বক্ষঃ ভেসে, চেতন ভরা ধরা।
স্নেহাবেশে পড়্‌লো খসে, শ্যামল আঁচল খানি—
সাজ্‌লে জগদ্ধাত্রী, ভুবন-কর্ত্রী সারা ধরার রাণী।
(ফুটলো) উষার আলো, জগৎ পেলো নবীন শক্তি তা'য়;
আলো করি সকল ভুবন স্বর্ণবরণ গায়—
হিমালয়ের শৃঙ্গ হ'তে আয় মা নেমে আয়!

(৪)

মোহন সুরে, উঠ্‌লো পরে মধুর বীণার তান,
প্রথম পরাণ পেয়ে বিশ্ব শুন্‌লো প্রভাত গান
কানন কোলে, কুসুম দোলে, ভ্রমর পাগল ঘ্রাণে
গন্ধবহ বইল মন্দ, বিহগ গাইল বনে;
ফুলধনু, ফুলের ধনু মোহন ফুলের শর—
প্রণয়সূত্রে—প্রথম হেথা বাঁধ্‌লো বাসর ঘর,
রসিক কবি আঁক্‌লো কত মোহন ছবি ধ্যানে
নাচ্‌লো বীরের তপ্ত শোণিত রুদ্রবীণার তানে।
আত্মদর্শী, গাইল ঋষি—উচ্চ সাধন গান,
বিশ্বময়ের-বিশ্বমাঝে স্বরূপ অধিষ্ঠান,
ঢালিয়া দিলো শোণিত সতী আপন পতির পায়—
হিমালয়ের শৃঙ্গ হ'তে আয় মা নেমে আয়!

(৫)

আয় মা আয় বসে আছি তোমার মুখ চেয়ে
হইল কত, সময় গত জীবন গেলো বয়ে
নাম্‌লো ধীরে, ভুবন ঘিরে আঁধার কালো রাতি
রইলো পিছে, অতীত মাঝে ভাস্বর অরুণ ভাতি
জাগ্‌বে তুমি, পু'জবো আমি অমাবস্যা রাতে
(ফুটবে) পৌর্ণমাসী, জগৎ হাসি, দিক্ জাগিবে প্রাতে।
আলো করি সকল ভুবন স্বর্ণবরণ গায়
হিমালয়ের শৃঙ্গ হ'তে আয় মা নেমে আয়!

মালীর যোগান।

(কবি গান প্রসঙ্গে)

রাজার আদেশ, মালীকে ফুল যোগাইতে হইবে। কিন্তু আজকাল ফুল যোগান বড় দায়, একেত ভাল ফুল মিলেইনা, তাতে আবার যে কয়েকটি আছে, তাহাও দুষ্প্রাপ্য। কোনটি বা পাতায় ঢাকা, মানব চক্ষের অগোচরে পড়িয়া রহিয়াছে; কোনওটী বা কাঁটা বনে ঘেরা, তুলিতে গেলে মালীর প্রাণান্ত কোনটি; বা ছিন্ন দল, কোনওটী বা কীটদষ্ট, আর যে কত বাসী হইয়া, পড়িয়া ঝড়িয়া ধুলিসাৎ হইয়াছে, কে তার সংখ্যা করে! বেশী দুঃখ এই ঝড়ে পড়া ফুলগুলির জন্য, এগুলি কেবল ফুটিয়াই শেষ, কেউ তুলিয়া নিয়া দেব পদে উৎসর্গ করিল না—হায় বনের ফুল, তুমি কেন ফুটিয়াছিলে!

কিন্তু একটি কথা; সেকালের সমজদারগণ যদি এইরূপ এক একটি বাগান সাজাইয়া রাখিতেন, তাহলে মালীকে এম্‌নি বেগ পাইতে হইত না। তেমন রক্ষণ শীল লোক সেকালে অতি অল্পই ছিলেন। মালী কাঁটা ভাঙ্গিয়া বহু কষ্টে একটি ফুটন্ত ফুল সংগ্রহ করিয়া বাবুর হাতে দিল, বাবু ক্ষণিক তাহার সৌন্দর্য্য সৌরভের প্রশংসা করিয়া মালীকে যৎকিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক দিয়া নুতন ফুল আনিতে আদেশ করিলেন, মালী বহু কষ্টের সমানীত ফুলগুলি, মহাস্রোতে ভাসাইয়া দিয়া আবার নুতন ফুলের অন্বেষণে গেল। এইরূপে কাল স্রোত যুগে যুগে কত মান্দার নিন্দিত ফুল যে ভাসাইয়া নিয়াছে, সারা জীবন কাঁদিলেও আর তাহা ফিরিয়া পাইব না! তাই বলিতেছিলাম, সেকালের সমজদারগণ যদি বাড়ীতে বাগান সাজাইয়া ফুলগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেন, তাহলে দেশে আজ ফুলের অভাব হইত না।

এখন ফুল যোগান বড় দায়! ফুল তুলিতে গেলেই কান্না আসে। একেত ফুল দুষ্প্রাপ্য, তার উপর আবার রুচি ভেদ। সকলে একরকম ফুল ভালবাসেন না; কেউ ফুটন্ত গোলাপ ফুলটি চান, কেউ কনে বউটির মত ঝুঁই ফুলটিকে একটু বেশী আদর করেন, কেউ মালতীর মালা গাছটি গলে দুলাইতে তৎপর, কেউবা বকুলের গন্ধে আকুল, কেউ বা গন্ধরাজের উগ্র ঘ্রাণে মাতোয়ারা। ফুলের রাজ্যে যেমন, সাহিত্য রাজ্যেও তেম্‌নি। ছেলেরা ভালবাসে খোস গল্প, যুবকেরা ভালবাসে বুনিয়াদি প্রেমের টপ্পা, অপেক্ষাকৃত প্রাচীন যাঁরা তাঁহাদের মধ্যে কেহবা ঐতিহাসিক তত্ত্বসংগ্রহার্থে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, কেহবা ধর্ম্মতত্ত্বে মন দিয়াছেন।

জড় জগৎ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। মানবের রুচির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, জগতের ভাষা, সাহিত্য, ভাব, চিন্তা—নিত্য পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আজ যাহা ভাল ছিল, কাল তাহা ভাল লাগেনা। পরিবর্ত্তন প্রিয় সমাজ পুরাতনকে ধীরে ধীরে সরাইয়া, নুতনকে হৃদয়ে স্থান দিতেছে। তাই সেকালের প্রাচীনেরা যাহা ভাল বাসিতেন, নব্য সম্প্রদায় তাহা চায় না।

সেকালের প্রাচীন সমজদারগণ ভালবাসিতেন, কবিওয়ালা ও ঝুমুর ওয়ালীর গান, সখী সংবাদ, পাঁচালী, টপ্পা ইত্যাদি। অশ্লীলভায় ভাজ আছে বলিয়া, নব্য সম্প্রদায়, সেগুলিকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে চাহিতেছেন। তাহার স্থান যাত্রা ও থিয়েটার সম্প্রদায় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সর্ব্ব প্রকার অশ্লীলতা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হউক, তার জন্য দুঃখও নাই, খেদও নাই; কিন্তু দুঃখ এই, আমরা বাহিরের আবর্জ্জনা তুলিয়া লইয়া তাহা আনিয়া ঘরে স্থান দিতেছি। সেকালের সীতার বনবাস, রাম বনবাস প্রভৃতি পালা সমাজকে সত্য ধর্ম্ম, পাতিব্রত্য কত কিনা শিক্ষা দিয়াছে। কিন্তু আধুনিক পালা গুলির প্রতি একটু সূক্ষ্ম ভাবে দৃষ্টি করিলে দেখা যায়, লোকের মনোরঞ্জনের জন্য, কবিগণ আপন আপন গ্রন্থে, কেবল নৃত্য গীতের বাহুল্য মাত্র দেখাইয়াছেন। ফলে অশ্লীলতা ষোল কলায় পূর্ণ হইয়া অভিনয়ের সঙ্গে ঢুকিতেছে। মন্মথ মিলনের কবি নিজে রস বর্ণনায় অক্ষম হইয়া, বিদ্যাসুন্দর হইতে ধার করিয়া নারীগণের পতি নিন্দাটি পর্য্যন্ত গীতাভিনয়ে স্থান দিয়াছেন। তারপর অপরিনীতা গৌরীর মুখে বন মালা শোভিত নারায়ণকে দেখিয়া যে কথা বলাইয়াছেন, সেস্থানে কবি তিরস্কারেরও অনুপযুক্ত। সীতার বনবাসে বনবাসিনী বিরহ বিধুরা সীতার সম্মুখে, ব্যাধগণের

অস্বাভাবিক তাণ্ডব নৃত্য কেবল লোক মনোরঞ্জনের জন্য টানিয়া বুনিয়া খাড়া করিয়াছেন। যোগমায়ার পূতনার সেই অঙ্গ ভঙ্গি ও মাসীর গানটি কতটুকু শ্লীলতা পূর্ণ তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। এমনকি পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ দশরথের সম্মুখে নর্ত্তকীগণের একটা নাচ দিতে "দশরথ উদ্ধারের" বেহায়া কবি একটুও ইতঃস্তত করেন নাই! বলিহারি লোকরঞ্জনেচ্ছা! বলিহারি কলির জীবের রুচি! তারপর আর একটি ঢং, প্রত্যেক পালাতেই একটি হাস্য রসিক বয়স্য থাকা চাই; এই সকল জীবের কথায় হাস্য রসের উদ্রেক হওয়া দূরে থাক বরং মনে বিরক্তিরই সঞ্চার হয়। হাসাইতে যাওয়ারও একটা কায়দা আছে; হাসির কথায় মুন্সিয়ানা থাকা চাই, নতুবা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া মুখে যা আসে, বলিতে থাকিলে তাতেও লোকে হাসিবে, সে হাসি অবশ্য পৃথক ভাবের। পাগলের পাগলামি দেখিয়া লোকে হাসি রাখিতে পারে না, তাই হাসে। অল্পদিন হইল একখানা নূতন গীতাভিনয়ের অভিনয় দেখিয়াছিলাম, নামটী তাহার সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধ। হাজার মাথার একটা রাবণ ছিল। দশ মাথার জ্বালায়ই একবার দেবগণকে শুদ্ধ অস্থির হইতে হইয়াছিল, তা'তে আবার যে রাবণ আপন কাঁধে মাথা মুণ্ডের একটা হাট বসাইয়া রাখিয়াছিল সে যে কিরূপ ভীষণ হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। সেই রাবণটার ছিল একটা শালা, নাম তা'র ভদ্রমুখ। ভদ্রমুখটা তেম্‌নি একটা বয়স্য। সেই ভদ্রমুখ শালা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া এম্‌নি ভাষায় বলিতে লাগিল যে অনেক চাষার ছেলের মুখ দিয়াও সেরূপ ভাষা বাহির হয় না।

ইহারও একটা কারণ আছে. নাটক-নভেল-কাব্যকার সকলকেই সমালোচনার আগুনে পুড়িতে হয়, কিন্তু গীতাভিনয় গুলির সমালোচনা হইতে বড় দেখা যায় না। সেই জন্যই বোধ হয় এইরূপ অবাধ বিচরণ। কিন্তু এই অবাধ বিচরণের ফল বড় ভাল হইতেছে না। যে গীতাভিনয়গুলি পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের শিক্ষাদাতা, সেগুলি এইরূপ ক্ষুদ্র কবি বা আদৌ কবি নামের অনুপযুক্ত লোকের হাতে পড়িয়া তাহাদের নিজস্ব হারাইতে বসিয়াছে। তবে একথাও অবশ্য স্বীকার্য্য,যে গীতাভিনয় রচয়িতাদিগের মধ্যেও এমন লোক আছেন, যাঁহারা শ্রেষ্ঠ কবির আসন পাইবার যোগ্য।

এতো গেল গীতাভিনয়-কর্ত্তাদের কথা। ধরিতে গেলে ঝুমুরওয়ালা ও থিয়েটারের অভিনেত্রীগণ একই জাতীয় লোক। আধুনিক সভ্যতার হিসাবে ও রুচিভেদে, আমরা কিন্তু ঝুমুরওয়ালীগণকে যে চক্ষে দেখি, থিয়েটারের অভিনেত্রীগণকে সে চক্ষে দেখি না। ঝুমুরওয়ালীগণ আধুনিক সামাজিকগণের চক্ষে হীনা ও উপেক্ষিতা, পক্ষান্তরে থিয়েটারের অভিনেত্রীগণ দুর্লভ্য ও সম্মানিতা। রুচি একই জিনিষকে দুই ভাগে কাটিয়া, এক ভাগ আস্তকুড়ে ফেলিয়াছে, অপর ভাগকে সসম্মানে বুকের উপর স্থান দিয়াছে।

সে কালের কবিওয়ালাগণও এক্ষণে সমাজের চক্ষে অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত। মনিষী দীনেশচন্দ্র তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" এই শ্রেণীর লোককে অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বিদায় পূর্ব্বক সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। অশ্লীলতার হিসাবে এই সমস্ত লোক যেমন "অর্দ্ধচন্দ্র" পাইবার যোগ্য, তেমনি সুমধুর কান্ত পদাবলী, ও ভাবময় মধুর সঙ্গীত রচনার জন্য ইহারা বঙ্গ সাহিত্যের এক একটি রত্নাসন পাইবারও অধিকারী।

কবিওয়ালাগণকে লোকে যতই দোষী সাব্যস্ত করুক না কেন, একবারে ষোল আনা দোষ তাঁহাদের স্কন্ধে চাপান যায় না। তজ্জন্য সমাজও অল্পাধিক পরিমাণে দায়ী। নিরক্ষর গ্রাম্য কবিওয়ালাগণ কেবল যশ উপার্জ্জন, কিম্বা ভাষা-সাহিত্যের উন্নতির জন্য কবিতা রচনা করেন না। ইহা তাঁহাদের উদর পালনের একমাত্র পন্থা; অর্থ উপার্জ্জনই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। এমতাবস্থায় কবিকে কথায় কথায় লোকের মুখাপেক্ষী হইতে হয়। দেশ কাল পাত্র যাহা চায়, বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে তাহাই করিতে হয়। তা না হইলে লোকসমাজে তাঁহাদের প্রসার প্রতিপত্তি বজায় থাকে কোথায়? মনে করুন ভাগবত রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ প্রসঙ্গ লইয়া কবির লড়াই বাঁধিয়াছে। উভয়ে যথাশাস্ত্র তাহার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। উন্নত ভাব, উন্নত

চিন্তা, মধুময় পদাবলী, মাধুর্য্যের প্রস্রবন শত মুখে উপলিয়া উঠিতেছে। কত কৃত্তিবাস, কত কাশীদাস, কত বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস তাঁহাদের জিহ্বাগ্রে। ভাষা সহস্র মুখে সফেন জাহ্নবীর ধারার ন্যায় কলকলে বহিয়া যাইতেছে। সভা নিস্তব্ধ, নীথর, সভাসদগণ নীরব। অমনি কোন কোন বদ-রসিক সমজদার আদেশ করিয়া বসিলেন, 'মোটা ভজন' চাই। তখনি শাস্ত্রকাহিনী, পুরাণকাহিনী পরিত্যক্ত হইল ; দেখিতে দেখিতে সভাসদগণের বিকট হাস্য ও করতালীতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। সে সব অশ্রাব্য অশ্লীল ভাষা ও সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া অনেকে হয়ত কানে হাত দিলেন। এইখানে বলিতে হইবে গঙ্গাজল নিজে কলুষিত ছিল না আমরাই নিজ দোষে তাহা কলুষিত করিয়াছি। শোনা যায়, গর্দ্দভ স্রোতের জল পান করে না, জল ঘোলা করিয়া তবে পান করে ; এইজন্য আমরা গাধাকে কত নিন্দা করিয়া থাকি। কিন্তু মানুষ আপনার দোষ দেখে না, পরের দোষ ঢাক বাজাইয়া প্রচার করিয়া ফিরে।

আমরা নিজের দোষে ভালকে মন্দ করিয়া তুলিয়াছি। এইজন্য ময়মনসিংহের সুপ্রসিদ্ধ কবিওয়ালা রামগতি সরকার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"সঙ্গীতজীবীদের মধ্যে প্রত্যেকেরই একটা মান সম্মান আছে। কেবল কবিওয়ালাগণের তাহা নাই। থিয়েটার সম্প্রদায় রঙ্গমঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া কত স্ফূর্ত্তি করে, বাই-খেমটাওয়ালীরা ফরাসের চাদরের উপর পায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দেয়, দুর্ভাগ্য কবিওয়ালাদের কিন্তু মাটির বিছানা দূর হইল না। ইহার কারণ লোকে আমাদিগকে একটা যাত্রার সংএর মত বিবেচনা করে। অশ্লীলতা বক্‌বাজীই আমাদের পেশা। নপুংসক গুর্ম্মার গান ও আমাদের কবিওয়ালাদের গান লোকে একই পংক্তিতে স্থান দিয়াছে। দোষ কিন্তু আমাদের নহে ; অশ্লীলতা প্রচার আমাদের উদ্দেশ্য নহে। শাস্ত্র আলোচনা, সঙ্গীত রচনা, মানুষকে মধুর হরির নাম প্রদান করা, নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে ভুলাইয়া রাখা—ইহাই আমাদের লক্ষ্য। কি করি. লোকে তা বুঝে না। তাহারা স্বচ্ছ জল ঘোলা করিয়া পান করিবে, আমাদের কি দোষ। দোষ আমাদের—আমরা এই, ঘৃণ্য পেশাটা ছাড়িয়া দেই না কেন ?"

কথাগুলি যেমন সত্য, তেমনি মর্ম্মন্তুদ। পায়ের কোনও স্থান দুষ্ট ক্ষতে আক্রান্ত হইলে, জীবন নাশের ভয়ে, ডাক্তার তাহার সমস্তখানি পা কাটিয়া ফেলেন। হতভাগ্য ব্যক্তি চিরদিনের জন্য অঙ্গহীন হইয়া পড়ে। ইহজীবনে তাহার আর সে অভাব পূর্ণ হয় না। ভাষা সাহিত্যের অঙ্গ হইতে অশ্লীলতা রূপ দুষ্ট ক্ষতের আক্রমন ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত, আমরা তাহার সেইরূপ একখানি পা কাটিয়া ফেলিতেছি, সে অভাব ইহজীবনে আর পূর্ণ হইবে না, সুনিশ্চয়। যত দিন বাচিয়া থাকি, সেই ছিন্ন অঙ্গের অভাব, পলে পলে, প্রতি পাদক্ষেপে, আমাদিগকে যে কি মর্ম্মভেদী যাতনা প্রদান করিবে, আমরা তাহা সময়ে টের পাইব। হাঁসের একটা অদ্ভুদ ক্ষমতা আছে শুনা যায়, নীর ও ক্ষীর একত্র মিশাইয়া দিলে, নীর ত্যাগ করিয়া ক্ষীর পান করে। কিন্তু উন্নত জীব মানুষের সে ক্ষমতা নাই। তাই আমরা নীরের সহিত ক্ষীর ত্যাগ করিয়াছি। কীটের জন্য এমন দেব দুর্ল্লভ পুষ্পকে জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়াছি।

এইবার ময়মনসিংহের দাশুরায়-রামগতি সরকার ও অন্যান্য কবিওয়ালাগণের কয়েকটী গান নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম। ভরসা আছে, পাঠকগণ ইহা হইতেই উল্লিখিত কথাগুলির সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বাঙ্গালায় গীতি কবিতার অভাব নাই। তথাপি আমাদের বিবেচনায়, এই সমস্ত গান সংগৃহীত হইলে, বাঙ্গালা ভাষার অনেক পুষ্টি সাধিত হয়। ময়মনসিংহের সাহিত্যের ইতিহাসে এইগুলি অমূল্য মণি মাণিক্যের ন্যায় স্থান পাইবার যোগ্য। যেমন কোনও বহুমূল্য রত্নহার হইতে, একটি মাত্র রত্ন স্থান চ্যুত হইলে সে স্থান শূন্য থাকিয়া যায়, সেইরূপ যদি কেহ কোনও দিন, ময়মনসিংহের সাহিত্য ভাণ্ডারের রত্নগুলি লইয়া হার গাঁথিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে, সেই হারের, এমন স্থান অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে, যে কোনও উজ্জল রত্নেও সে স্থানের অভাব দূরীভূত হইবে না। আমাদের মনে হয়, বহুদিন হইতে সেই রত্নগুলি একটি দুইটি করিয়া হারাইয়া

যাইতেছে, এখনও চেষ্টা করিলে তাহার কথঞ্চিৎ সংগৃহীত হইতে পারে।

ময়মনসিংহের কবিওয়ালাগণের এই সকল গান এত সহজে নষ্ট হইবার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথম কারণ ময়মনসিংহের বহু কবির কবিতা, কাব্য, পুরাণ মুদ্রযন্ত্রের অভাবে মানব নয়নের গোচরী ভূত হয় নাই। অবশ্য তৎকালীন ময়মনসিংহে ধন-কুবেরের অভাব ছিলনা। ময়মনসিংহে বহুপরক্রান্ত ভূম্যধিকারীর বাস,তবে তাঁহারা এইরূপ পাপানুষ্ঠানে, যে দুপয়সা জমাসেরেস্থায়, বাজে খরচ লিখেন নাই, এজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া যায়। অথচ শুনা যায় এই সমস্ত ভূম্যধিকারী-গণের মধ্যে সঙ্গীত প্রিয় সমজদার লোক অনেক ছিলেন। দ্বিতীয় কারণ তদানিন্তন ময়মনসিংহে রক্ষণ শীল লোক অতি অল্পই ছিলেন। সঙ্গীত, কথকতা, ছড়া পাঁচালী, তাঁহারা এককানে শুনিয়াছেন অন্য কান দিয়া তাহা বাহির হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অনাদরে ও রক্ষণ শীল লোকের অভাবে ময়মনসিংহের সাহিত্য ভাণ্ডার হৃত সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছে।

তৃতীয় কারণ—কবিগায়কগণের কর্ণ পটাহভেদী চিৎকার, ও সঙ্গীতের ভাষার জড়তায় অনেক সময় শ্রোতাগণ সঙ্গীতেরপদ গুলি একেবারেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। এইরূপ নানাকারণে বোধ হয় লোকে দিন দিন কবিগানের উপর বীতশ্রদ্ধ হইতে লাগিল।

চতুর্থ কারণ—গ্রামে গ্রামেই সম-প্রতিদ্বন্দী দল ছিল। এক দল কোনও রূপে একটি গান সংগ্রহ করিয়াছে, সে দল সেই গানটিকে এমনই সন্তর্পণে রক্ষা করিয়াছে, যে প্রতিদ্বন্দী ঘুণাক্ষরে তাহার একটি মাত্র চরণ ও পাইতে না পারে, এদিকে অন্য দলও এইরূপ নূতন গান সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। একদল একদিন একটি গান গাহিলে, অন্য দল সে গানটি আর কখনও গায় নাই। এইরূপেও কত অমূল্য সঙ্গীত কবিওয়ালাগণের হাতের লিখা খাতায় পড়িয়া পঁচিয়াছে।

আমাদের মনে হয় অধঃপতনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ, কবির দলে প্রতিভাশালী লোকের অভাব। দাশুরায় যদি আবার জন্মগ্রহণ করেন; তবে হয়ত লোকে সখ করিয়া আবার কবি গান শুনিতে যাইবে। একটা লোকের অভাবে, একটা সম্প্রদায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। দাশুনাই, গান শুনে কে? শুনায়ইবা কে? অশ্লীলতাও একটি কারণ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহা একটি অতি সঙ্কীর্ণ কথা। এইরূপ অস্থায়ী ভাব দেশকাল পাত্রভেদে জন্মে, আবার দেশকাল পাত্রভেদে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

অনেক লোক এমন আছেন যাঁহারা বলেন, কবি গান শুধু অশ্লীল নয়,ভাববর্জ্জিত ও নীরস। তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। এ সম্বন্ধে একটা রসের কথা আছে, এক ব্যক্তি অন্ধকারে বসিয়া মণ্ডা খাইতেছিল। দুর্ভাগ্য ক্রমে সেই মণ্ডার ভিতর ছিল একটা টিকিয়া। পথিক, সর্ব্বাগ্রে সেই টিকিয়াটাই মুখে পুরিয়া দিয়া, চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন, "হায় হায় ভগবান দুনিয়ার মণ্ডার মিঠাও তুলিয়া লইয়াছেন।" যাঁহারা এইরূপ অন্ধকারে, টিকিয়া খাইয়া, মণ্ডার স্বাদ বুঝিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহাদিগকে বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। আর যাঁহারা কেবল মাত্র, অশ্লীলতার ভাজ আছে বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাঁহাদিগকে ময়মনসিংহের কবি রামগতির এই কয়েকটি সঙ্গীত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ময়মনসিংহের বিভিন্নস্থানে এইরূপ অসংখ্য সঙ্গীত লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছে। সেই ভাবময় সঙ্গীত মুক্তাবলী একা সংগ্রহ করা সুকঠিন। আমরা সবগুলি গান আদ্যন্ত সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই, কতকগুলি ছিন্ন দল, কতকগুলির দুএকটি পাপ্ড়ি মাত্র নমুনা স্বরূপ গাঁথিয়া দেওয়া হইল। আমাদের বিশ্বাস, বিভিন্ন স্থান হইতে কুড়াইয়া লইয়া, এই সমস্ত সঙ্গীত সংগ্রহ করিতে পারিলে, একখানি প্রথম শ্রেণীর গীতি কাব্য হইতে পারে।

১। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়ে রইলেন রসময়,
　তাঁরি আশাতে—বৃন্দে-চিত্রে-ললিতে,
　　　　মন সাধে নিকুঞ্জ সাজায়।
　তুইলে চাপার কলি,
　গজরাজ ফুল, সন্ধ্যামালী, মালতী, বকুল,
　তুইলে মন সাধে বনফুল,
　টগর, বেলী, সেফালিকে,
　কৃষ্ণচূড়া, কাঠ মল্লিকে—

কুঞ্জ দেখে শ্রীরাধিকের প্রাণ হইল আকুল।
না পেয়ে সে কৃষ্ণের দেখা, কাতরা হইয়ে,
সখীগণের বদন চেয়ে, বল্‌তেছে ললিতের কাছে
আর নিশি নাই, প্রাণ সই গো! শ্যামের আসার আশা কি আছে?
বঁধু আসবে বইলে,
মন সাধে কুসুম তুইলে, গেঁথে ছিলাম হার—
মনে বাসনা ছিল আমার—
বকুল, বেলী, সেফালিতে,
হার গেথেছি বিনা সূতে,
ভুলাইতে নন্দের সুতে, গলে দিতাম তাঁর।
যাঁর আশাতে কুঞ্জে বসি,
জাগিয়ে পোহালেম নিশি,
কেবল তারা গুণে সারা হলেম সই।
আশা তরু তলে বসে,
ছিলেম সখি, ফুলের আশে,
অভাগিনীর কর্ম্ম দোষে, ডাল ভেঙ্গে সব ফল নিয়াছে.
আর নিশি নাই, প্রাণ সই গো! শ্যামের আসার আশা কি আছে?

(ঝুমুর)

করলেম কৃষ্ণ প্রেমের একাদশী. ঐ পোহাল নিশি।
যাঁর আশাতে করলেম শয্যা,
সে আইল না পেলেম লজ্জা, হলেম উদাসী,
আমার অঙ্গে নাই সে বল,
কি করিব বল,
যে জ্বালা জ্বালাইল কালশশী, ঐ পোহাল নিশি,
—করলেম কৃষ্ণ প্রেমের একাদশী।

উল্লিখিত গানটির উপর, পাঠকগণ একটু মনোযোগ করিবেন। এখানে অশ্লীলতার নাম গন্ধও নাই। অথচ আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সরস ভাব।

পাঠকগণ, এই অভিসার রজনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া মানস নয়নে একবার সেই পীরব যৌবন ভারাক্রান্তা ষোড়শী গোপ যুবতীগণের গতি বিধি লক্ষ্য করিতে থাকুন। কুঞ্জবাসিনীগণ সকলেই অভিসারিকা। সকলেই শ্যাম সন্দর্শনাভিলাসিনী। প্রথম রজনীতে ফুল তোলা। বাগান ভরা ফুল, আকাশ ভরা তারা। নীচে শিশির মুক্তা খচিত দুর্ব্বাদলের গালিচা, তাহার উপর অলক্ত রঞ্জিত, নূপুর শিঞ্জিত, চরণের ছুটাছুটী। অলক্তরাগে দুর্ব্বাদল রঞ্জিত হইতেছে। এই ফুলটী আমার প্রিয়তম কেশব ভালবাসেন,রাধা নিজে এই ফুলটী তুলিতে পারিল না,চিত্রা ও ললিতার কাছে কত অনুনয় করিয়াছে, চিত্রা-ললিতা পুষ্পশাখা নত করিয়া ধরিল, হয়ত রসিকা চিত্রা ও ললিতা পুষ্প শাখাটিকে এমন ভাবে নোয়াইয়া ধরিল যে রাধা তাহা ধরে ধরে ধরিতে পারে না। ঐ দেখুন রাধা দুপায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর রাখিয়া, উকি দিয়া ফুলটি ধরিতেছে; একদিকে অঞ্চল স্থানচ্যুত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইতেছে। তাহার বদন মণ্ডলে কি সুন্দর রক্তিম আভা।

এইবার রাধা ফুল তুলিল। ফুলটি তুলিতে তাঁহার যতটুকু কষ্ট হইয়াছিল, তুলিয়া ততটুকু আনন্দ পাইল। বহুকষ্টে বহু আগ্রহে ফুল তোলা শেষ করিয়া মধ্য রাত্রে শ্যাম বিলাসিনী কুঞ্জ সাজাইতে চলিলেন। একটি মালা দশবার গাথিয়া, একটি ফুল একস্থানে দশবার বসাইয়াও, রাধার মনোমত হইতেছেনা। সখীদের কাছে বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছে, কিরূপ ভাবে কুঞ্জ সাজাইলে কুঞ্জটি কুঞ্জ-মোহনের নয়নাভিরাম হইবে। এদিকে সখীদের সঙ্গেও তাহার মতের ঐক্য হইতেছেনা। রাধাতো ভাবিয়াই আকুল, যাহা হউক বহু পরিবর্ত্তনের পর কুঞ্জ সাজান শেষ হইল, রাধা সর্ব্বাপেক্ষা যত্নের সহিত বাগানের বাছা বাছা সুগন্ধি ফুলে একটী নয়ন মনোমোহন মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছে। প্রিয়তম আসিলে, এই মালাটীর দ্বারা, সর্ব্বপ্রথম তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে।

শেষরাত্রে উৎকণ্ঠা। কৈ শ্যামত এখনও পর্য্যন্ত এলোনা! চিত্রে,ললিতে, ঐ শোন্ নিশাচর পক্ষী সকল কলরব করি-তেছে। রাত্রি বুঝি প্রভাত হইয়া আসিল! কৈ শ্যামত এলোনা! রাধা বার বার দ্বার খুলিয়া আকাশের দিকে চাহিতেছে, অন্যমনস্ক হইয়া তারা গণিতেছে, এক, দুই, তিন, তারা গুলি ও ক্রমে মলিন হইতে চলিল। কৈ শ্যামত এলোনা। তখন বৃক্ষপত্রের পতন শব্দে,নিশাচর পাখীগণের পক্ষ বিধূনন শব্দে, প্রতি পতন শীল পদার্থের শব্দে, রাধা চমকিয়া উঠিতেছে, এই বুঝি শ্যাম আসিতেছে—কিন্তু কৈ শ্যামত এলোনা। কখনও নিজের পায়ের শব্দে, কখন ও সখীগণের পায়ের শব্দে, রাধা আত্মহারা হইয়া শ্যামের আগমন ভাবিয়া পুলকিত হইতেছে,—আবার সেই ভাবান্তর, কৈ শ্যামত এলোনা। কি উৎকণ্ঠা, কত-

বার ফুলশয্যার উপর একাকিনী শুইয়া, নিদ্রার ভান করিয়াছিল, কিন্তু নিদ্রা আসিবে কেন ? নিদ্রাকেতো রাধা চায়না, রাধা চায় শ্যাম। একবার হয়ত পুষ্পাসনের উপর বসিয়া রাধা ভাবিয়াছিল, এখন যদি শ্যাম আসেতো মান করিব, কথা কইবনা ; কিন্তু হায় কা'র সঙ্গে মান, শ্যামত এলোনা !

এদিকে ফুলশয্যা বাণী। হইতে চলিল। রজনীর শেষ তারা গুলি জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিয়া যাইতেছে, পূর্ব্বাশা গগন, ধীরে ধীরে রক্তিমরাগে রঞ্জিত হইতেছে। তখন রাধা কাঁদিতে কাঁদিতে—"সখিগণের বদন চেয়ে,বল্‌তেছে ললিতার কাছে, আর নিশি নাই প্রাণ সইগো ! শ্যামের আসার আশা কি আছে ?"

এই যে একটী কথার ভাব সহস্র কথায়ও ব্যক্ত করা যায় না, বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিগণের ভনিতায়ও এমন দুইটী কথা বিরল, এই একটী কথার উপর কত গুলি কথার নির্ভর করিতেছে। রাধার মনে কত কথা, কত উৎকণ্ঠা এই একটী কথা দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে। মনের ভিতর ভাব আসে, কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, নিরাশ প্রনয়িনী রাধার তৎকালীন মনের ভাব, পাঠকগণ, মনে মনে উপলব্ধি করিতে থাকুন—সেই একটী পদ—"শ্যামের আসার আশা কি আছে ?"

তার পর রজনী প্রভাত হইল। নিষ্ঠুর শ্যাম আর আসিল না। রাধা সখীগণের সহিত সে রাত্রি কৃষ্ণ প্রেমের একাদশী করিলেন। একবারে নিরম্বু উপবাস ! কিন্তু সেই রজনীর ফল আবার কৃষ্ণকে হাতে হাতে পাইতে হইয়াছিল।—

যখন—

২। "চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হতে, রজনী প্রভাতে,
রাধার নাথ রাধার কুঞ্জে যান,
রাধে কমল মুখী, হয়ে মন দুঃখী,
(শ্যামের উপরে) করলেন দুর্জ্জয় মান ॥
রাধার মান দেখে শ্যাম গিরিধারী ব্যস্ত অতিশয়,
সে যে কেন্দে রাধার কাছে কয়, ব্যস্ত অতিশয়,
(বলে)—তুমি গো রাই ব্রজেশ্বরী,
আমি তোমার আজ্ঞাকারী,
এ অপরাধ ক্ষমা কর প্যারী, ধরি তোমার রাঙ্গা পায়।"

শ্যামকে তদবস্থ দেখিয়া সহচরীগণ বলিতেছেন—

তোমার মনের ভাব কেশব কিছুই বুঝতে নারি,
তাইতে জিজ্ঞাসি হরি ! বল খুলে,
কৃষ্ণ কও হে শুনি, ও শ্যাম চিন্তামণি,
ভাস কেন নয়ন জলে ।
তুমি গোলক বিহারী হরি,
ব্রজেতে বংশীধারী
(ত্রিগুণধারী—)
তোমার নাম নিলে জীবে তরে ভববারি,
শ্রীচরণ ঘেমে ছিল, দ্রবময়ী গঙ্গা হল,
কোন গঙ্গা হবে বল চক্ষের জলে ?
কৃষ্ণ কও হে শুনি, ও শ্যাম চিন্তামণি,
ভাস কেন নয়ন জলে।
যেমন রাহুর ভয়ে শশী ব্যস্ত,
তেমনি দেখ্‌তে পাই।
ভালবাসি বইলে তাই জিজ্ঞাসি,
কৈ হে চূড়া, কইহে বাঁশী,
কি জন্য হে কালশশী, শশীর মুখে মধুর হাসি নাই,
যেমন সীতা হারা হয়ে বনে, কেঁদেছিলেন রাম,
আমরা রামায়ণে শুনিলাম, কেঁদেছিলেন রাম
আজ কি হারা হয়ে রাধার চরণ, বিচ্ছেদ অশ্রু হচ্ছে পতন,
ধরে রাধার চরণ, রামের মতন, করছ রোদন বাঁকা শ্যাম ?

(ঝুমুর)

বল বল শুনি গুণমনি ওই চাঁদ বদনে,
বলতে বাধা কিহে রাধার নাথ, কি হয়েছে আজ রাধার সনে,
মণিহারা ফণীর মতন গুণমনি হলে কেনে
হয়ে কি ধন হারা, এমনি ধারা, ধারা বহে দুনয়নে।

উল্লিখিত গানটীর মধ্যে "ধরি তোমার রাঙ্গাপায়" কথাটী কত মধুর, শুনিলে জয়দেবের সেই "দেহিপদ-পল্লব" কথাটী মনে হয়। অথচ জয়দেবের সেই "দেহিপদপল্লব মুদারম্" হইতে একেবারে খাসবাঙ্গালী-কবির, এই "ধরি তব রাঙ্গাপায়" কথাটী অধিকতর পরিচিত বলিয়া মনে হয় নাকি ? কি মধুর ভাবময় ! যেন আমাদের সর্ব্বাপেক্ষাপ্রিয়, পরিচিত গানটী কেহ হারমোনিয়ম দ্বারা কানের কাছে সা রে গা মা করিয়া ধীরে ধীরে বাজাইয়া নিতেছে। গানটী শুনিলে

কুঞ্জ দেখে শ্রীরাধিকের প্রাণ হইল আকুল।
না পেয়ে সে কৃষ্ণের দেখা, কাতরা হইয়ে,
সখীগণের বদন চেয়ে, বল্‌তেছে ললিতের কাছে—
আর নিশি নাই, প্রাণ সই গো! শ্যামের আসার আশা কি আছে?
বঁধু আসবে বইলে,
মন সাধে কুসুম তুইলে, গেঁথে ছিলাম হার—
মনে বাসনা ছিল আমার—
বকুল, বেলী, সেফালিতে,
হার গেথেছি বিনা সূতে,
ভুলাইতে নন্দের সুতে, গলে দিতাম তাঁর।
যাঁর আশাতে কুঞ্জে বসি,
জাগিয়ে পোহালেম নিশি,
কেবল তারা গুণে সারা হলেম সই।
আশা তরু তলে বসে,
ছিলেম সখি, ফুলের আশে,
অভাগিনীর কর্ম্ম দোষে, ডাল ভেঙ্গে সব ফল নিয়াছে.
আর নিশি নাই, প্রাণ সই গো! শ্যামের আসার আশা কি আছে?

(ঝুমুর)

করলেম কৃষ্ণ প্রেমের একাদশী, ঐ পোহাল নিশি।
যাঁর আশাতে করলেম শয্যা,
সে আইল না পেলেম লজ্জা, হলেম উদাসী,
আমার অঙ্গে নাই সে বল,
কি করিব বল,
যে জ্বালা জ্বালাইল কালশশী, ঐ পোহাল নিশি,
—করলেম কৃষ্ণ প্রেমের একাদশী।

উল্লিখিত গানটির উপর, পাঠকগণ একটু মনোযোগ করিবেন। এখানে অশ্লীলতার নাম গন্ধও নাই। অথচ আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সরস ভাব।

পাঠকগণ, এই অভিসার রজনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া মানস নয়নে একবার সেই নীরব যৌবন ভারাক্রান্তা ষোড়শী গোপ যুবতীগণের গতি বিধি লক্ষ্য করিতে থাকুন। কুঞ্জবাসিনীগণ সকলেই অভিসারিকা। সকলেই শ্যাম সন্দর্শনাভিলাসিনী। প্রথম রজনীতে ফুল তোলা। বাগান ভরা ফুল, আকাশ ভরা তারা। নীচে শিশির মুক্তা খচিত দুর্ব্বাদলের গালিচা, তাহার উপর অলক্ত রঞ্জিত, নূপুর শিঞ্জিত, চরণের ছুটাছুটী। অলক্তরাগে দুর্ব্বাদল রঞ্জিত হইতেছে। এই ফুলটী আমার প্রিয়তম কেশব ভালবাসেন,রাধা নিজে এই ফুলটী তুলিতে পারিল না,চিত্রা ও ললিতার কাছে কত অনুনয় করিয়াছে, চিত্রা-ললিতা পুষ্পশাখা নত করিয়া ধরিল, হয়ত রসিকা চিত্রা ও ললিতা পুষ্প শাখাটিকে এমন ভাবে নোয়াইয়া ধরিল যে রাধা তাহা ধরে ধরে ধরিতে পারে না। ঐ দেখুন রাধা দুপায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর রাখিয়া, উকি দিয়া ফুলটি ধরিতেছে; একদিকে অঞ্চল স্থানচ্যুত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইতেছে। তাহার বদন মণ্ডলে কি সুন্দর রক্তিম আভা।

এইবার রাধা ফুল তুলিল। ফুলটি তুলিতে তাঁহার যতটুকু কষ্ট হইয়াছিল, তুলিয়া ততটুকু আনন্দ পাইল। বহুকষ্টে বহু আগ্রহে ফুল তোলা শেষ করিয়া মধ্য রাত্রে শ্যাম বিলাসিনী কুঞ্জ সাজাইতে চলিলেন। একটি মালা দশবার গাথিয়া, একটি ফুল একস্থানে দশবার বসাইয়াও, রাধার মনোমত হইতেছেনা। সখীদের কাছে বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছে, কিরূপ ভাবে কুঞ্জ সাজাইলে কুঞ্জটি কুঞ্জ-মোহনের নয়নাভিরাম হইবে। এদিকে সখীদের সঙ্গেও তাহার মতের ঐক্য হইতেছেনা। রাধাতো ভাবিয়াই আকুল, যাহা হউক বহু পরিবর্ত্তনের পর কুঞ্জ সাজান শেষ হইল, রাধা সর্ব্বাপেক্ষা যত্নের সহিত বাগানের বাছা বাছা সুগন্ধি ফুলে একটী নয়ন মনোমোহন মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছে। প্রিয়তম আসিলে, এই মালাটীর দ্বারা, সর্ব্বপ্রথম তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে।

শেষরাত্রে উৎকণ্ঠা। কৈ শ্যামত এখনও পর্য্যন্ত এলোনা! চিত্রে,ললিতে, ঐ শোন্ নিশাচর পক্ষী সকল কলরব করি; তেছে। রাত্রি বুঝি প্রভাত হইয়া আসিল। কৈ শ্যামত এলোনা! রাধা বার বার দ্বার খুলিয়া আকাশের দিকে চাহিতেছে, অন্যমনস্ক হইয়া তারা গণিতেছে, এক, দুই, তিন, তারা গুলি ও ক্রমে মলিন হইতে চলিল। কৈ শ্যামত এলোনা। তখন বৃক্ষপত্রের পতন শব্দে,নিশাচর পাখীগণের পক্ষ বিধুনন শব্দে, প্রতি পতন শীল পদার্থের শব্দে, রাধা চমকিয়া উঠিতেছে, এই বুঝি শ্যাম আসিতেছে—কিন্তু কৈ শ্যামত এলোনা। কখনও নিজের পায়ের শব্দে, কখন ও সখীগণের পায়ের শব্দে, রাধা আত্মহারা হইয়া শ্যামের আগমন ভাবিয়া পুলকিত হইতেছে,—আবার সেই ভাবান্তর, কৈ শ্যামত এলোনা। কি উৎকণ্ঠা, কত-

বার ফুলশয্যার উপর একাকিনী শুইয়া, নিদ্রার ভান করিয়াছিল, কিন্তু নিদ্রা আসিবে কেন ? নিদ্রাকেতো রাধা চায়না, রাধা চায় শ্যাম। একবার হয়ত পুষ্পাসনের উপর বসিয়া রাধা ভাবিয়াছিল, এখন যদি শ্যাম আসেতো মান করিব, কথা কইবনা ; কিন্তু হায় কা'র সঙ্গে মান, শ্যামত এলোনা !

এদিকে ফুলশয্যা বাণী। হইতে চলিল। রজনীর শেষ তারা গুলি জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিয়া যাইতেছে, পূর্ব্বাশা গগন, ধীরে ধীরে রক্তিমরাগে রঞ্জিত হইতেছে। তখন রাধা কাঁদিতে কাঁদিতে—"সখিগণের বদন চেয়ে,বল্‌তেছে ললিতার কাছে, আর নিশি নাই প্রাণ সইগো ! শ্যামের আসার আশা কি আছে ?"

এই যে একটী কথার ভাব সহস্র কথায়ও ব্যক্ত করা যায় না, বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিগণের ভনিতায়ও এমন দুইটী কথা বিরল, এই একটী কথার উপর কত গুলি কথার নির্ভর করিতেছে। রাধার মনে কত কথা, কত উৎকণ্ঠা এই একটী কথা দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে। মনের ভিতর ভাব আসে, কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, নিরাশ প্রনয়িনী রাধার তৎকালীন মনের ভাব, পাঠকগণ, মনে মনে উপলব্ধি করিতে থাকুন—সেই একটী পদ—"শ্যামের আসার আশা কি আছে ?"

তার পর রজনী প্রভাত হইল। নিষ্ঠুর শ্যাম আর আসিল না। রাধা সখীগণের সহিত সে রাত্রি কৃষ্ণ প্রেমের একাদশী করিলেন। একবারে নিরম্বু উপবাস ! কিন্তু সেই রজনীর ফল আবার কৃষ্ণকে হাতে হাতে পাইতে হইয়াছিল।—

যখন—

২। "চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হতে, রজনী প্রভাতে,
রাধার নাথ রাধার কুঞ্জে যান,
রাধে কমল মুখী, হয়ে মন দুঃখী,
(শ্যামের উপরে) করলেন দুর্জ্জয় মান॥
রাধার মান দেখে শ্যাম গিরিধারী ব্যস্ত অতিশয়,
সে যে কেন্দে রাধার কাছে কয়, ব্যস্ত অতিশয়,
(বলে)—তুমি গো রাই ব্রজেশ্বরী,
আমি তোমার আজ্ঞাকারী,
এ অপরাধ ক্ষমা কর প্যারী, ধরি তোমার রাঙ্গা পায়।"

শ্যামকে তদবস্থ দেখিয়া সহচরীগণ বলিতেছেন—

তোমার মনের ভাব কেশব কিছুই বুঝ্‌তে নারি,
তাইতে জিজ্ঞাসি হরি ! বল খুলে,
কৃষ্ণ কও হে শুনি, ও শ্যাম চিন্তামণি,
ভাস কেন নয়ন জলে।
তুমি গোলক বিহারী হরি,
ব্রজেতে বংশীধারী
(ত্রিগুণধারী—)
তোমার নাম নিলে জীবে তরে ভববারি,
শ্রীচরণ ঘেমে ছিল, দ্রবময়ী গঙ্গা হল,
কোন গঙ্গা হবে বল চক্ষের জলে ?
কৃষ্ণ কও হে শুনি, ও শ্যাম চিন্তামণি,
ভাস কেন নয়ন জলে।
যেমন রাহুর ভয়ে শশী ব্যস্ত,
তেম্‌নি দেখ্‌তে পাই।
ভালবাসি বইলে তাই জিজ্ঞাসি,
কৈ হে চূড়া, কইহে বাঁশী,
কি জন্য হে কালশশী, শশীর মুখে মধুর হাসি নাই,
যেমন সীতা হারা হয়ে বনে, কেঁদেছিলেন রাম,
আমরা রামায়ণে শুনিলাম, কেঁদেছিলেন রাম
আজ কি হারা হয়ে রাধার চরণ, বিচ্ছেদ অশ্রু হচ্চে পতন,
ধরে রাধার চরণ, রামের মতন, করছ রোদন বাঁকা শ্যাম ?

(ঝুমুর)

বল বল শুনি গুণমনি ওই চাঁদ বদনে,
বলতে বাধা কিহে রাধার নাথ, কি হয়েছে আজ রাধার সনে,
মণিহারা ফণীর মতন গুণমনি হলে কেনে
হয়ে কি ধন হারা, এমনি ধারা, ধারা বহে দুনয়নে।

উল্লিখিত গানটীর মধ্যে "ধরি তোমার রাঙ্গাপায়" কথাটী কত মধুর, শুনিলে জয়দেবের সেই "দেহিপদ-পল্লব" কথাটী মনে হয়। অথচ জয়দেবের সেই "দেহিপদপল্লব মুদারম্‌" হইতে একেবারে খাসবাঙ্গালী-কবির, এই "ধরি তব রাঙ্গাপায়" কথাটী অধিকতর পরিচিত বলিয়া মনে হয় নাকি ? কি মধুর ভাবময় ! যেন আমাদের সর্ব্বাপেক্ষাপ্রিয়, পরিচিত গানটী কেহ হারমোনিয়ম দ্বারা কানের কাছে সা রে গা মা করিয়া ধীরে ধীরে বাজাইয়া নিতেছে। গানটী শুনিলে

আহার নিদ্রা থাকেনা, শৈশবের কত জীর্ণ পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠে।

৩। মথুরায় এসে বৃন্দে, গবিন্দের পদারবিন্দে কয়,
সে যে ত্রিভঙ্গ বিহনে, নিত্য বৃন্দাবনে,
দিনের দিনে সব হইল শূন্যময়।
আমরা জন্মের মতন, কুলমান আর জীবন যৌবন তোমাকে দিয়ে
কৃষ্ণ তোমার পদে আছি বিকাইয়ে।
তুমি হলে না অনুকূল,
কেবল মজাইলে গোপীকুল
অকূল সাগরেতে গোকুল দিলে ভাসাইয়ে।
গোপীর সর্ব্বস্ব ধন, ব্রজের জীবন, তুমি কৃষ্ণধন,
বিক্রীত হয়েছ এখন, এসে এই মথুরায়।
বল বল ও নীল রতন, দিয়ে কি অমূল্য রতন,
কুজাধনী কিনেছে তোমায়?

এই সঙ্গীতটী সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ভাষা ছন্দ ও ভাব মাধুর্য্যের হিসাবে এই গানটী তুলনা রহিত। আদ্যন্ত অনুপাসের অট্টহাসিতে সমুজ্জ্বল।

৪। অযোধ্যায় আসিয়ে, রাজধানীতে প্রবেশিয়ে—
প্রমাদ ভাবিয়ে ভরত কেন্দে কয়,
কৈ সে অযোধ্যার সে শোভা কৈ?
জয় পতাকা ধ্বজা কৈ?
জয়ধ্বনি কৈ?
নৃত্য গীত আর মঙ্গল বাদ্য কৈ?
পিতে রাজেন্দ্র দশরথ কৈ?
রাজ্যেশ্বরী মাতা কৌশল্যা কৈ?
ভ্রাতৃ বৎসল দাদা রামচন্দ্র কৈ?
রাজলক্ষ্মী মাতা জানকী কৈ?
বীরেন্দ্র ভাই লক্ষ্মণ কৈ;
শুনে ভরতের খেদের কথা, কৌশল্যা পেয়ে ব্যথা (অপার)
কেন্দে বলে সর্ব্বনাশ ঘটেছে;
বাছা ভরত আয় রে কৈ কৈ।
তোর জননী কৈকেই রামকে বনবাস দিয়াছে।
বাপ্ রে তোর জননী তোর কারণ,
রামের অঙ্গের আভরণ,—স্বহস্তে খুলে,
যত্ন করে রেখেছে রে ভুলে,—(তোকে পরাবে বইলে)
বাপরে সে সব অঙ্গে ধারণ করে,
রামের বেশে মোর কোলে আয় রে,
চন্দ্র বদন নিরখিয়ে যুরাক্ রে তোর এ মার জীবন।

(ঝুমুর)

লক্ষ্মী জানকী আর বাছা লক্ষ্মণ, রামের সনে বনে যায়,
তাদের বেশ ভূষা অঙ্গের আভরণ
কেড়ে রাখ্ লয়ে তোর মায়,
ক্রমে তিন শিশুরে পড়ায় যোগীর বেশ,
তোর মার মনে কিরে হায়! নাইরে দয়ার লেশ,
তবু শিশু রাম, করে তোর মাকে প্রণাম,
বলে মা হলেম বিদায়।

আর একটী গানের কথা মনে পড়িতেছে, সেটী নিমাই সন্ন্যাস। নবদ্বীপচন্দ্র বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিলে পর পুত্র বিরহ বিধুরা শচীমাতা দিবসে প্রদীপ জ্বালিয়া নগর অন্বেষণ করিয়াছিলেন। গানটী বড়ই মর্ম্ম-স্পর্শী, ইহার প্রত্যেকটী পদ অশ্রুজলে গাঁথা—

"রাণী দিবসে জ্বালিয়া বাতি
খুঁজে নগর পাতি পাতি,
ভাসিয়ে নয়ন জলে,
যাঁরে দেখে, তারে বলে,
দেইখে থাকলে দেরে বইলে,
প্রাণের নিমাই গেল কোন পথে।"

* * * *

গানটী গাহিতে গায়কের কণ্ঠ রুদ্ধ হয় শ্রোতার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া যায়। গৌর মাতার ক্রন্দনে পাষাণ গলিয়া ধারা বহে। গানটী সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

এইস্থানে আর একটী কথা বলা আবশ্যক এই সকল গান চিতান, পরচিতান, ধুয়া, লহর, মহরা, খাদ, ঝুমুর প্রভৃতি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। এক একটী অংশের এক এক রকম ছন্দ ও সুর।

এইবার মালী তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ করিয়া যোগদান দিয়া বিদায় মাগিতেছে। সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ বিশেষজ্ঞের কাছে; মালীর ইহার অধিক বলিবার কিছুই নাই। *

শ্রীচন্দ্রকুমার দে।

---

* কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের জন্য।

বিষ্ণুর বিকাশ।

বিষ্ণু ত্রিমূর্ত্তির অন্যতম মূর্ত্তি। সুতরাং তাঁহার বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা যে বিশেষ কৌতুকাবহ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দুর সমস্ত প্রধান দেবতার ন্যায় বিষ্ণুর মূল কল্পনাও বেদেই দেখিতে পাওয়া যায়। "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূলহমস্য পাংশুরে।" এই বৈদিক ঋক্‌টী অনেকেরই নিকট সুবিদিত। বিষ্ণু এইরূপে বেদে স্তুত হইলেও তিনি বেদের প্রধান দেবতারূপে স্তুত হন নাই। তদুদ্দেশ্যে বেদে অল্প কয়েকটী মাত্র মন্ত্রই বিরচিত দেখিতে পাওয়া যায়। একাধিকস্থলে * ইন্দ্রের সহিতই তাঁহাকে একত্র স্তুত হইতে দেখা যায়। একস্থলে (১।২২।১৯) "তিনি ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা"—"ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা,"—বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে ইন্দ্রের সহিতই বিষ্ণুর বিকাশের যোগ আছে, মনে করা যাইতে পারে।

আর্য্যগণ পঞ্চনদ প্রদেশে উপনীত হইলেই ইন্দ্রের বিকাশ হয়, ইহাই পুরাতত্ত্বজ্ঞদিগের মত। ইন্দ্রের নাম পারসীক বা পাশ্চাত্য কোন আর্য্যশাখার ভাষায় পাওয়া যায় না। ইহাতে তাঁহার বিকাশ যে ভারতবর্ষেই হয় তাহাই প্রমাণিত হয়। ভারতবর্ষ বর্ষাপ্রধান স্থান বলিয়া বর্ষায় অধিষ্ঠাতৃ দেব ইন্দ্রের বিকাশ ভারতবর্ষে হওয়া প্রাকৃতিক কারণেও সম্পূর্ণ ই স্বাভাবিক। ইন্দ্রের 'বৃষা' ও 'মেঘবাহন' নামে বর্ষার সহিত তাঁহার স্পষ্টযোগেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইন্দ্রের সহিত বিষ্ণুর নাম সংযুক্ত থাকায় বিষ্ণুরও বিকাশ যে ভারতবর্ষে হয়, তাহাই আমরা অনুমান করিতে পারি। বিষ্ণুকে বেদে যে ইন্দ্রের সখারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে ইন্দ্রের অপেক্ষা অপ্রধান বলিয়াই তাঁহাকে বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং ইন্দ্রের পরে তাঁহার বিকাশ হয়, ইহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ অভিধানে বিষ্ণুর যে নাম পাওয়া যায় তাহাও ইহারই সমর্থন করিয়া থাকে। অমরকোষে বিষ্ণুর নাম পর্য্যায়ে লিখিত হইয়াছে—"উপেন্দ্র ইন্দ্রাবরজশ্চক্রপাণি-শ্চতুর্ভুজঃ।" 'উপেন্দ্র' নামে বিষ্ণু যে ইন্দ্রেরই সহচর ও সহায় এই অর্থ ই উপলব্ধ হইতেছে। তিনি বেদে যে "ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, 'উপেন্দ্র' নামটী সম্পূর্ণরূপে তাহারই মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছে। 'উপেন্দ্র' নামের পরই যে বিষ্ণুর 'ইন্দ্রাবরজ' নাম পাওয়া যায় তাহাতে বিষ্ণু ইন্দ্রেরই পরে জাত বলিয়া বুঝা যাইতেছে। ইহাতে বিষ্ণুর বিকাশ যে ইন্দ্রের বিকাশের পরবর্ত্তী তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

ইন্দ্র যেমন বৃষ্টি দান করেন, সূর্য্যও তেমনই বৃষ্টি দান করেন। শাস্ত্রে আছে ঃ—

> "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্য মুপতিষ্ঠতে।
> আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা॥"

"অগ্নিতে আহুতিদান পূর্ব্বকই সূর্য্যের সম্যক্ উপাসনা করা হয়; সূর্য্য হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়—বৃষ্টি হইতে অন্ন জন্মে ও অন্ন হইতে লোক জন্মে।"

বিষ্ণু আদিত্যেরই অন্যতম ; যথা ঃ—

> তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেবহি :
> বিবস্বান্ সবিতাচৈব মিত্রোবরুণ এবচ।
> অংশোভগশ্চাতিতেজা আদিত্যাঃদ্বাদশাঃস্মৃতাঃ॥"
>
> বিষ্ণুপুরাণ ১।১৫।১০

ইহা হইতে বিষ্ণু যে সূর্য্যেরই রূপান্তর তাহা আমরা পরিষ্কার জানিতে পারিতেছি। বিষ্ণু সূর্য্যের রূপান্তর হইলেও ভারতবর্ষে যখন ইঁহার বিকাশ হইয়াছে—তখন ইঁহাকে বিশেষরূপে ভারতাকাশের সূর্য্যেরই রূপ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ভারতবর্ষেই আর্য্যগণ সূর্য্যকে মধ্যগগনে মস্তকের উপর প্রথম বিরাজমান দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের উত্তরে থাকিতে সূর্য্যকে তদ্রূপ মস্তকের উপর দেখিবার সম্ভাবনা ছিল না। ভারতবর্ষে আসিয়া মস্তকোপরি পরিদৃশ্যমান চতুর্দ্দিক উদ্ভাসনকারী সূর্য্যকে প্রথম দর্শন করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব ভাস্বররূপে অভিভূত হওতঃ আর্য্যগণ সর্ব্বতোব্যাপী বলিয়া নূতন 'বিষ্ণু' নামে তাঁহার উপাসনা করিয়াছিলেন।

* ঋগ্বেদ ১।১৫৫, ৬।৬৯।

বিষ্ণু যে মধ্যাকাশেরই সূর্য্য দেবতা, আমাদের মধ্যাহ্ন গায়ত্রীর ধ্যানেই তাহার যথেষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যাহ্ন গায়ত্রীর ধ্যান এই—

(মধ্যাহ্নে) "বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসীম্।"

'মধ্যাহ্নগায়ত্রী বিষ্ণুস্বরূপা—তিনি গরুড়ারূঢ়া ও পীত-বস্ত্রপরিহিতা'। বিষ্ণুকে যে আমরা 'গরুড় বাহন' ও 'পীতাম্বর' রূপে দেখিতে পাই, তাহা মধ্যাহ্নগায়ত্রীর ধ্যান অনুসারে। সুতরাং তিনি যে বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

সূর্য্য মধ্যাকাশে মাথার উপর আসিলে গরুড়জাতীয় বৃহৎ পক্ষী সকলকে তন্নিম্নে আকাশে উড্ডীন হইতে দেখা যায়—তাহা হইতেই গরুড় বিষ্ণুর বাহনরূপে কল্পিত হইয়াছে। বিষ্ণুর ধ্যানেও আমরা তাঁহাকে স্পষ্টই মধ্যাহ্ন সূর্য্যরূপী বলিয়া বুঝিতে পারি; যথা--

"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্
কিরিটী, হারী হিরণ্ময়বপু
ধৃতশঙ্খ চক্রঃ॥"

এস্থলে বিষ্ণুকে কেবল সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা বলিয়াই বর্ণনা করা হয় নাই; কিন্তু সূর্য্যের প্রখর মধ্যাহ্ন কিরণের স্বর্ণচ্ছটাও বিষ্ণুর স্বর্ণকান্তি এবং স্বর্ণভূষণে আরোপিত হইয়াছে।

মধ্য গগনে সূর্য্যের অবস্থান হইতে চতুর্দ্দিকে তাহার কিরণ বিস্তারে মধ্যাকাশবর্ত্তী সূর্য্যরূপী বিষ্ণু যে চতুর্ভুজ-রূপে কল্পিত হইবেন, তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

বিষ্ণু যে 'চক্রপাণি' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন—তাহারও মূল বেদে পাওয়া যায়; যথা—

চতুর্ভিঃ সাকং নবতিং চ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্তং ব্যতীঁরবীবিপৎ।
বৃহচ্ছরীরো বিমিমান ঋকভির্যুবাকুমার প্রত্যেত্যাহবং॥" ৬
ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৫৫ সূক্ত।

"বিষ্ণু গতি বিশেষ দ্বারা বিবিধ স্বভাব বিশিষ্ট, চতুর্ণবতি (কালাবয়বকে) চক্রের ন্যায় বৃত্তাকারে চালিত করিয়াছেন। বিষ্ণু বৃহৎ শরীর বিশিষ্ট ও স্তুতি দ্বারা পরিমেয়; তিনি নিত্য তরুণ ও অকুমার, তিনি আহবে গমন করেন।" এই বর্ণনা হইতে বিষ্ণুর চক্রটী যে 'কালরূপচক্র' তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি।

বিষ্ণু যে বিশেষরূপে জগতের রক্ষা ও পালনকর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহার সূচনাও বেদেই দেখিতে পাওয়া যায়; যথা :—

"ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।
অতোধর্ম্মাণি ধারয়ণ্॥" ১৮
(ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ২২ সূক্ত।)

"বিষ্ণু রক্ষক, তাঁহাকে কেহ আঘাত করিতে পারে না, তিনি ধর্ম্ম সমুদয় ধারণ করিয়া তিনপদ পরিক্রম করিয়াছিলেন।"

বিষ্ণুর বামনাবতারে তিন পদ বিক্ষেপে বলী দমনের পৌরাণিক উপাখ্যানেরও মূল এই ঋকে পাওয়া যাই-তেছে। সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া মধ্যাকাশ আরোহণ পূর্ব্বক পশ্চিম আকাশে গমন করতঃ আকাশের এই যে তিনস্থানে পরিভ্রমণ করেন, তাহাই বিষ্ণুর তিন পাদবিক্ষেপরূপে কল্পিত হইয়াছে। সূর্য্যের শূন্যে তিনস্থানে পরিভ্রমণের দ্বারা পৃথিবীর নিম্নপৃষ্ঠে অন্ধকার অপসারিত হয়, তাহাতেই প্রথমোদিত অরুণ-ভানু—বিষ্ণুর বামনাবতার ও জগদ্ব্যাপী ঘোর নিশান্ধকার দৈত্যরাজ বলীরূপে কল্পিত হইয়াছে। বলীও পৃথিবীতে স্থান না পাইয়া পাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এস্থলে অবতার-তত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা কর্ত্তব্য বোধ করি। আমরা বিষ্ণুরই অবতার কল্পিত দেখিতে পাই। ত্রিমূর্ত্তির অন্য কোন দেবতারই অবতার দেখিতে পাই না। ধর্ম্মের রক্ষা ও সাধুদিগের পালনই অবতারের উদ্দেশ্য। যথা গীতায়—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

বিষ্ণু ত্রিমূর্ত্তির রক্ষা ও পালন মূর্ত্তি বলিয়া ধর্ম্মরক্ষা ও সাধু পালনের জন্য তাঁহারই অবতার কল্পিত হওয়া সঙ্গত। উপরি উদ্ধৃত বৈদিক ঋকে বিষ্ণুকে ধর্ম্মের আশ্রয়রূপে আমরা যে বর্ণিত দেখিতে পাই, তাহাতে তাঁহার অবতার বাদের সারসত্যটীই নিহিত রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

ইন্দ্র যেমন 'মেঘবাহন', বিষ্ণু তেমনই 'নারায়ণ';

উভয়ের সহিতই মেঘের যোগ আছে। কিন্তু ইন্দ্র কেবল পৃথিবীর উর্ব্বরতা সম্পাদন করেন; বিষ্ণু দ্বারা যেমন পৃথিবীর উর্ব্বরতা সাধিত হয়—তেমনই শস্যাদিও উৎপাদিত হইয়া জীব জগতের পুষ্টি এবং রক্ষাও সাধিত হয়। এই প্রকারে ইন্দ্রের অপেক্ষা বিষ্ণুর অধিক মাহাত্ম্য হেতু বিষ্ণুই অপর সকল দেবতার উপর প্রাধান্য লাভ করিলেন।

ইন্দ্রের অপেক্ষা বিষ্ণুর পূর্ব্বোক্ত প্রাধান্য যে কোন সময়ে প্রখ্যাপিত হয়; তাহার আভাসও আমরা শাস্ত্রাদি হইতেই প্রাপ্ত হইতে পারি।

বিষ্ণু গোচারণ স্থানে বিশেষরূপে প্রকাশ পাইতেছেন বলিয়া আমরা বেদে বর্ণনাপ্রাপ্ত হই। যথা—

"তাবাং বাস্তুন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্রগাবো ভূরিশৃংগা অযাসঃ।
অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতিভূরি॥" ৬

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৫৪ সূক্ত।

"যে সকল সুখের স্থানে ভূরিশৃঙ্গ বিশিষ্ট ও ক্ষিপ্রগামী গোসমূহ বিচরণ করে, সেই সকল স্থানে গমনার্থ তোমাদের উভয়ের প্রার্থনা করি। এই সকল স্থানে বহু লোকের স্তুতি যোগ্য অভীষ্টবর্ষী বিষ্ণুর পরমপদ প্রভূত স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে।"

এখানে গোচারণের স্থানটী বিষ্ণুর বিশেষ প্রকাশের স্থানরূপে বর্ণিত হওয়ায় বিষ্ণুর বিকাশ যে সূর্য্যের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী ভারতবর্ষে আর্য্যদিগের অধিষ্ঠানের পর হয়, তাহারই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। পরন্তু গোচারণের সঙ্গে বিষ্ণুর প্রকাশের বিশেষ যোগ হইতে আর্য্যদিগের গোপালন সময়ই যে বিষ্ণুর কল্পনা হয়, তাহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে। বিষ্ণুর 'গোবিন্দ' নামে গোদিগের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়; তাহারও মূল আমরা এখানে পাইতেছি।

বিষ্ণুর যে এক নাম 'শার্ঙ্গী' তাহার ব্যাখ্যা আর্য্যদিগের গোপালনের মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে। শৃঙ্গ বাদন পূর্ব্বক গোসকলকে গোষ্ঠে চালন করার নিয়ম যে কেবল আমাদের দেশেই প্রচলিত ছিল তাহা নহে—পাশ্চাত্য দেশেও প্রচলিত ছিল।

সোমরসের পরিবর্ত্তে হবিঃ যোগে যজ্ঞ সম্পাদনের আবশ্যকতা হইতেই আর্য্যগণ গোপালনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। গো যে যজ্ঞের জন্য বিশেষ উপযোগী ছিল 'হোমধেনু' নামেই আমরা তাহা বুঝিতে পারি।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাধান্য বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেই যে বিষ্ণুর বিকাশ হয়, তাহা নারায়ণের নমস্কার মন্ত্রটী আলোচনা করিলে বিশেষরূপেই আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে। সেই মন্ত্রটী এই—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায়চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

এখানে নারায়ণকে যেমন 'ব্রহ্মণ্যদেব' বলা হইয়াছে তেমনই তাঁহাকে 'গোব্রাহ্মণহিত' বলিয়াও বলা হইয়াছে। ইহাতে তিনি যে বিশেষরূপে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পক্ষপাতী ও ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠপোষক তাহার স্পষ্ট উল্লেখই পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার 'গোবিন্দ' নামেও 'গোর হিতকারী' রূপে বর্ণনায় গোর সহিত তাঁহার বিকাশের যোগ স্পষ্টাক্ষরেই প্রকটিত হইতেছে।

এই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সময়—ভারতেতিহাসে ক্ষত্রিয়ের অধঃপতন ও ব্রাহ্মণের অভ্যুদয়ের কাল বলিয়া অনুমিত হয়। ইন্দ্র বলবীর্য্যেরই দেবতা। সুতরাং তিনি যে বিজয়ী ক্ষত্রিয়ের দেবতা হইবেন, তাহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। ক্ষত্রিয়দিগের দ্বারা বিজয় ও সমৃদ্ধির জন্য ইন্দ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বহুল বর্ণনাই পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ বিশেষভাবে বিষ্ণুর উপাসক বলিয়াই ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কাহারও বিষ্ণু পূজায় অধিকার দেখা যায় না। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াই আর্য্যদিগকে বিশেষরূপেই আত্মকলহ ও অনার্য্য দমনে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল। এই সময়েই ক্ষত্রিয় প্রাধান্যের সময় ও ইন্দ্রোপাসনার সময়। ইহার পর আর্য্যগণ শান্তিতে উপনিবিষ্ট হইলেই ব্রাহ্মণের প্রাধান্যের সময় ও তৎসঙ্গে হোম সম্পাদনের সময় আসে। এই সময়ে ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা বিষ্ণু যজ্ঞদেব রূপে পরিণত হন। তাহাতেই "যজ্ঞোবৈবিষ্ণুঃ" (যজ্ঞই বিষ্ণু) এইরূপ শ্রুতি প্রচলিত হইয়াছে। এই হোমের জন্যই ব্রাহ্মণগণ বিশেষরূপে গোপালন করিতে আরম্ভ করেন। এই গোপালনোপলক্ষেই গোপালন স্থানের নামানুসারে ব্রাহ্মণদিগের 'গোত্রের' উৎপত্তি হয়। গোপালন যে আদিতে ব্রাহ্মণদিগেরই কার্য্য ছিল—ব্রাহ্মণের গোত্রই

যে আর সকল জাতি প্রাপ্ত হইয়াছে—তাঁহাদের নিজের যে কোন স্বতন্ত্র 'গোত্র' ছিল না—এই ঐতিহাসিক সত্য দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হয়।

গোপালনকে মূল করিয়া শান্তির সময়ে ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এই কারণেই বোধ হয় ইহা অনেকাংশে অহিংসামূলক হইয়াছে। কিন্তু তান্ত্রিক ও অপর বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিকূল প্রভাব আসিয়া এই ধর্ম্মের বিকাশে বাধা প্রদান করিয়াছিল। পরে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে নির্জ্জীব বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনর্ব্বার সজীবতা লাভের সময় আসিল। শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে প্রথমেই 'ইন্দ্রযজ্ঞ' বন্ধ করিয়া দিয়া যেমন হিংসামূলক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রথম প্রকাশ্য প্রতিপক্ষতা প্রদর্শন করিলেন, তেমনই বিষ্ণু যে ইন্দ্রেরই প্রতিদ্বন্দ্বী তাহারও প্রমাণ প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মের অহিংসা ভাবের বিকাশের পরাকাষ্ঠা সাধিত হইল। তিনি গোপালন ধর্ম্মেরও চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার 'গোপাল' নামে ইহার চির নিদর্শনই বিদ্যমান রহিয়াছে। তদীয় বাল্যলীলা স্থানের 'গোকুল' নামেও তাঁহার গোসংস্রবেরই বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণের সময় আর্য্যদিগের কৃষিজীবনের সময় (Agricuitural stage)। তাঁহার 'কৃষ্ণ' নামের ব্যুৎপত্তিতেও কৃষির সহিত যোগেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। তদীয় অগ্রজের 'হলী', 'হলধর' নাম কৃষির আরও সুস্পষ্ট প্রমাণই প্রদান করিয়া থাকে। কৃষ্ণ যে 'মুরলীধর' নামে পরিচিত তাহাতেও কৃষিজীবনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে বংশীবাদন যে বিশেষরূপে গোপালনের আনুষঙ্গিক 'shepherd's pipe' (রাখালের বাঁশী) কথায়ই তাহার স্পষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান দেখা যায়।

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব ধর্ম্মকে অভূতপূর্ব্ব নূতন রূপ ও নূতন জীবন প্রদান করেন বলিয়াই তিনি বিষ্ণুর অবতাররূপে পরিগণিত না হইয়া স্বয়ং বিষ্ণুরূপেই পরিচিত হইয়া থাকেন। এই প্রকারে সূর্য্যদেবতায় বিষ্ণুর বিকাশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণে বিষ্ণুর বিকাশের পরিপূর্ণতা সাধিত হইয়াছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

তিব্বত অভিযান।

টুনার পথে।

পরদিবস প্রাতঃকালে আমরা ফারী দুর্গে ফিরিয়া আসিলাম। গত রাত্রের ঝড় আপন ভীষণ প্রভাবের অনেক চিহ্ন গ্রাম ও দুর্গের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছিল। দুর্গের দুইটী সর্ব্বোচ্চ তোরণ বজ্রাঘাতে একবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পাঠক জানেন, দুর্গটী অত্যন্ত প্রাচীন। বহুদিবস মেরামত না হওয়াতে অনেক স্থান একবারে পতনোন্মুখ হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে কয়েকটী স্থান গত রাত্রে পড়িয়া গিয়াছিল। দুর্গ মধ্যস্থ লোকজন চাপা পড়িবার ভয়ে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছিলেন।

ইহার কয়েক দিবস পরে আমাদের জেনারেল সাহেব নূতন চুম্বিতে ফিরিয়া গেলেন। এই সময়ে আমাদের খাদ্যদ্রব্যাদি ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছিল। এই সকল আনয়ন করিবার জন্য কুলী ও খচ্চরই আমাদের প্রধান সহায়। কিন্তু যে সকল দ্রব্য আনীত হইত, তাহার প্রায় তৃতীয়াংশ বাহকেরাই খাইয়া ফেলিত। আমাদের সহিত এই সময়ে ফারীতে প্রায় ২০০০ সৈন্য ছিল। ইহাদের আবশ্যক দ্রব্যাদি বহন জন্য প্রায় চারি হাজার কুলী ও আসিয়াছিল। এই বিপুল লোক সংখ্যার উপযুক্ত খাদ্য

আমাদের সিকিমী কুলিগণ ঝুড়ী নির্ম্মাণ করিতে লাগিল।

দ্রব্য আনায়নের জন্য যে কি প্রকার আয়োজনের প্রয়োজন তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। ইহার জন্যই

জেনারেল সাহেব নূতন চুম্বিতে গমন করিয়াছিলেন। পর দিবস আমাদের সাহেব (কমিসেরিয়েটের প্রধান কর্ম্মচারী) ও তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন। গ্রামবাসীরা প্রায়ই আমাদিগের নিকট কোনও দ্রব্য বেচিত না। আমরা অনায়াসে বল প্রয়োগ করিতে পারিতাম। এরূপ অবস্থায় হয়ত কেহ আমাদিগকে অপরাধী করিতেন না। কিন্তু এবিষয়ে আমাদিগের উপর বিশেষ কঠিন আদেশ ছিল, দুই চারিজন সিপাহী এই আদেশ অমান্য করাতে অত্যন্ত কঠিন শাস্তি পাইয়াছিল।

এই সময়ে তিব্বতে যাইবার এক সহজ সাধ্য নূতন পথ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। যে পথে আমরা আসিয়াছি, তাহার কষ্টের কথা বিবৃত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারত হইতে তিব্বত গমনের এক পথ ফারী দুর্গের সম্মুখে আসিয়া শেষ হইয়াছে। ইহা ভোট রাজ্যের ভিতর দিয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে এইপথ খুব সুগম। আমরা তখন ভোটরাজের অভিমত আনাইয়া এইপথ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলাম।

ফারীতে প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য রাখিয়া আমরা ৪ঠা জানুয়ারী টুনা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

পথিমধ্যে আমরা 'চোরটেন্ কারপো' (শ্বেত-গম্বুজ) দুর্গ দেখিতে পাইলাম। দুর্গস্বামীর নাম কর্ণেল চাও। তিনি একজন চীনা কর্ম্মচারী। খুব ভদ্রলোক বলিয়া মনে হইল। স্বয়ং অগ্রবর্ত্তী হইয়া বিশেষ সম্মান ও যত্নের সহিত অধিকাংশ কর্ম্মচারীকে জলযোগের জন্য আহ্বান করিলেন।

ইঁহার নিকট শুনিলাম, রুষ কর্ম্মচারী সুপ্রসিদ্ধ ডর্জিথ্ ঐ সময়ে লাসায় অবস্থান করিতেছেন। তিনি যে রাস্তা ভুলিয়া বা দলাই লামার চরণদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন তাহা কেহই মনে করিবেন না। শুনিলাম তিব্বত যাহাতে ইংরেজের নিকট অবনত না হয়, তাহারই সৎপরামর্শ দিবার জন্য তিনি লাসায় উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি নাকি দলাই লামাকে ভরসা দিয়াছেন যে, রুষের ভয়ে ইংরেজ অবিলম্বে তিব্বত ছাড়িয়া পলায়ন করিবেন। কর্ণেল মহাশয় ইহাও বলিলেন যে, দলাইলামার যে যে কর্ম্মচারী ইংরেজের পক্ষ সমর্থন করিতেছিল, তিনি তাঁহাদিগকে অত্যন্ত কঠিন শাস্তি দিতেছেন।

পরদিবস আমরা প্রসিদ্ধ টংলা গিরিপথ (Pass) অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহার উচ্চতা প্রায় ১৫০০০ফুট। জানুয়ারী মাসে এমন স্থানে যে কি প্রকার শীতের আধিপত্য, তাহা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না। যেদিকে দেখি বরফের স্তূপ ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। এই স্থানে আমাদিগকে এক রাত্রি থাকিতে হইয়াছিল। সমস্ত লোকের উপযুক্ত তাঁবু না থাকাতে আমাদের কয়েক জন সিপাহী ও কর্ম্মচারী বরফের ঘরে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। বরফের ঘরের কথা পুস্তকে পড়িয়াছিলাম বটে, কিন্তু স্বচক্ষে কখনও দেখি নাই। আজ চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল।

প্রথমে একটা স্থানে গোল দাগ করা হয়। তাহার পর ইষ্টকের আকারে বরফকে কাটিয়া লইয়া গুম্বুজের মত ঘর প্রস্তুত হয়। একখানা গোল চুপড়ী উলটাইলে যেমন দেখায় এই ঘরও অনেকটা সেই রকম। ইহার প্রবেশ দ্বার দুইপ্রকারে রাখা হয়। পাশের দিকে অনধিক দেড় বা দুই ফুট স্থান খালি রাখা হয় গৃহস্বামীকে গুড়ি মারিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। লোক প্রবেশ করিবার পর একখানা বরফের বড় টুকরা দ্বারা ঐ গহ্বরের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অনেক গৃহের মাথার উপর ঐ প্রকার ছিদ্র থাকে। এই সব বরফের ঘর যে কি প্রকার আরাম জনক তাহা অনেকে জানেন না। তাঁবু অপেক্ষা ইহাতে অনেক গরম হয়। এই সকল এত গরম যে, এই জানুয়ারী মাসেও একখানা লেপ গায়ে দিয়া অনায়াসে রাত্রিবাস করা যায়। অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে, এই বরফের ইট সকল গলিয়া গৃহবাসীকে ভিজাইয়া দেয়। এ ধারণা একেবারে অমূলক। ঐ দিন রাত্রে আমি নিজে সখ করিয়া একটা বরফের ঘরে রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম। সে দিন আমরা মাটির তেলের ষ্টোভে চা ও ডিম সিদ্ধ করিয়াছিলাম। ইহাতেও ঘরের কোনও স্থান হইতে বরফ গলে নাই।

এই সমস্ত শীত প্রধান স্থানে অনেক সময় জলের জন্য বড় কষ্ট পাইতে হয়। প্রাতঃকালে বরফ না গলাইলে এক বিন্দু জল পাওয়া যায় না। সে জল এত শীতল যে, তাহাতে হাত দিলে হাত যেন কাটিয়া দেয়। শুনিলাম,

এখানকার লোক রাত্রে শুইবার সময় ২।৩টা বড় বোতলে বরফের ক্ষুদ্র ২ টুকরা ভরিয়া নিজের পাশে রাখিয়া দেয়। প্রাতঃকালে ঐ সকল বোতল হইতে জল পাওয়া যায়।

এই গিরিশঙ্কটে শীত এত প্রখর যে,আমাদের সৈন্যদের বন্দুকের চোঙ প্রভৃতির মধে, বরফ জমিয়া গিয়া সেগুলিকে একবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া দিয়াছিল। ঐ সময়ে যদি বিপক্ষ পক্ষ আমাদিগকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে নিশ্চয় আমাদিগকে দাঁড়াইয়া মার সহিতে হইত।

এইস্থান হইতে হিমালয়ের দৃশ্য অত্যন্ত মনোমুগ্ধ কর। দক্ষিণে চুমল-হরি গিরিশৃঙ্গ আকাশ পর্য্যন্ত চলিয়া

ছেলেবেলায় পড়িয়াছিলাম, "তিব্বত এক অধিতকা বা টেবিল ল্যাণ্ড"। তাহাতে এই বুঝিয়াছিলাম যে উহা একটী সমতল ভূমি, পাহাড় পর্ব্বতের সহিত বড় একটা সম্বন্ধ নাই। আজ দেখি, ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখি পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত, তাহার পর পর্ব্বত—ক্রমান্বয়ে চলিয়া গিয়াছে।

পরদিবস বেলা এগারটার সময় আমরা ঐ গিরি শঙ্কট পার হইয়া তিব্বতে পদার্পণ করিলাম। প্রথম কয়েক মাইল পথে আমাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল। সমস্ত স্থান ক্ষুদ্র উপল খণ্ডে পরিপূর্ণ। কুলীদের পায়ে
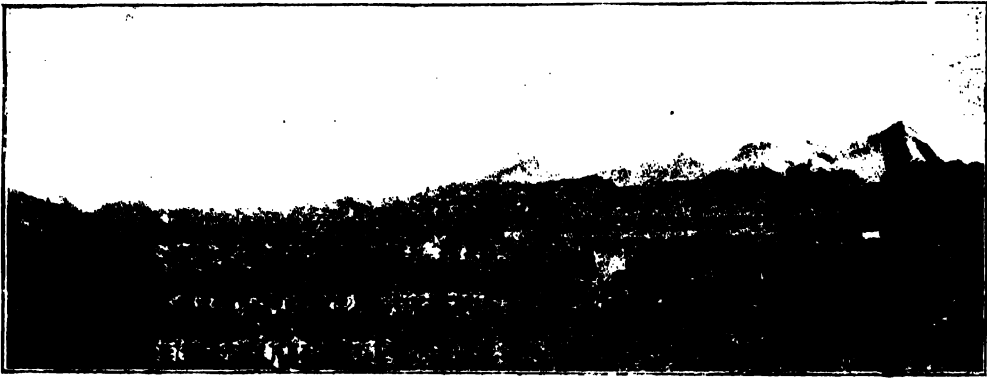
টুনা উপত্যকায় ইংরেজশিবির অদূরে চুমল হরি শৃঙ্গ।

গিয়াছে। বামে ও পশ্চাতে অনন্ত পর্ব্বত মালা সাগর প্রবাহের মত কোনও এক অজ্ঞাত রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। সম্মুখে আমাদের ঠিক নীচেই তিব্বত। ভগবানকে আরাধনা করিবার কি সুন্দর স্থান! এই জন্যই আমাদের তীক্ষ্ণদর্শী প্রাচীন ঋষিরা হিমালয়ের এত পক্ষপাতী ছিলেন। গন্ধর্ব্বলোক; কিন্নরলোক; কুবের লোক, কৈলাশ, অমরাবতী প্রভৃতি সমস্ত স্থান ইহার মধ্যে কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা হয়ত ভাবিতেন, হিমালয় যখন এত সুন্দর অথচ দুর্গম, তখন দেবতারা ইহারই কোনওনাকোনও স্থানে অবস্থান করেন। যাঁহারা সংসারের জ্বালায় জর্জ্জরীভূত, শান্তির অস্তিত্ব এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছেন, তাঁহারা যদি একবার এখানে উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে ইহাকে যে অমরালয় বলিয়া মনে করিবেন ইহা সুনিশ্চয়।

জুতা না থাকাতে তাহারা খুব কষ্ট পাইতে লাগিল। খানিকদূর পরে দেখি চারিদিকে অনেকতিব্বতীয় গর্দ্দভ চরিয়া বেড়াইতেছে। এখানে ইহাদের নাম 'কিয়াং'। ইহারা প্রায় সকলেই দলবদ্ধভাবে বিচরণ করিতেছে। এতগুলা জন্তু চরিতেছে. অথচ ইহাদের কোনও রক্ষক নাই দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। পরে জানিতে পারিলাম যে, ইহারা বন্য গর্দ্দভ, কাহারও রক্ষিত নহে। গর্দ্দভ যে এত সুশ্রী হয়, তাহা আমি জানিতাম না। ইহাদের বর্ণ পাটকিলে মাঝে ২ কাল রংএর ডোর কাটা অনেকটা জেব্রার মত। তিব্বতীয়েরা বলে, ইহারা পোষ মানে না। সাহেবেরা এই নুতন জন্তু দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা সঙ্কল্প করিলেন যে, কয়েকটা কিয়াং লইয়া চেষ্টা করিয়া দেখিবেন পোষমানে কি না!

এই প্রস্তরময় প্রান্তরের দৈর্ঘ্যপ্রায় ১২ মাইল।

এগারটার সময় রওনা হইয়া সন্ধ্যার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ৬ মাইল মাত্র গমন করিতে পারিয়াছিলাম। ঘণ্টায় প্রায় এক মাইল পথ। স্থানটার অধিকাংশই সমতল বটে, কিন্তু উহা যে কি প্রকার দুর্গম, আমাদের উপরোক্ত বর্ণনা হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। যাহা হউক সন্ধ্যার সময় আমরা 'টুনা' গ্রামে উপস্থিত হইলাম। গ্রামখানি খুব ছোট অধিবাসীর সংখ্যা একশতের অধিক হইবে না। পূর্ব্বে এই গ্রাম নিকটবর্ত্তী রামহ্রদের তটে অবস্থিত ছিল। তখন নাকি এস্থানে অনেক লোক বাস করিত। এখন ঐ হ্রদ অনেক দূরে সরিয়া যাওয়ায় গ্রাম হতশ্রী হইয়া পরিয়াছে।

আবার ফিরিয়া আসিল। শেষে একান্ত অসহ্য হওয়াতে ঘরে আগুণ জ্বালিয়া দিলাম।

পরদিবস আমরা প্রাতঃকালে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। অনেক অনুসন্ধানের পর একটা উপযুক্ত স্থান মনোনীত করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র তাহাকে গড়বন্দী করিবার আয়োজন করা হইল। ইহার পর কাপ্তেন্ ওট্‌লে তিব্বতীয়দিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের জন্য কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত প্রেরিত হইলেন। তিনি টুনার পাঁচমাইল দূরে একদল তিব্বতীয় সৈন্য দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মতে উহাদের সংখ্যা ২০০ র কম নয়। এই সময় আমরা ফারী হইতে সংবাদ পাইলাম যে,

টুনা উপত্যকা অতিক্রম।
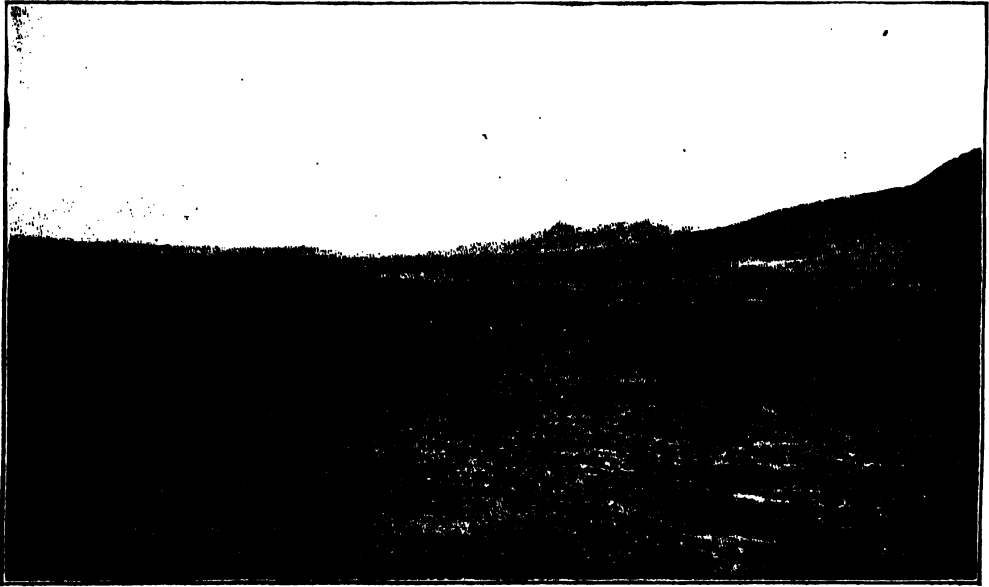
আমরা গ্রামের বাহিরে একটি ঝরণার ধারে শিবির সন্নিবেশ করিলাম। সকলেই অত্যন্ত শ্রান্ত ছিলাম বলিয়া সামান্য জলযোগ করিয়া শয়ন করিলাম। এতদিন পর্য্যন্ত আমরা পাহাড়ে ২ ঘুরিতেছিলাম; সেইজন্য রাত্রে শয়ন কক্ষে আগুন না জ্বালাইয়া শুইতাম না। আজ আমরা সমতল ভূমিতে উপস্থিত। ভাবিলাম আজ আর আগুন জ্বালিব না। সন্ধ্যা-রাত্রি একরমক কাটিয়া গেল। কিন্তু রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে ২ শীত এমন বৃদ্ধি পাইল যে, আমাদের হাত পা যেন জমিয়া যাইতে লাগিল। টংলার শীত যেন

সামরিক কর্ম্মচারী গ্রাণ্ট সাহেব অশ্বারোহণে আসিবার সময় তাহার সহিত পথিমধ্যে কয়েকজন তিব্বতীয় লামার দেখা হয়। তাহাদের সহিত কথোপকথনের সময় তিনি সহসা আক্রান্ত হয়েন। সাহেবের সহিত কয়েকজন মাত্র দেশী সিপাহী ছিল। তাহারা হঠাৎ আক্রমনের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করে। তিব্বত অভিযানের ইহাই প্রথম যুদ্ধ।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

সইদখাঁর বিচ্‌ কোঠা

আটীয়া পরগণার পাঠান জমিদারগণের পূর্ব্ব পুরুষ, আটীয়ার লোক-বাস স্থাপয়িতা, আদিম ভূম্যধিকারী সইদখাঁর বাসস্থান আটীয়া, রূপসী, ও পাকুল্যা— এই তিন স্থানেই প্রতিষ্ঠিত ছিল, বলিয়া জানা যায়। পাকুল্যাস্থিত সইদখাঁর ভবনে উত্তরকালে তদীয় বংশের বধূ মতিবিবি বসতি করিতেন। এই মহীয়সী মহিলা, প্রতাপে ও অবদানে আটীয়ার পাঠান নাম উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নির্ম্মিত হর্ম্ম্যে ও মসজিদে সইদখাঁর কীর্ত্তি আবৃত হইয়া পড়িলেও সেই সুপ্রাচীন কাল হইতে, বর্ত্তমান সময়ের কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একটি ক্ষুদ্র মন্দির বা প্রকোষ্ঠ, "সইদখাঁর বিচকোঠা" নামে পরিচিত হইত। ধ্বংসকারী কালের আঘাতে এবং পাঠান জমিদার দিগের উত্তরাধিকারি গণের ইষ্টক লোলুপতায় সইদখাঁও মতি-বিবির কীর্ত্তি সমস্তই বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। এখন আর 'বিচ কোঠা' নাই; উহা যে স্থলে অবস্থিত ছিল, লোকে ভূপ্রোথিত প্রাচীর দেখাইয়া তাহার নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। (১)

'বিচ কোঠা' বা 'গর্ভ-গৃহ' নাম হইতে মনে হয়, এক কালে ইহা বৌদ্ধ মন্দির ছিল। নিভৃতে ভজন সাধনের জন্য বৌদ্ধ যুগে গর্ভগৃহ নির্ম্মিত হইত। ইহার অন্য নাম 'অন্তর্গৃহ' বা গম্ভীরা। হিন্দুদিগের মধ্যেও অন্তর্গৃহ নির্ম্মাণের পদ্ধতি ছিল। নিভৃতে ভজন সাধনের জন্যত উহা নির্ম্মিত হইতই, মূল্যবান্ সামগ্রী রাখার জন্যও লোকে এরূপ প্রকোষ্ঠের প্রয়োজন বোধ করিত। শ্রীমদ্‌ভাগবতে অন্তর্গৃহের উল্লেখ আছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শেষ দশায় দিবারাত্রি 'গম্ভীরাতেই অবস্থান করিতেন। এই গম্ভীরা বা গর্ভগৃহই বিচ্‌ কোঠা, অর্থাৎ গৃহের মধ্যের গৃহ। বাউলেরা এখন ও যোগ সাধনের জন্য গম্ভীরা বা 'ছিলা'তে বসিয়া থাকে। তাহাদের গম্ভীরা, ঘরের ভিটা খুঁড়িয়া নির্ম্মিত হয়।

পাকুল্যা অতি প্রাচীন গ্রাম। ইহার প্রাচীনতার অনেক নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। ইহার নিকটে ভূমি খনন কালে কয়েকটি প্রাচীন কামান পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয় এক সময়ে পাকুল্যাতে বৌদ্ধ বিহার বা মন্দির ছিল। উত্তরকালে সইদখাঁ, সেই বৌদ্ধ গর্ভ গৃহকেই কেন্দ্র করিয়া আপনার আবাস নির্ম্মাণ করেন, এবং গর্ভ গৃহ বিচ-কোঠা নামে প্রসিদ্ধ হয়। যাহা হউক ইহা অনুমান মাত্র।

প্রবাদ এই—যখন সইদখাঁ, আটীয়া পরগণার অধিপতি হন, সেই সময়ে এ পরগণার অধিকাংশ স্থানই জলমগ্ন ছিল। সইদখাঁ কোথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবেন, স্বীয় গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন, তুমি যে স্থানে অসম্ভব বীরত্বের কোন চিহ্ন দেখিবে, সেই বীর-ভূমিতেই স্বীয় আবাস নির্ম্মাণ কর। সইদখাঁ, নৌকায় চড়িয়া বীর-ভূমির অনুসন্ধানে বাহির হইলেন, কিন্তু বহুদূর ভ্রমণ করিয়াও অসম্ভব বীরত্বের নিদর্শন কোথায়ও দেখিতে পাইলেন না। সন্ধ্যাকালে সইদখাঁর নৌকা এক প্রকাণ্ড চরের নিকট ভিড়িল। সইদ, চরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, এক বৃহৎকার ভেক একটি বিষধর ফণীকে অবলীলায় গ্রাস করিতেছে। ভেকের এই অসম্ভব বীর্য্য-বর্ত্তা দেখিয়া সইদ বুঝিলেন, ইহাই গুরু দেবের কথিত বীর-ভূমি। কিছুকাল মধ্যেই ভেক সর্পটিকে উদরসাৎ করিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া গেল। ভেক, যে স্থানে উপবিষ্ট হইয়া সর্পটিকে গ্রাস করিয়াছিল সইদখাঁ সেই স্থানে এক লৌহ কীলক প্রোথিত করিয়া গুরুর নিকট আগমন করিলেন। গুরু, সমুদয় বিবরণ শুনিয়া সইদ-খাঁকে সেই স্থানে আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। যে স্থানে লৌহ কীলক প্রোথিত হইয়াছিল, ঠিক সেইস্থানেই সইদখাঁর শয়ন বা ভজন গৃহ-বিচ্‌ কোঠা নির্ম্মিত হয়। সইদ, এই বিচ-কোঠার মধ্যে একাকী অবস্থান করিতেন। বিচ-কোঠার বহির্ভাগে আরও গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার ধ্বংসাবশেষ এখন ও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই জন প্রবাদ সত্য হইলে পাকুল্যা গ্রাম সইদখাঁ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানা যাইতেছে।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

(১) পাকুল্যার বর্ত্তমান জমিদার শ্রীযুত লালমিঞা সাহেবের বাটীর প্রাচীর সংলগ্নে দক্ষিণদিকে 'বিচ্‌ কোঠা' অবস্থিত ছিল। 'বিচ্‌ কোঠার' স্থান একণে দোলত্দুয়ারের জমিদার প্রসিদ্ধ মিঃ গজনবী সাহেবের অধিকার ভুক্ত। বোধ হয় খনন করিলে এখনও বিচ-কোঠার কতক অংশ বাহির হইতে পারে। বিচকোঠার মধ্যে সইদখাঁর ব্যবহৃত কোন দ্রব্য পাওয়া ও বিচিত্র নহে।

শুভ-দৃষ্টি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(৬)

চণ্ডী বাবুও অতি প্রত্যুষে উঠেন। উঠিয়া তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম—চাকর-বাকর গুলিকে ডাকিয়া তোলা, ছাত্রদিগকে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া পড়িতে বলা, গরুর ঘরের অবস্থা ইত্যাদি দর্শন করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "রাত দুদণ্ড থাকিতে শৈবাল তোমার হাত দেখ্‌বে বলে গিয়াছে। বাড়ীর ওঁরা নিষেধ করিলেন, ঠাণ্ডাটা যাক্; আমি বলিলাম, যোগেশকে হাত ধুইতে আমিই নিষেধ করিব। মেয়ে কি সে সব কথা শুন্‌লে? অসুখ বিসুখ নেই—"

চণ্ডী বাবুর কথায় আমি বেকুব হইয়া গেলাম। নিতান্ত অপরাধীটীর মত শৈবালের উদ্দেশে পুনরায় আমার কক্ষে প্রবেশ করিলাম। তাঁহাকে কিছু না বলিয়া শৈবাল আমার মুখপানে চাহিয়া ফুঁফাইয়া ফুঁফাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি বলিলাম—"শৈবাল আমায় ক্ষমা কর বোন্, আমি না বুঝতে পেরে তোমার মনে আঘাত দিয়াছি, এখন জানতে পেরেছি—ভাল হউক্ মন্দ হউক্ তুমি তোমার পিতামাতার জ্ঞাতসারেই আসিয়াছ।"

শৈবাল কাঁদিতে লাগিল। আমি কম্পিত হস্তে তাঁহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিলাম! সান্ত্বনা বাক্যে অনেক বুঝাইলাম।

শৈবাল বলিল—"সেদিন রাতও আপনি আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিয়াছেন।"

আমি বলিলাম "সেরূপ সময় আমার নিকট না আসিলেই আমি সুখী হইব।"

শৈবাল জেদ করিয়া বলিল—"কেন?"

আমি বলিলাম—"আমার কাজের ক্ষতি হয়।"

শৈবাল—"আপনি এঠিক কথা বলেন নাই। আমি আপনার কাজের ক্ষতিই করিব।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"আচ্ছা করিও।"

শৈবাল—"সেদিন কি আপনি আমাকে কষ্ট দেন নাই?"

আমি দেখিলাম শৈবাল কেবল কথাই বৃদ্ধি করিতেছে। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। শৈবাল পুনরায় বলিল—"আপনি নিশ্চয় আমাকে কোন বিষয় সন্দেহ করিয়াছেন।"

আমি—"না করিবার মত কি প্রমাণ দিয়াছ?"

শৈবাল—"আপনার নিকট প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা নির্দ্দোষ হইতে যাওয়াকে আমি নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় মনে করি।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"আমি তোমার মত হাত দেখা শিখিলেত প্রমাণ না লইয়াই বলিতে পারিতাম।"

শৈবাল হাসিল।

এইরূপ Shower and Sun shine এর পর আমি স্বকর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম।

(৭)

২৭ শে অগ্রহায়ণ। শৈবাল জলৌকার মত আমার পিছনে লাগিয়া আছে। সে যে কি বলিতে চায় বা করিতে চায়, কিছুই বুঝা যায় না। আমার অনেক মূল্যবান সময় তাহার অযথা আচরণ ও আব্দারে বৃথা নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

চণ্ডীবাবু ও তাহার গৃহিণী, কন্যার আচরণে সম্পূর্ণ উদাসীন। এ আপদ না ছাড়াইতে পারিলে আর ধর্ম্ম রক্ষার আশা নাই। যাউ হউক এবার 'শুভে কুশলে' পার পাইতে পারিলে আর এ পুরী মাড়াইব না—ইহাই স্থির করিলাম। এখন—"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথাকরোমি"—ব্যতীত আর উপায় নাই।

সন্ধ্যার পর শৈবাল আসিয়া আমার নিকট বসিল। আমি তখন মুদ্রিত নয়নে কালীঘাটের কালী মূর্ত্তির চিত্রের সম্মুখে ধ্যান করিতেছিলাম। ধ্যান সমাপন করিয়া বলিলাম—"কি মনে করিয়া শৈবাল?"

শৈবাল বলিল—"আপনি কোন দিনই আমার কোন কথায় মনোযোগ দেন না।"

আমি—"কবে কোন দিন তোমার কথায় মনোযোগ দিই নাই?"

শৈ—"কোন দিনই আপনার নিকট আমি কোন কথা বলিয়া সুখ পাইনা। আপনি প্রতি কথায় আমাকে অবহেলা করেন।" আমি লজ্জিত ভাবে বলিলাম—

"আমিত কখনও কাহারও মনে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করিনা শৈবাল! যাহা বলিবার তুমি নিশ্চিন্তে বলিয়া যাও।'

শৈবাল—"আমি আপনার নিকট গীতা পাঠ করিতে ইচ্ছা করি।"

আমি—"সুখের কথা। তোমার বাবাওতো প্রতি দিন গীতা পাঠ করেন। তাঁহার সঙ্গে রীতিমত পড়িলে ও তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিলেই বোধ হয় তোমার যথেষ্ট হইবে।

শৈবাল বিমর্ষ ভাবে বলিল—"আপনি আমাকে অন্তরে ঘৃণা করেন।"

আমি—"এরূপ অন্যায় ভাবনা তোমার কেন হয় শৈবাল?"

শৈবাল—"আপনি নিজে আমাকে গীতা পড়াইলে আপনার কি কোন অনিষ্ট হয়?

আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম—"না,এমন কিছুই না।"

শৈ—"তবে আমি আপনার নিকটই পাঠ শুনিব"।

* * * *

শৈবালের সঙ্গীত অন্তে আমি গীতা পাঠ করিতে লাগিলাম। শৈবাল একাগ্র মনে গীতার শ্লোক ও তাহার বঙ্গানুবাদ শ্রবণ করিতে লাগিল।

(৮)

দোল পূর্ণিমা। শৈবালের সহিত গীতা পাঠ করিয়া হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। এখন আর সঙ্কোচ নাই, ব্যবধান নাই। শৈবাল প্রতি দিন প্রাতে ও রাতে আমার নিকট বসিয়া গীতা পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করে এবং সন্ধ্যার পর পূর্ব্ব রীতি অনুসারে পরমার্থ সঙ্গীত গায়।

সন্ধ্যার পর চণ্ডী বাবু আসিয়া বসিলেন।

শৈবাল হারমোনিয়মে গান ধরিল।

গানে মুগ্ধ হইলাম, ভগবানের করুণা স্মরণ করিয়া বিহ্বল হইলাম। আবেগ ভরে বলিলাম, "শৈবাল, শিলং গেলে আর তোমার গান শুনিতে পাইব না।"

চণ্ডীবাবু আমার কথার উত্তরে বলিলেন—"যোগেশ তুমি যদি কিছু মনে না কর তবে নিঃসঙ্কোচে একটা কথা বলিতে পারি। শৈবাল কে তোমার সঙ্গিনী করিয়া লও। শৈবাল এখন তোমারই ন্যায় গীতা ছাড়া কিছু বুঝে না, তোমাকে ছাড়া কিছু চায় না। আর দেখ, ধর্ম্ম জীবনে সহায়তা ব্যতীত উন্নতি নাই। সৎসহায়তাই ধর্ম্ম জীবনের উন্নতির সহায়। আমি তোমাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসি, আমার ইচ্ছা শৈবালকে তোমার হাতে সমর্পণ করিয়া তোমার ধর্ম্ম জীবন যাপনের সহায়তা করি। শৈবাল তোমারই উপযুক্ত সঙ্গিনী।"

কথার ভাব বুঝিয়া শৈবাল পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল। আমি চণ্ডী বাবুর কথার উত্তরে অতি সঙ্কোচ ভাবে বলিলাম—"আপনি আমার উপদেষ্টা ও প্রতি পালক; আমার জীবনের অবস্থা ভাল নহে। আমি সংসারের ভিতর নিজকে আপাততঃ আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করি না। সংসার সৃষ্টি আমার ইচ্ছা নহে।"

চণ্ডী বাবু হাসিয়া বলিলেন—সংসারে নির্লিপ্ত থাকিয়া ভগবানের আস্বাদন পাওয়া কঠিন। সংসারের হর্ষ, বিষাদ, মান, অভিমান, সুখ, দুঃখ, বিপদ সম্পদের ভিতর দিয়া যিনি ভগবানের স্বত্ত্বা অনুভব করিতে পারেন, তিনিই ভগবানের প্রকৃত ভক্ত।"

আমি মাথা নীচের দিকে নিয়া বলিলাম—"স্ত্রী সম্ভোগের বাসনার ভিতর ভগবৎ ভক্তির স্থান নাই। আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

চণ্ডী বাবু বলিলেন—"স্ত্রী সহধর্ম্মিণী। ধর্ম্মের জন্য, সহবাসের জন্য নহে। ধর্ম্ম বিষয়ে একে অন্যকে উন্নত করিবার জন্য—সম্ভোগ বা পুত্র উৎপাদনের জন্য নহে।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। চণ্ডী বাবু বলিতে লাগিলেন—"দাম্পত্য ধর্ম্মে সম্ভোগ বিরতির দৃষ্টান্ত জগতে বিরল হইলেও অনুসন্ধান করিলে তাহা খুব বিরল নহে। সেবা গোসাই কাঞ্চনীকে আজীবন সহধর্ম্মিণী রূপে রাখিয়া ছিলেন, কিন্তু কখনও সম্ভোগ করেন নাই। বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রন্থে Chaste marriageএর এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সেবা দাসী সম্ভোগের জন্য নহে—ধর্ম্মের জন্য। যে পামরেরা ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম সঞ্চয় করে, জগতে তাহারাই অধিক পাপী। জগতে ভালরও এইরূপ অপব্যবহার হইতেছে।"

চণ্ডী বাবু বিবাহের সাপক্ষে এইরূপ শাস্ত্র সঙ্গত ও যুক্তি সঙ্গত কারণ দেখাইতে লাগিলেন। আমি চুপ করিয়া থাকিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম—"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি। (ক্রমশঃ)

———

জাতক।

পৃথিবীর সকল দেশেই অতি প্রাচীন সময় হইতে পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণি কিম্বা ভূত প্রেতাদি অশরীরীদিগকে অবলম্বন করিয়া অনেক উপদেশজনক গল্প প্রচলিত হইয়া আসিতেছে এবং বুদ্ধ, মহম্মদ, যীশু-খ্রীষ্ট প্রভৃতি ধর্ম্মগুরুগণ এবং ব্যাসাদি পুরাণকর্ত্তারা এই সকল গল্প উপলক্ষে মানুষকে নানা হিতকথা শিক্ষা-দিবার উপযোগিতা উপলব্ধ করিয়াছেন। মানব শিশু কিম্বা শিশুকল্প প্রাচীন মানব সকলেই এই সকল গল্পে অশেষ আনন্দ ও উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই সমস্ত রূপ-কথা বা উপকথা সংগ্রহ করিতে পারিলে দেশ বিশেষের প্রাচীন রীতি নীতি আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম বিশ্বাস সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়, সময় সময় মহাকাব্যাদির অঙ্কুর পর্য্যন্ত দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। এই কারণে য়ুরোপের মনীষিগণ সাতিশয় যত্ন সহকারে দীর্ঘকাল যাবৎ উপকথা সংগ্রহ করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন ঈষপের কথা, মধ্য যুগের খৃষ্টান যাজকদিগের প্রণীত Jesta Romanorum, ইটালী-দেশীয় বোকাচিও এবং ইংলণ্ডের চসার প্রণীত কাব্য এই উদ্দেশ্যেই রচিত। বর্ত্তমান সময়ে জার্ম্মেনির গ্রীম নামক ভ্রাতৃদ্বয় এ সম্বন্ধে যে বিখ্যাত গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন তাহাও সকলের সুবিদিত। কিন্তু গ্রীমই বল, ঈষপই বল, বৌদ্ধ-জাতক সমূহের তুলনায় এ সমস্ত সেদিনের কথা। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, পালিভাষায় লিপিবদ্ধ জাতক গ্রন্থ বোধহয় এতৎ সম্বন্ধে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। উত্তর কালে এই সমস্ত গল্পই রূপান্তরিত হইয়া পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথা সরিৎসাগর, ঈষপের উপকথা প্রভৃতিতে দাঁড়াইয়াছে।

এই জাতক কি! বৌদ্ধেরা বলেন এ সমস্ত ভগবান গৌতমবুদ্ধের অতীত-জন্ম বৃত্তান্ত। বুদ্ধ হইতে গেলে বহুবার জন্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ কর্ম্মফল বিনষ্ট করিতে হয়। যিনি বুদ্ধ হইয়াছেন, এই সমস্ত অতীত জন্মে তিনি "বোধিসত্ব" বা "বুদ্ধাঙ্কুর" ছিলেন। এইরূপে গৌতমবুদ্ধ কোন জন্মে হস্তী, কোন জন্মে মর্কট, কোন জন্মে মৎস্য, কোন জন্মে মৃগ, কোন জন্মে ব্রাহ্মণ, কোন জন্মে শ্রেষ্ঠী ইত্যাদি হইয়াছিলেন। বুদ্ধপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাতিস্মর হইয়াছিলেন, তখন এই সকল অতীত জন্ম বৃত্তান্ত তাহার মানস পটে উদিত হইয়াছিল। উত্তর কালে তিনি শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবার সময় এই সমস্ত প্রাচীন কথার বর্ণনা করিতেন।

সমস্ত জাতকই যে বুদ্ধপ্রোক্ত তাহা বোধহয় বৌদ্ধ ভিন্ন অন্য কেহ বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই যে অতীব প্রাচীন এবং কোন কোনটী বুদ্ধের সমসাময়িক তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। প্রবাদ আছে, অশোকের পুত্র মহীন্দ্র যখন সিংহল দ্বীপে ধর্ম্মপ্রচার করিতে যান তখন পালি ভাষায় লিখিত এই জাতকগ্রন্থ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে উহা সিংহলী ভাষায় অনূদিত হয়। শেষে কি কারণে বলা যায় না, পালি ভাষায় লিখিত মূল গ্রন্থ বিনষ্ট হইয়া যায়। তৎপরে সুপ্রসিদ্ধ বুদ্ধঘোষ সিংহলী হইতে পালিতে উহার পুনঃ অনুবাদ করেন। ইহাও প্রায় দেড় হাজার বৎসরের কথা।

কিয়দ্দিন হইল ডেনমার্ক, জার্ম্মেনি ও ভারতবর্ষ এই তিন রাজ্যের রাজপুরুষদিগের সাহায্যে কোপেন-হেগন বাসী পণ্ডিতবর ফোস্‌বল এই জাতক গ্রন্থের পালি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণ ও মহামতি কাউয়েল সাহেবের তত্ত্বাবধানে ইহার ইংরেজী অনুবাদ সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে মোট ৫৫০টী জাতক আছে। তাহাদের প্রত্যেকের ৩ অংশ। (১) প্রত্যুৎপন্ন বস্তু, অর্থাৎ যে উপলক্ষে বুদ্ধদেব গল্পটী বলেন। (২) অতীত বস্তু অর্থাৎ প্রস্তুত জাতকাংশ। (৩) সমবধান অর্থাৎ বুদ্ধদেবের সমসাময়িক কোন্ ব্যক্তি অতীত কালে কি ছিলেন তাহা প্রদর্শন।

জাতক আমাদের জাতীয় ধন—কারণ বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষেরই ধর্ম্ম এবং পালি ভাষা বোধহয় বাঙ্গালা ও বিহার উভয় প্রদেশেরই প্রাচীন ভাষা। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম, এ মহোদয় এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করিয়াছেন; এই গ্রন্থ প্রকাশ হইলে

যে কেবল ধর্ম্মমূলক একখানি সুচিন্তিত উপাখ্যান গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে তাহাও নহে প্রাচীন সময়ের অনেক ঐতিহাসিক এবং সামাজিক বৃত্তান্তও জানা যাইবে; এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষার অনেক শব্দের প্রয়োগের যুক্তিও বুঝিতে পারা যাইবে। তাঁহার এই অনুবাদ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে এক অভিনব সম্পদ প্রদান করিবে, তজ্জন্য রায় সাহেব বাঙ্গালি মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন। আমরা সৌরভের পাঠকগণের জন্য একটী জাতক প্রকাশ করিলাম। যদি এগুলি পাঠকদিগের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে, তবে ক্রমে আরও প্রকাশ করিব। "সৌরভ" সম্পাদক।

রাজাববাদ জাতক। *

[শাস্তা (১) জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময় কোশল রাজকে উপদেশ দিবার জন্য এই কথা বলিয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে সবিস্তার বিবরণ ত্রিশকুন-জাতকে প্রদত্ত হইবে (৫২১)।]

একদা কোশল রাজাকে একটী চরিত্রদোষ সংক্রান্ত অতি জটীল বিবাদের মীমাংসা করিতে হইয়াছিল। ইহাতে বিলম্ব ঘটায় তিনি প্রাতরাশ সমাপন পূর্ব্বক ধৌত হস্তের জল শুকাইতে না শুকাইতেই অলঙ্কৃত রথে আরোহণ করিয়া শাস্তার নিকট উপনীত হইলেন। তিনি শাস্তার প্রফুল্লকমল-রমণীয় পাদবন্দনা করিয়া একান্তে উপবেশন করিলে শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ যে আজ এসময়ে আগমন করিলেন?" রাজা বলিলেন, "ভগবন্, অদ্য একটী চরিত্র দোষ সংক্রান্ত জটিল বিবাদের মীমাংসা করিতে হইয়াছিল বলিয়া অবকাশ পাই নাই; অনন্তর যেমন বিচার শেষ করিলাম, অমনি আহারান্তে প্রক্ষালিত হস্ত শুষ্ক না হইতেই আপনার অর্চ্চনার্থ এখানে উপস্থিত হইয়াছি।" "মহারাজ, ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এবং নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে পারিলে রাজার কুশল হয়, তিনি স্বর্গলোকের অধিকারী হইয়া থাকেন। আবার আমার ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া আপনি যে যথাধর্ম্ম নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কিন্তু পুরাকালে রাজগণ অসর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিতদিগের উপদেশানুসারে পরিচালিত হইয়াও যে নিরপেক্ষভাবে যথাধর্ম্ম বিবাদনিষ্পত্তি করিতে পারিতেন, চতুর্ব্বিধ অগতিগমন (২) পরিহার করিয়া দশবিধ রাজধর্ম্ম পালনে (৩) সমর্থ হইতেন এবং শাস্ত্রানুসারে রাজ্যপালন পূর্ব্বক দেহান্তে স্বর্গলোক লাভ করিতেন ইহা বিস্ময়কর সন্দেহ নাই।" অতঃপর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা মহিষীর গর্ভরক্ষার্থ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিলেন; এবং বোধিসত্ত্ব যথাকালে বিনাকষ্টে ভূমিষ্ঠ হইলেন। নামকরণ দিবসে আত্মীয় বান্ধবেরা তাঁহার "ব্রহ্মদত্ত কুমার" এই নাম রাখিলেন। তিনি কালক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তক্ষশিলানগরে গমন পূর্ব্বক সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিলেন এবং পিতার দেহত্যাগের পর রাজ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাধর্ম্ম নিরপেক্ষভাবে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। বিচার করিবার সময় তিনি কখনও ক্রোধলোভাদির বশীভূত হইতেন না।

রাজা যথাধর্ম্মে রাজ্যশাসন করিতেন বলিয়া তাঁহার অমাত্যেরাও ন্যায়ানুসারে বিবাদ নিষ্পত্তি করিতেন; আবার অমাত্যেরা সূক্ষ্মবিচার করিতেন বলিয়া কূটার্থ-কারকও (৪) দেখা যাইত না। কাজেই রাজাঙ্গণে আর অর্থীপ্রত্যর্থীর কোলাহল শুনা যাইত না; অমাত্যেরা সমস্ত দিন ধর্ম্মাসনে বসিয়া থাকিতেন; কিন্তু বিচার প্রার্থী কোন জনপ্রাণী দেখিতে না পাইয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিয়া যাইতেন। ফলতঃ এইরূপ সুব্যবস্থার গুণে অচিরে ধর্ম্মাধিকরণ জনহীন স্থানের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

অনন্তর একদিন বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমি যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করিতেছি বলিয়া এখন আর কোন বিচারপ্রার্থী দেখা যায় না; অর্থীপ্রত্যর্থীর কোলাহল শ্রুতিগোচর হয় না; ধর্ম্মাধিকরণ নির্জ্জন হইয়াছে। কিন্তু আমার কি কি দোষ আছে, তাহা এক-

---

* অববাদ=উপদেশ (বৌদ্ধসাহিত্য)।

(১) শাস্তা, দশবল, তথাগত প্রভৃতি গৌতমবুদ্ধের উপাধি।

(২) চতুর্ব্বিধ অগতিগমন, যথা ছন্দ (অতি লোভ ইত্যাদি), দোষ (মাৎসর্য্য), মোহ (অবিদ্যা), এবং ভয়।

(৩) দশবিধ রাজধর্ম্ম, যথা, দান, শীল, পরিত্যাগ, অক্রোধ, অবিহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, মার্দ্দব, অবিরোধন এবং তপঃ।

(৪) কূটার্থকারক=যাহারা মিথ্যা মকদ্দমা করে।

বার দেখিতে হইতেছ। আমার এই এই দোষ ইহা জানিতে পারিলে সে গুলি পরিহার পূর্ব্বক অতঃপর নিরবচ্ছিন্ন গুণেরই আশ্রয় লইতে পারিব।" তদবধি যে তাঁহার দোষ প্রদর্শন করিবে, সর্ব্বদা তিনি তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যাহারা রাজভবনে বাস করিত তাহাদের মধ্যে কাহাকেও তিনি তাঁহার অগুণ বাদী বলিয়া দেখিতে পাইলেন না; পক্ষান্তরে সকলেরমুখেই নিজের গুণকীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, এই সকল লোক হয়ত ভয়বশতঃ আমার দোষের উল্লেখ না করিয়া কেবল গুণই বলিতেছে।" অতঃপর তিনি প্রাসাদের বহিঃস্থ লোকদিগের মধ্যে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু সেখানেও নিজের নিন্দাকারক কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। শেষে তিনি ক্রমে ক্রমে নগরবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহারা নগরের চতুর্দ্বারের বাহিরে উপকণ্ঠভাগে বাস করে তাহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কাহারও মুখে নিজের দোষ শুনিতে পাইলেন না। বরং সকলেই তাঁহার গুণের প্রশংসা করিতে লাগিল। তখন তিনি একবার জনপদ অনুসন্ধান করিবার সংকল্প করিলেন এব; অমাত্যদিগের হস্তে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া একমাত্র সারথি সহ রথারোহণে অজ্ঞাতবেশে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি এইরূপে প্রত্যন্ত ভূমি পর্য্যন্ত গেলেন, কিন্তু কুত্রাপি অগুণ বাদী কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; পরন্তু সকলের মুখেই নিজের গুণকীর্ত্তন শুনিতে পাইলেন। সুতরাং তিনি রাজপথ অবলম্বনে পুনর্ব্বার নগরাভিমুখেই যাত্রা করিলেন।

তৎকালে কোশলপতি মল্লিকও যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিতেন, এবং কেহ তাঁহার দোষ কীর্ত্তন করে কিনা ইহা জানিবার জন্য তিনিও রাজভবনাদি কুত্রাপি অগুণবাদী দেখিতে নাপাইয়া এবং সর্ব্বত্র নিজের প্রশংসাবাদই শুনিয়া পরিশেষে জনপদে ভ্রমণ করিতে করিতে ঘটনাক্রমে সেই সময়ে উক্ত অঞ্চলে উপনীত হইয়াছিলেন। এই দুই নরপতি বিপরীত দিক্ হইতে অগ্রসর হইতে হইতে শকটমার্গের এক নিম্ন অংশে পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। সে স্থান এত অপ্রশস্ত যে রথদ্বয়ের পাশাপাশি যাইবার উপায় ছিল না।

কোশলরাজের সারথি বারাণসীরাজের সারথিকে বলিল, "তোমার রথ ফিরাইয়া পথ ছাড়িয়া দাও।"

সে বলিল, "তোমার রথই ফিরাও; আমার রথে বারাণসী-রাজ ব্রহ্মদত্ত রহিয়াছেন।"

"আমার রথেও কোশলরাজ মল্লিক আছেন। তোমার রথ ফিরাইয়া রাজ-রথ যাইতে দাও।"

বারাণসীর সারথি ভাবিল, "তাইত, ইনিও যে একজন রাজা! এখন উপায় কি করি? আচ্ছা, কোশলরাজের বয়স কত জানিয়া উভয়ের মধ্যে যিনি ছোট তাঁহার রথ খোলা যাউক, এবং যিনি বড় তাঁহাকে অগ্রসর হইতে অবসর দেওয়া হউক।" ইহা স্থির করিয়া সে কোশল-সারথিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের রাজার বয়স কত?" সে যে উত্তর দিল তাহাতে দেখা গেল উভয় রাজাই সমবয়স্ক। অতঃপর বারাণসীরাজের সারথি কোশলপতির রাজ্যপরিমাণ, সেনাবল, ঐশ্বর্য্য, যশ, কুলমর্য্যাদা প্রভৃতির সম্বন্ধেও প্রশ্ন করিল এবং জানিতে পারিল —দুই জনেরই রাজ্য তিনশত যোজন বিস্তীর্ণ; এবং দুই জনেরই সেনাবল, ঐশ্বর্য্য, যশ, গোত্র, কুল প্রভৃতি তুল্যরূপ তখন সে স্থির করিল,ইহাদের মধ্যে যিনি চরিত্রগুণে মহত্তর তাহারই সুবিধা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অতএব সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের রাজার শীলাচার কীদৃশ?" ইহার উত্তরে "আমাদের রাজা অতীব শীলবান্" এই বলিয়া কোশল-সারথি নিম্নলিখিত গাথা দ্বারা স্বীয় প্রভুর গুণবর্ণনা করিতে লাগিল:—

"কঠোরে কঠোর, কোমলে কোমল, মল্লিক রাজার রীতি;
সাধুজনে তাঁর সাধু ব্যবহার, শঠে শাঠ্য এই নীতি।
বর্ণিতে কি পারি চরিত্র তাঁহার; সংক্ষেপে বলিনু তাই;
অতএব রথ ফিরায়ে তোমার ছাড়ি দেহ পথ, ভাই।"

ইহা শুনিয়া বারাণসীর সারথি জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের রাজার কি কেবল এই সকল গুণ?" "হাঁ, আমাদের রাজার এই সকল গুণ।" "এই সকল যদি গুণ হয়, তবে দোষ কাহাকে বলে?" "এগুলি যদি অগুণ হয়, তবে না জানি তোমাদের রাজার কেমন গুণ!" "বলিতেছি, শুন।" অনন্তর বারাণসীর সেনাপতি নিম্নলিখিত গাথায় ব্রহ্মদত্তের গুণগান করিল:—

"অক্রোধের বলে শাসেন ক্রোধীরে, অসাধুকে সাধুতায় ;
কৃপণ যে জন, হেরি তার দান, মানে নিজ পরাজয় ;
সত্যের প্রভাবে মিথ্যারে দমিতে এমন দ্বিতীয় নাই ;
তাই বলি রথ ফিরায়ে তোমার ছাড়ি দেহ পথ, ভাই।"

ইহা শুনিয়া মল্লিকরাজ এবং তাহার সারথি উভয়ে রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অশ্ব খুলিয়া লইলেন এবং রথ ফিরাইয়া বারাণসীরাজকে পথ ছাড়িয়া দিলেন। অনন্তর বারাণসীরাজ মল্লিকরাজকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন এবং জীবনান্তে স্বর্গলাভ করিলেন। মহারাজ মল্লিকও তদীয় উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া জনপদে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং সেখানে কোন অগুণবাদী দেখিতে না পাইয়া স্বকীয় নগরে প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক তিনিও জীবনাবসানে স্বর্গবাসী হইলেন।

[সমবধান—তখন মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন কোশল-সারথি; আনন্দ ছিলেন কোশল-রাজ; সারীপুত্র ছিলেন বারাণসীর সারথি এবং আমি ছিলাম বারাণসী-রাজ]।

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ।

মহীশূর রাজ্য।

ইংরেজ ভারত ভূমির অধীশ্বর। তাঁহার আদেশে ভারত ভূমির শাসনদণ্ড পরিচালিত হইতেছে; কোন স্থানে এই আদেশ সুস্পষ্ট, কোন স্থানে তাহা ইঙ্গিত মাত্র। শেষোক্ত স্থান দেশীয় বা করদ রাজ্য নামে পরিচিত। ভারত ভূমির বিপুল অংশ দেশীয় রাজন্য বৃন্দের শাসনাধীন। তাঁহাদের অধিকাংশ অধিপতিই ইংরেজের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া সুশৃঙ্খল ভাবে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন এবং স্বরাজ্যের উন্নতি সাধন জন্য একাগ্রভাবে অবহিত রহিয়াছেন। যে সকল দেশীয় রাজা সুশাসন ও প্রজারঞ্জনে নিরত হইয়া ভারতবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহীশূরের অধিপতি অন্যতম। মহীশূর রাজ্য বিস্তৃত ও ধন-ধান্য পূর্ণ। বর্ত্তমান মহীশূর রাজ্য ইংরেজের অনুগৃহ-সৃষ্ট। এই রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা অবধি ইংরেজ সর্ব্বদা তৎসম্পর্কে অনুকূল ভাব পোষণ করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি ভারত বিধাতা লর্ড হার্ডিঞ্জ মহীশূরাধিপতির মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার সহিত নূতন সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছেন। আমরা এই উপলক্ষে মহীশূর রাজ্যের কৌতুকাবহ ইতিহাস সৌরভের পাঠক বর্গকে উপহার দিতেছি।

মহীশূর রাজ প্রাসাদ।

খৃষ্টিয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে দ্বারকার যদু বংশীয় রাজপুত্রদ্বয়—বিজয় ও কৃষ্ণ মহীশূর প্রদেশের অরণ্যানীর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তথায় রাজ্য স্থাপনার্থ

গমন করেন। এইরূপ জন শ্রুতি প্রচলিত আছে যে, হাড়াল্লা (মহীশূর নগরের কিঞ্চিত দক্ষিণ পূর্ব্বে স্থিত বর্ত্তমান হড়িনাড়া) রাজ্যের অধিপতির অনুপস্থিতি সময়ে ও অনভিপ্রায়ে কোন এক প্রতিবেশী নীচ কুলোদ্ভব রাজার সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব হয়। দ্বারকার কুমার দ্বয় রাজ কুমারীর এই বিপন্ন অবস্থায় তাঁহার পক্ষাবলম্বনে এই বিবাহার্থী রাজাকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাভূত করেন। এই যুদ্ধে পরাজিত নৃপতির তনুত্যাগ হইলে ভ্রাতৃদ্বয় তৎপরিত্যক্ত রাজ্য অধিকার করিলেন। রাজকুমারী যুবকদ্বয়ের শৌর্য্য ও বীরত্বে চমৎকৃত হইয়া তাঁহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠকে কৃতজ্ঞচিত্তে পতিত্বে বরণ করিলেন। বিজয় "বাদেয়ার" উপাধি গ্রহণ করতঃ শাসন কার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। এই বিজয় বাদেয়ারই মহীশূর রাজবংশের আদিপুরুষ বলিয়া প্রখ্যাত। এই নবাগত রাজ পরিবার ক্ষমতাশালী প্রতিবেশী রাজন্য বর্গের সহিত রাজ নৈতিক ও বাণিজ্যাদির উন্নতি কল্পে সন্ধি স্থাপনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেন। কালেনর রাজ পরিবার ইহাদের অন্যতম। নঞ্জনগরের তিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিম ও মহীশূর-উটকামন্দ রাস্তার পার্শ্ব স্থিত বর্ত্তমান'কালাল' গ্রামে এই রাজ পরিবার বাস করিতেন। এখনও উক্ত গ্রাম বাসিগণ একটী ভগ্ন দুর্গ রাজ প্রাসাদের ধ্বংশাবশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। বিদ্বজ্জন বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে মহীশূরের প্রস্তর লিপি বিশেষে 'কালেলর' রাজা বলিয়া লিখিত "টিমারাজা" এই রাজ পরিবারের স্থাপয়িতা। দাক্ষিণাত্যের একছত্রী সম্রাট বিজয়নগরাধিপগণের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত। টিমারাজা ১৫০৪ খৃঃ অব্দে কালগ্রাম স্থাপন করেন। বিজয়ের অধস্তন পুরুষ রাজা বাদেয়া ১৬১৭ খৃঃ অব্দে চেরিঙ্গাপত্তন স্বাধিকার ভুক্ত করিলে মহীশূর প্রদেশ হইতে বিজয়নগরের আধিপত্য লোপ পায়।

এই সময়ে মহীশূর প্রদেশের অন্যতর শাসনকর্ত্তা কালাধিপতির প্রভূত ক্ষমতা ছিল। যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াই হউক অথবা সন্ধি স্থাপন দ্বারাই হউক, রাজনীতি বিশারদ ও যোদ্ধা রাজা বাদেয়ার তাঁহাকে নিজ পক্ষাশ্রিত রাখার প্রয়োজন অনুভব করিলেন। রাষ্ট্র ও বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থ ও বিজয় নগরাধিপতির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ বাদেয়ার রাজার প্রস্তাবানুযায়ী কালাধীশ তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। আত্মরক্ষা ও পররাজ্য আক্রমণ জন্য একতা সূত্রে সন্ধি স্থাপন ভারতেতিহাসে এই প্রথম। উক্ত সন্ধির সর্ত্তানুসারে বাদেয়ার রাজার উত্তরাধিকারীগণ কালেন পরিবারের যোগ্য ব্যক্তিদিগকে প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি পদে নিযুক্ত রাখিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে মহীশূর রাজ্য হাইদার আলী সাহার অধীন হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সর্ত্ত অনুসারে কাজ হইয়াছে। কালেন পরিবারের পররাষ্ট্র স্বতন্ত্রতা করায়ও করিয়া বাদেয়ার রাজা মহীশূর প্রদেশে সর্ব্বশক্তিমান হইলেন। মহীশূর নরপতি সপ্তম শাম রাজ (১৭৩১—১৭৩৪ খৃঃঅব্দ) প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি দেবরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নন্দ রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়া পাটরাণী করেন। এই সূত্রে দেবরাজ ও তাহার ভ্রাতা প্রভূত ক্ষমতা শালী হইয়া উঠেন। তাঁহারা অত্যন্ত কর্ম্মিষ্ঠ ছিলেন ও নিকটবর্ত্তী কতিপয় রাজ্য জয় করিয়া মহীশূর রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। শাম রাজা অল্প বয়স্ক হইলেও উক্ত ভ্রাতৃ দ্বয়ের কর্ত্তৃত্ব সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে কর্ম্ম চ্যুত করিতে অথবা তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস করিতে সচেষ্ট হইলেন; কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁহার চেষ্টা বৃথা হইল। অপর পক্ষে দেবরাজ সমস্ত কার্য্য ভার তাঁহার ভ্রাতার হস্তে অর্পণ করতঃ স্বয়ং সত্য সঙ্গমে নির্লিপ্ত ভাবে থাকিয়া ইষ্টমন্ত্র সাধনে তৎপর হইলেন। তিনি বৈষ্ণব, শ্রীরামের উপাসক ও ধর্ম্ম ভীরু ছিলেন। শাম রাজের উত্তরাধিকারী কৃষ্ণরাজ বাদেয়ারের রাজত্বের চতুর্দ্দশ বৎসরে ১৭৪৮খৃষ্টাব্দে নাবাশিপুর তালুকান্তর্গত তিরথকুবলা নামক স্থানে দেবরাজ "অগ্রহরা" প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার ভগবদ্ ভক্তির ও ধর্ম্ম জীবনের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। চতুর চূড়ামণি নন্দ রাজা ১৭৪৬ খৃঃ অব্দে ধর্ম্মাপুরাম ও ১৭৪৯ খৃঃঅব্দে হাইদার আলীর বাসস্থান বেবনহল্লি মহীশূর রাজ্য ভুক্ত করেন। এই সময় হাইদার আলীর সাহস ও বিপদে স্থির-বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তিনি তাঁহাকে ৫০ জন অশ্বারোহী ও ২০০ পদাতিক সৈন্যের নায়ক

রূপে নূতন লব্ধ দুর্গের রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। মহীশূর রাজ্যের তদানীন্তন প্রান্ত দেশে এই দুর্গটী অবস্থিত ছিল। সুমন্ত্রী নন্দরাজা আর্কট আক্রমনের সময় ক্লাইবের সাহায্যার্থ গমন করেন। কর্ণাট ভূপতি মহম্মদ আলি সময়োচিত সাহায্য লাভের আশায় নন্দরাজাকে ত্রিচিন্নপল্লির অধিকার ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু ইংরেজের অনুমতি ব্যতীত কর্ণাটরাজের ত্রিচিন্নপল্লি অথবা তাঁহার রাজ্যের অন্য কোন অংশের আধিপত্য ত্যাগের অধিকার ছিল না। এই সূত্রে ইংরাজের সহিত নন্দরাজার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। শিবভক্ত নন্দরাজা তামিল ভাষায় লিখিত "পিরিয় পুরাণম্" গ্রন্থোক্ত ৬৬ জন শৈব-

সপারিষদ মহীশূর রাজ।

ঋষির ধাতু মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া একটি শৈব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে নন্দরাজা মহারাজ কৃষ্ণ বাদেয়ারের নিকট হইতে পূর্ব্ব সন্ধির সর্ত্তগুলি পুনরাবৃত্তি করিয়া একটী "ভাষাপত্র" প্রাপ্ত হন। ২০ বৎসর কাল রাজ কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করার পর উদীয়মান শক্তিশালী অকৃতজ্ঞ হাইদার আলী তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া নিজ প্রাসাদে আবদ্ধ রাখেন। এই অবস্থায় কারাগারেই তাঁহার মৃত্যু হয়। অতঃপর হাইদার আলী মহীশূর রাজকে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া স্বয়ং রাজ্যাধিকারী হন এবং উৎকট সাধনা বলে দক্ষিণাত্যের বিপুল অংশ স্বাধিকার ভুক্ত করিয়া সুবিস্তৃত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। হাইদার আলী পরলোকগত হইলে তদীয় পুত্র ও উত্তরাধিকারী টিপু সুলতান ইংরাজ রাজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া নিজ রাজ্য বিনষ্ট কারণ ও চেরিঙ্গাপত্তন দুর্গ ধ্বংশ সময় ইংরাজ হস্তে নিহত হন। অতঃপর ইংরাজ রাজ বাদেয়ারের বংশধরকে মহীশূর প্রদেশের আধিপত্যে পুনর্ব্বার স্থাপন পূর্ব্বক ন্যায় পরতার পরিচয় দেন এবং হাইদার আলীর রাজ্যের অন্যান্য অংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভুক্ত করেন। মহীশূরের বর্ত্তমান মহারাজা উক্ত বাদেয়ার রাজার বংশাবতংস; কাল রাজের বংশধর এখনও মহীশূরের সৈন্যাধ্যক্ষ।

শ্রীকেদারনাথ সেন।

সখের যাত্রা।

(১)

যোগেশ জমিদারের ছেলে, সুতরাং তাহার কতকগুলি খেয়াল থাকিতে পারে অর্থাৎ বড় লোকের খেয়াল থাকিলে তাহাতে দোষ নাই, আর গরীবের খেয়ালকে 'ঘোড়া রোগ' বলে!

কথাটা একটু ভাঙ্গিয়া বলিতে হইতেছে। যোগেশ ছেলে বেলা হইতে পিতৃহীন, সংসারে বিধবা মাতা ভিন্ন তাহার কোনও অভিভাবক ছিল না। অটল সংসার, ধন-ধান্যে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। এরূপ অবস্থায় যোগেশ এণ্টান্স পাস করিয়া যখন গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় পড়িতে চলিল, তখন মধুলোভে মধুমক্ষিকাকুলের ন্যায় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতৃকুল তাহার প্রতি যে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে থাকিবে এবং তাহার মাতাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ব্যতি-ব্যস্ত করিয়া তুলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! তবে যোগেশ যখন বলিল, "আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি বিবাহ করিব না," তখন সকলেরই আশ্চর্য্য হওয়ার কথা। মুরব্বিয়া ঈষৎ হাসিলেন অর্থাৎ এটা একটা খেয়াল, কয়দিন টিকিবে!

কলিকাতায় আসিয়া যোগেশ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, শাক্ত শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল সমাজে মিশিয়া একটা নূতন কথা শিখিল—'আধুনিক ইংরেজী শিক্ষিতা মেয়েরা মেম্-সাহেব, ইহাদের ছায়া মাড়ানও পাপ।' সুতরাং যোগেশ পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞাটা একটু পরিবর্ত্তন করিল অর্থাৎ বিবাহ-তো করিবেই না, যদিই করিতে হয় স্কুলে পড়া মেয়েকে কিছুতেই বিবাহ করিবে না।

পাছে অতিমাত্রায় শিক্ষিত হইলে মনের পরিবর্ত্তন ঘটে, এই ভয়ে এফ, এ ফেল করিয়াই যোগেশ সরস্বতীর কাছে বিদায় প্রার্থনা করিল। তখন উপেন, নরেন, হরেন, যোগেন প্রভৃতি বন্ধুর দল আসিয়া ধরিয়া বসিল "আমাদের একটা উপায় করিয়া দিতে হইবে অর্থাৎ তোমাদের জমিদারীতে আমাদিগকে চাকুরী দিয়া প্রাণে বাঁচাইতে হইবে।"

যোগেশ বলিল "তথাস্তু।"

(২)

গ্রামে পঁহুছিয়াই যোগেশ একটা লঙ্কাকাণ্ড বাধাইয়া দিল। বৃদ্ধ কর্ম্মচারীগণ সকলেই বিদায় প্রাপ্ত হইলেন কারণ বার্দ্ধক্য বশতঃ তাঁহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। তারপর, সহচরগণ একে একে উজির, নাজির, কোতোয়াল, প্রভৃতির আসন অধিকার করিয়া বসিল।

সহচরগণ তাস, পাশা, দাবা, ক্রিকেট, ফুটবল নিয়া পড়িলেন। এসব বিষয়ে তাঁহারা ভীম, দ্রোণ, কর্ণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন না!

মা ছেলেটিকে কাছে পাইয়া ধরিয়া বসিলেন, "যোগেশ এ'বার তোর পড়া শেষ হইয়াছে, সুতরাং তো'কে বিবাহ করিতেই হইবে। আমি নাতি নাত্নীর মুখ না দেখিয়া মরিতে পারিব না।"

যোগেশ বলিল "বল কি মা! আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন মহাপাপ, মা হইয়া তুমি আমাকে পাপ করিতে বলিলে কোন্ প্রাণে!"

মা রাগ করিয়া বলিলেন "এ'তো'র কি সৃষ্টি ছাড়া প্রতিজ্ঞা, আমি এ প্রতিজ্ঞা শুনিব না।"

সহচর দল আসিয়া বলিল, "তাইতো মা আমরাও কত করিয়া বলিতেছি—এমন প্রতিজ্ঞা আমরা শুনি নাই!"

মা তখন বন্ধুবর্গকে বলিলেন, "আচ্ছা বাবা তোমরাই কেন ও'কে বুঝিয়ে বল না।" তাহারা হাসিয়া বলিল বুঝিয়ে, শুঝিয়ে কিছু হ'বে না মা। তুমি অনুমতি দাও তো আমরা সংসারের যত মেয়ে আছে দেখিয়া যিনি যোগেশের উপযুক্ত তাঁহাকে বাছিয়া আনিয়া দিব।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "তথাস্তু।"

যোগেশ রোষ কষায়িত লোচনে সহচর মণ্ডলীকে তীব্র গালিবর্ষণ করিয়া মার পদতলে পড়িয়া বলিল "মা' আমাকে আরও কিছু সময় দাও, একবার ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখি।"

মা অগত্যা বলিলেন 'তথাস্তু," তারপরে নির্জ্জনে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন আরম্ভ করিলেন; তাহার কারণ আজ যদি উনি বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে কি যোগেশ এত অবাধ্য হইতে পারিত!

ভীষণ শেলের মত বিবাহটা যখন তীব্রবেগে যোগেশের ঘাড়ে পড়িতেছিল তখন সময়াস্ত্রক্ষেপে তাহাকে প্রতিরোধ করিয়া যোগেশ দেখিল, একটা কিছু কাজ তাহার হাতে থাকা চাই; অর্থাৎ বৃদ্ধের দল তামাক খাইয়া গল্প করিয়া দিন কাটাইতে পারেন, কিন্তু যুবকেরা তাস, পাসা দাবা ফুটবল ক্রিকেট লইয়াই তৃপ্ত থাকিতে পারেন না, আরও কিছু চাই।

সহচর মণ্ডলীকে ডাকিয়া যোগেশ বলিল, "বলতো এখন কি করা যায়।"

১নং বন্ধু উপেন বলিল এসোনা শিকার করিয়া আসা যাক্—Hunting is a manly game.

২নং হরেন্ বলিল, "শিকার ব্যয় সাপেক্ষ, বিশেষতঃ very dangerous. চল একদিন picnic আর একদিন বাইচ্ খেলা যাক্।

তখন ৩নং এবং ৪নং বন্ধুদ্বয় বাধা দিয়া নিজেদের মত প্রকাশ করিল, কাজেই বিষয়টা ক্রমে মীমাংসার অতীত হইয়া উঠিতেছিল, সভাপতি যোগেশ বলিল "দেখ তোমরা ইংরেজী পড়িয়া সাহেব ঘেঁষা হইয়া পড়িয়াছ আমাদের দেশের পদ্ধতিগুলির প্রতি একবারও মনোযোগ দাও না। সাহেবদের চলাফেরা ও খেলাতে আমাদের শিক্ষণীয় বিশেষ কিছুই নাই—আচ্ছা মনে কর আমরা যদি একটা সখের যাত্রার দল গড়ি, তবে আমোদ ও শিক্ষা দুইই হইতে পারে।"

সহচরগণ বলিল "তাইতো, অতি উত্তম প্রস্তাব," অর্থাৎ এবার যিনি প্রস্তাবক তাঁহার বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার সাহস ছিল না।

যোগেশ উৎসাহের সহিত বলিল "একবার ভাব দেখি যাত্রায় লোকশিক্ষার কত উপায় রহিয়াছে, মিশনরী প্রথা অপেক্ষা যাত্রা ও কথকতা কত শ্রেষ্ঠ! একটা সখের দল করিয়া গ্রামে গ্রামে নীতি ও ধর্ম্মের বিস্তার করিব। একাজে কোনও দোষ নাই, কাজেই বাহিরের লোক বেশী না লইয়া আমরাই পাঠ নিব, আমরাই গাহিব; সকলে উদ্যোগ আরম্ভ কর।"

(৪)

পোষাক পরিচ্ছদ যন্ত্রাদি সংগৃহীত হইতে এক সপ্তাহও লাগিল না। ভাঁড়ারে যদি তেল থাকে তবে মাছ ভাজিতে বেশী বিলম্ব হয় না।

তখন ওস্তাদজী আসিয়া সেতারের কান মুচড়াইতে মুচড়াইতে বিভিন্ন প্রকার মস্তক ঘূর্ণন ও মুখভঙ্গীর সহিত সঙ্গীত আলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অশ্ববিনিন্দিত স্বরের মূর্চ্ছনায় ছেলের দল মাটীতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

তিন সপ্তাহের মধ্যে 'রিহার্সেল' শেষ করিয়া দল বাহির হইল। পালার নাম 'কৃষ্ণলীলা'। গান শুনিয়া সকলে শিয়াল যাত্রার গল্প স্মরণ করিল; কিন্তু রাধিকাটীতে ছিল বিশেষত্ব। যোগেশ তাহার সুন্দর চেহারা ও মিষ্ট গলা লইয়া যখন আসরে নামিত তখন দর্শকমণ্ডলী ভাবিত একটা নূতন কিছু দেখিলাম ও শুনিলাম।

দল সবেমাত্র বাহির হইয়াছে অমনি নিকটবর্ত্তী হরিগ্রামের জমিদার রামকান্ত বাবু লিখিয়া পাঠাইলেন, "বাবা যোগশ, আমাদের বাড়ীর মেয়েরা তোমাদের গান শুনিতে চাহিতেছেন।"

যোগেশ সহর্ষে নিমন্ত্রন গ্রহণ করিল।

সারাদিনে সাত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার প্রাকালে গোষান রমাকান্ত বাবুর বাড়ীতে পঁহুছিল। সাদর অভ্যর্থনায় প্রীত হইয়া যোগেশ অধিকারীর ন্যায় বলিল, "রাত্রি জাগা আমাদের অভ্যাস নাই, সুতরাং কাল প্রাতে আমরা গান ধরিব।"

রাম বাবু বলিবেন "তথাস্তু।"

যোগেশ রাত্রি ভোজনের জন্য অন্দর মহলে নিমন্ত্রিত হইল। মা ছাড়া অন্য কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাহার বড় একটা আলাপ পরিচয় ছিল না।

সুতরাং মাথা হেট করিয়া লাজুক যোগেশ আহার করিতে বসিল। পরিবেশন কারিণী যখন ভাতের থালা ও ব্যঞ্জনের বাটীগুলি যোগেশের সম্মুখে রাখিতে লাগিল, তখন যোগেশের বুকের ভিতরটা ঘড়ির কাঁটার ন্যায় ঠক্-ঠক্ করিয়া উঠিল। সে কিছুই খাইতে পারিতেছেনা দেখিয়া গৃহিণী পাতের কাছে আসিয়া বসিলেন এবং "এটা আগে খাও," "ওটা মন্ট, একটু খাও" ইত্যাদি

সস্নেহ বাক্যে সেই নবীন যাত্রাওয়ালাকে আকণ্ঠ ভোজন করাইলেন।

একটা চিন্তা যোগেশকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল— কাল সে এই বাড়ীর মেয়েদের সম্মুখে রাধিকার বেশে কি করিয়া বাহির হইবে!

(৬)

পরদিন প্রাতঃকালে আসর বসিল যুদ্ধবিগ্রহ, নর্ত্তন, কুর্দ্দন যাত্রার মামুলি দৃশ্যগুলি একে একে চলিতে লাগিল। অবশেষে যোগেশ আসরে নামিয়া গান ধরিল,

"কই কৃষ্ণ, কোথায় কৃষ্ণ, আমার কৃষ্ণধনে এনে দাও" কি সুন্দর চেহারা আর কি মিষ্টি গলা! বৃদ্ধ বৃদ্ধারা চক্ষের জল রাখিতে পারিল না, আর যুবকেরা বারংবার encore, encore বলিয়া রাধিকা ঠাকুরাণীকে বিব্রত করিয়া তুলিল। সকলের উপরে বিপদ হইল এই যে সকলেই তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল "ইনিই শ্যামগ্রামের জমিদার যোগেশ বাবু।" সুতরাং রাধিকা ঠাকুরাণীর গলা যে একটু ধরিয়া আসিবে, আর কথা বলিবার সময় prompter কে তাহার আঁচল ধরিয়া টানিয়া দিতে হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি!

এইরূপে তিন অঙ্ক শেষ হইয়া গেল। বাহবাও যথেষ্ট মিলিল। কিন্তু চতুর্থ অঙ্কের প্রথম ভাগেই এক অভিনব দৃশ্য দেখা গেল। যোগেশ আসরে আসিয়া সবেমাত্র ললিতা সখীর চিবুক ধরিয়া গান ধরিয়াছে—

"সখি কালো রূপ আর হেরব না নয়নে," অমনি তাহার চক্ষু আসরের পশ্চাৎ ভাগে মেয়েদের বসিবার স্থানের দিকে ফিরিল। বয়স্কা মেয়েরা চিকের অন্তরালে বসিলেও যাহারা অল্পবয়স্কা তাহারা খোলা জায়গাতেই বসিয়া ছিল। সকলের সম্মুখে বসিয়া সেই শর নিবেশ কারিণী বডিস্ সেমিজ ধারিণী মেয়েটী তদ্গত চিত্তে যোগেশের গান শুনিতে ছিল—গানটা যেন তাহার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া গিয়াছিল। দেখিয়াই যোগেশের মাথা ঘুরিয়া গেল। গানটা ও মধ্য খানে হঠাৎ থামিয়া গেল। দোষ ঢাকিবার জন্য ললিতা সখী বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন কিন্তু রাধিকার মুখে টুঁ শব্দটী নাই। prompter তিনবার তাঁহার আঁচল টানিয়া দিল কিন্তু রাধিক নীরব! দর্শকেরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে যোগেশের পতন ও মূর্চ্ছার আবির্ভাব হইল বিষম বিভ্রাট।

(৭)

যোগেশ চক্ষু মেলিয়াই দেখিল দুগ্ধফেনোনিভ শয্যায় তাহার দেহ বিন্যস্ত রহিয়াছে। চারিদিকে আতর গোলাপজলের ছড়াছড়ি। গৃহিণী তাহার চোখে মুখে গোলাপজল ছিটাইতেছেন, আর সেই মেয়েটী মাথার কাছে বসিয়া পাখা করিতেছে। বঙ্কিম বাবুর দুর্গেশ-নন্দিনীর সেবাপরায়ণা আয়েষার কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। যোগেশের মনে হইল ভাবিল এমন সেবা পাইলে সে চিরকাল মূর্চ্ছিত হইয়া থাকিতে পারে।

যোগেশ চাহিবামাত্র গৃহিণী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন, "লীলা, একটু সরবৎ তৈয়ার করিয়া আনতো মা।"

লীলা পাখা রাখিয়া সরবৎ করিতে গেল। গৃহিণী যোগেশকে বলিলেন "এখন কেমন আছ, বাবা?"

যোগেশ বলিল, "বেশ আছি।" প্রাণে তাহার প্রবল জোয়ার ভাটা খেলিতেছিল।

লীলা সরবৎ লইয়া আসিল; যোগেশ দেখিল কলিকালের স্কুলে পড়া মেয়েরা 'বাবু' হইলেও সরবৎটা করে বেশ মিষ্টি!

লীলা চলিয়া গেল। গৃহিণী তখন লীলার কথা তুলিয়া বলিলেন "ওটী আমার মেয়ে—কলিকাতায় মেয়েদের স্কুলে লেখা পড়া করিয়াছে, গান বাজনা কার্পেটের কাজ প্রভৃতি বেশ জানে।"

যোগেশ বলিল "তা' না হবে কেন ও'তো আপনারই মেয়ে।" মনে মনে ভাবিল, নবেল, কার্পেট, হিষ্টিরিয়া এই তিনটী রোগ না থাকিলে কলিকালের মেয়েদের স্বামী নামক উপগ্রহটী জুটিবে কি করিয়া!

গৃহিণী বলিলেন "হাজার শিক্ষিতা হইলেও আজ কাল মেয়েদের বর জুটা ভার—লীলার জন্য ভারি চিন্তা হইয়াছে।"

যোগেশ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সব শুনিল।

(৮)

যোগেশ বাড়ী আসিয়াই বলিল "যাত্রার দল ভাঙ্গিয়া দাও।"

১ নং বন্ধু বলিল "তা' বেশ, ভাঙ্গিয়া দাও কিন্তু তোমার হঠাৎ মূর্চ্ছা হইল কেন, তা'র একটা নিকাশ দিতে হইবে।"

২ নং বন্ধু বলিল "তা' আর বুঝ্‌তে পারলে না। মানুষের জীবনে মধ্যে মধ্যে একটা শুভ অবসর আসে তখন যাত্রা গাইতে গেলেও জামাই সেবা লাভ হয়।"

৩ নং বন্ধু বলিল "বেশ বুঝিতেছি ভবিতব্যানাং দ্বারানি ভবন্তি সর্ব্বত্র' অর্থাৎ হ'ল 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে!'

যোগেশ রাগিয়া বলিল "ফের যদি অমন কর, তবে আর তোমাদের সঙ্গে মিশিবনা।"

বেগতিক দেখিয়া বন্ধুরা একে একে উঠিয়া গেল, কেবল ৪ নং উপেন্ তখনো বসিয়া রহিল, সে জানিত যোগেশ তাহাকেই মনের কথা খুলিয়া বলিবে। যোগেশকে একাকী পাইয়া উপেন্ বলিল "আমি কিন্তু সব বুঝিয়াছি, কিছু বলিতে হইবে না—এখন শুভকর্ম্মের উদ্যোগ করিব কি?"

যোগেশ বিষণ্ণবদনে বলিল "কিন্তু রামকান্ত বাবু রাজি হইবেন কি?"

উপেন্ উত্তেজিত হইয়া বলিল—"তুমি নেহাৎ বোকা; যাত্রা গানের লীলা খেলাটা একরূপ মনে কর দেখি! তাঁহার সৌভাগ্য যে তোমাকে পাইতেছেন। আমি মা'কে বলিয়া সব ঠিক্ করিয়া দিতেছি।"

(৯)

শুভদিনে শুভক্ষণে লীলার সঙ্গে যোগেশের বিবাহ হইয়া গেল। বহুদিন পরে লীলা যোগেশের পুরাতন ডায়ারী খানা খুলিয়া দেখিল এক পৃষ্ঠায় লেখা রহিয়াছে, "বিবাহ তো করিবই না, যদিই করিতে হয় স্কুলে-পড়া মেয়েকে কিছুতেই করিব না।"

লীলা যোগেশকে বলিল "আচ্ছা রাধিকা ঠাকুরুণ, প্রতিজ্ঞা যে ভাঙ্গিয়াছেন তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি?"

যোগেশ বলিল, "কেন, তুমিই তো আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছ—সুতরাং তোমাকে সপ্তাহ নিরম্বু উপবাস করিতে হইবে।"

লীলা হাসিয়া বলিল "আমি আপনার পায়ে ধরিয়া সাধিতে গিয়াছিলাম কিনা!"

যোগেশ গম্ভীর ভাবে বলিল "তা' বটে। সখি, মনোযোগ পূর্ব্বক অবধান কর," এই বলিয়া গান ধরিল,

"মনের দুঃখ আছে মনে
সে দুঃখ আর বলুব কা'কে
পড়িলে প্রেমের পাকে ঘোর বিপাকে
মনের বল আর ক'দিন থাকে!"

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিধবা মেয়ে

প্রস্ফুটিত অঙ্গে যার, শোভা রাশি সুন্দর সলাজ,
তারে দিয়া পড়িয়াছে বাঙ্গালার নিষ্ঠুর সমাজ
প্রচ্ছন্ন অশ্রুর কাব্য! সকরুণ ছন্দ বেদনার
লীলায়িত লোধ্র পুষ্পে! মনে পড়ে মুরতি তোমার!—
তরুণ যোগিনী বেশে, চক্ষু মুদি যবে চলেছিলে
যৌবন মঞ্জুল পথে, বিরহ সাজায়ে নব ফুলে!
শঙ্খ হীন করে তব কমণ্ডলু গঙ্গা বারি ভরা
সর্ব্বস্ব ত্যাগের যজ্ঞে হাসি মুখে চলেছ কি ত্বরা?
বঙ্গের বিধবা মেয়ে! কবি কহে, তারে আমি চিনি,
পঙ্ক হতে অশ্রু নীরে ফুটিয়াছে রক্ত কমলিনী!
একদা বিরলে বসি, বিধি নিজ ভাব চিত্রশালে
সৌন্দর্য্যের পুণ্য মূর্ত্তি নিরমিলা নয়নের জলে
আমি ভাবি চিরদিন অশ্রুভরা সজল নয়নে
সৌন্দর্য্যের মাঝে বিধি এত অশ্রু রাখিলে কেমনে!

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

সাহিত্য সেবক।

আওলাদ হোসেন (খান বাহাদুর)—সৈয়দ আওলাদ হোসেন ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহাদের আদি বাসস্থান বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বাহাদুরপুর গ্রামে; বর্ত্তমানে ঢাকা সহরে অবস্থান করিতেছেন। ইনি কলিকাতা মাদ্রাসা ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে রুরেল সবরেজেষ্ট্রার হন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে স্পেসিয়াল সবরেজেষ্ট্রার পদে উন্নতী হন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রথম Inspector of Registration পদ লাভ করেন। ১৯০৭ সনে ইনি খাঁ বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৯১৩ সনের ১লা আগষ্ট হইতে পেন্সন প্রাপ্ত হইতেছেন। ইনি ছোট বেলায় পার্সি আরবী পাঠ করেন, বাংলা পড়েন নাই। হাজারীবাগ হইতে ঢাকা জিলার শ্রীনগরে বদলী হইয়া বাঙ্গলা পরীক্ষা দিতে বাধ্য হন। ইহাঁর Antiquities of Dacca নামক এক খানি ইংরেজী গ্রন্থ আছে।

আবদুল বারি—নিবাস নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত মাইজদী গ্রাম। ইনি "কারবালা" নামক একখানা কবিতা পুস্তক লিখিয়াছেন।

আবুল মাআলী মহাম্মদ হামিদ আলী:—সুলতানপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৯৪ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা হইতে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষকতা কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছেন। ইনি "কাসেমবধ, জয়নলোদ্ধার" কবিতা কুঞ্জ প্রভৃতি কবিতা গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

আবদুল মজিদ চৌধুরী—নিবাস পাবনা জেলার অন্তর্গত জানকী গাঁতি। ইনি "সুলতান বলখি" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ—ইনি একজন সুলেখিকা। বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাদিতে লিখিয়া থাকেন তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"আমার পিতামহ ৺অভয়কুমার দাস, পিতা ৺প্রাণ কুমার দাস, নিবাস ফরিদপুর জেলার লুনসিং গ্রাম। শ্বশুরালয় ঢাকা জেলা বিক্রমপুর পরগণার ষোলঘর গ্রাম। স্বামী শ্রীরাখালদাস ঘোষ, ঢাকা কলেজের প্রফেসর। শ্বশুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ, উকীল।

"বাবা নব্যতন্ত্রী ছিলেন; উনবিংশ শতাব্দীর ভারত যখন বক্ষের উপর পুঞ্জিত আর্জ্জনার ভারে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া সব ছুঁড়িয়া ফেলিতেছিল সেই সময়ের সেই উত্তপ্ত উত্তেজনা তাঁহার রক্তে মিশ্রিত ছিল। হিন্দু সমাজ যে সব সংকীর্ণতায় সঙ্কুচিত হইয়া চলিত, ক্রুদ্ধ আক্রমণ কারীর মত তিনি তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন; ফলে আমরা free Education পাইয়াছিলাম। কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই, চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ-পদ্যপাঠ তৃতীয় পাঠ Royal Reader No III বাল—শিক্ষার এই অতি ক্ষুদ্র ভাণ্ডার সঙ্গে লইয়া দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে স্বামী গৃহে আসিলাম। বাবা আমাদের কখনও কোন নভেল ইত্যাদী পড়িবার অনুমতি দেন নাই সুতরাং সাহিত্য জগতের সহিত আমাদের কোন পরিচয় ছিল না। এমন কি বিরাধ বাবু ও বঙ্কিম বাবুর নামও আমাদের নিকট সম্পূর্ণ নূতন ছিল।

"বাবা Personal Assistant to the Commissioner ছিলেন; তিনি পশ্চিমে কাজ করিতেন; নগরোপকণ্ঠে নির্জ্জনে লালিত হইয়া আমাদের সমাজ সংসার ও দেশ সম্বন্ধে কোনও ধারণা ছিল না, এবং মাষ্টার মহাশয়ও পড়ার বই গুলি ছাড়া আমাদের আর কিছুর সহিত বড় পরিচয় ছিল না। বর্দ্ধমানে আমার infant class শেষ হয়, পরীক্ষায় প্রথম হইয়া dall ও Picture book এবং সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণ ও মহাভারত প্রাইজ পাই। সপ্তম বৎসরের মধ্যে সেগুলি ও আরো কয়েকটী হিন্দু পুরাণ আমি শেষ করিয়াছিলাম। বাঁকীপুর স্কুলে Upper Primary দিয়া আমরা যখন ভাগলপুর আসিলাম তখন সেখানে স্কুল ভাল না থাকায় বাড়ীতে পড়ার বন্দোবস্ত করিলেন। আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি নিজে যথেষ্ট ক্লেশ স্বীকার করিতেন। কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াত যত্নত" এই নীতি বাক্যটীর প্রতি তিনি অতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন।

নবম বৎসর বয়ঃক্রমে আমি হটাৎ একদিন কবি হইয়া পড়ি। ঘটনাটা যে বিশেষ কিছু বৃহৎ ছিল তাহা নয়, স্নিগ্ধ এক শারদ প্রভাতে ছোট, একটি পাখীর ছানা গাছের ডালে বসিয়া গান গাহিতেছিল, এমন সময় একটী দাঁড়কাক আসিয়া তাহাকে ঠোকরাইয়া মারিয়া ফেলিয়া দিল, আমরা তিন বোন তাহাকে তুলিয়া আনিলাম ও হরিনাম শুনাইয়া (রামায়ণে পড়িয়াছিলাম যে অন্তকালে হরি নাম শুনাইলে দেবদূত আসিয়া স্বর্গে লইয়া যায়) রাশীকৃত ফুলের ভিতর সমাধি দিলাম। সন্ধ্যায় আমরা সেখানে প্রদীপ জালিতাম ও ফুলের মালা দিয়া ও ঝাউপাতা দিয়া সাজাইতাম। এই পাখীটির সমাধি প্রস্তরের উপরে আমরা তিন জনে একটী কবিতা লিখিয়া দিয়াছিলাম। সেদিন হইতে কারণে অকারণে অসম্বরনীয় একটা আকুলতা আমাকে স্বস্তিহীন করিয়া তুলিল এবং আমার শিশু কল্পনা সহসা প্রকাশিত সেই অপরূপ জগতের নিরুদ্দিষ্ট পথে যাত্রীবেশে গিয়া দাড়াইল। সে সময় আমি যে খাতা গুলি পূর্ণ করিয়াছিলাম তাহা, আমার একান্ত গোপন ধন ছিল এবং পাছে তাহা পাঠ করিয়া কাহারও হাস্য রসের উদ্রেক হয়, এই জন্য সেই পাখিটীর মতই আমি সে গুলিকে মৃত্তিকার নিম্নে সমাধি দান করিয়াছিলাম।

একান্নবর্ত্তী বৃহৎ পরিবারে হিন্দু বধুর যে দায়ীত্ব ভার গ্রহণ করিতে হয়, তাহা মাথায় লইয়া আমি যখন দাঁড়াইলাম, তখন দেখিলাম পঙ্গু হইয়া গিরি অতিক্রম করিতে উদ্যত হইয়াছি। সময় সুযোগ ও সুবিধা অপরুষ্ট লক্ষ্মীর মত যতই আমার নিকট হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল ততই আমার চেষ্টা প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। বিমুখ ভাগ্যদেবীর দিকে চাহিয়া আমি কহিয়াছি—"কালি কত করবি কর, তবু না কাতর হবে চাঁদসদাগর।" সাহিত্যের এই মন্দির তলে আমি আমার জীবনের দুটি শ্রেষ্ঠ ধন নিবেদন করিয়াছি, তাহা আমার স্বাস্থ্য ও চক্ষু। আমার আকাঙ্খার এ স্বর্ণ দেউলের উত্তরণ শিলায় আমার সব ক্লেশ সোনা হইয়া গিয়াছে। আমার থলি শূন্য করিয়া নিবেদনের ডালি সাজাইয়া বিনিময়ে প্রসাদ যাহা পাইয়াছি—তাহা যশ নয়, প্রতিষ্ঠা নয়, গৌরব নয়; তাহা আমার প্রাণের পরম তৃপ্তি।

"নিষাদ একলব্যের মত আমার সাহিত্য সাধনা গুরুর কাছে হয় নাই; গুরুর নামে হইয়াছে। বিবাহের পর যে একটী পরম আনুকূল্য আমি পাই তাহা স্বামীর গ্রন্থরাশি। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের একটী পুস্তকও তাহাতে বাদ ছিল না। বাঙ্গালির ঘরে এ সুযোগ অতি কমই ঘটিয়া থাকে। রাত্রি জাগিয়া আমি সে সমুদয় গ্রন্থ গভীর আগ্রহে পাঠ করি। বাঙ্গালা মাতৃ-ভাষা—সহজেই আমি আয়ত্ত করিয়া লইলাম। ইংরাজী অভিধান সম্বল হইল। কি ইংরাজী কি বাঙ্গলা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ছাড়া আমি কখনও পড়িয়া তৃপ্তি পাই নাই সুতরাং পড়ি নাই। লঘু প্রকৃতির লেখার উপর ছেলে বেলা হইতে আমি বীতশ্রদ্ধ ছিলাম। * * *

" আমার জন্ম তারিখ আমি অবগত নহি, সনও ঠিক বলিতে পারিলাম না। শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ অতিক্রম করিয়াছি, এই মাত্র বলিতে পারি।

শ্রীআশুতোষ দাস গুপ্ত মহলানবীশ — বরিশাল জেলার অন্তর্গত ঝাউকাঠী গ্রামে ১২৮৫ সনের ৪ঠা আশ্বিন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺বদনচন্দ্র দাস গুপ্ত মহলানবীশ। ইনি বাল্যকাল হইতেই সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া থাকেন। বরিশাল রাজচন্দ্র কলেজে অধ্যয়ন কালে "আশা" নামে একখানি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বর্ত্তমানে শিবপুর (হাবড়া) হইতে "নন্দিনী" নামক একখানা মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিতেছেন।

শ্রীআশুতোষ রায়—ঢাকা জেলার অন্তর্গত সুয়াপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম শিবচন্দ্র রায়। আশুবাবু সিনিয়ার জুনিয়ার পরীক্ষা পাশ করিয়া ঢাকায় ওকালতি ব্যবসা করিতে আরম্ভ করেন। ইনি যুক্তি চিন্তামণি উপদেশ রত্নাকর "পদ্ম কুসুম" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

মহরম। শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও ঢাকা পপুলার লাইব্রেরী হইতে শ্রীহরিরাম ধর বি এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৵৹ আনা মাত্র। পূর্ণ বাবু অতি প্রাঞ্জল ও মর্ম্মস্পর্শি ভাষায় মহরমের বিষাদ ময় কাহিণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই পুস্তক খানি সর্ব্বাংশে সাম্প্রদায়িকতা পরিশূন্য এবং সর্ব্বজাতির পাঠোপযোগী হইয়াছে। ৪ খানি সুন্দর ছবিতে গ্রন্থখানির সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইয়াছে। পুস্তক খানি দুই বর্ণে মুদ্রিত।

প্রহ্লাদ। এই খানি ও শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রভট্টার্য্যের লিখিত এবং পপুলার লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।৵৹ আনা। হরি ভক্ত প্রহ্লাদের কাহিনী অতি মধুর ভাষায় লিখিত হইয়াছে। বালক বালিকাগণ এই পুস্তকে হরি ভক্তির ভগবদ্ভক্তির মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত হইবে। গ্রন্থে ছয় খানি সুন্দর চিত্রিত আছে।

প্রৌঢ়াবস্থায়
আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথ।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

সৌরভ

দ্বিতীয় বর্ষ। } ময়মনসিংহ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১। { অষ্টম সংখ্যা।

শারদা তিলকের রচনা কাল।

(বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের কলিকাতা অধিবেশনে পঠিত)

তন্ত্র গ্রন্থ সমূহের মধ্যে "শারদা তিলক" পণ্ডিত সমাজে সুপরিচিত। বহু শতাব্দী হইতেই ইহার পঠন পাঠনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ প্রাচীন সূত্রগ্রন্থের রীতি অনুসারে লিখিত। ইহাতে অল্পাক্ষরে এত অধিক বিষয় বিন্যস্ত হইয়াছে যে—টীকার সাহায্য ব্যতীত ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় পরিস্ফুট হয় না। গ্রন্থকার স্বয়ংই ইহাকে তন্ত্রের সারসংগ্রহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার এই গ্রন্থ টীকার সাহায্যে অধ্যয়ন করিলে, তাঁহার উক্তির সত্যতা পদে পদে প্রতিভাত হয়। বাস্তবিক উপাসনার উপযোগী এমন বিষয় প্রায় দেখা যায় না, যাহা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয় নাই। ঈদৃশ উপাদেয় গ্রন্থের রচয়িতা মহাত্মা লক্ষ্মণাচার্য্য কোন্ সময়ে ভারতের কোন্ ভূভাগ সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে কুতুহল হইয়া থাকে। কিন্তু গ্রন্থকারের উক্তির দ্বারা কৌতুকাস্পদ বিষয়ের কিছুই জানা যায় না। তিনি গ্রন্থের শেষ ভাগে যে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে এই মাত্র জানা যায় যে—তাঁহার প্রপিতামহ "মহাবল" নামক পণ্ডিত আশ্রিত শিষ্য সমূহকে মুক্তিরূপ ফলদান করিয়াছিলেন। মহাবলের পুত্র' আর্য্য পণ্ডিত"নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। উক্ত আর্য্য পণ্ডিত"দেশিক বারণেন্দ্র"বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন; এই বিশেষণ হইতে বুঝা যায়,—সে কালের "দেশিক" (গুরু) সমাজে তিনি শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ দেশিক "দেশিক" নামে অভিহিত হইয়াছেন। উক্ত শ্রীকৃষ্ণই দেশিকেন্দ্র লক্ষ্মণের পিতা। লক্ষ্মণ দেশিক সমগ্র বিদ্যাতে এবং বিবিধ কলাতে অতীব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার এই মাত্র বলিয়াই আত্ম-পরিচয় প্রদান প্রয়াস হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের উপাদেয়তা এবং দুর্জ্ঞেয়তা হেতু অনেক মহাত্মাই ইহার টীকা প্রণয়নে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। সংপ্রতি উক্ত গ্রন্থের তিনখানি টীকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। টীকায় লক্ষ্মণাচার্য্যের বিষয় কিছুই বর্ণিত হয় নাই। মাধব ভট্ট বিরচিত "গূঢ়ার্থদীপিকা" টীকাতেও মূলগ্রন্থকারের কোনও পরিচয় নাই।

কিন্তু রাঘব ভট্ট কৃত "পদার্থাদর্শ" টীকায় বর্ণিত গ্রন্থকারের গুরু পঙক্তির এবং শিষ্যশ্রেণীর ক্রম নির্দ্দেশানুসারে জানা যায় যে শ্রীকণ্ঠের শিষ্য বসুমন্ত, তৎশিষ্য সোমানন্দ, সোমানন্দের শিষ্য উৎপলাচার্য্য, উৎপলাচার্য্যের শিষ্য লক্ষ্মণাচার্য্য, লক্ষ্মণের শিষ্য অভিনব গুপ্ত ও অভিনব গুপ্তের শিষ্য ক্ষেমরাজ। ক্ষেমরাজের শিষ্যগণ ক্ষেমরাজ হইতে লক্ষ্মণ পর্য্যন্ত এবং উৎপলাচার্য্য হইতে শ্রীকণ্ঠ পর্য্যন্ত গুরু সমূহকে প্রণাম করিয়াছেন। লক্ষ্মণাচার্য্যের শিষ্য অভিনব গুপ্ত এবং কাশ্মীরীয় শৈবাচার্য্য 'পরমার্থ সার' রচয়িতা অভিনব গুপ্ত একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। কাশ্মীরীয় অভিনব গুপ্তের একজন প্রসিদ্ধ শিষ্যের নামও ক্ষেমরাজ, এই ক্ষেমরাজ "শিবসূত্র বিমর্ষিণী" রচনা করিয়া গিয়াছেন। অভিনব গুপ্ত খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

সুতরাং লক্ষ্মণাচার্য্য ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

শারদা তিলকের প্রথমাংশে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে যে সকল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাতে তান্ত্রিক দর্শনের অনেকটা স্বতন্ত্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্ফোটবাদি বৈয়াকরণদিগের মত উপন্যস্ত করিয়া তাহার নিরসনেও মতান্তরের খণ্ডনরূপ দার্শনিক রীতির অনুসরণ দেখা যায়।

গ্রন্থকার বর্ণিত জগদুপাদান "নাদ বিন্দুর" সহিত মহা-বৈয়াকরণ ভর্তৃহরিকৃত বাক্য পদীয়ের সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। শারদা তিলক পাঠে মনে হয়,—সে কালের তান্ত্রিক-সমাজে বিবিধ দর্শনের এবং জ্যামিতি প্রভৃতি শাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা হইত। কারণ কুণ্ডের অথবা তোরণ প্রভৃতির নির্ম্মাণ জ্যামিতির সাহায্য ব্যতীত কিছুতেই হইতে পারে না। ইহাতে বাস্তু বিদ্যাজ্ঞানেরও আবশ্য-কতা উপলব্ধ হয়। এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রাঘব ভট্ট বহু গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে গৌতম কৃত তন্ত্র ব্যাকরণেরও উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে—ব্যাকরণের নিয়মেও তন্ত্রশাস্ত্র স্বতন্ত্রতালাভ করিয়াছিল।

লক্ষণাচার্য্যের আবির্ভাবকাল তন্ত্র সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশের যুগ বলিয়া উল্লিখিত হইবার যোগ্য। ক্রমে ক্রমে অবনতির ফলে তন্ত্রের দার্শনিক মত নিবন্ধ গ্রন্থ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। গুরু শিষ্য কেহই আর দার্শনিক তর্কের প্রয়োজন অনুভব করেন না।

সুতরাং গুরু শিষ্যের লক্ষণ নিরূপণ হইতেই তন্ত্রসার প্রভৃতি নিবন্ধের উপক্রম, এবং পদ্ধতি রচনা, মন্ত্রোদ্ধার, স্তব-কবচ সংগ্রহ প্রভৃতিতে উপসংহার দেখা যায়। এমন কি দীক্ষা প্রভৃতির অনুষ্ঠানেও শারদা তিলকের তুলনায় পরবর্ত্তি গ্রন্থে অনেকটা সুগমতার পরিচয় পাওয়া যায়। মনে হয়, এই সময় হইতেই গুরুতা—ব্যবসার রূপে পরি-গণিত হইয়াছে, এবং "উপদেশঃ কলৌযুগে" এই উপদেশ প্রচারিত হইয়াছে। অঙ্কুরারোপণ প্রভৃতির খুঁটিনাটি বাদ দিয়া সহজ দীক্ষা পদ্ধতি সংগৃহীত হইয়াছে।

টীকাকার 'রাঘব' আত্মপরিচয় দানে কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। পদার্থাদর্শের উপসংহারে তিনি যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়—'দক্ষিণদিকে গোদাবরী নদীর শোভমান উপকণ্ঠে জনস্থান নামক প্রসিদ্ধ লোক-পূর্ণ স্থান ছিল; মহারাষ্ট্র দেশের সেই স্থানে রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত হৃষ্টচিত্তে বাস করিতেছিলেন।

সেই স্থানে মহাপ্রসিদ্ধ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ কুলে উদারচেতা ভট্টগ্রামেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই আদি মহেশ সিংহ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

তাঁহা হইতে কুশাগ্রতুল্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ভট্ট পৃথ্বীধর জন্ম-গ্রহণ করেন, ইনি অনেক প্রকারে ভট্টগ্রন্থ, বেদান্তশাস্ত্র ও মহাভাষ্য অধ্যাপনা করিতেন।

কতিপয় দিবসের পর পবিত্রচেতা এই ভট্ট পৃথ্বিধর শিব রাজধানী বারাণসী পুরীতে গমন করিয়া শরীর বিনাশ পর্য্যন্ত তথাতেই বাস করিয়াছিলেন।

উক্ত পৃথ্বিধর হইতে এই রাঘবভট্ট জন্মগ্রহণ করিয়া-ছেন, ইনি অসাধারণ নীতিজ্ঞ, ন্যায়শাস্ত্রে এবং বেদান্ত-শাস্ত্রে পণ্ডিত, ভট্টমতানুযায়ী মীমাংসাশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ ও সাহিত্যের রত্নাকর স্বরূপ। ইনিই আয়ুর্ব্বেদের নিধি কলা বিষয়ে কুশল, কামশাস্ত্রে ও অর্থশাস্ত্রে গুরু, সঙ্গীতে নিপুণ ও সদাগম নিধির পারদর্শী।

তিনি ১৫১০ পরিমিত রৌদ্র নামক বৎসরে পৌষ মাসে শুক্রবারে শুক্লপক্ষীয় অষ্টমীযুক্ত সপ্তমী তিথিতে কাশীধামে এই টীকা রচনা করিয়াছেন।

এই ১৫১০ সালকে বিক্রম সম্বৎ ধরিয়া লইলে ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দ 'পদার্থাদর্শের' রচনা কাল স্থির করিতে হয়।

রাঘব নিজকে যেরূপ বহুদর্শী রূপে নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন, তাহাতে আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাকে আত্মশ্লাঘারত বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার এই উপাদেয় গ্রন্থ পাঠ করিলে, স্বভাবতই যেন তাঁহার প্রতি একটা অগাধ ভক্তির উদ্রেক হয়। তিনি যে সকল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে এবং ব্যাখ্যা নৈপুণ্যের প্রতি মনোনিবেশ করিলে যেন বলিতে প্রবৃত্তি হয়,—'শারদা তিলকের' তাৎপর্য্য একমাত্র তিনিই বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিয়াছেন।

তিনি এত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন যে গ্রন্থের নাম

না থাকিলেও রাঘব ভট্ট ধৃত বলিয়াই স্মার্ত্ত প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ তাঁহার গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শারদা তিলকের অনেক পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়, বাঙ্গালার পুস্তকে, বেনারসে মুদ্রিত পুস্তকে এবং টীকাতে পাঠের এত বৈষম্য লক্ষিত হয় যে, রাঘবের সাহায্য না পাইলে, এই সমস্ত পাঠের বিচার করা সম্ভব হয় না। রাঘব অনেক পাঠ ধরিয়া বিচারের দ্বারা প্রকৃত পাঠ স্থির করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, রাঘবের বহু পূর্ব্ব হইতেই সম্প্রদায় ভেদে পাঠভেদ সংঘটিত হইয়াছিল।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

ময়মনসিংহের দাশুরায়।

মানুষ যায়, কিন্তু তাঁর স্মৃতি থাকে। সে দাশুরায় নাই, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি, বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসের পরতে পরতে, আঁকা রহিয়াছে। সে স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে, কালেরও সাধ্য নাই। বাঙ্গালার স্বর্ণখনি আবার মাইকেল হেমচন্দ্রের মত রত্নপ্রসব করিতে পারে, কিন্তু সে দাশুরায় বুঝি আর হইবে না। পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যের ইতিহাসে, দাশুরায়ের স্মৃতি উজ্জ্বল ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। কিন্তু ময়মনসিংহের সাহিত্যের ইতিহাসে, ময়মনসিংহের দাশুরায়ের কথা কিছুই নাই। পশ্চিম বঙ্গের ন্যায়, ময়মনসিংহেও কবিওয়ালাদের গানে, একবার ভাবের বান ডাকিয়াছিল। এক্ষণে সে স্রোতের ভাটা পড়িয়াছে। ময়মনসিংহের সাহিত্যের ইতিহাসে, তাহারই একটী ক্ষুদ্র স্মৃতি আঁকিয়া রাখা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ঠিক কোন্ সময়, কোথা হইতে এই মহাস্রোত আসিয়া, ময়মনসিংহের জলা ভূমি ভাসাইয়া দিয়াছিল, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারিব না। বোধ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, পশ্চিম বঙ্গ হইতেই এই ভাবের বন্যা সর্ব্বপ্রথম ময়মনসিংহের উপকূলে আসিয়া সাড়া দেয়। ঠিক সেই সময় কয়েক জন কবিওয়ালা, এতদঞ্চলে আবির্ভূত হন। ইহাদের মধ্যে দুইজন ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্থানে আরও দুই একজন থাকিতে পারেন, কিন্তু যতদূর জানি, পূর্ব্ব ময়মনসিংহে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। সুধু পূর্ব্ব ময়মনসিংহে কেন, ঢাকা জেলার প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা গণও ইঁহাদের কাছে হারিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের একজনের নাম রামনাথ ওরফে রামু, অন্য জনের নাম রামগতি; একজন ময়মনসিংহের নিধুবাবু, অপর জন—দাশুরায়। রামগতি সরকার ও রামু সরকার এই নামেই ইহারা সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত ছিল। রামগতি জাতিতে নাপিত, রামনাথ জাতিতে মালী। ইহারা উভয়েই নিরক্ষর, এমন কি নিজের নামটী পর্য্যন্ত দস্তখত করিতে শিখে নাই। অথচ এমন কোনও পুরাণ নাই, এমন কোনও শাস্ত্র নাই, যাহা তাহাদের কণ্ঠগত না ছিল। সরস্বতী যেন তাঁহাদের কণ্ঠেই বাস করিতেন।

প্রতিভা যে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী দিগের গলায়ই বরমাল্য প্রদান করিবে, তাহা নহে। স্থানবিশেষে দেখা যায়, জগতের অনেক হেয় অনাদৃত লোকও দেব দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী হইয়া থাকেন। এই প্রতিভার বলেই মূর্খ কালিদাস জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, এই প্রতিভার বলেই দস্যুপতি রত্নাকর, আজ জগতগুরু বাল্মিকী নামে পূজিত, বোপদেব পণ্ডিত-শিরোমণি। প্রতিভা দেবের দান, দেবতা যাকে ভালবাসেন, তিনিই সেই অলৌকিক মহাদান প্রাপ্ত হন।

সাগরের অতল জলে কত মহারত্ন জলিতেছে, দুর্গম কণ্টক বনে কত শত সুরভী কুসুম ফুটিয়া আবার ঝড়িয়া পড়িতেছে, অন্ধকার গিরি গহ্বরে কত শত অমূল্য হীরকখণ্ড লুকাইত রহিয়াছে, মানুষ তাহার খোজ রাখে না।

পল্লী জননীর শান্ত-শীতল ক্রোড়ে এমন দুই একজন লোক জন্ম গ্রহণ করেন, যাঁহারা উপযুক্ত সাহায্য ও আশ্রয় পাইলে, জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য। কিন্তু কেবল উপযুক্ত সাহায্যের অভাবে, উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে, সেই সকল বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইতেছে। ইহার ফলে মানবের জাতীয় জীবনের একদিক অন্ধকার সমাচ্ছন্ন থাকিয়া যাইতেছে।

প্রদীপ কেবল তাহার নিজের ক্ষুদ্র দীপাধার টুকুকে আলোকিত করেনা, পার্শ্ববর্ত্তী পুঞ্জীকৃত অন্ধকার রাশি দূরীভূত করিয়া মানবকে তাহার গন্তব্য পথ দেখাইয়া দেয়। সূর্য্যকিরণ কেবল রবির পরিধিকে উজ্জ্বল করিয়া ক্ষান্ত থাকেনা, বিশ্ববসুন্ধরাকে সমুজ্জল করিয়া তুলে। প্রতিভাশালী ব্যক্তি স্বীয় দীপ্তালোকে তাঁহার নিজের আঙ্গিনাটুকু আলোকিত করেন না, পরন্তু পৃথিবীর অনেক দুরপনেয় অন্ধকার রাশি অপসারিত করিয়া দেন। এইরূপ একজনের প্রতিভার আলোকে আমরা দশজনকে চিনিয়া লইতে পারি। দশটী দুর্জ্জেয় কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই।

পূর্ব্ব ময়মনসিংহের আধুনিক কবিওয়ালা গণের মধ্যে আরও দুই জনের নাম উল্লেখ যোগ্য। একজন কালীচরণ দে অপর জন বিজয়নারায়ণ আচার্য্য। প্রতিভাশালী হইলেও বিজয় নারায়ণ অকাল-কোকিল, কেননা ময়মনসিংহের সে সুখ বসন্তে কালিচরণ অকালে অনন্তধামে যাইয়া বিজয়কে স্থান ছাড়িয়া দিয়াছে।

বলিলে হয়ত অত্যুক্তি হইবে না, এইরূপ প্রতিভাশালী অনেক লোক, বনফুলের মত পল্লীগ্রামের নির্জ্জন অরণ্যে ফুটিয়া আপনি ঝড়িয়া পড়িতেছে। তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা উদ্যম সব তাঁহাদের অকাল সংসার-চিন্তা-জর্জ্জরিত-দুঃখ দৈন্যের বিষম জ্বালায় আকুলিত-জীবনের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানের চিতানলে পুড়িয়া ভস্মিভূত হইতেছে, ছায়ায় ঘেড়া কুসুম কলিকার মত, রুদ্ধ-আলো প্রদীপের মত, নিয়তির ছিদ্রহীন অরণ্যের মধ্যে পড়িয়া ফুট ফুট ফুটিতে পারে নাই। তাঁহাদের কাতর ক্রন্দন, হা হুতাশ, শিক্ষিত অধিবাসীর কর্ণমূলে পৌছায় নাই। মানুষ আপন ভাইকে চিনিয়া লইতেছে না। বিলাসিতার বিষম স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া বিপুল ধনরাশি জগতের হেয় কার্য্যে জলের মত খরচ করিতেছে। যাহার বিন্দুমাত্র সংসারের লোক-হিতার্থে ব্যয় করিলে জগতের অনেকগুলি বহুমূল্য জীবন রক্ষা পাইতে পারিত, অনেক মহার্ঘ রত্ন আবিষ্কৃত হইত। আমরা হেলায় এইরূপ কত রত্ন পায়ে দলিয়া যাইতেছি, কত সুরভি কুসুম পল্লীর বিজন বনে ফুটিয়া অকালে ঝড়িতেছে, কেউ তাহার জন্য মুখের আক্ষেপটুকুও করে না। রাজোদ্যানের প্রস্ফুটিত গোলাপ, গন্ধরাজের ইতিহাস অনেকেই লিখেন, কিন্তু বিজন বনান্তরাল স্থিত বনফুলের জন্য কেউ কাঁদে না, মানবের জাতীয় ইতিহাসে ইহা একটী দুরপনেয় কলঙ্ক।

মূল প্রসঙ্গের বহির্ভূত হইলেও, এইস্থানে আর একটী লোকের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। সে একজন ভিক্ষুকের কথা। বিধাতা তাহাকে জন্মান্ধ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। জগতে তাহার আপনার বলিবার কেহই নাই। উদরান্ন সংগ্রহের জন্য তাহার অন্য কোন সংস্থান নাই। কিন্তু বিধাতা তাহাকে এমন এক অমূল্য বস্তু দান করিয়াছেন, যাহার প্রভাবে, সে সমস্ত পল্লীবাসীর আদরণীয়। সে বাড়ীতে বাড়ীতে আপনার রচিত সঙ্গীত, ছড়া, ইত্যাদি গান করিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করে। তাহার বিরচিত কলির বৌ, গাজীচরিত, গোষ্টবিহার প্রভৃতি সঙ্গীত ও ছড়া আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, তাহা বেশ ভাবময় ও সরল। পল্লীবাসিগণ ইহার দ্বারা নিত্য নূতন ছড়া গান তৈয়ার করাইয়া শুনিয়া থাকেন। চারিটী পয়সা দিলে সে তৎক্ষণাৎ বসিয়া বসিয়া একটী দীর্ঘ ছড়া শুনাইয়া দিবে। এমন তার আশ্চর্য্য দৈবশক্তি। 'জলের ঘাটে কুলের বউ' নামে তাহার একটী উৎকৃষ্ট ছড়া আছে। তাহা বেশ কবিত্বপূর্ণ। পল্লীবাসীগণ, এই কাণা ফকিরকে লইয়া, নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে। আমার বিশ্বাস উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে এই ব্যক্তি একজন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ লোক হইতে পারিত।

উপরে যে লোকটীর কথা বলিলাম, আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের কবিওয়ালাগণও সেই জাতীয় নিরক্ষর গ্রাম্য কবি—বিধাতার অমূল্য দানের অধিকারী। পূর্ব্বে আমরা যে দুইজন কবিওয়ালার কথা বলিয়াছিলাম, তন্মধ্যে রসবর্ণনায় রামগতি সর্ব্বশ্রেষ্ট। ময়মনসিংহের তদানীন্তন ভূম্যধিকারিগণ, এমনকি রাজধানী সুসঙ্গের মহারাজগণ পর্য্যন্ত তাহার অসাধারণ কবিত্বশক্তিতে ও সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ ছিলেন।

কবি রামগতির বালক বয়সের কথা আমরা অবগত নহি। তবে যতদূর শুনা যায়, ছোটকাল হইতেই কথায়

কথায় মিল দিয়া কথা বলার একটা অভ্যাস তাহার ছিল। শৈশব সখাগণের সঙ্গে যখন মাঠে গরু চরাইতে যাইতেন, তখন তিনি নানাপ্রকার কথায় ও সঙ্গীতে, তাহাদের সকলকে মুগ্ধ করিতেন। যে দুরন্ত ছেলে, তাহার আদেশ প্রতিপালন করিতে হেলা করিত, তিনি তাহার নামে এমন শ্লেষ-জড়িত টপ্পা বাঁধিয়া গাহিতেন, যে সে হতভাগ্য উপহাসে জর্জ্জরিত হইয়া দল ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইত। তিনি সঙ্গীতে যেমন সুকণ্ঠ, রহস্যে তেমনি বাগ্মী ছিলেন।

যুবক বয়সে কবি তাঁহার স্বগ্রাম বাসিনী কোন এক পল্লী মহিলার কলঙ্ককর কাহিনী লইয়া একছড়া রচনা করেন। এই ঘটনা হইতে গ্রামের লোক তাহার উপর এমন বিরক্ত হয় যে, তিনি অনন্যোপায় হইয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন। এই সময় ঢাকা জিলার এক প্রসিদ্ধ ঝুমুরওয়ালীর দল, ময়মনসিংহের নানা স্থানে গান গাহিয়া, বেড়াইতে ছিল। বিধাতার ইঙ্গিতে কবি তাহাদের দলে প্রবেশ করিলেন। স্বভাব কবি রামগতিকে বেশী দিন ঝুমুরওয়ালীর দলে শিক্ষা-নবিশ থাকিতে হইল না। মধ্য বয়সে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সেই বিজন বন কুসুমের গন্ধ যিনি অনুভব করিলেন, তিনিই মুগ্ধ হইলেন।

একদিন ময়মনসিংহ দুর্গাবাড়ীতে বিক্রমপুরের দুইজন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালার সঙ্গে কবি রামগতির পাল্লা হইয়াছিল। তদানীন্তন সমজদারগণ সেই দিন কবি রামগতিকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন। খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে কবি, সুসঙ্গ রাজধানীতে আহুত হইলেন। তখন মাঘ মাস, দরিদ্র কবি প্রথমেই মাঘের নিদারুণ শীতের একটা টপ্পা বাঁধিয়া গাহিলেন। রাজ সরকার হইতে কবিকে একজোরা শাল পুরস্কার দেওয়া হইল। কবি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে আরও একটী সুন্দর টপ্পা বাঁধিয়া গাহিলেন। তাহাতে প্রাচীনতম রাজবংশের অনেক কীর্ত্তি কাহিনী গাঁথা ছিল, ময়মনসিংহের মুকুটমণি মহারাজগণের কীর্ত্তি কথা, রাজধানী সুসঙ্গ ও সোমেশ্বরীর মিষ্ট জলের সুন্দর বর্ণনা ছিল। সঙ্গীতটী দীর্ঘ বিধায় উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না আক্ষেপ রহিল। মাঘের শীতের সুন্দর টপ্পাটী, ছেলে পিলেরা পর্য্যন্ত মনের ভিতর গাঁথিয়া রাখিয়াছে। শব্দ নৈপুণ্যে, পদ যোজনায় ও অনুপ্রাসের অনাবিল স্বচ্ছ হাসিতে ইহা একটি প্রথম শ্রেণীর টপ্পা।

গৌরীপুরের সরকারে তখন কবিওয়ালাগণের অত্যন্ত প্রসার ছিল, শারদীয়া পূজা উপলক্ষে কবি রামগতি দলবল সহ গৌরীপুরে আসিয়া আসরে নামিলেন। গৌরীপুরের তদানীন্তন সমজদার ভূম্যধিকারী কবি রামগতির একটী মাত্র সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তাহাকে একশত টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন। সেই সঙ্গীতটীতে বিদ্যাসুন্দরের নারীগণের পতি নিন্দার মত বাড়ীর কর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া ঘোড়ার সহিসের পর্য্যন্ত বর্ণনা ছিল।

একবার ঋণের দায়ে কবির বাড়ী ঘর নীলাম হইয়া যায়, দাগু বিশ্বাস নামে এক প্রাচীন সমজদার লোক তাহাকে কয়েক খণ্ড ভূমি দান করিয়া তাহার উপস্থিত বিপদের সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সমস্ত ভূমি নিতান্তই অনুর্ব্বর ছিল। উচিত বক্তা কবি ভাব বুঝিয়া এই দুঃখের সময়ও আঠারবাড়ী যাইয়া একটী সুমধুর টপ্পা বাঁধিয়া গাহিয়াছিলেন। সেই টপ্পাটিতে তাহার অতীত জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখের কাহিনী গাঁথা ছিল। শেষ ভাগে তাহার উপকারী প্রভুর দানের বিষয় একটু শ্লেষজড়িত ছিল। আমরা বহুকষ্টে তাহার কথঞ্চিৎ মাত্র সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

"মহিমা সাগর বর ধর্ম্ম অবতার,
হতভাগ্য রামগতি, দিল দরখাস্ত পাতি,
ধর্ম্ম-পতি করুণ সুবিচার।
অন্ন কষ্টে দুরদৃষ্টে মরেছে মোর জ্যেষ্ঠ ভাই,
বাবুজী গো! এ বিপদে রক্ষা কর্ত্তা কেহ নাই।
পাঁচশ টাকার দায় বন্দী,
হয়ে ছিলাম সুকুন্দি,
ভিটা ছেড়ে ফতেপুরে যাই
দেইখে দাগু বিশ্বাস জমী দিল,
বুনলে হয়না মাষকলাই।

মুকুন্দীর সম্পদশালী বাবুদের অত্যাচারে, কবিকে বাড়ীঘর ছাড়িয়া পলাইতে হইয়াছিল। আমরা "মাণীর যোগান" প্রবন্ধে কবির কয়েকটী ভাবময় সঙ্গীত, সৌরভের পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছি। এবারও বহুকষ্টে একজন প্রাচীন সমজদারের নিকট হইতে কতকগুলি সুমধুর ছড়া সংগ্রহ করিয়া উপস্থিত করিলাম। ইহা যমুনার খেয়া ঘাটের একটী সুন্দর বর্ণনা। কৃষ্ণ খেয়া ঘাটের মাঝি, রাধা সঙ্গিনীগণ সহ পুষ্প তুলিতে যমুনার পর পারস্থিত নিধুবনে যাইতেছেন! কৃষ্ণকে দেখিয়া রাধা সঙ্গিনীগণকে বলিতেছেন—

ছিছি সখি! একিজ্বালা,
খেয়ার মাঝি সেও যে কালা,
উপরে কালো মেঘের জাল,
কালো দেখি তাল তমাল।
কালো দেখি মাথার চুল,
কালো দেখি বনের ফুল,
শিখীর পেখম কদম গাছে,
তাতেও কালোর চিহ্ন আছে।
আমরা যত গোপের নারী,
কালো রূপ না দেখিতে পারি।
কালার নৌকায় উঠ্‌তে ভয়,
সোনার অঙ্গ মলিন হয়।
উঠ্‌ব না আর কালার নায়,
সাঁত্‌রে নি সই যাওয়া যায়!

উত্তরে সখীগণ বলিতেছে—

ছিছি সখি! একি ব্যথা,
এই কি তোমার মনের কথা?
খেয়ার নৌকায় হব পার,
মোদের কেন এই বিচার!
কালো মাঝির নায়ে যাবে,
তাতেই অঙ্গ মলিন হবে?
শ্যাম বিচ্ছেদে আকুল হলে,
কালো তমাল আলিঙ্গিলে,
তখন ত সই হওনি কালা,
আজ কেন এ মনের মলা!

হাতে লয়ে ফুলের সাজি;
ডাকদিয়ে বলে, খেয়ার মাঝি।
শীঘ্র শীঘ্র কর পার গলার কণ্ঠী পুরস্কার।

কৃষ্ণ ধীরে ধীরে আনিয়া, খেয়া নৌকা পারে লাগাইলেন। কিন্তু পার হইতে নৌকা কিঞ্চিৎ দূরে রহিল। গোপবালাগণের সঙ্গে তাঁহার একটী কথা আছে। ষোড়শী ব্রজ যুবতীগণ, তখন ফুলের ডালা হাতে করিয়া যমুনার রজত সৈকতে দণ্ডায়মানা, চন্দ্রমণ্ডল যেন যমুনার খেয়ার ঘাটে নামিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কৃষ্ণ সে কথাটী বলিতেছেন—

শুনলো সুন্দরীগণ,
খেয়ার মাঝির নাছোর পণ।
ষোল বছরের যুবতী;
তোমরা যত রসবতী।
নদীতে আজ তুফান ভারী,
একেই আমার জীর্ণ তরী,
তাইতে আমার বিষম ভয়,
তরীতে ভর নাহি সয়।
উলঙ্গ হয়ে যত ধনি!
তীরে রাখ বসন খানি,
তাতে ও কিছু পাতল হবে
তরীতে মোর ভর সহিবে।

শুনিয়া গোপ যুবতীগণ চটিয়া লাল। কী—খেয়ার মাঝির এত বড় কথা! উলঙ্গ হয়ে নৌকায় উঠ্‌তে হবে? কৃষ্ণও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি যমুনার জল খেলার কথা তুলিয়া তাহাদিগকে কিছু উত্তম মধ্যম শুনাইয়া দিলেন। কথা গুলি বড়ই শিক্ষাপ্রদ কিন্তু অশ্লীল। সমাজে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা লজ্জাকর হইলেও কতক অভ্যাস দোষে, কতক চির প্রচলিত বলিয়া আমরা ত্যাগ করিতে পারিতেছিনা; যাহা হউক এইখানে এই কয়েক ছত্র কবিতা তুলিয়া দিতে ক্ষান্ত রহিলাম। লজ্জা পাইয়া গোপযুবতীগণ কৃষ্ণকে অশেষ প্রকার অনুনয় করিতে লাগিল।

খেয়ার মাঝি আবার বলিল—

ফুল তুল্‌তে যাও পর বাগানে,
চেয়ে দেখনা নিজের ধনে,
অঙ্গে ফুটা কত না ফুল,
সংসারে নাই ইহার মূল।
নয়ন দুটী অপরাজিতা,
বাহু দুটী পদ্মের লতা,
বদন যেন শতদল,
ওষ্ঠ যেন বিম্বফল,
তোমাদের এই ফুলের মধু;
পিইতে পাগল ভ্রমরবধু।
নিজের ঘরে থুইয়া ধন,
পরের ঘরে দিচ্ছ মন।
শুন আমার একটী কথা,
মনে আমার আছে ব্যথা।
নিজের আমার বাগান নাই,
পরের ফুলে উড়ে যাই।
আমি হলেম খেয়ার মাঝি,
তোমরা যৌবন ফুলের সাজি,
মনে আমার দুঃখ তাই,
পয়সা কড়ি নাহি চাই
যদি কর যৌবন দান,
তবেই আমার বাঁচে প্রাণ।

এইবার রাধা আর রাগ সামলাইতে পারিলনা, কী—

ছোট লোকের বড় কথা!
প্রাণে বড় বাজ্‌ল ব্যথা,
খেয়ার মাঝি, বাগের মালী,
ছোট লোক, আর ঘাষের হালি।
নৌকাতে আর না উঠিব,
সাঁতরে নদী পার হইব।
খেয়ার মাঝির বেহায়াপণা,—
চাইলে দিতাম কানের সোনা।
কোন মুখে চায় যৌবন দান,
পয়সা নানেয় নিবে ধান।
এক পয়সার খেয়ানী,
তোর কেন এত ফোটানী?

ঠিক কথাইত, পয়সা না নেয়, ধান নিবে, এক পয়সার চাকর, তার কেন এত জাঁক।

কথাগুলি শুনিয়া মালিনীর প্রতি বিদ্যার রসের তিরস্কারটী মনে পরে। রাধা তখন সঙ্গিনীগণ সহ রাগের মাথায় সাঁতার দিয়া বসিল। যমুনার নীলতরঙ্গে যৌবন তরঙ্গ ভাসিল। নক্ষত্রমণ্ডল সহ চন্দ্র যেন যমুনা জলে খসিয়া পড়িয়াছে। এমন সময়, সহসা বংশীধারীর মোহন বাঁশী বাজিয়া উঠিল। সেই বাঁশীর স্বরে যমুনা উজান বহিয়া চলিল, সেই উজান স্রোত ঠেলিয়া অবলা গোপযুবতীগণ পারে যাইতে পারিল না, মধ্য নদীতে ক্লান্ত দেহে তাহারা বিপদের কাণ্ডারী মধুসূদনকে ডাকিল। এইবার মধুসূদন-কৃষ্ণ রসরঙ্গ ভুলিয়া, একে একে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া নৌকায় তুলিয়া লইলেন।

এই খানে কবিওয়ালাদের আর একটী অসাধারণ ক্ষমতার কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঢোল সাহানা বাজিতেছে, গায়কগণ দ্রুত উচ্চারণে লহর টানিয়া যাইতেছে, সেই অবস্থায় এইরূপ সঙ্গে সঙ্গে মিল জুটাইয়া কবিতা রচনা করা অভ্যাসটী বোধ হয় কবিওয়ালাগণেরই নিজস্ব। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণেরও বোধ হয় সে ক্ষমতা নাই।

কবি রামগতি সম্বন্ধে একজন প্রাচীন সমজদার ব্যক্তি বলিয়াছিলেন—"দেশ রামগতিকে চিনিল না। তার এক একটী টপ্পার দাম লাখ টাকা। তাহার অসাধারণ শক্তির কথা, আমি শত মুখেও বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। সে লেখা পড়া আদতে শেখে নাই, অথচ বাগ্দেবী যেন তাহার জিহ্বাগ্রে বাস করিতেন। রামগতি যে লিখা পড়া জানিত না, আমি তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। আমি একদিন তাহাকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়িতে দিয়াছিলাম, কারণ রামগতি সুকণ্ঠ। রামগতি হাসিয়া বলিল, সরস্বতী আমার প্রতি সেকৃপা করেন নাই। শুনিতে চান, আমি অমনি শুনাইব। আশ্চর্য্যের বিষয় কবি তখন পুস্তক রাখিয়া তাহার কণ্ঠ গাঁথা নূতন রামায়ণ আমাকে শুনাইতে বসিল। আমি কৌতূহল বশতঃ একখানা খাতা লইয়া তাহার নূতন

রামায়ণ লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কয়েক ছত্র পর্য্যন্ত লিখিয়াছিলাম মনে পড়ে—

সুন্দর সরযূ তটে অযোধ্যানগর।
দশরথ নামে তথা এক নৃপবর ॥
কৌশল্যা কেকয়ী আর সুমিত্রা সুন্দরী।
পরাক্রান্ত নৃপতির তিন পাটেশ্বরী ॥

কয়েক ছত্র লিখিয়া আর পারিলাম না। ভাষা এমনি দ্রুত বেগে চলিতে লাগিল, যে তাহার সঙ্গে হাটিয়া যাওয়া দূরের কথা, ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়াও দুঃসাধ্য, কাজেই কেবল শুনিয়া গেলাম।”

আমি বলিলাম, এসব ছাড়িয়া কবি যদি, একখানা রামায়ণলিখিয়া যাইতেন,—তবে দেশের অনেক উপকারে আসিত। তিনি আবার বলিলেন—পেশা ছাড়িয়া দিলে অন্ন জুড়ে কোথায়? কেবল নদীর জল খাইয়া রামায়ণ লিখা যায় না। তাতে আবার ময়ননসিংহ হেন যায়গা।—যেখানে মুদ্রা আছে, মুদ্রা যন্ত্র নাই, যে দেশের পদ্মাপুরাণ পশ্চিম বঙ্গের বটতলার আশ্রয়ে যাইয়া রক্ষা পাইয়াছে,সে দেশের কবির রামায়ণ, রচিত হইলেও জলা ভূমির কীট সকলের হাতে, লোক-লোচনের গোচরীভূত হইবার পূর্ব্বেই সদ্গতি লাভ করিত সন্দেহ নাই।

আমি আবার বলিলাম—কবি এমন আশ্চর্য্য প্রতিভা সম্পন্ন হইয়াও কেন এমন অশ্লীলতার আশ্রয় লইয়াছিলেন বুঝিতে পারিলাম না। তাহাতে সেই প্রাচীন সমজদার ব্যক্তিটী বলিলেন, স্বয়ং রামগতির সঙ্গে আমার এই বিষয় লইয়া কথা ছিল। রাম গতি বলিয়াছিল—

“প্রথম মন্থনে উঠ্‌লো সুধা
মিট্‌লো লোকের ভব ক্ষুধা।
তাতেই সবে হারা দিশ্
অধিক মন্থনে উঠ্‌লো বিষ।—

এটা অধিক মন্থনের ফল। দেখুন দেবের নৈবেদ্য ও শূকরের খাদ্য উভয়ই সংসারে পাওয়া যায়। যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই আহার করে।” শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে, সঙ্গীত রচনায় তাঁহার এমন এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে পদ যোজনা করিতে তাঁহাকে আদৌ ভাবিতে হইত না। একদিন নবমী নিশির আরতির শেষে আমি বলিলাম—রামগতি, তোমার একটী মাল্‌সী শুনি। না ভাবিয়া না চিন্তিয়া সে অমনি আরম্ভ করিল—

“পায়ে ধরিরে নবমী নিশি, আর প্রভাত হইওনা,
তুমি প্রভাত হলে, নয়ন খুলে, নয়ন তারা আর হেরব না,
আঁধার ঘরের চাঁদের আলো—বড় স্নেহের ধন উমা
হ'লে নয়ন তারা, উমা হারা, দেহেতে প্রাণ আর রবে না।
দুদিনের জন্য পেয়েছি তারে, ভাল করে আজও হেরি না
(মায়ের চাঁদ মুখ খানি ভালকরে)
বল না হতে বোধন, করি বিসর্জ্জন,
কেমনে এমন সুবর্ণ প্রতিমা।”

“গাইতে গাইতে তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। আমি দেখিলাম, পদ যোজনা করিতে তাঁহাকে বিন্দু মাত্রও ভাবিতে হইল না। জিহ্বাগ্রে যেন সরস্বতীর অধিষ্ঠান। ভাব দেখিয়া মনে মনে স্বভাব কবির চরণে প্রণত হইলাম। মনে মনে তাঁহার পদধুলি লইলাম”। বৃদ্ধের কথায় আমিও মনে মনে স্বভাব কবির চরণে, উদ্দেশে প্রণাম করিলাম।

কবি রামগতির উপমাগুলি বড় সুন্দর। তিনি মুহূর্ত্তে একটী মাত্র কথার শত শত উপমা দিয়া বসিতেন। সেই কথা গুলি যেমন মধুর তেমনি ভাবময়। যেন নদীতরঙ্গের মত, একটীর উপর আর একটী, উঠিয়া পড়িয়া খেলা করিয়া, কল কল ঢল ঢল ভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে। কয়েকটী উপমা নিয়ে প্রদান করিলাম।

১। যেমন সুগৃহী আর সবিতা,
সুরভী আর সুমাতা।
কুলের কন্যা কমলে
সৎপুত্র আর, বেল ফুলে।
সতী নারী গঙ্গা জল ইত্যাদি।

২। কুপুত্র আর বলদে,
কুগৃহ আর গাধে,
কুভৃত্য আর কুকুরে,
কুসঙ্গী আর শূকরে।
অসৎ নারী বদ্ধজল
হাটের বেশ্যা—মাকাল ফল ইত্যাদি।

৩। যেমন জলের শোভা কমলে,
চক্ষের শোভা কাজলে,
ওষ্ঠের শোভা তাম্বুলে।
সতী নারীর পতি শোভা
কুলের শোভা ছাওয়ালে। ইত্যাদি।

৪। স্রোত হীনা তটিনী,
কুলহীনা ভামিনী,
শস্য হীনা মেদিনী—ইত্যাদি।

৫। মূর্খ পুত্র রাড়ী স্ত্রী,
এর চাইতে আর দুঃখ কি ?

৬। যেমন জলের শোভা কমলিনী
পদ্মের শোভা ভানু।
তেমনি কুমুদিনীর চন্দ্র শোভা
রাধার শোভা কানু। ইত্যাদি।

৭। পেচক বাসে আঁধারে,
ময়লা বাসে শূকরে।
বায়স বাসে মাকালে,
হংস বাসে শৈবালে।
চাতক বাসে মেঘের জল,
পাখা বাসে ঘোলা জল।
পদ্ম ফুলের মধু থুইয়া,
করী বাসে মৃণাল খাইয়া।
কুকার্য্যে কুলোকের মতি,
কুলটা বাসে পরের পতি।
চোরে বাসে পরের ধন
অসৎ পথে পাপীর মন। ইত্যাদি।

একদিন জনৈক কবিওয়ালা কবি রামগতিকে প্রশ্ন করিয়াছিল, যে কলিতে জগন্নাথ কে ? রহস্যচ্ছলে কবি উত্তর দিয়াছিলেন—

"যাঁর ঘরে আছে সতী নারী, গোলায় আছে ধান,
গোয়ালেতে দুগ্ধবতী দুগ্ধ করে দান।
পুত্র যাঁরে মেরে মাছ, অর্জ্জে খাওয়ায় ভাত,
যাঁর পুকুরে স্বাদু জল, সেই তো জগন্নাথ।"

আর একদিন ঢাকা জিলার একজন কবিওয়ালা (জাতিতে শাখারী) কবি রামগতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—আকাশে ধূমকেতুর উদয় হয় কেন ? কবি এই বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিয়া রহস্যচ্ছলে উত্তর দিয়াছিলেন—

যাঁর শব্দেতে দেবতা তুষ্ট,
তারে কেটে করিস ক্ষয়,
সেই পাপেতে আকাশেতে
ধূম্র-লোচন উদয় হয়।

কবি রামগতির আর একটী অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, লোককে হাসাইতে হাসাইতে একবারে কাঁদাইয়া ফেলিত। শেষ বয়সে কবি ঘোড়ায় চড়িয়া আসর গানে যাইতেন। কিন্তু সে ঘোড়াটীও অধিকক্ষণ সোয়ারের ভর সহ্য করিতে রাজী ছিলনা। দশ মাইল স্থান যাইতে কবিকে পাঁচ মাইল হাটিয়া যাইতে হইত। একদিন কোনও স্থানে যাইতে কবি ঘোড়াটীকে টানিয়া লইয়া যাইতে ছিলেন। পথে একজন ভদ্র লোক রামগতিকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন—কি রামগতি ঘোড়াটাকে হাটিয়ে নাও যে ? কবি হাসিয়া বলিলেন—আর খানিক দূর যেয়েই কোলে করিব। এইরূপ রসের কথায় কবি পথের লোককে পর্য্যন্ত অনাবিল আনন্দ দান করিতেন।

শৈশবে যে বালক মাঠে রাখাল বালকগণের সহিত গরু চড়াইত, উত্তরকালে সেই, বালক আপন অসামান্য প্রতিভার বলে, আবাল বৃদ্ধ বনিতার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া ছিল। এমন কি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার সমজদারগণ পর্য্যন্ত কবি গাহানা শুনিবার জন্য কবিকে স্বস্ব ভবনে আহ্বান করিয়া লইতেন এবং তাহার সুমধুর ভাবময় সঙ্গীতগুলি, বিভিন্ন জেলার কবিওয়ালাগণ ক্রয় করিয়া লইত। রামগতির গান শুনিবার জন্য লোকে দশ মাইল পথ হাটিয়া চিড়া মুড়ী খাইয়া যাইতেও কষ্ট বোধ করিত না। আজও লোকে আক্ষেপ করিয়া বলে, রামগতি নাই শুনিব কি !

এমন যে প্রতিভা সম্পন্ন লোক, তাহার শেষ দশা যে কি ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, তাহা শুনিলেও হৃৎকম্প হয়। শেষ বয়সে কবি দাও বিশ্বাসের সেই অনুর্ব্বর ভূমি খণ্ড পরিত্যাগ করিয়া, আত্মীয় বান্ধবের নিকট হইতে শেষ বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক, কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত,

বড়াইল বাজারের নদী তীরবর্ত্তী জন-মানব-শূন্য এক অশ্বথ বৃক্ষ মূলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানে একখানি সামান্য পর্ণকুটীর বাঁধিয়া জীবনের শেষ কয়দিন কাটাইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার শেষ দিন নিকটবর্ত্তী হইতে চলিল। কবি বুঝিতে পারিলেন এ যাত্রা আর রক্ষা নাই, কালের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য কবি জগন্মাতা মহাকালীর চরণে শরণ লইয়া গাহিয়াছিলেন—

"জল বিম্ব জলে যেমন,
আছে দেহের মধ্যে জীবন তেমন—
রবেনা মা কখন ;
অন্তে রাখিস মা তব পদে এই নিবেদন।
যেমন ধারা নিশির শেষে পদ্ম পত্রের জল,
জীবন তেমনি হয় চঞ্চল,
মা, মা গো ঘন ঘন বহে নিশ্বাস,
এ জীবনে নাই গো বিশ্বাস,
অনিত্য জীবনের আশা, আমার সকলি বিফল।"

কবি বুঝিতে পারিলেন এ অনিত্য নশ্বর জীবনের আর আশা নাই। জীর্ণ জীবন মন্দিরে, সর্ব্ব-ধ্বংসকারী কালের অপ্রতিহত প্রভাব আসিয়া পৌঁছিতেছে ; অচিরেই তাঁহাকে বিশ্বের মায়াপাশ কাটিতে হইবে। ভাব বুঝিয়া কবি তখন গাহিয়াছিলেন—

"আমার বাকি কি আর গমনে,
যে দিন বাঁধবে এসে শমনে।
আমার দিনের নাই বাকি,
তাইতে মা ডাকি, তারা তারা বলে বদনে।
মাগো! দীন বেশেতে যাব যে দিন,
নিকট হলো বিকট সে দিন,
সেদিনের আর বাকি কদিন,
আমার শেষ হয়ে এলো।"

গভীর রজনীতে একদিন কবির নিশ্বাস মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল। বলিতে বুক ফাটিয়া যায়, মুমূর্ষু কবির শেষ পিপাসায় তাহার ওষ্ঠে এক বিন্দু জল দেয়, এমন বন্ধু কেহ ছিলনা। একদিন সহস্র সহস্র লোক যাহার একটী মাত্র কথা শুনিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া থাকিত, আজ তাঁহার এই শোচনীয় অসহায় মৃত্যু! একটী কীট পতঙ্গ অসহায়ে পড়িয়া মরিলে তাহারও জন্য দুঃখ হয়, কিন্তু রামগতির এই শোচনীয় মৃত্যুতে ময়মনসিংহবাসীর প্রাণে একটু আঁচরও লাগে নাই।

কেহ চিনিল না, কেহ বুঝিল না, এম্‌নি ভাবে অনাদরে আমরা, আমাদের দাশুরায়কে দীন বেশে নদীতীরে বিসর্জ্জন করিয়া আসিলাম। অমর কবি মধুসূদনের শোচনীয় অসহায় মৃত্যু বঙ্গের, শুধু বঙ্গের কেন, সমস্ত ভারতের দুর্ভাগ্য ; আর ময়মনসিংহের দাশুরায়ের মৃত্যু ময়মনসিংহের দুর্ভাগ্য। জানি না বিধাতার অভিসম্পাতগ্রস্থ ময়মনসিংহের ভাষা-সাহিত্য অহল্যা পাষাণীর ন্যায় কবে কোন মহাপুরুষের চরণ স্পর্শে আবার সঞ্জীবিত হইবে! অনাদরে ময়মনসিংহের বহুরত্ন হারাইয়াছে, চণ্ডীদাসই বল, আর রামপ্রসাদই বল, এ অঞ্চলে জন্মিয়াছিল সবই। জন্মে নাই—কেবল রসগ্রাহী ও গুণগ্রাহী ব্যক্তি।

শ্রীচন্দ্রকুমার দে।

শুভ-দৃষ্টি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গীতার উপদেশ; চণ্ডীবাবুর বদান্যতা, জীবনের উন্নতি, ভবিষ্যতের উপায়, গৃহিণীর কর্ত্তব্য, এবং সর্ব্বোপরি শৈবালের একাগ্রতা, সরলতা ও ধর্ম্ম ভাব আলোচনা করিয়া আমি শৈবালকে জীবনের সঙ্গিনী করিলাম।

শিলং—লাবানে একখানা ক্ষুদ্র বাসা ভাড়া করিয়া দুজনে থাকিতাম। ঠাকুর চাকর রাখিলাম না। শৈবাল ঠাকুর চাকরের স্থান অধিকার করিল। ঝরণার জল, মুক্ত সমীরণ, দূর পর্ব্বতের বিচিত্র দৃশ্য, উপত্যকার নগ্ন সৌন্দর্য্য সর্ব্বোপরি ভগবানের নাম—আমাদের মনে অনন্ত শান্তি প্রদান করিতে লাগিল।

শৈবালের সঙ্গীত শুনিয়া পাড়ার সকলই মোহিত হইয়া গেলেন। তাঁহারা অনেকেই সন্ধ্যার পর আসিয়া

আমাদের কীর্ত্তনে যোগদান করিতেন। এইরূপে আমাদের Honey moon কাটিয়া যাইতে লাগিল।

একদিন আমাদের কীর্ত্তন সম্বন্ধে আফিসে একটু মন্তব্য শুনিলাম। গৃহে আসিয়া শৈবালকে সাবধান করিয়া কীর্ত্তন বন্ধ রাখিলাম। সন্ধ্যার পর আমাদের ভাবাপন্ন ২।১ জন বন্ধু আসিয়া বসিতেন। তাহাদের সহিত গীতা ও অন্যান্য ধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠ করিতাম। শৈবাল প্রকোষ্ঠান্তরে থাকিয়া তাহা শুনিত। গভীর রাত্রিতে শৈবাল গান করিত, আমি তন্ময় চিত্তে শুনিতাম।

একদিন শৈবাল বলিল—"আজ পাড়ার মেয়েরা সহরে যাইবেন। তাঁহারা আমাকেও যাইতে বলেন।"

আমি বলিলাম—"শিলিং লাবান হইতে দু মাইল নীচে এতদূর পাহাড়ের রাস্তায় তুমি হাটীতে পারিবে না।"

"ঊর্দ্ধে পর্ব্বত গাত্রে পার্ব্বত্য পল্লি. নিম্নে সুবিস্তৃত উপত্যকা ভূমি।"

শৈবাল বলিল—"তাঁহারা নাকি প্রায়ই এই পথ হাটীয়া যান।"

আমি বলিলাম—"তাঁহারা যান তা আমি জানি, তুমি এত দূর যাইতে পারিবে না।"

শৈবাল—"না গেলে তাঁরা কি মনে করিবেন?"

আমি—"তুমি যদি হাটীতে না পার, তবে আর তাঁরা কি মনে করিবেন।"

শৈবাল—"হাট্‌তে পার্‌ব।"

আমি—"তবে যেও।"

এর পর—শৈবাল প্রায়ই পাড়া বেড়াইতে যাইত। কোন দিন আমাকে বলিত, কোন দিন আমাকে বলিত না। এ'দিকে ধর্ম্ম চিন্তায়ও তাঁহাকে যেন কিছু কিছু করিয়া উদাসীন দেখিতে লাগিলাম। বিলাসিতাটা ধীরে ধীরে যেন তাঁহার মানস ক্ষেত্র জুড়িয়া বসিতেছিল। একদিন সে আমাকে বলিল—"আপনার লম্বা দাঁড়ি, লম্বা চুল, ও লম্বা নখ গুলা ফেলে দিন। আমি বলিলাম—"এই লম্বা দাঁড়ি লম্বা চুলেরই কি তুমি একদিন আদর করিতে না!" শৈবাল লজ্জিত হইয়া বলিল—"ফেলে দিলে ভাল হ'য়ে পুনরায় উঠ্‌ত।"

আমি আর কিছু বলিলাম না। আমি নিজের ভিতরও দেখিলাম অযত্নে অনেকটা দৈন্যতা প্রবেশ করিয়াছে। মানসিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া ভগবানকে ডাকিলাম ভগবান—"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

(২)
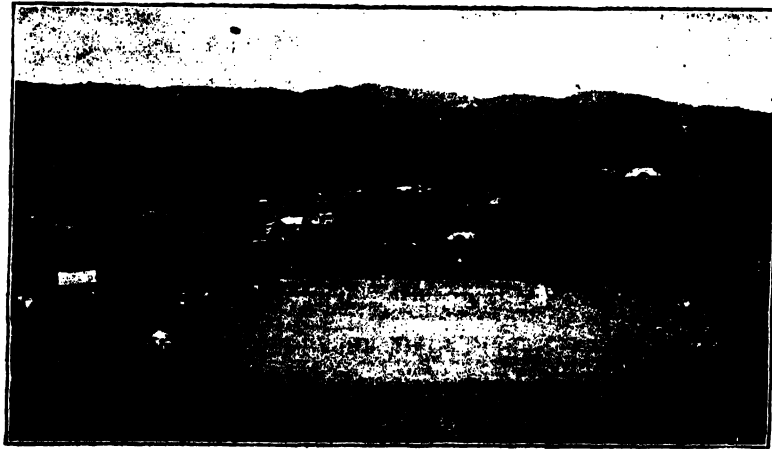
সন্ধ্যার পূর্ব্বে গৃহের সম্মুখে উচ্চ শিলাখণ্ডে বসিয়া জীবন নাটকের অঙ্ক গর্ভাঙ্কগুলি তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিতেছিলাম; সঙ্গে ছিল আমাদের আফিসের নবীন বাবু। নবীন বাবু আমার এক বয়সি, এতদিন এক সঙ্গেই ছিলাম, সংসার পাতিয়া পৃথক হইয়াছি।

ঝরণা হইতে প্রবল বেগে মহাশব্দে জল পরিতেছিল। বহু নিম্নে শিলংএর সুবিস্তৃত উপত্যকা ভূমি; ঊর্দ্ধে নিম্নে পর্ব্বত গাত্রে পার্ব্বত্য পল্লি। কোথাও নিম্ন ভূমিতে কোথাও উচ্চ ভূমিতে মেঘ-পুঞ্জ বিচরণ করিতেছিল। প্রকৃতির এই রম্য সৌন্দর্য্য আমার মনে অনুমাত্রও শান্তি প্রদান করিতে পারিতেছিল না।

নবীন অনেক কথা বলিল। আমি একান্ত মনে শুনিলাম। যাহা শুনিলাম তাহা চিন্তা করিতে হৃতকম্প হয়। চক্ষু জলে বক্ষ ভাসাইয়া নবীনকে সকল কথা জানাইলাম। নবীন বড়ই স্পষ্টবাদী। সে বলিল—তুমি তোমার জীবনকে নিজেই নষ্ট করিয়াছ। এখন দুঃখ করিলে কি

হইবে? আমি তোমার গীতা ভক্তির পরিণাম বড়ই বিষময় দেখিতেছি। বাস্তবিক যে পাষণ্ড ধর্ম্ম পত্নীকে তুচ্ছ করে—সে গীতা পাঠের অযোগ্য। আমি এতদিন যদি জানিতাম,তুমি পূর্ব্বে আর একটা বিবাহ করিয়াছিলে, তবে কখনই এ ভণ্ডামির সমর্থন করিতাম না। এখন তোমাকে কিছুদিন পুড়িয়াই মরিতে হইবে, নতুবা প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম—বুঝিলাম বাস্তবিক আমি পাষণ্ড, গীতার অবমাননা করিয়াছি—সতীলক্ষ্মীর অভিসম্পাতে আমাকে পুড়িয়া মরিতে হইবে। আমি আকুল প্রাণে বলিলাম—"নবীন, ভাই এখন আর ভৎর্সনা করিলে কি হইবে। আমাকে উপদেশ দাও।"

নবীন বলিল—"উপদেশ আর কিছুই নহে। অশান্তি, শান্তি সকলি ইন্দ্রিয়ের অধীন। অশান্তিকে মনে না আসিতে দেওয়াই শান্তি। পুনরায় সংসারত্যাগ করিয়া গীতা নিয়া বাহির হও, শান্তি পাইবে। অথবা অশান্তিকেই শান্তি বলিয়া বরণ করিয়া লও, আপদ চুকিয়া যাইবে।

আমি নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলাম। নবীন বলিল—"তুমি ত্রিশ বত্রিশ বৎসরের বুড়ো আর তোমার স্ত্রী ষোড়শী যুবতী। তোমার কর্কশ গীতার উপদেশ কি তার উন্মত্ত যৌবনকে প্রবোধ দিতে পারে? তুমি চন্দ্রশেখর হ'লে সে শৈবলিনী হবে এ আশ্চর্য্যের বিষয় কি? দাঁড়ি চুল কামিয়ে নবীন যুবকটি সেজে তার মনোতুষ্টি কর—দেখ্‌বে গৃহে পুনরায় শান্তি আসিবে। সংসার প্রাঙ্গনে কি সন্ন্যাসীর আশ্রম খাপ খায়?"

নবীনের স্পষ্ট কথায় আমি রাগ করিলাম না। বলিলাম—ভাই ঠিক কথাই বলিয়াছ, কিন্তু উপায় কি? নবীন বলিল—"শৈবালের চরিত্র আমি জানি। চণ্ডীবাবু, তাঁহার গৃহিনী, ছেলে, মেয়ে সকলেরই চরিত্র প্রশংসনীয়। চণ্ডীবাবু সকলকেই সৎ মনে করিয়া আপনার ভাবেন। তাঁহার কন্যাও ঠিক তাঁহারি মত সরল। সরল লোক নিজের ইষ্টানিষ্ট বুঝে না। তাঁহার পাছে বদলোক লাগিলে অতি সহজেই তাহাকে নষ্ট করিতে পারে। চণ্ডীবাবুর ন্যায় সরল ও ধার্ম্মিক লোক এ জগতে দুর্লভ। আমি চণ্ডীবাবুর অন্ন খাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়াছি। জগদীশ প্রভৃতিও চণ্ডীবাবুর তণ্ডুলে বর্দ্ধিত, এখনও তাঁহার বাসার নিঃসম্পর্কীয় বহু দরিদ্র ছাত্র প্রতিপালিত হইতেছে। এমন পিতার মেয়ে তোমার তদ্বিরের অভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, বড়ই আক্ষেপের বিষয়।

আমি অনন্যোপায় হইয়া বলিলাম—"তুমি যাহা বলিলে তাহা ঠিক। এখন কি করিব?"

নবীন—"যাহাতে জগদীশ তোমার বাসা না মাড়াইতে পারে তাহাই কর। শৈবালকে যত্ন কর, ধর্ম্মোপদেশ দাও, কথাটা বুঝাইয়া বল। আমার স্ত্রী যদি তাহাকে কোন হিতোপদেশ দিতে যায়, তবে হিতে বিপরীত হইতে পারে। ইহা তোমারি কার্য্য। দ্বিতীয়—তুমি কয়েক দিনের জন্য গীতাখানা তুলে রেখে তোমার মতে ও তাহার মতে সামঞ্জস্য করিয়া সংসার চালাও। একেবারে তোমার মতও চালাইও না, একেবারে তার মতেও চলিওনা। দেখা যাক কি হয়? আজ এই পর্য্যন্ত।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম—"ভগবান তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

(৩)

রাত ৮টা, বিছানায় শুইয়া আছি। শৈবাল আহার করিয়া আসিয়া কাছে বসিল।

আমি বলিলাম—"কাল দাঁড়ি ও চুলটা ফেলে দিব।

শৈবাল আমার লম্বা দাঁড়িটায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"কাজ নাই।"

আমি—"তবে কেন সে দিন বলেছিলে?"

শৈবাল হাসিয়া বলিল—"বলেছি তাতেই কি দোষ হয়েছে?"

আমি—"তুমি একটা বল্লে না করা অন্যায় বৈ কি?"

শৈবাল—"তবে আমি বল্লাম,কাটিয়া দরকার নাই।"

আমি—"শৈবাল আমি আর আজ থেকে গীতা পড়ব না।"

শৈবাল—"গীতাত আপনার মুখস্থই হইয়াছে, ও আর পড়া না পড়া সমান।" আর একটা ধর্ম্ম পুস্তক পড়ুন শুনি।

আমি—"শৈবাল, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব, তুমি সত্য কথা বলবে?"

শৈবাল—"আপনার কি বিশ্বাস ?"

আমি—"আমার বিশ্বাস তুমি সত্য বলবে।"

শৈবাল—"যদি আমি মিথ্যা বলি, তাও তবে আপনি সত্য বলে মনে করবেন,—না ?"

আমি—"অবশ্য।"

শৈবাল—"তবে আর এই মুখবন্ধ কেন ?"

আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম—"যাক্—তুমি এখন নবীন বাবুর বাড়ী হইতে "রামকৃষ্ণের জীবনী" খানা আনতে পার কি ?"

শৈবাল দরজা খুলিয়া দেখিয়া আসিয়া বলিল—"বড় অন্ধকার. আপনি একটুক দাঁড়ালে দেখতে পারি।"

"আমি দাঁড়ালে আর তুমি কেন ?"

"আচ্ছা" বলিয়া শৈবাল হাড়িখানটা লইয়া বাহির হইতে উদ্যত হইল।

আমি বলিলাম—"কোন সাহসে তুমি এতরাত নবীন বাবুর বাড়ী যাবে, ছিঃ।"

শৈবাল অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"আপনি বল্লেন তাই যাব।"

আমি—"আমি বল্লেই কি তুমি যাহার তাহার নিকট যাবে ?"

শৈবাল—"আপত্তি কি ?" আপনার আপত্তি না হ'লে, যাহার নিকট বলিবেন, তাহার নিকটই আমি যাইতে পারি। নবীন বাবুতো আপন লোকই।"

আমি—"নবীন বাবু তোমাদের আপন লোক কি প্রকারে ?"

শৈবাল—"তিনি যে আমাদের বাসায় থাকিয়া পড়িতেন। আমাকে কত কোলে কাঁখে লইয়াছেন।"

আমি—"তোমার সঙ্গে কি এখানে আসিয়া তাঁহার দেখা হইয়াছে ?"

শৈবাল—"না, তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নাই। গত বছর মাঘ মাসে তিনি আমাদের বাসায় গিয়াছিলেন। সেখানে দেখা। এখানে তাঁর স্ত্রী আমাকে সকল কথা বলিয়াছেন।

আমি—"তোমার পূর্ব্ব পরিচিত কাহারও সহিত এখানে আসিয়া সাক্ষাৎ হইয়াছে কি ?"

শৈবাল—"আজ জগদীশ বাবু আসিয়াছিলেন। তিনিত প্রায়ই আসেন। তিনি ঢাকায় আমাদের বাসায় থাকিয়া পড়িতেন।"

আমি—"জগদীশ বাবু যে আসিয়াছিলেন ও আসেন, তাতো তুমি আমাকে বল নাই।"

শৈবাল—"আপনিওতো কখন জিজ্ঞাসা করেন নাই।"

আমি—"এ আমার কর্ত্তব্য না তোমার কর্ত্তব্য।"

শৈবাল হাসিয়া বলিল—"উভয়েরই কর্ত্তব্য।"

আমি একটু ক্রোধভাবে বলিলাম—"আমার কর্ত্তব্য কিসে ?" শৈবাল বিমর্ষভাবে বলিল—"আপনি রাগ করিতেছেন।" আমি নম্রভাবে বলিলাম—"কর্ত্তব্যের অবহেলা করিয়াছ, তাই রাগ হইতেছিল।"

শৈবাল বলিল— "আমি সারাদিন একলাটী বসিয়া যে, কাজ করি, সেখানে যখন যাই, যাহারা যখন আসেন যান, সকল বিষয়েরই কি প্রতিদিন নিকাশ দিই, না আপনি নিকাশ নেন ? যদি নিতেন, তবে সেটী কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতাম, না দিলে ক্রটী হইত।"

আমি বলিলাম—"জগদীশ বাবু আসিয়া কি করেন ?

শৈবাল—"তিনি গান শুনিতে চান,নানা রকম গল্প করেন।"

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম— "জগদীশ বাবুর এইরূপ আসা যাওয়া কি তুমি দোষের মনে কর না ?"

শৈবাল—"না আমি তাহা দোষের মনে করি নাই।

আমি বলিলাম—"জগদীশের সহিত আর কোথাও তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে ?"

শৈবাল নিঃসঙ্কোচে বলিল— "আর একদিন তাহার বাসায়।" আমি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলাম—"তুমি এই দুই মাইল পথ পাহাড়ের নীচে গেলে কাহার অনুমতি লইয়া, কে তোমার সঙ্গে গিয়াছিল ?"

শৈবাল নির্ভিক চিত্তে বলিল— "আপনার অনুমতি লইয়া পাড়ার অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে।"

আমার অত্যন্ত ক্রোধ হইল। আমি ক্রোধ চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। বলিলাম—"তুমি যে অভিসারে যাইবে, তাহা আমাকে জানাও নাই।"

শৈবালের মুখ লাল হইয়া গেল। সে বলিল— "আপনি অন্যায় বলিতেছেন, আমাকে এরূপে কষ্ট দিবেন না।"

শৈবাল কখনও মিথ্যা কথা বলিত না। অন্যায় হউক ন্যায় হউক, যাহা করিত নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করিত। ইহা আমি সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিতাম। পাছে আমার প্রশ্নের উত্তরে কোন নিদারুণ সত্য কথা বলিয়া ফেলে, তাই আমি সেদিন জগদীশ সম্বন্ধে আর কোন কথা উত্থাপন করিলাম না।

আমি শান্তভাবে বলিলাম— "তোমাকে জগদীশের নিকট দেখিয়া ও জগদীশকে তোমার নিকট দেখিয়া পাড়ার লোকে নানা কথা মনে করিতেছে।"

শৈবাল নির্ব্বাক চিত্তে বলিল— "লোকের কথায় আমার কি হইবে। আপনি কি মনে করিতেছেন?"

আমি বলিলাম— "পর স্ত্রীর পর পুরুষের সহিত হাস্য পরিহাস করিতে যাওয়া অসঙ্গত, এ কথা কি তুমি অস্বীকার করিতে পার? তাহাতে আবার জগদীশ অবিবাহিত যুবক, তাহার সহিত নির্জ্জনে অসময়ে হাস্য পরিহাস গল্পগুজব! ছিঃ শৈবাল, এই কি তোমার পিতা তোমাকে শিক্ষা দিয়াছেন!"

শৈবাল আমার পায়ে ধরিয়া বলিল—"আমার পিতা যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, ভাল হউক মন্দ হউক, নিঃসঙ্কোচে তাহা পালন করি। আপনি নিষেধ করুন, করিব না। বৃথা সন্দেহ করিয়া আমাকে কষ্ট দিবেন না। আমার বাবাকে দোষী করিবেন না।"

আমি আপাততঃ চুপ করিয়া রহিলাম।

(ক্রমশঃ)

নিষাদল।

বিশুদ্ধ নিষাদল বর্ণ ও গন্ধহীন কঠিন পদার্থ; লবণের অপেক্ষাও তীব্র আস্বাদযুক্ত। জলে ইহা দ্রব হয় এবং ইহার জলীয় দ্রাবণ হইতে পাখীর পালকের সদৃশ অতি সুদৃশ্য দানা বাঁধিয়া থাকে। উত্তাপ দিলে ইহা না গলিয়া একেবারে বাষ্পাকারে পরিণত হয়। এই বাষ্প শীতল হইলে পুনরায় কঠিন হইয়া পড়ে। এই গুণ আছে বলিয়া নিষাদল অপর কোন দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত থাকিলে উত্তাপ দ্বারা সহজে উহা হইতে পৃথক করিতে পারা যায়।

বাজারে সাধারণতঃ যে নিষাদল পাওয়া যায়, তাহা অর্দ্ধ স্বচ্ছ স্থূলতন্তু বিশিষ্ট। ইহাকে সহজে ভগ্ন বা চূর্ণ করা যায় না। ইহা গুলিবার সময় জল বেশ শীতল হইয়া পড়ে। ১০ ভাগ নিষাদল ১০০ ভাগ জলে গুলিলে প্রায় ১৮ ডিগ্রি তাপ নামিয়া যায়। নানাবিধ দ্রব্যে রঙ ধরাইতে ইহার আবশ্যক হয়। টিন মিস্ত্রিগণ রাঙঝাল দিবার সময় ইহা ব্যবহার করে। যে ধাতুর উপর ঝাল লাগাইতে হইবে তাহা উত্তপ্ত করিতে হয়। উত্তপ্ত করিলে তাহাতে মরিচা ধরে। নিষাদল দিলে ঐ মরিচা দূর হয় এবং টিন গলিয়া ধাতুর উপর বেশ শক্ত হইয়া লাগিয়া যায়। চিকিৎসকগণ ঔষধার্থে ইহার ব্যবহার করেন। সোডা, ফট্‌কিরি নানাপ্রকার রং, নীলরঙ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ইহার আবশ্যক হয়। রসশালায় নানা রাসায়ণিক প্রক্রিয়ায় ইহার ব্যবহার আছে। তাড়িত স্রোত উৎপাদক কোন কোন ব্যাটারিতেও ইহার আবশ্যক।

ইতিহাস।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে নিষাদল এশিয়া হইতে ইউরোপে নীত হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে এসিয়া বাসিগণ ইহা আগ্নেয়গিরির সন্নিকটস্থ প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করিত। কারণ আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত কালে ধাতুস্রাব-প্রবাহিত স্থানের বৃক্ষ লতাদিধ্বংস দ্বারা ইহার উৎপত্তি হয়। এই স্বভাবজাত পদার্থই মানব প্রথম প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে ঠিক কোন শতাব্দীতে তাহা বলা যায় না—মিশর হইতে নিষাদল ইউরোপে আমদানি হইত। মিশর বাসিগণ চুলীতে উষ্ট্রের বিষ্ঠা দগ্ধ করিয়া ইহা প্রস্তুত করিত। ইউরোপে ইহাই সাল আম্‌নিয়াকম্ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ার প্রসিদ্ধ আল্‌কেমিষ্ট বা রসশাস্ত্রবিদ্‌গণ লবণ ও সর্জ্জিকাক্ষারকে সাল আম্‌নিয়াকম নাম প্রদান করিয়াছিলেন। এই দুই পদার্থ মিশরের নিকটস্থ লিবিয়া মরুভূমিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। ঐ স্থানে জুপিটার-আমন নামে এক মিশরীয় দেবতার মন্দির বর্ত্তমান ছিল। এই দেবতার নাম হইতে আল্‌কেমিষ্টগণ লবণ ও সর্জ্জিকাক্ষারকে সাল্-আম্‌নিয়াকম্ বা আমনদেবতার লবণ

নাম প্রদান করেন। মিশরে নিষাদল যখন প্রথম আবিষ্কৃত হইল, তখন ইহাকে সম্ভবতঃ নূতন সাল্ এই নাম দেওয়া হইয়াছিল। ইউরোপে লবণ,ও সর্জ্জিকাক্ষারের পরিবর্ত্তে নিষাদলরে সাল—আম্মনিয়াকম নামে কেন প্রসিদ্ধি লাভ করিল, তাহা বলা যায় না। সাল্ আম্মনিয়াকম্ নাম ইউরোপে মাঝে কিছু দিনের জন্য সাল্-আর্মনিয়াকম্ নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু পুনরায় সাল্-আম্মনিয়াকম্ নামই প্রচলিত হইয়াছে।

ল্যাটিন জেবারের গ্রন্থে সাল্-আম্মনিয়াকম্ নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই গ্রন্থ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে নিষাদল ইহার পূর্ব্বে মিশর হইতে ইউরোপে আনীত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে, নরমূত্র ও লবণ সংযোগে ইহার উৎপাদন প্রণালী বর্ণিত আছে।

খৃষ্টের ১৭শ শতাব্দীতে রবার্ট বয়েল নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ বৈজ্ঞানিক লিখিয়া গিয়াছেন যে পূর্ব্বদেশে উষ্ট্রের মূত্র হইতে সাল্-আম্মনিয়াকম্ প্রস্তুত করা হয়; কিন্তু ইউরোপে নরমূত্র হইতে ইহা উৎপাদন করা হইয়া থাকে। এই প্রণালী প্রাচীন ভারতে জানা ছিল না।

ভারতবর্ষে এই দ্রব্য নবসার ও চূলিকালবণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত রসার্ণব নামক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। * রসরত্নসমুচ্চয় নামক রসায়ণ গ্রন্থে নিষাদলের উৎপত্তি ও গুণ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যাইতেছে, † কাষ্ঠ ও কোমল বংশ খণ্ড পচিয়া এবং ইষ্টকের পাজার নিষাদল যে উৎপন্ন হয়, তাহা ভারতীয়গণ আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু নরমূত্র ও লবণ যোগে ইহার উৎপত্তি প্রণালী ভারতে তখন জানা ছিল না।

উপরি লিখিত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা নবসার ও সাল্ শব্দে এবং চূলিকা লবণ নামের সহিত ইহার মিশরীয় উৎপাদন প্রণালীর বিশেষ সংযোগ দেখিতে পাই। অতএব ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে নিষাদল মিশর দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল এরূপ অনুমান যে সঙ্গত তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত ল্যাটিন জেবারের গ্রন্থেও সাল-আম্মনিয়াকম নাম বর্ত্তমান। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে একই সময়ে মিশর হইতে নিষাদল ইউরোপ ও এসিয়ায় আনীত হইয়াছিল এবং সার বা সাল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। "ইষ্টক দহন কালে ইহা জন্মায় বলিয়া ইহার চূলিকা লবণ নাম হইয়াছে"—রসরত্ন সমুচ্চয়ে এইরূপ বর্ণনা আছে। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত রসার্ণবে ইষ্টক দহনে ইহার উৎপত্তি হয় এরূপ উল্লেখ নাই। ইহা হইতে অনুমান হয় যে ইহার উৎপত্তি স্থান মিশর দেশীয় প্রণালী হইতে চুলিকা লবণ নাম প্রথম প্রযুক্ত হয়। এই নাম হইতে সঙ্কেত পাইয়া সম্ভবতঃ ভারতীয়গণ অপরাপর চুলীতে ইহার অন্বেষণ করেন ও ইষ্টক দহনের পাঁজার ইহার সাক্ষাৎ লাভ করেন। সেই জন্য পরবর্ত্তী কালে ইষ্টক দহনের পাঁজার উল্লেখ দেখিতে পাই। নবসার এক্ষণে নিষাদল নামেই ভারতে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে দেখিতেছি। নিষাদল নাম কোথা হইতে ও করে আসিল? পারস্য ভাষায় নিষাদলকে নৌসদর্ বলে। নৌসদর্ বা নৌসদল্ যে ভারতে নিষাদল্ হইয়া পড়িয়াছে তাহা বুঝাইবার অধিক আবশ্যক নাই। অতএব দেখিতেছি যে আধুনিক সময়ে মুসলমানগণ নিষাদল নাম ভারতে প্রচার করিয়াছেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও

* গন্ধ তালক সিন্ধূথ চুলিকাষ্টকণং তথা। ৯ম পটল। ৯
গন্ধক, হরিতাল, সমুদ্রলবণ, চূলিকা ও টঙ্কণ (সোহাগা)।
আসুরী টঙ্কণঞ্চৈব নবসার স্তথৈবচ। ১০ম পটল। ৮৩—৮৪
সরিসা; সোহাগা ও নবসার।

† করীর পীলু কাষ্ঠেষু পচ্যমানেষু চোদ্ভবঃ।
ক্ষারো সৌ নবসারঃ স্যাচ্চূলিকা লবণাভিধঃ॥

ইষ্টিকা দহনে জাতং পাণ্ডুরং লবণং লঘু।
তদুক্তং নবসারাখ্যং চুলিকা লবণং চতৎ॥
রসেন্দ্র জারণং লোহদ্রাবণং জঠরাগ্নিকৃৎ।
গুল্ম প্লীহাস্যশোষঘ্নং ভুক্ত মাংসাদি জারণং॥

কোমল বংশ ও পীলু কাষ্ঠ পচিলে নবসার নামে এক প্রকার ক্ষার উৎপন্ন হয়। ইহাকে চুলিকা লবণ বলে। ইষ্টক পোড়াইবার সময়ে লঘু, পাণ্ডুর বর্ণ এই লবণ জন্মে বলিয়া ইহার নাম নবসার ও চুলিকা লবণ হইয়াছে। ইহা পারদ জারিত করে, লৌহদ্রব করে, এবং জঠরাগ্নি বৃদ্ধি করে। গুল্ম রোগ, প্লীহা ও মুখশোষ নষ্ট করে এবং ভুক্ত মাংস জীর্ণ করে।

মনে করেন, নবসার শব্দ পারসিক নৌসদর শব্দ হইতে আসিয়াছে। *

নিষাদলে নাইট্রোজান, উদজান ও ক্লোরিন এই তিন মূল পদার্থ বর্ত্তমান। একটী নিষাদল অনুতে নাইট্রোজান (N) এক পরমাণু. উদজান (H) চারি পরমাণু ও ক্লোরিন (Cl) এক পরমাণু আছে। অতএব ইহার সাঙ্কেতিক নাম (N H 4 Cl)। দগ্ধ চুনের পাথরের বা চুনের সহিত মিশ্রিত করিলে ইহা হইতে এমোনিয়া নামে এক বাষ্প উদ্ভূত হয়। এই বাষ্প অতি তীব্র একপ্রকার গন্ধ যুক্ত এবং জলে অত্যন্ত দ্রানীয়। উদ্ভিদ্‌জাত রক্তবর্ণ লিটমাসকে ইহা নীলবর্ণে পরিণত করে। এইজন্য ইহা আলকালি বা ক্ষার জাতীয় পদার্থ। এই বাষ্পকে বায়ু মধ্যে দগ্ধ করা যায় না; কিন্তু অম্লজান বায়ু মধ্যে ইহা পীতবর্ণ শিখা যুক্ত হইয়া দগ্ধ হয়। শঙ্খ দ্রাবক (H cl), গন্ধক দ্রাবক ($H_2 SO_4$), সোরা দ্রাবক (HNO_3) প্রভৃতি দ্রাবকের সহিত সহজে মিশ্রিত হইয়া ইহা ভিন্ন ভিন্ন লবণ জাতীয় পদার্থ প্রস্তুত করে। শঙ্খ-দ্রাবক দ্বারা নিষাদল বা এমোনিয়াম ক্লোরাইড; গন্ধক দ্রাবক দ্বারা এমোনিয়াম সল্‌ফেট; এবং সোরাদ্রাবক দ্বারা এমোনিয়াম নাইট্রেট উৎপন্ন হয়।

পাথুরিয়া কয়লা আবদ্ধ লৌহ পাত্রে উত্তপ্ত করিলে উহা হইতে বাষ্পীয় পদার্থ বহির্গত হয়। এই বাষ্পে নানা প্রকার বাষ্পীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকে। ইহাদের মধ্যে দুইটী—এমোনিয়া ও অঙ্গারাম্ল বাষ্প। জলে এই দুই বাষ্প দ্রবণীয় বলিয়া কয়লা সম্ভূত বাষ্প জলের মধ্য দিয়া সঞ্চালিত করা হয়। এই জলে এমোনিয়া বাষ্প ও অঙ্গারাম্ল বাষ্প মিশ্রিত হইয়া এমোনিয়া কার্বনেট নামে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। চুণের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহা হইতে এমোনিয়া বাষ্প উদ্ভূত হইলে উহা শঙ্খ দ্রাবকের মধ্যে প্রবেশ করান হয়। শঙ্খ দ্রাবকের সহিত এমোনিয়া মিশ্রিত হইলে রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা নিষাদল উৎপন্ন হয়। বর্ত্তমান কালে এই প্রক্রিয়া দ্বারা নিষাদল প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

* Hindu Chemistry vol I. P. 97.

তিব্বত অভিযান।

টুনায় শীতকাল।

পর দিবস ১০ই জানুয়ারী টুনায় ৪০০ সৈন্য ও ৪ টা তোপ রাখিয়া জেনারেল সাহেব ফারীতে ফিরিয়া গেলেন। আমি ও সেন মহাশয় টুনায় রহিলাম। রায় মহাশয় আমাদের সহিত নূতন চুম্বি পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। এই সময় প্রবল শীত পড়াতে তিনি আমাদের সহিত আর অগ্রসর হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। অগত্যা তিনি ঐ স্থানেই রহিয়া গেলেন।

এই স্থানে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, আমরা ফারীতে এক আড্ডা বসাইয়াছিলাম। তবে টুনায় আবার উহার প্রয়োজন কি ছিল? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, টুনা তিব্বতের ঠিক প্রবেশ দ্বারে। এ পর্য্যন্ত তিব্বতীয়-দিগের বিষয়ে আমাদের কর্ত্তাদের সম্পূর্ণ অন্য প্রকার ধারণা ছিল। তাঁহারা মনে করিতেন, উহারা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা। তাহার পর আবার শুনিয়াছিলাম যে,টুনার অদূরে বহুসংখ্যক তিব্বতীয় সৈন্য সংগৃহীত রহিয়াছে। এই জন্য আমরা আর অগ্রসর হওয়া যুক্তি সঙ্গত মনে করিলাম না। সামান্য সৈন্য লইয়া খাস তিব্বতের মধ্যে প্রবেশ করা যুক্তিযুক্ত কিনা তাহার অনুসন্ধানের জন্য আমরা তিব্বতের প্রবেশ পথে কয়েক দিনের জন্য অবস্থান করা উচিত মনে করিয়াছিলাম। শত্রুর রাজ্যে অল্প সৈন্য লইয়া শিবিরের মধ্যে থাকা নিরাপদ নয় বলিয়া টুনায় এই অস্থায়ী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত আমরা তিনটি স্থানে অস্থায়ী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। নূতন চুম্বি, ফারী ও টুনা। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত স্থানের শীত বিশেষ কষ্টদায়ক ছিল না। তিব্বতীয়েরা কিন্তু বলিল, এবার তিব্বতে শীতের প্রকোপ বড় কম। হইতে পারে, কিন্তু আমার নিকট ফারী ও টুনার শীত এক প্রকার অসহ্য মনে হইত।

আজ বেলা দুইটার পর হইতে বরফ পড়িতে আরম্ভ করিল। রাত্রে হাড়ভাঙ্গা শীত বোধ হইল। ডাক্তার সাহেবের পরামর্শে আজ আমরা রাত্রে ভেড়ার চামড়ার থলির ভিতর শয়ন করিলাম। ইহাতে মুখ ও মস্তক

ছাড়া আর সমস্ত দেহ থলির মধ্যে থাকে। পূর্ব্বেও কয়েকবার ইহা ব্যবহার করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম, এতদিন ব্যবহারের সুযোগ হয় নাই। আজ ব্যবহার করিলাম। প্রথম প্রথম বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল কিন্তু শীঘ্রই ঐ ভাব দূর হইল।

এ দেশে বেলা নয়টার আগে প্রাতঃকাল হয় না। ৯ টার পরে সূর্য্যদেব দেখা দেন। এই জন্য সাধারণতঃ ১০ টার আগে কেহ শয্যা ত্যাগ করে না। ইচ্ছা হইলেও দারুণ শীতের জন্য সম্ভবপর হয় না। আমি চিরদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিতাম। কিন্তু এখানে সে অভ্যাস ছাড়িতে হইল। শেষে এমন হইল যে চাকর যখন নয়টার সময় গরম চা লইয়া ডাকাডাকি করিত,তখন অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিতাম। এক এক দিন তাহাকে প্রহার করিবারও ইচ্ছা হইত। এক এক দিন তাহার হাত হইতে চা'র পেয়ালা লইয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতাম। কোনও কোনও দিন অনেক ডাকাডাকিতেও না উঠাতে চাকর, চার পেয়ালা টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া যাইত। ঘণ্টা খানেক পরে উঠিয়া দেখিতাম চার, উপর বরফের সর (Ice-cream) জমিয়া গিয়াছে।

বরফের এইরূপ দৌরাত্ম্য প্রায় সর্ব্বদাই সহ্য করিতে হইত। এক দিন আফিসে যাইয়া দেখি দোয়াতের মধ্যে একখানা বরফ রহিয়াছে। আর একদিন নয়টার সময় উঠিয়া এক ঘটি গরম জল লইয়া শৌচ কর্ম্মে গেলাম, সে দিন পায়খানায় আমাকে ২০।২৫ মিনিট থাকিতে হইয়াছিল, জল-শৌচের সময় দেখি ঘটির মধ্যে জল আদৌ নাই—এক চাপ বরফ জমিয়া রহিয়াছে। আর একদিন প্রাতঃকালে চাকর না থাকাতে নিজেকেই তামাক সাজিতে হইল। গড়গড়ার উপর কলিকা বসাইয়া টানিতেছি, শব্দ নাই। প্রথমে ভাবিলাম, গড়গড়াটা বন্ধ হইয়া রহিয়াছে, শেষে কিন্তু আবিষ্কৃত হইল—গড়গড়ার সমস্ত জল বরফ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ ঘটনা মধ্যে মধ্যে প্রায়ই হইত।

এই অভিযানের সময় ১১ টা হইতে ১ টা বা ২ টা পর্য্যন্ত আফিসের কাজ করিতে হইত। তাহার পর আহারাদি করিতাম। তাহার পর প্রায়ই বেড়াইতে যাইতাম। প্রবল শীত ছিল বটে, কিন্তু জড় ভরতের মত বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হইত না। এই পাহাড়ে হাওয়ায় এমন কিছু ছিল,যাহার জন্যআমরা সকলেই শ্রমসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছিলাম। এক স্থানে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিতাম না। শিকার করিবার হুকুম না থাকাতে বড় কষ্ট হইত, সময় কাটান বড় কঠিন হইত। মাঝে মাঝে পুস্তকাদি ও সংবাদপত্র পাইতাম বটে, কিন্তু তাহাতে অধিকক্ষণ মন লাগাইতে পারিতাম না। একটা হারমনিয়ম সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর প্রায়ই তাহার সহিত আলাপ পরিচয় করিতাম। কলিকাতার ডাক সপ্তাহে একবার মাত্র পাইতাম।

এ বৎসরে এখানে নাকি প্রয়োজনানুরূপ বরফ পড়ে নাই; তাহার জন্য অধিবাসীরা বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অত্যন্ত কম হেতু চাষ প্রভৃতির সুবিধা বরফ পাতের উপর নির্ভর করে। এবার বরফ পাত কম হওয়ায় এখানকার লোকদের বিশ্বাস, এই কম বরফ পাতের জন্য আমরাই দায়ী। দারজিলিং হইতে টুনা পর্য্যন্ত আমরা তার বসাইয়া ছিলাম বটে, কিন্তু অনেক সময় হেলিও-গ্রাফের (Heliograph) সাহায্যও গ্রহণ করা হইত। এই যন্ত্র নিম্ন লিখিত প্রকারে পরিচালিত হইত। একটা উচ্চ পর্ব্বতের উপর অগ্নি জালিয়া তাহার সম্মুখে একখানা দর্পণকে নানা প্রকারে নাড়া হইত। ভিন্ন ২ কথা বুঝাইবার জন্য ভিন্ন ২ সাঙ্কেতিক কথা আছে। এই প্রথা পার্ব্বত্য প্রদেশেই সম্ভব। সাধারণতঃ ইহা রাত্রি কালে ব্যবহৃত হয়। অধিক দূর হইলে দূরবীক্ষণের সাহায্যে সঙ্কেত পাঠ করা হয়। অজ্ঞ তিব্বতীয়েরা মনে করিত যে, এই যন্ত্র দ্বারা আমরা এদেশের বরফ পাত বন্ধ করিয়া দিয়াছি। একদিন টুনার কয়েকজন অধিবাসী আসিয়া আমাদিগকে সবিনয়ে অনুরোধ করিল যে, আমরা যেন দয়া করিয়া বরফ পড়াটা একবারে বন্ধ করিয়া না দিই।

আমরা তাহাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিলেও ভগবান করিলেন। কয়েকদিনের মধ্যে খুব বরফ পড়া আরম্ভ হইল। বাঙ্গলা দেশের বৃষ্টির মত অবিশ্রান্ত পড়িতে লাগিল। সাত আট দিন পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব সম্পূর্ণ অদৃশ্য রহিলেন। তারপর দুই একদিন ঈষৎ রৌদ্র দেখা দিল।

আবার কয়েকদিবস পর্য্যন্ত সেই ভাবে রহিল। বাহিরে বেড়াইতে যাওয়া একরকম বন্ধ হইল। আমি ও সেনজা আমাদের ছোট ঘরটির মধ্যে বসিয়া হয় তামাক ভস্ম করিতাম, নতুবা দাবা খেলিতাম। ইংরাজি প্রবাদ আছে,—সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ কার্য্য—কোনও কাজ না করা। কথাটার অর্থ আজ আমরা সহজেই বুঝিতে পারিলাম।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।

কূপমণ্ডূক আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডি হইতে একেবারে সাগরের সীমাহীন বারিরাশির মধ্যে যাইয়া পড়িলে তাহার যে দুরবস্থা হয়, সুদূর নির্জ্জন পল্লিকক্ষ হইতে বিপুল জনমানবপরিপূর্ণ কলিকাতার ত্রিতল অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া সরোজকুমারেরও সেইরূপ অবস্থা দাঁড়াইল। নবীন যুগের নবীন সভ্যতার উজ্জ্বল আলোক প্রভা তার অন্ধতম পল্লিচক্ষুকে ঝল্‌সাইয়া দিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? সরোজ সন্ধ্যার পর প্রতিদিন ভিতর হইতে গৃহ-দ্বার বন্ধ করিয়া কার্ডবোর্ডে—

"সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৭॥০টা উপাসনা"—লিখিয়া তাহার দরজার উপর ঝুলাইয়া দিত। সন্ধ্যার ম্লানোজ্জ্বল আলোকরাশি যখন রজনীর অন্ধকারে ডুবিয়া যায়, সরোজের হৃদয় আকাশ তখন এক নবীন আশার আলোকে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে, অন্তরবীণায় এক বিচিত্র রাগিনী ধ্বনিত হইয়া উঠে এবং চক্ষুর সম্মুখে এক তেজোদীপ্ত এবং গর্ব্ব স্ফীত মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

সন্ধ্যা ৬টা—৭॥০টা সরোজ যাহার উপাসনায় ব্যাপৃত থাকিত, সে সরোজের প্রতিবেশি কন্যা—কমলা। সরোজ এই দেড় ঘণ্টা কাল বাতায়ন সম্মুখে আরাম কেদারায় শয়ন করিয়া তৃষিত নেত্রে এই কিশোরীর রূপসুধা পান এবং সঙ্গীত সুধা উপভোগ করিত।

কমলার আরক্ত আঁখির স্নিগ্ধ দৃষ্টি সরোজের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিল,—তার লীলায়িত দেহের ললিত গতি সরোজের বুকে এক নবীন রসের ঢেউ তুলিয়া দিল,—আর তার মধু কণ্ঠের সুধা-গীতি রঙীন নেশায় সরোজের চিত্ত ভরপুর করিয়া তুলিল।

ভগবদ্ভক্ত প্রিয় শিষ্যের মত যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তার উদগ্রীব আগ্রহ রাশি স্তূপীকৃত পুণ্যের মত তাহাকে তাহার আকাঙ্খিত স্বর্গের জন্য নিতান্তই লালায়িত করিয়া তুলিল—অবশেষে সরোজ স্থির করিয়া ফেলিল, যেমন করিয়াই হউক—কার্য্য করিতেই হইবে।

(২)

সে দিন সরোজ তাড়াতাড়ি কলেজ হইতে চলিয়া আসিয়াছে—ঝির সাথে Engagement. কিন্তু সরোজের আগ্রহ বুঝিয়া ঝি চলে না সুতরাং এ অসময়ে তার দর্শন পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। সরোজ তীর্থের কাকের মত ঝি'র প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

সময় তার আর কাটে না। নির্ব্বাসিত মানবের দিনগুলি ফুরাইতে চাহে না, মৃত্যুর জয়দণ্ড যার মাথার উপর ঝুলিতেছে তার প্রতি দণ্ড বৎসরে পরিণত হয়, আর মিলনাগ্রহব্যাকুল যুবকের বুকে ব্যথা হানিবার জন্যই মুহূর্ত্তগুলি যেন ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়াও সরিতে চাহে না।

সরোজেরও সেই অবস্থা—ঝির আগমনে যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, তার মনের উদ্‌গ্রীব আগ্রহ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে ততই পীড়া দিতে লাগিল। এমন সময় তপ্তহৃদয়ের মরু-নন্দনসম ঝি আসিয়া সরোজের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সরোজ তাহাকে আপন নিভৃত কক্ষে ডাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—

'বলি ঝি, কোন খোঁজ খবর করতে পারলে কি?' ঝি তার স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠ যথাসাধ্য সংযত এবং সংহত করিয়া,—বাম হস্ত খানা পৃষ্ঠদেশ বিলম্বিত করিয়া, সম্মুখের দিকে হেলিয়া, তর্জ্জনী ঘুরাইয়া বলিল—"তা পেরেছি বই কি? কিন্তু তোমার এই ঘটকালির জন্য আমায় কি বক্‌সিস্ দেবে বল!"

সরোজ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল—"তা যদি সব ঠিক করে দিতে পার ত, আমার সাধ্যে যা কুলায়, আমি তোমায় সন্তুষ্ট করে দেব'।"

ঝি—"তবে এখন একটু মুখ মিষ্টি করে যাও?"

সরোজ বুঝিল ঝি যে খবর আনিয়াছে, তাহাও নিশ্চয়ই মিষ্ট এবং মধুর। একটি রৌপ্যমুদ্রা ঝির হাতে গুঁজিয়া দিয়া সরোজ বলিল—"বল, খবর কি?"

ঝি—"খবর যে ভাল, এই রূপার চাক্‌তিই তার প্রমাণ।"

সরোজ উদ্বিগ্নচিত্তে বলিল—"আর ঠাট্টা করোনা ঝি, সত্যি করে বল, ব্যাপার খানা কি?"

ঝি—"ওগো ঠাট্টা নয় গো ঠাট্টা নয়—এই মাসের ভেতরেই তোমার 'আইবর' নাম ঘুচ্‌বে—বুঝলে? গিন্নি ত রাজি। রাজি বলে রাজি, যেন হাতে হাতে স্বর্গ পেলে। তোমার মত সোনার চাঁদ ছেলে পেয়েও যদি সন্তুষ্ট না হবে, ত হবে কিসে? তা আমিই কি আর তোমার কথা কম কয়েছি? এমন ছেলে হাত ছাড়া করলে শেষে হায় আপশোষ করবে—এই সব বলে কয়ে গিন্নির মন ভজিয়েছি। তা তুমি নিশ্চিন্তি থাকতে পার, আমি ঠিক বলছি গিন্নির যা রকমদেখলুম্ তাতে বাবুর মত না হ'য়ে যায় না—তুমি কালই সব জানতে পাবে এখন।"

সে রাত্রে অনেক চেষ্টা সত্বেও সরোজের ভাল ঘুম হইল না। অর্দ্ধ জাগ্রত অবস্থায় যে স্বপ্নরাজে বিচরণ করিয়া ফিরিল। তাহা কত বিচিত্র, কত মোহময়, কত মধুময়, কত আশাতীত, কত কল্পনাতীত, কত আনন্দময়! কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা লইয়া তার ভবিষ্যৎ জীবনের মধুময় চিত্র সে গড়িয়া তুলিতে লাগিল,—তার রঙীন বাসনারাশি তাহাকে যে কল্পলোকের রাজাসন দান করিল, সে দেখিল, তাহার পাশে রাণীর আসনে উপবিষ্ট তার সেই প্রতিবাসী কন্যা—কমলা।

(৩)

পরদিবস ঝি আসিয়া তার মিশিলিপ্ত কালো দাঁতগুলি বিকশিত করিয়া যখন সরোজকে শুভসংবাদ দান করিয়া তার ঘটকালির সার্থকতার উপযুক্ত পুরস্কারের কথা পুনঃস্মরণ করাইয়া দিয়া গেল, তখন রাত ৯টা। সরোজ তখনই বাড়ীতে বৌদিদির নিকট চিঠি লিখিতে বসিল—

শ্রীচরণেষু—

বৌদি, আজ অনেকদিন পর বহু নজির পত্র লইয়া তোমার দ্বারে উপস্থিত হইতেছি, আমার উপস্থিত মোকদ্দমার উকীল তোমাকেই স্থির করিয়াছি—নতুবা আর কেউ আমার পক্ষে দাঁড়াইয়া কৃতকার্য্য হইবে তেমন ভরসা দেখি না। তোমার হাতে সব সমর্পণ করিয়া আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম।

সত্যি বৌদি, সংসারে যার বৌদি নাই তার যেন কিছুই নাই! এমন মধুর সম্পর্ক দুনিয়ায় আর কিছু আছে বলিয়া জানি না। একদিকে তোমরা আমাদের পূজনীয়া, অপরদিকে তোমরাই আমাদের হাস্য পরিহাস, ক্রীড়া কৌতুকের সঙ্গিনী। তোমরাই আমাদের স্নায় শুষ্ক নীরস মরুহৃদয়ে করুণার শান্তিজল সিঞ্চন করিয়া থাক—তোমরাই আমাদিগের ভবিষ্যৎ জীবনে আশার উজ্জ্বল আলোক জ্বালিয়া থাক। তোমরা না থাকিলে কি এ সংসার—সংসার হইত?

আজ আমি যে কারণে তোমার কাছে উপস্থিত—চিন্তা করিয়া ইহার গুরুত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিও—আমার বিকৃত মস্তিষ্কের খামখেয়ালী ভাবিয়া হাসিয়া উড়াইও না।

হয়ত শুনিয়া সুখী হইবে যে পূর্ব্বের মত বিবাহে অনিচ্ছা বা অরুচি আমার আর নাই। এতদিন তোমাদের শত পীড়াপীড়ি সত্বেও আমি বলিয়া আসিয়াছি, বি, এ পাশ না করিয়া বিবাহ করিব না। তার উপর ইহাও আমার চিরকালের ইচ্ছা যে যাহাকে চিরকালের জন্য জীবন সঙ্গিনী করিতে হইবে, যে ধর্ম্মে কর্ম্মে সমাজে সর্ব্বদা আমার একমাত্র অবলম্বন হইবে, তাহাকে অমন হঠাৎ কেবলমাত্র পিতামাতার কথার উপর নির্ভর করিয়া সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে পারি না।

সত্য কথা বলিতে কি বৌদি, আমি সেরূপ এক বিবাহ স্থির করিয়া বসিয়া আছি, এখন তোমাদের অনুমোদন হইলেই হয়। তুমি একটু চেষ্টা করিলেই সকলের মত করাইতে পারিবে, ইহাই আমার বিশ্বাস—তাই বলিয়াই তোমাকে ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়াছি।

আমি যে পরিবারে বিবাহ স্থির করিয়াছি, তাহা কলিকাতার সম্মানিত এবং সম্ভ্রান্ত পরিবার। মেয়েটির নাম কমলা—সাক্ষাৎ কমলারই মত সে দেখিতে, তাহার দিব্য মোহন কান্তি, তার বিচিত্র মধুর অঙ্গ সৌষ্ঠব, তার

সুধা নিশুন্দিত কণ্ঠস্বর—সত্য কথা বলিতে কি বৌদি, তোমার নারীহৃদয়কেও চঞ্চল করিয়া তুলিবে—পুরুষ ত কোন ছার! তার রূপের চাইতে গুণের প্রশংসা আমি বেশি করি। তার সুন্দর শান্ত স্নিগ্ধ স্বভাবখানি যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহাকেই আপন করিয়া লইতে চায়। সে একাধারে যেমন গান গাহিতে এবং বাজাইতে পারে—তেমনই উল, কার্পেট, কামিজ, বডিস্ প্রভৃতি সেলাইর কাজও যথেষ্ট জানে—মোটের উপর তোমরাও তাহাকে পাইলে সুখী এবং সন্তুষ্ট হইবে একথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। আমার মুখে তার অধিক প্রশংসা অশোভন দেখায় বলিয়াই এখানে থামিতে বাধ্য হইলাম। আমার বিশ্বাস কমলা সত্য সত্যই আমার গৃহে কমলার আসন প্রতিষ্ঠিত করিবে। তার বয়সের কথা হয়ত জানিতে চাহিবে। আমাদের সমাজে যেরূপ কচিখুকীর প্রচলন আছে, আমি সেরূপ পছন্দ করি না—পছন্দ করি না বলিয়াই যাহাকে বাছিয়া বাহির করিয়াছি, সে পূর্ণ-যৌবনা ষোড়শী! যাহাকে লইয়া জীবনের দুঃখ সুখের মীমাংসা করিতে হইবে, সে যদি পূর্ণ বিকশিত বুদ্ধি না লইয়া আমার নিকট আসিল, তবে কেমন করিয়া তাহা সম্ভবপর হইবে?

তোমাকে মনের কথা বলিতে আমার আপত্তি হওয়া উচিত নয়, তাই বলি কমলাকে যদি আমার করিতে না পারি, তবে আমার জীবন মরুভূমিতে পরিণত হইবে, সংসার আমার নিকট বিষময় বলিয়া মনে হইবে এবং ভবিষ্যৎ আমার নিকট নৈরাশ্যের অন্ধকারে মজ্জমান বলিয়া প্রতীত হইবে। বৌদি, যেমন করিয়া হউক মা, বাবা এবং দাদার মত তোমাকে করাইতে হইবে। এদিকে আর যা কিছু, সবই আমি স্থির করিয়াছি—কমলার মা, বাবা আমাকে তাহাদের আপন করিয়া লইতে নিতান্তই উৎসুক।

আমি তোমার পত্রের প্রতীক্ষায় রহিলাম। পূজ্য পূজনীয়দিগকে আমার প্রণাম দিও এবং নিও। আমি ভাল, বাড়ীর সকলের কুশল সংবাদ লিখিতে ভুলিওনা। ইতি।

তোমার স্নেহের
সরোজ

পুঃ—মা, বাবা এবং দাদার মত জানিয়া পত্র পাঠ উত্তর দিতে ত্রুটি করিও না।

(৪)

সরোজ দুইখানা চিঠি পাইল। একখানা সরোজের পিতা লিখিয়াছেন, অপর খানা তার বৌদির চিঠি—ভারী মোটা খামে। বউ দিদির চিঠি খানা সরোজ আগে খুলিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি লিখিয়াছেন—

"স্নেহের ঠাকুর পো, তোমার চিঠিতে আশাতীত সংবাদ পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম। কবে তোমার অঙ্কলক্ষ্মীকে তোমার পাশে দেখিয়া সুখী হইব, সেই দিন গুনিতেছি।

তুমি যে স্বয়ং-বর হইতে যাইতেছ এ সংবাদে আমি যতটা সুখী হইয়াছি, আর কেউ ততটা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কারণ তাঁহাদের রুচি নিতান্তই সেকেলে ধরণের। এতদিন যাহাকে এত অনুনয় বিনয় করিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারিলাম না, তাহার সহসা এই মতি পরিবর্ত্তনে সকলেই যে সুখী, সন্তুষ্ট এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন, একথা লেখাই বাহুল্য।"

চিঠিখানি যতই পড়িতে লাগিল সরোজের অন্তর ততই আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

"তুমি যে কমলার কথা লিখিয়াছ সে যে তোমারই উপযুক্ত একথা আমি সহস্রবার স্বীকার করি। এমন কি মা'কে পর্য্যন্ত তার কথা এমন ভাবে বলিয়াছি যে তিনি বলিয়াছেন 'আহা, এমন লক্ষ্মী বৌমা কি আমি পাব?' তুমি তাকে লইয়া সুখী হইবে ইহাও আমার খুবই বিশ্বাস।"

সরোজ ভাবিল মা'র পর্য্যন্ত মত পাওয়া গিয়াছে, আর ভাবনা কি? সে মনে মনে নাচিয়া উঠিল।

"তোমার দাদারও এ বিবাহে নিতান্ত অমত আছে বলিয়া মনে হইলনা; বিশেষত তোমার মনের দিকে চাহিয়া এবং আমার মুখে কমলার শত প্রসংশা শুনিয়া, তার মত অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।"

সরোজ ভাবিল, তা বৌদি এমনই ত হইবে, দেবরের দুঃখকষ্ট বুঝিয়া তাহা দূরীকরণে বদ্ধ পরিকর না হইলে সে আবার বৌদি কিসের?" কৃতজ্ঞতায় তার মস্তক বৌদির চরণ তলে লুটাইয়া পড়িতে চাহিল।

"কচি খুকীকে ঘরে আনার পক্ষপাতী আমিও নহি, কমলার মত ষোড়শীকে পাইলে তুমি যে সন্তুষ্ট হইবে, তা অনুমান করিতে পারি। কমলা আমাদের গৃহে কমলার আসন প্রতিষ্ঠা করুক, ইহাই আমার ইচ্ছা।"

সরোজ দেখিল বৌদিদিও তারই মতন কমলার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন—সে মনে মনে বলিল, সেজন্য ভাবনা কি বৌদি ; আমি কমলাকে গৃহে নেবই নেব, অন্ততঃ তোমার সন্তুষ্টি সাধনের জন্য হইলেও নেব। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষের মনে পরোপকারের ইচ্ছাটা সর্ব্বদাই জাগ্রত থাকে এবং নিজ স্বার্থ অপেক্ষা পরের স্বার্থ সাধনের জন্য প্রবল আগ্রহ জাগিয়া উঠে।

"কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারিলাম না"—লাইনটি পড়িয়া সরোজের মাথা ঘুরিয়া গেল। যতই অগ্রসর হইতে লাগিল ততই তার চিত্তের সরসতা এবং মুখের প্রফুল্লতা অন্তর্হিত হইতে লাগিল।

"একমাত্র বাবার অমতে সকলই পণ্ড হইয়া গেল। তিনি আমাদিগকে ডাকিয়া বুঝাইয়া বলিলেন 'চিন্তা করিয়া দেখ'—আমরাও চিন্তা করিয়া দেখিলাম—নিজে দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিবার রীতি আমাদের দেশে প্রচলিত নাই। আমরা হিন্দু—প্রজাপতির নির্ব্বন্ধের উপর নির্ভর করাই আমাদের সঙ্গত—পুরুষানুক্রমে তাহাই চলিয়া আসিয়াছে এবং তাহাতেই সুখে আমাদের সংসার কাটিয়া যাইতেছে। দেখিয়া শুনিয়া বহু পরীক্ষা করিয়াও অনেকে জীবনে সুখী হইতে পারেন নাই, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

"মানুষের রূপ চিরস্থায়ী নহে। দুদিন পরে রূপের নেশা কাটিয়া যায়। গান বাজনা, উল কার্পেটের কাজ দরিদ্র হিন্দুগৃহের উপযোগী বলিয়া মনে হয় না। সামান্য গৃহস্থালী কাজ জানিলে আমাদের হিন্দুগৃহ লক্ষ্মীশ্রী মণ্ডিত হইয়া উঠে। তোমার জন্য দেশে যে মেয়ে স্থির করা হইয়াছে, এ অঞ্চলে তাহার অনুরূপ রূপবতী এবং গুণবতী মেয়ে আর দুইটি নাই। বয়সেও সে নিতান্ত কচিখুকী নয়। ১৩।১৪ বৎসরের মেয়েকে তুমি আপন ইচ্ছানুরূপ শিক্ষা দীক্ষায় সাজাইয়া লইতে পারিবে।

"কলিকাতার মেয়ে আমাদের ঘরে খাপ খাইবে কিনা তাহাও চিন্তার বিষয়। আমার মতে দেশে বিবাহ করাই যুক্তি সঙ্গত। আশা করি মতি যখন ফিরিয়াছে, তখন ভগবান তোমার এ মতলবও ফিরাইবেন।

"আমরা অবলা, সুতরাং আমাদের বলের পরিচয় দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা বই আর কি? তোমার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়াও ব্যারিষ্টারীতে ফেল হইলাম। আশা করি, আমার কোন অপরাধ লইবে না। শীঘ্র উত্তর দিও। ইতি—

তোমার বৌদি।

সরোজ হতাশভাবে পিতার চিঠি পড়িতে লাগিল।

"কল্যাণবরেষু—

আমার অজ্ঞাতে এবং অমতে তুমি যে বিবাহ-প্রস্তাব স্থির করিয়া বসিয়াছ, জানিতে পারিলাম। আমার বংশে এমন কুলাঙ্গার এখন পর্য্যন্ত কেহ জন্মে নাই। তোমার সাহস এবং ধৃষ্টতা দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমি রামপুরে তোমার বিবাহ স্থির করিয়াছিলাম—আগামী ফাল্গুনে দিনও স্থির করিয়াছিলাম। এখন তুমি যে প্রকার স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছ, তাহাতে আমাদের মতে তোমার মত হইবে বলিয়া মনে হয় না ; তাই লিখি, তোমার ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে বর্ত্তমান মাস হইতে খরচ পত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

আঃ শ্রীরামহরি দেব শর্ম্মণঃ।

বৌদিদির চিঠি পড়িয়া সরোজ মর্ম্মাহত হইয়াছিল কিন্তু তাহার পিতার চিঠি তাহার উষ্ণ মস্তিষ্ককে একেবারে বিকৃত করিয়া দিল। সে যে কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না—অবশেষে কার্ডে লিখিল—

"শ্রীচরণেষু—

বৌদি, তোমার চিঠি পাইলাম। তুমি আমার জন্য এত করিয়াও কিছু করিতে পারিলে না বলিয়া দুঃখিত হইও না। আমারই অদৃষ্ট মন্দ—নতুবা ভগবানই মতি ফিরাইবেন কেন? মতি ফিরাইলেন ত আমার সাধআশা মিটাইলেন না কেন?

সে যাক, আমি যে কি করিব, কিছুই ঠিক করিতে

পারি নাই। তবে তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক আমার চির-দিনের তরে ঘুচিবে এ কথা সুনিশ্চয়। ইতি

তোমাদের হতভাগ্য

সরোজ।

পুঃ—আগামী মাঘোৎসবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইব স্থির করিয়াছি। এ সংবাদ সকলকে জানাইতে পার।

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধের উপর নির্ভর করা পুরুষের কর্ত্তব্য নহে, উহা নিতান্ত দুর্ব্বল হৃদয়ের পরিচায়ক। সঃ

বাড়ীর চিঠি বন্ধ করিয়া সরোজ আর একখানা চিঠি লিখিল। তারপর ঝিকে ডাকিয়া গোপনে একখানা তাহার হস্তে দিয়া অপর খানা সে নিজে পোষ্ট করিতে গেল।

যথা সময় ঝি ফিরিয়া আসিয়া সরোজের হাতে এক খানা চিঠি দিল। সরোজ সাগ্রহে চিঠি পড়িতে লাগিল।

"প্রিয় সরোজ বাবু,

আপনার বাড়ীর পত্র ঝি মাকে দেখাইয়াছে। মা আপনাকে ২৫৲ টাকা করিয়া পড়ার খরচ দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। আপনার আর কষ্ট করিয়া আসিবার প্রয়োজন নাই। এখন যত শীঘ্র মঙ্গল-কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, ততই ভাল। ভগবান উভয়কে সুখী করুন।

আপনার কমলা।"

পিতার চিঠি পাইয়া সরোজ নিরুপায় হইয়াছিল। কমলার চিঠি তাহার মনে অযুত বল সঞ্চার করিয়া দিল। সরোজ স্থির-সঙ্কল্প হইয়া বউ দিদিকে লিখিল।

"শ্রীচরণেষু—

বৌদি, আগামী ২০শে অগ্রহায়ণ আমার কুমার-জীবনের অবসান হইবে। কমলাই আমার ব্রত ভঙ্গের প্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তুমি আমাদের মিলনে সুখী হইবে জানি—তাই আজ তোমাকে এ সংবাদ জানাইতেছি। আশীর্ব্বাদ করিও, যেন সুখী হইতে পারি। তোমাদের সকলকে এ সময় পাইলাম না এবং সকলে মিলিয়া এ আনন্দ উপভোগ করিতে পারিলাম না—ইহাই দুঃখ রহিল। এ সংবাদ আর কাহাকেও জানাইবার দরকার নাই।

তোমার স্নেহের

সরোজ।"

(৫)

বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পুষ্প শয্যার সুগন্ধ রাশির মধ্যে সরোজ যখন সোহাগ কম্পিত স্বরে ডাকিল 'কমলা'—তখন তাহার কমলা জড় পুত্তলিবৎ নির্ব্বাক নিস্পন্দ জীবটির ন্যায় থাকিয়া তাহার সকল আদর সম্ভাষণ নিষ্ফল করিয়া দিল। কমলার সরল সুন্দর মুখ খানা পাউডারের অনাবশ্যক আবরণে নিতান্তই অশোভন দেখাইতেছিল, তাই সরোজ ধীরে ধীরে চেলির অঞ্চলে মুখখানা মুছাইতে যাইতেছিল, এমন সময় পেছন হইতে কে যেন এক জন সরোজের চক্ষু টিপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বলুন ত আমি কে?" সরোজ নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"তা কেমন করে বলব?"

"না বল্লে ছাড়ব না।"

"তবে তাই হো'ক"—

অগত্যা সে আর কি করিবে—বাধ্য হইয়াই চক্ষু ছাড়িয়া সরোজের সম্মুখে আসিয়া বলিল—"দেখুন দেখি, চিন্‌তে পারেন কি না?"

সরোজ অবাক হইয়া বলিয়া উঠিল—"এ কি এ কমলা—তুমি"—

কিশোরী হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না—উচ্চহাস্যে বলিয়া উঠিল—"হাঁ, আমি তোমার বড় দিদি, কমলা, আর এ আমার ছোট বোন সরলা।"

সরোজের বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল, সে প্রতারিত হইয়াছে। ফুল-শয্যা তাহার নিকট কণ্টকশয্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইল, সে বুকের ভিতর জ্বালা লইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল, কমলা হাত ধরিয়া তাহাকে রাখিতে পারিল না।

পরদিন বৌদিদি সরোজের পত্র পাইয়া অবাক হইলেন।—সরোজ লিখিয়াছে—

বৌদি, তোমাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। যথা সময়ে বাড়ী পৌঁছিব। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধই নির্ব্বন্ধ।

তোমার স্নেহের

সরোজ।

শ্রীপ্রফুল্লকৃষ্ণ ঘোষ।

অতীত-স্মৃতি।

আজ এই মধুর প্রভাতে একটী অতীত কাহিনী বলিবার জন্য এই প্রয়াস। সে খুব বেশী দিনের কথা নয়। আমরা কলিকাতা হইতে আসিতেছিলাম, গোয়ালন্দ ষ্টীমারে উঠিয়া সতরঞ্চি পাতিয়া কয়েকজন বন্ধু বসিলাম। সঙ্গে একটী হারমোনিয়ম। চাবি টানিয়া 'গাট' টিপিলে হারমনিয়ম সকলের নিকট যেমন ভাবে কঁ্যা-কোঁ করে, আমাদের নিকটও তাহার চাইতে ভাল কিছু করিতেছিলনা। আমরা সাত আটজন বন্ধুপার্টির সবাই এইরকম ওস্তাদী দ্বারা ষ্টীমারের যাত্রীদিগের বিশেষ উপদ্রব ঘটাইলেও, আমরা নিজের কোনও ত্রুটীই দেখিতে পাই নাই। যন্ত্রটা কখনও আমার হাতে কখনও বা অন্য কোনও 'নীলকমলের' হাতে পড়িয়া কেবল তারস্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছিল। অবশ্য আমরাও যথাসাধ্য তাহার সঙ্গে সুর মিলাইয়া সমবেদনা প্রকাশ করিতে ত্রুটী করি নাই। পরে শুনিয়াছি, আমাদের গানের প্রথম সূত্রপাতের সময় একটী শিশু তাহার মায়ের কোলে মূর্চ্ছা গিয়াছিল। এবং যাত্রীরাও বিশেষ কিছু করিবার উপায় নাই ভাবিয়া ষ্টীমারখানিকে" মনোরথ গতি'তে চালাইবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছিল। তবে যাহারা হারমনিয়মের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত, এমন দুই একটী লোক হাঁ করিয়া কলের বাজনা ও আমাদের রাসভ-রাগিণীর অমিয় ধারা পান করিতেছিল। আমরা তাহাদিগকে পরম যত্নে আমাদেরই পার্শ্বে আসন দিতেছিলাম। এবং ইহাতে আমরা নিজকে ওয়াটার্লু'র যুদ্ধ জেতা অপেক্ষা কম বিজয়ীমনে করিতে পারি নাই।

টুইলের শার্ট গায় দেওয়া একটী মাঝারি গোছ চেহারার ভদ্রলোক একপাশে দাঁড়াইয়া আমাদের অভিনয় দেখিতেছিলেন। আমরা তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিবার বিশেষ আবশ্যকতা অনুভব করি নাই।

একপদ দুইপদ করিয়া সকলেই কিছু সঙ্গীত উচ্চারণ করিলেন, অতঃপর খানিক সঙ্গীত-সমালোচনা হইল এবং পুনরায় রাগিণী ভাঁজিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল। এবার ফরমাইস। কেহ আমাকে, কেহ বা অন্যকে হুকুম করিতে লাগিলেন। এইভাবে কে ভাল গায়—তাহার বাছনি লইয়া একটা গণ্ডগোল চলিল; সেই দণ্ডায়মান ভদ্রলোকটী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন" কৈ, আপনারা ত আমাকে গান করিতে বল্লেন না।" অমনি সকলে সমস্বরে "হাঁ-হাঁ—আসুন-বসুন—গা-ন" ইত্যাদি বলিতে বলিতে ভদ্রলোকটীকে একপাশে বসিতেদিলাম। তিনি বসিয়া হারমনিয়মটী কোলের উপর তুলিয়া লইলেন;—তখনই বুঝিলাম—"সামান্য মানুষ বুঝি না হবে এ জন"।

একটু হাসিয়া তিনি বলিলেন—কি গাহিব? অমনি চারি দিক হইতে ফরমাস পড়িল—কেউবা যাত্রা, কেহ থিয়েটার, কেহ রবিঠাকুর, কেহ বা ডি. এল. রায়,—তখন স্বদেশীর খুব খর জোয়ার—কেহ কেহ স্বদেশী সঙ্গীতের বায়না ধরিলেন—আর কেহ বা কীর্ত্তনের কথা পাড়িলেন। সপ্তরথী পরিবেষ্টিত ভদ্রলোকটী আমারদিকে চাহিয়া কহিলেন" কৈ, আপনিত কোনো ফরমাস দেন নাই?" "আমি আর কি বলিব—তবে যদি জানেন—রজনী সেনের দু'একটা গান হইলে বেশ হইত।"

"কোন্‌টা—গাইব?"

অনেকে অনেকটা ফরমাস্ দিলেন, আমি বলিলাম—"বাণীর" "স্নেহ বিহ্বল, করুণা ছল ছল" গানটী যদি জানেন—গান্। তখন—মধুর কণ্ঠে মধুর গান ষ্টীমার খানিকে মাতাইয়া তুলিল। এমন গান ত জীবনে আর শুনি নাই; চক্ষু মুদিয়া দুইহাতে হারমনিয়ম বাজাইতেছিলেন—গায়কের চক্ষুদুটী দিয়া দুইবিন্দু অশ্রুঝরিল—সে গান শুনিয়া আমাদের চারিদিকে ষ্টীমারের সমুদয় লোক,—নরনারী ময় খালাসী আসিয়া জমায়েৎ। গায়কের বিশ্রাম নাই, বিরক্তি নাই, আলস্য নাই, সুরেরও কোনও বিকৃতি নাই;—একে একে বাণীর সবগুলি গান গায়িলেন! পদ্মাবক্ষে বুঝি এমন অমৃত ধারা আর কোনোদিন বর্ষণ হয় নাই; জাহাজ খানি বুঝি এমন আরাম আর কখনো অনুভব করে নাই, তাই কি আজ পদ্মা নিস্তরঙ্গ—ষ্টীমার আনন্দে মন্থরগামী!

হঠাৎ গায়ক কহিলেন "উঠি—সময় হয়েছে নিকট,—এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।" তারপর এ গানটীও গাহিলেন, জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথায় যাবেন,"মত্ত—মাতুলালয়ে।"

বুকটা ধরাস্ করিয়া উঠিল—জিজ্ঞাসা করিলাম—“মহাশয়ের বাড়ী ?

উত্তর—“পাবনা জিলায়।”

মুখে যেন আর কথা সরিতেছিলনা ; না জানি ইনি কে ? বড় কষ্টে জিজ্ঞাসা করিলাম—‘নাম’ ?

‘রজনীকান্ত সেন’।

হায় না জানিয়া এই দেশবিশ্রুত ব্যক্তির সমক্ষে কি ছেলেমিই না করিয়াছি ! সকলে যোড়হাতে দাঁড়াইলম ! “আমাদের ত্রুটী মনে রাখ্‌বেন না বলুন !”

রজনী বাবু কাঁদিয়া ফেলিলেন। “আজ এই অল্প সময়ের বন্ধুতা, পরিচয়, আনন্দ—জীবনে বড় বেশী অনুভব করি নাই ! দুঃখ এই—এখনি কেন জাহাজ এখানে আসিল—কেন এ সুখের অবসান হইল। আপনারা যদি কুণ্ঠিত হন—বড় ব্যথা পাব। খোলা অন্তরে যদি কথা না বলেন, তবে আমার পরিচয় দেওয়াটাই অন্যায় হইল বুঝি !”

তার পর প্রত্যেকের নিকট বিদায় লইয়া রজনী বাবু বিদায় হইলেন—জাহাজ যেন নিরানন্দময় হইয়া উঠিল।

এই প্রথম—এই শেষ সাক্ষাৎ ! তারপর যখন মৃত্যু শয্যায় দেখিলাম, তখন সেই মূর্ত্তিমান মুখর-সঙ্গীত বেদনার অশ্রুজলে প্লাবিত !

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

অভাব ও দুঃখ।

অভাব—পলাও দূরে
এস দুঃখ ! নতশিরে
করি আবাহন !
সুখত চাহিনা আমি
আমার উপাস্য তুমি
দাও ও চরণ !

দুঃখ কহে—“অভাবেরে
তাড়ায়ে দিতেছ দূরে
আসিব কেমনে ?
জীবনে মরণে সাথী
দুইয়ে এক হয়ে থাকি
শয়নে স্বপনে !”

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন।

কলনাদিনী সুরধুনীরতটে, বিদ্বজ্জন মণ্ডলীর আবাস ভূমি, বাঙ্গালির জ্ঞান বিজ্ঞানের আদর্শস্থল, যুক্তবঙ্গের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে বঙ্গ-বাণী মাতার ভক্ত উপাসক মণ্ডলীর সপ্তম মিলনোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। চট্টল অধিবেশনের পর বাণীর দীন-পল্লি-সেবকগণ রাজধানীর সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য বুক বাঁধিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু কলিকাতা সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের সে বাসনায় অন্তরায় হইলেন। প্রথম অন্তরায় তাঁহাদের দিন নির্দ্ধারণে, দ্বিতীয় অন্তরায় অসময়ে নিমন্ত্রণ প্রেরণে, তদুপরি নিমন্ত্রণে কার্পণ্য প্রদর্শনে। নিমন্ত্রণ সম্বন্ধে ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য বিবরণে লিখিত হইয়াছে“বঙ্গীয় গ্রন্থকার, প্রবন্ধ লেখক, সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্রের সম্পাদক, সাহিত্য পরিষদের ও সাহিত্য সভার সভ্যগণ এবং বিভিন্ন জেলার উচ্চপদস্থ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে এই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করা হয়। * * * এই উপলক্ষে প্রায় আট সহস্র নিমন্ত্রণ পত্র নানা প্রণালীতে দেশময় প্রেরিত হয়।” আর কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষ সুদূর মফস্বলের দীন দরিদ্র সাহিত্য সেবীকে সাহিত্যের পীঠ স্থান হইতে দূরে রাখিবার জন্য সম্মিলনের দিন বন্ধের প্রথম দিন ধার্য্য করিয়াছেন এবং নিমন্ত্রণ প্রেরণে অযথা বিলম্ব ও কার্পণ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষ সুধু নিজদের সুখ সুবিধা লক্ষ্য করিয়া চলিবেন, অপরের সুখ সুবিধা একবারও বিবেচনা করিবেন না ইহা সমীচীন নহে। আমাদের মত সুদূর প্রান্তবাসীকে সম্মিলনে যোগদান করিবার অবসর দেওয়া সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষ উপযুক্ত বিবেচনা করেন নাই। ফলে মফঃস্বল হইতে অধিক লোক কলিকাতা সম্মিলনে যোগ দান করে নাই।

যাহা হউক নিমন্ত্রণের অবস্থা ও ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া কতিপয় বন্ধুর সম্মিলনে যোগদান করিবার বাসনা বিলুপ্ত হইল। স্থানীয় পরিষদের প্রতিনিধিরূপে সুখ সম্মিলনে আনন্দ উপভোগ করিবার বাসনা বুকে লইয়া

বৃহস্পতিবারের জন্য হুজুরে বিদায়ের আরজি পেশ করতঃ মিলনের পুণ্যতীর্থে যাত্রা করিলাম।

পরদিন প্রাতে সাড়ে সাত ঘটিকার সময় পূর্ব্ব বঙ্গের কতিপয় সাহিত্য সেবীকে লইয়া মেইল ট্রেণ শিয়ালদহে পৌঁছিল। গাড়ী হইতেই দেখিলাম, শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম. এ, ও শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়দ্বয় কতিপয় স্বেচ্ছা সেবক সহ আমাদের অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন। আমরা সাদরে অভ্যর্থিত হইয়া তাঁহাদের নির্দ্দেশ মত অশ্ব-যানে আরোহন করিলাম।

গাড়ী হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের ১০নং বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া থামিল। সম্মুখেই দেখিলাম শুভ্র মস্তক, হাস্য-বদন ব্যোমকেশ বাবু ও কতিপয় স্বেচ্ছা সেবক। ব্যোমকেশ বাবু আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। তখন আমাদের বিছানা পত্র উপরে উঠিতে লাগিল। আমরা রাজ প্রাসাদ সদৃশ সেই বিশাল সৌধে আরোহণ করিতে লাগিলাম। স্বেচ্ছা সেবকগণ আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। ত্রিতলকক্ষে আমাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমাদের পূর্ব্বেই চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ও মালদহের সাহিত্য সেবীগণ সমবেত হইয়াছিলেন। আমরা—ঢাকা ও ময়মনসিংহের নিমন্ত্রিত ও প্রতিনিধিগণ আসিয়া তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলাম।

এইবার প্রাতঃভোজনের পালা। হাত মুখ ধুইতে না ধুইতেই দেখি—চা,লুচি, মোহনভোগ হাজির। আমরা অকাতরে তাহা গ্রহণ করিলাম। তখন একে অন্যের সহিত আলাপ পরিচয় আরম্ভ হইল। ইহাই মিলনের সুখ এবং সম্মিলনের স্বার্থকতা।

২৭শে চৈত্র শুক্রবার ২টায় সম্মিলনের অধিবেশন।

গড়ের মাঠের উত্তর প্রান্তে হাইকোর্টের অনতিদূরে টাউন হলের বিস্তীর্ণ দ্বিতল কক্ষে সম্মিলনের স্থান নিদ্ধারিত হইয়াছিল। বিশাল স্তম্ভ পরিশোভিত টাউন হল সজীব বৃক্ষ-রাজিতে, পাতাকা ও নানা বর্ণের কাগজ খণ্ডে পরিশোভিত হইয়াছিল। পূর্ব্বভাগে মঞ্চ। মঞ্চোপরি সভাপতি, দুই পার্শ্বে মহিলা এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ, সম্মুখে মফঃস্বলের প্রতিনিধি ও তার পশ্চাতে কলিকাতার প্রতিনিধিগণের বসিবার স্থান ও বারান্দা দর্শকগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ঘরে অসংখ্য বিজলী পাখা চলিতেছিল, বাহিরে নহবৎ বাজিতেছিল।

বেলা দুই প্রহর হইতেই টাউন হলে লোক সমাগম হইতে থাকে। মহিলাদের আসন শূন্য পড়িয়া ছিল।

মৃদুমন্দ মনোমদ মূলতানে নহবৎ বাজিতেছিল। সকলেই লাট বাহাদুরের জন্য উৎসুক চিত্তে অপেক্ষা করিতে ছিলেন। সকলের মুখই বিপুল পুলকাঞ্চিত। ঠিক আড়াইটার সময় বঙ্গেশ্বর হাস্য মুখে সুসঙ্গের মহারাজা, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ, কাশিম বাজারের মহারাজা, নদীয়ার মহারাজা দিনাজপুরের মহারাজা প্রভৃতি ও অন্যান্যকে সঙ্গে লইয়া সভা মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ, কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ আসিলেন। তখন করতালীতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। তারপর শুভক্ষণে শুভমিলনে ক্ষণকাল আনন্দের নীরব রোলে সভামণ্ডপ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

ঐকতান বাদ্য বাজিয়া উঠিল। "আমার বঙ্গবাণী" নামক একটী সঙ্গীত গীত হইলে বঙ্গেশ্বর ইংরেজি বক্তৃতায় সম্মিলনের উদ্বোধন ঘোষণা করিলেন।

লাট বাহাদুর সম্মিলনে বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিবেন সকলেই এইরূপ আশা করিয়াছিলেন, এমন কি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির বক্তৃতায়ও তাহাই বলা হইয়াছিল কিন্তু বঙ্গেশ্বর দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—"তিনি আজও বাঙ্গালা ভাষা আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।"

তৎপর স্যর গুরুদাস ইংরেজি ভাষায় বঙ্গেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে ও মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান বঙ্গ ভাষায় তাহার সমর্থন করিলে পর সংস্কৃত কলেজের বেদাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস উপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ,দুটী সংস্কৃতস্তোত্র পাঠ করেন।

অতঃপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী "মানসী হইতে পুনর্মুদ্রিত" তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অভিভাষণটী সম্মিলনের জন্য লিখিত হইয়াছিল, কি মানসীর জন্য লিখিত হইয়াছিল, তাহা আমরা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। শাস্ত্রী মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে হুগলীর

জন্ত শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র শিবস্তোত্র শীর্ষক একটী সুদীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন। অতঃপর গত সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করিলেন। তারপর সুসঙ্গের মহারাজের প্রস্তাবে দিনাজপুরের মহারাজের সমর্থনে এবং কাশীমবাজারের মহারাজা ও ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের অনুমোদনে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় একে স্থবির, তাহাতে ভগ্ন-স্বাস্থ্য সুতরাং তিনি অভিভাষণের কতক পাঠ করিয়া কনিষ্ঠ সহোদর রবীন্দ্রনাথের হস্তে পাঠের ভার প্রদান করেন। রবীন্দ্রনাথ স্বীয় কণ্ঠ মাধুর্য্যে সে জনসঙ্ঘকে কিছুকালের জন্য স্তম্ভিত করিয়া ফেলেন। সভাপতির অভিভাষণে আমরা বহু আশা করিয়াছিলাম। তিনি জ্ঞানকাণ্ডকে কর্ম্মকাণ্ড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া যে কল্পিত উপাখ্যানের সহিত দুই একটী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এক সম্প্রদায়ের মনে দারুণ আঘাতই লাগিয়াছে।

আমরা ময়মনসিংহ সম্মিলন হইতে দেখিতে পাইতেছি, সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ পত্রিকা বিশেষের জন্য লিখিত হইতেছে; ইহা জন সাধারণের মধ্যে প্রচারের কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। সভাপতির অভিভাষণ যাহাতে সাধারণের হস্তগত হয়, সমিতির কার্য্য পরিচালন সমিতি ভবিষ্যতে তাহার ব্যবস্থা করিলে বোধ হয় সমীচীন হয়। অতঃপর বঙ্গেশ্বর প্রস্থান করিলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রাজা মহারাজা সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। এইবার গত বৎসরের কার্য্য বিবরণ পাঠ প্রভৃতি মামুলী কার্য্য চলিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে এক মহা হুলুস্থূল ব্যাপার আরম্ভ হইল। কথা হইল, পর দিন এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইতিহাস, সাহিত্য দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের আলোচনা হইবে। এক পক্ষ বলেন, ইহাই হউক; আর এক পক্ষ বলেন, না—তাহা হইতেই পারে না, একই সভায় সমস্ত প্রবন্ধ আলোচিত হউক। দ্বিতীয় পক্ষের মত সাহিত্যকে সর্ব্বজনীন করিতে হইবে, বিশেষজ্ঞের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন নহে; ইহার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইতে পারে। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন জনসাধারণের, সুতরাং ইহাতে সর্ব্ব বিষয় সরল করিয়া বুঝাইতে হইবে। যাঁহারা বৈজ্ঞানিক জগতে বিপুল আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা যদি মাতৃভাষায় জনসাধারণকে তাহা বুঝাইতে পারেন, তবেই সম্মিলনের সার্থকতা। প্রথমবারে দ্বিতীয় পক্ষেরই সংখ্যা বৃদ্ধি দেখা গেল। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বেই কার্য্য প্রণালী স্থির করিয়াছিলেন, এমন কি ভিন্ন ভিন্ন সম্মিলনের সভাপতি পর্য্যন্ত নিয়োগ হইয়াছে সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনেকে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনে রাজি হইলেন না সুতরাং তাহা ভোটে উঠিল। যখন ভোটে উঠিল, তখন গোল বাঁধিল। টানাটানি হুড়াহুড়ি আরম্ভ হইল। ফলে প্রথম পক্ষের জয় হইল। পর দিন চার সভায় চারটী অধিবেশন হইবে স্থিরকৃত হইল।

রজনীতে "সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে" প্রতিনিধি ও সমাগত সাহিত্য সেবীদিগের জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। সুতরাং সানন্দে তাহাতে যোগদান করিলাম।

পরদিন যথা সময়ে প্রবন্ধ পাঠের জন্য চারিটী আসর বসিল। বাড়োয়ারী পূজায় যেমন একস্থানে যাত্রা, এক স্থানে থিয়েটার, একস্থানে সার্কাস, একস্থানে কবি বসিয়া যায়, আর লোকজন চতুর্দ্দিকে কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া একবার এটা একবার সেটা দেখিয়া বেড়ায়, এই দিনের সভা গুলিও তেমনি হইল। জুতার মস মস শব্দ, বাক্যালাপের পুঞ্জিত কোলাহল, আর করতালির চটাপট শব্দ— দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্য-ইতিহাসের সুচিন্তিত গবেষণার মৃদু মন্দধ্বনিকে অতি নিম্নে রাখিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিতে লাগিল।

ঐতিহাসিক বিভাগের সভাপতি ছিলেন—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়; পাঠের জন্য প্রবন্ধ উপস্থিত হইয়াছিল ২০টী। সাহিত্য বিভাগের সভাপতি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন; প্রবন্ধ ছিল ২৬টী। দর্শন বিভাগে সভাপতি ছিলেন ডাঃ প্রসন্নকুমার রায়; প্রবন্ধ ছিল ৯টী। বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ছিলেন—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী; প্রবন্ধ ছিল ১৬টী।

সুখের বিষয় এই যে এই প্রবন্ধ সমূহের মধ্যে আমরা এই জেলার সাতটী প্রবন্ধ দেখিতে পাইয়াছিলাম। তন্মধ্যে ঐতিহাসিক বিভাগে দুইটী, সাহিত্য বিভাগে দুইটী, বিজ্ঞান শাখায় দুইটী ও একটী উদ্বোধন কবিতা ছিল।

সভা ভঙ্গের পর অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ ম্যাজিক লেণ্টার্ণের সাহায্যে বাঙ্গালির খাদ্যের মধ্যে বিজ্ঞান সম্মত কি প্রকারের দ্রব্য কত আছে এবং আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আর কি প্রয়োজন,তাহা বিশদ ভাবে সমবেত সাহিত্য সেবীকে বুঝাইয়া দেন। পরিশেষে তিনি দেশের কতিপয় শ্রেষ্ঠব্যক্তির খাদ্যের তালিকা তুলনাকরিয়া তাহা প্রদর্শন করেন।

এইদিন সন্ধ্যায় ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট বঙ্গীয় সমবেত সাহিত্য সেবীদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের "চন্দ্রগুপ্ত" অভিনয় দেখাইবার ব্যবস্থা করেন। তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ সেকালের গ্রীকদিগের ব্যবহার্য্য বস্ত্রের অনুকরণে প্রস্তুত ছিল। সকলেই এই অভিনয় দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলেন।

শনিবার প্রাতে পুনরায় বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন হইল। এই সভায় কাশিম বাজারের মহারাজা বাহাদুর সভাপতি ছিলেন। সভায় বহু বাদ প্রতিবাদ আরম্ভ হয়। এই সময় কোন কোন কর্ত্তৃপক্ষকে ধৈর্য্যের সীমা লঙ্ঘন করিতে দেখিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম।

তৃতীয় দিন প্রথমে ইতিহাস ও সাহিত্য বিভাগের বাকী প্রবন্ধ পঠিত হয়। পরে সাধারণ সভার অধিবেশন হয় এবং আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুপস্থিতে মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন সাধারণ সভার সভাপতি হন। মূল সম্মিলনের সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথকে প্রথম দিনের পর আর সভায় দেখা যায় নাই; মূল সভাটা যখন চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল,মূল সভাপতির তখন আর স্থানই বা কোথায়? তাহাকে দিয়া প্রয়োজনই বা কি? এই দিন বহু প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হয়।

তৎপর বাগ্মীপ্রবর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল "সাহিত্যে সমন্বয়"সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন "সম্মিলনকে চারি ভাগে বিভক্ত করিতে চাও কর, কিন্তু মূলটীকে দৃঢ় ও সবল করিতে হইবে; ভাষাকে সর্ব্বজনীন করিতে হইবে। দু চার জন বিশেষজ্ঞ থাকিতে পারেন, তাহাদের কার্য্যে জগত মুগ্ধ হইতে পারে, তাহাতে ভাষা গঠিত হইবে না। ভাষা গঠিত হইবে,যদি সাধারণ তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে"।"

এইবার আমন্ত্রণের পালা। মাননীয় কাশীমবাজারাধিপতি জানাইলেন যে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর আগামীবর্ষে বর্দ্ধমানে অধিবেশন করিবার জন্য সম্মিলনকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। এই সময় যশোহরের পক্ষ হইতে রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর সম্মিলনকে আগামীবর্ষে যশোহরে আহ্বান করেন। দেখা গেল, কেহই বর্দ্ধমানের সীতাভোগ ও মিহিদানার লোভ সম্বরণ করিতে রাজি নহেন, কাজেই আগামীবর্ষে বর্দ্ধমানে ও তারপর বৎসর যশোহরে সম্মিলনের অধিবেশন হইবে স্থির হইল।

প্রস্তাবাদি সমর্থনের মাঝেও একটু বেশ বাদ প্রতিবাদ চলিয়াছিল। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় ময়মনসিংহের প্রস্তাবিত দুঃস্থ সাহিত্য সেবীদিগের জন্য করুণ প্রার্থনা করিতে গিয়া একটু বিপন্ন হইলেন। বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে যখন এ প্রস্তাব উঠে নাই, তখন আর উঠিতে পারে না, এইরূপ একটা অজুহাতে তাহার কথা পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু লাহিড়ী মহাশয় ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি চীৎকারে চতুর্দ্দিক কাঁপাইয়া তুলিলেন, তখন ব্যোমকেশ বাবু এক ব্যবস্থা আছে বলিয়া মুখে আশ্বাস প্রদান করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, ময়মনসিংহের গৃহীত প্রস্তাবানুসারে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হস্তে সদ্‌গ্রন্থ প্রণয়ন জন্য শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম,এ ৫০০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া দুই হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন।" কিন্তু দুঃস্থ সাহিত্য সেবীদিগের জন্য যে কি ব্যবস্থা হইল, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এই প্রস্তাব এই ভাবেই চাপা পড়িয়া গেল।

অবশেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানের পর বাণীর সেবকগণের মিলনোৎসব-কার্য্য আনন্দ কোলাহলের মধ্যে সমাপ্ত হইল।

সভা ভঙ্গের পর পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-সেবীগণ টাউন

হলের এক প্রকোষ্ঠে সমবেত হইয়া সাহিত্যের উন্নতির জন্য "পূর্ব্ববঙ্গ সম্মিলন" নামে এক মিলনোৎসব প্রয়োজন বলিয়া এক প্রস্তাব করেন। তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এক কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

এই দিন সন্ধ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে সমবেত সাহিত্য সেবিগণের সম্বর্দ্ধনার জন্য কলিকাতা সাহিত্য সভা কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজের ভবনে এক সান্ধ্য সমিতির আয়োজন করেন। সৌজন্য ও শিষ্টাচারের অবতার মহারাজা বাহাদুর সকলকে অভ্যর্থনা করেন। এই স্থানে গান-বাদ্য, পান-ভোজনের সহিত আমাদের মিলনোৎসব মধুরেণ সমাপয়েৎ" হইল।

অভ্যর্থনা সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের জন্য যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা তাহাদিগেরই উপযুক্ত। সেই বিশাল রাজপুরী সদৃশ রাজ-প্রাসাদ, বিদ্যুৎ পাখা, দরিদ্র পল্লিবাসী আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। আর তাঁহাদের আদর আপ্যায়ন সে কথা কি বলিব! দেখিলাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ডাক্তার দেবপ্রসাদকে, আর পরিষদের বর্ত্তমান কর্ণধার রায় যতীন্দ্রনাথকে তাহাদের উদার ব্যবহার অভ্যাগত মাত্রকেই সন্তুষ্ট করিয়াছে। সর্ব্বোপরি আমাদের সদানন্দ ব্যোমকেশ বাবুকে আমরা আমাদের হৃদয়ের অজস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। দুই দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার প্রাণের পুত্তলিকে নীমতলার মহাশ্মশানে ডালি দিয়াও হর্ষোৎফুল্ল মুখে দিন নাই রাত্রি নাই, সর্ব্বদা পার্শ্বে থাকিয়া আগন্তুক সাহিত্য-সেবীদিগের পরিচর্য্যা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এ ব্যবহার ভুলিতে পারিব না।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

পঞ্চ-অভিভাষণ।

গঙ্গার উৎপত্তি স্থান মহাতীর্থ। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্মভূমি পুণ্যক্ষেত্র কলিকাতা মহানগরে, সাহিত্যের সপ্তম কুম্ভ মেলায়, সাধকগণ সমবেত হইয়া চিত্তের শুদ্ধি এবং চিন্তার শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিভাষণে সাহিত্য-দেবতার মঙ্গল আরতি বাজিয়া উঠিয়াছিল। উহাতে দীপের আলোক, ধূপের গন্ধ এবং শঙ্খঘণ্টাধ্বনি কিছুরই অভাব ছিল না। তাঁহার নানা তথ্যপূর্ণ অভিভাষণের প্রত্যেক অঙ্গের উল্লেখ এখানে সম্ভবপর নহে। কলিকাতার ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার সুবর্ণ বল্লরী কিরূপে কৃতী সেবকগণের যত্নে চারিদিকে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছিল, শাস্ত্রী মহাশয় উহার অতি সুন্দর চিত্র প্রদান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার বক্তৃতার একটী মাত্র স্থান উদ্ধৃত করিতেছি—

"বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি। প্রাচীনকালে বাঙ্গালার যে এত প্রভাব, এত আত্মগৌরব ছিল, বাঙ্গালীরা এখন সে কথা ভুলিয়া গিয়াছে। এখন বাঙ্গালী সমুদ্রে যাইতে চায় না, উপনিবেশ স্থাপনত দূরের কথা। শিল্প বাণিজ্যেও বাঙ্গালীর যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে। * * সাহিত্য চর্চ্চায় যদি আবার শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হয়, সাহিত্য-সেবিগণ যদি আবার বাঙ্গালীদিগকে শিল্পী ও বণিক করিয়া তুলিতে পারেন, সাহিত্যেরও উন্নতি হইবে, বিজ্ঞানেরও উন্নতি হইবে, শিল্প বাণিজ্যেরও উন্নতি হইবে।"

বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতিই বটে। আপনার শক্তি তৌল করিতে পারিলে বাঙ্গালী তাচ্ছিল্যের আরও অনেক উর্দ্ধে উঠিতে পারিত। সুপ্ত-শক্তির চিত্র দেখাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্রে সাহিত্য-প্রতিভার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সপ্তম সাহিত্য সম্মিলনে ইংরেজী দীক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী, ভরসা করি, আপনাকে চিনিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিতে সমধিক যত্নবান হইবে।

* * *

সম্মিলনের সভাপতি ঠাকুর দ্বিজেন্দ্রনাথের অভিভাষণ তাঁহার আজীবন জ্ঞান চর্চ্চার ফল স্বরূপ। তিনি যে কল্পিত আখ্যায়িকায় তাঁহার অভিভাষণ সমাপ্ত করিয়াছেন সংক্ষেপতঃ তাহা এইরূপ :—

"সেকালে এই ভারতবর্ষে তত্ত্বজ্ঞান ছিলেন রাজর্ষি আর পরাবিদ্যা ছিলেন রাজমহিষী। বিজ্ঞান ছিলেন একমাত্র নাবালক পুত্র। রাজর্ষি তত্ত্বজ্ঞান তাহার রাজ্য ও এই শিশুপুত্রের ভার রাজমন্ত্রী স্মৃতি-পুরাণের হস্তে রাখিয়া পত্নীসহ তপোবনে প্রয়াণ করিলেন। তখন রাজ্যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। মন্ত্রী স্মৃতি-পুরাণ রাজভাণ্ডারের ভক্ষ্য সকল যাহাতে প্রজারা পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিলেন,

কিন্তু এই ব্যবস্থা প্রজা সাধারণের মনঃপূত হইল না। তাহারা তাহা বিনামূল্যে অথবা অতি সামান্য মূল্যে পাইতে দাবী করিল। মন্ত্রী উপায় নাই দেখিয়া ভাণ্ডারের সেই বিশুদ্ধ তত্ত্বাদির সহিত নানাপ্রকার অর্থহীন ও অসার ক্রিয়া কর্ম্মের ভেজাল (?) মিশাইয়া প্রজাদিগকে সামান্য মূল্যে দিতে লাগিলেন। বিজ্ঞান আপত্তি করিল—আপনি এই কদর্য্য সামগ্রীগুলা বাজারে চালাইতেছেন—ও যে বিষ। মন্ত্রী বলিলেন—"ঐ দ্রব্যগুলিরই মধ্যে দুই চা'রি কোটা অমৃত যাহা সঙ্গোপিত আছে, তাহা অমন ধারা দশবিশ হাঁড়ি বিষকে গিলিয়া খাইতে পারে।

"কিছুদিন পরে মন্ত্রীর কার্য্যতায় বিজ্ঞান কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার জননী ভারতভূমি হইতে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং স্বীয় বাহুবলে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে আপনার আধিপত্য অটলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এদিকে রাজভাণ্ডারে অসার জিনিসের ভেজালে বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম চাপা পড়িয়া যাইতে লাগিল।

উপসংহারে দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন ঃ—

রাজ ভাণ্ডারের ভেজাল ভক্ত-পথে সামগ্রীতে এক আধ কোটা অমৃত যাহা সঙ্গোপিত রহিয়াছে—তাহা সত্য। রামায়ণ ও মহাভারতে দেশের আধ্যাত্মিক সভ্যতাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। মন্ত্রীর উপর রাগ করিয়া বিজ্ঞান যে পিতার অনভিমতে আপনার জননীতুল্য জন্মভূমিকে ফেলিয়া পশ্চিম ভূখণ্ডে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—এটা তাহার উচিত কার্য্য হয় নাই। তাহার উচিত ছিল পিতৃভূমি পরিত্যাগ না করিয়া পিতার নিকট পরমার্থিক সত্যের মন্ত্র গ্রহণ করিয়া নিজ অপূর্ণ জ্ঞান ভাণ্ডারের শূন্য ভাগটা পুরাইয়া লওয়া। যাইহউক বিজ্ঞান যদি হিতসাধন চান তবে ফিরিয়া পিতার নিকট দীক্ষিত হউন এবং আর্য্য সভ্যতার যৌবরাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিয়া পিতার চিরপোষিত মনস্কামনা পূর্ণ করুন। তাহা হইলে প্রাচ্য প্রতিচ্য উভয় রাজ্যেরই মঙ্গল হইবে।"

সাহিত্য সম্মিলনে সাহিত্য সেবকগণ প্রাচীন সাহিত্যাচার্য্যের হস্তে সাহিত্যান্নের সুবর্ণ থালা দেখিবার আশা করিয়াছিলেন।

* * *

সাহিত্য সভার সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্নের অভিভাষণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তিনি একস্থানে বলিয়াছেন—

"যাঁহারা মাতৃ সমৃদ্ধিতে ঐশ্বর্য্যশালিনী বঙ্গভাষাকে দেখিয়া ঐশ্বর্য্যশূন্য করিয়া দীনা করিতে চান, যাঁহারা বিদেশের দৃষ্টান্তে বঙ্গভাষাকে অলঙ্কারশূন্য করিয়া বিধবার বেশে সাজাইতে চান, তাঁহাদিগকে বলিবার কিছুই নাই। পাশ্চাত্য জগতের মহাকবি মিল্টনও ভারতীয় রীতিতে কবিতাসুন্দরীকে সাজাইয়াছেন, স্পষ্ট দেখাইতে পারি। অবশ্য রূপকে (নাটকে) পাত্রবিশেষের মুখে প্রাদেশিক শব্দেরই ব্যবহার সঙ্গত। তাই বলিয়া পণ্ডিতের মুখে, রাজার মুখে, মন্ত্রীর মুখে প্রাদেশিক শব্দের ব্যবহার সঙ্গত নয়। গভীর বিষয়ের বক্তৃতা করিতে যাইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে উন্মাদনা আনিতে ইচ্ছা করিয়া যদি কেহ প্রাদেশিক ভাষায় বক্তৃতা করেন, সে বক্তৃতা জলের মত উপরে উপরে ভাসিয়া যায়, ক্ষুদ্র নদীর ক্ষুদ্র বীচের মত তাৎকালিক ক্ষুদ্র ভাবের সৃষ্টি করিয়া পাদমূলমাত্র স্পর্শ করিয়া চলিয়া যায়। আবার যে বক্তৃতায় শব্দের ঝঙ্কার আছে, ডম্বর বন্ধ আছে, গুম্ফনকৌশল আছে, সে বক্তৃতা কর্ণমূল স্পর্শ করিয়া উপরে উপরে ভাসিয়া যায় না। অগাধ, অকূল, ফেনিল জলনিধির হিমাদ্রি শৃঙ্গস্পর্দ্ধি উচ্চ উত্তাল, শুভ্র মুক্তাবর্ষী তরঙ্গের মত গভীর মেঘ গর্জ্জনে ছুটিয়া সভ্যমণ্ডলীকে আপ্যায়িত করিয়া ফেলে, আকুল করিয়া ফেলে, অধীর করিয়া তোলে, মুহূর্ত্তের মধ্যে আকাশে তুলিয়া ভূমিপৃষ্ঠে উৎক্ষিপ্ত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সমস্ত গ্লানি, মনের সমস্ত অবসাদ লইয়া চলিয়া যায়। সেইরূপ বক্তৃতা ভিন্ন মনে অভূতপূর্ব্ব ভাবাবেশ হয় না, তেজের সঞ্চার হয় না, উন্মাদনা আসে না। তেজ সঞ্চার করিতে হইলে তেজস্বিনী ভাষার প্রয়োজন। ওজোগুণ না থাকিলে ভাষায় তেজস্বিতা হয় না। সংস্কৃতবহুল বাক্যের প্রয়োগ ভিন্ন ভাষায় ওজোগুণ আসে না।

যাঁহারা কথ্য ভাষাকে লেখ্য ভাষা করিতে চান, তাঁহারাও কখনও ধর্ম্মকে 'ধর্ম্ম' উচ্চারণ করেন না। পুরস্ত্রীবর্গের অনেকের মুখে, অশিক্ষিত ইতরশ্রেণীর সর্ব্বসাধারণের মুখে, ধর্ম্মই আমরা শুনিতে পাই। ইহা দ্বারা কি বুঝিব, প্রকৃত শব্দ কি অবধারণ করিব? অক্ষম জিহ্বার উচ্চারিত, বিকৃত শব্দকে শব্দসমাজের আসনে বসাইলে ইংরেজের উচ্চারিত টুমিকেও ভূমির আসনে বসাইতে হয়। মহামনা বঙ্কিমচন্দ্রও সর্ব্বত্র টেকচাঁদী ভাষার অনুবর্ত্তন করেন নাই; স্থানবিশেষে তাঁহার লেখনী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষাকে পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া সমাসবহুল বাক্যের সৃষ্টি করিয়াছে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের গানেও আমরা সংস্কৃত শব্দরাশির সমাবেশ দেখিতে পাই। তাঁহার কৃত প্রাচীন সাহিত্য নামক গ্রন্থও আমাদের কথার সম্যক্ সমর্থন করিবে। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, যাঁহাদিগের সংস্কৃত ভাষায় ও সংস্কৃত ব্যাকরণে সম্যক্ বুৎপত্তি নাই তাঁহাদিগের কৃত সমাসগ্রন্থি, তাঁহাদিগের কৃত সন্ধিবদ্ধ প্রবন্ধের গৌরব বৃদ্ধি করে না; প্রত্যুত সেই প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে ভাষায় আবর্জ্জনা আনয়ন করিয়া ভাষাকে কলুষিত করে। ভাবগৌরবে যদি সেই প্রবন্ধের, সেই পুস্তকের সমাজে আদর হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে সংক্রামক পীড়ার ন্যায় সেই দুষ্ট গ্রন্থন যে নবীন লেখকদিগকে আক্রান্ত করিয়া ভাষাকে আক্রমণ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সংস্কৃতানভিজ্ঞ লেখকগণ অনবধানতা বশতঃ লেখনীচালনায়, লেখনীর

আঘাতে ভাষাসুন্দরীর লাবণ্যোচ্ছ্বাসিত অনিন্দ্যসুন্দর দেহের নানা স্থানে যে পূযশোণিতপূর্ণ ক্ষতের সৃষ্টি করিয়া সৌন্দর্য্যের ক্ষতি করিতেছেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদিগের সেই সমস্ত ভ্রম প্রদর্শিত হইলেও মোহবশে তাঁহারা তাহা বুঝেন না। তর্কবিদ্যার লীলাক্ষেত্র বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া তর্কে কেন তাঁহারা হটিবেন? তাঁহাদিগের সেই অশুদ্ধ পদমালা রক্ষার জন্য বলিয়া উঠিবেন,—"ইহা সংস্কৃত ভাষা নহে, বাঙ্গালা ভাষা। ইহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র খাটিবে কেন?" উত্তরে বলিতে পারি—সমাস ও সন্ধি কাহার? যাহার নিকট হইতে সন্ধি, সমাস গ্রহণ করিয়াছ, তাহার নিয়ম মানিবে না—ইহা কেমন? ডাক্তারী ঔষধ খাইবে, অথচ ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ মানিবে না; রসায়নবিজ্ঞান না জানিয়া নিজেই প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ করিলে যে দোষ হয়, এস্থলে তাহাই হইবে।"

যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার জন্ম পত্রিকায় উহার রাশি নক্ষত্রের অবস্থান এখনও স্থির করিতে পারেন নাই, তাহাদের নিকট তর্করত্ন মহাশয়ের উক্তি মনঃপূত হইবে কিনা জানি না। বাঙ্গালা ভাষাকে আরবি ও পার্সি ভাষা প্রধান করিতে কাহারও কাহারও প্রয়াস দেখা যাইতেছে। যিনি যাঁহার ক্রোড়েই কেন বঙ্গভাষাকে স্থাপন করুন না, ভাষা আপনার জননীকে চিনিয়া লইয়াছে। মা এক, ধাত্রী অনেক।

* * *

দর্শন শাখার সভাপতি ছিলেন ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। তাঁহার অনুপস্থিতে ডাঃ প্রসন্নকুমার রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি বলিয়াছেন—

"দার্শনিক-সাহিত্যের উন্নতি করিতে হইলে পরিভাষার অভাব দূর করিতে হইবে। দার্শনিক সাহিত্যের উন্নতির আর একটী উপায় পরস্পরের ভাব বিনিময়ের ব্যবস্থা। বাঙ্গালা ভাষা যখন পরিপুষ্ট হইবে, ইহার শব্দ-দৈন্য যখন ঘুচিবে, বাঙ্গালা ভাষার পুস্তক যখন অন্য ভাষায় অনূদিত হইবে, তখন হয়ত আমাদেরও আর ইংরেজির সহায়তা আবশ্যক হইবে না। কিন্তু যতদিন তাহা না হয়, ততদিন ইংরেজি ভাষায় আমাদের চিন্তার ফল সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে সংকুচিত হইবার কোনও কারণ নাই। কারণ জগতের বিচারালয়ের সমক্ষে সেগুলিকে উপস্থিত করা, ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এইরূপ চিন্তার প্রচার করা আপাততঃ কেবল ইংরেজি ভাষার দ্বারাই হইতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে এরূপ প্রণালী বঙ্গভাষার উন্নতির অন্তরায় বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু আমি মনে করি যে পরোক্ষভাবে ইহার দ্বারাও বঙ্গসাহিত্য লাভবান হইবে। দেশে দার্শনিক চিন্তার প্রসার হইলেই বাঙ্গালা দার্শনিক সাহিত্য তাহার দ্বারা নিশ্চয়ই উপকৃত হইবে। *কোনও জাতির দার্শনিক সাহিত্য পরিপুষ্ট করিতে হইলে কেবল মৌলিক অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। অনুবাদের মূল্যও এস্থলে স্বীকার করা কর্ত্তব্য। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে এইরূপেই ভাবের আদান প্রদান হইয়া থাকে। এইরূপ বিনিময়ের দ্বারা জগতের সমস্ত সাহিত্য সর্ব্বকালে উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে।"

* * *

বিজ্ঞান শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলিতেছেন—

"আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা, তাহার উপর ভর করিয়া আমি বলিতে বাধ্য যে বাঙলা ভাষা জনসাধারণের সম্মুখে পদার্থ বিজ্ঞানের প্রচার কার্য্যে একবারে অসমর্থ নহে। রসায়ন শাস্ত্রের বিবিধ মৌলিক এবং যৌগিক দ্রব্যের পারিভাষিক নামগুলা এবং তাহাদের গঠনবিজ্ঞাপক সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলা ইংরেজি রাখিব কি বাঙলায় ভাষান্তরিত ও রূপান্তরিত করিব, তাহা লইয়া একটা বিবাদ বহুকাল হইতে চলিত আছে। আপাততঃ সেই বিবাদের মীমাংসার কোন সম্ভাবনা দেখি না, কিন্তু সেই বিবাদের নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত বাঙলা দেশের শিক্ষার্থীরা—ইংরেজি ভাষায় যাহাদের দখল নাই তাহারা—রসায়ন বিদ্যার রসাস্বাদনে যে একবারে বঞ্চিত থাকিবে, ইহা উচিত নহে। উদ্ভিদ্ বিদ্যা এবং প্রাণিবিদ্যা বিবিধ উদ্ভিদ্ জাতির এবং প্রাণিজাতির নামকরণে লাটিন ভাষার আশ্রয় লন; সেই উৎকট নামগুলি কোন কালে বাঙলা ভাষার ধাতুর সহিত মিলিতে চাহিবে কি না তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু যেমনই হউক—লাটিন নামগুলি বজায় রাখিয়াই হউক অথবা তাহাদের অনুবাদের চেষ্টা করিয়াই হউক—উদ্ভিৎতত্ত্বকে এবং প্রাণিতত্ত্বকে বাঙলা সাহিত্যে স্থান দিতেই হইবে। ভূবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা বিবিধ আকরিকের ও বিবিধ শিলাখণ্ডের যে সকল নাম সর্ব্বদা ব্যবহার করেন, বাঙ্গালীর কোমল বাগ্‌যন্ত্র তাহার উচ্চারণে ছিঁড়িয়া যাইবার আশঙ্কা আছে, তাহা স্বীকার করি। যাঁহারা করাত এবং হাতুড়ি হাতে পাহাড়ে পাহাড়ে লাফাইয়া বেড়ান, তাঁহাদের দেহ ও মন আগেটের ও কোরণ্ডমের কাঠিন্য পাইয়াছে সন্দেহ নাই। আমাদের বাগ্‌যন্ত্রের এই কোমলতা দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় কোমল হইবে, এরূপ আশা করি না; কিন্তু ঐ নামগুলাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া একটুকু মোলায়েম করিয়া লইলেই যদি আমাদের বাগিন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় উভয়েই তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হয়, তখন বাঙলা সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের কঠিন অন্তঃকরণকে একটু করুণরসার্দ্র করিতে আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।"

* * *

সম্মিলনের প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই।—উহাতে

সাহিত্য এবং বিজ্ঞান, দর্শন এবং ইতিহাস প্রত্যেকেই বিশিষ্ট মর্য্যাদা পাইয়াছিল। বর্ণমালার উচ্চারণে যেরূপ কণ্ঠ, তালু, দন্ত, ওষ্ঠ, মূর্দ্ধা এবং নাসিকার প্রয়োজন ভাষার উৎকর্ষ সাধনে তেমনি সকল অঙ্গের পুষ্টি ও পরিচালনা আবশ্যক। দর্শন বিহীন সাহিত্য অন্ধ; বিজ্ঞান শূন্য দর্শন দন্তহীন বৃদ্ধের বাক্যের ন্যায় অস্পষ্ট এবং অদ্ভুত। সাহিত্যহীন ইতিহাস ছিন্নমুণ্ড অশ্বত্থামা বিশেষ।

— —

যৌবন।

১

প্রমোদ নিকুঞ্জ মাঝারে প্রাণের,
বাজিছে মধুরে একটী বীণ্;
ছিন্ন-তার হ'য়ে হইবে নিরব,
যৌবনের ভাতি হইলে লীন।

২

কুসুম কোরক অলস নয়নে,
হাসে স্নিগ্ধ হাসি উষার বায়।
গোধূলীর ম্লান অঞ্চল পরশে
ফুল্ল-ফুলবালা ঝরিয়া যায়।

৩

তরুণ অরুণ কিরণ বরণ,
অস্ত রবির উজ্জ্বল লেখা,
সব নিভে যায় আঁধারের কোলে
শুধু থাকে বুকে স্মৃতির রেখা।

৪

হেরিয়া এ সব যৌবনে আমার
জড়াইয়া ধরি সকলে বুকে
কালের শীতল পরশ হইতে
লুকাইতে চাই নিভৃত লোকে।

৫

যৌবন-চঞ্চল অঞ্চল-বাতাসে
প্রেম-সিন্ধু মথি অমিয় উঠে।
বিরহের অশ্রু, মিলনের হাসি,
করি পান বসি জীবন-তটে।

৬

বিষাদ হইতে সুখেরে ছাঁকিয়া
দেয় উপহার বিশ্বের প্রাণে।
সু-রস রূপের দেয় ছিটাইয়া
যেই চায় তা'র নয়ন পানে।

৭

যাহা আছে মোর, লও সব, কাল,
অধরের সুধা, লোচন দীপ্তি,
চূর্ণিত চিকুর, নিটোল গঠন,
আসুক এ সনে অনন্ত সুপ্তি।

৮

সৌন্দর্য্য খুলিয়া নেওএকে একে,
হৃদয় মাঝারে দিওনা উঁকি।
বাহিরে যা আছে হরে নিয়ে যাও,
যৌবন আমার রাখিয়া বাকী।

৯

ক'দিন বাঁচিব ভাবিনা কখনো,
মরনে আমার নাহি কো ডর।
মৃত্যুর সৈকতে দাঁড়াইব আমি
যৌবনের-বাহু করিয়া ভর।

১০

অন্তিম শয়নে চাহিগো হেরিতে,
পাতার নীলিমা, মলয়ানিল
বসন্তের হাসি, কৌমুদী-মাধুরী,
ললনা-তরল-নয়ন-নীল।

শ্রীসুরেশচন্দ্র পত্রনবিশ।

সুবর্ণ পদক।

ময়মনসিংহের গৌরব পণ্ডিত কুলাগ্রগণ্য মহাত্মা কালী বিদ্যালঙ্কারের নাম সর্ব্বজন-পরিচিত। এই মহাত্মা বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত রঘুনন্দনের "অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের" মত খণ্ডন করিয়া "অষ্টাবিংশতি তত্ত্বাবশিষ্ট" নামে বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন।

এই উভয় গ্রন্থ অবলম্বনে পণ্ডিত দ্বয়ের মতের পার্থক্য দেখাইয়া যিনি বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন তাঁহাকে কালীপুরের জমিদার সুকবি শ্রীযুক্ত বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয় একটী সুবর্ণ পদক প্রদান করিবেন। প্রবন্ধ আগামী ৩০শে মাঘের পূর্ব্বে সৌরভ-সম্পাদকের নিকট পৌঁছান আবশ্যক। পুরস্কার যোগ্য প্রবন্ধটী আগামী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের—বর্দ্ধমান অধিবেশনে পাঠের জন্য উপস্থিত করা যাইতে পারে এবং সৌরভে প্রকাশিত হইবে। বিশেষ বিবরণ চিঠি লিখিলে জানিতে পারিবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—"সৌরভ" ময়মনসিংহ।

মাননীয় ডিরেক্টার বাহাদুরের চিঠি।

আমরা আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের মাননীয় ডিরেক্টার বাহাদুর পূর্ব্ব বাঙ্গালার উচ্চ ও মধ্য ইংরাজি স্কুল সমূহের জন্য "সৌরভ" অনুমোদন করিয়াছেন। তাহার চিঠির অনুলিপি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

FROM—THE DIRECTOR OF PUBLIC INSTRUCTION
Bengal.

TO—BABU KEDAR NATH MAZUMDAR,
Research House, Mymensingh.

Calcutta, the 1[illegible]h. May, 1914.

Sir,

In reply to your dated 22nd. April 1914, I have the honour to say that the monthly magazine "Sourava" has been approved for the use of libraries attached to High and Middle Schools in the Dacca, Chittagong and Rajshahi Divisions. It will be included in accordance with the usual procedure, into the list of Newspapers, Periodicals and Magazines selected for use in Colleges and Schools in East Bengal.

I have &c.
SD/- ILLEGIBLE
For Derector P. I.

চিত্র সম্বন্ধে কৈফিয়ত।

কলিকাতা হইতে ব্লক করাইয়া, ঢাকা হইতে ছাপাইয়া মফস্বল হইতে পত্রিকা বাহির করা যে কত দুরূহ ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। এরূপ করিয়াও আমরা নির্দ্দিষ্ট সময়েই "সৌরভ" বাহির করিয়া আসিতেছি।

জ্যৈষ্ঠ মাসের ব্লক কলিকাতা হইতে অদ্য পর্য্যন্তও আসিয়া না পঁহুছায়, নিয়মিত প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপিত চিত্র ব্যতীতই এই সংখ্যা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। এবারের চিত্রগুলি আগামী সংখ্যায় প্রদত্ত হইবে। ইতি,

কার্য্যাধ্যক্ষ—

ডাঃ প্রসন্নকুমার রায়।
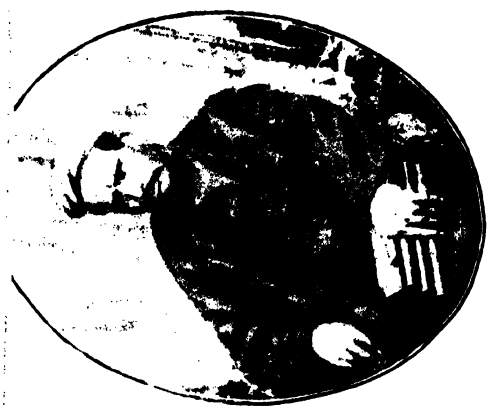
মহামহোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

Asutosh Press, Dacca.
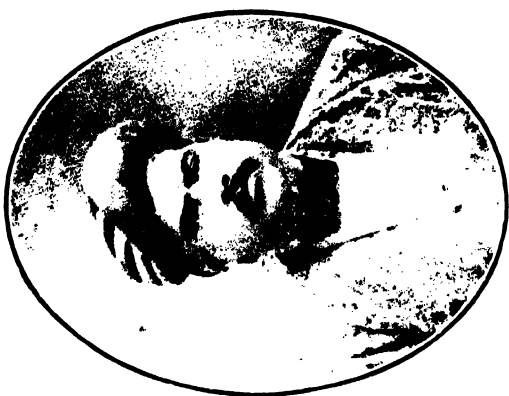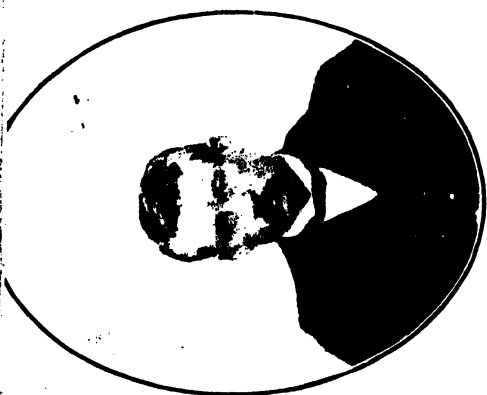
সৌরভ

দ্বিতীয় বর্ষ। }	ময়মনসিংহ, আষাঢ়, ১৩২১।	{ নবম সংখ্যা।

গো জাতির উন্নতি।

(বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ময়মনসিংহ অধিবেশনে পঠিত)

আমাদের দেশীয় গৃহপালিত পশ্বাদির অবস্থা অতিশয় শোচনীয়,উহাদের অবস্থা ক্রমশঃই অবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, একথা সকলেই স্বীকার করেন কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিলে গ্রাম্য পশ্বাদির বর্ত্তমান অবনতি দূর হইতে পারে, সে বিষয়ে কেহই চিন্তা করেন না অথবা চিন্তা করিলেও আপনাদের নির্দ্ধারিত উপায় কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন না।

গো এবং মহিষ জাতির শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে ভারতবাসীর সুখ স্বচ্ছন্দতা একান্ত জড়িত। গো মহিষ এ দেশের কৃষিকার্য্যের এবং ভার বহনাদি কার্য্যের প্রধান সহায়; ইহারা কৃষকের একমাত্র সম্বল। ভারতবাসীর শারীরিক ও মানসিক শক্তি রক্ষার্থ গো এবং মহিষ দুগ্ধ ও তজ্জাত নবনীত এবং ঘৃতাদি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গালার সর্ব্বত্রই গো এবং মহিষ জাতির হীনাবস্থা ঘটিয়াছে আমরা সময়ে সময়ে সংবাদ পত্রে এ বিষয়ের আলোচনা দেখিতে পাই। এতদ্বারা অনুমিত হয় যে শিক্ষিত সম্প্রদায় গো মহিষ জাতির অবনতি জনিত ক্লেশ তীব্রভাবে অনুভব করিতেছেন। ইহা সাময়িক শুভ লক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৪০। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এ অঞ্চলের প্রায় সর্ব্বত্রই গো-শালা গো পূর্ণ, বাথান (১) মহিষ পূর্ণ দেখা যাইত। কিন্তু এক্ষণে আর গো শালায় ও বাথানে সেরূপ গো মহিষের সংখ্যা দেখা যায় না। অনেক স্থলে গোশালা ও বাথান পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়াছে। শতাধিক গো মহিষ পালন এক্ষণে কিম্বদন্তীতে পরিগণিত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমরা একটাকায় ২০ সের দুগ্ধ বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি; বর্ত্তমান সময়ে টাকায় ৩। ৪ সের দুগ্ধও সকল সময় পাওয়া যায় না। দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় দুগ্ধে ও ঘৃতে নানারূপ কদর্য্য ও স্বাস্থ্য হানিকর দ্রব্য বহুল পরিমাণে মিশ্রিত হইতেছে। বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও ঘৃত সংগ্রহ নিতান্ত কষ্ট সাধ্য হইয়াছে, অত্রাবস্থায় লোকের যে স্বাস্থ্যের হানি হইবে তাহার আর সন্দেহ কি ?

গো মহিষ জাতির অবনতিতে একদিকে যেমন দুগ্ধ ঘৃত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনই কৃষিকার্য্যের ও গুরুতর ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। ভূমিতে সার প্রদান ভিন্ন কৃষির উৎকর্ষতা সাধিত হইতে পারে না। এ দেশের কৃষক সম্প্রদায় মধ্যে গোময় এবং গোমূত্র ভিন্ন অন্যপ্রকার সার ব্যবহারের প্রথা প্রচলন নাই। গো সংখ্যার অল্পতা নিবন্ধন ঐ সকল সার দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় সার প্রদান ক্রমশঃ রহিত হইয়া আসিতেছে সারের অল্পতা জন্য প্রচুর পরিমাণে শস্যোৎপত্তির ও ব্যাঘাত হইতেছে।

আমাদের দেশে দিন দিনই সুবিস্তৃত চারণ ভূমি সকল কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হওয়ায় উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যাভাবে গৃহপালিত পশু সমূহ ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। জন সংখ্যার আধিক্য এবং শস্য ক্ষেত্রের উর্ব্বরতাশক্তি হ্রাস হওয়ায় কৃষিজাত দ্রব্যাদি পূর্ব্বাপেক্ষা মহার্ঘ্য

(১) যেখানে রাত্রিতে পশুসকল রুদ্ধ করিয়া রাখা হয়।

হইয়াছে। তন্নিমিত্ত কৃষকগণ গ্রামস্থ চারণ ভূমি গুলিতেও শস্যোৎপাদন করিতেছে। সেইজন্য এক্ষণে আর পূর্ব্বের ন্যায় চারণ ভূমি দৃষ্টিগোচর হয়না। এদিকে কালধর্ম্মে অর্থের প্রয়োজনীয়তা এবং অর্থ লালসা বর্দ্ধিত হওয়ায় ভূম্যধিকারীরাও আয় বৃদ্ধির সুবিধা দেখিয়া প্রজার সহিত ঐ সকল ভূমির কর আদায়ের বন্দোবস্ত করিতেছেন। প্রচুর তৃণাভাবে পশুগণও ক্রমশঃই জীর্ণ শীর্ণ কলেবর ও ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া অকালে কাল কবলে পতিত হইতেছে।

পশু পালন করিয়া যে বিশেষ লাভবান হওয়া যাইতে পারে সে বিষয়ে আমাদের দেশীয় পশু পালকদের জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ কাজেই পশু দিগের নিমিত্ত করপ্রদান করিয়া চারণ ভূমি রাখা তাহারা নিতান্তই ক্ষতিকর বলিয়া মনে করে। ইংলণ্ডের কৃষিক্ষেত্রের বাৎসরিক কর গড়ে প্রতি বিঘা ৭৲ সাতটাকা, চারণ ভূমির প্রতিবিঘার কর ১২৲ বারটাকা। ইহা ব্যতীত চারণভূমি চাষের ব্যয় আছে। একখানি ভূমি চারণভূমিতে পরিণত করিতে বিঘাপ্রতি ১২৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকা ব্যয় হয়, ইহাতেই বুঝিতে পারাযায় যে সেদেশে চারণভূমির আদর কত। এতাধিক ব্যয় করিয়াও ইংলণ্ডীয় পশুপালকগণ পশুপালন করিয়া বিলক্ষণ লাভ করিতেছেন। বিগত ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ডের পার্ব্বত্যভূমি বাদে অবশিষ্ট ১০ কোটি বিঘা মধ্যে ৬ কোটী বিঘাভূমিই চারণভূমিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। একথা শুনিলে হয়ত আমাদের দেশীয়গণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবেন।

আমাদের প্রাচীন আর্য্য মহাত্মাগণ গো চারণ ভূমির কর গ্রহণ করা নিতান্ত পাপ জনক বলিয়া মনে করিতেন। আর্য্য ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষি মনু স্বীয় সংহিতায় লিখিয়াছেন যে "ধনুঃ শতং পরীহারো গ্রামস্যাৎ সমন্ততঃ। সম্যাপাতা-স্ত্রয়োবাপি ত্রিগুণো নগরস্যতু" অর্থাৎ গ্রামের সীমা হইতে চারিদিকে একশত ধনু (চারিশত হস্ত) অথবা চারিহস্ত পরিমিত যষ্ঠি তিনবার প্রক্ষেপ পরিমিত স্থান গো চারণের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ তাহাতে কোন প্রকার শস্য বপন করিবে না। নগরের চতুর্দ্দিকে ঐ নিমিত্ত ইহার ত্রিগুণ স্থান রক্ষা করিবে। বর্ত্তমান কালে প্রায় সমস্ত ভূমিই বিবিধ শস্যে পরিপূর্ণ, চারণ ভূমি বোধ করি অধিক চক্ষুগোচর হইবে না। বর্ত্তমান সময় লোকের যেরূপ মনোভাব লক্ষিত হইতেছে তাহাতে পাশ্চাত্য কিম্বা প্রাচ্য দৃষ্টান্ত যে কার্য্যকরী হইবে সে আশা ক্ষীণ, তবে ভূম্যধিকারীরা যদি গ্রামের চারণ ভূমিগুলির অল্পমাত্র কর গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাদিগকে বন্দোবস্ত করিয়া দেন তাহা হইলেও কতকটা ফল দর্শিতে পারে, কিন্তু কেবল চারণ ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিলেই যে যথেষ্ট হইবে তাহা নহে, চারণ ভূমিতে পশু দিগের আহারোপযোগী পুষ্টিকর তৃণাদি যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিতে পারে তাহারও উপায় বিধান করা আবশ্যক হইবে।

প্রাচীন কালে হিন্দুদিগের প্রেত শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে উৎকৃষ্ট লক্ষণাক্রান্ত বৃষ ছাড়িয়া দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত বৃষ উৎসর্গ করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে মহর্ষি কাত্যায়ন বলিয়াছেন "অব্যঙ্গ জীব বৎসায়াঃ পয়স্বিন্যাঃ সুতোবলী। একবর্ণো দ্বিবর্ণো বা যোবাস্যাদষ্টকা সুতঃ" ॥ অর্থাৎ যে বৃষ অবিকলাঙ্গ জীবিত বৎস্যা দুগ্ধবতীর পুত্র বলবান একবর্ণ বা দুইবর্ণ বিশিষ্ট এবং অষ্টকা তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই প্রকার লক্ষণাক্রান্ত বৃষ উৎসর্গ করিবে। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে আর্য্যঋষিগণের উদ্দেশ্য কত মহৎ ছিল এবং গো জাতির উন্নতি সাধন বিষয়ে তাঁহাদের কত দুরদর্শিতা ছিল। এই উৎসর্গীকৃত বৃষের যাহাতে বলক্ষয় না হয় আর্য্য ঋষিগণ তৎপক্ষেও যত্নের ক্রটী করেন নাই। মহামুণি গোভিল বলিয়াছেন "বৃষভন্তু সমুৎসৃষ্টং কপিলা বাপি কামতঃ যোজয়িত্বা হলং কর্য্যাৎ ব্রতং চান্দ্রায়নং স্বয়ং॥" অর্থাৎ যদি কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক উৎসর্গীকৃত বৃষ কিম্বা কপিলা দ্বারা হাল চালনা করে তবে তাহাকে দুইটী চান্দ্রায়ন করিতে হইবে। ঐসকল বৃষকে সকলেই যত্ন করিতেন। সুতরাং গো বংশ বৃদ্ধির সহজ উপায় ছিল। গাভীদিগের সংযোগ বিধানের নিমিত্ত ষণ্ডরাখার বিশেষ প্রয়োজন হইতনা। ক্রমে দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তার আরম্ভ হইলেও উৎসর্গীকৃত বৃষগুলিকে স্বেচ্ছামত বিচরণ করিতে দেওয়া হইত। সেই সময়েও বৃষাভাব

নিবন্ধন গোবংশ বৃদ্ধির তাদৃশ অসদ্ভাব হয় নাই। স্বেচ্ছাবিহারী বৃষগুলি বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট ও বীর্য্যবান হইত এবং তাঁহাদের দ্বারা সচ্ছন্দে বিহারিণী বৎসতরী হইতে যে সকল সন্তান জন্মিত তাহাও সমধিক বলিষ্ঠ হইত। অধুনা বৎসতরীগুলিকে গৃহস্থেরা গ্রহণ করে বলিয়া তাহাদের আর সেরূপ সন্তান জন্মে না। অবশেষে ইংরাজী ১৮৬৮ সালের মিউনিসিপাল ৬ আইন প্রচার হইলে সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রাম ও নগরগুলিতেই গৌণ্ড অর্থাৎ অস্বামীক পশু আবদ্ধ স্থান স্থাপিত হওয়ায় প্রথমতঃ গ্রামস্থ ষণ্ডগুলিকেই আবদ্ধ করিয়া সুলভ মূল্যে বিক্রীত করা হইল। হৃষ্টপুষ্ট কলেবর বৃষগুলি নিষ্ঠুর ক্রেতাদিগের হস্তে নিপতিত হইয়া কতকগুলি খাদকের উদরপূর্ত্তি করিল ও কতকগুলি মুষ্কছেদিত হইয়া বাহকের ও হলচালকের কার্য্যে নিযুক্ত হইল, সুতরাং বৃষের সংখ্যা সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িল। অনন্তর কৃতক্লীব ষণ্ড দ্বারা হলচালন প্রথা প্রচলিত হওয়ায় ষণ্ডের সংখ্যা আরও অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বহু সংখ্যক গাভীর পাল মধ্যেও দুই একটী পূর্ণ বয়স্ক ষণ্ড খুঁজিয়া পাওয়া সুকঠিন। এতদঞ্চলে সংযোগ ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য ষণ্ড রক্ষা করার পদ্ধতি প্রায় নাই বলিলেই হয়। অধিকাংশ স্থলেই যে সকল ষণ্ড বলদ বানাইবার জন্য রাখা হয়, সেই সকল অপরিণত বয়স্ক ষণ্ড দ্বারা সংযোগ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং সেই অপরিণত বয়সের নিস্তেজ ও দুর্ব্বল ষণ্ডের ঔরসে যে সকল সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহারা কাজেই দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া থাকে। এই প্রকারে আমাদের দেশীয় পশ্বাদির সংযোগ ক্রিয়ার ব্যভিচার বশতঃ বংশ পরম্পরায় তাহারা ক্রমশঃই খর্ব্বাকার, ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। শরীর দুর্ব্বল হইলে অতি অল্প কারণেই পীড়ার উৎপত্তি হয় এবং সেই পীড়া সহজেই কঠিন ভাবে পরিণত হইয়া প্রাণ বিনাশের কারণ হইয়া উঠে। অক্লীব ও কৃতক্লীবের সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে অকৃতক্লীব পশু সকলের প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত উদ্ধত, আর কৃতক্লীব পশু সকল স্বভাবতঃই নিরীহ। এই নিমিত্ত এক্ষণে হলচালনাদি শ্রমজনক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য অনেকেই কৃতক্লীবকে অধিক মনোনীত করিয়া থাকেন। এই প্রকারে সামান্য অসুবিধার জন্য পশু জাতির ভাবি উন্নতির পথের অন্তরায় স্বরূপ পুং পশু সকলের পুংস্ত্ব বিনাশ করা নিতান্তই অনুচিত। প্রাচীন দূরদর্শী আর্য গণ গোবংশের ভাবি উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইবার আশঙ্কায় কৃতক্লীবগো দ্বারা হলচালন প্রথার অনুমোদন করেন নাই। মহামুনি পরাশর বলিয়াছেন "স্থিরাঙ্গং নীরুজং দৃপ্তং বৃষভং ষণ্ড বর্জ্জিতং বাহয়েদ্দিবসস্যার্দ্ধং পশ্চাৎ স্নানং সমাচরেৎ।" অর্থাৎ স্থিরাঙ্গ, নিরোগ, গর্ব্বিত ও অক্লীব বৃষ দ্বারা দুই প্রহর কাল পর্য্যন্ত হলবাহন করিয়া পশ্চাৎ স্নান করাইতে হইবে। বাহন সকল হলবাহনাদিতে যাহাতে ক্লিষ্ট কিম্বা দুর্ব্বল না হয় তৎপক্ষেও তত্ত্বদর্শী পরাশর বিধি নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; যথা,—"হলমষ্টগবং ধর্ম্ম্যং ষড়গবং ব্যবসায়িনাম্ চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবঞ্চ গবাসিনাম্" অর্থাৎ ৮টী গো দ্বারা হলচালন করাই ধর্ম্মসম্মত, ছয়টী গো দ্বারা হলচালন করা ব্যবসায়ীর কার্য্য এবং চারিটী গো দ্বারা হলচালন করা নৃশংসের কার্য্য ও দুই গো দ্বারা হলচালন করা গোখাদকের কার্য্য। মহাত্মা পরাশরের উপর্য্যুক্ত মূল্যবান উপদেশ ও শাসন বাক্য উপেক্ষা করাতেই গোজাতির এতাধিক দুর্গতি ঘটিয়াছে। প্রাচীন আর্য্য ব্যবস্থা অনুসারে আটটী গো দ্বারা যদি হলচালন করা যায়, তাহা হইলে প্রাতঃকাল হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে প্রতি জোড়া গরুর পক্ষে ১½ ঘণ্টা মাত্র সময় লাগে, তাহার পরই বিশ্রাম জন্য অবসর পায়। ছয়টী বৃষ দ্বারা হলচালন করিলে প্রতি জোড়ার পক্ষে দুই ঘণ্টা কাল মাত্র পরিশ্রম করিতে হয়। চারিটী দ্বারা হলচালন করিলে প্রতি জোড়ার পক্ষে ৩ ঘণ্টা কাল পরিশ্রম করিতে হয়। বর্ত্তমান কালে দুইটীর অধিক গরু ক্রয় করিতে কেহ ইচ্ছা করে না, কিন্তু এক্ষণে কৃষকশ্রেণীর গৃহে গৃহে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে দুইটী কৃতক্লীব বৃষ দ্বারা হলচালন করাই তাহারা কর্ত্তব্যকার্য্যমধ্যে পরিগণিত করিয়াছে। দুইটী বাহন দ্বারা ব্যাপক কাল অবিশ্রান্ত অনাহারে হলচালিত হওয়ায় ক্রমেই যে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া তাহারা অল্পকাল মধ্যে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহা কেহ ভ্রমেও মনে করে না।

বর্ত্তমান সময়ে দুইটির অধিক গো কিনিতে গেলেই অধিক অর্থব্যয়ের আবশ্যক হয় সুতরাং সেই অর্থব্যয়ের আশঙ্কায় কেহই দুইটীর অধিক গরু ক্রয় করিতে অগ্রসর হয় না। কিন্তু ইহা বিষম ভ্রান্তি। নিরন্তর পরিশ্রমে যখন বাহন সকল অল্পকাল মধ্যে ক্লিষ্ট হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করে তখন বাধ্য হইয়াই পুনরায় সেই অর্থব্যয়ই করিতে হয়, ইহা অপেক্ষা অদুরদর্শীতা আর কি হইতে পারে? দূরদর্শী পরাশর এই ভাবি অনিষ্ট নিবারণের জন্তই দুইটী গো দ্বারা হলচালকদিগকে 'গোখাদকের' ন্যায় পাপী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে এতদপেক্ষা কঠোর শাসন আর কি হইতে পারে। এই সকল সদুপদেশ অগ্রাহ্য করা হেতুই কৃষকদিগের সমূহ ক্ষতি ও গবাদির এত দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে।

আমাদের দেশের গোশালাগুলি এত নিম্ন করিয়া প্রস্তুত করা হয় যে, ঐ গোশালার মধ্যে আলোক কিম্বা বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং মেঝের আর্দ্রতা দূর হয় না। এই প্রকার নির্ম্মাণ দোষে উহা অত্যন্ত অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। অতি ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট একখানা গোশালা মধ্যে অধিক সংখ্যক গরু সমস্ত রাত্রি দাঁড়াইয়া কাটায়। তাহাতে আবার অধিকাংশ স্থলেই মল মূত্রাদি পরিষ্কার করা হয় না; গোশালার বেড়াগুলি আবার এরূপ বিশৃঙ্খলভাবে প্রস্তুত করা হয় যে গোশালাস্থ পশুগুলি প্রবল বায়ু, বৃষ্টি ও দারুণ শীতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং এরূপ গোশালা যে গোগণের স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। গোশালা সম্বন্ধে মহর্ষি পরাশর লিখিয়াছেন "গোশালা সুদৃঢ়া যস্য শুচির্গোময় বর্জ্জিতা। তস্য বাহাবিবর্দ্ধন্তে পোষ নৈরাপি বর্জ্জিতা। সকৃন্মূত্রে বলিপ্রাঙ্গ বাহা যত্র দিনে দিনে। নিঃসরন্তি গবাং স্থানাৎ তত্র কিং পোষণাদিভিঃ।" অর্থাৎ যাহার গোশালা সুদৃঢ়, পবিত্র ও গোময় বর্জ্জিত তাহার গোসকল পোষণ অভাবেও সতত পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে কিন্তু যে স্থানে বাথান সকল মল মূত্রাদিতে বিলিপ্ত থাকে, তাহার গো সকল দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অন্যরূপ পোষণ দ্বারা কি হইতে পারে?

ইউরোপ ও আমেরিকার গো মেষাদির উন্নতির বিবরণ শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। "কলিং" নামক একজন সাহেবের ডর্হেম দেশীয় "কমেট" নামক একটি বৃষ ১১০০০ এগার হাজার টাকা এবং তাহার "লিলী" নাম্নী গাভী ৪৭০০৲ চারি হাজার সাত শত টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রকাশ্য নিলামে কয়েকটী উৎকৃষ্ট গরু ১৬০০০।১৭০০০ যোল সতের হাজার টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। স্কটলণ্ড দেশবাসী প্রসিদ্ধ গো-পালক ডিউক অব আর্গাইলের একটি ষণ্ডের ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্য হইয়াছিল। ইহা বলা বাহুল্য যে,ইংলণ্ডেও গরু সচরাচর এত অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়না। উক্ত গরু সকল বিশেষ সুলক্ষণাক্রান্ত ছিল বলিয়া এত উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল। তবে ইহা বলা আবশ্যক যে খুব ভাল গরু ইংলণ্ডে ১০০০ হাজার টাকার কম মূল্যে সচরাচর পাওয়া যায় না। বিলাতে গরুর অবস্থা পূর্ব্ব হইতেই যে এরূপ উন্নত ছিল তাহা নহে। গো জাতির উন্নতি এবং সেবা পরিচর্য্যার গুণে তথায় এক একটী গাভী ২০ কুড়ি ২২ বাইশ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে। এ কথা আমাদের দেশীয় ব্যক্তিগণ অনেকেই অবিশ্বাস করিতে পারেন। কিন্তু বিলাতের বিশিষ্ট লোকের নিকট তত্ত্বানুসন্ধান করিলে তাহাদের ভ্রম নিশ্চয়ই দূর হইবার সম্ভাবনা। ইহা কি কম পরিতাপের বিষয় যে, যে ভারতবাসী আর্য্যগণের এককালে দ্রোণক্ষীরা (বত্রিশ সের দুগ্ধ দাত্রী) গাভী ছিল, আজ কিনা সেই আর্য্য বংশধরগণকে বিদেশী গাভীর দুগ্ধ প্রদান ক্ষমতা বিষয়ে সংশয় ছেদ এবং প্রতীতি জন্মাইবার জন্য ভিন্ন দেশস্থ ব্যক্তির নিকট অনুসন্ধান করার অনুরোধ করিতে হইল।

(১) বঙ্গদেশে "রাখাল" বলিতে চাষার একটী অজ্ঞান ও অজাত শ্মশ্রু বালককে অথবা অকর্ম্মণ্য একটা নির্ব্বোধ চাষাকে বুঝাইয়া থাকে। ইহারাই পশু রক্ষার্থে নিযুক্ত। যাহারা আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ তাহারা পশ্বাদি রক্ষা করিতে কতদূর সমর্থ হইবে, কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। অনেক সময় উহারা অকারণে পশু গুলিকে নির্দ্দয় রূপে

প্রহার, নানা প্রকারে যাতনা প্রদান ও উপদ্রব করিয়া থাকে! রাখালগণ অধিকাংশ সময়ই তাহাদের অবস্থানের সুবিধা কর স্থানে পশুগুলিকে রাখিয়া থাকে। তথায় পশু-দের পানাহারের সুবিধা থাকুক বা না থাকুক সে বিষয়ে তাহারা ভ্রুক্ষেপ ও করেনা। কি প্রকারে উহাদের বল বর্দ্ধিত, উদর পূর্ণিত, স্বচ্ছন্দ বিহার পুষ্টি সাধিত ও স্বাস্থ্য রক্ষিত হয়, সে বিষয়ে উহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ। পালিত পশুদিগের জীবন—রক্ষকের উপরেই নির্ভর করে; সেই রক্ষক যদি তাহাদিগের জীবন রক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হয়, তবে আর তাহাদের জীবন রক্ষার উপায় কি?

(২) আমাদের দেশে দুগ্ধের নিমিত্ত এবং হল চালন ও শকট বহনাদি শ্রম জনক কার্য্য সাধন জন্য গো, মহিষ প্রতিপালিত হইয়া থাকে। অনেকেই এক শরীর হইতে এই উভয় উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা পাইয়া থাকেন, কিন্তু পরস্পর বিরোধী লক্ষণ একাধারে থাকিতে পারেনা। একটী অঙ্গ বিশিষ্ট রূপে বৃদ্ধি পাইলে অপর একটী অঙ্গের বৃদ্ধি সেই সঙ্গে হ্রাস হয়। যে গাভী বা মহিষী দৃঢ়কায় তাহারা প্রায় দুগ্ধবতী হয়না এবং যাহারা কোমলাঙ্গী তাহারাই প্রায় অধিক দুগ্ধবতী হইয়া থাকে।

(৩) গর্ভাবস্থায় গর্ভিনী পশু যদি সতত অপ্রসন্ন থাকে, তবে উৎকৃষ্ট পশুর সন্তানও অপকৃষ্ট হয়।

(৪) বিলোম অনুলোমের ফল,—হীনাবস্থার পুং পশুর দ্বারা উন্নতাবস্থার স্ত্রী পশুর গর্ভসঞ্চার হইলে সন্তানগুলি হীনাবস্থা সম্পন্ন হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে দেখা যায়।

(৫) পূর্ব্ব সংযোগ ক্রম,—হীনাবস্থার পুং পশু সংযোগে উন্নতাবস্থার স্ত্রী পশুর দুই একবার সন্তান উৎপন্ন হইলে তাহার ঐ ক্রম সহজে অপনীত হয় না, অর্থাৎ পুনর্ব্বার উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পুং পশু সহযোগেও তাহার গর্ভে উৎকৃষ্ট সন্তান জন্মেনা। ইহা বিশেষ রূপে পরীক্ষিত। আমাদের দেশীয় পশু পালকগণ এই সকল তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত থাকায় পশুদিগের আভিজাত্যের ব্যভিচার ঘটিতেছে।

(৬) সংযোগের ফলাফল,—অল্প দুগ্ধবতী পশুর গর্ভজাত পুংপশু অধিক দুগ্ধবতী স্ত্রী পশুর সঙ্গে সংযুক্ত হইলে সেই গর্ভ ধারিণীর প্রথম প্রসূতাবস্থাতেই দুগ্ধের পরিমাণ অনেক কমিয়া যায়। ইহা শুনিতে আশ্চর্য্য জনক বটে কিন্তু অনেক স্থলে ইহা পরীক্ষিত হইয়া সত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। সেই গর্ভে যদি স্ত্রী সন্তান জন্মে তাহা হইলে সেও অল্প দুগ্ধবতী হয়।

(৭) নবোপার্জ্জিত লক্ষণ বংশগত হইতে পারে,—স্থান কাল বা অবস্থা ভেদে বা শিক্ষাগুণে নূতন লক্ষণ উৎপন্ন হইলে তাহাও বংশগত হইতে দেখা যায়। যাঁহারা নূতন লক্ষণাক্রান্ত পশ্বাদি উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা বড়ই উপকারী।

(৮) পরিবর্ত্তন,—আকার বা গুণের ভালর দিকে পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে জল বায়ু ও অবস্থা অনুকূল হওয়া আবশ্যক। তাহা প্রতিকূল হইলে বিপরীত দিকে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

(৯) মিশ্রণ কার্য্য,—নানা দিগ্দেশীয় পুং পশু দ্বারা মিশ্রণ কার্য্য অধিক দূর পর্য্যন্ত চলেনা। কারণ অতি মিশ্রিত হইলে স্ত্রী জন্তু সকল বলহীন ক্ষুদ্রকায় হইয়া পড়ে, এই জন্য জন্তাদির উন্নতি করিতে হইলে এক এক প্রদেশের উৎকৃষ্ট জন্তু নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদের সংযোগী স্থাপন করিতে হইবে; নচেৎ উন্নতি হয় না।

(১০) স্ত্রী ও পুংপশু একত্র কালের ফলাফল,—স্ত্রী ও পুং পশুদিগকে নিকট নিকট রাখিলে পুং পশুদিগের স্বাস্থ্যের হানী হইয়া থাকে এবং স্ত্রী পশুরা শীঘ্র শীঘ্র গর্ভ ধারণ করে।

(১১) গর্ভকালীন ক্রম,—প্রসব কালে কখন কখন সন্তানের এমন লক্ষণ দেখা যায়, যাহা কোন পূর্ব্ব পুরুষে ছিলনা, মাতার চিন্তার উপর এই সকল লক্ষণের উৎপত্তি নির্ভর করে।

(১২) অতি নিকট সম্পর্ক দ্বারা সন্তান উৎপাদন,—এক জোড়া পুং ও স্ত্রী পশু হইতে যে পাল উৎপন্ন হইল, সেই পাল বৃদ্ধির জন্য পালের স্ত্রী বা পুং পশুর সহিত কখন সংযোগ স্থাপন না হয়, তাহা হইলে সে বংশে বা পালে আর ভিন্ন পালের শোণিত প্রবেশ করিতে পারিল না। কতকদিন এইরূপ চলিতে পারে। এবং তাহার

ফল ও ভাল, কিন্তু অধিক দিন এ নিয়মে বংশ বৃদ্ধি হইলে বংশের অবনতি হয়।

(১৩) মিশ্র জন্ম,—উপরে যাহা বলা হইল, ইহা ঠিক তাহার বিপরীত। ইহার অর্থ এক পালের সহিত অন্য পালের পুং বা স্ত্রী পশুর সংযোগ স্থাপন, ইহাতে অবশ্য জন্মের ঠিক থাকে না, কিন্তু অন্যান্য অনেকগুণ পাওয়া যায়, যাহা এক জাতীয় বল, দুগ্ধ দিবার ক্ষমতা প্রভৃতি গুণ ইহা দ্বারা অন্য জাতীতে উৎপাদন করা যায়।

(১৪) অস্মদ্দেশীয় গৃহপালিত পশ্বাদি পীড়িত হইলে চিকিৎসাভাবে প্রায়শই অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি পশু চিকিৎসা পদ্ধতি শিক্ষাকল্পে পশু চিকিৎসা বিদ্যালয় (Veterinary College) স্থাপন করিয়াছেন, এতদ্বারা সমূহ উপকার সাধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আশানুরূপ ফল লাভ ঘটে নাই। বঙ্গভাষায় পশু চিকিৎসা বিষয় গ্রন্থাদির একান্ত অসদ্ভাব লক্ষিত হয়। এবম্বিধ গ্রন্থাদি প্রচার বিষয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষিত হওয়ার সময় উপস্থিত হইয়াছে। দেশের ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে এই অভাব অচিরেই পূর্ণ হওয়ার আশা করা যায়। দেশের স্থানে স্থানে পশুশালা (Dairy Farm) প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসও সমীচীন বলিয়া মনে হয়। জৈন সম্প্রদায় পিঞ্জরাপোল স্থাপন করতঃ অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাঁহাদের সদ্ দৃষ্টান্ত অনুসরণীয় বটে। নিরক্ষর ও দরিদ্র কৃষক প্রভৃতির মধ্যে পশু পালনের উপকারিতা এবং তাহাদের স্বাস্থ্য প্রভৃতি উন্নতি বিধায়ক সরল ভাষায় লিখিত প্রবন্ধাদি পাঠ প্রথা প্রচলিত করার চেষ্টাও সঙ্গত। গবাদি পশু বধের গতি রোধ করার চেষ্টা কর্ত্তব্য হইলেও ইহা সর্ব্ব প্রকারে আমাদের আয়ত্ব নহে, গবর্ণমেণ্ট ও দেশের ধনী এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ মনোযোগী হইলে এ সম্বন্ধে সদুপায় উদভাবিত হইতে পারে। কলিকাতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরীতে গো পালকগণ গবাদির প্রতি যে প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকে এবং তাহাদের প্রতি যত্নের যে অসঙ্গত ও অমার্জ্জনীয় শিথিলতা প্রদর্শন করে, তাহাতে নিতান্তই লজ্জিত ও পরিতপ্ত হইতে হয়। ফলতঃ ইহারা পরোক্ষভাবে গো বধের সহায়তা করিতেছে বলিয়াই মনে হয়। কঠোর রাজবিধি প্রচলিত থাকা স্থলেও ইহারা গবাদির প্রতি নিষ্ঠুরতার এক শেষ প্রদর্শন করিতেছে, ইহার প্রতিকার বাঞ্ছনীয় ও চিন্তনীয়।

রাজধানী সুসঙ্গ। } ৺কমলকৃষ্ণ সিংহ শর্ম্মা।

সেরি বাণিজ (বণিক্) জাতক।

[শাস্তা * শ্রাবস্তীনগরে অবস্থানকালে জনৈক হীনবীর্য্য ভিক্ষুসম্বন্ধে এইকথা বলিয়াছিলেন। এইব্যক্তি সাধনা ত্যাগ করিয়া বিহারে ফিরিলে অপর ভিক্ষুগণ তাঁহাকে শাস্তার নিকট লইয়া গেলেন। শাস্তা বলিলেন, "এই মার্গফলপ্রদ শাসনে প্রবিষ্ট হইয়া যদি তুমি উৎসাহ পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে লক্ষ মুদ্রা মূল্যের সুবর্ণ পাত্র হইতে বঞ্চিত হইয়া সেরি বণিকের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তোমারও সেইরূপ হইবে।

অনন্তর ভিক্ষুগণ শাস্তাকে সেই কথা সবিস্তার বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; শাস্তাও তাঁহাদের অবগতির জন্য জন্মান্তর প্রতিচ্ছন্ন সেই অতীত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন :—]

অতি প্রাচীন সময়ে বোধিসত্ত্ব সেরি নামক রাজ্যে বাসনের কারবার করিতেন। তখন তাঁহার নাম ছিল, সেরিবান্। সেরি রাজ্যে ঐ নামে আরও এক ব্যক্তি বাসনের কারবার করিত। উহার বড় অর্থ লালসা ছিল। একদা বোধিসত্ত্ব তাহাকে সঙ্গে লইয়া তৈলবহ নদের অপরপারে অন্ধপুর নগরে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা কে কোন্ রাস্তায় ফেরি করিয়া বেড়াইবেন তাহা ভাগ করিয়া লইলেন; কথা হইল একজন যে রাস্তায় একবার ফেরি করিয়া গিয়াছেন, অপরজন তাহার পরে সেখানেও ফেরি করিতে পারিবেন।

অন্ধ পুরে পূর্ব্বে এক অতুলসম্পত্তিশালী শ্রেষ্ঠি পরিবার বাস করিত। কালে কমলার কোপে পড়িয়া তাহারা নির্ধন হয়, একে একে পুরুষেরাও মারা যায়। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন ঐ বংশে কেবল একটী বালিকা ও তাহার বৃদ্ধা পিতামহী জীবিতা ছিলেন। তাঁহারা অতিকষ্টে প্রতিবেশীদিগের বাড়ীতে কাজকর্ম্ম করিয়া দিনপাত করিতেন। বাড়ীর কর্ত্তা সৌভাগ্যের সময় যে সুবর্ণপাত্রে ভোজন করিতেন, সেটী তখনও ছিল; কিন্তু দীর্ঘকাল ব্যবহৃত না হওয়ায় এবং আবর্জ্জনার মধ্যে পড়িয়া থাকায় উহার উপর এত ময়লা জমিয়াছিল, যে সহসা উহা সোণার বাসন বলিয়া বোধ হইত না।

* শাস্তা, সুগত, দশবল, তথাগত প্রভৃতি গৌতমবুদ্ধের উপাধি।

একদিন লোভী ফেরিওয়ালা "থালা ঘটী কিনিবে" "থালা ঘটী কিনিবে" বলিতে বলিতে ঐ শ্রেষ্ঠীদিগের বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতেছিল। তাহা শুনিয়া বালিকাটী বলিল, আমায় একখানা বাসন কিনিয়া দাওনা, দিদিমা।" দিদিমা বলিলেন, "বাছা, আমরা গরিব লোক, পয়সা পাইব কোথায়?" তখন বালিকা সেই সোণার বাসনখানি আনিয়া বলিল, "এইখানা বদল দিলে হয় না কি? ইহা ত আমাদের কোন কাজে লাগে না।" বৃদ্ধা ইহাতে আপত্তি না করিয়া ফেরিওয়ালাকে ডাকিলেন এবং তাহার হাতে বাসনখানি দিয়া বলিলেন, মহাশয়, ইহার বদলে আপনার এই বোন্‌টীকে যাহা হয় একখানা নূতন বাসন দিন্।"

বাসনখানি দুই একবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া ফেরিওয়ালার সন্দেহ হইল, সম্ভবতঃ উহা স্বর্ণনির্ম্মিত। এই অনুমান প্রকৃত কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সে সূচী দিয়া উহার পিঠে দাগ কাটিল এবং উহা যে সোণার বাসন সে সম্বন্ধে তখন আর তাহার কিছুমাত্র সংশয় রহিল না। কিন্তু মেয়েমানুষ দুইটাকে ঠকাইয়া ইহা বিনামূল্যে লইব এইরূপ দুরভিসন্ধি করিয়া সে বলিল, "ইহার আবার দাম কি? ইহা সিকি পয়সায় * কিনিলেও ঠকা হয়।" অনন্তর সে নিতান্ত অবজ্ঞার ভাণ করিয়া বাসনখানি ভূমিতে ফেলিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

ইহার ক্ষণকাল পরেই বোধিসত্ত্ব সেই পথে ফেরি করিতে আসিলেন এবং "থালা ঘটী কিনিবে," "থালা ঘটী কিনিবে" বলিতে বলিতে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া বালিকাটী তাহার পিতামহীকে আবার সেই প্রার্থনা জানাইল। বৃদ্ধা কহিলেন, যে বাসন বদল দিতে গিয়াছিলে তাহার ত কোন দামই নাই শুনিলে। আমাদের আর কি আছে, বোন্, যাহা দিয়া তোমার সাধ পূরাইতে পারি?"

বালিকা কহিল "সে ফেরিওয়ালা বড় খারাপ লোক, দিদিমা। তাহার কথা শুনিলে গা জ্বালা করে। কিন্তু এ লোকটী দেখত কত ভাল, ইহার কথাও কেমন মিষ্ট। এ বোধ হয় ঐ ভাঙ্গা বাসন লইতে আপত্তি করিবে না।"

তখন বৃদ্ধা বোধিসত্ত্বকে ডাকাইয়া বসিতে বলিলেন এবং বাসনখানি তাঁহার হাতে দিলেন। বোধিসত্ত্ব দেখিবা মাত্রই বুঝিলেন উহা সুবর্ণনির্ম্মিত। তিনি বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা, এ বাসনের দাম লক্ষমুদ্রা। আমার নিকট এত অর্থ নাই।"

বৃদ্ধা কহিলেন, "মহাশয়, এই মাত্র আর একজন ফেরিওয়ালা আসিয়াছিল। সে বলিল ইহার মূল্য সিকি পয়সাও নহে। বোধ হয় আপনার পুণ্যবলেই বাসনখানি এখন সোণা হইয়াছে। আমরা ইহা আপনাকেই দিব; ইহার বিনিময়ে আপনি যাহা ইচ্ছা দিয়া যান।" বোধিসত্ত্বের নিকট তখন নগদ পঁচিশ কাহণ এবং ঐ মূল্যের পণ্য দ্রব্য ছিল। তিনি ইহা হইতে কেবল নগদ আট কাহণ এবং তুল ও থলেটী লইয়া অবশিষ্ট সমস্ত বৃদ্ধার হস্তে অর্পণ করিলেন এবং অনুমতি লইয়া বাসন খানি গ্রহণ করিয়া যত শীঘ্র পারিলেন নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে একখানি নৌকা ছিল। তিনি ইহাতে আরোহণ করিয়া মাঝির হাতে আট কাহণ দিয়া বলিলেন, "আমাকে শীঘ্র পার করিয়া দাও।"

এদিকে লোভী বণিক্ শ্রেষ্ঠীদিগের গৃহে ফিরিয়া বাসনখানি আবার দেখিতে চাহিল। সে বলিল "ভাবিয়া দেখিলাম তোমাদিগকে ইহার বদলে একেবারে কিছু না দিলে ভাল দেখায় না।" তাহা শুনিয়া বৃদ্ধা কহিলেন, "সে কি কথা, বাপু? তুমি না বলিলে উহার দাম সিকি পয়সাও নয়! এই মাত্র একজন সাধুবণিক্ আসিয়া ছিলেন। বোধ হয় তিনি তোমার মনিব হইবেন। তিনি আমাদিগকে হাজার কাহণ দিয়া উহা কিনিয়া লইয়া গিয়াছেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র সেই লোভী বণিকের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিল; সঙ্গে যে সকল মুদ্রা ও পণ্যদ্রব্য ছিল তাহা চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিল। অনন্তর উলঙ্গ হইয়া, হায়, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, দুরাত্মা ছল করিয়া আমার লক্ষ মুদ্রার সুবর্ণ পাত্র লইয়া গিয়াছে", এইরূপ প্রলাপ করিতে করিতে এবং তুলাদণ্ডটী মুদ্গারের ন্যায় ঘুরাইতে ঘুরাইতে সে বোধিসত্ত্বের অনুসন্ধানে নদীতীরে ছুটিল। সেখানে

* মূলে "অর্দ্ধমাষক" এই শব্দ আছে।

গিয়া দেখে নৌকা তখন নদীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত গিয়াছে সে "নৌকা ফিরাও" "নৌকা ফিরাও" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; কিন্তু বোধিসত্ত্ব নিষেধ করায় মাঝি নৌকা ফিরাইল না। বোধিসত্ত্ব অপর পারাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; দুষ্টবুদ্ধি বণিক্ একদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল; অনন্তর দারুণ যন্ত্রণায় তাহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইল; মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে লাগিল এবং সেই মুহূর্ত্তেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইল। ইহার পর বোধিসত্ত্ব দানাদি সৎকার্য্যে জীবন যাপন করিয়া কর্ম্মফল ভোগের জন্য লোকান্তর গমন করিলেন।

* * *

[কথান্তে সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইয়া শাস্তা এই গাথা পাঠ করিলেন: —

মুক্তি-মার্গ প্রদর্শক বুদ্ধের শাসন,
লভিতে সুফল তাহে কর প্রাণপণ।
নিরুৎসাহ অনুতাপ ভুঞ্জে চিরদিন,
বণিক্ সেরিভা যথা ধর্ম্মজ্ঞানহীন।

এইরূপে অর্হত্ত্ব লাভের উপায় প্রদর্শন করিয়া শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই হীনবীর্য্য ভিক্ষু অর্হত্ত্বরূপ সর্ব্বোত্তম ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন দেবদত্ত (১) ছিলেন সেই ধূর্ত্ত বণিক্, এবং আমি ছিলাম সেই সুবুদ্ধি ও ধর্ম্মপরায়ণ বণিক্।]

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ।

---

(১) জাতকের অনেক অংশে দেবদত্তের উল্লেখ দেখা যায়। এই জন্য তাঁহার সম্বন্ধে কতিপয় বৃত্তান্ত জানিয়া রাখা আবশ্যক। দেবদত্ত গৌতমবুদ্ধের অন্যতম বিরোধী; কেবল তর্কে নহে, নানারূপ অসদুপায় প্রয়োগ করিয়াও, তিনি গৌতমকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি দুই তিন বার তাঁহার প্রাণনাশের পর্য্যন্ত অভিসন্ধি করিয়াছিলেন। ফলতঃ যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধে যেমন দুর্য্যোধন, গৌতমের সম্বন্ধেও সেইরূপ দেবদত্ত।

এই দেবদত্ত কে তাহা লইয়া মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন তিনি শুদ্ধোদনের ভ্রাতুষ্পুত্র; স্বয়ংবর-ক্ষেত্রে তিনিও যশোধারার পাণিগ্রহণার্থী ছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মতান্তরে দেবদত্ত কোলীরাজ সুপ্রবুদ্ধের পুত্র; যশোধারার সহোদর এবং শুদ্ধোদনের ভাগিনেয়। তাহা হইলে দেবদত্ত গৌতমের পিষতুত ভাই এবং যশোধারা পিষতুত ভগ্নী। পিষতুত ভগ্নীকে বিবাহ করা তৎকালে রাজকুলে, বিশেষতঃ শাক্যবংশে, দোষাবহ ছিল না।

গৌতমের বুদ্ধত্বলাভের ২০ বৎসর পরে দেবদত্ত, আনন্দ, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি শাক্যরাজকুমারগণ এক সঙ্গে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। আনন্দ ও অনিরুদ্ধ উভয়েই গৌতমের পিতৃব্য-পুত্র। ইঁহারা যখন শাক্যদেশ হইতে যাত্রা করেন, তখন উপালি নামক এক নাপিতকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময় রাজকুমারগণ আভরণাদি খুলিয়া উপালির হাতে দিয়া বলিলেন তুমি শাক্যরাজ্যে ফিরিয়া সংবাদ দাও যে আমরা প্রব্রাজক হইরাছি। উপালি দেখিলেন তিনি কুমারদিগকে রাখিয়া একাকী প্রতিগমন করিলে শাক্যদিগের কোপ-ভাজন হইবেন; তাহাতে তাঁহার প্রাণান্ত পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। তিনি ইহাও বিবেচনা করিলেন, "এই রাজপুত্রগণ বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও যে সুখের আশায় সংসার ত্যাগ করিতেছেন, আমিই বা তাহা হইতে বঞ্চিত হই কেন?" অতএব তিনিও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। উত্তরকালে উপালি বিনয়পিটকে পারদর্শী হইয়া "বিনয়ধর" উপাধিলাভ করিয়াছিলেন।

দেবদত্ত ধ্যানবলে ঋষিত্বলাভ করিলেন; তিনি কামরূপ হইলেন এবং আকাশমার্গে বিচরণের ক্ষমতা লাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি নিরতিশয় ক্রূর ছিল বলিয়া তিনি এই ঋদ্ধিবল কেবল অসদুদ্দেশ্য সাধনেই নিয়োজিত করিতেন। তিনি বুদ্ধশাসনের বিরোধী হইয়া নিজেই একটী সম্প্রদায় গঠনের অভিপ্রায় করিলেন। তখন মগধরাজ বিম্বিসার এবং কোশলরাজ প্রসেনজিৎ উভয়েই গৌতমের শিষ্য; কাজেই তাঁহাদের নিকট কোন সাহায্য লাভের আশা না দেখিয়া দেবদত্ত বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুকে হাত করিলেন। অজাতশত্রু তখন যুবরাজ। তিনি দেবদত্তের বাসার্থ একটী বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন এবং সেখানে পঞ্চশত শিষ্যের জন্য প্রতিদিন ভক্ষ্য ভোজ্য পাঠাইতে লাগিলেন। প্রবাদ আছে এই সময় হইতেই দেবদত্তের ঋদ্ধিবল বিনষ্ট হয়।

অতঃপর দেবদত্ত গৌতমের সহিত সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু গৌতম তাঁহাকে সারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন অপেক্ষা উচ্চমর্য্যাদাদিতে অসম্মত হইলেন বলিয়া ঐ চেষ্টা ব্যর্থ হইল; দেবদত্তের প্রকৃতিও ইহার পর ভীষণতর হইয়া উঠিল। তিনি কুপরামর্শ দিয়া অজাতশত্রুকে পিতৃহত্যায় প্রবর্ত্তিত করিলেন। অজাতশত্রু প্রথমে অস্ত্রাঘাতে পিতৃবধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতার নিকট গিয়া অস্ত্র চালাইতে পারেন নাই। শেষে দেবদত্তের বুদ্ধিতে তিনি পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া অনশনে মারিবার ব্যবস্থা করেন।

অজাতশত্রু রাজা হইলে দেবদত্ত তাঁহার সাহায্যে গৌতমের প্রাণনাশের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি রাজার নিকট হইতে কতিপয় সুনিপুণ ধানুষ্ক চাহিয়া আনিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, "ইহাদের দ্বারা গৌতমের প্রাণবধ করাইয়া শেষে ইহাদিগকেও নিহত করাইব, তাহা হইলে কেহই আমার দুষ্কার্য্যের কথা জানিতে পারিবে না।" কিন্তু ধানুষ্কদিগের নেতা গৌতমকে লক্ষ্য করিয়া যে তীর নিক্ষেপ করিল, তাহা তদভিমুখে না গিয়া বিপরীত

দিকে ছুটিল। এই অলৌকিক ব্যাপারে ধানুকদিগের চৈতন্য হইল। তাহারা গৌতমের নিকট ক্ষমা চাহিয়া তদীয় শাসনে প্রবেশ করিল।

ইহার পর দেবদত্ত স্থির করিলেন গৌতম যখন গৃধ্রকূটের নিকট দিয়া গমন করিবেন, তখন পাহাড়ের উপর হইতে যন্ত্রবলে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রাণনাশ ঘটাইতে হইবে। সঙ্কল্পমত কার্য্যও হইল; কিন্তু শিলাখণ্ড পতিত হইবার কালে ভাঙ্গিয়া গেল; উহার এক অংশমাত্র গৌতমের পায়ের উপর আসিয়া পড়িল। জীবকের চিকিৎসার গুণে গৌতম এই ক্ষত হইতে আরোগ্য লাভ করিলেন।

তখন দেবদত্ত আর এক বুদ্ধি বাহির করিলেন। অজাতশত্রুর "নালাগিরি নামে এক প্রকাণ্ড হস্তী ছিল। দেবদত্ত স্থির করিলেন কল্য গৌতম যখন ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইবেন, তখন এই হস্তীকে মদ খাওয়াইয়া রাজপথে ছাড়িয়া দিলে এ তাঁহাকে পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিবে।" এ কথা গৌতমের কর্ণগোচর হইল; তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে সে দিন ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু তিনি কোন নিষেধ শুনিলেন না। তিনি অষ্টাদশ বিহারের ভিক্ষুগণসহ যথাসময়ে ভিক্ষায় বাহির হইলেন; নিজে সর্ব্বাগ্রে চলিলেন। এদিকে নালাগিরি শুণ্ড আস্ফালন করিতে করিতে উভয় পার্শ্বস্থ গৃহাদি ভগ্ন করিয়া সচল গণ্ডশৈলের ন্যায় তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। এক দুঃখিনী রমণী তাহার শিশু সন্তান লইয়া উহার সম্মুখে পড়িল। মত্তহস্তী তাহাদিগকে শুণ্ড দ্বারা ধরিতে যাইতেছে দেখিয়া গৌতম বলিলেন, "আমাকে মারিবার জন্যই দেবদত্ত তোমায় মদ খাওয়াইয়াছে; আমি যখন উপস্থিত আছি, তখন এই অনাথার উপর আক্রোশ কেন?" এই কথা শুনিবা মাত্র নালাগিরির মত্ততা বিদূরিত হইল; সে অতি শান্তভাবে অগ্রসর হইয়া শুণ্ডদ্বারা গৌতমের চরণ বন্দনা করিল। অমনি সমবেত জনসমুদ্র হইতে মহান্ জয়ধ্বনি উত্থিত হইল; যাহার অঙ্গে যে আভরণ ছিল, সে তাহা উন্মোচন করিয়া নালাগিরিকে উপহার দিল; তদবধি নালাগিরির নাম "ধনপালক" হইল।

পিতৃহত্যা-জনিত পাপে অজাতশত্রু সুষুপ্তি ভোগ করিতে পারিতেন না; অনুতাপানলে তাঁহার অন্তরাত্মা নিয়ত দগ্ধ হইত। শেষে তিনি জীবকের পরামর্শে গৌতমের শরণ লইলেন এবং তাঁহার পাদমূলে পড়িয়া নিজের দোষখ্যাপন করিলেন। গৌতমও তাঁহাকে প্রকৃত অনুতপ্ত জানিয়া উপাসক-সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লইলেন। তদবধি দেবদত্তের প্রতিপত্তি গেল; রাজভবন হইতে প্রতিদিন পঞ্চাশত ভিক্ষুর ভক্ষ্য ভোজ্য আসা বন্ধ হইল; দেবদত্তের শিষ্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তিনি নিজে ভিক্ষায় বাহির হইলেন; কিন্তু নগরবাসীরা তাঁহার ভিক্ষাপাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন দেবদত্ত গৌতমের নিকট গিয়া বিবাদ নিষ্পত্তির প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনি ভিক্ষুদিগের জন্য ছয়টী নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করুন, তাহা হইলে আমি পুনর্ব্বার আপনার সম্প্রদায় ভুক্ত হইব।" এই ছয়টীর মধ্যে এখানে দুইটী নিয়ম সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। দেবদত্ত বলিলেন, ভিক্ষুরা শ্মশানলব্ধ বস্ত্রখণ্ড ব্যতীত অন্য কোন বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন না এবং কদাচ মাংস আহার করিবেন না। বস্ত্রসম্বন্ধে গৌতম উত্তর দিলেন, "আমার শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেই ভদ্রবংশীয়; শ্মশানে যাইতে তাহাদের প্রবৃত্তি হইবে না; বিশেষতঃ তাহারা যদি বস্ত্রদান গ্রহণ না করে, তাহা হইলে উপাসকদিগের মধ্যেও দানধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত ঘটিবে। অতএব এ নিয়ম চলিতে পারে না"। মাংসত্যাগের প্রস্তাব সম্বন্ধে গৌতম দেখাইলেন যে ভিক্ষালব্ধ খাদ্যের কোন বিচার হইতে পারে না। উপাসকগণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাহা দিবে, ভিক্ষুরা সন্তুষ্টচিত্তে তাহাই আহার করিবে। যদি কেহ মাংস দেয়, তবে প্রাণিবধজনিত পাপ দাতার ভোক্তার নহে। বিশেষতঃ দেশভেদে যখন খাদ্যভেদ দেখা যায়, তখন এ খাদ্য গ্রাহ্য, এ খাদ্য অগ্রাহ্য, এরূপ নিয়ম অসম্ভব।

অনন্তর দেবদত্ত গৌতমের দল ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার প্ররোচনায় পঞ্চশত ভিক্ষু কিয়ৎকালের জন্য বুদ্ধশাসন পরিহারপূর্ব্বক তদীয় সম্প্রদায় ভুক্ত হইল বটে; কিন্তু সারীপুত্র আসিয়া তাহাদিগকে বুদ্ধশাসনে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন; তখন দেবদত্ত নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িলেন; দারুণ মনস্তাপে তাহার কঠিন পীড়া হইল; তিনি শয্যাগত হইলেন। এই সময়ে তিনি স্থির করিলেন "জেতবনে গিয়া গৌতমের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁহারই শরণ লই।" তিনি শিবিকারোহণে জেতবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গৌতম লোকমুখে এই সংবাদ জানিতে পারিয়া বলিলেন, "দেবদত্ত শত চেষ্টা করিলেও আমার দর্শন পাইবে না।" প্রকৃতপক্ষেও তাহাই ঘটিল; দেবদত্ত জেতবন বিহারের নিকট শিবিকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পদব্রজে যাইবার সঙ্কল্পে যেমন ভূতলে পদার্পণ করিয়াছেন, অমনি পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া অবীচি হইতে ভীষণ বহ্নিশিখা উত্থিত হইল এবং তাঁহার সর্ব্বশরীর বেষ্টিত করিল। "আমি গৌতমের শ্যালক; আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাও; হে গৌতম, আমায় রক্ষা কর, বলিয়া দেবদত্ত কত চীৎকার করিলেন; কিন্তু তিনি রক্ষা পাইলেন না, নরকেই গেলেন। বৌদ্ধেরা বলেন, দেবদত্ত মৃত্যুকালে বুদ্ধের শরণ কামনা করিয়াছিলেন বলিয়া, পরিণামে যখন পাপক্ষয় হইবে, তখন তিনি পুনর্ব্বার কুশলভাজন হইতে পারিবেন।

তিব্বত অভিযান

বরফের মধ্যে রাত্রি বাস।

আমরা দারুণ শীত ভোগ করিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু তজ্জন্য কাহারও কোনও অসুখ করিল না। জ্বর, সর্দ্দি, প্রভৃতি শীতের সহচর সকল আদৌ দেখা দিল না। প্রথম ২ আমাদের কষ্ট বোধ হইত; কিন্তু ক্রমে ২ উহা সহ্য হইয়া গেল। চুম্বী হইতে টুনা পর্য্যন্ত দ্রব্যাদি ও ডাক আনিবার জন্য যে সকল লোক নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা সমস্ত দিন সেই শীত ও বরফের মধ্যে থাকিয়াও বেশ সুস্থ ছিল। যে সকল সিপাহী রাত্রিকালে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াইয়া পাহারা দিত তাহাদের মধ্যে কয়েকজন নিউমোনিয়ায় মারা পড়ে। অনেকসময় হাত, পা ও নাক বরফে জমিয়া গিয়া রক্ত চলাচল বন্দ হইয়া যাইত কিন্তু ইহার চিকিৎসা সকলেই জানিত বলিয়া ইহাতে কাহারও বিশেষ কোন ও অনিষ্ট হয় নাই। পোষ্টাফিসের একজন বেহারী কেরানী বিশেষ অসাবধান হওয়াতে দক্ষিণ হস্ত ও পদ জমিয়া গিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়েন। শুনিলাম, তিনি খালি পায়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে রক্ষা করার জন্য অনেক চেষ্টা করা হইল কিন্তু কোন ও ফল হইল না। গলার স্বর আমাদের সকলেরই ভারী হইয়া পড়িয়াছিল। আমার খুবই ভারী হইয়াছিল। সৌভাগ্য ক্রমে, আমি গায়ক নই, তাহা হইলে হয়ত একটা বিষম কাণ্ড করিয়া বসিতাম।

টুনাতে রোজ রোজ ঘরে বসিয়া থাকিয়া আমরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম; সেই জন্য একদিন আমরা সাত জনে (একজন বাঙ্গালী তিন জন সাহেব দুই জন গুর্খা ও একজন শিখ) নাংলুহ্রদ মাছ ধরিতে গিয়াছিলাম। যাঁহারা বঙ্গের গ্রাম্য পুষ্করিণীতে তামাক টানিতে ২ মাছ ধরেন, তাঁহারা আমাদের এই গল্প শুনিয়া বুঝিবেন যে, মাছধরা অনেক সময় [illegible]কার অপেক্ষাও অধিকতর কষ্টকর এবং বিপজ্জনক। ঐ সময়ে নাংলু হ্রদের অধিকাংশ স্থান বরফে আবৃত ছিল বটে, কিন্তু স্থানে ২ বরফ ছিলওনা। আমরা ঐ প্রকার দুইটি স্থানে বসিয়া মাছ ধরিতে ছিলাম। কিন্তু সেখানে সুবিধা না হওয়াতে আমরা অন্যত্র যাইবার কল্পনা করিলাম।

একস্থানে খানিকটা বরফ জমিয়াছিল। হ্রদেরতট হইতে ঐ স্থান পর্য্যন্ত প্রায় ৭।৮ রশি স্থান বরফ জমিয়াছিল। আমরা স্থির করিলাম ঐ বরফের অপর প্রান্তে গমন করিয়া ছিপ ফেলিব। এক স্থানে থাকিলে সকলের সুবিধা হইবে না জানিয়া আমরা ভিন্ন ২ স্থানে যাইয়া বসিলাম। প্রথম ছিপ ফেলিয়াই একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, ঐ বরফের উত্তর প্রান্তে আমি ও দুই জন সাহেব ও দক্ষিণ প্রান্তে অবশিষ্ট সকলে বসিয়াছিল। একবার মাছ ধরিতে আরম্ভ করিলে মানুষের আর কোনও জ্ঞান থাকে না। তখন 'কাদের সাপ' বলিবার অবস্থা হয়। বিশেষ, যদি খুব মাছমায়, তাহা হইলেত কথাই নাই। ছিপ ফেলিতে না ফেলিতে কাতনার সজোর-টান পড়িল। ৩০।৪০ হাত সুতা নক্ষত্র বেগে খুলিয়া গেল। তাহার পর সুবিধা পাইয়া খানিকটা টানিয়া আনিলাম। আবার ছাড়িয়া দিলাম। এই ভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা খেলাইবার পর প্রায় ১৬ সের এক মাছ তুলিয়া ফেলিলাম। এইরূপে ছয়টা মাছ ধরিবার পর ছিপ ফেলিতেছি এমন সময় এক উচ্চ চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। চাহিয়া দেখি, আমাদের একজন সাহেব চীৎকার করিতে ২ আমাদের দিকে সবেগে ছুটিয়া আসিতেছেন। তাহাকে ঐ ভাবে আসিতে দেখিয়া আমরা ছিপ ফেলিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আসিয়া যাহা বলিলেন তাহাতে আমরা বিলক্ষণ ভীত হইয়া পড়িলাম। এই সময়ে আমাদের অপর চারিজন লোক ও চীৎকার করিতে ২ আমাদের দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছিল।

ঘটনা টা এই:—পূর্ব্বেই বলিয়াছি; আমরা তিন জন ঐ বরফের উত্তর প্রান্তে অর্থাৎ কিনারা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে বসিয়াছিলাম। অপর চারিজন তীরের নিকট ছিলেন। কিজন্য বলা যায় না, ঐ বৃহৎ বরফ খণ্ডটা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। একখণ্ড কিনারার সহিত লাগিয়া রহিল; অপরটা আমাদের তিন জনকে লইয়া হ্রদের অন্তদিকে ভাসিয়া চলিল। আমরা সকলেই

বিশেষ ভাবে ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া প্রথমে কেহই ইহা জানিতে পারি নাই। যখন জানিলাম, তখন উভয়ের মধ্যে প্রায় ২৫।৩০ হাত ব্যবধান হইয়া পড়িয়াছে। আমরা তিনজনে ঐ বরফের তীরের দিককার কিনারায় যাইয়া অপর তিন জনকে চীৎকার করিয়া কহিলাম, "আপনারা শীঘ্র একখানা নৌকা সংগ্রহ করুন। তাহা না হইলে আমরা বড়ই বিপদে পড়িব। শীঘ্র যান!" তাঁহারা সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া হ্রদের তটের দিকে চলিয়া গেলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে, এই সময়ে সন্ধ্যার ছায়া আসিয়া পড়িতে ছিল। এই পার্ব্বত্য দেশের সবই বিচিত্র। নয়টার আগে সূর্য্যদেব প্রায় দেখা দেন না। এদিকে আবার চারিটা বাজিতে না বাজিতে তাঁহার দপ্তর বন্ধ হয়। সহসা মনে হইল—সেটা কৃষ্ণ পক্ষ। ভাবিলাম, বিপদ যখন আসে বন্ধুবান্ধব সঙ্গে করিয়া আনে।

আমরা যে বরফ খণ্ডের উপর ছিলাম তাহার দৈর্ঘ্য ৩০ হাত এবং বিস্তার ২০ হাতের অধিক হইবে না। উহার প্রায় সর্ব্বত্র সমতল ছিল, কেবল দুই তিন স্থানে বরফের স্তূপ জন্মিয়াছিল। আমরা তিনজনে উহার একটার আড়ালে যাইয়া বসিলাম। এই সময় হাওয়া বেশ জোরে বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল; মনে হইল শীঘ্রই ঝড় আরম্ভ হইবে। এই খোলা জায়গায় রাত্রিকালে যদি বরফ পড়া ও ঝড় আরম্ভ হয়। তাহা হইলে আমাদের যে ভীষণ দুরবস্থা হইবে তাহা ভাবিলেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। ঐ সামান্য হাওয়াতেই আমরা কাঁপিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। মাছ ধরিতে আসিয়াছিলাম, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিয়া যাইব স্থির ছিল। সেই জন্য আমরা বিশেষ গাত্র বস্ত্রাদি সঙ্গে আনি নাই। এই সব কথার আলোচনা করিতেছি, এমন সময় এক জন সাহেব পকেট হইতে চুরুট বাহির করিয়া ধরাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন সকলেই সেই পথ অবলম্বন করিলাম। অনেকটা আরাম পাইলাম।

হাওয়া ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। রাত্রে যে আর কেহ আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে, সে আশা ক্রমেই হ্রাস পাইতে লাগিল। আমরা জানিতাম, এই শীতকালে হ্রদের কোনও স্থানে কোন ও নৌকা বা ডিঙ্গি নাই। ইহার নিকটে কোনও লোকালয় ও নাই। আমাদের সঙ্গীরা যদি টুনায় ফিরিয়া গিয়া নৌকার সন্ধান করেন, তবে নটা দশটার কমে কোনও মতেই ফিরিতে পারিবে না। ততরাত্রে হ্রদ ভীষণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে। ততক্ষণে আমরা যে ইহার কোথায় ভাসিয়া যাইব, কে জানে। বিশেষ যদি রীতিমত ঝড় আরম্ভ হয়, তাহা হইলে হয়'ত টুনা হইতে কেহই আসিতে পারিবে না। পাঠক হয়'ত এখন আমাদের বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন।

আমরা যতই এই সব কথার আলোচনা করিতে লাগিলাম, ততই আমরা অধিকতর হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিলাম। এই সময় অন্ধকার অত্যন্ত গভীর হইয়া পড়িয়াছিল ও আমরা শীতের প্রকোপে অধিকতর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলাম। ক্রমে ২ আমার সর্ব্বাঙ্গে এক নূতন ধরণের অবসাদ উপস্থিত হইতেছিল, ও আমার মনে হইতেছিল খানিকটা ঘুমাইলে সমস্ত কষ্টের অবসান হইবে। আমার সঙ্গী দুই জনই সৈনিক পুরুষ একজন কাপ্তেন ও অপর জন লেফটেনাণ্ট। কাপ্তেন সাহেব আমার ঠিক পার্শ্বেই বসিয়াছিলেন ও আমার ভাব কতক ২ বুঝিতে পারিতেছিলেন। আমি যখন ঘুমাইবার অভিপ্রায়ে দুই হাঁটুর মাঝখানে মাথাটা রাখিবার যোগাড় করিতেছিলাম তখন তিনি আমার দুই হস্ত ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিলেন। নিমেষের মধ্যে সমস্ত অবসাদ পলায়ন করিল। তিনি কহিলেন, "যদি বাঁচিতে চাও, ঘুমাইওনা। ঘুমাইলে আর জাগিতে হইবে না। চল খানিকটা দৌড়া দৌড়ি করি।" সাহেব নিজে আমার হাত ধরিয়া উঠাইলেন ও আমার হাত ধরিয়া ছুটিতে লাগিলেন। অপর সাহেব বিনা বাক্যব্যয়ে আমাদিগকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

মিনিট দশেক এইরূপ করিবার পর ছোট সাহেব (অর্থাৎ লেফটেনাণ্ট) কহিলেন, "টুনা হইতে যদি কেহ আসে তবে আপনাদের ঠিক স্থান তাহারা কি প্রকারে জানিতে পারিবে? খানিকটা আগুণ জ্বালান যায় নাকি?" বড় সাহেব বলিলেন, "জ্বালানত খুব উচিত। কিন্তু

জ্বালাইব কি? আমাদের সঙ্গে এমন কোনও বস্ত্রাদি নাই, যাহা আমরা জ্বালাইতে পারি। যাহা আছে তাহাই আমাদের পক্ষে অনেক কম। তোমাদের কাহারও কাছে যদি রিভলভার থাকে আওয়াজ করিতে পার। আমার সঙ্গে কিছুই নাই।" আমাদেরও সেই অবস্থা। মাছ ধরিতে আসিয়া বোধ হয় খুব কম লোকই সঙ্গে রিভলভার আনিয়া থাকেন।

ইহার পর আমরা আর বসিতে সাহস করিলাম না। বেড়াইতে বেড়াইতে চুরুট টানিতে লাগিলাম। এই ভাবে বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল। আমার মনে হইল, রাত্রি অতিবাহিত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। ছোট সাহেব বলিলেন "তাহা নয়, তবে দুইটার আমল বটে। আচ্ছা ঘরিটাই একবার দেখা যাক না।" কিন্তু দেখা যায় কি প্রকারে? তখনও ঝড় বেশ চলিতেছে। হ্রদের জল উদ্দাম নৃত্য করিতেছে। বরফ খণ্ড সকল পরস্পরের সহিত প্রতিহত হইয়া অতি ভীষণ শব্দ করিতেছে। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু এক্ষণে দেখিলাম যে, আমাদের বরফ দ্বীপ একস্থানে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে—তাহা না হইলে হয়ত এতক্ষণ অন্য কোনও বরফ খণ্ডের উপর পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত। যাহা হউক, অনেক যত্নের পর আমরা একটি দিয়াশলাইর কাঠি জ্বালিয়া ঘড়ি দেখিলাম। কিন্তু একি! এখনও নয়টা বাজে নাই! ঘড়িটা নিশ্চয়ই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাও ত নয়। তখন আবার আর একটা কাঠি জ্বালিয়া অন্য একটা ঘড়ি দেখিলাম। তাহাতেও ঐ সময়। তখন অগত্যা বিশ্বাস করিতে হইল। কিন্তু আমিত একবারে হতাশ হইয়া পড়িলাম। এই ভীষণ দুর্য্যোগের মধ্যে এখনও প্রায় ১০ ঘণ্টাকাল কষ্টে জীবিত থাকা কখনও সম্ভব নয়। কতবার যে টুনার সেই গরম ঘরের ভিতরকার আমার ক্ষুদ্র শয্যাটির কথা মনে পড়িল তাহা বলিতে পারি না। দেশের কথা, আত্মীয় স্বজনের কথা মনে পড়াতে প্রাণটা বড় অস্থির হইয়া পড়িল। আর যে তাহাদের কাহাকেও দিখিতে পাইব তাহার বিন্দুমাত্র আশা ছিল না। এই সময় চুরুটটা নিবিয়া যাওয়াতে বড় সাহেবের চুরুটে উহা ধরাইয়া ঘন ২ টানিতে আরম্ভ করিলাম।

বড় সাহেব কিন্তু বিন্দুমাত্র নিরাশ হয়েন নাই। তিনি বহুক্ষণ হইতে নানা উপায়ে আমাকে প্রবোধ দিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে আমার সহিত নানাপ্রকার হাসির গল্প করিতেছিলেন, গান করিতেছিলেন। ঝড়ের প্রকোপে তাঁহার অনেক কথা ডুবিয়া যাইতেছিল বটে, তবুও তদ্দ্বারা আমি যথেষ্ট উৎসাহিত হইতেছিলাম। ঘড়ি দেখিবার পর এই ভাবে আরও খানিকক্ষণ অতিবাহিত হইল। এমন সময় ছোট সাহেব অতি ভীষণ চীৎকার করিয়া কহিলেন, "বাঁচিবার উপায় পাইয়াছি—পাইয়াছি—পাইয়াছি—আর ভয় নাই—পাইয়াছি।" সহসা এই ব্যাপারে ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নৃত্য দর্শনে (মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ দেখা দিতেছিল) আমরা তাঁহার মাথা বিগড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করিলাম। বড় সাহেব তাঁহার উভয় হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "কি ব্যাপার? কি পাইয়াছ?" ছোট সাহেব নিতান্ত উৎসাহের সহিত কহিলেন, "আমরা যদি বরফের ঘর প্রস্তুত করি—" তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে বড় সাহেব তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "ধন্য পরমেশ্বর! এ সোজা কথাটা এতক্ষণ কাহারও মনে পড়ে নাই! সত্যসত্যই তুমি আজ আমাদের জীবন রক্ষা করিলে। এস এখনই কাজ আরম্ভ করা যাউক।"

বলা বাহুল্য আমরা তৎক্ষণাৎ ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। ঝড় তখনও পর্য্যন্ত সমানভাবে চলিতেছিল। সমানভাবে কেন?—উহার বেগ বৃদ্ধিই হইয়াছিল। কারণ, হ্রদের জল এখন চারিদিক হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া আমাদের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। তখন আমাদের সমস্ত হৃদয় উৎসাহে পরিপূর্ণ। আমরা এই নূতন বিপদকে তুচ্ছ করিয়া বরফ কাটিতে আরম্ভ করিলাম। আমাদের সকলের নিকটই এক এক খানা ছোরা ছিল। তাহার সাহায্যে একঘণ্টার মধ্যে আমাদের উপযুক্ত পরিমাণ বরফ বড় বড় ইষ্টকের আকারে কাটিয়া লইলাম। তাহার পর—প্রায়—সাতহাত পরিমিত ভূমি গোলাকার ভাবে ঐ ইষ্টকের দ্বারা ঘেরিয়া ফেলিলাম। ইহার দ্বার আমরা উপরে রাখিয়াছিলাম। উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ব সংগ্রহিত—একখানা বড় বরফের

সাহায্যে এই গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম। আমরা যখন উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছি, তখন বরফ পড়িতে লাগিল। একে এই ভীষণ ঝড়, তাহার উপর বরফ পড়া। বাহিরে থাকিলে আমরা যে নিশ্চয়ই মৃত্যু মুখে পতিত হইতাম, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। বরফের ঘরের মধ্যে গমন করিয়াই আমরা সকলে মঙ্গলময় ভগবানকে পুনঃ ২ ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম তাহারই অপার করুণা বলে ঠিক উপযুক্ত সময়েই ছোট সাহেবের মনে এই বরফের ঘরের কথা মনে হইয়াছিল। কি আশ্চার্য্য! আমাদের শয্যার কথা এখনও বলা হয় নাই। আমরা যদি বরফের উপর শয়ন করিতাম, তাহা হইলে হয় ত জমিয়া যাইতাম। কিন্তু বড় সাহেবের অভিজ্ঞতাকে শত ২ বার ধন্যবাদ। আমরা বেশ গরম শয্যা পাইয়াছিলাম। পাঠক জানেন, এই উপস্থিত বিপদ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আমি কয়েকটা বড় ২ মাছ ধরিয়াছিলাম। সাহেব দুই জনও প্রায় ১২, ১৩ টা ধরিয়াছিলেন এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই এই ১৯ টা মাছ আমাদের নিকট সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। যাঁহারা মাছ ধরেন তাঁহারা জানেন শীকারীর মাছ প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর। তাই তত বিপদেও আমরা মাছগুলি নিজেদের নিকট রক্ষা করিয়াছিলাম। বরফের ঘরে প্রবেশ করিবার সময় কাপ্তেন সাহেব বলিলেন মাছ গুলাকে ভিতরে লইয়া চল। শয়ন করিবার জন্য এমন ভাল বিছানা আর কোথাপাইব? উহাদের রক্ত এখনও গরম। ইহাদের উপর শয়ন করিলে খুব আরামে থাকিব। এমন বিচিত্র শয্যার কথা আপনারা বোধ হয় আর কখন শুনেন নাই কিন্তু ঐ শয্যাই সেদিন আমাদের নিকট রাজ শয্যার অধিক মূল্যবান মনে হইয়াছিল।

সমস্ত রাত্রি ঐ একই প্রকার দুর্য্যোগ চলিল। কিন্তু যখন চারিদিকে প্রকৃতি দেবী উক্ত রূপ সাংঘাতিক ক্রীড়ায় নিমগ্ন তখন আমরা বেশ আরামের সহিত মৎস্য শয্যায় সুখে নিদ্রা ভোগ করিতেছিলাম। অনেকে হয়ত শুনিলে বিশ্বাস করিবেন না যে, ঐ রাত্রে আমরা বরফের ঘরে মৎস্য শয্যায় যে প্রকার আরাম পাইয়াছিলাম, তাহা আমরা পাকা বাড়ীর বিচিত্র শয্যায়ও পাই নাই।

পর দিবস প্রাতঃকালে ঘরের দ্বার উন্মোচন করিতে গিয়া দেখি উহা জমিয়া গিয়াছে। সমস্ত রাত্রি বরফ পড়াতে আমাদের ঘরের চারিদিকেও প্রায় ৪ ফুট পুরু এক বরফের স্তর জমিয়া গিয়াছিল। প্রায় এক ঘণ্টা কাল বিশেষ পরিশ্রমের পর দ্বার উন্মুক্ত হইল। বাহিরে আসিয়া দেখি আমাদের 'বরফ দ্বীপ' হ্রদের অন্যদিককার তটে আসিয়া সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। মাছগুলা সেই বরফের ঘরের মধ্যে রাখিয়া আমরা তীরের উপর উঠিলাম। সেখান হইতে টুনায় পঁহুছিতে প্রায় বেলা এগারটা বাজিল।

অনুসন্ধানে অবগত হইলাম যে গত রাত্রে আমাদের সঙ্গীরা টুনায় উপস্থিত হইয়া আমাদের বিপদের কথা জ্ঞাপন করিলে তৎক্ষণাৎ বোটের জন্য প্রথমে দুর্গের মধ্যে ও পরে গ্রামে বিশেষভাবে অনুসন্ধান হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে কোনওস্থানে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। গ্রামের মধ্যে থাকিলেও বোধ হয় কেহ দিতে সাহসী হয় নাই। তখন পাঁচজনলোক ঐ হ্রদের অভিমুখে গমন করেন। সে সময়ে ভীষণবেগে ঝড় বহিতেছিল। চারিদিক দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন। উহারা কয়েকটা মশাল জ্বালিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিফল মনোরথ হয়েন। কয়েকবার বন্দুকের আওয়াজ করা হয়, ঝড়ের জন্য তাহা আমরা শুনিতে পাই নাই। যাহা হউক, ইহার পর ইহাঁরা সকলে টুনায় ফিরিয়া যান।

আমরা টুনায় ফিরিয়া গিয়া কয়েকজন লোক পাঠাইয়া দিলাম। তাহারা আমাদের মাছগুলি টুনায় লইয়া গেলে সে দিন রাত্রে প্রাণ ভরিয়া মাছের পোলাও খাইয়া অবসাদ ঘুচাইলাম।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

সমতট।

বঙ্গদেশের অন্তর্গত বিক্রমপুর যে একটি প্রাচীন স্থান, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। উহার প্রাথমিক অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া অনেকের মত এই যে উহাই প্রাচীন সমতট। পরে যে কারণেই হউক উহা বিক্রমপুর অভিধা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইউরোপীয়দের মধ্যে যাহারা এই কথা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে "ফার্গুসন" সমগ্র ঢাকা জেলাকে এবং "ওয়ার্টসার" ফরিদপুরের পূর্ব্ব ও ঢাকা জেলার উত্তরবর্ত্তী স্থানকে, সমতট আখ্যায় প্রযুক্ত করিয়াছেন। এই দুই কথার প্রতি লক্ষ্য করিলে, প্রথম কথায় বিক্রমপুরকে সমতটের অংশ বিশেষ ও পরবর্ত্তী লেখকের মতানুসরণ করিলে কেবল এক বিক্রমপুরই সমতট বলিয়া জানা যায়।

"ইৎচিঙ" বলেন, সমতট ভারতবর্ষের পূর্ব্বস্থানে সন্নিবিষ্ট; উহাতেও বিক্রমপুর পরিত্যক্ত হয় না।

মতামত যাহাই হউক অর্থাৎ একমাত্র বিক্রমপুরই সমতট বা উহা সমতটের অংশ বিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশিত হউক, তাহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; তবে সমতটের প্রধান কেন্দ্র বা সদর স্থান যে বিক্রমপুর ছিল, উহা প্রতিপাদন জন্য আমরা যৎকিঞ্চিৎ কারণ নির্দ্দেশ করিতে অভিলাষী হইয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি।

ইতিহাসজ্ঞগণ অবশ্যই পরিজ্ঞাত আছেন, স্থানের নাম, সীমা প্রভৃতি অনেক সময়েই রাজবিধানানুসারে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কত প্রাচীন স্থান তৎকালীন নাম পরিহার করিয়া নূতন নামে পরিচিত হইতেছে। কত প্রদেশ অন্য প্রদেশের অন্তর্গত হইয়া পূর্ব্ব নামের অস্তিত্ববিহীন হইয়াছে। এইরূপ বিষয়ের কোনরূপ উদাহরণ প্রদর্শন আবশ্যক মনে করি না। সমতট হইতে বিক্রমপুর নামের পরিণতি ও রাজশক্তির পরিচায়ক ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ইতিহাস ও ভূগোল পর্য্যালোচনা দ্বারা আরও উপলব্ধি হয়, অনেক সময়ে কোন কোন ক্ষুদ্র স্থানের নাম হইতেও কোন বৃহৎ প্রদেশের বা বৃহৎ প্রদেশের নামানুযায়ী সদর স্থানের নাম নির্দ্দেশিত হইয়াছে। যেমন বেহার একটা নগর, আবার এই বেহার যে প্রদেশের অন্তর্গত উহার নামও বেহার।

টোডরমল্ল বঙ্গদেশটী নানা সরকারে বিভক্ত করিয়াছিলেন, দেখা যায় প্রায় প্রত্যেক সরকারের অন্তর্গত একটা মহালেরও ঐ নাম। যেমন সরকার পূর্ণিয়া, সরকার ফতেয়াবাদ, সরকার খলিফেতাবাদ, সরকার সোনারগাঁ, প্রভৃতি প্রত্যেকের অন্তর্গত ৪০।৫০ টী করিয়া মহাল আছে, উহার একটীর নাম আবার প্রত্যেক সরকার সাদৃশ্য। বর্ত্তমান জেলাগুলির নাম ও এইভাবে অনেকটা ঘটিয়াছে। নিম্নলিখিত বিবরণের সামঞ্জস্য বিধানার্থে পূর্ব্বভাগেই আমাদিগকে এই কথা গুলি বলিয়া রাখিতে হইল।

প্রায় শত বৎসর অতীত হইল, পদ্মার প্রচণ্ডতরঙ্গাঘাতে, বিক্রমপুরের অন্তর্গত একটা বর্দ্ধিষ্ণু স্থান বিলয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। বহু জাতীয় হিন্দু এই স্থানের প্রধান অধিবাসী ছিল; মুসলমানের সংখ্যা বিরল দৃষ্ট হইত। এইস্থানটীর নাম ছিল সমকট। এখন বিক্রমপুরের বহু গ্রামের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া যেমন অর্থ সঙ্গত করিয়া লইবার প্রথা দাঁড়াইয়াছে (১) পূর্ব্বে তাহা ছিল না। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন উহার ঐ নামই ছিল। অধুনা কোন কারণ বশতঃ এই নামের উল্লেখ করা প্রয়োজন হইলে "সোমকোট" নামেই পরিচয় প্রদান করা হইয়া থাকে।

বিদেশীয় লেখকগণ কেহ কেহ সমতটের স্থানে, সলকট, সকলট প্রভৃতি নাম ব্যবহার করিয়াছেন। উহা যে কেবল তাহাদের স্বেচ্ছা প্রণোদিত ব্যবহার তাহা নয়, নামের পরিবর্ত্তনের সহিত ঈষৎ উচ্চারণগত পার্থক্যই তাহাদের দ্বারা সাধিত হইয়াছে।

যে সময় এইস্থান সমুদ্র তীরবর্ত্তী ছিল, তখন উহার নাম ছিল সমতট। ইহা হইল আভিধানিক নাম। সাধারণ লোকে উচ্চারণের সৌকর্য্যার্থে। উহাকে সংকট ও বিজ্ঞ লোকে সমকট উচ্চারণ করিত

(১) কাওলীপাড়া "কালীপাড়া" সোণারটং "সোণারং" মাঐসার "মহিসার' প্রভৃতি

কলিকাতার স্থলে, পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা কৈলকাতা ও স্থানীয় অধিবাসীরা কল্‌কাতা ব্যবহার করিয়া থাকে। দীর্ঘ উচ্চারণ স্থানে প্রায়ই হ্রস্ব উচ্চারণ করিতে লোকে সুবিধা পায় বলিয়া প্রকৃত নামের অনেক সময়ে বিকৃতি ঘটাইয়া থাকে।

যাহারা এই সমকট সম্বন্ধে সন্দিহান, তাহারা ১৭৬৪ খ্রীঃ অব্দের র‍্যানালের অঙ্কিত মানচিত্র অনুসন্ধান করিলেই এই স্থানটী প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। মেঘনা হইতে একটী ক্ষুদ্র নদী বাহির হইয়া দুই ভাগে বিভক্তান্তর বিক্রমপুরের বক্ষভেদ করিয়া পদ্মার সহিত যে স্থানে সম্মিলিত হইয়াছে উহার অনতিদূরে অথচ উভয় স্রোতধারা মধ্যবর্ত্তীস্থানে এই সমকোটের অবস্থান ছিল। উহার সন্নিকটেই "খাগটীয়া" একটী মন্দির বক্ষে ধারণ করিয়া, স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছে। যে নদীতীরে এই গ্রামদ্বয় বর্ত্তমান ছিল উহার নাম কালীগঙ্গা।

আমরা বলিতে সাহসী এই সমকট যে (১) প্রাচীন সমতটের সদর স্থান ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সমকট (সমতট) হইতে প্রদেশের নাম হইয়াছিল অথবা প্রদেশের নাম অনুসারেই সদর স্থানের নামকরণ হইয়াছিল তাহা অবধারণ করা সহজসাধ্য নহে।

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

জীবন মরণ।

(১)

হে পতি, মূরতি তব আঁকিয়া হৃদয়ে,
নিয়ত পূজিব সুখে প্রেমের প্রসূনে,
মরিলেও পরপারে সঙ্গে যাব নিয়ে
আমারো হবেনা ক্ষতি তোমার মরণে।

(২)

মরণ দেহের নাশ করে অল্পক্ষণে,
কিন্তু অবিনাশী সদা এ প্রেমের জাল,
ধ্বংশ না করিতে পারে সহস্র মরণে,
এজালে জড়িত মোরা রব চিরকাল।

(৩)

আসুক মরণ, নাশ করুক্ শরীর,
অমর হইয়া রব আমরা দু'জন;
আত্মা নাশ করিবারে পারে কোন বীর?
সমান প্রেমের রাজ্যে জীবন মরণ।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

নারায়ণদেব

(প্রত্যুত্তর)

"সৌরভের" মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রামনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় নারায়ণদেব সম্বন্ধীয় পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রবন্ধাদির আলোচনা করিয়া একটি প্রতিবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদের কয়েকটি কথা বক্তব্য আছে। নারায়ণদেব সম্বন্ধে রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় সতীশ বাবুর যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, নব্য ভারতে অচ্যুত বাবুর ও পঞ্চানন বাবুর যে প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়, এবং আর্য্যাবর্ত্তে দীনেশ বাবু যাহা লিখেন, তিনি তাহা পাঠ করেন নাই; রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় আমরা সতীশ বাবুর প্রবন্ধের যে অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছি, এবং অচ্যুত বাবু সাহিত্য সংবাদ পত্রে নারায়ণ দেব সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেন, মাত্র তাহাই অবলম্বনে প্রতিবাদটি করিয়াছেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতে সতীশ বাবু নাকি "তাঁহার উক্তি তিনটি সুদৃঢ় প্রমাণের উপর সংস্থাপন করিয়াছেন!" যদি এই প্রমাণ ত্রয় দুর্ব্বল না হইয়া সুদৃঢ় হইত, তবে লেখক মহাশয় তাহা প্রতিবাদে উদ্ধৃত করিলেইত তদীয় কার্য্যসিদ্ধি হইত, পাঠকও দেখিতে পাইতেন যে প্রমাণগুলির দৃঢ়তা কতদূর; তাহা না করিয়া সেই দুর্ব্বল প্রমাণকে

---

(১) ষোড়শ শতাব্দী হইতে এই স্থানটী বৈদ্যের এক প্রধান সমাজ স্থান ছিল, যথা—

"রাজপাশার রাম আর সোমকোটের নিম।
দামুদীয়া কোয়রপুরে ভরামাঠার চিন॥"

ঘটক বিশারদ—

উহা "সুদৃঢ়" এইমাত্র বলাতেই তাহা সুদৃঢ় বলিয়া প্রমাণিত হইবে কি? সতীশ বাবুর উক্ত প্রমাণত্রয়ে আমরা দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলাম, তাহা নাকি সতীশ বাবুর পক্ষে "অনুকূল ভিন্ন প্রতিকুল হয় নাই!"

সতীশবাবু লিখিয়াছিলেন—"ময়মনসিংহের শিশু মাতৃস্তন্যের সঙ্গে নারায়ণ দেবের সরস পাঁচালীর সহিত পরিচিত হইয়া থাকে,......পূর্ব্ববাঙ্গালার মুসলমান শিষ্যগণ এখনো তাহাদের সুপবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরাণ সরিপের শ্লোক শিক্ষার পূর্ব্বে 'নারায়ণ দেবে কয় নরসিংহসুত' প্রভৃতি কবিতাংশ শিক্ষা এবং অর্দ্ধস্ফুট জড়িতস্বরে আবৃত্তি করিয়া শ্রোতৃবর্গের কর্ণে মধুবর্ষণ করিয়া থাকে।" এতৎ প্রসঙ্গে অনেক কথাই বলিতে পার যায়; এই কথাগুলির অধিকাংশই মুসলমানগণ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন না। এতদুক্তি উপলক্ষে আমাদের লিখিত "দুই বৎসর পূর্ব্বের কথা লিখিতেছি, নারায়ণদেব কোন জেলার লোক, তাহা অনেকেই জানিতেন না, ময়মনসিংহের কয়েক স্থানের টোলের প্রাচীন অধ্যাপক হইতে জিজ্ঞাসায় এই উত্তর পাইয়াছি যে তিনি পূর্ব্বদেশের লোক, ময়মনসিংহের কি না তাঁহারা জানেন না।" এই কথার উত্তরে "সৌরভে" বলা হইয়াছে, উপরিউক্ত উক্তির দ্বারা নাকি সতীশ বাবুর উক্তি সমর্থিত হইয়াছে!! এতদনুষঙ্গে আমাদের উক্তির উপলক্ষে লেখক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বংশীদাস নিজে নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের নকল করিবার সময় স্থানে স্থানে স্বীয় নামটি বসাইয়া দেওয়ার কথা "কোন্ ময়মনসিংহবাসী স্বীকার করিবেন? স্বীকার করিতে পারেন কি?" তাঁহার এই জিজ্ঞাস্যের উপর আমাদেরও একটা জিজ্ঞাস্য আছে, যখন বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ পৃথক আছে কি না কেহ জানিত না, যখন নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ কথার সহিতই মাত্র ময়মনসিংহ বাসী পরিচিত হইয়াছিল, তখন নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে বংশীদাসের ভণিতা দৃষ্টে তাঁহাদের বংশী সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল? তাঁহারা কি তখন মনে করিতেন না যে, বংশীনামক একব্যক্তি নারায়ণদেবের গ্রন্থ মধ্যে স্বীয় নামে ভণিতাগুলি লাগাইয়া বা যুড়িয়া দিয়াছেন? এক্ষণে উহা অস্বীকৃত হইতে পারে, কিন্তু তখন ঐরূপ মনে করা ব্যতীত অন্য পথ ছিল কিনা পাঠক মহাশয়ই বিবেচনা করুন।

সতীশ বাবুর পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তি সম্বন্ধে আমরা বলিয়াছিলাম যে, চাণক্য, মদনমোহন তর্কলঙ্কারের গাথার সহিত অন্যান্য স্থানের ন্যায় ময়মনসিংহবাসী শিশুদিগেরও পরিচয় হইয়া থাকে বলিয়া তাঁহাদিগকেও ময়মনসিংহের বলিতে হইবে কি? চক্রবর্ত্তী মহাশয় "সৌরভে" এই কথার যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা এই—"চাণক্য, মদনমোহনের গাথা অন্যান্য স্থানের শিশুর ন্যায় ময়মনসিংহের শিশুরও পরিচয় হয়, কাজেই একা ময়মনসিংহ বাসী তাঁহাদিগকে আপনার বলিতে পারেনা, কিন্তু নারায়ণদেবের গাথার সহিত একা ময়মনসিংহের শিশুর পরিচয় হয়, সুতরাং তাঁহাকে ময়মনসিংহবাসী আপনার বলিয়া ভাবা স্বাভাবিক।"

এস্থলে 'একা' শব্দটির প্রতি পাঠক লক্ষ্য করিবেন। নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ এক ময়মনসিংহ জিলা ব্যতীত অন্যত্র প্রচারিত নাই, ইহাই কি লেখকের অভিপ্রায়? হইলে আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া নিরস্ত হইতে পারি কিন্তু বর্দ্ধমান বা চব্বিশপরগণা প্রভৃতি স্থানের পাঠক এই কথাটা বিশ্বাস করিয়া লইলেও, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানের পাঠক বর্গ এতৎপাঠে কি মনে করিবেন? নারায়ণদেব তাঁহাদেরও সুপরিচিত 'একা' ময়মনসিংহ বাসীর নহেন। আমাদের প্রবন্ধের একস্থানেই অচ্যুত বাবুর ত্রিপুরায় দৃষ্ট এক নারায়ণী পদ্মাপুরাণের প্রসঙ্গ আছে; সাহিত্য সংবাদে প্রকাশিত তদীয় প্রবন্ধে, শ্রীহট্টের প্রতি পল্লীতেই নারায়ণী পদ্মাপুরাণ থাকার কথা লিখিয়াছেন; বাস্তব পক্ষেও তাহা দৃষ্ট হয়। তদবস্থায়ও লেখক কিরূপে পূর্ব্বোক্ত উক্তিটি লিপিবদ্ধ করিলেন, আমরা বুঝিতে অসমর্থ। বস্তুতঃ নারায়ণী পদ্মাপুরাণের সহিত 'একা' ময়মনসিংহের শিশুই মাতৃস্তন্যের সহিত পরিচিত নহে, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা প্রভৃতির শিশুরাও মাতৃকোলে থাকিয়া উহা শ্রবণ করে, সুতরাং নারায়ণদেবকে "ময়মনসিংহবাসীর আপনার বলিয়া ভাবা স্বাভাবিক" চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই উক্তিটিও সতীশবাবুর বাক্যের ন্যায়ই বাস্তব নহে। "আমরা দেখিয়াছি, মাতা

স্তন্যপায়ী শিশু ক্রোড়ে করিয়া পদ্মাপুরাণের পাঁচালী শুনিয়াছেন।” তাঁহার এই কথায় সতীশবাবুর অতিরঞ্জিত কথা সমর্থিত হইতে পারিবে না, অনুসন্ধানে এইরূপ আবিষ্কারের ফল শ্রীহট্ট জেলার স্থানে স্থানে প্রতি বৎসর ‘শ্রাবণী’তেই পরিদৃষ্ট হইবে।

‘শ্রাবণী’ (মনসা পূজা) উপলক্ষে এখনও শ্রীহট্টের স্থানে স্থানে পদ্মাপুরাণ পাঠ এবং পদ্মাপুরাণের গীত হইয়া থাকে; নৌকাপূজায় পদ্মাপুরাণ গীত হওয়া পূজার একটা অঙ্গ হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। বিশেষ আড়ম্বরে সর্ব্ব-দেবীর সহিত মনসা-মূর্ত্তি গঠিত করিয়া নৌকাপূজা এক শ্রীহট্টেই প্রচলিত। * ‘শ্রাবণী’তে ঘরে ঘরে মনসা পূজার কথা ছাড়িয়া দিলেও শ্রীহট্টে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে অসংখ্য পরিবারে অসংখ্য স্থানে মনসার ‘ঘট’ স্থাপিত আছে, এবং তাহার নিত্যপূজা হয়। তুলনায় শ্রীহট্টের সঙ্গে এবিষয়ে অন্য কোন জিলাই সমকক্ষ হইবে না। আর ইহারা হয় নারায়ণ দেব, নয় ষষ্ঠীবর প্রভৃতির সহিত পরিচিত, তদবস্থায় লেখকের প্রমাণটি উলটাইয়া শ্রীহট্টের দিক হইতেও বলা যাইতে পারে যে, নারায়ণদেব সহ শ্রীহট্ট বাসী যেমন পরিচিত, তেমন অন্য কোন জিলার লোকই নহে, অতএব শ্রীহট্ট বাসীর তাঁহাকে “আপনার বলিয়া ভাবা স্বাভাবিক”। কবির বোড়গ্রামে বাস হেতু ময়মনসিংহের অধুনা একটা দাবি চলিতেছে মাত্র।

তাহার পর লেখক বলেন—“পঞ্চানন বাবু একটি প্রবন্ধে অহেতুক অতর্কিত ভাবে বলিয়াছিলেন যে বুড়গ্রাম পূর্ব্বে শ্রীহট্ট সরকারের অন্তর্গত ছিল। সতীশ বাবু তাঁহার প্রবন্ধে পঞ্চানন বাবুর এই কথার প্রমাণ চাহিয়াছিলেন। পঞ্চানন বাবু ভ্রম বশতঃ হঠাৎ এইকথা বলিয়াছিলেন বুঝিয়া বোধ করি বিজ্ঞজনোচিত মৌনাবলম্বন করিয়াছেন। মনুষ্য মাত্রেই ভ্রম করে।”

লেখকের লেখার কৌশলটি পাঠক লক্ষ্য করিবেন, যেন পঞ্চানন বাবু তাঁহাকে বলিয়াছেন, হাঁ আমার ভ্রমই হইয়াছে, তবে যখন লিখিয়াছি, তখন কথাটা ফিরাইব কেমন করিয়া তাই মৌনাবলম্বন! লেখক যাহাই বলুন, কিন্তু পঞ্চানন বাবু যে “তত্র মৌনংহি শোভনম্” ভাবিয়া মৌনাবলম্বন করেন নাই, তাহা তাঁহাকে কে বলিল? এ সম্বন্ধে পঞ্চানন বাবুর মত কি, তাহা না জানিয়াই উহা তাঁহার ভ্রম বলিয়া ধরিয়া নেওয়াটা উপযুক্ত হইয়াছে কি? আর যদিই বা তাঁহার কথা স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তথাপি ইহা বিবেচনার বিষয় যে, লোকে সাধারণতঃ কোন্ কথা অতর্কিত ভাবে হঠাৎ বলিয়া থাকে? লোকে শিক্ষিত কথা অপেক্ষা অনাবৃত সত্য কথাটাই হঠাৎ বলিয়া থাকে। এবং তাহার উপর অনেক সময় জয় পরাজয় নির্ভর করে।

“বুড়গ্রাম যখন ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত, তখন চির-দিনই উহার অন্তর্গত আছে”, লেখকের এই উক্তিটাই কি একটা প্রমাণ? যখন ময়মনসিংহ জেলা গঠিত হয় নাই (১২৫ বৎসর পূর্ব্বে), তখন বোড়গ্রাম শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছিল কিনা, ইহা কি জিজ্ঞাস্য হইতে পারে না?* যখন চিরদিন ময়মনসিংহ জিলা ছিল না, তখন “চির-দিনই উহার অন্তর্গত আছে” কথার মূল্য কতদূর? ময়মনসিংহ জেলা গঠিত হইবার পূর্ব্বে যখন জোয়ানসাহী প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী স্থান গুলি শ্রীহট্ট জিলার অধীনে ছিল, তখন বর্ত্তমান ময়মনসিংহের পূর্ব্বপ্রান্তীয় বোড়গ্রাম যে শ্রীহট্ট হইতে পৃথক ছিল, কোন্ প্রমাণে লেখক তাহা বলেন? ফলতঃ প্রমাণ ব্যতিরেকে “চিরদিনই উহার অন্তর্গত” ইত্যাদি বলিয়াও প্রমাণের জন্য অন্যকে উল্টা দোষ দেওয়া সমীচীন নহে। বোড়গ্রাম নসিরুজ্জিয়াল পরগণান্তর্গত কথাটা জানিয়াও প্রকাশ না করিলে আমাদেরই পক্ষে মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হইত, এসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে নসিরুজ্জিয়াল পরগণাটি কতদিনের এবং জোয়ানসাহীর খারিজা কিনা, যদি না হয়, তবে তৎকালে শ্রীহট্টান্তর্গত স্থান মধ্যে উহা

* আমরা সত্যের অনুরোধে প্রকাশ করিতেছি যে ময়মনসিংহ জিলারও স্থানে স্থানে এইরূপ আড়ম্বরের সহিত মনসা পূজা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। সৌঃ সঃ।

* শুনা যাইতেছে যে, ময়মনসিংহ জেলা তিনটি পৃথক জেলায় বিভক্ত হইবে, যদি তাহা হয়, তবে বোড়গ্রামের ভাগ্য কোন নব জিলার সহিত সম্বদ্ধিত হইবে বলা যায় না। এবং “চিরদিনই উহার অন্তর্গত” এ উক্তি ভবিষ্যতে কেহ বলিলে যেমন হইবে, এখনও ঠিক তেমনই হইতেছেনাকি?

ছিল কিনা (কেননা জোয়ানসাহী ছাড়াও বহুস্থান শ্রীহট্টের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল) ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা এখনও বাকি রহিয়াছে।

যাহা উল্লেখিত হইল, সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির এসব বিষয় আলোচনার পূর্ব্বে মতখ্যাপন সমীচীনতাজ্ঞাপক হইবে বলিয়া বিবেচিত হইবে না; লেখক ইহার কোন কথা আলোচনা করিয়াছেন ? সহজ পথ ছাড়িয়া বক্রপথে চলিলে, তাহা বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি অত্যাচার" বলিয়া কি অভিহিত হইবে না ?

জোয়ানসাহী পরগণা কোন সময়ে শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছিল কিনা তাহার নাকি প্রমাণ হয় নাই! কেদার বাবু এবং অচ্যুত বাবুর বাক্য লেখক মহাশয়ের নিকট গ্রাহ্য না হইলেও এবিষয়ে আইন ই আকবরি এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোংর পঞ্চম রিপোর্ট (১৮১২ ইং) ইত্যাদি ঐতিহাসিক গ্রন্থের প্রমাণ বোধ হয় অগ্রাহ্য হইবে না। নারায়ণ দেবের বংশাবলী লইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনেক কথা বলিয়াছেন, ব শ তালিকা অকৃত্রিম প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত এসব কথায় কোন ফল দর্শিবে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ।

বাসনা।

বাঁধন হারা নয়ন-ধারা
ঝর্‌ছে কাহার লাগি,
জীবন ভরে কাহার তরে
হৃদয়-অনুরাগী!
তরুণ তপন, ভাঙ্গলো স্বপন—
তন্দ্রা গেল টুটে;
বীণার তানে, মধুর গানে
হৃদয় ভরে উঠে।
গগণ মেঘে কিরণ মেখে
খুল্‌লো ত্রিদিব-দ্বার,
বকুল তলে, কুসুম-দলে
পূজার উপচার!
যা কিছু আজ, জীবনের কাজ
ঢাল্‌বো তাঁহার পায়!
জীবন স্বামী, যাহার আমি
প্রাণ তাঁহারে চায়!

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

তিনটী রত্ন-কণিকা।

আমাদের জন্মভূমি সোণার বাঙ্গলার সোণার মাটীতে শুধু আজ সোণা ফলিতেছে এমন নয়,—মা আমাদের চির দিন স্বর্ণ প্রসবিনী! আধুনিক কালে আমাদের নবীন-চন্দ্র,হেমচন্দ্র,রবীন্দ্রনাথকে গর্ভে ধরিয়া মা আমাদের যেমন গরবিনী, প্রাচীন কালে চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাসাদি অসংখ্য কবিরত্নকে বুকে ধারণ করিয়া ও মা আমাদের তেমনই গৌরবান্বিতাছিলেন। আজ আমাদের রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব সৌরভে প্রতিচ্য ভূখণ্ড পর্য্যন্ত আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু হউন আর মুসলমান হউন, কে এমন বাঙ্গালী আছেন, যিনি বাঙ্গলায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আজ নিজকে সৌভাগ্যশালী মনে না করিতেছেন? ফলতঃ যে রত্নগর্ভার গর্ভে চণ্ডীদাসাদির জন্ম হইতে পারিয়াছিল, সেই গর্ভে রবীন্দ্রনাথাদির মত কবির জন্ম কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়! এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। যাহা স্বাভাবিক, ঠিক তাহাই হইয়াছে। প্রত্যেক বাঙ্গালী সন্তানের হৃদয়ে গৌরবাত্মিকা ধারণা থাকা উচিত। এই ধারণা তাহাকে স্বীয় মহত্ব স্মরণ করাইয়া দিবে, —এই ধারণা তাহাকে সেই মহত্ব-রক্ষার প্রচেষ্টায় প্রণোদিত করিবে। এই ভাব বাঙ্গালীর চক্ষুর সম্মুখে এক সুমহৎ আদর্শ ধরিয়া দিবে। সেই আদর্শ ধরিয়া বাঙ্গালী আপনার ভবিষ্যৎ জীবন গড়িয়া তুলিবে।

বলিয়াছিত, চণ্ডীদাসাদির জন্মস্থানে রবীন্দ্রনাথের মত কবির জন্ম একান্ত স্বাভাবিক। সেই স্বাভাবিকতা সম্ভবে পরিণত হইয়াছে বলিয়া আজ আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছি। কিন্তু যাঁহাদের মনীষাও প্রতিভা ভিন্ন ভিন্ন সঞ্চিত হইয়া অবশেষে রবীন্দ্রনাথ রূপ মহা মহীরুহে

ব্যাপৃত হইয়াছে, দুঃখের বিষয়, সেই প্রাচীন কবিগণের অনেকে আজও আমাদের জ্ঞানের অগোচর রহিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের আলোচনা এখন অনেক বাড়িয়াছে সত্য কিন্তু দু'চারিজনে যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার আলোচনা লইয়াই অনেকে ব্যস্ত,—নূতন নূতন তথ্যাবিষ্কারের দিকে অতি কম লোকেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের পরিসর হিসাবে প্রাচীন সাহিত্যোদ্ধারের কার্য্য এখনো কিছু হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আরো বহুদিন এই ক্ষেত্রে কার্য্য করিলে তবে যদি তাহার একটা কিনারা হয়। আমাদের নবীন লেখকগণের নবোদ্যম অঙ্গের লিখিত অসার গল্প ও কবিতার অনুবাদে অপব্যয়িত না করিয়া যদি এই অতি প্রয়োজনীয় কার্য্যে নিয়োজিত করেন, তবে মাতৃভাষার উপকারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সাহিত্য সাধনা সার্থক হইতে পারে। স্বগ্রামে ও স্বদেশে লিখিবার মত কত জিনিস পড়িয়া রহিয়াছে। অথচ সেই সব ঘরের রত্ন ফেলিয়া তাঁহারা পরের চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়াই আপনাদের শক্তির অপচয় করিবেন, ইহা নিতান্তই ক্ষোভের কথা। এক দিনের আলস্যে আমাদের কত মহার্হ রত্ন যে অনন্ত কালের ক্রোড়ে চিরদিনের জন্য মিশিয়া যাইতেছে, তাহার পরিমাণ করা যাইতে পারে না। এখনো সময় আছে। এখনো নবীন লেখকগণ সে দিকে মনোনিবেশ করুন।

কাঙ্গালের হাতে মাণিক পড়িলে তার যেমন আনন্দ হয়, মাতৃ ভূমির এক জন প্রাচীন কবির আবিষ্কার করিতে পারিলে আমারও তেমন আনন্দ হইয়া থাকে। প্রাচীন পুঁথি নাড়া চাড়া করিতে করিতে সম্প্রতি তিন জন প্রাচীন কবির তিনটি রত্নকণিকা সদৃশ পদ পাওয়া গিয়াছে। পদগুলি পাইয়া আমার যে আনন্দ হইয়াছে, বাঙ্গালী পাঠকগণকে তাহা বিলাইয়া দেওয়ার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমার পরিশ্রমের সফলতায় আমি যেমন সুখী,—পাঠকগণ পদগুলির আস্বাদন করিয়াও তেমন সুখী হইবেন। এই দেখুন না কেমন সুন্দর উপভোগযোগ্য জিনিস্ সকল আজও দেশের নানা স্থানে অযত্নে পড়িয়া রহিয়াছে ঃ—

বিনোদিনী বিলম্ব করিতে না জুয়াএ।
তুয়া পথ নিরক্ষিতে রহিয়াছে প্রাণনাথে
রাধা বোলি মুরলি বাজাএ॥
নপুর কিঙ্কিনী কেয়ূর কুণ্ডল মণি
পরিহরি কর লো গমন।
প্রিয় সখীর গলে ধরি নীল নীচোপল পরি
দেখ গিয়া ও চান্দ বদন॥
তুয়া রূপ হেরি হেরি আকুল মুরারি
হেরিতে হরল গেয়ান।
কহে দ্বিজ পার্ব্বতী শুন শুন পুণ্যবতী
অলক্ষিতে নিকুঞ্জ পয়ান॥ ১।

বেলোয়ার রাগ।

বদলে থুইয়া যাও বাঁশী।
তবে সে আসিবা হেন বাসি॥
ও বাঁশী যতনে থুইমু,
গন্ধ চন্দন দিমু,
হীরা মণি মাণিক্যে জড়িয়া।
যখনে তোমার তরে
ও বুক বেদনা করে
নিবারিমু দুঃখ বাঁশী বুকে দিয়া॥
বাঁশীটি দুই কুল খাইল,
কুলের কলঙ্ক হৈল,
বাঁশী নহে পরম দারুণি।
সে বাঁশী সঙ্গতি জাইব,
আর নি আসিতে দিব,
আনি দিব রসিক রমণী॥
দ্বিজ মাধবে কহে,
সোণা নহে রূপা নহে,
কেবল বাঁশের আগা বাঁশী।
দিব্য কর প্রাণ নাথ,
মোর মাথে দিয়া হাত,
মুঞি তোমার হৈয়া যাইমু দাসী॥ ২।

পরাণে সে জানে।

মরম দুঃখ পরাণে সে জানে॥

কিরূপে দেখিব কালা কালিন্দীর কূলে।

ধড়ে ধৈরজ নহি মানে।

অধর রঙ্গিমা ভুরুর ভঙ্গিমা

চুড়াটি বান্ধ্যাছে ঠানে॥

নিষেধ ন মানে বিষম সন্ধানে

হান্যাছে গোবিন্দের বাণে।

জাগিতে ঘুমিতে আন না লয় চিতে

কালিয়ার বাঁশীর সানে॥

চিত্ত ধরান দিয়া রাখিতে না পারি হিয়া

অনাহুতে বান্ধি টানে।

বাঁশী বাজাএ নিতি কান্নার পিরীতি

বুজিতে বুঝন ধান্ধা।

কহে শিবচরণ দাসে প্রেম ভকতি পাশে

মুই কেনে না গেলু বান্ধা॥ ৩।

কবিতার সৌন্দর্য্য বুঝাইবার জিনিস নহে, বুঝিবার জিনিস। সেরূপ বুঝিবার ক্ষমতা যাঁহার আছে, তিনিই বলিবেন, এই গুলি ত কবিতা নয়—সুধা নিষ্যন্দিনী রত্ন কণিকা। এমন কবিত্ব ও ভাব সম্পদের অধিকারী না হইলে সাধ্য কি আজ প্রতীচ্য জগৎ বাঙ্গালী কবির কবিতায় এমন বিমুগ্ধ হইতে পারিত?

একটু বলিয়া রাখা ভাল, আমরা কবিতাগুলি পাইয়া বুকে করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু এই সুধা যাঁহারা আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কোন সন্ধান পাই নাই। এই সুধা হইতে যে আমরা বঞ্চিত হই নাই, ইহাই পরম সৌভাগ্য। আপাততঃ ইহাতেই সান্ত্বনা লাভ করা যাউক।

শ্রীআবদুল করিম।

পুরীর নক্সা।

বড় দাণ্ড বা বড় রাস্তা।

ক। অরুণ স্তম্ভ, ২২ হাত উচ্চ। খ। ছাউনি মঠ, দ্বিতলে। গ। ছাত্তা মঠ—দ্বিতলে। ঘ। বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ। ১। মূলমন্দিরে রত্ন বেদী। ২। লোকনাথ ও ৩। মদনমোহন (৺জগন্নাথ দেবের প্রধান প্রতিনিধি দ্বয়)। ৪।৫ জয় ও বিজয় দ্বারপালদ্বয়। ৬। গরুড়স্তম্ভ। ৭। রন্ধনশালা হইতে ভোগ বাহকদের আবৃত রাস্তা। ৮। সত্য নারায়ণ। ৯। রাধাকৃষ্ণ। ১০। অক্ষয় বট কল্প বৃক্ষ তন্নিম্নে বট বৃক্ষ ১১। সর্ব্বমঙ্গলা। ১২। মার্কণ্ডেয় শিব। ১৩। গণেশ। ১৪। ক্ষেত্রপাল। ১৫। মুক্তি মণ্ডপ বা ব্রহ্মাসন। ১৬। নৃসিংহ। ১৭। চন্দন মণ্ডপ। ১৮। রোহিণী কুণ্ড ও কাক। ১৯। বিমলাদেবী (বৎসরে একটি বলি, দুর্গাপূজার সময়) ২০। বেণীমাধব। ২১। বৃন্দাবন। ২২। কৃষ্ণ। ২৩। সিদ্ধি গণেশ। ২৪। কারারুদ্ধ একাদশী (পুরীতে একাদশীর উপবাস নাই)। ২৫। কৃষ্ণ। ২৬। সরস্বতী। ২৭। দক্ষিণেশ্বরী কালী। ২৮। লক্ষ্মীদেবী। ২৯। সূর্য্য নারায়ণ। ৩০। রাম লক্ষ্মণ। ৩১। চাহনি মণ্ডপ। ৩২। ভেট মণ্ডপ। ৩৩। শীতলা। ৩৪। ময়দার ঢেঁকি ঘর। ৩৫। গঙ্গা কূপ। ৩৬। যমুনা কূপ। ৩৭। ডাকঘর।

ক্ষেত্র কাহিনী।

(এই প্রবন্ধের পূর্ব্বাংশ সৌরভের ১ম বর্ষের শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। আবার রথযাত্রা আসিয়াছে। রাজা ও সম্পাদক উভয়ই সমান। "অস্তি নাস্তি ন জানাস্তি দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ"—তাঁহাদের ত্রাসে ত্বরান্বিত চিত্তে দপ্তর ঝাড়িয়া বাকী শেষ করিলাম। (লেখক)।

লক্ষ্মীদেবীর বিরহসঞ্জাত দুর্জ্জয় অভিমান ও পুনর্যাত্রার দিবস দম্পতি কলহ-রূপ বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়ার বিষয় পূর্ব্বে কীর্ত্তন করিয়াছি। তৎপরে শ্রীমতীর ইঙ্গিতে দেবদাসীগণ সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়াছে। এতদিন পর আমরাও পুনরায় মন্দিরে প্রবেশ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া ক্ষেত্র কাহিনীর উপসংহার করিতেছি।

পুরীর সমুদ্র স্নান।

সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া বহু প্রস্তর সোপান উল্লঙ্ঘন করিতে হয়। দেখিলাম, পাথরের উপর নামের আঁচর কাটিয়া বহু নর নারী অমর হইবার উৎকট বাঞ্ছা প্রকটিত করিয়াছেন। শ্রীমন্দিরের ভিতর প্রাঙ্গনে বামদিকে অক্ষয় বট। মার্কণ্ড মুনির সুদীর্ঘ পরমায়ুর প্রবাদ সকলেই অবগত আছেন। প্রলয়ের জলপ্লাবন কালে জীবিতাবশিষ্ট একমাত্র মার্কণ্ড ঠাকুর যখন সাঁতার কাটিয়া এই অক্ষয় বটের অগ্রশাখা ধরিয়া প্রাণের আশা করিতেছিলেন, তখন নির্দ্দয় শমনও তাঁহার অগ্রকেশ ধারণ করিয়া সে আশা ব্যর্থ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ মুনিঠাকুরকে স্বীয় বিশাল উদর মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া যমরাজকে প্রবঞ্চনা করিয়াছিলেন। রাখে কৃষ্ণ মারে কে? মারে কৃষ্ণ রাখে কে? পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার আশার মত আর আশা নাই। অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং তথাপি কেহ জীবনের আশা ভাণ্ড পরিত্যাগ করে না। বৃদ্ধ মার্কণ্ড শ্রীকৃষ্ণের নিকট অমর বর প্রাপ্ত হইয়া এক সরোবর নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাহার তীরে দেবালয় স্থাপন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ চিন্তায় তিনি অদ্যাপি জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। শ্রীমন্দিরের উত্তর পশ্চিম কোণ হইতে যে রাস্তা উত্তর দিকে গিয়াছে, সেই পথে মার্কণ্ডেয় সরোবরে যাইতে হয়। মার্কণ্ড মুনির পরমায়ুর ন্যায় উক্ত বটবৃক্ষও অক্ষয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অদ্যাপি এই তরুমূলে অবস্থান করিয়া ভক্ত বাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিতেছেন। এজন্য তাঁহার নাম বটকৃষ্ণ ও বৃক্ষের নাম বাঞ্ছাকল্পতরু। এস্থানে নানা দিক-দেশীয় স্ত্রীলোকের জনতা। শাখাচ্যুত পক্ক ফল মস্তকে কিম্বা অঞ্চলে পতিত হইলে মনস্কামনা সিদ্ধির ধ্রুব লক্ষণ। বাস্তবিক ইহার অপেক্ষা ফলপ্রাপ্তির প্রকৃতর লক্ষণ আর কি হইতে পারে? সুতরাং কত স্ত্রীলোক যে অক্ষয়বট তলে সমস্ত দিবস অঞ্চল পাতিয়া বসিয়া থাকিয়া ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিয়া থাকেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত উড়িয়া বালকবৃন্দ পাঠে অবহেলা করিয়া পরীক্ষার "পাশ" কামনায় অবিরাম কল্পতলায় কালকর্ত্তন করিয়া হাতে হাতে প্রতিফল পাইয়া থাকে, তাহারও সংখ্যা নাই!

তীর্থক্ষেত্রে পাদুকার ব্যবহার নাই। মন্দিরের ক্ষেত্রও প্রস্তর মণ্ডিত। সুতরাং নগ্নপদ-বিচরণে অনভ্যস্ত শিক্ষিত বাবুগণ যখন মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের কোপানল হইতে উদ্ধার মানসে উত্তপ্ত প্রস্তর উল্লম্ফন করিতে করিতে ত্বরিত পদে অক্ষয় বটের শরণ লইতে ধাবিত হন, তখন সে দৃশ্য পরম করুণ! বাবুদের অঞ্চল নাই, বটবৃক্ষের মেওয়ার প্রতিও লোভ নাই; চাই শুধু বটের চরণ ছায়া। বটের ন্যায় মহাবৃক্ষ হিন্দুদের বড় সেবার যোগ্য। নাই বা থাকিল ফল, "ছায়া কেন নিবার্য্যতে।" যেখানে জনতা সেইখানেই বট। তীর্থক্ষেত্র, বাজার, কাচারী প্রাঙ্গন ইত্যাদি। বট প্রায়ই অক্ষয়। শিবপুরের গার্ডেনে যে প্রকাণ্ড বৃক্ষ শাখা প্রশাখা, পৌত্র প্রপৌত্রাদি লইয়া বহু স্থান অধিকার পূর্ব্বক বিরাজ করিতেছে, তাহার বয়স

নির্ণয় হয় নাই। কেহ কেহ বলের উহার উপরে বসিয়া ভুষণ্ডি কাক পৌরাণিক দেবাসুর দর্শন করিয়াছিল। বটবৃক্ষের ইংরাজী নাম "বেনিয়ান ট্রি।" দোকানদার বেণেরা হাটে বাজারে বট গাছের তলায় বসিয়া জিনিস পত্র বিক্রয় করে; সাহেবেরা তাহা দেখিয়াই ঠাহর করিয়া লইয়াছেন এটা বেণিয়াদের গাছ। সেই জন্য ঐরূপ নামকরণ। সে যাহা হউক পুরীতে আসিয়া একজন নবীন ভাবুক কবিকে এই কল্পতরুমূলে বসিয়া কল্পনা সাধনা করিতে দেখিয়াছি। এই বটতলা-কবির কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে কিনা, তাহা জানি না।

অক্ষয়বট ত্যাগ করিয়া আমরা সম্মুখে মুক্তিমণ্ডপে উপস্থিত হইলাম। ইহা ক্ষেত্রপাল ও নরসিংহ দেবের মধ্যস্থিত একটী উচ্চ বেদী। অক্ষয়বট ও মুক্তি-মণ্ডপ তীর্থস্থানের অঙ্গ বলিয়াই বোধ হয়। প্রয়াগ এবং গয়াধামেও অক্ষয়বট বিদ্যমান; আবার বিশ্বেশ্বর মন্দিরেও দক্ষিণ পার্শ্বে মুক্তিমণ্ডপ বিরাজমান। কথিত আছে, জগন্নাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা সময় স্বয়ং ব্রহ্মা এই স্থানে উপবেশন করিয়া প্রতিষ্ঠা বিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া-ছিলেন। এজন্য ইহার অপর নাম ব্রহ্মাসন। অধুনা সর্ব্বলোক-পিতামহের গদি উত্তরাধিকার সূত্রে কেবল কয়েকজন স্থানীয় "ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত" দখল করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহারা বলেন তাঁহারা ব্যতীত আর কোনও পৌত্রেরই এস্থানে উপবেশন করিবার অধিকার নাই। একজন প্রবীণ উকীল লাগাইয়া একটা স্বত্বের মামলা করিয়া দেখিলে হয়।

শুনিতে পাই বঙ্গদেশে প্রায় প্রতিগ্রামেই নিষ্কর্ম্মা লোকদের একটা আড্ডা আছে, এবং তাহাকে বঙ্গভাষায় "মুক্তিমণ্ডপ" বলা যায়। পুরীর এই মূল মুক্তিমণ্ডপে উক্ত "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত" দের উপবেশন কার্য্য ব্যতীত প্রকৃত "ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত" দেরও একটি সভার অধি-বেশন কার্য্য হইয়া থাকে। এই পণ্ডিত সভা অনেক সৎকার্য্য করিতেছেন এবং শাস্ত্রালোচনায় ইঁহাদের বিশেষ অনুরাগ। যোগ্যপাত্রে উপাধি বিতরণও এক কার্য্য। বঙ্গ-দেশে ব্রাহ্মণরত্ন, কায়স্থরত্ন ইত্যাকার উপাধি বোধ হয় শীঘ্রই প্রচলিত হইবে। উড়িষ্যা দেশের উপাধিগুলি এখনও পুরাতন কলেবর ত্যাগ করিয়া নব নব দেহ ধারণ করে নাই। উপাধির নাম যথা, 'উত্তর-কবাট' অর্থাৎ রাজ্যের উত্তর দ্বারের রক্ষক। 'দক্ষিণ-কবাট' দক্ষিণদ্বারের প্রহরী। জগন্নাথ মন্দিরের পূর্ব্ব দ্বারের নাম সিংহদ্বার। উহা সর্ব্বপ্রধান দ্বার। সুতরাং পূর্ব্ব কবাট উচ্চতম সম্মান বোধক; এই উপাধিটি 'জি-সি-এস-আই' এর মত বিরল। একদা আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়া ছিলেন, আমার প্রতিবেশীরা অনেকেই "রাজা", আমাকে 'রাজা' করিয়া দিতে পার? আমি বলিলাম, তোমার বেশী টাকা পয়সা নাই, দান ধ্যান নাই, রাজা হবে কিসে? তিনি উত্তর করিলেন, আমি তা বলছি না; আমি বলছি কি যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ব্যাকরণের সাহায্যে এমন একটা নূতন উপাধি নির্ম্মাণ করিতে পারেন না যাতে রাজার মত একটা ঝঙ্কার বা আওয়াজ বহিয়া যায়, যাতে আমি 'রাজা' না হইয়াও রাজা বনিয়া যাই, কিম্বা
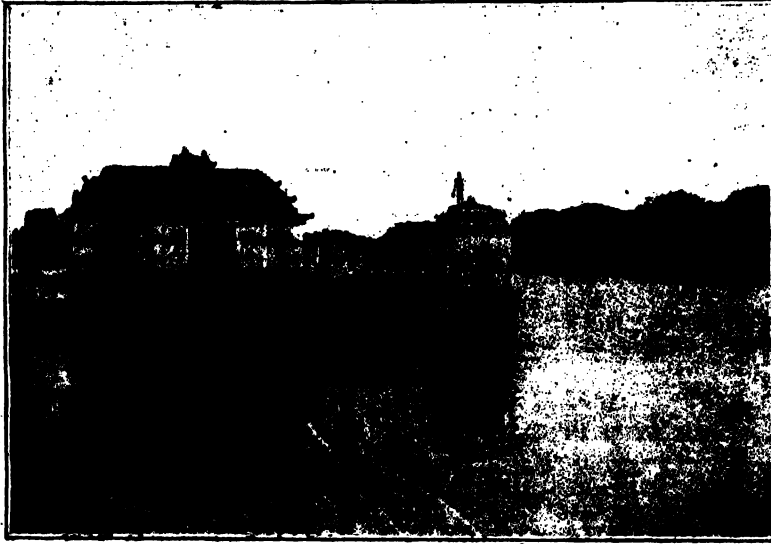
যাতে আমি রাজা হইয়াও রাজা বনিয়া না যাই? আমি বলিলাম, "তা হবে না রাজা উপাধি গবর্ণমেণ্ট দেন। তুমি এক কাজ কর। তোমার যেমন বিদ্যা বুদ্ধি নাই, সম্বলের মধ্যে শুধু এক দেব দ্বিজে ভক্তি। বিদ্যাভূষণ, ন্যায়রত্ন এগুলি মানাইবে না, তুমি ভক্তি চঞ্চু হও গে। তার জন্যে গাঁটের থেকে পাঁচসিকা খরচ করিতে হইবে।" সেই অবধি বন্ধুবর আশা স্বত আছেন।

মুক্তিমণ্ডপে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া আমরা রোহিণী-কুণ্ডে উপনীত হইলাম। ইহা একটী ক্ষুদ্র চৌবাচ্চা। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে স্নানযাত্রার সময় সর্ব্বাগ্রে রোহিণী-

প্রবেশ করিল। একটা পাখীর অধম পাপ জন্ম কাক, তারি জন্যে স্বর্গের দরজা দুই ফাক হইয়া গেল! এই দেখিয়া বিচারপতি ধর্ম্মরাজ (যম) অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। তখন অন্তর্য্যামী ভগবান পুরুষোত্তম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! তোমার ক্ষুব্ধ হইবার আবশ্যক নাই। এই জগন্নাথক্ষেত্রে দশ যোজনের ভিতর তোমার শাসন চলিবে না। এই তীর্থের মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের প্রতি তোমার অধিকার রহিল না।" হায়! তদবধি পৃথিবীর ধর্ম্ম-রাজ্য ক্রমশঃ খাস হইয়াছে ও হইতেছে।

শ্রীমন্দির—শ্রীক্ষেত্র।

কুণ্ডের জল দ্বারা জগন্নাথ দেবের স্নান সম্পন্ন হয়। প্রলয়কালে সমুদ্রের জল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া রোহিণী-কুণ্ডে বিলীন হইয়াছিল। একদা এক কাক স্নান করিতে আসিয়া ইহার পবিত্র জলে পক্ষের আঘাত করিয়াছিল। যেই পক্ষাঘাত করিয়া শরীরে জলের একটু ছিটা পাওয়া আর তৎক্ষণাৎ হীনজন্ম কাক শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুতুল্য দেব দেহ ধারণ পূর্ব্বক আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া একেবারে বৈকুণ্ঠলোকে

কুণ্ডের ভিতর প্রস্তরময় কাকমূর্ত্তি আছে। যাত্রীগণ উহা হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া ললাট স্পর্শ করেন। ললাটে লেখা থাকিলে বৈকুণ্ঠ বাস হবেই হবে। প্রণামের পর "প্রণামী" রাখিতে হয়। পাণ্ডা নন্দন ঘর হইতে হরেক রকম কতকগুলি রৌপ্যমুদ্রা আনিয়া কুণ্ডের জলের ভিতর সাজাইয়া রাখে। তাহা দেখিয়া যাত্রীদের বুঝিতে হইবে এখানে পয়সার কর্ম্ম নয় টাকা কিম্বা আধুলি চাই। কিম্বা তৃতীয় শ্রেণীর বৈকুণ্ঠ যাত্রীর পক্ষে অন্ততঃ একটা

সিকি গাঁট হইতে ছাড়িতেই হইবে। বৈকুণ্ঠদ্বারের টিকেট নেহাৎ সস্তা নয়! কেহ একটি পয়সা ফেলিলে, পাণ্ডার পো তখনই তাহা তুলিয়া অন্যত্র লুকাইয়া রাখে।

অতঃপর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে বিমলাদেবীর মন্দির। মন্দিরের বারান্দায় উপবিষ্ট পুরোহিতগণ আমাদিগকে দূর হইতেই হস্তসঙ্কেতে সাদরে আহ্বান করিতে লাগিল। তাঁহাদের ভয় পাছে আমরা উক্ত মন্দিরে মস্তকঘর্ষণ না করিয়াই অন্য দিকে অগ্রসর হই। কলিকাতার বাজারেও দোকানদারেরা পান্থদের প্রতি ঐরূপ সাদর আহ্বান করিয়া সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মূলমন্দিরের চতুঃপার্শ্বে বহু দেবদেবী ঘর তুলিয়া অবস্থান করিতেছেন। বেণীমাধব, বৃন্দাবন, সিদ্ধিগণেশ, সরস্বতী, সূর্য্যনারায়ণ রামলক্ষ্মণ, শীতলা প্রভৃতি অসংখ্য দেবতাদের দ্বারা এই আনন্দ নিকেতন অষ্টপ্রহর মুখরিত। আমাদের দেশে বড়লোকের গৃহে এইরূপই মাসী, পিশি, দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজনদের উপনিবেশ স্থাপন হইয়া থাকে। গোবিন্দপুরের জমিদার নগেন্দ্রনাথ দত্ত ও সূর্য্যমুখীর আবাসভবন এইপ্রকার আনন্দ কোলাহলে পরিপূর্ণ ছিল। সাহেবদের রাজ অট্টালিকাগুলি একটি বিশাল নিস্তব্ধতার রাজ্য বলিয়াই বোধ হয়। বাহির হইতে ভিতরে জনপ্রাণী আছে বলিয়া বোধ হয় না। এখানে মাসী পিশি এবং ডাক হাঁক নাই। রান্নাঘর প্রায় এক মাইল দূরে। চাকর বাকর নীরব ধীর পাদবিক্ষেপে বিচরণ করে।

এখানে সর্ব্বদেবতাই বিরাজমান। যাঁহারা শৈব তাঁহাদের জন্য শিব আছেন; যাঁহারা শাক্ত তাঁহাদের জন্যই এই বিষ্ণুমন্দিরে বিমলাদেবীর আবির্ভাব। সুতরাং আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, এই স্থানে সংবৎসরে দুর্গোৎসবের নবমীপূজার দিবস একটি ছাগ বলিদান করা হয়। সেদিন মূল মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকে এবং সমস্ত দেবালয় বিশুদ্ধ গোময় জলে প্রক্ষালিত করার পর পরদিবস প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ পুনরায় আরব্ধ হয়। প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যাইতে পারে যে চৈতন্যদেবের কৃপায় উড়িষ্যাদেশ হইতে হিংসাপ্রবৃত্তি একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। এদেশে নবাগত বাবুদের আহারে অরুচি হইলে চামারদের শরণাপন্ন হইতে হইবে, অন্য কেহ পাঁটা কাটিবে না। কিন্তু হায়, এভাব বুঝি আর থাকে না! রেল হওয়ার পর পুরীর নাম জাকিয়া উঠিয়াছে। এখন অহরহ কলিকাতা হইতে হাওয়া খোরের আমদানি। ইহাদের কেবল হাওয়াতে পেট ভরে না, সুতরাং মিউনিসিপালিটি ইহাদের জন্য একটা ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আমাদের সহযাত্রী—বাবুর মাংসভক্ষণের প্রবৃত্তি ছিল। বলিতে লজ্জা বোধ হইতেছে বৃষমাংসেও ইঁহার আপত্তি নাই। পাচক ব্রাহ্মণকে এদেশে "পূজারী" বলে। বাবুর পূজারী বলিল মর্কট-বাজারে উক্ত বিপণি আছে। নামটি বেশ—"মর্কট-বাজার"। এদেশে মর্কটের প্রাধান্য, তাহারা বৃক্ষের ফল ও ক্ষেত্রের শস্যাদির স্বত্বলইয়া গৃহস্থদের সঙ্গে সতত বিরোধ উত্থাপন করিয়া থাকে। ভাবিলাম কাশীর monkey temble এর ন্যায় পুরীর মর্কট-বাজারের ঐরূপ নামকরণ। কিন্তু ভ্রম দূর হইয়াছে! মিউনিসিপালিটি দয়া করিয়া বড়দাণ্ডের (বড়-সড়ক) পার্শ্বে এক বাজার স্থাপন করিয়াছেন, উহার নাম market ইহাকেই লোকে "মর্কট-বাজার" বলে!

বিমলা মন্দিরে প্রণামী রাখিয়া আমরা উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। ডাহিনে মূলমন্দিরের নিম্নে একটী অতিক্ষুদ্র স্থানে কারারুদ্ধ একাদশী ঠাকুরাণীকে দেখিলাম। পুরীতে একাদশীর উপবাস না করিলে সাজা নাই। একাদশী ঠাকুরাণী আর কি করিতে পারেন, তিনি নিজেই কারারুদ্ধা।

একদল যুবক অপেরা গ্লাসের সাহায্যে ঊর্দ্ধমুখী হইয়া মন্দির গাত্রের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিল। আমরা ইহাদের হইতে তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া পরমানন্দ সহকারে "আনন্দ-বাজারে" প্রবেশ করিলাম। তখন আমাদের পাষাণ হৃদয়েও কিরূপ সরস ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা বলিবার নয়। এইস্থানে সামান্য পয়সার বিনিময়ে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই পরম পবিত্র ক্ষেত্রে আর জাতিভেদ নাই, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল একত্র একপাত্রে অন্নাহার করিতেছে! ইহা হইতে সার্ব্বজনীন উচ্চতর প্রেম আর কি হইতে পারে? হে বঙ্গের কূপ-বিহারী গ্রাম্যভেকগণ, সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রে

নিষিদ্ধ বটে, তবু রেলে চড়িয়া একবার সমুদ্রতীরে গিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের চরণধূলা লইয়া আইস, মন প্রফুল্ল হইবে, সঙ্কীর্ণতা চলিয়া যাইবে, দলাদলি কলহ দূর হইবে এবং গ্রামে গ্রামে পুনরায় সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হইবে।

স্নানবেদীর পশ্চিমে প্রশস্ত উন্মুক্ত ক্ষেত্রে আনন্দ বাজার অবস্থিত। ছায়ার স্থান না থাকায় পূর্ব্বে দুপ্রহর সময় যাত্রীদের বড় কষ্ট হইত। ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার বাবু রাজকিশোর দাস ১৩১৮ সনে মহাপ্রসাদ ক্ষেত্রে একটী টাইলের ছাদ বিশিষ্ট গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দির-তহবিল হইতে দৈনিক ভোগ দেওয়া হয়, এবং প্রত্যহ এই ভোগ কনট্রাকটারদের নিকট বিক্রয় করা হয়। কনট্রাক্টার নিজ ইচ্ছামত মূল্যে যাত্রীদের কাছে আনন্দবাজারে মহাপ্রসাদ বিক্রয় করেন। প্রসাদ ছোট, বড়, মাঝারি—হরেক রকম হাঁড়ি, সালসা ও ভাঁড়ে বিক্রয় হয়। যাত্রীরা হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া আহার করেন, অন্য পাত্র ব্যবহার করেন না। এইরূপে বহু ভাঙ্গা হাঁড়ি আনন্দ বাজারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। কনট্রাক্টারদের লোক সেই উচ্ছিষ্ট ও পরিত্যক্ত ভগ্নাংশগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখে এবং যাত্রীদের নিকট তাহাই ভোজন পাত্র রূপে ব্যবহৃত হয়। ভক্তির নিকট ঘৃণা নাই। কিন্তু স্বাস্থ্য-রক্ষার হিসাবে এই প্রথা অতি দূষণীয়। নূতন ম্যানেজার সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত রায় সাহেব গৌরশ্যাম মহান্তি মহাশয়কে এবিষয়ে বলিয়াছিলাম। তিনি এদিকে দৃষ্টি করিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

পুরীর রাজা শ্রীজগন্নাথদেবের সর্ব্বপ্রধান সেবক এবং মন্দিরের অধিকারী। সর্ব্বপ্রথমে রাজার দত্ত রাজভোগ ও পরে সাধারণ ভোগ নিবেদন করা হয়। পুরীরাজের পূর্ব্ব পুরুষগণ গঙ্গাবংশীয় স্বাধীন নরপতি ছিলেন। কিছু পূর্ব্বে ইঁহাদের খুর্দায় রাজধানী ছিল। ১৮০৩ সনে ইংরাজ উড়িষ্যা অধিকার করেন। তদবধি ইঁহারা পুরী সহরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এ বংশের বর্ত্তমান রাজার নাম শ্রীমুকুন্দদেব। ইনি গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ২,৩৩৩৲ পলিটিকাল পেন্সন ভোগ করিতেছেন। মন্দিরের অনতিদূরে বড় রাস্তার পূর্ব্বধারে ইঁহার বাড়ী। বাড়ীর তেমন বাহ্য শোভা নাই। রাজা এখন গৃহস্থ মানুষ, সুতরাং গৃহের ভিতরেই দিবানিশ অবস্থিতি করেন, বহির্গমন করেন না। কোন দরবারেও শুভ গমন নাই। শ্রীমন্দিরের কার্য্যের সুশৃঙ্খল পরিচালনার জন্য সদাশয় গবর্ণমেণ্ট কএক বৎসর যাবৎ জনৈক ডেপুটী কালেক্টার নিযুক্ত করিয়াছেন। জনসাধারণ ইহাতে পরিতুষ্ট। রেল হওয়ার পর এরূপ ব্যবস্থা অনিবার্য্য। মন্দিরের ম্যানেজার পুরীরাজের নিকট হিসাব নিকাশ দিতে বাধ্য কিম্বা নিযুক্তিদাতা গবর্ণমেণ্টের নিকটই তিনি দায়ী তৎসম্বন্ধে একটা মামলা চলিতেছে, শুনিয়া আসিয়াছি। কটকের সবজজ রাজার আবেদন নামঞ্জুর করিয়াছেন। তৎপর হাইকোর্ট কি বলিয়াছেন, জানি না। বড় দাণ্ডের অপর পার্শ্বে দোলমণ্ডপের নিকট দ্বিতল গৃহে টেম্পল ম্যানেজারের আফিস। মন্দিরের জন্য আলাহিদা থানাও আছে। নাম টেম্পল-পোলিস। পাহাৰাওয়ালাদের পাগড়ি ও চোখ দুই-ই লাল, কিন্তু সকলেই হিন্দু।

উড়িষ্যা দেশে পুরীরাজের সম্মানসূচক একটী স্বতন্ত্র অব্দ প্রচলিত আছে। উহার নাম অঙ্ক। (*N. B.* উচ্চারণ অংক, হসন্ত। ওড়িয়াগণ শব্দের সাধারণতঃ অকারান্ত উচ্চারণ করেন, যথা, ফল (ফল্ অ) ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের শেষে যুক্তাক্ষর থাকিলে আমাদের উল্টা উচ্চারণ করেন। যথা প্রসন্ন (প্রসন্) মিশ্র (মিশর)। আমরাও এখন মিত্র না বলিয়া মিত্তির বলি)। বর্ত্তমান অঙ্ক ৪১। শ্রীমুকুন্দদেব ৪১ বৎসর যাবৎ গদিতে প্রতিষ্ঠিত আছেন ইহা বুঝিলে ভুল হইবে। কারণ ০ এবং ৬ সংখ্যা বাদ দিতে হয়। এ দুটী অশুভকর। ৫এর পর ৭ এবং ৯ এর পর ১১ ইত্যাদি। আমাদের দেশে মহাজনেরাও অঙ্কের পিঠে শূন্য ভাল বাসেন না। ১০০৲ স্থলে ১০১৲ আদায় করিতে পারিলেই শুভঙ্কর।

পুরীতে বহু মঠ আছে। মঠের মোহান্তগণ চির-কুমার। ভূসম্পত্তি হইতে অনেকের লক্ষাধিক আয়। বিষয় ভোগ বাসনা ইঁহাদের শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। কোন কোন মোহান্ত মহারাজ সময় অপব্যয়ের বিরোধী, একজই বোধ হয় "মোটর কারে" আরোহণ করিয়া যাতায়াত কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। পুরীসহরে মোহান্তগণই সর্ব্বে-

সর্ব্বা, পুরীরাজের অস্তিত্ব সাধারণে জানিতে পারে না। কয়েকটী মঠের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(১) রাধাকান্ত মঠ—শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলে আগমন করিয়া এই স্থানে অবাস্থিতি করিতেন। এখনও তাঁহার কাঁথা ও কমণ্ডলু সযত্নে রক্ষিত আছে। বালেশ্বর জেলার ভদ্রক সহরে শান্তিয়া নামক পল্লীতে শ্রীচৈতন্য একদিন রাত্রিবাস করিয়াছিলেন। সেখানে গৃহস্বামী গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ীতেও আমরা মহাপ্রভুর ব্যবহৃত জীর্ণ কাঁথা সন্দর্শন করিয়াছি। (২) শ্রীশঙ্করানন্দ মঠ—বর্ত্তমান মোহান্ত শ্রীসচ্চিদানন্দ সরস্বতী। (৩) রাঘবদাস মঠ—শ্রীজগন্নাথ রামানুজ দাস। ময়মনসিংহ জেলার উত্তর পূর্ব্বাংশে ইঁহার জমিদারী আছে। (৪) উত্তর পার্শ্ব মঠ। (৫) দক্ষিণ পার্শ্ব মঠ। (৬) সিদ্ধ বকুল মঠ। (৭) রাজ গোপাল বা এমার মঠ ইত্যাদি। মোহান্তগণ অনেক সৎকার্য্যে দান ধ্যান করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করেন; এজন্য উচ্চ রাজপুরুষদের সঙ্গে ইঁহাদের সদ্ভাব আছে।

মোহান্ত মহারাজদের পর পুরীর পাণ্ডাদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। পাণ্ডা শব্দের ওড়িয়া বানান পণ্ডা। মূলে পণ্ডিত শব্দের সঙ্গে ঐক্য আছে। পণ্ডিতদের ন্যায় জ্ঞানবল না থাকিলেও ইঁহাদের অনেকেই ধনবলে বলীয়ান। ইঁহাদের অর্দ্ধ মুণ্ডিত মস্তক এবং অভ্যঙ্গ মর্দ্দিত হৃষ্ট কলেবর দেখিতে অতি মনোহর। অনেকেই গৌরবর্ণ সুপুরুষ। স্বয়ং কমলাদেবী বোধ হয় ইঁহাদের রূপেই মুগ্ধা হইয়াছেন। গয়ার পাণ্ডাদের সঙ্গেও সরস্বতীর বিবাদ, এজন্য কমলাদেবী তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মী। অল্পদিন হইল গয়াধামে গমন করিয়াছিলাম। জনৈক পাণ্ডা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বাবুজী আমার গোমাষ্টারের (গোমস্তা) কাছে পুছ করুন আমার পিতামহের কয়টা হস্থি (হস্তি) ছিল।" তাহা শুনিয়া আমর কবি বচন মনে হইল, কিন্তু তুষ্ট থাকিলে ইষ্টই হয়, আর তিনি রুষ্ট থাকিলে কি অনিষ্ট না হইতে পারে!

"উষ্ট্রে, লুম্পতি রং বা ষং বা
তস্মৈ প্রদত্তা নিবিড় নিতম্বা॥"

মহাকবি কালিদাস পূর্ব্বে হস্তীমূর্খ ছিলেন। তিনি জাল পণ্ডিত সাজিয়া কালীদেবী নাম্নী জনৈকা অসামান্য-রূপ লাবণ্য সম্পন্না বিদুষী রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুভরাত্রিতে একটা উট ডাকিয়া উঠিয়াছিল। কালীদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন নাথ! ও কি ডাকিতেছে? কালিদাস বলিলেন, উট্র। জিহ্বার জড়তা জন্য পূর্ণ উচ্চারণ হইল না। স্ত্রী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলিলে! এবার কালিদাস বলিলেন "উষ্ট"। তখন স্বামীর মূর্খতা দেখিয়া রূপাভিমানিনী কালীদেবী অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং উল্লিখিত শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছিলেন। বোধহয় কালীদেবী divorce করার পর বাক্‌দেবী কালিদাসের প্রতি অনুকম্পা করিয়াছিলেন। শুনিতেছি, হোমারের জন্মস্থানের ন্যায় কবি কালিদাসের জন্মস্থান নির্ণয় উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য মহলে সংপ্রতি একটা হৈ চৈ ও বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে। কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি জানাইয়াছেন ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ কালিপুর গ্রামে কালিদাস তাঁহার প্রথমা স্ত্রী কালীদেবীর সঙ্গে বসবাস করিয়াছিলেন, পরে কালীপুর ত্যাগ করেন। বলা বাহুল্য কালীপুর নামটীও নাকি কবি দম্পতির স্মৃতিই বহন করিতেছে। তৎপর তিনি বর্দ্ধমানের অন্তর্গত ইতিহাস প্রসিদ্ধ উজানি গ্রামে (বর্ত্তমান নাম মঙ্গল কোট) রাজা বিক্রমকেশরীর সভায় আগমন করিয়াছিলেন। এ সব কথা কতদূর সত্য তাহার বিশেষ আলোচনা আবশ্যক।

গত ১৩১৯ সনে শ্রীমন্দিরের আয়ব্যয়ের হিসাব পাঠকদিগকে উপহার দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

আয়

গত বৎসরের তহবিলে উদ্বৃত্ত	৪৯,৭১৯৲
ভূসম্পত্তির আয়	৬৩,৬৫৮৲
মন্দিরে গৃহীত	২৮০২০৲
যাত্রীদের নিকট হইতে	৫৮৫৭৮৲
বিবিধ	৬৮১৬৲
অগ্রিম আয়	৭৫০২৲
মোট	২১৪,২৮৩৲

ব্যয়

দৈনিক পূজায় ব্যয়	১১৫,৫২৭৲
কর্ম্মচারীর বেতন	৩০,১২২৲
গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য এবং আইন খরচ	২০,০২১৲
পুরীরাজের প্রাপ্য	৪,৫১৩৲
বিবিধ ব্যয়	১৬,৯৪৩৲
ডিপজিট প্রদান ও অগ্রিম ব্যয়	১১০৯২৲
মোট ব্যয়	১,৯৮,২১৮৲
উদ্বৃত্ত জমা	১৬০৬৫৲
	২,১৪,২৮৩৲

১৩১৯ সনে পূজায় ব্যয় বেশী হইয়াছে। তাহার কারণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নব-কলেবর। অন্যান্য বৎসর পূজার ব্যয় সত্তর কি পচাত্তর হাজার টাকায় সম্পন্ন হয়। নবকলেবরে—২৫০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে, এবং "গুণ্ডিচা বাড়ীর" সংস্কার কার্য্যে—২০,০০০৲ টাকা খরচ হইয়াছে। গতবৎসর বৈকুণ্ঠ ভবনের সংস্কার কার্য্য দেখিয়া আসিয়াছি।

শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়।

শুভ-দৃষ্টি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(৪)

কার্ত্তিক মাসে ঢাকায় নামিয়া আসিলাম।

চণ্ডী বাবুর একটী মোহরেরকে দুরে একখানা বাড়ী দেখিতে বলিলাম। চণ্ডী বাবু ও তাহার গৃহিণী অত্যন্ত প্রতিবাদ করিলেন। আমি নিতান্তই অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া শুভ দিনে শ্বশুর বাড়ী হইতে নুতন বাসায় আসিলাম। পঁচা ও তাহার সমপাঠী রাখালকে শৈবাল আদর করিয়া সঙ্গে লইল।

শিলংএর ঘটনার পর শৈবালের একটু অভিমান দেখা দিয়াছিল। সে আর কোথাও যাইতে চাহিত না, কাহারও সঙ্গে কথা কহিত না। এমন কি, আমার সহিতও প্রাণ খুলিয়া কথা কহিত না।

এক দিন প্রাতে বসিয়া পঁচা ও রাখালকে পড়াইতে-ছিলাম, শৈবাল রাখালকে ডাকিয়া লইয়া গেল। আমি যেন দেখিলাম, শৈবাল একখানা কাগজ রাখালের হাতে দিয়া কি বলিল, রাখাল কাগজ খানা পকেটে রাখিয়া চলিয়া গেল। সংসারের কোন কিছুই আমি ইতঃপূর্ব্বে লক্ষ্য করিতাম না। কিন্তু এখন সকল খুটীনাটীর প্রতিই লক্ষ্য করি। শৈবালও আমার এই সন্দেহ ভাব লক্ষ্য করিত, তাই উভয়ের মধ্যে যেন ক্রমে একটী বিশাল ব্যবধান সৃষ্টি হইতে লাগিল। ভগবান জানেন ইহার জন্য কে দায়ী—আমি না শৈবাল?

এ কার্য্যেও শৈবাল আমার ব্যবহার লক্ষ্য করিল, আমি শৈবালকে লক্ষ্য করিলাম। আমার দোষ কাটা-ইবার জন্য ছুতা ধরিয়া শৈবালকে বলিলাম—"তুমি বড় স্বার্থপর, রোজ রাখালের পড়া নষ্ট কর।" কেন পঁচাকে দিয়া কাজ করাতে পার না কি?

শৈবাল বলিল—"তারও একটা কৈফিয়ত দিতে হ'বে নাকি?"

আমি—"সে তোমার ইচ্ছা।"

শৈবাল—আমি রাখালকে পঁচা অপেক্ষা অধিক ভালবাসি, রাখালের কার্য্যে আমার বিশ্বাস আছে; পঁচার কাজে অনুমাত্রও বিশ্বাস করি না।"

আমি—"ঐ আগেরটী মিথ্যা পাছেরটী সত্য।"

শৈবাল দুঃখিত হইয়া বলিল—"আপনি আমাকে সর্ব্বদাই এরূপ কষ্ট দেন। আমি কখনও মিথ্যা কইতে শিখি নাই। আপনি "মিথ্যা" ও "সন্দেহ" এই দুইটী জিনিস আমার চিন্তার ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিতেছেন।"

আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম "ক্ষমা কর। নিজের মার পেটের ভাই অপেক্ষা পরের ছেলেকে যে কেহ অধিক ভালবাসিতে পারে, তাহা আমি জানি না, শুনিও নাই।"

শৈবাল—"স্নেহের ভিত্তি চরিত্রের উপর, গুণের উপর। তাহা যে স্নেহ করিতে জানে, সে বুঝে।"

বাস্তবিক এই শিশুর চরিত্র ও গুণে আমি এই কয় দিনেই এত মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে আমি শৈবালের কথার সমর্থন করিতে বাধ্য হইলাম।

রাখাল ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই আমি আফিসে চলিয়া গেলাম। বিকালে আফিস হইতে আসিয়া

বালকের অনুসন্ধান করিলাম। তখনও রাখাল বা পঁচা কাহাকেও পাইলাম না। আমার চিন্তা হইল—"রাখাল চিঠি লইয়া গেল কোথায় ?

শৈবালকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"রাখাল পঁচা এরা সব গেছে কোথায় ?"

শৈবাল বলিল—"বোধ হয় নদীর ধারে গেছে।"

আমি বলিলাম—শৈবাল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—রাখাল প্রাতে গেছিল কোথায় ?"

শৈবাল ভগ্নকণ্ঠে বলিল—"আপনার মনে কি সন্দেহ হয় ?"

আমি বলিলাম—"জিজ্ঞাসা করিলে দোষ আছে কি ?"

শৈবাল—"তবে আমি না বলিলে কোন দোষ আছে কি ?"

আমি বলিলাম—"সে তোমার ইচ্ছা।"

শৈবাল দৃঢ় মনে বলিল—"তবে আমি বলিতে চাই না।"

আমি শৈবালের নিকট এই অপ্রত্যাশিত উত্তর পাইয়া নিজকে বড়ই অপমানিত মনে করিলাম। ইহার অবশ্যই প্রতিকার করিতে হইবে বলিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলাম। এখন রাখাল আসিলেই হয়।

আমি ছাদে বেড়াইতেছি। নীচে রাখালের শব্দ শুনিলাম। আমি রাখালকে ডাকিলাম, শিশু নাচিতে নাচিতে ছাদে উঠিয়া আমার সম্মুখীন হইল।

আমি বলিলাম—"রাখাল আজ প্রাতে চিঠি নিয়ে কাকে দিলে ?"

রাখাল কহিল—"কার চিঠি ?"

আমি বলিলাম—"তোমার দিদির।"

রাখাল চুপ করিয়া রহিল।

আমি বলিলাম—"যদি মিথ্যা কথা বল, তবে এই বেত দিয়ে মারব।"

রাখাল ভয়ে কাঁদিতে লাগিল।

আমি—"আচ্ছা, তোমার দিদি তোমায় কোথায় পাঠাইয়াছিল ?"

রাখাল—"বলিব না, দিদি মানা করিয়াছেন।"

আমি বেত দেখাইয়া বলিলাম—"না বলিলে তোমাকে মারিব।"

রাখাল মাটীর দিকে চাহিয়া বলিল—"দিদি মানা করিয়াছেন।" রাগে আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। জীবনের সমস্ত ক্রোধ যেন পুঞ্জীভূত হইয়া এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমি তাহার ক্ষুদ্র পকেট হইতে টানিয়া চিঠি বাহির করিয়া লইলাম। এবং বলিতে কষ্ট হয়—সেই দুধের শিশুকে নিতান্ত নির্দ্দয়ভাবে বেত্রাঘাত করিলাম। বালক চীৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। রাখালের কান্না শুনিয়া নীচ হইতে শৈবাল দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে কোলে

"শিশুকে কোলে নিয়া নামিয়া গেল।"

লইল। আমি ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া শৈবালের পৃষ্ঠে ক্রোধের উপসংহার করিলাম। শৈবাল নীরবে পৃষ্ঠ পাতিয়া বেত্রাঘাত সহ্য করিতে করিতে শিশুকে কোলে নিয়া নামিয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি প্রকৃতস্থ হইলাম। দারুণ অনুশোচনায় আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মনে মনে ভগবানকে ডাকিলাম—"ভগবান তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

এই দারুণ লজ্জাকর অভিনয়ের পরও আমার খেয়াল কমিলনা। Office room এ যাইয়া কপাট বন্ধ করিলাম, তারপর রাখালের পকেটে প্রাপ্ত চিঠি পাঠ করিতে লাগিলাম। চিঠি পাঠ করিতে করিতে আমার চক্ষে অনবরত জল ধারা বহিতে লাগিল।

আমি চিৎকার করিয়া বলিলাম—"হায় হায় ভগবান এ কি সত্য? তুমি মঙ্গলময় তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

যুগপৎ আমার সমস্ত অতীত জীবনের কাহিনী নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। আমি টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া কান্দিতে লাগিলাম। হায়, সরলা তুমি এখন কোথায়? আমি কাঞ্চনের পরিবর্ত্তে আজ কাঁচ খণ্ড লইয়া ব্যস্ত; রত্ন ফেলিয়া মৃৎখণ্ডের উপাসক। ভগবান্ বল দাও। রাখাল বাবা তোকে আজ কসাইর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। ননীর পুতুল হায়, হায়। একের পাপে অন্যের দণ্ড, আমি কি পাষণ্ড। আমি অনবরত কাঁদিতে লাগিলাম—অনন্ত বৃশ্চিক দংশনে যেন আমার প্রাণ ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইতে লাগিল।

"কোথায় রাখাল।" আমি দ্বার খুলিয়া রাখালের নিকট গেলাম। ছেলেটা শৈবালের কোলে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। আমি শৈবালের বক্ষ হইতে রাখালকে টানিয়া নিজ কোলে লইলাম। দেখিলাম বালক তখনও চক্ষু মেলিতেছে না। আমি শৈবালকে বলিলাম দেখিতেছ কি, জল আন—শীঘ্র জল আন! শৈবাল দৌড়িয়া জল আনিল। মাথায় জল দিতে দিতে রাখাল চাহিল। আমার মুখের দিকে চাহিয়াই—"দিদি" বলিয়া চিৎকার করিয়া পুনরায় অজ্ঞান হইয়া পড়িল। শৈবাল আমার কোল হইতে তাহাকে তুলিয়া লইল; আমি বাতাস করিতে লাগিলাম।

শৈবাল কান্দিতে কান্দিতে বলিল—"ডাক্তার ডাকুন সিগ্‌গির। চাকরকে ডাক্তারের জন্য প্রেরণ করিয়া, আমি বসিয়া দারুণ মনস্তাপে স্ত্রীলোকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলাম।

ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিল—"অতি সাবধানে থাকিতে হইবে, Heart fail করিতে পারে।

রাত্র ১২ টার সময় জ্বর দেখা গেল। শৈবাল রাখালকে বুকে লইয়া রহিল আমি এক দৃষ্টে মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। কাহারও চ'খে ঘুম নাই।

রাত্রে শিশু প্রলাপ বকিতে লাগিল। "দিদি ধর ধর।" "আমাকে মারিবেননা।" "দিদি মানা করিয়াছে" "মা দেখ" "দেখলেনা।" "শৈবাল প্রভৃতি কথায়" বাট্ বাট্ "দাদা এই যে আমি" "কালই তোমার মা আসবেন" "কাহার সাধ্য তোমাকে মারে" ইত্যাদি বলিতে লাগিল। আমি প্রাণের বেদনায়, বিবেকের তাড়নায়, গত জীবনের কাহিনী স্মরণ করিয়া কেবল অশ্রুপাত করিতে লাগিলাম। ডাক্তার বলিলেন—জ্বরটা অধিক হইয়াছে, যাই হউক তাতে চিন্তার বিষয় কিছুই নাই।

শৈবালকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'রাখালের মাতাকে কেমন করিয়া আনিবে, কোথায় তিনি? শৈবাল বলিল "আমাদের মোহরের মাধব দাদা জানেন। তিনিই রাখালকে আমাদের বাড়ীতে স্থান করিয়া দিয়াছিলেন।"

আমি বলিলাম—"তাঁহাকে কালই আনাইবার বন্দোবস্ত কর।"

শৈবালের উদ্‌যোগে পর দিন ৯টার গাড়িতে মাধব রায় মহাশয় চলিয়া গেলেন। সেদিন আর শৈবালের সহিত আমার কোন বাক্যালাপ হইল না। অথচ উভয়ই এক বিছানায় রাখালের পার্শ্বে বসিয়া রহিলাম।

ক্রমশঃ।

ভারতীয় আর্য্যগণের শিষ্টাচার পদ্ধতি

আর্য্য সমাজে যত প্রকার শিষ্টাচার আছে, নমস্কার প্রথা তন্মধ্যে প্রধান। নমস্কার যে কেবল শিষ্টাচার সূচক, তাহা নহে; ভক্তি ও শ্রদ্ধার পরিচায়ক এবং ঐহিক পারলৌকিক মঙ্গল দায়ক। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুজন এবং আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সমস্ত ব্যক্তিকে নমস্কার করা শিষ্টতা ও সভ্যতা অনুমোদিত এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধাতিশয্য হেতুক। সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির মধ্যে শিষ্টাচার সূচক

অভিবাদন প্রথা কোন না কোন প্রকারে প্রচলিত আছে; কিন্তু শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশক সম্মান জ্ঞাপক নমস্কার প্রথা আর কোন দেশে ও সমাজে নাই। আদিম কাল হইতে নমস্কার প্রথা হিন্দু সমাজে প্রচলিত হইয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। দুঃখের বিষয়, অনুকরণের অপরিহার্য্য অনুরোধে বর্ত্তমান বঙ্গ সমাজেও নমস্কারের অন্তর্জ্জলি হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

দেব মূর্ত্তি দর্শনে ভক্তি ভাবে প্রণাম করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন এবং ব্রাহ্মণ ও আপনাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ বিদ্যা বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে নমস্কার করিলে—যেমন তাঁহাদের সম্মান রক্ষা হয়, তেমনই নিজেরও আয়ু, যশ, ধন সুখাদি বৃদ্ধি এবং অশেষ মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। নমস্যকে নমস্কার না করিলে যে দোষ হয়, তাহা শাস্ত্রে উক্ত আছে। যথা ;—

"দেবং বিপ্রং গুরুং দৃষ্টা ন নমেদ্‌যস্ত সম্ভ্রমাৎ।
সকাল সূত্রংব্রজতি যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ॥
ব্রাহ্মণঞ্চ গুরুংদৃষ্টা ন নমেদ্‌যোনরাধমঃ।
যাবজ্জীবন পর্য্যন্তমশুচির্যবনোভবেৎ॥

অর্থাৎ দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু দেখিয়া সম্ভ্রমের সহিত নমস্কার না করিবে, যতদিন চন্দ্র সূর্য্য উদয় হইবে ততদিন কালসূত্র নামক নরকে বাস করিতে হইবে। তার ইহ জীবনে আমরণ পর্য্যন্ত অশুচি যবন সদৃশ হইবে।

নমস্কার কয় প্রকার এবং কোন কোন স্থানে কিরূপ অবস্থায় নমস্কার করিতে নাই, প্রাচীন শাস্ত্র কর্ত্তারা তাহাঁ বিশদরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। নমস্কার তিন প্রকার ; কায়িক, বাচিক ও মানসিক। যথা :—

"কায়িকো বাগ্‌ভবশ্চৈব মানস স্ত্রিধিবঃ স্মৃতঃ।
নমস্কারস্ত তত্বজ্ঞৈরুত্তমাধম মধ্যম॥"

এই তিন প্রকার নমস্কার উত্তম মধ্যম ও অধম ভেদে ত্রিবিধ। যথা কায়িক—হস্ত পদাদি বিস্তৃত করিয়া ভূতলে পতিত হইয়া ললাট দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া দণ্ডবৎ নমস্কার উত্তম। জানুদিয়া ভূমি স্পর্শ করিয়া ভূতলে ললাট স্পর্শ দ্বারা নমস্কার মধ্যম ; আর পথে ঘাটে দেখা হইলে হাত যোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া যে 'কুড়ুলে-নমস্কার' তাহাই অধম। আমাদের দেশে করশিরঃ সংযোগে অধম কুড়ুলে নমস্কারই এখন পথে, ঘাটে সমাজে ঘুরিয়া বেড়াইয়া নমস্কারের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে।

নমস্যকে দেখিলে নমস্কার করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য এবং সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু রাত্রে নমস্কার নিষিদ্ধ। তাহার প্রমাণ মহাভারতে উক্ত হইয়াছে। যথাঃ—

"রাত্রৌ নৈব নমস্কুর্য্যা তেনাশী রভি চারিকা।
অতঃ প্রাতঃ পদংদত্বা প্রযোক্তব্যে চ তে উভে॥"

রাত্রে নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ করিতে নাই। যদি করিবার প্রয়োজন হয়, তবে নমস্কর্ত্তা আশীঃকর্ত্তা উভয়েই প্রাতঃ শব্দ যোগ করিয়া করিবে। নব্য সম্প্রদায় প্রায়ই এসংবাদ রাখেননা। কিন্তু প্রবীন সম্প্রদায় এখনও "প্রাতঃ প্রণাম" বলিয়া রাত্রে প্রণাম করিয়া শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন।

দেবতার প্রণাম সম্বন্ধে এরূপ কোন নিষেধ বিধি নাই। কিন্তু গভীর জ্ঞান সম্পন্ন লোক হিত চিকীর্ষু শাস্ত্র কর্ত্তারা কি উদ্দেশ্যে রাত্রে প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ করিবার নিষেধ বিধি করিয়াছেন, তাহার গূঢ় তত্ব উপলব্ধি করা মাদৃশ ক্ষুদ্র বুদ্ধির দুরধিগম্য।

আর্য্য মহাত্মারা রাত্রে নিষেধাজ্ঞা দিয়াও আবশ্যক স্থলে বিধি করিয়াছেন ; কিন্তু স্থান ও সময় বিশেষে নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ করিতে একেবারেই নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যথা :—

"পুষ্পহস্তো বারিহস্ত তৈলাভ্যঙ্গো জলস্থিতঃ।
আশীঃকর্ত্তা নমস্কর্ত্তা উভয়োর্নরকং ভবেৎ॥
দুরস্থং জলমধ্যস্থং ধাবন্তং মদগর্ব্বিতং।
ক্রোধবন্তং বিজানীয়াৎ নমস্কারঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥"

পুষ্প কিম্বা জল হস্তে থাকিলে, তৈল মাখা অবস্থায় এবং জলে থাকিয়া নমস্কার বা আশীর্ব্বাদ করিলে উভয়েরই নরক ভোগ হইবে। আর যে ব্যক্তি দূরে আছে (তোমাকে দেখিতেছেনা) জল মধ্যস্থ, যে দৌড়াইতেছে, যে অহঙ্কার গর্ব্বিত, যে ক্রুদ্ধ, এরূপ ব্যক্তিকেও নমস্কার করিবেনা।

আর সভাস্থলে, যজ্ঞশালায়, দেবতায়তনে ব্যক্তি বিশেষকে নমস্কার করিবেনা। এরূপ স্থানে কাহাকে নমস্কার করিলে পূর্ব্ব সঞ্চিত পুণ্য নষ্ট হয়। যথা :—

"সভায়াং যজ্ঞশালায়াং দেবতায়তনেষুচ।
প্রত্যেকন্তু নমস্কারো হন্তিপুণ্যং পুরাকৃতং॥"

ইহার মধ্যে সভাস্থলে ব্রাহ্মণ হইলে "ব্রাহ্মণেভ্যোঃ নমঃ" আর শূদ্র হইলে "বিপ্রচরণেভ্যোঃ নমঃ" বলিয়া সভাস্থ সমবেত সকলকে নমস্কার করিবার রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু সভায় উপবিষ্ট জনগণের মধ্যে ব্যক্তি বিশেষকে নমস্কার নিষিদ্ধ।

উপরে নিষিদ্ধ স্থানে নিষিদ্ধ নমস্কার ব্যক্ত করা হইল কিন্তু অভিবাদনীয় গুরুজনের মধ্যে খুল্লতাত, মাতুল, বয়ঃ কনিষ্ঠ হইলে আদৌ নমস্কার করিতে নাই। গুরুপত্নী, বিমাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতৃ জায়া আপনাপেক্ষা ন্যূন বয়স্কা হইলেও নমস্কার করিবে, তাহাতে বাধা নাই। যথা ;—

"মাতুঃ পিতুঃ কনীয়াংসং ন নমেদ্বয়সাধিকঃ।
নমস্কুর্য্যাদগুরোঃ পত্নীং ভ্রাতৃজায়াং বিমাতরং॥"

কালের গুরুতর সংঘর্ষণে, বিশাল হিন্দুসমাজের পরিবর্ত্তনে, পাশ্চাত্য রুচির প্রচলনে, সমাজের প্রথম প্রয়োজনীয় হিন্দুর অবশ্যকরণীয় নমস্কার প্রভৃতি সৎশিক্ষা সমাজ হইতে ক্রমে তিরোহিত হইতেছে। নমস্কার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইল। অন্যান্য বিষয় বারান্তরে আরও বিস্তৃত ভাবে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

সাহিত্য সেবক।

শ্রীমতী ইন্দুবালা— ইনি দিঘাপাতিয়ার মহারাজার ভগিনী। রাজ কুমারী ইন্দুবালা "শেফালিকা" প্রভৃতি কয়েক খানা কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

ইস্মাইল হোসেন সিরাজী—ঃ- নিবাস পাবনা জেলায়। ইনি একজন প্রসিদ্ধ বক্তা ও লেখক। মৌলবী সাহেব—উচ্ছ্বাস, স্ত্রীশিক্ষা, মহানগরী কর্ডোভা, উদ্বোধন, নবউদ্দীপনা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ ঃ—ফরিদফুল জেলার অন্তর্গত ধুতুরাহাটী গ্রামে শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর ঘোষ। ঈশানবাবু ১৮৭২ অব্দে বঙ্গেশ্বরদী স্কুল হইতে ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া ফরিদপুর জেলা স্কুলে অধ্যায়ন করেন। ১৮৭৬ সনে তিনি এণ্ট্রান্স পাশ করেন ও ক্রমে বি.এ. ও এম্. এ পাশ করিয়া বিষয়কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। এম, এ পাশ করিয়া ঈশানবাবু নড়াল স্কুলে প্রধান শিক্ষকতা কার্য্যে নিয়োজিত হন। তারপর সংস্কৃত কলেজিয়েটে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিয়োজিত হন। ১৮৮৫ সনে নদীয়া জেলার ডেপুটী ইনস্পেক্টর পদে নিযুক্ত হন ও চারি বৎসর এই কার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়া হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া সেখানে পাঁচ বৎসর অবস্থান করেন। মধ্য দুই বৎসর বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের ইনস্পেক্টরের কার্য্য করেন। ১৯০৩ সনে হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োজিত হন। তিনি সময় সময় সহকারী ডিরেক্টরের পদেও কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে তিনি "রায় সাহেব" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঈশানবাবু বহু পাঠ্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি বৌদ্ধ "জাতক" সম্বন্ধে মাসিকপত্রে বহু প্রবন্ধ লিখিতেছেন "জাতক" বাঙ্গালা ভাষায় অভিনব বস্তু।

শ্রীঈশানচন্দ্র রায় চৌধুরী— নিবাস মুন্সীবাজার শ্রীহট্ট. সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া থাকেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশঃ— নিবাস রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পুঁঠীয়া। ইনি কাব্য চন্দ্রিকার টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহঃ— ১২৬৫ সনের ১৩ই অগ্রহায়ণ ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত জামালপুর টাউনে মাতুলালয়ে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় চৈতন্যচন্দ্র গুহ টাঙ্গাইল উপরিভাগের চালান গ্রামে স্বীয় আবাসবাটী নির্ম্মাণ করেন ;

শৈশবে ঈশ্বর বাবুর আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল তাই বাল্যকালে গ্রাম্য সরকারদের নিকট লেখাপড়া শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে বিবাহ করিয়া শ্বশুরের অর্থে রীতিমত লেখা পড়া আরম্ভ করেন। তিনি জামালপুর হইতে মাইনর পাশ করিয়া ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে ভর্ত্তি হন। পরে ১৮৭৯ সনে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার জন্য

প্রস্তুত হন। পীড়িত হওয়ায় পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। এদিকে সংসারের চাপে তিনি বিষয় কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। কিছুকাল সরকারী আফিসে কেরানীর কার্য্য করিয়া তিনি জামালপুর মাইনর স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করেন। ১৮৮৪ সনে তিনি মোক্তারী পাশ করিয়া জামালপুরে ব্যবসা আরম্ভ করেন। ব্যবসায় তিনি বেশ সুনাম ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ঈশ্বর বাবু কৃষিকার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞ। তিনি জামালপুরে একটী বিরাট আদর্শ কৃষি ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এরূপ কৃষিক্ষেত্র পূর্ব্ববঙ্গে দুটী নাই। এই কার্য্যে তিনি তাহার আজীবন সঞ্চিত অর্থ ও জ্ঞান ব্যয় করিয়াছেন। তিনি সময় সময় ষ্টেটস্‌ম্যান, ইণ্ডিয়ান মিরার, অমৃত বাজার প্রভৃতি সংবাদ পত্রে কৃষি ও উদ্যানতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। তিনি বাঙ্গালা মাসিক পত্রেও তাহার অভিজ্ঞতার ফল প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে অনেক নূতন সম্পদ প্রদান করিয়াছেন। তাহার লিখিত বহু প্রবন্ধ তেলেগু ভাষায় অনুদিত হইয়াছে।

ঈশ্বরবাবু বাঙ্গালা ভাষায় উদ্যানতত্ত্ব বারিধি নামে এক সুবৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। শীঘ্রই এই বিরাট গ্রন্থ পুস্তকাকারে বাহির হইবে। সারতত্ত্ব ও উদ্ভিদতত্ত্ব ও মৃত্তিকাতত্ত্ব প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র গ্রন্থ ও আছে।

ঈশ্বরবাবু লণ্ডন নগরস্থিত "রয়েল হর্টিকাল সোসাইটী কর্ত্তৃক সভ্য মনোনীত হইয়া F. R. H. S. উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আরতি।

বিহঙ্গ কলরবে
আজিকে আমার কানন খানিতে
তোমার আরতি হবে।
শিশির সজল পল্লব রাজি
ফুলে ফুলে ফুলে উঠিয়াছে সাজি
হে দয়িত তব আগমনে আজি
পুলকিত হেরি সবে;
আমার রচিত কানন খানিতে
তোমার আরতি হবে।

সাধ করে আমি আজি
আঁচলের ফুল দিছি পথে ডালি,
ভাঙ্গিয়া ফেলেছি সাজি।
যে ফুল ফুটেছে সুবাসে শোভায়
পরশিয়া তারে নাশিবনা হায়,
ঝরা ফুল দিতে তোমার পূজায়
পরাণ উঠিছে রাজি'।
আঁচলের ফুল দিছি পথে ডালি,
ভাঙ্গিয়া ফেলেছি সাজি।

নিজ হতে আজ প্রাণ
ভুলিয়া গিয়াছে পূজার মন্ত্র —
ভুলিয়া গিয়াছে গান।
আজিকে ফুল্ল ফুল শোভা মাঝে
ভ্রমর কণ্ঠে বাজে বীণা বাজে,
সেথা যেয়ে আমি বল কোন্ লাজে
তুলি প্রাণহীন তান।
তাই ভুলিয়া গিয়াছি পূজার মন্ত্র
ভুলিয়া গিয়াছি গান।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

"সুবর্ণ পদক।"

ময়মনসিংহের গৌরব পণ্ডিতকুলাগ্রগণ্য মহাত্মা কালী বিদ্যালঙ্কারের নাম সর্ব্বজন-পরিচিত। এই মহাত্মা বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত রঘুনন্দনের "অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের" মত খণ্ডন করিয়া "অষ্টাবিংশতি তত্ত্বাবশিষ্ট" নামে বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

এই উভয় গ্রন্থ অবলম্বনে পণ্ডিত দ্বয়ের মতের পার্থক্য দেখাইয়া যিনি বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন তাঁহাকে কালীপুরের জমিদার সুকবি শ্রীযুক্ত বিজয়কান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয় একটী সুবর্ণ পদক প্রদান করিবেন। প্রবন্ধ আগামী ৩০শে মাঘের পূর্ব্বে সৌরভ-সম্পাদকের নিকট পৌঁছান আবশ্যক।

কার্য্যাধ্যক্ষ—"সৌরভ" ময়মনসিংহ।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, বি,এ

U. RAY & SONS.

সৌরভ

দ্বিতীয় বর্ষ। } ময়মনসিংহ, শ্রাবণ, ১৩২১। { দশম সংখ্যা।

সইদ খাঁ পন্নি।

(ময়মনসিংহ সাহিত্য পরিষদে পঠিত)

প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এক মহিমান্বিত বীরপুরুষ, তদানীন্তন মোগলাধিকারের পূর্ব্বপ্রান্তে সুশাসন ও সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়া জনশূন্য এক বিস্তৃত প্রদেশে লোক-নিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। আজ আমরা সেই অবদান-গরিষ্ঠ মহাত্মার কথা বলিব।

ইতিহাসে সইদ খাঁর নাম বিশেষভাবে কীর্ত্তিত না হইলেও যে আটীয়া পরগণায় তাঁহার সংখ্যাতীত কীর্ত্তি-চিহ্ন রহিয়াছে, সেই বিস্তৃত প্রদেশের প্রত্যেক অধিবাসী আজিও তাঁহার নাম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করে। আজিও গ্রাম্য বৃদ্ধগণ স্নিগ্ধ ছায়া-তরু-তলে উপবেশন করিয়া যুবক ও বালকদিগের নিকটে সইদ খাঁর চরিতকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। সইদ খাঁর আমল, আটীয়া পরগণার সত্য যুগ। সেই যুগ কেবলই ধন-ধান্যপূর্ণ, কেবলই পুণ্য প্রতিষ্ঠায় পবিত্র ও সুখ শান্তিতে স্নিগ্ধ। সে যুগে গোশালায় মধুর দুগ্ধ ধারাধ্বনি, মাঠে বৃষের গম্ভীর গর্জ্জন-শব্দ, দেবালয়ে শঙ্খঘণ্টা নিনাদ ও আরতির ধূপগন্ধ। সে যুগের কথা বলিয়া বৃদ্ধের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়, সে আমলের বর্ণনা শুনিয়া যুবক বিস্ময়ে আপনার পিতৃভূমির দিকে একবার চাহিয়া দেখে। প্রাচীনকালের নির্দ্দেশ করিতে হইলে আটীয়া পরগণার নিরক্ষর কৃষক বলে—"ও সেই সইট্ খাঁর আমলের কথা"। সইদ্ খাঁ কে? তাহা অনেকেই জানে না, কিন্তু "সইট্ খাঁর আমল" বলিলে সকলেই বুঝে উহা স্মরণাতীত অতীত কাল।

পাঠান কররাণী বংশ বাঙ্গালার ইতিহাসে বিখ্যাত। এই বংশের তাজ খাঁ, সোলেমান কররাণী, বায়েজিদ খাঁ পন্নি ও দাউদ, বাঙ্গালার তক্তে বসিয়া স্বাধীন-রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে সোলেমান ও তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র দাউদই বিশেষ প্রসিদ্ধ। দাউদ, বাঙ্গালার শেষ পাঠান ভূপতি। দাউদের ছিন্নমুণ্ড আগ্রায় প্রেরিত হইবার পরেই বাঙ্গালা মুল্লুক মোগলের অধীন হয়। দাউদের পতনের পরে তদীয় অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র কন্যা আগ্রায় প্রেরিত হয়। মহাত্মা আকবর এই অরাতি-সন্ততি-গণের ভরণপোষণের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া "আকবর নামাতে" লিখিত আছে।

কররাণী বংশের এই বিবরণ পাঠ করিয়া মনে হইতে পারে, দাউদের সন্তানগণের আগ্রায় গমনের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালার সহিত কররাণী-পান্নি-পাঠানদিগের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। সোলেমান কররাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়েজিদ খাঁ পন্নির বংশ এখনও বঙ্গদেশে বিদ্যমান আছে। দাউদের পুত্রকন্যা দিগের মতই বায়েজিদের পুত্র ও আকবর বাদশাহের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমরা প্রবন্ধারম্ভে যে সইদ খাঁর নাম উল্লেখ করিয়াছি ইনিই সোলেমান কররাণীর জ্যেষ্ঠপুত্র বায়েজিদ খাঁ পন্নির কনিষ্ঠপুত্র। বায়েজিদের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম সেখ মহম্মদ। উড়িষ্যায় মোগলপাঠানের যুদ্ধে সেখ মহম্মদের মৃত্যু হয়। সেখ মহম্মদের পুত্র বা কন্যা কেহ

ছিল কিনা জানা যায় না। সইদ খাঁ বাল্যকাল হইতেই আটীয়া পরগণায় ছিলেন, তাঁহার বংশধরগণ এখনও আটীয়ার জমিদার। কররাণীবংশের ভারতবর্ষে আগমন এবং বাঙ্গালার আধিপত্য প্রাপ্তির সহিত সইদ খাঁর বিবরণ, আকবর নামা প্রভৃতি ইতিহাস, আটীয়া পরগণার প্রচলিত লোকপ্রবাদ ও আটীয়ার পাঠান জমিদারগণের শাহী ফর্ম্মাণ প্রভৃতি হইতে নিম্নলিখিত রূপ অবগত হওয়া যায়।

তাজ খাঁ, সোলেমান খাঁ, এমাদ খাঁ ও ইলিয়াস খাঁ—চারি সহোদর। ইঁহারা পাঠান জাতির পন্নিবংশসম্ভূত। কররাণ গ্রামে বাস নিবন্ধন ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ কররাণী বলিয়া পরিচিত হইতেন। ইঁহারা কররাণী বংশীয় হইলেও এই সহোদর চারি ভ্রাতার মধ্যে একমাত্র সোলেমান খাঁই কররাণী বলিয়া ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছেন। অপর তিন ভ্রাতা খাঁ উপাধিতেই পরিচিত। সোলেমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়েজিদ, বায়েজিদ খাঁ বা বায়েজিদ খাঁ পন্নি(১) নামে পরিচিত ছিলেন। সোলেমানের কনিষ্ঠপুত্র দাউদ, কেবল দাউদ বলিয়াই ইতিহাসে উল্লিখিত। বায়েজিদের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ইতিহাসে সেখ মহম্মদ লিখিত হইয়াছে। বায়েজিদের কনিষ্ঠপুত্র সইদ, সইদ খাঁ পন্নি বা কেবল সইদ খাঁ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এই নামাবলী হইতে দেখা যায়, এই কররাণী পাঠান-দিগের সাধারণ উপাধি ছিল—খাঁ, কেহ কেহ খাঁ উপাধির সহিত স্বীয় বংশ পরিচায়ক 'পন্নি' শব্দও লিখিতেন, কেহ কররাণ বাসী (কররাণী) পরিচয়ও দিতেন, কেহবা 'সেখ' বলিয়াও আপনাকে অভিহিত করিতেন।

কররাণী ভ্রাতৃচতুষ্টয় অশ্বারোহী সৈনিক বা অশ্ব-বিক্রেতা রূপে আফগানিস্থান হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। আকবর নামায় লিখিত আছে, যাত্রাকালে ইঁহাদের পিতা বলিয়াছিলেন,—"যদি হিন্দুস্থানে বাদ-শাহের দরবারে অদৃষ্ট প্রসন্ন না হয়, তাহা হইলে অশ্ব বিক্রয় করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিও।" তখন শের শাহার পুত্র সেলিম শাহশূর দিল্লীর বাদশাহ। শেরশাহ ও তদীয় পুত্রের পাঠান-প্রীতির কথা ইতিহাস বিশ্রুত। পাঠান বলিয়াই তাজ খাঁ ও তদীয় ভ্রাতৃগণ বাদশাহের আশাতীত অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন। সেলিমশাহ এই নবাগত পাঠানদিগকে এক এক প্রদেশের শাসনভার প্রদান করিলেন। পন্নি কররাণী দিগকে আর অশ্ব বিক্রয় করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে হইল না।

ইহার পর শূরবংশের অধঃপতন সময়ে তাজ খাঁ বলে ও কৌশলে গৌড়রাজ্য অধিকার করেন। তাজ খাঁ, চতুর ছিলেন, বাদশাহ আকবর, পাঠানদিগের প্রভুতার উচ্ছেদ করিতে উদ্যোগী হইলে তিনি উপঢৌকন পাঠাইয়া বাদশাহের প্রীতিবর্দ্ধন করিলেন। সুতরাং দিল্লী ও আগ্রা লইয়া ব্যস্ত মোগল সম্রাট্ বাঙ্গালারদিকে আর ফিরিয়া চাহিলেন না। তাজ খাঁর মৃত্যুর পরে তাহার ভ্রাতা সোলেমান কররাণী বাঙ্গালার স্বাধীন ভূপতি হন। সোলেমান, উড়িষ্যা, কামরূপ ও কোচরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু মোগল অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। অধিকন্তু উপঢৌকন পাঠাইয়া আকবরের প্রীতি রক্ষা করিতেন। সুতরাং সোলেমানের অধিকারে আকবর বাদশাহ, হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক হন নাই।

সোলেমানের রাজত্ব পূর্ব্বদিকে বাঙ্গালার সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রবাদ আছে—পশ্চিমদিকে মোগল অধিকারের সীমা, স্বীয় রাজধানীর নিকটবর্ত্তী বলিয়া সোলেমান, বাঙ্গালার পূর্ব্বপ্রান্তে যে রক্তবর্ণ উন্নতভূমি ঢাকা হইতে মধুপুর দিয়া কড়ইবাড়ী পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত —যাহা মুসলমান ইতিহাসে 'কোহস্তানে ঢাকা' নামে আখ্যাত,—উহারই একদেশে নিজ রাজধানী স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এই প্রবাদের সত্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ না থাকিলেও প্রাগুক্ত রক্ত মৃত্তিক-ভূমির মধ্যে "কররাণীর চালা" নামে এক বহু বিস্তৃত সমপৃষ্ঠ ভূমি এবং উহার মধ্যস্থ প্রাচীন দীর্ঘিকা প্রভৃতি উক্ত প্রবাদের যাথার্থ্যের অনুকূল প্রমাণ দিতেছে। কররাণী চালার উত্তর দিকে "সহর গোবিন্দপুর।" এখন উহা জনশূন্য ও অরণ্যে পরিণত হইলেও নাম শ্রবণেই অনুমিত হয়, এককালে উহা সমৃদ্ধ নগররূপে বর্ত্তমানছিল। সোলেমান কররাণী এই সহর গোবিন্দপুরের রামনারায়ণ

(১) ইতিহাসে বায়েজিদ ও বায়েজিদ খাঁ এবং আটীয়ার মসজিদের শিলালিপিতে 'বায়েজিদ খাঁ পন্নি' লিখিত আছে।

গড়গড়ি নামক কোনও ব্রাহ্মণের এক রূপসী কন্যা বিবাহ করেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। কেহ কেহ বলেন, সোলেমান কররাণী নহে, তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র বায়েজিদ খাঁ পন্নি, রামনারায়ণ গড়গড়ির কন্যা বিবাহ করেন। এই ব্রাহ্মণী পত্নীর গর্ভে বায়েজিদের কনিষ্ঠপুত্র সইদ খাঁর জন্ম হয়। যাহা হউক ইহা জনশ্রুতি মাত্র। তবে 'নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ' ; সইদখাঁর মাতৃকুল যে হিন্দু ও ব্রাহ্মণ, তাহা নানারূপ জনপ্রবাদ হইতেই প্রতিপন্ন হয়। ইতিহাস কিন্তু এ সম্বন্ধে নীরব। জনশ্রুতির ক্ষীণ আলোকে বিশ্বাস ভিন্ন এক্ষেত্রে আর উপায় নাই।

যে কারণেই হউক, "কোহস্তানে ঢাকার" কররাণী চালায় সোলেমানের রাজধানী স্থাপনের কল্পনা ও উদ্যোগ কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই বলিয়াই মনে হয়। তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র বায়েজিদ খাঁ পন্নিকে পূর্ব্বপ্রদেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়া তাণ্ডায় গমন করেন। বায়েজিদ, কররাণী চালার অনতিদূরে আপনার যে আবাস বাটী নির্ম্মাণ করেন, উহার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। নিরক্ষর পাহাড়বাসী লোকে উহাকে বাইজ খাঁ (বায়েজিদ খাঁ) রাজার বাড়ী বলে।

'কোহস্তানে ঢাকা' নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান। বোধ হয় এই অস্বাস্থ্যকরতা নিবন্ধনই বায়েজিদ খাঁ পন্নি গড়ের আবাস পরিত্যাগ করিয়া ভড়ে (১) আগমন করেন; এবং বর্ত্তমান টাঙ্গাইল মহকুমার অদূরে স্বনামে বায়েজিদপুর গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় আপনার আবাসবাটী নির্ম্মাণ করেন। বায়েজিদ খাঁ পন্নির এই বাটীর ধ্বংসাবশেষ ও দীর্ঘিকা প্রভৃতি এখনও বায়েজিদপুরে (বাজিৎপুরে) বিদ্যমান আছে। লোকে উহাকে বাইজ খাঁ চৌধুরীর বাড়ী বলে। বায়েজিদ খাঁ পন্নি, পূর্ব্বপ্রদেশের রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন বলিয়া এ দেশের লোকে তাঁহাকে চৌধুরী বলিত।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বায়েজিদ, সোলেমান কররাণীর জ্যেষ্ঠপুত্র। সোলেমানের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া বায়েজিদ, তাণ্ডায় গমন করেন। (৯৮১ হিঃ), এবং পিতার মৃত্যুর পরে বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাহাকে অধিক দিন এ সৌভাগ্য ভোগ করিতে হয় নাই। সিংহাসন লাভের ত্রয়োদশ দিবসে তাজখাঁর পুত্র হান্সু, তাঁহাকে দরবার গৃহ মধ্যেই ছুরিকাঘাতে বিনাশ করে।

হান্সু, একপক্ষে বায়েজিদের জ্যেষ্ঠতাত পুত্র, অন্যদিকে তাঁহার সহোদরা ভগিনীর স্বামী ছিল। রাজ্যলাভে, হান্সুকে এই নিষ্ঠুর কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। তাজ খাঁ, বাঙ্গালা অধিকার করেন, এইজন্য হান্সু, বাঙ্গালার সিংহাসন নিজের প্রাপ্য বলিয়া মনে করিত।

হান্সু, রাজ্যলোভে বায়েজিদকে বধ করিলেও সিংহাসন গ্রহণ করিতে পারে নাই। অবিলম্বে, বায়েজিদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দাউদ, হান্সুকে বধ করিয়া ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধের সহিত সিংহাসন গ্রহণ করিলেন।

বায়েজিদের জ্যেষ্ঠপুত্র সেখ মহম্মদ, তাণ্ডায় পিতামহ সোলেমান কররাণীর নিকটে থাকিতেন। পিতার অপঘাত মৃত্যুর পরে তিনি পিতৃব্য দাউদের বশংবদ হইয়া মোগলের বিদ্রোহী হন এবং দাউদের মতই মোগল-পাঠানের সংঘর্ষকালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বায়েজিদ তাণ্ডায় গমন কালে স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র সইদ খাঁ ও তদীয় মাতাকে বায়েজিদপুরে রাখিয়া যান। তাঁহার গমনের অব্যবহিত পরেই গৌড়রাজ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়। দাউদ, মোগল সম্রাটের বিদ্রোহী হইয়া কেবল স্বনামে খোতবা ও শিক্কা প্রচলিত করিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই। স্বীয় অসীম সৈন্যবল দর্শনে দৃপ্ত হইয়া মোগল অধিকার আক্রমণ করেন। ফলে, মোগল ও পাঠানে বাঙ্গালার অধিকার লইয়া বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই সময়ে সইদ খাঁ অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ছিলেন। পিতৃব্য দাউদ বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সেখ মহম্মদ এই বিপ্লব কালে কেহই তাঁহার সংবাদ লন নাই। সুতরাং বায়েজিদের বিধবা পত্নী বালক সইদকে লইয়া এই সময়ে বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। যে পর্য্যন্ত বাদশাহ আকবর সইদ খাঁকে অনুগ্রহ না করিয়াছিলেন, ততদিন বোধ হয় তাঁহাকে কষ্টেই দিন যাপন করিতে হইয়াছিল। দাউদের পতনের পরেই সইদের কষ্টের দিন গত হয়। বাদশাহ আকবর

---

(১) রক্তবর্ণ মৃত্তিকা বিশিষ্ট উন্নতভূমির নাম গড় বা টেঙ্গর। নিম্নভূমিকে 'ভড়' বলে।

সইদের সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাকে মোগলাধীন বাঙ্গালার পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে জায়গীর প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তরক্ষক শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। সইদ খাঁ পন্নি, করতোয়া হইতে পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত স্থানের শাসন ও সংরক্ষণ করিতে থাকেন।

দাউদের পতনের পরেও মোগল পাঠানের যুদ্ধের বিরাম হয় নাই। পাঠানেরা উড়িষ্যা হইতে বিতাড়িত হইয়া কোহ্স্তানে ঢাকা ও ভাটী প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। ঘোড়াঘাট হইতে দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিগবর্ত্তী স্থান সমূহের মধ্যে বারংবার যুদ্ধ হইতে থাকে। ধামরাই অঞ্চলে যুদ্ধে শাহাবাজকম্বুর সাহচর্য্য করিতে দেখিতে পাই। আর কোনও যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন বলিয়া জানা যায় না।

আসল তুমার জমায় পরগণা বিভাগ হইলে আলেপশাহী ও বড়বাজু প্রভৃতি পরগণা সইদ খাঁর শাসনাধীন থাকে। এই সময়ে সইদ খাঁ, বায়েজিদপুর পরিত্যাগ করিয়া আটীয়াতে আপনার আবাস নির্ম্মাণ করেন। ইহার পর তৎকর্ত্তৃক আটীয়ার প্রসিদ্ধ মসজিদ নির্ম্মিত হয়। উত্তর কালে আলম নদী, সইদ খাঁ পন্নির মনোরম ভবন আপন উদরসাৎ করিলেও সইদের কীর্ত্তি একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও আটীয়ার মনোহর মসজিদ, সইদ খাঁ

আটীয়া মসজিদ।

ওসমান খাঁ, ভাটী প্রদেশে ঈশা খাঁ পাঠানদিগের নেতা হইয়া মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকেন। এই বিপ্লবে সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ ও ভাটী অঞ্চলে অরাজকতা উপস্থিত হয়। মোগল ও পাঠান উভয় সেনাই দেশ লুণ্ঠন করিলেও পাঠানেরাই এ বিষয়ে অধিক অত্যাচার করিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই ঘোর বিপ্লবের সময়েও সইদ খাঁর প্রভাপে পাঠানগণ তদধীন প্রদেশে কোনও অত্যাচার করিতে পারে নাই। সইদ খাঁ পন্নি এই যুদ্ধে বিশেষ লিপ্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। আমরা তাহাকে একবার মাত্র কোহ্স্তানে ঢাকার অন্তর্গত সন্তোষপুরের পন্নির সৌন্দর্য্যানুরাগ, ভগবদ্ভক্তি, ও শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় দিতেছে। এই মসজিদের শিরঃস্থিত শিলাফলকে লিখিত আছে :—

(পদ্যাংশ)

"ব দৌরে শা নুরউদ্দীনে জাঁহাগীর,
সেনাশোদ্ বশ্ মস্জেদ হাএ আলা।
সইদ খানে পন্নি হাম্ মসজেদে সাখ্ত,
কে ইয়াবদ্ আজ্‌রে আ দর্দারে ওক্‌বা।
চু তারিখস্ ব জোস্তম্ আজ্ খেরদ্ গোফ্ত,
কে আয় সৈয়দ অজা কল্লাহো‌ংখয়রা। (১)

(১) এই চরণের অক্ষর গণনায় ১০১৮ অব্দ পাওয়া যায়।

(গদ্যাংশ)—মসজেদে সইদ খানে পন্নি, এব্নে বায়েজিদ খানে পন্নি ব আন্জান রসিদ। ১০১৮"

বঙ্গানুবাদ।

(পদ্যাংশ)—নূরউদ্দীন জাঁহাগীর শাহের রাজত্বকালে যখন তাহার নির্ম্মাণের তারিখ আমার বুদ্ধির নিকট অন্বেষণ করিলাম, তখন বুদ্ধি বলিল—হে সৈয়দ, পরমেশ্বর তোমাকে উত্তম ফল প্রদান করুন।

(গদ্যাংশ)—বায়েজিদ খাঁ পন্নির পুত্র সইদ খাঁ পন্নির মসজিদ নির্ম্মিত হইল। ১০১৮ হিজরী।

সাহেন শার দরগা।

অনেক উত্তম উত্তম মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হইল। (সেই সময়ে) সইদ খাঁ পন্নিও পরকালে ফল প্রাপ্তির আশায় একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করিলেন। (লেখক বলেন)

সইদ খাঁর একশত বৎসর পূর্ব্বে 'বাবা আদম কাশ্মীরী' নামে একজন মুসলমান তপস্বী আটীয়া গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেন। শাহেন শা বাবা আদম কাশ্মীরীর

পুণ্য প্রভাবে আটীয়া তৎকালে হিন্দু ও মুসলমানের নিকট পুণ্যক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছিল। এক্ষণে সইদখাঁর বাস নিবন্ধন আটীয়া প্রাদেশিক রাজধানী হইয়া আর ও বিখ্যাত হইল। যদিও বাদশাহ আকবর আটীয়া পরগণা নামে কোন ও মহালের সৃষ্টি করেন নাই, তথাপি আটীয়া গ্রামের প্রসিদ্ধি এবং সইদ খাঁ ও তাহার বংশধরগণের প্রতাপে আলেপশাহীর পশ্চিমার্দ্ধ আটীয়া পরগণা নামে বিখ্যাত হইয়া উঠে।

আলেপশাহীর পশ্চিমার্দ্ধ তৎকালে বিরল বসতি ও অরণ্য পূর্ণ ছিল। এই ভূমির অধিকাংশ স্থানে, সইদ খাঁর সময়ে নিম্নভূমি ও বিল ছিল। সইদ খাঁ, এই 'ভড়' প্রদেশে গ্রাম ও নগর প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হইলেন। প্রচুর পরিমাণে নিষ্কর, ব্রহ্মত্র, দেবত্র, পীরপাল, প্রভৃতি প্রদান করিয়া তিনি এই প্রদেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু এবং সৈয়দ, পাঠান, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভদ্র লোকদিগকে স্থাপন করেন। সাধারণ প্রজাও তাঁহার অনুগ্রহে বঞ্চিত হয় নাই। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে তিনি প্রজা মাত্রকেই স্বকীয় কর্ষিত ভূমির ⅕ পঞ্চমাংশ বিনাখাজানায় ভোগ করিতে দিয়াছিলেন। এই নিষ্কর ⅕ এক পঞ্চমাংশের নাম—"সরকমী"। আজিও আটীয়ার প্রজাগণ, সইদখাঁ পন্নির প্রদত্ত এই সরকমী ভোগ করিয়া আসিতেছে। এইরূপ উদার দানের দৃষ্টান্ত সেই অবদানের যুগেও বঙ্গদেশে আর নাই। সইদখাঁর দান পাইয়া জন শূন্য আটীয়া পরগণা লোক পূর্ণ ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। বাস্তবিক, সইদখা পন্নিই "আটীয়া পরগণা গঙ্গরহের" লোকস্থিতি ও সমাজ প্রতিষ্ঠার মূল।

মুসলমান সমাজে সইদখাঁর প্রভাব সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। হিন্দু সমাজের উপর তাঁহার ও তদীয় বংশধরগণের কিরূপ প্রভাব ছিল এবং এখনও আছে, আমরা তাহাই বলিতেছি। ব্রাহ্মণ; কায়স্থ ও বৈদ্য সমাজে বল্লালী ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। পাঠান ভূপতিগণ এই জাতি ত্রয়ের সামাজিক সম্বন্ধে কোন কর্ত্তৃত্ব করেন নাই। কিন্তু এই তিন জাতি ব্যতীত, তাঁহারা হিন্দু সমাজের অন্য সমুদয় জাতির সমাজপতি ছিলেন। এখনও নবশাক, নমশূদ্র, মালী, প্রভৃতি জাতির সমাজ সম্বন্ধে আটীয়ার জমিদারগণই কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। সইদ খাঁ ও তদীয় বংশধরগণই এই সকল জাতির মধ্যে নূতন কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রদান করিতেন। এই কৌলিন্যের নাম "প্রাধান্য"। নবশাক প্রভৃতি মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু, ইঁহাদিগকর্ত্তৃক দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। সেই দুই ভাগের নাম 'প্রধান ও 'জন'। প্রধানেরাই কুলীন। 'পরধানী' (প্রাধান্য) লাভ করিতে হইলে পাঠান চৌধুরীকে 'নজর, দিতে হইত। পাঠান চৌধুরীগণ সন্তুষ্ট হইয়া কাহাকে বিনা নজরেও প্রাধান্য মর্যাদা প্রদান করিতেন। নমশূদ্র সমাজে প্রধানের উপরেও আরও একটী পদবী আছে। উহার নাম "তেরাই"। "তেরাইর" অনুমতি ভিন্ন অশৌচান্তের পর নমশূদ্রেরা মৎসাহার করিতে পারেনা। তেরাই পদবী বিশেষ নজর দিলে মিলিত। পাঠান চৌধুরী গণের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি ধ্বংসের সহিত, তাহারা এক্ষণে হিন্দু সমাজের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে যেন শিথিল হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। এখন কোনও "জন" প্রাধান্য প্রার্থী হইয়া জমিদার সরকারে উপস্থিত হইয়াছে—এরূপ কচিৎই দেখা যায়। "প্রাধান্য' প্রথা প্রবর্ত্তন সইদখাঁ পন্নির এক বিশেষ কীর্ত্তি।

সইদ খাঁ পন্নি আটীয়াতে আবাস বাটী নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন, একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সইদখাঁর পুত্র ফতেখাঁ ও আটীয়াতেই বাস করেন কিন্তু পৌত্র সলিমখাঁ চৌধুরী আটীয়ার আবাস পরিত্যাগ করিয়া কোহস্থানে ঢাকার সন্নিকটে সলিমনগর নামে এক গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিয়া তথন বসতি করেন। সলিম খাঁ পন্নি প্রথমে আটীয়া ও আলেপশাহীর চৌধুরী ছিলেন, শেষে চট্টগ্রামের সুবেদার হইয়া তথায় গমন করেন এবং অবশিষ্ট জীবন চট্টগ্রামেই যাপন করেন। তাঁহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রচালিত আছে:—

"সলিম পন্নি বাঘ মার
চাটগাঁওকা সুবেদার॥"

সলিম পন্নির পুত্র মইন খাঁ চৌধুরী, সলিমনগরের

অদূরে স্বনামে মইননগর গ্রাম প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় আপনার দেওয়ান খানা ও আবাস বাটী নির্ম্মাণ করেন। মইননগরের পুরাতন নাম গোড়াই, মইন খাঁ চৌধুরী স্বীয় নামে উহার নূতন নাম করণ করিলেও উহার পুরাতন নাম বিলুপ্ত হয় নাই। সইদ খাঁ পন্নির বংশধরগণ বহুকাল পর্য্যন্ত এই মইননগর বা গোড়াই গ্রামে বসতি করেন। সইদখাঁর অধস্তন ৯ম পুরুষ সাদতআলী খাঁ, গোড়াই পরিত্যাগ করিয়া করটীয়া গ্রামে স্বীয় বসতি স্থাপন করেন। এক্ষণে সাদত আলীখাঁর পৌত্র (সইদ খাঁর অধস্তন ১১শ পুরুষ) শ্রীযুক্ত ওয়াজেদ আলী খাঁ পন্নি (ইহাঁর অন্য নাম চাঁদ মিঞা) ও তদীয় বৈমাত্রের ভ্রাতৃগণ করটীয়াতেই বাস করিতেছেন। ইহাঁরাই সইদ খাঁর শেষ বংশধর।

এক্ষণে আর সমগ্র আটীয়া পরগণা সইদ খাঁর বংশধর দিগের হস্তে নাই : গৃহবিবাদে ও বংশবিস্তারে তাঁহাদের আটীয়ার জমিদারীর অধিকাংশ বহুধা বিভক্ত ও নানা বিভিন্ন বংশীয়ের হস্তগত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সম্পত্তির পরিমাণ অল্প হইয়া আসিলেও যে উদারতা ও অবদানের জন্য পন্নি বংশ প্রসিদ্ধ সেই উদারতা ও অবদান আজিও সইদ খাঁর শেষ বংশধর আটীয়ার পাঠান-শ্রেষ্ঠ শ্রীযুত ওয়াজেদ আলী খাঁ পন্নির চরিত্রে সম্যক্‌ই বিদ্যমান রহিয়াছে। আজিও তাঁহার দানে সহস্র দুঃখীর দুঃখ দূর হইতেছে এবং আজিও অসংখ্য অসমর্থ দরিদ্র প্রজা, নামে নিষ্কর না হইলেও কার্য্যতঃ বহুজমী তাঁহার নিকট হইতে নিষ্কর ভোগ করিতেছে।

যে পাঠান বংশ দ্বারা একটি বিস্তৃত প্রদেশে লোক নিবাস স্থাপিত ও সমাজ ব্যবস্থিত, হইয়াছিল, তাহাদের বংশধারা এইরূপ :—

(১) সোলেমান কররাণী হজরত আলা।
|
(২) বায়েজিদ খাঁ পন্নি
|
(৩) সইদ খাঁ পন্নি
|
(৪) ফতে খাঁ
|
(৫) সলিম খাঁ চৌধুরী বা সলিম পন্নি।
|
(৬) মইন খাঁ চৌধুরী
|
(৭) মুনায়েম খাঁ চৌধুরী
|
(৮) খোদা নেওয়াজ খাঁ চৌধুরী
|
(৯) আলেপ খাঁ চৌধুরী
|
(১০) ফয়েজ আলী খাঁ
|
(১১) সাদত আলী খাঁ
|
(১২) মাহ্‌মুদ আলী খাঁ
|
(১৩) ওয়াজেদ আলী খাঁ পন্নি (চাঁদ মিঞা)

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

আত্ম সমর্পণ।

আজকে হ'তে রাখবোনা আর
কিছু আমার তরে।
সবি আমার তোমায় দেব
হৃদয় খালি করে।
প্রাণ দেব, এ হৃদয় দেব,
দেব অশ্রু হাসি।
দেব আশার আলোক সনে
আঁধার রাশি রাশি।
দেব উষার কনক কিরণ
নিশির ঘোর কালো।
নিদাঘ ঘেরা দীর্ঘ শ্বাস,
বর্ষা ঘেরা আলো।
জগত আমার ঢেলে দেব
তোমার পদতলে।
হৃদয় আমার বিলিয়ে দেব
চরণ পদ্মদলে।
আজকে হ'তে রাখবো না আর
কিছু আমার তরে—
সবি আমার তোমায় দেব
হৃদয় খালি করে।

শ্রীবিভাবতী সেন।

বরপণ, আত্মহত্যা ও সমাজ।

স্নেহলতার শোচনীয় আত্মহত্যার সংবাদে দেশময় যে একটা প্রবল আবেগ তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে সমাজে পণপ্রথার রাক্ষসী মূর্ত্তির তিরোধানই আমরা আশা করিয়াছিলাম এবং সেই আশা প্রণোদিত হইয়াই সমাজের উদ্বোধনে যত্ন করিয়াছিলাম। তৎপরে সব সভা সমিতিতে যখন যুবকদিগকে লইয়া প্রতিজ্ঞা করান হইতে লাগিল, তখন মনে মনে একটা আশঙ্কা জাগিয়া ছিল যে পাছে এসব আবেগও আন্দোলন অনেকটা হুজুগে পর্যবসিত হয়। আর এইসব প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যুবকদল এবং তাহাদের অভিভাবকগণের মধ্যে একটা বিতণ্ডা ও মত ভেদের সূচনা করিয়া পাছে সমাজের মধ্যে আর একটা বিপ্লবের উৎপত্তি হয়। যে সব পণ প্রথা নিবারিণী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, তাঁহাদের সকলের কার্য্যপ্রণালী অবগত নহি ; তবে দুই তিনটির সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাত আছি তাহাতে দেখিতে পাইতেছি যে কন্যা দায়গ্রস্থ অভিভাবক গণের তালিকা ক্রমশঃই দীর্ঘাৎ দীর্ঘতর হইতেছে কিন্তু বিনা পণে বিবাহেচ্ছু বরের তালিকা একরূপ শূন্য বলিলেও বলা যায়। সংবাদ পত্রে বিনাপণে পুত্রের বিবাহদিব বলিয়া যাঁহারা নাম স্বাক্ষর যুক্ত পত্রপ্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের কাহারও কাহারও নিকট আমরা পত্র লিখিয়া জানিয়াছি যে কাহারও বা তিন চারিটি পুত্র বা তৎস্থানীয় বালক আছে কিন্তু তাহারা বিবাহযোগ্য নহে অর্থাৎ ১০।৮।৬.৪ এইরূপ বয়স্ক; কাহারওবা এখন বিবাহ দিবার সুবিধা হইবে না! আবার "সঞ্জীবনীতে" এরূপও পাঠ করিয়াছি যে কোন কোন বিবাহে পণ লওয়া হয় নাই বলিয়া সংবাদ পত্রে ঘোষণা করা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে সব স্থলেও পণ গৃহীত হইয়াছে !!

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া আমরা বুঝিতেছি যে আমাদের হুজুগ প্রিয়তার যে অপবাদ আছে এ ক্ষেত্রেও তাহা হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারি নাই। একথা আমরা অস্বীকার করি না যে হুজুগ দ্বারাও সময় সময় কতকটা কাজ হয় কিন্তু একথা একরূপ নিশ্চয় করিয়াই বলা যাইতে পারে যে হুজুগের উপর অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফল স্থায়ী হয় না। স্বদেশী আন্দোলনের সময়কার অনেক ঘটনাতেও এই সত্য পরিস্ফুট হইয়াছে। হুজুগের মুখে নাম কিনিবার জন্য অনেকে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, কিন্তু গোপনে গোপনে সে প্রতিজ্ঞা নিজেই ভাঙ্গিয়াছেন। ঘরে বিদেশী জিনিস ব্যবহার করিয়াও বাহিরে স্বদেশীর বক্তৃতা দিয়াছেন। অনেকে যেমন স্বার্থ সাধনের জন্য স্বদেশীর বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছেন, অন্যে আবার সেইরূপ স্বার্থ সাধনের জন্য স্বদেশী সাজিয়াছেন, আমি জানি একজন নব্য উকীল ন্যাসনাল স্কুল খুলিবার জন্য তীব্র বক্তৃতা প্রদান করেন, আর তৎস্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয়টিকে গোলাম জাতির বিদ্যালয় বলিয়া তাহার উপর তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া মুক্ত কণ্ঠে বালকগণকে সে বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে উত্তেজিত করেন। ইহারই কিছু দিন পরে বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারি যে ঐ উকীল বাবুটি মুন্‌সেফীর জন্য ওমেদার এবং সে জন্য স্থানীয় মুন্‌সেফ বাবুদের সঙ্গে সুপারিশের পরামর্শ করিতেছেন। যেখানে বি, এল, উপাধিধারী শিক্ষিতগণেরই মনে মুখে এইরূপ সামঞ্জস্য, সেখানে অন্যে পরে কা কথা!

ঐ সময়কার হুজুগে বালক দলের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা হইয়াছিল যে যে কোন উপায়ে একবার জেলে যাইতে পারিলেই স্বদেশ সেবার চরম পরিণতি হইল। আর কিছু করিতে পারি বা না পারি নিতান্ত পক্ষে 'বন্দেমাতরং' বলিয়া পুলিশের সমক্ষে উপস্থিত হইতে পারিলেই জেলে যাওয়ার পথ সুগম হইতে পারে; আর জেলে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি, বাঙ্গালা, উর্দ্দু, হিন্দী সব ভাষার সংবাদ পত্রে দেশ সেবক বলিয়া নাম ছাপা হইয়া যাইবে, গুণগানে দেশ ভরিয়া যাইবে; মুক্তির সময় ফুলের মালা, স্বদেশী কীর্ত্তন, সভা, বক্তৃতা হয়ত মেডেল আদিও মিলিবে! এ হুজুগের প্রলোভন সহজ নহে; সস্তায় নাম কিনিবার, স্বদেশ সেবী হইবার এরূপ পন্থা ত্যাগ করাও সহজ নহে সুতরাং কতক কতক বালক ঐরূপ হুজুগের মত্ততাতেই জেলে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইত! ঐরূপ বালকগণকে বুঝান যে কত কঠিন ছিল, তাহাদিগকে নিয়ম সংযমের অধীন করিয়া রাখিতে যে কত কষ্ট পাইতে

হইত তাহা ভুক্ত ভোগীই জানেন। আমি একথা বলিনা যে সকলেই ঐরূপ ভ্রান্তির খেয়ালেই জেলে গিয়াছে। তবে অনেক বালক যে গড্ডলিকা প্রবাহে ভাসিয়া স্বদেশী সাজিয়া ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

দুঃখের বিষয় যে বরপণের এই আন্দোলনেও সেই হুজুগের পরিচয় পদে পদে পাওয়া যাইতেছে; ইহাতে সমাজের পরিণাম চিন্তা করিয়াও সময় সময় মনে বড় আতঙ্ক উপস্থিত হইতেছে।

হিন্দু শাস্ত্রের শিক্ষা—আত্মহত্যা মহাপাপ। এজন্য অশেষ কষ্ট সহ্য করিলেও হিন্দু কদাচিৎ আত্মহত্যা করিয়া থাকে। হিন্দু রমণীগণও অম্লান বদনে অশেষ কষ্ট সহ্য করে তথাপি আত্মহত্যা দ্বারা সাধারণতঃ সে কষ্টের লাঘব কামনা করে না।

সহমরণ প্রথা রহিত হইবার পর সময় সময় স্বামীর মৃত্যুতে সাধ্বী পত্নী আত্মহত্যা দ্বারা সহমরণের অভাব পূরণ করেন ইহা দেখা যায়। সেরূপ আত্মহত্যাও সন্তানবতী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায় না; যৌবনস্থা, সন্তানহীনা রমণীই সময় সময় দুর্ব্বহ স্বামী বিয়োগ বেদনা সহ্য করিতে অক্ষমা হইয়া স্বামীহীন জীবন 'তুচ্ছ বোধে অনলে' আহুতি প্রদান করেন।

স্নেহলতার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে সৌরভের জন্মস্থান ময়মনসিংহ জেলায়ই একটি ষোড়শী সাধ্বী এইরূপ স্বামী বিরহিতা হইয়া কেরসিন তৈল সহায়ে অনলে আত্ম বিসর্জ্জন করেন,সংবাদ পত্রে সে কথা পাঠ করিয়াছিলাম। আরও অন্যান্য স্থল হইতেও সময় সময় এইরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এ প্রকার আত্মহত্যার উদ্দেশ্য অন্য প্রকার তাহা সকলেই সহজে বুঝিতে পারেন। ইহার সহিত বর্ত্তমান আত্মহত্যা প্রথার তুলনা হইতে পারে না।

তারপর স্নেহলতার আত্ম বিসর্জ্জন। তাহারও উদ্দেশ্য পিতা মাতাকে উদ্বাস্ত হইবার দায় হইতে উদ্ধার করা। যদি তাহার বিবাহের জন্য তাহার পিতাকে বসতবাটি বিক্রয় করিতে না হইত, হয়ত তাহা হইলে সে আত্মহত্যা করিত না। যাহা হউক এই আত্মহত্যার মূলেও পিতার প্রতি অত্যধিক ভক্তি প্রীতিই বর্ত্তমান। এইজন্যই এই মৃত্যুতে দেশের লোকের হৃদয়ে একটা শোকের তরঙ্গ বহিয়াছিল, একটা প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহার ফলে লোকে তাহাকে প্রশংসা এবং সমাজকে নিন্দা করিয়াছিলেন। সাময়িক পত্রে তদনুরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, স্নেহলতার ছবি ছাপা হইয়া বিক্রীত হইতেছিল এবং লোকে সাগ্রহে উহা কিনিতেছিল। ইহা হইতেই দুর্ভাগ্যক্রমে হুজুগের সৃষ্টি হইল। এবং অল্পদিনের মধ্যেই এক স্নেহলতা নহে অনেক স্নেহের আদরের লতিকা আমরা হারাইলাম। ইহাদের মধ্যে সকলের পিতাই যে স্নেহলতার পিতা হরেন্দ্র বাবুর ন্যায় কন্যার বিবাহের চিন্তায় অতিমাত্র বিব্রত হইয়াছিলেন তাহাও নহে। কাহারও কাহারও পিতার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল এবং স্বেচ্ছায় যৌতুকাদি দিতেও তিনি কাতর ছিলেন না, তথাপি কন্যা কেরসিন সহায়ে জীবন বিসর্জ্জন দিল!

এই সেদিন যে ময়মনসিংহ সহরের এক ভদ্র লোকের ১৪শ বর্ষীয়া কন্যা ঐরূপে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার পিতাও নিতান্ত দরিদ্র নহেন! পণ দানেও অনিচ্ছুক নহেন। তবে এইসব মৃত্যুর হেতু কি? আমাদের আশঙ্কা হয় যে কুমারীগণের কোমল হৃদয়ে স্নেহলতার মৃত্যুর প্রশংসাতে একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে যে এইরূপে মরিতে পারিলেই খুব নাম হইবে; লোকে খুব প্রশংসা করিবে; সেই লোভে সেই নাম কেনার প্রলোভনে এই সব নবনীত সুকুমার দেহলতা অনলে আহুত হইতেছে! নতুবা যেখানে কারণ বর্ত্তমান নাই সেখানে কার্য্য কি প্রকারে সম্ভব পর হয়? যেখানে কন্যা পক্ষ দান করিতে সক্ষম, সেখানে পণ বা যৌতুকাদি গ্রহণে কোন দোষ দেখি না। সেরূপ স্থলেও যদি কন্যা আত্মহত্যা করিতে থাকে, তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবেনা যে সেটা হুজুগে পড়িয়া ভ্রান্ত ধারণার বশে!

এদিকে তো এইসব কুমারী বালিকার এই ভাব! অন্যদিকে আবার দেখুন এই আন্দোলনে সমাজ কতদূর সংশোধনের পথে অগ্রসর হইতেছে, স্নেহলতার মৃত্যু সমাজ চক্ষে কিরূপ স্থায়ী চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছে

আমাদের পূর্ব্ববঙ্গের কথাই ধরুন! আমরা অতি বিশ্বস্ত সূত্র হইতে যে কতকগুলি সংবাদ পাইয়াছি তাহারই দুই একটা পাঠক বর্গকে উপহার দিতেছি!

ঢাকা কলেজের জনৈক এম,এ, বি,এল, উপাধি ধারী, প্রফেসার ঢাকার একখানা সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় নিজেই নাকি ময়মনসিংহের একটি ঋণ গ্রস্ত যুবকের গলায় পা দিয়া পাঁচ হাজার টাকা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার ভগ্নীকে গ্রহণ করিয়াছেন। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে কবিবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের সেই সুপ্রসিদ্ধ কবিতা "বাবা থাকুক আমার বিয়ে" সর্ব্ব প্রথম এই সম্পাদক মহাশয়ই তাঁহার পত্রিকায় বাহির করিয়া বাহবা নিয়াছিলেন। যদি এইরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা ঈদৃশ ব্যবহার প্রাপ্ত হই, তবে "বলমা তারা দাঁড়াই কোথা!'

এই সংবাদটি পাইয়া আমি এরূপ ব্যথিত হইয়াছিলাম যে তাহা কি বলিব!

২য়— ঐ কলেজেরই আর একজন প্রফেসরও টাকা লইয়া বিবাহ করিয়াছেন সত্য কিন্তু তিনি নাকি শ্বশুরের সঙ্গে একটা গোপন যুক্তি করিয়াছেন যে টাকাটা তিনি নিজে ক্রমে পরিশোধ করিবেন, আপাততঃ পিতার দাবী তিনি পূরণ করুন। ইহা দ্বারা তিনি উভয়কুল রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, এজন্য আমরা আন্তরিক তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু আশঙ্কা হইতেছে যে তাঁহার পিতা এই বিষয় যখন জানিতে পারিবেন তখন তিনি কি ভাবে ইহা গ্রহণ করিবেন, আর তখন পিতা পুত্রে ইহা লইয়া কোন মনোমালিন্য ঘটিবে কিনা?

৩য়— ময়মনসিংহের জমিদার প্রথিত নামা শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী এম, এ, মহাশয় সম্প্রতি তাঁহার একটী আত্মীয়ার বিবাহের জন্য একটি এম্. এস্. সি, পড়া পাত্র ঠিক করিয়া পাত্র পক্ষকে ২৫০০৲ টাকা অগ্রিম দেন। বিবাহের রাত্রিতে পাত্রপক্ষ শ্রীযুক্ত গোপাল দাস বাবুর কলিকাতার বাটীতে আসিয়া কোন তুচ্ছ অজুহাতে বরউঠাইয়া লইয়া যান। গোপালদাস বাবু নিরুপায় হইয়া সেই রাত্রেই কলিকাতা মেসে মেসে ঘুরিয়া বহুকষ্টে একজন পাত্র সংগ্রহ করিয়া কন্যাটিকে বিবাহ দিয়া জাতি কুল রক্ষা করেন। বিষয়টী আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে। এ ব্যাপার যেন আপোসে নিষ্পত্তি না হয়। ধর্ম্মাধিকরণে প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারিত হউক এই আমাদের কামনা!

আমাদের সমাজের চরম শিক্ষিত গণের কার্য্যকলাপ হইতেই সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইবে এবং এই স্নেহলতার মৃত্যু জনিত বরপণ নিবারণ আন্দোলনে কতদূর সুফল হইয়াছে তাহার প্রমাণ কতকটা পাওয়া যাইবে।

সমাজে কি মানুষ আছে যে এই সব কুমারী হত্যা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিবে? নতুবা উচ্চ শিক্ষিত গণের মধ্যেও এইরূপ নীচতার নিদর্শন পাওয়া যাইত না। সমাজেরত এই অবস্থা! লাভের মধ্যে কতকগুলি বালিকা এই হুজুগের মধ্যে পড়িয়া নাম কিনিবার লোভে আত্মহত্যা করিয়া মরিতেছে। এবড়ই অসদ্দৃষ্টান্ত! এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া মহৎ কার্য্য করিলেও তাহাতে ক্ষুদ্রত্বের স্বার্থের কালিমা লিপ্ত হয়, ইহা বালিকাগণকে বুঝাইয়া দেওয়ার এই সময় এবং বালিকাগণেরও বুঝিবার এই সময়!

বিভিন্ন সমাজের সমাজ পতিগণের কি চৈতন্য হইবে না? তাহারা স্ব স্ব সমাজের মধ্যে কি এই নুতন বিপদ নিবারণের কোন চেষ্টা করিবেন না? এবং বরপণের অত্যাচার কম করিতে উদ্যোগ করিবেন না? যদি তাহা না করেন, তাহা হইলে চাপরাসওয়ালা উকীল, ডাক্তার, এম. এ, বি. এ, বি, এস, সি, প্রভৃতির অর্থ লিপ্সা আরও বৃদ্ধিই পাইতে থাকিবে, তাঁহারা প্রকাশ্যে বা গোপনে স্বীয় স্বীয় মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া অর্থ লাভের চেষ্টায় ফিরিবেন; আর অনর্থক এইরূপে কুমারীগণের আত্মহত্যা সমাজে ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে। তাহার পরিণাম যে কি হইতে পারে তাহা চিন্তা করিলেও হৃৎকম্প হয়। আর কুমারীগণকেও বলি যে, তাঁহারা হিন্দুর সন্তান, ইহা না ভুলিয়া ধৈর্য্যে সাহসে বুক বাঁধিয়া সেই জীবন দাতা জগন্নাথকে মনে প্রাণে ডাকুন! তদ্দত্ত জীবন অনলে বিসর্জ্জন না দিয়া তাঁর চরণে অর্পণ করুন; তিনিই তাঁহাদের সুব্যবস্থা করিবেন!

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

হারাণো মাণিক।

ফিমেল ইস্কুলের বোর্ডিং এ বিভাকে এখন সকলেই ভালবাসে। এখানে তার স্নেহের ডাক নাম বিউটী এবং সকলে তারে এই নাম ধরিয়াই ডাকে। আমাদের বিশ্বাস, স্ত্রী সৌন্দর্য্য সমালোচনায় পুরুষ জাতি এ পর্য্যন্ত যথেষ্ট অপক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। কারণ পুরুষ জাতির মধ্যে এমন অনেক লোক দেখা যায় যাঁরা স্ত্রীলোক তো দূরের কথা পুথি পুস্তকে স্ত্রী প্রত্যয়ান্ত পদ পাইলে অতিরিক্ত প্রশংসার চোটে তার উপরেই লুটাইয়া পড়িতে চান। এহেন স্ত্রৈণ জাতির মতামতের উপর বেশী আস্থা স্থাপন করা যায় না। কিন্তু স্ত্রী জাতির কথা আলাদা। যখন খাস মেয়ে মহলে স্ত্রীলোকের রূপের খ্যাতি রটে তখন সেস্থলে সৌন্দর্য্য টুকু নিরেট খাটি জিনিস বলিয়া মানিয়া লইতে বোধ হয় পাকা স্ত্রী বিদ্বেষীরও কোন আপত্তি হইতে পারে না। এই নিরিখে ওজন করিলে বিভাকে সুন্দরী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

বিভা যখন প্রথম এই স্কুলে ভর্ত্তি হইতে আসে, তখন তার বয়স—বছর চোদ্দ। সে আজ তিন বছরের কথা। একটী ছোকরা তাকে ভর্ত্তি করিয়া দিবার জন্য লইয়া আসিল। তাকে দেখিতে শুনিতে অনেকটা কলেজের ছোকরার মত, গায়ে টুইলের সার্ট, চোখে নিকেলের চশমা, গলায় চাদর নাই, মুখ খানা বেজায় ফ্যাকাশে; সে বিভাকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া তাকে বোর্ডিং এ রাখার সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া গেল। ইস্কুলের 'এডমিশন' রেজিষ্টারে নাম লেখাইয়া দিল কুমারী বিভা, পিতার নাম বিভূতি ভূষণ রায়, ঠিকানা ২৪ নং বিপিন হালদারের বাড়ী। জ্বরে পীড়িত থাকায় বিভূতি বাবু নিজে আসিতে পারেন নাই।

ইস্কুলের হেডমিশট্রেস্ ছোকরাটির কথা অনুসারেই বিভাকে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। ইস্কুল ছুটির পর ঝি নূতন ছাত্রীটীকে বোর্ডিংএর লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট হাজির করিয়া দিল। লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ভারি চতুর মেয়ে; তিনিও একজন শিক্ষয়িত্রী। বিভার এডমিশন নেওয়ার সময়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন। এবার বিভাকে নিজের হাতায় পাইয়া তাহাকে জেরা সুরু করিয়া দিলেন—"আচ্ছা যে ছোকরাটী তোমায় ভর্ত্তি করে দিয়ে গেল, সে তোমার কে হয়?"

প্রশ্নটী শুনিয়া বিভার নেত্র পল্লব হইতে গলা পর্য্যন্ত সারা মুখ লাল হইয়া উঠিল। এত বেশী লাল হইল যে প্রশ্নটা না শুনিলে যে কেউ মনে করিতে পারিত বুঝি বিভাকে এমন একটা অনুচিত প্রশ্ন করা হইয়াছে, যার উত্তর দেওয়া তার পক্ষে নিতান্ত লজ্জাকর!

বিভা মাটির দিকে চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে নিরুত্তর হইয়া থাকিল। কিন্তু চতুর লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছাড়িবার পাত্রী নহেন। একটী অল্প বয়সের ছোকরার সহিত অবিবাহিতা কুমারীর এমন কি সম্পর্ক হইতে পারে, যা লাজের বাধা অতিক্রম না করিয়া প্রকাশ করা যায় না! বিভা এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারিল না। এমন অবস্থায় মানুষের মনে নানারূপ অপ্রিয় কথা নানা গ্লানিকর সন্দেহ উদয় হওয়া কিছু মাত্র অস্বাভাবিক নয়। বোর্ডিংএর কর্ত্রীরও তাই হইল। তিনি ঝড়ের মত ছুটিয়া গিয়া কথাটা হেডমিশট্রেসের কানে তুলিলেন। একে মেয়ে রাজা, তাতে যুধিষ্ঠিরের অভিশাপ—সুতরাং দেখিতে দেখিতে কথাটা বোর্ডিংএর চারিদিকে আগুণের মত ছড়াইয়া পড়িল। এই কথা লইয়া বিভার সম্বন্ধে এমন একটা বিশ্রী অপবাদ চারিদিকে রটিয়া গেল, যাহাতে বিভার বলিয়া কেন—বিদ্যালয়ের সম্পর্কিত যে কোনও ছাত্রীর সম্বন্ধে ওরূপ কোন কথা ওঠা বিদ্যালয়েরই কলঙ্ক।

অমনি হেডমিশট্রেসের খাস কামরায় কোর্ট মার্শেল বসিয়া গেল। বোর্ডিংএর কর্ত্রী পারেনত তখনি বিভাকে তার পোর্টমেণ্টটা সঙ্গে দিয়া গলা ধাক্কা দিয়া একেবারে সদর রাস্তায় বাহির করিয়া দিয়া আসেন। বিভা আসামী সে পাথরেরতৈরী পরিটীর মত শক্ত হইয়া দাড়াইয়া থাকিল, মুখে কথাটী নাই। মুখশ্রী সদ্য তুষার পাত ক্লিষ্ট পদ্মের কুঁড়িটীর মত ম্লান। সে মুখ দেখিয়া হেডমিশট্রেসের শুষ্ক প্রাণে অন্তঃসলিলা রুদ্ধ স্নেহ সহসা

উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁর সমুদয় হৃদয় টুকু এক মধুর প্লাবনে সরস করিয়া তুলিল। মানুষের হৃদয় যখন সরস হয়, তখন দুঃখীর বেদনায় সমুদয় চিত্ত ভরিয়া উঠিতে বিলম্ব হয় না, এবং সমুদয় বিশ্বজগৎ এক নূতন সৌন্দর্য্যে সমুজ্জল হইয়া উঠে। হেডমিশট্রেস খুব জোরের সহিত বলিলেন—"না, বিভা যাই হোক না কেন, সে যখন বিপদে পড়ে আমাদের আশ্রয় নিয়েচে, তখন আমি একে ত্যাগ কত্তে পারচি নে। অতীত খোয়া গেছে বলেই যে ওকে ভবিষ্যতে কিছু সঞ্চয় কত্তে দেওয়া হবেনা, এ কোন কাজের কথাই নয়।"

বিভা বড় শক্ত মেয়ে। তাড়নার চোটে সমুদয় বোর্ডিংএ হুলুস্থুল বাধিয়া গেল; তবু বিভার মৌনব্রত কিছুতেই ভঙ্গ হইল না। অবশেষে অনেক কথা কাটা কাটির পর স্থির হইল যে বিভার পিতাকে আসিবার জন্য চিঠি লিখিয়া দেওয়া হউক; তারপর তাঁর নিকট সব জানিয়া শুনিয়া পরে যা হয় একটা করা যাইবে, নচেৎ শুধু সন্দেহের উপর বিভাকে আশ্রয়চ্যুত করা সঙ্গত নয়।

বোর্ডিংএর লেডি সুপারিণটেনডেণ্ট লোকটী মোটের উপর ভাল। কিন্তু তিনি বড় কড়া বিচারক। মানুষের কোনও প্রকার দুর্ব্বলতাকে তিনি ক্ষমা করিতে জানিতেন না। বিচারকের হৃদয়ে যে জিনিসটী থাকিলে লোকের দণ্ড তিরস্কারও স্নেহ ও মঙ্গলে মণ্ডিত হইয়া উঠে, অপরাধী আপনি তার অপরাধ স্বীকার করিয়া সাশ্রুনেত্রে বিচারকের নিকট অপরাধের দণ্ড যাচিয়া লয়, অপরাধীর অপরাধ সত্বেও বিচারকের ক্ষমা সুন্দর চক্ষে যে করুণার অধিকারী হইয়া উঠে সেই জিনিষটার নাম করুণা। আমাদের লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়ার হৃদয় ভাণ্ডারে এই আশ্চর্য্য স্পর্শমণিটীর অভাব ছিল। তাই তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বিভা বোর্ডিং এ থাকিয়া গেল দেখিয়া তিনি বিভার উপর আন্তরিক চটিয়া গেলেন। বিভা যেন মানুষ নয়; কতকগুলি গুরুতর অমার্জ্জনীয় অপরাধের সমষ্টি মাত্র—লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই মনে করিয়া পদে পদে তাকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বোর্ডিংএর ছাত্রীরা কখনো বিভার সঙ্গে মিশিত না। তার সঙ্গে দেখা হইলে সকলেই মুখ অন্ধকার করিয়া সরিয়া পড়িত, সুবিধা মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষাক্ত বাক্য বাণে বিভার কোমল হৃদয় বিদ্ধ করিয়া দূর হইতে তার যাতনা দেখিয়া আমোদ বোধ করিত। ইহারা সকলে মিলিয়া লেডি সুপারিণটেনডেণ্টের নেতৃত্বে নির্দ্দয় একদল সখের সেনা গঠিত করিল এবং তাদের এক মাত্র কর্ত্তব্য হইল বিভার বোর্ডিং স্থিত ক্ষুদ্র আশ্রয় টুকু তাহার নিকট দুঃসহ করিয়া তোলা।

বিভা বড়ই লাজুক মেয়ে। তার সর্ব্বাঙ্গের অস্ফুট যৌবন মাধবী পত্রপল্লবের ছায়া ঢাকা স্বর্ণ বর্ণ ফুলের পাঁপড়ির মতই অত্যন্ত শিথিল ও ক্ষণভঙ্গুর! কিন্তু তার হৃদয়টা, সরু সোনার তারের মত, অত্যন্ত শক্ত ও ভারসহ। বাহিরে ঝড় যখন গাছ পালার ডাল ভাঙ্গে, পাতা ছিঁড়ে, তখনো যেমন ঘরের সাসি বন্দ করিয়া আলো জ্বালিয়া কাজের মানুষ আপনার কাজটী নিপুনভাবে করিয়া যায়, তেমনি বিভাও চারিদিকের নির্দ্দয় শ্লেষ গ্লানি হাসি ও টিট্‌কারীর মধ্যে নীরবে আপনার কাজ টুকু সুসম্পন্ন করিয়া যাইত। স্নেহের অভাব যতই তার বুকে বাজিত, ততই সে আপনাকে কাজের ভিঁড়ের ভিতর নিমজ্জিত করিয়া রাখিত। সুতরাং অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই বিভা ফিমেল ইস্কুলের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রী হইয়া উঠিল। লেখাপড়ায়, শিল্পে, সুকুমার কলা বিদ্যায়, গৃহকর্ম্মে কিছুতেই আর কোন ছাত্রী বিভার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না।

এইভাবে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। বিভার পিতার নিকট ইস্কুল হইতে যে চিঠি লেখা হইয়াছিল, তার কোনও জবাব আসিলনা। কিছু কাল অপেক্ষা করিয়া হেড মিসট্রেশ আরেক খানা তাগিদ চিঠি পাঠাইলেন। আরও কয়েক মাস পার হইয়া গেল কিন্তু বিভার পিতাও আসিলেন না, চিঠিরও কোন জবাব আসিল না। এবার চিঠির মালীকের হাতে লেখা রসিদের জন্য মাসুল দিয়া ইস্কুল হইতে বিভার পিতার নামে রেজেষ্টরী করা চিঠি গেল। কয়েক মাস পর কলিকাতা সহরের প্রায় সমুদয় গুলি পোষ্টাফিস প্রদক্ষিণ করার চিহ্ন স্বরূপ সর্ব্বাঙ্গ মোহরাঙ্কিত হইয়া শেষকালে ডেডলেটর আফিস হইতে খামের একাংশ ছিন্ন হইয়া হেডমিশট্রেশের হাতে চিঠি

খানা ফেরত আসিল, তাতে পোষ্টাপিসের কৈফিয়ৎ লেখা ছিল, লিখিত ঠিকানায় বিভূতি ভূষণ রায় নামক কোনও লোকের উদ্দেশ পাওয়া গেলনা। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এইযে ঐ নামে ঐ ঠিকানা হইতে বিভার নিকট মাসে মাসে রীতিমত মনিঅর্ডারে খরচ আসিতেছে।

রহস্য গাঢ় হইয়া উঠিল, আবার কোর্ট মার্শেল বসিল। বিভাকে আবারো অপরাধীর মত উপস্থিত করা হইল। মধু চক্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপের ন্যায় বোর্ডিংএর ছাত্রীদের বাস গৃহগুলি আবার বিভার কথা লইয়া মুখরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু এবারেও বিভার নিকট তার পিতা মাতার কিম্বা সে ছোকরাটার কোনও খবর পাওয়া গেল না। লেডি সুপারিণটেনডেণ্ট তো চটিয়া লাল। বলিলেন 'এ পাপটাকে এখনি ইস্কুল থেকে বিদায় করে দিয়ে আমাদের বিদ্যালয়টাকে কলঙ্ক মুক্ত করা হোক।" আর এক জন শিক্ষয়িত্রী বলিলেন "এ রহস্যের তল যে কোথায়, তা তো কিছু ঠাহর করে উঠতে পারচি না!" আর এক জন বলিলেন—"পুলিশে খবর দাও? এসব রহস্য তারাই ভাঙ্‌তে জানে ভালো ইত্যাদি।

আবারও সুন্দর মুখের জয় হইল। বিচার অন্তে হেডমিশট্রেশ 'রায়' দিলেন—এক মাসেই বিভা ইস্কুলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রী হইয়া উঠিয়াছে! তার স্বভাব চরিত্র যেরূপ মধুর তাতে তার সম্বন্ধেকোনও কলঙ্কের কথা আমার মনেই আসে না। আমি বিভার ইস্কুলের মাইনে ফ্রি করিয়া দিলাম,তার বোর্ডিংএর খরচ আমি নিজে বহন করিব। বিভা নীরবে, নত শিরে আরক্ত মুখে বিচার ফল গ্রহণ করিল। মাসে মাসে বিভার খরচের টাকা মনি অর্ডার যোগে আসিয়া রীতিমত ইস্কুল হইতে ফেরত যাইতে লাগিল। এই ভাবে তিনটী বৎসর কাটিয়া গেল। বিভার স্বভাবের গুণে চাঁদের কলঙ্কের মত তার দোষের কথাটা এমন প্রায় সকলেই ভুলিয়া গিয়া তাকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন কি, যে দিন বিভা ক্লাসে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া মেট্রিকুলেশন ক্লাশে প্রমোসন পাইল সে দিন হইতে লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টেরও বিভার সম্বন্ধে মতামতের আশ্চার্য্য পরিবর্ত্তণ দেখা গেল! এ জগতে মতামত এমনি হালকা জিনিষ বটে।

(২)

বিকাল বেলা এক পশলা বৃষ্টি হইয়া আকাশ পরিস্কার হওয়ায় ইস্কুলের প্রাঙ্গন স্থিত সবুজ মাঠ খানি দিনান্তের স্নিগ্ধ আলোকে অত্যন্ত মনোরম হইয়া উঠিল। ইস্কুল ছুটি হওয়া মাত্র মেয়েরা দলে দলে ছুটিয়া আসিয়া সুন্দর মাঠ খানির উপর সদ্য প্রস্ফুটিত নানা রঙ্গের ফুলের মত ছাইয়া ফেলিল। তাদের স্বচ্ছ আনন্দ ভরা হাস্য কাকলিতে মাঠ খানি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে যেন তার সবুজ বুকের উপর দিয়া হাসির জোয়ার বহিতেছিল!

ইস্কুল ছুটীর কিছুক্ষণ পর। বিভা একাকী ক্লাশ হইতে বাহির হইয়া মাঠ পার হইয়া বরাবর বোর্ডিংএর দিকে চলিয়া গেল। মাঠে যারা বেড়াইতে ছিল, তাদের পাশ কাটিয়া কারো পানে না চাহিয়া বিভাকে ত্রস্ত ভাবে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মেয়েদের মধ্যে কেউ একটু মুচ্‌কে হাসিল, কেউ বা তার সঙ্গিনীর পানে চোখে ইসারা করিল। কিন্তু সেদিকে বিভার কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিলনা!

বিভা তার কামরার ভিতরে গিয়া আর আর দিনের মত সেমিজ ও সারী বদল করিল না। আর আর দিনের মত আয়নার সমুখে দাঁড়াইয়া ভিজে তোয়ালে দিয়া মুখ চোখ ভাল করিয়া রগড়াইয়া মুছিয়া লইল না! আজ বিভার মুখ খানির স্পর্শ সুখে বঞ্চিত হইয়া অনাহত তোয়ালে খানা আলনার উপর নিস্তেজ ভাবে ঝুলিতে লাগিল। বিভা একটা চেয়ারের উপর বইগুলি কোন মতে ফেলিয়া দিয়া দাবানল বেষ্টিত বন ভূমি হইতে ভীত ত্রস্ত বনের হরিণী যেমন ভাবে বাহির হইয়া আসে, বিভাও তেমনি অস্থির ভাবে কামরা হইতে বাহির হইয়া বোর্ডিংএর দালানের বারান্দার উপর আসিয়া পড়িল!

বারান্দার রেলিং এর উপর ভর করিয়া সে শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিল। তার মাথার ভিতরে রক্ত ঝিম ঝিম করিতেছিল। মুখের চেহারা মাটির মত বিবর্ণ! তার চোখের সমুখে, গাছ পালার সবুজ আকাশের ভিতর দিয়া অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম ছবিটী গলিত বৃহৎ পদ্মরাগ মণিটীর মত দেখা যাইতে ছিল! কিন্তু সেদিকে তার চক্ষু ছিল না!

আজ কয়দিন বিভার হৃদয়ের ভিতরে একটা ভয়ানক ঝড় বহিতেছিল। বোর্ডিংএর লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মাসতুতো ভাই বিভাকে বিবাহ করিতে চান। ছেলেটী ম্যাডিকেল কলেজে পড়ে।

লেডি সুপারিণটেনডেণ্ট সুপারিসি করিয়া এ বিবাহে সকলেরই মত করাইয়া লইয়াছেন। হেডমিশট্রেস ঠিক এ প্রস্তাবটার অনুমোদন সূচক কোনও কথা স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও, বিভার যে এখন বিবাহ করা দরকার, সে কথা স্বীকার করিয়াছেন! কিন্তু বিভা লেডি সুপারিণ টেনডেণ্ট মহাশয়ার নিকট আত্মীয়টীর কবল হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল অথচ সমুদয় ইস্কুল বোর্ডিং একদিকে আর সে একলা একদিকে। হয়তঃ সকলের মতের বিরুদ্ধে চলিলে এইবার তাকে ইস্কুল বোর্ডিং ছাড়িতে হইবে। এই সমুদয় আশঙ্কা ও সন্দেহে বিভার মন আজ কয়দিন ভারি অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এর মধ্যে বিভার কামরা হইতে তার পোটমেণ্টের তালা ভাঙ্গিয়া এক আশ্চর্য্য চুরি হইয়া গিয়াছে। পোটমেণ্টে তার ধোয়া সাড়ি গুলি সব সাজানো ছিল। সেমিজ গুলি ভাঁজ করা ছিল, একটা কাগজের বাক্সের ভিতরে তার হার ও কাণের ইহুদী মাকড়ী দুটো ছিল, সে সব কিছুই চুরি হয় নাই— তার বাক্স ভাঙ্গিয়া কেবল চুরি গিয়াছে—একখানা চিঠি! সে চিঠিতে একটা নাম ও একটা ঠিকানা ছিল, যা এতদিন বিভা নিজের বুকের ভিতরে, সকলের চোখের আড়াল করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল! এবং এই নাম ও ঠিকানাটী ঢাকিয়া রাখিতে গিয়া তাকে কত লাঞ্ছনা, কত গঞ্জনা, কত কলঙ্কের কথা শুনিতে হইয়াছে! সে চিঠির মধ্যে লেখকের দৈন্যের সহিত সংগ্রামের সকরুণ ইতিহাস টুকু অশ্রুর ভাষায় অতি সুললিত করিয়া লেখা ছিল। কাজের বা অকাজের কোন কথা তাতে বেশী কিছু লেখা ছিল না! স্কুলে আসার পর বিভা ঐ এক মাত্র চিঠিই পাইয়াছিল। চিঠি খানা পড়া শেষ করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবার কথাটা চিঠিতে লেখা থাকিলেও বিভার অপরাধ—সে প্রাণ ধরিয়া তার প্রাণের জিনিষটী অগ্নির মুখে সমর্পণ করিতে পারে নাই! বিভা কল্পনার চক্ষে স্পষ্টই দেখিতে পাইল, তাকে যারা হিংসা করে, তারা তার চিঠি খানা হাতে পাইয়া কত হাসাহাসি করিতেছে—বলিতেছে—সত্য কেউ চিরদিন গোপন করিয়া রাখিতে পারেনা। এতদিনে সব গুপ্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে—

বিভা তন্ময় ভাবে আকাশ পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল; সহসা মুখের উপর একটা ভিজা নরম জিনিষের আঘাত পাইয়া চমকিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখে,সমুখে যুথি দাঁড়াইয়া তার হাতে একটা পদ্মের নাল, তার ডগার উপরে একটা পদ্মের কলি, তাতে জলের কণা তখনো লাগিয়া রহিয়াছে। যুথি মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল। তাহার এই শীকর সিক্ত কমলের স্নিগ্ধ স্পর্শেই বিভা ভাব-বিভোর চিন্তাজগত হইতে সচেতন বাস্তব জগতে জাগিয়া উঠিয়াছে।

যুথি লেডি সুপারিণটেনডেণ্টের এবং বিভার ভাবী পতির আত্মীয়। যুথির আকস্মিক শুভাগমনে বিভার বেশী একটা উৎসাহ দেখা গেল না। সে যুথিকে বলিবার মত একটা কথাও খুঁজিয়া পাইতেছিল না। কাজেই যুথিকেই কথা পাড়িতে হইল!

"ঠিক আধ ঘণ্টা হলো পাশে দাঁড়িয়ে আছি,সে দিকে একেবারে হুঁসই নেই দেখ চি! এতক্ষণ কোথায় ছিলে বিভা!" বিভা একটু ব্যঙ্গস্বরে বলিলঃ— "দেখ্‌তেই পাচ্চতো বোর্ডিংএর বারান্দায় রেলিং ধরে আগা গোড়া দাঁড়িয়ে আছি!" যুথি বলিলঃ—"ন্যেকামো করো না ভাই! আমি তো দেহটার খবর জিজ্ঞাসা করিনি, মনটা কোথায় ছিল এতক্ষণ, তাই জিজ্ঞেস করচি; মুখ গুঁজে কি ভাবছিলে?"

বিভা মুখখানা আরো একটু ভার করিয়া বলিলঃ— "ভাবচি নিজের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান! ভাবনার কি আমার কূল কিনারা আছে ভাই!"

যুথি বলিল—"ফের চালাকি! বসন্তের হাওয়া গায়ে লেগেছে—তুমি নিশ্চয় বিয়ের কথা ভাবচিলে—না ভাই?" বিভা যেন একটু আহত হইয়া উত্তর করিল— সেটাও একটা মস্ত ভাবনার কথা বটে! যুথি হাসিয়া বলিলঃ—তা তোমার ভাবনার উপর টেকস বসাতে আসিনি আমি। কিন্তু আমার কথাটা হচ্চে এই যে, এখনি

যদি সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তোমার ঘুম ভাঙ্গাতে হয়, তবে তোমার বিয়ে হয়ে গেলে আমাদের কি উপায় হবে!"

বিভা এবার এক পশলা মধুর হাসিয়া বলিল—"আমিও তাই ভাবছিলাম যুথি! এর একটা উপায় না করে, বিয়ে করাটা আমার পক্ষে ঠিক হবে না!"

যুথি বিভাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিলঃ— "তামাসা রাখ, যাও—

বিভা তার নীল ছলনা হীন চোখের দৃষ্টি যুথিকার উজ্জ্বল চোখের উপর স্থির করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলঃ— "চালাকি নয়, যুথি; আমি ভেবে চিন্তে স্থির করেচি বিবাহে আমার রাজি হওয়া অসম্ভব!"

বিভার সে ছলনাহীন সরল চোখের দৃষ্টি দেখিয়া তার কথার এক রত্তিও অবিশ্বাস করা যায় না। যুথিকা বলিল "বল কি বিভা! কথা বার্ত্তা সব এক রকম ঠিক ঠাক। হেডমিশট্রেস শুদ্ধ মত করেচেন, এতেও তোমার মনের খটকা যাচ্চে না—আশ্চার্য্য!

বিভা চুপ করিয়া থাকিল। তার অনিন্দ্য সুন্দর মুখ কান্তি তীব্র বেদনার অনুভূতি মাখা! কিন্তু যুথি বর পক্ষের ঘটকালি করিতে আসিয়াছিল। সেদিকে কোনও ভরসা না পাইয়া সে বিলক্ষণ চটিয়া উঠিতে ছিল। সে চটা সুরেই বলিল—"ছি বিভা! এখনো দুরাশা কাটে নি, তোমার পাপের প্রলোভন এখনো দমন কত্তে শেখো নি! আর কি তোমার বিবাহের আশা আছে! তোমার চিঠির কথা যে সকলের জানাজানি হয়ে গেছে!"

কথা শুনিয়া বিভার মুখ খানি প্রভাতের চাঁদটার মত সাদা হইয়া গেল। চিঠি চুরির রহস্যটা এতক্ষণে বিভা বেশ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিল।

(৩)

কলিকাতা সহরে একটা অন্ধকার গলির ভিতরে একটা স্যাঁত স্যাতে দালানের নীচের তালার কামরায় পঙ্কজ একটা ভাঙ্গা তক্তপোষের উপর একখানা ছেঁড়া মাদুর ফেলিয়া বসিয়াছিল; তক্তপোষের উপর স্তুপীকৃত লেখা অর্দ্ধলেখা খাতা পত্র বই পুস্তকের রাশি। তাতেই তক্তপোষ খানার বেশীর ভাগ জুড়িয়া রাখিয়াছে। পঙ্কজের সমুখে একখানা খাতা খোলা পড়িয়া আছে। কোলের উপর পুরাণো এস্রাজটী টানিয়া লইয়া সে বাজাইতে ছিল:—

হৃদয় বেদনা বহিয়া
প্রভু এসেছি তব দ্বারে।
তুমি অন্তর্যামী, হৃদয় স্বামী
সকলি জানিছ হে!

ভাবের পাগল মানুষটারই মত এস্রাজটীর হৃদয় হইতে একটী অশ্রুজল গঠিত বেদনার ছন্দ সুখের স্মৃতির সহিত সকরুণভাবে জড়িত হইয়া গৃহের ভিতর যেন উদ্ভ্রান্ত হইয়া ফিরিতেছিল। নিদাঘের তীব্র জ্বালায় মধ্যাহ্নটী নীরব— খোলা জানালা দিয়া ড্রেণের গন্ধ লইয়া ক্লান্তিকর গরম বাতাস ঘরের ভিতর আসিতেছিল। হৃদয়ের সুরের সহিত এস্রাজের কোমল রাগিণীটী যখনই মিলিয়া যাইতেছিল, তখনই পঙ্কজের মুদ্রিত চক্ষে সান্দ্রপল্লবের উপর অশ্রুর কণা গুলি পুতির মালার মত ছলছল করিয়া উঠিতেছিল।

পঙ্কজের দেহ নড়িতে ছিল না। গানের সুরে তার হৃদয় খানি নির্ম্মল সূর্য্য করোজ্জ্বল সুরভি প্রান্তরের সবুজ ঢেউ এর উপর দিয়া যেন কোন এক ছায়া ঘন পল্লব নিবিড় পল্লীকুঞ্জের নিভৃত গৃহ পানে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল! তার চোখের সমুখে ভাসিতেছিল—একখানি শান্ত কুটীর, চারি ধারে নাল বনে ঘেরা নীল বনের মাঝে মাঝে কত রঙ্গের বনফুল হাসির মত ছড়াইয়া গেছে! অঙ্গনে স্বর্ণ শস্যের রাশি, কুটীর সোপানে কমলার স্বর্ণ পদ চিহ্ন রচিত! সেখানে একটী তরুণ প্রাণ, পাশে একটী মাত্র তরুণ সঙ্গিনী—দুটী তরুণ হৃদয়ের নিত্যনব মঙ্গলানুষ্ঠানে প্রতিদিনের কর্ম্ম চেষ্টা, বিচিত্র সংসার যাত্রা। প্রফুল্ল জীবন লীলা সুন্দর তর হইয়া উঠিতেছে। দূর বনান্তরাল হইতে গিরি নির্ঝরিণীর তন্দ্রা মাখা কুলু কুলু ধ্বনির সহিত রাখালের বাঁশীর গান সুরভি বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া কর্ম্মের রাগিনীতে বিশ্রামের সুরটী মিলাইয়া দিতেছে!

আজ কোথায় সে প্রতিদিনের কর্ম্ম-চেষ্টা-সমুজ্জ্বল সুন্দর সংসার, কোথায় সে গৃহ, কোথায় সে নবজীবনের তরুণ সঙ্গিনীটী! সে মধুর স্বপ্নের সকলি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে কিন্তু সে সুখ স্বপ্নের স্মৃতি এখন দুঃখের মূর্ত্তি

ধরিয়া পিছে পিছে ফিরিতেছে! তাই, পঙ্কজ নিরবচ্ছিন্ন দৈন্যের মাঝ খানে বীণাপাণির পদ্মাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া তার প্রতিদিনের অশ্রুমালা বাণীর চরণে বাঁধিয়া দিয়া সুখী হয়। তরুলতা ঘেরা ফল ফুলময় সুন্দর পৃথিবীর সহিত তার অন্তরের যোগসূত্রটী যেন ছিঁড়িয়া গিয়াছে; পৃথিবীর নর নারীর বিচিত্র সুখ দুঃখের সঙ্গে যেন এখন তার প্রাণের সম্পর্কটীও ঘুচিয়া গিয়াছে; এমনি করিয়া নিঃসঙ্গ পঙ্কজের দীর্ঘ দিন গুলি যেন কাটিতে চায় না! পঙ্কজ নিত্য নূতন স্বপ্ন চয়ন করিয়া অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত বাণীর চরণে কণকাঞ্জলি দিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তার সাধনা সফল হইয়াছে—একথা বলা যায়না সাময়িক পত্রে প্রেরিত প্রবন্ধ ও কবিতা গুলি সম্পাদকেরা এ পর্য্যন্ত তাকে রীতি মত ফেরত দিয়া আসিতেছিলেন। দৈনিকে প্রেরিত প্রবন্ধ গুলি যদিও ফেরত আসিত না কিন্তু তার অধিকাংশই মুদীর বেসাতির মোড়করূপে গৃহে গৃহে রপ্তানি হইল! এত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও সে বাণীর চরণাশ্রিত সুখ দুঃখের নিলয়টী পরিত্যাগ করে নাই; কারণ মা বীণাপাণির নিকট ছাড়া কাঁদিয়া এমন সুখ আর কোথাও সে পায়নাই। কবিরা কাঁদিয়া শান্তি লাভ করিবার আশায় অনেক সময় বাণীর পুজরী হইয়া থকেন, অর্থ বা যশোলাভের জন্য নহে!

আজ কয়েক দিন হইল কলিকাতার কোনও বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশকের নিকট পঙ্কজ তার নূতন গীতিনাট্য খানা পাঠাইয়া দিয়াছে, প্রকাশকের নিকট হইতে সে সম্বন্ধে কোনো জবাব না পাওয়টা তার ভাগ্যে নূতন নহে! আজ সে আরেক খানা নূতন ছন্দের নাটিকায় হাত দিয়াছিল। কিন্তু আজ কিছুতেই আকাশ হইতে তার উষ্ণ কল্পনা পাখীটাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিতেছিল না। পাখী আজ সুদূর নীহারিকা পুঞ্জের কাছেই ঘুরিয়া মরিতেছিল, সে আর লেখনী মুখে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছিল না। মনটা একেবারেই কাজে বসিতেছিল না। তাই কোলের উপর পুরাণো এস্রাজটী টানিয়া লইয়া পঙ্কজ "হৃদয় বেদনা বহিয়া,প্রভু, এসেছি তব দ্বারে" বারে বারে এই গানটী বাজাইতেছিল, এমন সময় খোলা জানালা দিয়া বাহির হইতে ডাক পিয়ন ডাকিল "বাবু চিঠ্‌ঠি!" পঙ্কজ তাড়াতাড়ি এস্রাজ ফেলিয়া উঠিতে না উঠিতে ডাক পিয়ন জানালার গরাদের ভিতর দিয়া দুখানি চিঠি ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল!

পঙ্কজ তাড়াতাড়ি চিঠি দুখানি তুলিয়া লইল। এক খানি মুদ্রিত বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠ, আর এক খানা সাদা। মুদ্রিত খামের ভিতর ছিল—পুস্তক প্রকাশকের চিঠি, আর একখানা পাঁচশো টাকার চেক্! পুস্তক প্রকাশক লিখিয়াছেন, আপনার গীতিনাট্য খানা বিদ্বজ্জন সমাজে আদৃত হইয়াছে। ওপেলা বঙ্গমঞ্চের সত্বাধিকারী গীতিনাট্য খানা এক হাজার টাকায় ক্রয় করিয়াছেন। পাঁচশো টাকার চেক্ পাঠান গেল। পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য শেষ হইলে বাকি টাকা পাঠান যাইবে।"

আর সাদাখামের ভিতরে ছিল একখানা মেয়েলি হাতে লেখা চিঠি; হাতের লেখাটা তেমন পরিচিত নয়! কিন্তু স্বাক্ষর কাহিনী—বিভা। বিভা লিখিয়াছে—

"বিভার কথা মনে পড়ে তো? তোমার মনে পড়ুক আর না পড়ুক তোমাকে মনে করাইয়া দিবার অধিকার বিভার আছে! আমি কি চিরকাল স্মৃতি লইয়াই কাটাইব? ব্যর্থ জীবনের বোঝা লইয়া আমি দিন দিন বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছি এ সময়ে একবার আমাকে খোঁজ করা তোমার উচিত। যা ভাল মনে কর, করিও—

স্নেহের বিভা!"

বিভার ক্ষীণ, মিনতি পূর্ণ আকুল কণ্ঠ স্বর যেন বিশ্বজগতের একমাত্র আর্ত্তরোদন ধ্বনির মত পঙ্কজের কাণে বারংবার বাজিতে লাগিল।

(৪)

বোর্ডিংএর প্রাঙ্গনস্থিত একটী কৃষ্ণ চূড়া গাছের বিরল পত্র শাখার ফাঁকের ভিতর দিয়া শুক্লা অষ্টমীর রূপালি চাঁদ ঝমমল করিতেছিল। বিভা তার কামরার ভিতরে একখানা চেয়ারে একলাটী বসিয়াছিল। টেবিলের উপর একটী উজ্জল কেরোসিনের ল্যেম্প জ্বলিতেছিল। সন্ধ্যার স্নিগ্ধ বাতাসে প্রাঙ্গনস্থিত গাছ গুলির পত্র পল্লব গুলি মর্ম্মারিত হইতেছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ।

সহসা গৃহের কপাট নড়িয়া উঠিল। বিভা চমকিয়া উঠিয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখে—একজন নিঃশব্দ

পদে তার কামরার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার গা একখানা সাদা চাদরে আগা গোড়া ঢাকা, গায়ের চাদর খুলিয়া ফেলিয়া যখন সে বিভার দিকে আরো একটু অগ্রসর হইল, তখন বিভা পুলক রোমাঞ্চিত দেহে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখে—পঙ্কজ! দেহ কান্তি মলিন, মুখের লাবণ্য টুকু শুষ্ক কেবল অধীরায়ত সুন্দর চোখ দুটীতে সেই তরুণ যৌবনের ঔজ্জ্বল্য মাখা! শুধু সেই চোখ দুটী দেখিয়াই সে পুরাণো মানুষটীকে চিনিয়া লওয়া যায়!

বিভার বক্ষঃস্থল আনন্দের আবেগে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। বক্ষের উপরে সেফ্‌টী পিন দিয়ে আটা নীলাভ সাড়ীর আঁচল খানা সে স্পন্দন বেগে দ্রুত তালে নাচিয়া উঠিল। বিভা পঙ্কজ দুজনেই প্রথম কোন কথাই বলিতে পারিল না! তারপর অপ্রত্যাশিত মিলনের প্রথম উচ্ছ্বাসটা থামিয়া গেলে পর বিভা মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল :—

"অমন বেখবরি যে! তুমি তো বলেছিলে, তুমি আগে আমায় খবর না দিয়ে আমার সঙ্গে দেখা কত্তে আসবে না!" পঙ্কজ একটু হাসিয়া বলিল, "আর লজ্জা দিয়ে কাজ কি বিভা, তুমি তো জান সব।"

বিভা যেন সহসা নক্ষত্র-লোক হইতে তারাটীর মত ঝরিয়া পড়িল, এমনি ভাবে, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল :—

"আমি সব জানি, বলচো কি তুমি—আমি তো কথা বুঝে উঠতে পাচ্চি না!"

পঙ্কজ পরম স্নেহ ভরে বিভার শুভ্র মৃণালের মত কোমল হাত দুখানি নিজের হাতের উপর তুলিয়া লইয়া বলিল :—

"আজকে আমার আসবার সময় হয়েচে বিভা। এতদিন পর দয়াময় আমাদের পানে মুখ তুলে চাইলেন। তবু তোমায় আগে খবর দিয়ে দু এক দিন সবুর করে আসতুম। কিন্তু আজ তোমার চিঠি পেয়ে আর আমার দেরী সইল না!" বিভা পঙ্কজের মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া বলিল :—"আমি তোমায় আসতে লিখেচি? চিঠি লিখিতে তোমার মানা, তবু তোমায় আসতে লিখেছি! না তোমার ভুল হয়েচে!"

পঙ্কজ বলিল—"তুমি লেখনি?"

বিভা দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—"কক্ষনো না!"

পঙ্কজ ধীরে ধীরে বিভার হাত দুখানি ছাড়িয়া দিয়া পকেট হইতে এক খানা চিঠি বাহির করিয়া বিভার হাতে দিল। বিভা আলোর কাছে গিয়া চিঠি খানা পড়িয়া লাল হইয়া উঠিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "এ যে সুষমার হাতের লেখা, সে আমার নাম জাল করেছে!"

পঙ্কজ একটু হাসিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া বলিল, "তুমি আসতে লেখনি, আজ তবে আসি?—"

বিভা ছুটিয়া আসিয়া পঙ্কজের হাত জড়াইয়া ধরিল। বলিল, "না আমায় অমন করে ফেলে যেয়ো না; তুমি আমায় এখান থেকে নিয়ে চল!"

ঠিক সেই সময় লেডি সুপারিণ্‌টেণ্‌ডেণ্ট, হেড্‌ মিশ্‌ট্রেস ও সুষমা একজন পুলিশ ইন্‌স্পেকটার এবং একজন সবইনসপেকটার সঙ্গে লইয়া ঝড়ের মত ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

সবইনসপেকটার নেকড়ে বাঘের মত ছুটিয়া আসিয়া খপ্‌ করিয়া পঙ্কজের হাত খানা ধরিয়া ফেলিলেন। বিভার সুন্দর কপোলতল তখন লজ্জায় অপমানে রাঙ্গা দোপাটীফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। ছোট ছোট চুলের গোছা গুলি কালো কালো ভুজঙ্গ শিশুর মত তার রাঙ্গা কপোলের উপর দুলিয়া পড়িয়াছে!

বাঘিনীর মত তেজের সহিত বিভা সবইনস্পেক্টার বাবুর দিকে অগ্রসর হইয়া বলিয়া উঠিল :—

"ইনি চোরও না বা ডাকাতও না, কোন কু মতলবেও এখানে আসেন নি! আপনারা এঁকে অমন করে অপমান করবেন না।"

সুষমা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, সে ঠাট্টার সুরে বলিল—"ছি! তা হবে কেন! ভদ্র লোকটী নিশ্চয় দুপুর রাতে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন, পথ ভুলে এখানে এসে পড়েচেন!"

পঙ্কজ নতশিরে আরক্ত মুখে মাটির পানে চাহিয়া থাকিল।

ইনস্পেক্টার বাবু গম্ভীরভাবে একটা চেয়ারের উপর বসিয়া তাহার চোখের চশমাটী খসাইয়া ঘন ঘন নস্ত টানিতে লাগিলেন। তিনি এ পর্য্যন্ত কোনও কথা বলেন নাই, তাই বিভা একেবারে তাঁকে লক্ষ্যই করে নাই।

লেডি সুপারিণটেনডেণ্ট হেড মিশট্রেসের দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন—"কেমন, আপনি নিজের চোখ দুটোকে এখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস কত্তে পাচ্চেন তো?"

হেড মিশট্রেস গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

লেডি সুপারিণটেনডেণ্ট বিভার দিকে ফিরিয়া ঘৃণার সহিত বলিলেন—"বিভা, কেলেঙ্কারীর আর জায়গা ছিল না তোমার! বাজারে দড়ি কলসীও তো ঢের ছিল!"

বিভার আহত বক্ষঃস্থল বাত্যাবিক্ষোভিত সাগরের মত ক্রোধে অপমানে ফুলিয়া উঠিল। সে বলিলঃ—

"স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে দেখা কত্তে এলে যে কেলেঙ্কারী হয়, সেটা তো বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। তারপর তিনিও স্বেচ্ছায় আসেন নাই, চক্রান্ত করেই তাকে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে দেখছি।"

বিভা ঐ কটী কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল! তার পাণ্ডুর মুখের শোভা টুকু অশ্রুর মুক্তামালায় সাজিয়া উঠিয়া যেন আরো মধুর হইয়া উঠিল। নীল চোখের মণি দুটী অশ্রু বাষ্পের ভিতরে দুটী শিশির লগ্ন নীল পদ্মের মত শোভায় ঢল ঢল করিতে লাগিল!

ইনস্পেক্টার বাবু যে চেয়ারটায় বসিয়াছিলেন সেটা এবার একটু বেশী খচমচ্ করিয়া উঠিল। তিনি এবার বেশী করিয়া এক টিপ নস্য টানিয়া ক্রমাগতঃ হাঁচিতে লাগিলেন!

বিভার কথা শুনিয়া হেড মিশট্রেস নববিস্ময়ের সহিত তার দিকে তাকাইয়া বলিলেনঃ—

"বিভা! কার স্বামীর কথা বলচো? তুমি তো অবিবাহিতা।"

বিভা একটু মাথা নীচু করিয়া পঙ্কজের পানে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিলঃ—"না, আমি এঁর বিবাহিতা স্ত্রী!'

হেড মিশট্রেস আবারো জোর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—"তবে এতদিন এ কথা ছাপিয়ে রেখেছিলে কেন?"

বিভা বলিল, সে অনেক কথা। মোটা মুটি কথাটা এই, আমার স্বামী সর্ব্বদা সাহিত্যচিন্তায় নিরত থাকেন। এদিকে আমার শ্বশুর তাঁকে চাকুরী করিয়া সংসার পরিচালনার পথ করিতে আদেশ করেন। সাহিত্যানুরাগী আমার স্বামী পিতৃ আদেশ কর্ণপাত না করায় আমার শ্বশুর মহাশয় তাহাকে কটু বাক্যে শাসন করেন। ফলে অভিমানী স্বামী আমায় নিয়ে বেড়িয়ে পড়লেন। আমাদের যে তখন মাথা রাখবার স্থান ছিল না, তিনি তাও চিন্তা কত্তে অবসর পান নাই। শেষে তিনি আমায় স্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়ে সাহিত্য চর্চ্চা করে নিজে যা রোজকার কত্তেন তাই আমাকে মণিঅর্ডার করে পাঠাতেন।"

হেড মিশট্রেস বলিলেন—"বিভূতিভূষণ তবে তোমার কে?" বিভা আর কোন কথা বলিল না।

লেডি সুপারিণটেনডেণ্ট বলিলেনঃ—তবে আজকে এ হেয়ালী ভাঙ্গবার সহসা কি আবশ্যক হলো?

এবার প্রশ্নের উত্তর দিল পঙ্কজ—

"বিভাকে আর এখানে গোপন করে রাখবার তত আবশ্যক নেই। মা সরস্বতী এখন যা কিছু দিচ্ছেন, তাতেই এখন আমাদের স্ত্রী পুরুষের একরকমে চলে যাবে!"

লেডি সুপারিণটেনডেণ্টের নিজের কুটুম্বের সহিত বিভার সম্বন্ধ এমত অবস্থায় আর টিকে না বিবেচনা করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে পঙ্কজের পানে চাহিয়া তিনি বলিলেনঃ—আপনার নাম কি মহাশয়?"

"পঙ্কজ বিহারী মিত্র।"

পঙ্কজ বিহারী মিত্র যে একজন সুলেখক ও কবি একথা লেডি সুপারিণটেনডেণ্ট জানিতে পারিয়াছিলেন। এমন কি এই মাত্র "আরাধনা" মাসিক কাগজে তিনি পঙ্কজবিহারী মিত্রের লেখা একটা প্রবন্ধের ভারি তারিপ করিতেছিলেন। তিনি নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তারপর আস্তে আস্তে বলিলেন—

"এ ব্যাপার যে আগাগোড়া সাজানো খাঁটি মিছে কথা নয়, তার প্রমাণ কি?"

এইবার বেতের চেয়ার হইতে প্রৌঢ় পুলিশ ইনস্পেক্টার বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিভা এতক্ষণ তাঁর প্রতি লক্ষ্যই করে নাই। এবার তাঁকে ভাল করিয়া দেখিয়া লজ্জা নম্রমুখী হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তাঁর সম্মুখে পঙ্কজের মাথা মাটির দিকে আরো বেশী হেঁট হইয়া পড়িল। ইন্‌স্পেক্টর বাবু বাষ্পাকুল নেত্রে অশ্রুভরা কণ্ঠে ডাকিলেন, "বিভা!" বিভা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর

পঙ্কজের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেনঃ— এদিকে এসো পঙ্কজ। পঙ্কজও আজ সুবোধ শিশুটীর মত তার কাছে ভিড়িয়া দাঁড়াইল।

তিনি দুজনার মাথায় দুই হাত রাখিয়া সজল নেত্রে লেডি সুপারিণটেনডেন্টের দিকে চাহিয়া বলিলেন :—

"এরা যা বলেচে এ সব আগাগোড়া সত্য কথা, আমি হলপ করে বলতে পারি!"

লেডি সুপারিণটেনডেণ্ট তবু উদ্ধত জেরার সুরে প্রশ্ন করিলেন—"আপনি তা জানেন কি করে?"

ইনস্পেক্টার বলিলেনঃ—"এরা আমারি হারাণো মাণিক, পুত্র ও পুত্রবধূ।"

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ।

প্রেম।

গানটা তোমার ছড়িয়ে গিয়ে
　　একটা উদাস বাতাসে,
আমার নিজন কুটীর পাশে
　　বইল মধুর আশ্বাসে।
ভগ্ন বীণায় আজ্‌কে আবার
বাঁধ্‌বো মৃদু সুরটী তোমার;
তোমার গানে বাজ্‌বে বীণা
　　উঠ্‌বে ঊর্দ্ধ আকাশে।
গানটা তোমার ছড়িয়ে গেল
　　একটা উদাস বাতাসে

তোমার বাঁশী বাজ্‌বে যখন
　　মধুর সন্ধ্যা সকালে,
আমি তখন ধরবো সে সুর,
　　হাস্‌বো তোমায় হারালে;
তোমার সাথে পার্‌বো কি না,
নাইকো আমার নাইকো জানা;
নয়ন বেয়ে পড়্‌বে ধারা
　　এ সুর তোমায় মাতালে।
তোমার বাঁশী বাজ্‌বে যখন
　　মধুর সন্ধ্যা সকালে।

শ্রীসুধেন্দুমোহন ঘোষ।

মনসা ভাসান।

(চন্দ্রাবতীর গীত অবলম্বনে লিখিত)

শ্রাবণ মাস আসিলেই মনে পড়ে, সেই হতভাগিনী, সেই জন্ম দুঃখিনী বেহুলার কথা। চারিদিকে জলদকুন্তলা হাস্যময়ী প্রকৃতির শ্যামচ্ছবি, উপরে জলদজালজড়িত আকাশ, দূরে শ্যামল বনরাজি, শিরোভাগে ধূম্র-কিরীট শোভী গিরিশৃঙ্গের অপূর্ব্ব শোভা, নীচে স্বর্ণচূড় শস্য ক্ষেত্র সকল ফলভরে অবনত। এই সময় বাঙ্গালার গৃহে গৃহে নবান্ন, দিকে দিকে আশার গান, চারিদিকে বিমলানন্দ। তারই মধ্যে কে যেন কোথা হইতে অলক্ষিতে থাকিয়া আপন করুণ বীণাটী, রহিয়া রহিয়া বাজাইয়া দিতেছে। তাহার সেই মর্ম্মস্পর্শী প্রতি করুণ ঝঙ্কারে, মনে পড়ে সেই হতভাগিনী, সেই চিরদুঃখিনী বেহুলার কথা। যখন দিগন্তে মেঘের গুড়ু গুড়ু ধ্বনিতে শৈশবের জীর্ণ পুরাতন স্মৃতি একটী একটী করিয়া মনের ভিতর জাগাইয়া দেয়, সেই সঙ্গে মনে পড়ে দুঃখিনী বেহুলার কথা। শ্রাবণের রৌদ্র স্নাত নদীতে যখন বাইকগণ সাজের নৌকা সারি দিয়া বাহিয়া যায়, যখন তাহাদের সেই,

"কালনাগ মাঞ্জসে গেল লখাইরে দংশিয়া,
সায়রে ভাসিল বেহুলা পতি কোলে লইয়া।"

প্রভৃতি অশ্রুজলে গাথা সরল ভাটিয়াল সঙ্গীতগুলি কানের ভিতর দিয়া মর্ম্মস্থলে আঘাত করে, তখন মনে পড়ে, হায় এই শ্রাবণ মাসেই না, এইরূপ তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ নদীর উপর দিয়াই না, একদিন হতভাগিনী মৃত পতি বুকে করিয়া উন্মাদিনী বেশে কোথায় কোন্ অজানিত দেশে ছুটিয়া গিয়াছিল। সেই অনির্ব্বচনীয় শোক গাথা আজও আমাদের কর্ণে চিরপুরাতন অথচ নিত্য নূতন রূপে ধ্বনিত হইতেছে। ধন্য সেই মহাকবিগণ, যাঁহারা সেই অমর সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন। এই বিশ্ব-জগতের কত ঘটনা, কত প্রবাহ পুরাতন হইয়া বিস্মৃতির অতল গর্ভে লয় পাইতেছে, কিন্তু বেহুলার স্মৃতি চির নূতন।

বাস্তবিক বাঙ্গালীর পক্ষে, বিশেষতঃ ময়মনসিংহ বাসীর পক্ষে শ্রাবণ একটী স্মরণীয় মাস। সুখে দুঃখে গড়া এমন মাস বুঝি আর নাই। হর্ষ বিষাদের

এমন উজ্জ্বল রেখাপাত আর কোন মাসের উপরই দেখা যায় না। হাসি ও অশ্রুতে গড়া শ্রাবণ মাস ময়মনসিংহবাসীর বড় আদরের, এই সময় ময়মনসিংহের সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব বা মহাশক্তির অংশে রূপিণী নাগ মাতা বিষহরীর অর্চনা হইয়া থাকে। কুললনাগণ শ্রাবণী পঞ্চমীতে ঘট স্থাপন করিয়া, সারা মাস নিত্য সন্ধ্যাকালে মণ্ডপে ধূপ ধূনা জ্বালিয়া, হুলুধ্বনিতে আকাশ প্লাবিত করিয়া নিজ নিজ আবাসে নাগমাতার অধিষ্ঠান কামনা করেন। পুরুষগণ প্রত্যহ খোল করতাল সহযোগে তাহাদের সেই চির আদরের পুরাতন কাহিনী গান করিয়া দুঃখ দৈন্য অবসাদের হস্ত হইতে কিছু দিনের জন্য মুক্তি কামনা করেন। রমণীগণ তৎকালে নিশ্চেষ্ট থাকেন না। অবসর কালে পাড়ার সমস্ত সঙ্গিনীগণ মিলিয়া বেহুলার পবিত্র স্মৃতি লইয়া, তাহাদের কণ্ঠগাথা এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত গান করিয়া থাকেন। প্রচলিত নারায়ণ দেব ও বংশী দাসের পদ্মাপুরাণ হইতে এই গীত একটু স্বতন্ত্র রকমের। আখ্যান বস্তু এক হইলেও ছন্দ ও সুর বিভিন্ন রূপ। এই সঙ্গীত রচয়িত্রী আমাদের প্রবন্ধান্তরে বর্ণিতা—মহিলা কবি চন্দ্রাবতী।

কবি চন্দ্রাবতীর গানে দেখা যায় জালু মালুই পদ্মা পূজার প্রথম প্রবর্ত্তক। তবে হালুয়াবছাইরও নাম পাওয়া যায়। বন্দনা গীতির পরে কবি চন্দ্রাবতী এক স্থানে গাহিয়াছেন—

"জালুর পুত্র কানাইয়া গো জাল বাহিতে যায়,
পদ্মার আদেশে কাল দংশে তাহার পায়।
পার্ব্বতী কানায়ার মাও এই কথা শুনি,
আউলাইয়া মাথার কেশ গো ছুটে পাগলিনী।

* * * *

হেনকালে তথায় গো একটী যোগিনী
ছাই মাখা সর্ব্ব অঙ্গে গো গলদেশে ফণী।
চূড়াকারে বান্ধা কেশ গো পিঙ্গল বরণ,
পার্ব্বতী কান্দিয়া ধরে গো তাঁহার চরণ।
আউলা পার্ব্বতী গো, বলিছে মোর মাও
বিনামূলে হব দাসী গো ছাওয়ালে জীয়াও।

পদ্মার কৃপায় কানাইর প্রাণ বাঁচিল। দেবী কৌশলে পার্ব্বতীকে আপন পূজার উপদেশ দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। তখন পার্ব্বতী—

পঞ্চবর্ণের গুঁড়িতে গো অষ্টনাগ আঁকিয়া
তাহাতে স্থাপিল ঘট ভক্তি যুত হইয়া।
জয়াদি জোকার দিয়া গো পূজয়ে মনসা
পার্ব্বতীর হইল পূর্ণ মনের যত আশা।

ক্রমে এই কথা দেশময় রাষ্ট্র হইল। জালু এখন লক্ষেশ্বর; সে সোনার ভৃঙ্গারে জল খায়, রূপার পালঙ্কে পার্ব্বতীকে লইয়া নিদ্রা যায়। কানাইয়াকে আর মাছ ধরিতে হয় না, রত্নাবতী নামে এক মৎস্য-ব্যবসায়ী ধনবান সওদাগরের কন্যাকে বিবাহ করিয়া জলটুঙ্গীর উপর বসিয়া হাওয়া খায়। এই কথা শুনিল চাঁদের স্ত্রী সনকা। সাধারণতঃ দেবদেবীর উপর যতটা ভক্তি বিশ্বাস থাকে, সনকার তদপেক্ষা কিছু অধিক ছিল। রাজপাটেশ্বরী তৎক্ষণাৎ জালুর স্ত্রীকে আনিবার জন্য সুবর্ণ শিবিকা প্রেরণ করিলেন। এবং অচিরেই তাহার নিকট হইতে পদ্মা পূজার সমস্ত বিবরণ অবগত হইলেন। অচিরেই মহা পূজার ধূম পড়িয়া গেল। সোনার মন্দিরে সোনার ঘট স্থাপিত হইল। কাঁসর ঝাঁজরী শঙ্খ ধ্বনিতে, জয়-মঙ্গল গীতে, রাজপুরী চম্পক মুখরিত হইয়া উঠিল। অগুরু, ধূপ, ধূনার গন্ধে আকাশ ভরিয়া গেল।

এই সংবাদ রাজ্যপতি চন্দ্রধরের কানে গেল। শৈব চূড়ামণি চন্দ্রধর, পাছে নব দেবতার পূজায় ব্যস্ত সমস্তা সনকা, তাহার চির উপাস্য চন্দ্রচূড়কে অবহেলা করেন, এই ভয়ে হেমতাল নামক তাহার ভীম দর্শন তালের যষ্টি হাতে করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। উপরে রত্ন বেদিকার উপর স্থাপিত সুবর্ণ ঘট, নীচে শিলাসনে ধ্যানমগ্না সনকা। সনকা মন প্রাণ পদ্মার চরণে উৎসর্গ করিয়া বসিয়া আছেন। সহসা মন্দিরের ভিতর ক্রম করিয়া শব্দ হইল, চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া সনকা দেখিলেন, পাষণ্ড স্বামী তাহার মহা পূজার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া, মন্দির হইতে বাহির হইতেছেন। ভগ্ন ঘট শতখণ্ড হইয়া রত্নবেদির উপর গড়াইয়া পড়িয়াছে। সনকা চৈতন্য হারাইলেন। কি সর্ব্বনাশ!

দাম্ভিক রাজা তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া—

"ঘোষণা করিয়া দিলা গো সপ্ত শত ঢোলে।
যে করিবে পদ্মা পূজা তারে দিবে শূলে॥

এই হইতেই বিবাদের সূত্রপাত। সেই দিন হইতে নিষ্ঠুর রাজার আজ্ঞায়, পদ্মা পূজা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইল। চন্দ্রধরের তাড়া খাইয়া—

"প্রাণ লয়ে পদ্মাদেবী উঠে দিলা রড়,
সীজ বৃক্ষের ডালেতে রহিলা করি ভর।

তখন পদ্মা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, ছলে বলে চন্দ্রধরকে বশীভূত করিতে না পারিলে, পূজা প্রচলনের উপায় নাই। তারপর একদিন যখন সুনির্ম্মল প্রভাতে চন্দ্রধর চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া বাণিজ্য যাত্রা করিলেন, তখন একদিন সময় পাইয়া বিষহরি, কালীদহ নীরে তাঁহার চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবাইয়া দিলেন। ধনরত্নসহ চৌদ্দ ডিঙ্গা, কালীদহের বিপুল আবর্ত্তে তলাইয়া গেল। মহাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে, মৃত প্রায় চন্দ্রধর তাঁহার এক বন্ধুর ঘাটে যাইয়া কূল পাইলেন। কিন্তু পদ্মার কপট চক্রান্তে ভুলিয়া, তাঁহার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধুও তাঁহাকে সেই দুঃসময়ে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিল।

সপ্ত দিনের অনাহার, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কণ্ঠাগত প্রাণ লইয়া চন্দ্রধর বনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অকস্মাৎ এক রমণী সুবর্ণ ভৃঙ্গারে জল, ও স্বর্ণপাত্রে সুরসাল বিবিধ জাতীয় ফল মূল লইয়া, তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রধর জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? রমণী বলিল—পূজার প্রসাদ। চন্দ্রধর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কার পূজার? রমণী উত্তর করিল, পদ্মার। মহারোষে তাড়া করিয়া, চন্দ্রধর তাহাকে মারিতে গেলেন।

'পদ্মার উচ্ছিষ্ট ফল লো তোর ঘৃণা নাই।
ফল জল রাখি আগে তোর মাথা খাই।"

বলা বাহুল্য কপট বেশধারিণী মনসা, সহসা বন মধ্যে অদৃশ্যা হইয়া গেলেন। কিছুকাল পরে চন্দ্রধর, বনের মধ্যে এক পাকা কাঁঠাল দেখিতে পাইলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা কাঁঠাল নহে। পদ্মার কপটে ভীমরুলের চাক্ তাহার নয়নে কাঁঠাল রূপে প্রতিভাত হইতেছিল। হতভাগ্য রাজা তদ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্ত করিবার জন্ম গাছে চড়িলেন। ঝাঁকে ঝাঁকে ভীমরুল আসিয়া, তীব্র দংশনে তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। গাছ হইতে পড়িয়া চন্দ্রধর লাফাইতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে পদ্মা শ্লেষ বাক্যে, চন্দ্রধরের কাটা ঘায়ে সূচ ফুটাইতে লাগিলেন—

"নৃত্য গীত নাহি দেখি না দেখি রাজন
কেবল বনের মধ্যে চাঁদের নাচন।"

চন্দ্রধরও প্রত্যুত্তর দিলেন—

"লঘু কাণি সময় পাইয়া উপহাসে
পরে ত বুঝিব আগে যাই যদি দেশে।"

বহু কষ্টে হৃত সর্ব্বস্ব রাজা গৃহে প্রবেশ করিলেন।

তারপর পদ্মার অনুচর বিষধরগণ, তাঁহার ছয় পুত্রকে সাতবার করিয়া দংশন করিল, সাতবারই মহাজ্ঞান বলে চন্দ্রধর তাহাদের প্রাণ দান করিলেন। তখন মনসা বেশ বুঝিতে পারিলেন, মহাজ্ঞান হরণ ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই।

একদিন ঘোর বনে মৃগয়ার্থ প্রবেশ করিয়াই—

"সম্মুখে দেখিলা রাজা আশ্চর্য্য রূপসী,
আকাশ হইতে বনে খসিয়াছে শশী।
জটা জূট পিঙ্গল বর্ণ গো মাথার না কেশ
সোনার বরণ অঙ্গ গো যোগিনীর বেশ।"

যুবতী যোগিনীর সেই অপরূপ রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া, নির্লজ্জ চন্দ্রধর, আপনি তাহার কাছে বিবাহ সম্বন্ধ মাগিলেন। রমণী বলিল—

"সঙ্কল্প আছয়ে এক গো জানাই তোমারে,
মহাজ্ঞান জানে যেই বিয়া করি তারে।
চান্দ বলে মহাজ্ঞান গো জানি ভাল আমি,
আমারে করহ বিয়া গো সুন্দর রমণী।"

যোগিনী এই কথা শুনিয়া, চকিত দৃষ্টিতে নয়ন ফিরাইয়া লইল, যেন সে চন্দ্রধরের সেই কথায় আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই। বনফুলের উপর দিয়া একটা ভ্রমর উড়িয়া যাইতেছিল। ক্ষিপ্র হস্তে চন্দ্রধর, তাহা ধরিয়া আনিয়া, ছিন্নশির করিয়া ভূতলে রক্ষা করিলেন। তারপর মন্ত্র প্রয়োগ মাত্র ভ্রমর তৎক্ষণাৎ উড়িয়া আর একটী ফুলে যাইয়া বসিল।

যোগিনী ঈষৎ হাসিয়া আপন শ্রবণ যুগল চন্দ্রধরের মুখের কাছে ধরিল।

তখন "মহাজ্ঞান দিলা রাজা আড়াই অক্ষর
অন্তরীক্ষে উঠি পদ্মা রথে কৈলা ভর।
মূল সূত্র ছিড়ে গেল, ভাবিয়া বিষাদ
চন্দ্রাবতী কহে রাজা ঘটিল প্রমাদ"।

হায়! এমন সুজলবতী বর্ষা কাদম্বিনী যে কেবল বজ্রাগ্নি পূর্ণ হইবে, হতভাগ্য রাজা তাহা জানিতে পারে নাই। কিন্তু ভাবিয়া কি হইবে? বিষদন্ত হীন অজগরের ন্যায় চন্দ্রধর, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। চাঁদের আর এক সহায় ছিল, সে তাহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ, ধন্বন্তরী ওঝা। পদ্মা দেখিলেন ধন্বন্তরী নিহত না হইলে, বিবাদে জয়লাভের আর কোন উপায় নাই। এখন গোপিনী বেশে বিষহরী শঙ্খপুরে যাইয়া, নানা ছল আলাপনে ওঝার স্ত্রীকে এমনি মোহিত করিলেন যে, ধন্বন্তরী পত্নী বাধ্য হইয়া তাহার সহিত সহেলা পাতিলেন। তাহার পর একদিন ধন্বন্তরীর আহার্য্য বস্তুতে মনসাদেবী ছল করিয়া এমন তীব্র বিষ মিশাইয়া দিলেন, যে সেই মহাবিষে ওঝা আর রক্ষা পাইলেন না। হতভাগ্য চাঁদ সওদাগরের দক্ষিণবাহু ছিন্ন হইল। বিশল্যকরণী ও মৃতসঞ্জীবনী প্রভৃতি পার্ব্বতীয় বনলতায় চাঁদের যে যোজন ব্যাপী উদ্যান সর্প ভয় হইতে এতকাল চম্পকরাজ্যকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, একদিন নাগবালাগণের নিশীথ আক্রমণে সে উদ্যানও সমূলে ধ্বংসীভূত হইল। নিরস্ত্র রথীর মত চম্পক রাজ্য, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আপন মৃত্যু দিনের যেন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তারপর পদ্মার আদেশে—

'ছয় নাগে দংশিলেক ছয়টী কুমারে
কাঙ্গা রাড়ী ছয় বধূ রহিলেক ঘরে"।

ক্রমে সহস্র সহস্র লোক, সর্পাঘাতে প্রাণ হারাইতে লাগিল। হতভাগ্য রাজা, প্রজার আর কোন উপায় বিধান করিতে সমর্থ হইলেন না। দলে দলে প্রজাগণ, রাজ্য ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সোনার চম্পক রাজ্য, নিশীথ শ্মশান তুল্য নীরব, নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল। শ্মশানের কোলে শাখাপত্রহীন তরুর ন্যায় চন্দ্রধর, শেষ যুদ্ধের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। আরতো তাহার পুত্র নাই। পুত্রশোকের ভয় কি?

"নেড়া ঘোড়া হইয়াছি বিধাতার বরে
এই বার লবুকাণি দেখাইব তোরে।"

কিন্তু ইহার কিছু দিন পরেই আবার—

"লক্ষ্মী কোজাগর দিনে জন্মিল কোঙর
সনকা রাখিল তার নাম লক্ষ্মীন্দর।"

নবকুমারের মুখ দর্শন করিয়া, আনন্দের পরিবর্ত্তে চন্দ্রধরের মনে আতঙ্কেরই সঞ্চার হইল। লক্ষ্মীন্দরকে দেখিলেই চন্দ্রধরের অন্তরের ভিতর কি যেন একটা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিত। রাজ্য গিয়াছে, ধন গিয়াছে, ছয় পুত্র গিয়াছে, পাছে ইহাকেও হারাই! শুভ দিনে জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত আনিয়া রাজা নবকুমারের জন্মকোষ্ঠি তৈয়ার করাইলেন। কোষ্ঠির ফল বড় ভাল হইলনা।

"গণক লিখিল কোষ্ঠি অতি অলক্ষণে।
কালনাগে খাবে পুত্রে কাল রাত্রির দিনে॥"

হতভাগ্য রাজা কোষ্ঠির ফল আপনি শুনিলেন; সে সংবাদ সনকাকে শুনাইতে সাহস হইলনা। ভাবিলেন পুত্রকে চিরকুমার রাখিব। তাহলেত আর কালরাত্রি আসিবে-না! বিশ্ব বিধাতার নির্ব্বন্ধ খণ্ডাইতে পারে কার সাধ্য! ক্রমে লক্ষ্মীন্দরের যৌবন কাল উপস্থিত, সনকা ধরিয়া বসিলেন, পুত্রকে বিবাহ দিতে হইবে। চক্ষের কোণে অশ্রু টুকু সে দিন আর রাজা সনকাকে দেখাইলেন না। বুকের ভিতর রাবণের চিতা। পুত্রের বিবাহ দিবার কি তাঁহার সাধ নাই?——তবে—

তারপর একদিন ঢাক ঢোল সাহানার রবে চম্পক নগরের রাজপথ মুখরিত হইয়া উঠিল। লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ। বিবাহ উৎসবে চন্দ্রধর ক্ষণকালের জন্যও যোগ দান করিতে পারিলেন না। তিনি পুত্রের বাসর গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সপ্ততল গিরিশৃঙ্গে সেই বিশালকায় লৌহ গৃহ নির্ম্মিত হইল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে চন্দ্রধর সেই লৌহ গৃহের চারিদিকে, এক বিশাল ব্যূহ রচনা করিলেন; তীক্ষ্ণক্ষুর নকুল, সর্পভুক্ শিখণ্ডী, হাতী ঘোড়া লোক লস্কর লইয়া স্বয়ং চন্দ্রধর ভীমকায় হেমতাল হাতে করিয়া, বিনিদ্র নয়নে, ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তারপর যখন নব দম্পতী বাসর গৃহে প্রবেশ করিলেন, সহসা—

"ভাঙ্গিল মঙ্গল ঘট হয়ে শতখান,
দেখিয়া সনকা মার উড়িল পরাণ।
জোকার না ফুটে কণ্ঠে অশুভ জানিয়া,
শকুনি গৃধিনী উড়ে মাঞ্জসে ঘেরিয়া"

এইরূপ অতি সন্তর্পণে, পুত্র ও পুত্রবধূকে মাঞ্জসে রক্ষা করিয়া, চন্দ্রধর নিশ্চিন্ত চিত্তে, মাঞ্জসের কবাট অর্গল বন্ধ করিলেন। হায়! মূর্খ রাজা বুঝিতে পারে নাই, কাল অগোচর কোনও পদার্থই নাই এমন যে মাতৃগর্ভ, দুরন্ত কাল কীট তাহাতেও প্রবেশ করিয়া, জীবন কোরক অকালে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। লোহার মাঞ্জস? সেত তুচ্ছ মর্ত্ত-মানবের ভ্রম প্রমাদের অধীন।

পরদিন প্রত্যুষে, মাঞ্জসের দ্বার উন্মোচিত হইল। দাম্ভিক রাজা দেখিলেন অকাল রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় তাঁহার বিগত জীবন পুত্র, পার্শ্বে ছিন্ন মলিনা লতা তাঁহার সেই হতভাগিনী পুত্র বধূ, শিশির সিক্ত সেফালী কুসুমটীর ন্যায় রাত্রে ফুটিয়া দিবসের কোলে যেন ঝরিয়া পড়িয়াছে।

"শাখে কান্দে পাখীরা পশুরা কান্দে বনে,
বেহুলা হইল রাড়ি কাল রাত্রির দিনে।"

তখনই চারিদিকে সহস্র কণ্ঠে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। পূর্ণিমার রাকার উপর অকাল অমাবস্যার কাল যবনিকা পড়িয়া ধীরে ধীরে সমস্ত চম্পক রাজ্য আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। রাজা পাগল, রাণী পাগলিনী, রাজ্য শ্মশান, চারিদিকে হাহাকার, শোক সিন্ধুর বিপুল উচ্ছ্বাস!

তারই মধ্যে একদিন হতভাগিনী মৃত পতিকে গলায় জড়াইয়া কলার মান্দাসে ভাসিয়া স্রোতস্বতীর শৈবালের মত, উন্মাদিনী বেশে কোন্ অজানিত দেশে ছুটিয়া চলিল। সনকা তখন ভাল মন্দ কিছুই বলিতে পারিলেন না। তিনি উন্মাদিনী! দেখিতে দেখিতে ছয়টী মাস কাটিয়া গেল। পিতা পুত্রের যাণ্মাসিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে বসিয়াছেন। তিনবার অশ্রুজলে পিণ্ড কলঙ্কিত হইল। সহসা চন্দ্রধর পশ্চাতে নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন, এক অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি। দীন হীনা মলিন বসনা এক অসহায়া রমণী তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে। দেখিয়াই চন্দ্রধরের একটা বিগত স্মৃতি মনে পড়িল। সে এক সদ্য বিধবার করুণ মুখ কান্তি। কিন্তু অন্তরের দীর্ঘশ্বাস মুখে ফুটিয়া বাহির হইলনা। বেঁচে আছেকি সে হত ভাগিনী! না না বৃথা আশা! কোন দিন কোন প্রলয় স্রোতে, কোন্ মহাতরঙ্গের মুখে পড়িয়া ভাসিয়া গিয়াছে! আর নাই, ইহ জীবনে আর তাহাকে—

সহসা গুঞ্জরীর নীথর জল রাশি ভেদ করিয়া দ্বিতীয় চম্পক তুল্য এক তরীর বহর ভাসিয়া উঠিল। তখনই চারিদিকে আনন্দের রোল পড়িয়া গেল। ছয় ভাইর সঙ্গে আসিয়া লক্ষ্মীন্দর পিতার চরণ বন্দনা করিল। তখন ঘটা করিয়া পূজার আয়োজন হইল —

* * * *

"সেই হতে মনসার পূজা জগতে প্রচার'
যে যে কামনা করে সিদ্ধি হয় তার।
অপুত্রের পুত্র হয় নির্দ্ধনের ধন,
মৃত পুত্র জিয়ে অন্ধ, পায় নয়ন।
মনসা চরণ যেই পূজে ভক্তি ভরে,
সর্প ভয় হতে মাতা রাখেন তাহারে।

* * * *

পূজার উপাখ্যান শেষ হইল। এখন সেই হতভাগিনীর কথা। যে ভীষণ লোক নিন্দা, গরীয়সী জনকনন্দিনীকে পর্য্যন্ত লোক সমাজে কলঙ্কিতা করিয়াছিল, সেই লোক নিন্দার হস্ত হইতে পুণ্য প্রভাময়ী বেহুলার জীবন নিষ্কৃতি পাইলনা। কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পুণ্যবতী মহালোকে চলিয়া গেলেন। স্বর্গের সুরভি কুসুম মর্ত্ত্যের কণ্টক বনে স্থান পাইবে কেন?

ইহাই সহস্র বৎসরের অতীত কাহিনী, অথচ নিত্য নূতন। যুগযুগান্তরের অতীত কথা, অথচ যেন সেদিনের কোনও প্রত্যক্ষ ঘটনা। বেহুলা ময়মনসিংহের বড় আদরের, বড় সোহাগের ধন। যেন কোনও সুবিশাল উপবনের একটি মাত্র আনন্দ কুসুম! যেন কোন সন্তান বৎসল রাজার বংশের দুলালী—একমাত্র দুহিতা। সীতা সাবিত্রীর অপেক্ষা বেহুলা ময়মনসিংহবাসীর অত্যধিক আদরের সামগ্রী। ঘরের মেয়ের মত সুপরিচিতা। সাবিত্রীর পিতার নাম অনেকেই না জানিতে পারে, কিন্তু চাঁদ বেনেকে নাজানে, শাহ রাজাকে নাচেনে, বেহুলাকে না বুঝে, এমন লোক ময়মনসিংহে, কি শিক্ষিত কি

অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মধ্যেই বিরল। দশ বৎসরের মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলে, সেও বেহুলার পুণ্য কাহিনী অনর্গল শুনাইয়া দিবে।

কিন্তু এই অনন্ত ভালবাসার মধ্যেও বেহুলার প্রতি একটা অনাদরের ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে! সীতা, সাবিত্রী নাম অনেকে রাখে, কিন্তু বেহুলার নামে নিজ দুহিতার নাম রাখিতে বড় দেখা যায়না। যদি কেহ কাহাকেও আশীর্ব্বাদ করে, তুমি সীতা সাবিত্রীর মত হও, তবে সে আশীর্ব্বাদ অবনতশিরে গ্রহণ করিবে। কিন্তু যদি বলে বেহুলার মত হও, তা হলে সর্ব্বনাশ! বেহুলার প্রতি এই অনাদরের কারণ বোধ হয় বেহুলারই হতভাগ্য। এমন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ কারও ভাগ্যে ঘটে নাই। সীতা স্বামী সঙ্গে বনবাসিনী, সে ত্যাগ স্বীকারেও সুখ আছে। বিশেষ পতিব্রতা পতিসঙ্গে যেথানেই থাকেন দুঃখ বোধ করিবেন না ইহা স্বাভাবিক। সীতার যা দুঃখ অশোক বন-বাসকালে। পতি পরিত্যক্তা হইয়া বনবাসের কিছু দিন পরেই সীতা যমজ সন্তান কোলে লইয়া সকল দুঃখ পাসরিয়াছিলেন। বনবাসের অতি মাত্র দুঃখেও এই টুকু সুখ ছিল। আর সাবিত্রী—সাবিত্রীর দুঃখে বিদ্যুতের প্রখরতা আছে। কিন্তু তাহা তেমনি ক্ষণস্থায়ী। দুঃখের দাঁত হৃদয়ে বসিতে না বসিতেই আবার সুখ। সাবিত্রীর সে সুখ নিরবচ্ছিন্ন। কিন্তু বেহুলার দুঃখের অন্ত নাই, অবধি নাই, কূল নাই, শেষ নাই, সংখ্যা নাই। যেন কোনও হতভাগ্য জলমগ্ন ব্যক্তিকে তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া কেবলই ডুবাইয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। উদ্ধার নাই, —মুক্তি নাই। বেহুলা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভাগিনী। বেহুলাকে সবাই আদর করে, কিন্তু বেহুলার মত কেহই হইতে চায় না। চন্দ্রাবতী তাহার মেয়েলী সঙ্গীতের শেষ ভাগে লিখিয়াছেন—

"বেহুলার মত দুঃখী নাই ধরা তলে
ভাসান কাহিনী গাথা নয়নের জলে।"

চন্দ্রাবতী বঙ্গ নারীকে উপদেশ দিয়াছেন ——

"বেহুলার মত কেউ পতিব্রতা হয়।
বিশ্বাসে জিয়াবে পতি চন্দ্রাবতী কয়॥"

শ্রীচন্দ্রকুমার দে।
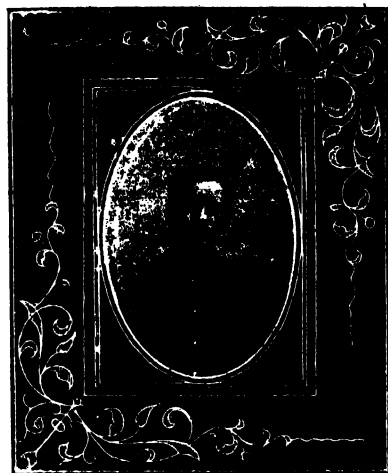
৺রজনীকান্ত চৌধুরী

আমরা গভীর শোকসন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে আমাদিগের অকৃত্রিম সুহৃদ সুকবি রজনীকান্ত চৌধুরী মহাশয় বিগত ২০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। রজনীকান্ত ময়মনসিংহ জেলার পরগণা রণভাওয়ালের অন্তর্গত ফরিদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল অবধিই কলাশিল্পে তাঁহার একান্ত অনুরাগ ছিল। তদুপরি ৪ বৎসর কাল কলিকাতা আর্ট স্কুলে বিদ্যালাভ করিয়া রজনী বাবু চিত্রশিল্পে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাঁহার অঙ্কিত নানাবিধ চিত্র অনেক গৃহ সুশোভিত করিতেছে। ৺প্রমদাচরণ সেনের "সখাতে" ও রজনী বাবুর অঙ্কিত অনেক চিত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কনে রজনী বাবু বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেন।

রজনীকান্ত নিপুণ সাহিত্যসেবী ছিলেন। ময়মনসিংহের সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। লোকের অনুরোধ মত উপস্থিত সঙ্গীত ও কবিতা রচনায় তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে দ্বাদশ মাসের বর্ণনা করিয়া তিনি "বার মাস" নামক একখানা কবিতা পুস্তক প্রকাশিত করেন। ঐ সময়ে এই পুস্তকখানি দেশ বিদেশে যথেষ্ট আদৃত হইয়াছিল। শীঘ্রই এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত

হইয়া যায়। পাঠক সমাজের আগ্রহাতিশয্য সত্ত্বেও দরিদ্র কবি উহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিতে পারেন নাই। এই প্রাচীন পুস্তকখানা এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়া গেলেও রসিক কবি উহাতে যে সকল বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাহা এখনও অনেকের স্মৃতি পটে অঙ্কিত রহিয়াছে। ভাদ্র মাসের বর্ণনায়—

"হায় কি মজা, হায় কি মজা,
মা করবে আজ তালের পিঠা"

পাঠে অনেক বৃদ্ধের রসনায়ও জল সঞ্চার করিয়া থাকে। রজনী বাবু স্বহস্তে প্রস্তুত কয়েকখানা উড্ কাট্ দিয়া এই পুস্তক খানা বাহির করেন। আমাদের মনে হয় "শিশু বোধকের" পরে "বারমাসই" প্রথম সচিত্র শিশুপাঠ্য বাঙ্গালা পুস্তক। এ বিষয়ে রজনী বাবুর মৌলিকতা প্রশংসনীয়।

কেবল কৌতুক-কবিতাতেই রজনী বাবুর সাহিত্য-সেবা পর্য্যবসিত হয় নাই। সমাজের নানাবিধ দুর্নীতি ও কুরীতি দূরীকরণ মানসে তিনি কয়েকখানি সামাজিক খণ্ড কাব্যও প্রকাশিত করেন। কয়েক বৎসর হইল বিবাহে পণপ্রথার দোষ প্রদর্শন করিয়া তিনি "বাঘা তেঁতুল" নামে একখানা কবিতা পুস্তক বাহির করেন। "চিন্তা ও চাবুক", "পূজার চাট্নি", "মাতৃ সঙ্গীত" প্রভৃতি কয়েকখানি কবিতা পুস্তকও তিনি প্রণয়ন করেন। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বেও রজনী বাবু "বর কর্ত্তার কীর্ত্তি মন্দির" নামে স্নেহলতার আত্মত্যাগ-কাহিনী প্রকাশিত করিয়া যান।

ময়মনসিংহ হইতে যে 'আরতি" নামক মাসিক পত্রিকা বাহির হইত, তাহার পরিচালকগণমধ্যে রজনী বাবুও একজন ছিলেন এবং মাঝে মাঝে তাঁহার রচনাও উহাতে প্রকাশিত হইত।

"আরতি" বাহির হওয়ার পূর্ব্বে ময়মনসিংহ হইতে "বাসনা" নামক একখানা মাসিক পত্র বাহির হইবার উদ্যোগ হইয়াছিল, সেই উদ্যোগকারিগণ মধ্যেও রজনী বাবু একজন ছিলেন; এমন কি তিনি "বাসনার" মলাটের জন্য লতাপত্রাঙ্কিত ব্লকও প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়া ছিলেন। নানা কারণে "বাসনা" আর বাহির হয় নাই।

বিগত ১৩১৩ সালে ময়মনসিংহ হইতে "দুর্ম্মুখ" নামক যে আকস্মিক পত্র বাহির হইয়াছিল, রজনীকান্তের বিদ্রূপাত্মক লেখা তাহাতেও প্রকাশিত হইত। দেশের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বিদ্রূপ করিয়া "গঙ্গাজলী v. s. সুর্য্যাভ্যালী" শীর্ষক যে কবিতাটী বাহির হইয়াছিল, তাহা রজনীকান্তেরই লেখনী প্রসূত। আমরা কবিতাটী নিম্নে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

"শুন বার্ত্তা ঠাকুর কর্ত্তা, ভেঙ্গে বলি তোমারে।
বক্তাগিরি ফলাও সদা সকাল বিকাল দুপরে॥
বল্লে কথা বুঝনা তা আছ কি এক খেয়ানে।
ভাগ্যের কর্ত্তা ভগবান, ভাগ্যে কি হয় কে জানে॥
রাজাগিরি সোজা নয়, কলের মত ফলে না।
চসমা চোকে বসে বসে হাত বাড়ালে মিলেনা॥
দেশী বাণের ধাকা খেয়ে রাজ্য এলো ভাসিয়ে।
ভাগ্যে ছিল তাইতে গেল গলায় গলায় জড়িয়ে॥
রাজা হয়ে বস্‌লে তুমি, মন্ত্রী হল বিস্ফোটক।
শনি হয়ে চাপলো ঘাড়ে বুঝেনা সে হক্ বেহক্॥
রাজা হলে কাজের বেলা বাজের মত চক্ষু চাই।
গুণের নিধি বলবো কি আর, সেটা তোমার মাত্র নাই॥
তুমি কর ছুটাছুটি ভাগলপুরে কোলকাতায়।
কালা মুখো কর্ম্মনাশা মন্ত্রী পিছে পিছে ধায়॥
উজির নাজির বক্সি কোটাল এরাই মাটি কল্লে সব।
দুদিন বাদে শুনতে হয় বা চারি দিকেই ছি ছি রব॥
ছিছি বুদ্ধি, মিছামিছি সাত সমুদ্র ডিঙ্গালে।
পূর্ব্ববাঙ্গালা দখল করল ছিলটি এক বাঙ্গালে॥
গঙ্গাজলী দূরে ফেলি সুর্য্যাভ্যালীর হবে জয়।
বল দেখি কর্ত্তা বাবু এ দুঃখ কি গায়ে সয়॥
সে দিকেতে রণ সাজে যেতে বলছি কতবার।
তিনি মারেন সাম্য ভোজ লুচি মণ্ডা ফলাহার॥
কল্পরসের বেঁটা যদি ধুমে ধামে দিতে চাও।
সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে ত্বরা পূর্ব্ববঙ্গে চলে যাও॥
দশের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে দেশের কর ব্যবস্থা।
মুলতবী চাউল আছে সেথা নিয়ে এসো কয় বস্তা॥

বলা বাহুল্য এই কবিতায় দেশের তৎকালীন অনেক কথার আভাস আছে।

প্রতি বৎসর দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে হোলিগান লেখা রজনী কান্তের এক প্রধান কার্য্য ছিল।

আমরা অবগত হইলাম, রজনীকান্ত বহু অপ্রকাশিত কবিতা ও পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন; দরিদ্র কবি ঐ সকল মুদ্রিত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। ভগবান্ রজনীকান্তের আত্মার সদ্গতি বিধান ও তাঁহার সন্তান সন্ততির প্রাণে সান্ত্বনা দান করুন, ইহাই আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়।

শুভ দৃষ্টি

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(৫)

সন্ধ্যার সময় রাখালের জ্বর ছাড়িল। শৈবাল রাখালকে লইয়া বসিয়া রহিল। আমি মর্ম্ম যাতনায় অস্থির হইয়া শান্তির কামনায় ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম। বহু দিন পর পুনরায় "গীতা" খুলিলাম। কতক্ষণ গীতা পাঠ করিলাম; গীতা আর আমার শান্তি বিধান করিতে সমর্থ হইল না। প্রথম জীবনের ভাব রাজ্য যেন সংপ্রসারিত হইয়া আমাকে গ্রাস করিল। আমি সরলার চিন্তায় আত্মহারা হইলাম।

সেই বাসর গৃহ—সরলার ঢল ঢল মুখখানি, মৃদু মন্দ হাসি, ইঙ্গিতে সম্ভাষণ, সেই শুভ রাত্রির হাস্য পরিহাস, উপহার, অঙ্গুরী বিনিময়—লজ্জার কমনীয় মূর্ত্তি কোথায় সে? তারপর পুনরায় কলিকাতায়—সেই বিষাদের শান্ত মূর্ত্তি, তাহার পিতার মৃত্যু শয্যা, পায়ে ধরিয়া অনুরোধ, প্রাণের বেদনাপূর্ণ লিপি—আমি পাষণ্ড অমূল্য রত্ন পায়ে ঠেলিয়া এখন তাহার জন্য উন্মত্ত হইয়াছি। হায়—না জানি সে দুঃখিনী কোথায়; কি ভাবে দিন কাটাইতেছে, উদরান্নের জন্য কত লাঞ্ছনা কত গঞ্জনা সহিতেছে, আমি একবার চিন্তা করিতেছি না। ধর্ম্ম পত্নীর মুখের দিকে না তাকাইয়া, পরিণামের দিকে লক্ষ্য না করিয়া—চলিয়া আসিলাম, বালিকা সারা রাত কাঁদিয়া আমার বুক ভাসাইল, আমার পাষাণ বক্ষ বিচলিত হইল না। পা ধরিয়া আর একটী দিন থাকিতে অনুরোধ করিল—তাহার পিতাকে মৃত্যু শয্যায় রাখিয়া—মূঢ় আমি—চলিয়া আসিলাম! এর পর তাহার কি হইল, কোন দিকে গতি হইল, বাঁচিল কি মরিল, গৃহে রহিল, কি পথে বসিল কোন তত্ত্ব করিলাম না।
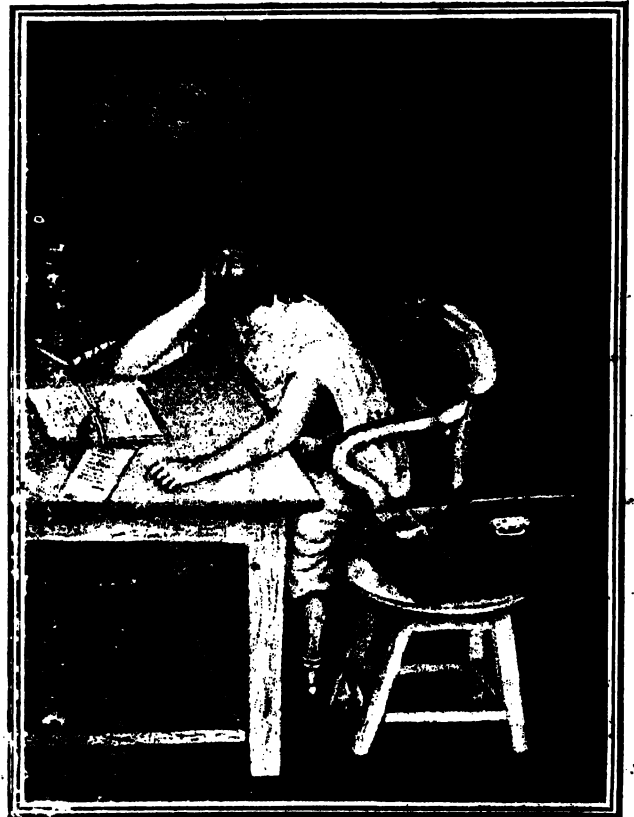
হাতবাক্স খুলিয়া সরলার "প্রীতি উপহার" ফটোখানা বাহির করিলাম। দেয়ালের গায়ে বোঁচার একখানা ছবি টাঙ্গান ছিল, তাহা ফেলিয়া দিয়া সরলার পবিত্র মূর্ত্তি তাহাতে রক্ষা করিলাম। বড় দিনের ছুটীতে সরলাকে উপহার দিবার জন্য আমার যে ফটো তুলিয়াছিলাম, তাহা তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিলাম। সরলার অঙ্গুরীটি লইয়া হস্তে পরিলাম।

এই সময় পার্শ্বের বাড়ী হইতে হারমোনিয়াম সহযোগে এই সঙ্গীতটী গীত হইতে লাগিল—

"আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই তুমি তাই গো!
তোমা ছাড়া এ জগতে মোর কেহ নাই কিছু নাই গো।
তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও,
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝারে
আর কিছু নাহি চাই গো॥
আমি তোমার বিরহে রহিব তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ বরষ মাস,
যদি আর কারে ভাল বাস, যদি আর নাহি ফিরে এস,
তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও আমি যেন দুঃখ পাই গো॥

সঙ্গীতটী কাণের ভিতর দিয়া গিয়া মর্ম্মস্পর্শ করিল। আমি অশ্রু রাখিতে পারিলাম না।

কলিকাতা হইতে লিখিত সরলার একখানা চিঠি অশ্রুসিক্ত নয়নে আকুল প্রাণে পড়িতে লাগিলাম। চিঠিখানাতে যেন গানের রাগিনীটী ধ্বনিত হইতেছিল—

সরলা লিখিয়াছে * * * আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী। শত অপরাধে অপরাধিনী হইলেও পরিত্যাগ করিতে পার না। আজ বাবা মৃত্যু শয্যায় নতুবা কখনই তুমি আমাকে ফেলিয়া যাইতে পারিতে না। আমি শত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া তোমার সঙ্গিনী হইতাম। * * * বাবা সারিয়া উঠিলে আমাকে আসিয়া লইয়া যাইও ইহাই একমাত্র অনুরোধ। * * আমি তোমাকে এক দিনের জন্য পাইয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছিলাম। সেও তোমার অনুগ্রহ—অযাচিত কৃপা। আর একটা দিন থাকিলে * * *

চিঠি কতবার পড়িলাম। কিছুতেই তৃপ্তি মিটিল না। উদাস মনে ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিলাম। ভগবান তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

প্রাতঃকালে রাখাল ভালই ছিল। আমি কাছে বসিয়া ডাকিলাম—"রাখাল তোমার কি হইয়াছিল?"

রাখাল চুপ করিয়া রহিল—

আমি আহ্লাদ দেখাইয়া বলিলাম—"একখানা ছবি নিবে?"

রাখাল বলিল—"নিব।"

আমি—"তবে তোমার মার নিকট বলিওনা যে আমি মারিয়াছি।"

রাখাল মৃদুস্বরে বলিল—"না বলিব না।"

আমি সেই যুগল চিত্র—"রাখালের পার্শ্বে দেয়ালে ঝুলাইয়া রাখিলাম। বলিলাম—তোমার ছবি এখানে থাক। তুমিও দেখ আমিও দেখি. ধরিও না নষ্ট হইবে।"

রাখাল মাথায় সায় দিল। আমি দেখিলাম রাখাল এখনও ভয় পাইতেছে।

আমি তাহার মাথায় ও গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম—"রাখাল আমি তোমাকে আর কোন দিন মারিব না। তোমার কোন ভয় নাই। তুমি খাইবে এখন?" রাখাল কথা বলিল না।

আমি বলিলাম—"তুমি ছবির বই নিবে?"

রাখাল বলিল—"আমি "মোহন ভোগ" নিব।"

পঁচাকে একখানা "মোহন ভোগ" আনিতে পাঠাইলাম।

রাখাল শৈবালকে ডাকিল।

আমি বলিলাম—"কি চাও আমি দিতেছি।" সে আমার নিকট কিছু চাহিল না। আমি বলিলাম কি চাও যদি আমাকে বল, তবে আমি আমার এই সুন্দর আঙ্গুটটী তোমার হাতে দিতে পারি।

রাখাল বলিল—"বলি।"

আমি—"তোমার দিদিকে কেন ডাক?"

রাখাল বলিল—"ক্ষুধা পাইয়াছে।"

আমি শৈবালকে আসিতে বলিয়া, "অঙ্গুরীটী রাখালের হাতে রাখিয়া দিলাম। বলিলাম সাবধানে রাখিও। হারাইয়া যাইবে। রাত আমাকে দিয়া ফেলিও।"

রাখালের নিকট আমি এমন অপরাধী যে তাহাকে আমার সর্ব্বস্ব দিয়াও সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছা হইতেছে। বাস্তবিক শৈবাল যথার্থই বলিয়াছে, স্নেহের ভিত্তি চরিত্রের উপর। শিশুর চরিত্র আমাকে মোহিত করিয়াছিল।

আজ দুদিন শৈবালের সহিত "শুভ-দৃষ্টি" নাই. সেও মুখ তুলিয়া আমাকে সম্ভাষণ করে না। জানি না জগৎপতির ইহাই শুভ ইচ্ছা কি না।

আফিসে যাইবার সময় অন্য দিকে ফিরিয়াই শৈবালকে বলিলাম "যে কোঠায় রাখাল আছে,সেখানেই তাহার মার স্থান করিয়া দিও; দেখিও ভদ্র-কন্যা অতিথি, তার কোনও অমর্য্যাদা না হয়। বয়সে যে বড় সেই প্রণম্য, রাখালের মাকে প্রণাম করিয়া সংবর্দ্ধনা করিও। ২ টায় গাড়ী আসিবে, পঁচাকে ও চাকরকে ষ্টেশনে পাঠাইও, খাওয়া দাওয়ার যোগাড় রাখিও। সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিও।"

শৈবাল মাথা হেঁট্ করিয়া তাহার কর্ত্তব্যের তালিকা শুনিল।

(৬)

আফিস হইতে আসিবা মাত্র শৈবাল আসিয়া তাহার প্রতি অর্পিত কার্য্যের বিস্তৃত কৈফিয়ত দিল। এবার তাহার চক্ষু দুটী হাস্যোজ্জ্বল—"সে আমার মুখের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া বলিতে লাগিল, রাখালের মা আসিয়াছেন,আমার প্রণাম লইলেন না। তাহার অবস্থা বড়ই অসচ্ছল, পরিধানের বস্ত্রখানা নানাস্থানে সেলাই করা, দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইয়াছে। রাখালের জন্য আমাদের নিকট যেন কত ঋণী। আমার সম্মুখে তিনি চৌকীতে বসিতে সঙ্কোচ মনে করেন, বলিলেন আপনারা প্রতিপালক আমরা আশ্রিত। আমি কত করিয়া বলিলাম বসিলেন না, পরে নিজে বসিয়া তাহাকে চৌকীতে বসাইয়াছি। তাহার চেহারা ও চরিত্রের ভিতর দিয়া যেন পুণ্য জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। রাখাল উপযুক্ত মায়ের উপযুক্ত ছেলে।"

আমি কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে সব শুনিলাম, ছাড়িয়া বলিলাম—"রাখাল ত তাহার নিকট কিছু বলে নাই ?"

শৈবাল বলিল—"আপনি যে ছবি, বই ও আংটী দিয়াছিলেন তাহা সে তাহার মাকে দেখাইয়াছে। আর আমি যে তাহাকে খুব ভালবাসি তাহা বলিয়াছে।"

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মারের কথা'ত বলে নাই।"

শৈবাল বলিল—"রাখাল কি তেমন ছেলে!"

আমি—"সে তোমারই শিক্ষা।" শৈবাল দুঃখিত হইল। আমি কথা কাটিয়া বলিলাম—"আমি রাখালকে দেখিব। দেখ সেখানে কে আছে।"

শৈবাল বলিল—"কেহই নাই কেবল রাখালের মা।"

আমি—"তাঁহাকে একটী বার সরিয়া যাইতে বল।"

শৈবাল তাচ্ছল্য ভাবে বলিল—"তিনি সরিয়া যাইবেন কেন ?"

আমি—"তিনি এক সমাজের ভদ্র স্ত্রী, তাঁহার সাক্ষাতে আমার যাওয়া অসঙ্গত নয় কি ?"

শৈবাল পূর্ব্বভাবে বলিল—"আপনি সকল বিষয়েই একটানা একটা "অসঙ্গত" দেখেন, ইহাও কি অসঙ্গত নহে ? "সন্দেহ" "মিথ্যা" "অসঙ্গত" ইহাই আপনার মূল মন্ত্র। মনে পাপ না থাকিলে নিঃসঙ্কোচে কার্য্য করিতে হইবে।"

আমি শৈবালের সরল ভাবের নিকট লজ্জিত হইলাম বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে বলিলাম—"তোমার সরলতা ও সত্যবাদিতাই আজ আমাকে অশান্তির কটাহে পুড়িতেছে। তোমার এত সরল ব্যবহারের আমি পক্ষপাতী নই।"

শৈবাল অগত্যা তাহাই করিল। আমি রাখালকে ডাকিতে ডাকিতে ভিতর কক্ষে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম রাখাল অঙ্গুরী হাতে লইয়া "মোহন ভোগ" পড়িতেছে।

আমি বলিলাম—"ক্ষুধা পেয়েছে ?"

রাখাল বলিল—"খাইয়াছি।"

দেখিলাম—শৈবাল ঘর খানাকে বেশ পরিষ্কার করিয়াছে। আমি বলিলাম—"বেশ বাবা পড়। আমি যে তোমাকে মেরেছি তাকি তুমি তোমার মাকে বলেছ ?"

রাখাল হাসিয়া বলিল—"আপনিতো বলিলেন, আমার কি দোষ ?"

শৈবাল হাসিয়া উঠিল। আমি ধীরে ধীরে চলিয়া আসিলাম।

(ক্রমশঃ)

আলুকী পরিবার ভুক্ত উদ্ভিদ।

বন্দ আলু বা মেটে আলু,কন্দ-মূল বিশিষ্ট লতাজাতীয় উদ্ভিদ। বঙ্গদেশে ইহা সচরাচর মে'টে আলু নামে প্রসিদ্ধ। ইংরেজী ভাষায় ইহাকে যাম্ (yam) কহে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম ডাইওস্কোরিয়া (Dioscorea)। ইহা লতাজাতীয় উদ্ভিদ হইলেও সাধারণ লতার স্বভাব বিশিষ্ট নহে। ইহাকে পরিবেষ্টিকা উর্দ্ধগা লতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার গাছ স্বভাবতঃই অন্য গাছকে বেষ্টন করিয়া উর্দ্ধদিগে গমন করিয়া থাকে ইহারা নানা জাতি। কোন কোন জাতির পাতা অতিশয় সুন্দর। উদ্যান শোভার জন্য এই সকল জাতির চাষ হইয়া থাকে। কোন কোন জাতির মূল খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। উহাদের মূল সুখাদ্য। কন্দমূল ও কাণ্ডের সংযোগ স্থান হইতে গুচ্ছমূল সকল বহির্গত হইয়া থাকে। ইহাদের কোন কোন জাতির পুরাতন মূল কখন কখন ২০।২৫ সের বা তভোধিক ওজন বিশিষ্টও হইয়া থাকে। এক বৎসর বয়সের মূল বড় হয় না। জাতি ও ভূমির অবস্থা বিবেচনায় এক বৎসরে ইহাদের মূল ১ হইতে ৩ সের ওজনের অধিক কদাচিৎ হইয়া থাকে। ইহাদের মূল যতই অধিক বয়সের হইবে ততই ইহারা আকারে বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু ২। ৩ বৎসরের উর্দ্ধ বয়সের মূল খাইতে সুস্বাদু হয়না। উহার মাংস কঠিন ও আঁশযুক্ত হয়। ইহাদের অধিকাংশ জাতির মাংস পিচ্ছিল। অগ্নি সংযোগে জলে সিদ্ধ করিয়া উহার পিচ্ছিল পদার্থ দূর করিয়া তৎপর পাক করিতে হয়। ইহাদের কোন কোন জাতির বীজ হয়। গাছের কাণ্ড ও পাতার সংযোগস্থলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডালে ও কাণ্ডের মস্তকে মূলবৎ গুটী জন্মিয়া থাকে। উহারাই বীজের কার্য্য সাধন করে। এই সকল বীজমূল ধুসর বর্ণের হয়। উহাদের গাত্র কাটল রেখান্বিত অর্থাৎ কাটা কাটা রেখাবৃত। এই সকল বীজমূলও খাওয়া যায়।

ইহাদের কোন কোন জাতির পাতা বৃহৎ; হৃৎপিণ্ডাকার; অগ্রভাগ সরু; সমগ্রপাতা রেখান্বিত ও তরঙ্গান্বিত। ঐসকল রেখাই পত্রের পঞ্জরাস্থি। উহারা মধ্যশিরা হইতে বহির্গত হইয়া, পত্রের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহাদের পাতা জলে পচাইয়া যে অস্থিপঞ্জর (Skeleton leaf) প্রাপ্ত হওয়া যায় উহা দেখিতে বড়ই সুন্দর। কোন কোন জাতির পাতা ক্ষুদ্র ও দীর্ঘাকার ও বক্র রেখাবৃত। ইহাদের পাতা গাঢ় ও চক চকে সবুজ বর্ণ। কোন কোন জাতির পাতার তলদেশ বেগুণে বর্ণের। এই বর্ণ নয়নের প্রীতিকর। কোন কোন জাতির মূলের উপরি ভাগ লম্বা, ঐ অংশ আঁশ পূর্ণ ও কঠিন। সেই জন্য অখাদ্য। এই অংশ কর্ত্তন করিয়া রোপণ করিলে উহা হইতে নূতন গাছ উৎপন্ন হয়। ইহাদের বীজ হইতেও গাছ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বীজ অর্থে খাসবীজ (Seedproper) বুঝিতে হইবে না। ইহাদের বীজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলুর আকার। উহারা গোলাকার বা দীর্ঘাকৃতি হয়। গাছের শাখায় শাখায় উহারা ঝুলিয়া থাকে। উহারা ভূপতিত হইলেই উহা হইতে নূতন গাছ উৎপন্ন হইয়া উহাদের বংশ বিস্তার কার্য্য সাধিত হয়।

ইহাদের কোন কোন জাতির কাণ্ড চতুষ্কোণ ও কোন কোন জাতির কাণ্ডগোল। কোন কোন জাতির মূলের উপরিভাগ গোল হইলেও উপরিস্থ কাণ্ড চতুষ্কোণ হয়। ইহাদের মূলের সংস্কৃত নাম আলুক বা আলুকী। ইহা শীত বীর্য্য, বিষ্টম্ভি, মধুর রস, গুরু, মলমূত্র নিঃসারক, রুক্ষ, দুষ্পাচ্য, রক্তপিত্ত নাশক, কফানিল বর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রজনক ও স্তন্যবর্দ্ধক।

"আলুকং শীতলং সর্ব্বং বিষ্টম্ভিমধুরং গুরু।
সৃষ্ট মূত্রমলং রুক্ষং দুর্জ্জরং রক্তপিত্তনুৎ।
কফানিলকরং বল্যং বৃষ্যং স্তন্য বিবর্দ্ধনম্।"

কোন কোন জাতির মূল মিষ্টাস্বাদ। আজকাল পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র ইহা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ইউরোপীয় জাতিও ইহা খাইতে ভাল বাসে।

অধুনা দক্ষিণ আমেরিকায় ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, বহুল পরিমাণে ইহার চাষ হইতেছে। ঐসকল দেশের অধিবাসীরা ইহার মূল নিয়ত খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতেছে। ইহারা ইহাকে গোল আলুর স্থলবর্ত্তী বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। কয়েকটী জাতি ঐসকলদেশের আদিম অধিবাসী,তদ্ভিন্ন এদেশজাত আলুর মূলও ঐসকল

দেশে নীত হইয়াছে। তথায় উহাদেরও চাষ হইতেছে। কয়েকটী জাতি জাপান ও চীন দেশেরও আদিম অধিবাসী। গ্রীষ্ম প্রধান দেশই ইহাদের চাষ পক্ষে বিশেষ উপযোগী. সমুদ্রের উপকুল হইতে ২০০০।৩০০০ হাজার ফুট উচ্চ স্থানেও ইহারা জন্মিয়া থাকে। ইহারা আফ্রিকার কোন কোন অংশ, ভারতবর্ষ, সিংহলদ্বীপ, ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, মালয় ও ব্রহ্মদেশেরই আদিম অধিবাসী।

এদেশে রীতিমত ইহাদের চাষ হয় না। রীতিমত চাষ হইলে দুর্ভিক্ষের সময় ইহারা এদেশবাসীর মহদুপকার সাধন করিতে পারে। এইরূপ কোন কোন দেশে রীতিমত ইহাদের চাষ হইতেছে। এদেশে সাধারণতঃ জঙ্গলস্থিত বৃহৎ বা মধ্যমাকার বৃক্ষের পাদদেশের নিকটে ইহাদের মূল বা বীজ রোপণ করা হয়। কখন কখন স্বভাবতঃই ইহাদের অজানা (Selfswon) বীজ হইতেই গাছ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরে উহাদের মূল পরিপক্ক হইলে উহাদিগকে উঠাইয়া লওয়া হয়। বর্ষাকালে ইহাদের গাছ সজীব থাকে। শীতকালে উহারা শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়। তৎপর বসন্তাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন মূল হইতে নূতন গাছ বহির্গত হইয়া থাকে। ইহাদের মূলকে ঘরে উঠাইয়া রাখিলেও রোপণ করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হওয়া মাত্র উহা হইতে গাছ বহির্গত হইয়া থাকে। ইহাদের বীজ-মূল ঘরে রাখিতে হইলে মৃত্তিকার বা বালির উপরে রাখিতে হয়। বসত বাটীর বা উহার উপকণ্ঠস্থ আবাদ অনুপযোগী জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে ইহার চাষ করাই সঙ্গত। কেননা তাহা হইলে অব্যবহার্য্য ভূমি হইতেও মূল্যবান ফসল প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রায় সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই ইহা জন্মে। অ‍াঠাল ও কঙ্করময় কঠিন ভূমি ইহাদের আবাদ পক্ষে উপযোগী নহে। হাল্কা দোয়াশ ও বালিপ্রধান মৃত্তিকাই ইহাদের চাষ পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহাদের চাষে সারের ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। সার ব্যবহার করিতে হইলে পাতার সার বা অন্য কোন উদ্ভিজ্জসার ব্যবহার করিতে হয়। ইহার অভাবে পুরাতন গো-বিষ্ঠার সারও একরূপ মন্দনহে। জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিতে গাছের পাতা ও মূল ইত্যাদি পচিয়া স্বভাবতঃ যে সার উৎপন্ন হয় উহাই ইহাদের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। তবে আবশ্যক মত অন্য সারও ব্যবহার করা যাইতে পারে, যে স্থানে ইহার চাষ করিতে হইবে ঐস্থানের মৃত্তিকার সহিত ছাইও পূর্ব্বোক্ত সার মিশ্রিত করিয়া দিলে ইহাদের মূলের আকৃতি ও ওজন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু এদেশে ইহাদের চাষে সার কদাচিৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আংশিক ছায়াযুক্ত স্থান ইহাদের চাষ পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ছায়াযুক্ত স্থানে ইহাদের গাছের তেজস্বিতা ও পাতার বর্ণ চাকচিক্য বৃদ্ধি হয়। রীতিমত ইহাদের চাষ করিতে হইলে অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে ভূমিকে কোদাল দ্বারা ২।৩ ফুট গর্ত্ত করিয়া খুড়িয়া লইবে। কঠিন মৃত্তিকা হইলে উহাতে ছাই বালি ও উদ্ভিজ্জসার মিশ্রিত করিয়া উহাকে হালকা মৃত্তিকায় পরিণত করিবে। তৎপর মাঘ মাস হইতে চৈত্র মাস মধ্যে ইহাদের মূল বা বীজ মূল রোপণ করিবে। এই সময়েই ইহার মূল বা বীজ হইতে গাছ বহির্গত হইতে আরম্ভ করে। যে সময় বীজ মূল হইতে স্বভাবতঃ গাছ বহির্গত হয় উহাই ইহার বীজ রোপণের উপযুক্ত সময়। সারি করিয়া ২।৩ ফুট গভীর গর্ত্ত করিবে। গর্ত্তের পাশ ও ঐ পরিমাণ হওয়া প্রয়োজন। এইগর্ত্তকে ছাই ও সার মিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া তিনফুট দূরে দূরে বীজ বা মূল রোপণ করিবে। সমস্ত ক্ষেত্র পূর্ব্বোক্তরূপে প্রস্তুত না করিয়া প্রত্যেক লাইনের ভিতরে ৩ ফুট অন্তর অন্তর তিন ফুট খাই ও দুই ফুট পাশ গর্ত্ত করিয়া উহা পূর্ব্বোক্তরূপে মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া উহাতেও বীজ রোপণ করা যাইতে পারে। এই প্রণালী পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অপেক্ষা অল্প শ্রম ও ব্যয় সাধ্য। ইহাদের কোন কোন জাতির মূল (কন্দ) ২।৩ ফুট লম্বা ও প্রায় ২।৩ ফুট চৌড়া হয়। সেইজন্য গভীর কৃষ্ট ভূমিতে ইহাদের বীজ বপণ করা আবশ্যক। রোপনের পরে উক্তবীজ হইতে গাছ বহির্গত হইলে উহাদিগকে বাউনী * দিয়া দেওয়া ভিন্ন আর ইহার অন্য

* বাউনী শব্দে ইহার গাছকে কোন গাছের, জাঙ্গলায়, বা তদ্রূপ অন্য কোন পদার্থের আশ্রয় গ্রহণ করাইয়া দেওয়াকে বুঝায়।

পাটি নাই। সময় সময় ইহার মূলে বায়ু উত্তাপ ও আলো প্রবেশের জন্য গাছের গোড়ার মৃত্তিকা উস্কাইয়া দিতে হয়। রোপণের পরে এক বৎসর মধ্যে ইহাদের কোন কোন মূল খাইবার উপযোগী হয়। তখন দুইটী গাছের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে একটী করিয়া মূল উঠাইয়া নিয়া ঐ গর্ত্তে আর একটী ক্ষুদ্র মূল রোপণ করিতে হয়। তাহা হইলে একই ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ইহার চাষ চলিতে পারে। অবশিষ্ট মূল সকল দ্বিতীয় বৎসরে দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। তৃতীয় বৎসরে উহারা ত্রিগুণ পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ক্ষুদ্র মূল সকল (২৩ সের ওজনের) ।৴০ আনা হইতে কখন কখন ৶০ মূল্যে বিক্রয় হয়। অধিক ওজনের হইলে কখন কখন ।০ আনা হইতে ১৲ টাকা মূল্যেও বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহার চাষ অতি সামান্য ব্যয়েই হয়। ব্যয়ের তুলনায় লাভ অধিক হইয়া থাকে। এক বিঘা জমিতে অন্যূন ১৬০০ মূল রোপণ করা যাইতে পারে। প্রত্যেকটী মূলের মূল্য গড়ে ।৴০ আনা হইলেও উৎপন্ন ফসলের মূল্য ১০০৲ টাকা হইতে পারে। জাঙ্গিলা দেওয়া ভিন্ন ইহার চাষে আর অধিক ব্যয় কিছুই নাই। তথাপি উহার ও চাষের ব্যয় প্রতি বিঘায় ৫০৲ টাকা বাদ দিলেও প্রতি বিঘায় অন্যূন ৫০৲ লাভ হইতে পারে। অব্যবহার্য্য অনুর্ব্বরা ভূমি হইতে প্রতিবিঘায় ৫০৲ লাভ সামান্য নহে। ২।১ বৎসর অপেক্ষা করিয়া ফসল সংগ্রহ করিলে ইহাপেক্ষা অধিক লাভ হইবার সম্ভাবনা নিশ্চিত। এই জাতীয় আলুতে নানারূপ কীটের উপদ্রব হইয়া থাকে। উহারা ইহাদের গাছের পাতা ও মূল খাইয়া থাকে, আলু গাছ কীটাক্রান্ত হইলে তৎক্ষণাৎ কীট বিনাশ করিবার উপায় বিধান করিবে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ।

ভয়।

করিনি তপস্যা কিছু তাঁহারি কৃপায়
জলে ছিল ক্ষুদ্র দীপ তিমির গুহায়,
সন্দেহের ঝঞ্ঝা তারে যেরূপে দুলায়!
বিশ্বাসের ক্ষীণালোক নি'বে না কি যায়!

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সাহিত্য সেবক।

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী—

ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন মসূয়া গ্রামে ১৭৮৫ শকাব্দার ২৮ শে বৈশাখ তারিখে উপেন্দ্র বাবু জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ৺শ্যামসুন্দর রায়। উপেন্দ্র বাবুর পূর্ব্ব নাম কামদারঞ্জন রায়। ৭ বৎসর বয়সে জ্ঞাতি খুল্লতাত মসূয়ার জমিদার স্বর্গীয় হরকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় কামদারঞ্জনকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। অতঃপর ইনি উপেন্দ্রকিশোর নামে পরিচিত হয়েন।

উপেন্দ্রকিশোর বাল্যকালেই অনন্য সাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন। তেমন প্রতিভা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। তিনি যখন ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে পড়িতেন তখন তাঁহার পিতা একদিন বলিয়াছিলেন "তুমি রাত্রিতেত একটুও পড় না।" উপেন্দ্রকিশোর উত্তর করিলেন "পাশের কোঠায় শরৎ কাকা পড়েন, তাতেই আমার শিক্ষা হয়। দু'জনে পড়িয়া কেবল গণ্ডগোল বাড়ানো মাত্র।" হরিকিশোর বাবু স্কুলে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন উপেন্দ্রকিশোর পড়া শুনায় সকলের শ্রেষ্ঠ ছাত্র। এইরূপে ১২৮৫ সনে উপেন্দ্রকিশোর ময়মনসিংহ জেলা স্কুল হইতে ১৫৲ টাকা বৃত্তি লইয়া এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিলেন। ছোট বেলা হইতেই সঙ্গীত শাস্ত্রে উপেন্দ্র বাবুর গভীর অনুরাগ ছিল। একদিন স্কুল হইতে আসিতে এক ব্যক্তির নিকট বেহালার গৎ শুনিয়া আসিয়াই উপেন্দ্রকিশোর তাঁহার ভৃত্যকে কহিলেন "গোপী দা এখনই আমার জন্য একটা বেহালা কিনে আন দেরি করিলে গৎটা ভুলিয়া যাইব"। বলা বাহুল্য প্রথম দিনেই ঐ ভাবে উপেন্দ্রকিশোর গৎ শিখিলেন। এখন ইহার সমকক্ষ বেহালা বাদক এ দেশে বিরল।

এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া তিনি উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য কলিকাতা যান। সেখানে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১২৮৯ সনে বি, এ, পাশ করেন। এই সময় বাঁশী বাজান শিক্ষা করেন। বি, এ, পরীক্ষার সময়ও তিনি বাঁশীতেই তন্ময় হইয়া থাকিতেন। পাঠ্য গ্রন্থের প্রতি তাহার বড় বেশী অনুরাগ ছিল না।

উপেন্দ্রকিশোরের মত সরল ভাষায় শিশুদিগের জন্য গল্প রচনা এ পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। ইহাতে তাঁহার একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। যখন ১৮৮৩ সনে প্রমদাচরণ "সখার" আয়োজন করেন, তখন উপেন্দ্র কিশোর তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। তারপর "সখা" "সাথী," "সখাও সাথী" "মুকুল" প্রভৃতি শিশুপাঠ্য পত্রিকায় উপেন্দ্র বাবুর বহু সুন্দর সরল রচনা প্রকাশিত হয়। শিশু সাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোর বাঙ্গালা ভাষায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার ভাষার লালিত্য ও মাধুর্য্যে শিশুর হৃদয়ে এক নূতন তান বাজাইয়া তুলে। এই সময় তিনি "ছেলেদের রামায়ণ" অতি ক্ষুদ্রাকারে বাহির করেন।

"দাসী," "প্রদীপ," "প্রবাসী" প্রভৃতি পত্রিকায় উপেন্দ্র বাবুর গবেষণাপূর্ণ বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

পেন্দ্র কিশোর এক জন উচ্চ শ্রেণীর চিত্রকর। ইঁহার চিত্রাবলী পাশ্চাত্য প্রদেশেও সমাদৃত হইয়াছে। ইনিই এদেশে হাফটোন চিত্রের প্রথম প্রচারক; তাঁহার চিত্র সম্বন্ধে বিলাতী Process year Book এ বহু প্রশংসা বাহির হইয়াছে। ইনিই চিত্র শিল্পী U. Roy নামে সকলের নিকট পরিচিত।

উপেন্দ্র বাবু একাধারে কবি ও চিত্রকর। ইঁহার "ছোট্ট রামায়ণ" পাঠ করিলে বুঝা যায় ইনি কেমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন।

উপেন্দ্র বাবু সম্প্রতি "সন্দেশ" নামে শিশুদের জন্য একখানি মাসিক পত্র সম্পাদন করিতেছেন। ইঁহার প্রণীত "ছেলেদের মহাভারত", মহাভারতের গল্প, "টুনটুনির বই" "ছোট্ট রামায়ণ" "বেহালা শিক্ষা" "হারমোনিয়ম শিক্ষা," "সেকালের কথা" প্রভৃতি গ্রন্থ সর্ব্বজন পরিচিত।

নারায়ণ দেব।

(২)

কবি ল্লভ উপাধি না নাম, তাহা লইয়া অতঃপর তর্ক উঠিয়াছে। লেখক বলেন—"সরল ও সহজ ভাবে বুঝিতে গেলে কবিবল্লভ উপাধি বলিয়াই বুঝা যায়। কবিবল্লভ নাম কাহারও শুনা যায় না।" যিনি বলেন উহা উপাধি, নাম হইতে পারে না, তাঁহার উচিত যে অন্য উদাহরণ দিয়া নিজ কথার সমর্থন করা। পক্ষান্তরে উহা যে উপাধি নহে, নাম; তাহার বহু উদাহরণ আমরা দিতে পারি। লেখক বলেন—"অচ্যুত বাবু সন্ধান পাইয়া থাকিলেও নাম নহে উপাধি, উপাধিতেই সেই ব্যক্তি পরিচিত।" "কবিবল্লভ নাম হইতে পারে না।" যদি তাহাই হয় তবে ত উপাধিতে পরিচিত অন্য ব্যক্তির প্রসঙ্গই আসিয়া পড়িতেছে, সে ব্যক্তি নারায়ণদেব হইতে ভিন্ন হইয়া পড়িতেছেন। অর্থাৎ কবিবল্লভ নারায়ণ দেবের উপাধি না হইয়া অন্যের উপাধি হইতেছে;—যে ব্যক্তি ঐ উপাধিতেই খ্যাত হইয়াছে। পক্ষান্তরে উহা যে নাম, তদ্বিষয়ে প্রমাণ—

"Kabiballab Ray the Progenitor of the family"—The modern History of Indian Chiefs Rajas & c, Vol II.

"খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবিবল্লভ নামে এক ব্যক্তি শ্রীহট্ট জন্ম গ্রহণ করেন।"

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২।২৪ ৬৯ পৃঃ।

এই কবিবল্লভ শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ দস্তিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তদ্ব্যতীত আমরা অচ্যুত বাবু হইতে অবগত হইয়াছি যে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের উত্তরাংশে আরও অনেক কবিবল্লভ নামক ব্যক্তির বংশ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক নামক চরিতাভিধানের সম্পাদক কবিবল্লভ নামক কবির পরিচয় দিয়াছেন। বল্লভ নামক এক কবিরও পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কবিবল্লভের কথা ছাড়িয়া দিলেও বল্লভ নামে বহু গ্রন্থকার প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে স্বীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। মহাভারতীয় "বিজয় পাণ্ডব" নামক গ্রন্থ প্রণেতা বল্লভের

নাম সাহিত্য সংবাদের প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে। "ভারত প্রসঙ্গ" প্রণেতা উক্ত বল্লভ দাসের ভাষাও "এ অঞ্চলের (শ্রীহট্টের) ভাষা হইতে বিভিন্ন নহে।" এই কথাও সাহিত্য সংবাদের প্রবন্ধে কথিত হইয়াছে। আমরাও মহাভারত সংসৃষ্ট "দুর্ব্বাসার পারণ" কাব্য প্রণেতা বল্লভ দ্বিজের উল্লেখ করিয়াছি এবং ইহাও বলিয়াছি যে এই বল্লভ ও নারায়ণ দেবের "সুকবি বল্লভ" একই ব্যক্তি হইতে পারেন।

অচ্যুত বাবু লিখিয়াছেন যে নারায়ণ দেব ও সুকবি বল্লভ এক গ্রাম বাসী ছিলেন। উভয়েই নগর হইতে উঠিয়া যান। অসম্ভব নহে যে একজন সন্নিকটবর্ত্তী বোড় গ্রামে এবং অপর আটকাহনিয়া গ্রামে চলিয়া গিয়াছিলেন। তবে কবিবল্লভের বংশীয় (রথীতর গোত্রীয়) ব্রাহ্মণগণ মাধবপাশা ও মান্দারকান্দীতেও আছেন বলিয়া অচ্যুত বাবুর প্রবন্ধে পাওয়া যায়। হইতে পারে যে আটকাহনিয়া হইতে পরে এই সব স্থানবাসী হন। অথবা মাধবপাশা প্রভৃতি হইতে কবির জনৈক ঊর্দ্ধ পুরুষ আটকাহনিয়াতেও গিয়া থাকিতে পারেন।

"বসতি বল্লভ দ্বিজ তাঁহার দেশেতে।"

"হরকান্ত সুত কবি কৃষ্ণের চরণে।"

এই দুই চরণের "কবি" এবং "বল্লভ দ্বিজ" একত্রে কবিবল্লভ হইতেছে। কবিগণের নামের পূর্ব্বে "কবি" শব্দের প্রয়োগ অনেক দৃষ্ট হয়। যথা:—

"কহে কবি শেখর কি কহব কান।"

পদকল্পতরু ৪৬৩।৩।১৪ পল্লব।

অভিনব সৎকবি দাস জগন্নাথ

জননী জঠর ভয় নাশরে॥

পদকল্পতরু ১২৭।৩।২৫ পল্লব।

পদকল্পতরুতে বল্লভ দাসের প্রায় ২২টী পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে একটির ভনিতা

"আনন্দে নিমগন বল্লভ দাস।"

আর একটির

"নরোত্তম দাস আশ চরণে রহ

শ্রীবল্লভ মনভোর।" ৪২৮।৩।১৩ পল্লব।

এতদ্বারা এই পদকর্ত্তাকে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সমসাময়িক অনুমান করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে বল্লভ বা কবি বল্লভকে উপাধি বলিয়া কখনই মনে হইবে না।

তাহার পর যখন নারায়ণ দেবের জাতি সম্বন্ধে পরস্পর বিসংবাদি মত রহিয়াছে, "জ্ঞান না ধরে সে যে জাতিতে ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি কথার সুমীমাংসা হয় নাই, যখন সতীশ বাবু অথবা চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই মূল বিষয়ে কোন সদুত্তর না দিয়াই বংশাবলীর অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়াছেন, তখন ইহা কীদৃশ গবেষণা বা অনুসন্ধিৎসা তাহা বুঝা যাইতেছে না। এ সম্বন্ধে আমরা যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম, তাহা সমীচীন কিনা, তাহা লইয়া কোন কথা যখন কেহ বলেন নাই, তখন লেখকেরই কথা মত এই মৌন তাহাদের সম্মতি বলিয়া ধরিয়া লইব কি? কিন্তু তাহা হইলে যে "কবি বল্লভ" উপাধি না হইয়া পৃথক ব্যক্তি হইয়া পড়েন!

"নারায়ণ দেবে কয়, সুকবি বল্লভে হয়"

এই বিষয় লইয়াও লেখক কম ব্যতিব্যস্ত হন নাই। কবিবল্লভ লেখকের মতে নাম হইতে পারে না, "পূর্ব্বের 'সু'টি নাকি ইহার বিষম অন্তরায়"। কিন্তু এই 'সু'টি যে পাদ পূরণে প্রযোজ্য হইয়াছে, আমরা তাহা বলিলেও লেখক তদ্বিষয়ে কিছু বলেন নাই। শ্রীযুত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের মতানুসারে 'সুকবি' বিশেষণও হইতে পারে, ইহাও বলিয়াছিলাম। লেখক ইহার অর্থ করিয়াছেন—"নারায়ণ দেব, যে সুকবি বল্লভ হয় সে কয়" ইত্যাদি। লেখক ত সহজ ভাবে কবিবল্লভটি উপাধি বুঝিয়াছেন কিন্তু এই স্থলে 'সু'টি উপাধির ব্যাধি স্বরূপ দাঁড়াইয়াছে কিনা দ্রষ্টব্য। "যে সুকবি বল্লভ হয়" কেন? "যে কবিবল্লভ" হয় হইল না কেন? তার পর উপাধি নামের সহিত নামের অংশস্বরূপই ব্যবহৃত হয়, নাম ও উপাধি এক সময়ে উভয়ে স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন ক্রিয়ার কর্ত্তারূপে ব্যবহৃত হওয়ার উদাহরণ আর কত আছে? কয় এবং হয়, এই দুইটি ক্রিয়ার কর্ত্তৃপদ অনুসন্ধানে লেখককে 'সে' আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। 'যে' না হইলে 'সে' হয় না, তাই "যে সুকবিবল্লভ হয়" ইত্যাদি ব্যাখ্যা! এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে কি যে কোন্

ব্যাখ্যাটি অধিক "রহস্যজনক ?"—তাঁহার না আমাদের ?

কবিবল্লভ নারায়ণ দেবের বন্ধু ছিলেন কি না, যাঁহারা উপাধিবাদী, তাঁহাদিগকে ইহা বুঝান কঠিন। যে যে পুঁথিতে "সুকবিবল্লভ খ্যাতি সর্ব্বগুণযুত" এইরূপ উক্তি পাওয়া যায় না সেই সেই পুঁথির পাঠক গ্রন্থমধ্যে কবিবল্লভযুক্ত ভণিতা পাইলে, ইহাকে নারায়ণ দেবের বন্ধু ব্যতীত আর কি অনুমান করিবেন ? পাঠকই বিবেচনা করুন। বংশীদাসের ও কবিবল্লভের ভণিতা একই নারায়ণী পদ্মাপুরাণে পাইলে, এই দুই ভণিতাকারক, নারায়ণ দেব হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি, এরূপ বিবেচনা না করিবার কি হেতু থাকিতে পারে ? দুই ব্যক্তির একত্রে কাব্য রচনার বহু উদাহরণ সাহিত্যে বর্ত্তমান। তদবস্থায় পূর্ব্বোক্ত অনুমান স্বাভাবিক। লেখক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে কবিবল্লভকে যে নারায়ণ দেব কবিতা রচনা করিয়া শুনাইতেন, "ইহা পদ্মাপুরাণের কোন্ স্থানে" লিখিত আছে ? প্রশ্নটী বেশ হইয়াছে ; এই রীত্যানুসারে ত তাঁহাকেও বলা যাইতে পারে যে, বোড়গ্রাম যে ময়মনসিংহে চিরদিন ছিল, ইহা পদ্মাপুরাণের কোন্ স্থানে আছে ?

তাহার পর লেখক বলিতেছেন "কবিবল্লভ যে নারায়ণ দেবের উপাধি ছিল, সতীশ বাবু তাহা নারায়ণ দেবের অন্যান্য স্থানের উক্তি দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন।" এই অংশ পাঠে ত পাঠক বুঝিলেন যে, এ কথাটার কোন আপত্তিই নাই—ইহা প্রমাণিত সত্য। কিন্তু আমরা না বলিয়া পারিলাম না যে, কথাটা অমূলক, সতীশ বাবুর বাক্য প্রমাণিত সত্যরূপে পরিণত হয় নাই। লেখক যদি এস্থলে আমাদের প্রবন্ধের সহিত সতীশ বাবুর প্রবন্ধের তুলনা করিতেন, তাহা হইলেই সতীশ বাবুর প্রবন্ধের অনেক কথাই যে খণ্ডিত হইয়া অপ্রমাণিত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ পাইত।

"কায়স্থ পণ্ডিত বড় বিদ্যা বিশারদ।
সুকবি বল্লভ খ্যাতি সর্ব্বগুণযুত॥"

এবং "সুকবি বল্লভ হয়ে দেব নারায়ণ
এক জাচারী কহে অনাদি জনম॥"

ইহাইত সতীশ বাবুর প্রমাণ। লেখক মহাশয়ের মতে কি ইহা অবিসংবাদী ? 'কায়স্থ' সম্বন্ধে আমাদের নূতন কিছু বলিবার নাই। কিন্তু এসব অংশ অনেক পদ্মাপুরাণে না থাকায় ইহার প্রামাণ্যে আমাদের সন্দেহ আছে, ইহা কাহারও কর্ত্তৃক যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা বিবেচনার কারণ আছে, আমরা যেরূপ লিখিয়াছিলাম সাহিত্য সংবাদের প্রবন্ধে দৃষ্ট হইল যে, অচ্যুত বাবুও তদ্রূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—কোন কোন মুদ্রিত নারায়ণী পদ্মাপুরাণে নাকি—

"কায়স্থ পণ্ডিত বড় বিদ্যা বিশারদ।
সুকবি বল্লভ খ্যাতি সর্ব্বগুণযুত॥"

ইত্যাদি আত্মশ্লাঘাসূচক আত্মপরিচয় ও উপাধির উল্লেখ আছে। নারায়ণ দেব বিজ্ঞ ছিলেন বটে ; কিন্তু সেই দীনতা প্রকাশের যুগে তিনি স্বয়ং এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন মনে করিতে ইচ্ছা হয় না। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু দ্বিশতাধিক বর্ষের প্রাচীন এক নারায়ণী পুঁথি পাইয়াছেন, উহাতে ইহা নাই। এই পদগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া শুনা যায়। অতি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি না পাওয়া পর্য্যন্ত ইহার সুমীমাংসা সুসঙ্গত হইবে না।

সুসঙ্গত না হইবার বিশেষ কারণ, "ভট্ট মিশ্র নহে পণ্ডিত বিশারদ" প্রভৃতি উক্তির সহিত ইহার বিরোধ। এবং "জ্ঞান না ধরে সে যে জাতিতে ব্রাহ্মণ" এই উক্তির সহিত অসামঞ্জস্য। এই জন্যই ইহা প্রক্ষিপ্ত বা পরবর্ত্তী যে জনা বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। লেখক যদি এসকল বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেন, কেহই কিছু বলিত না, কিন্তু তিনি তদ্রূপ চেষ্টা না করিয়া কেবল অন্যের কথার উপর টিপ্পনি করিয়াছেন। এস্থলেও আমাদের কথায় টিপ্পনি দিতে গিয়া বলিয়াছেন—"নারায়ণ দেবের লেখার স্থানে স্থানে ইহা অপেক্ষা অধিকতর শব্দাড়ম্বর দৃষ্ট হয়।" কিন্তু তিনিই আবার বংশীদাসের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—নারায়ণ দেবের "ভাষা গ্রাম্য ইতর ও অশ্লীল" ইত্যাদি। এই দুইটি কথাই যখন লেখকের একই মুখে ব্যক্ত হইয়াছে, তখন নারায়ণের মুখে একবার "পণ্ডিত বড়" এবং আর বার "পণ্ডিত নহে" ইত্যাদি উক্তিতে অসামঞ্জস্য দেখিতে না পাইতে পারেন, কিন্তু অন্যে মনে করিতে পারে না কি যে, এত বড় গ্রন্থকার

নারায়ণ দেব নিজ গ্রন্থে পরস্পর বিরোধী বাক্য লিপিবদ্ধ করিবেন, অতএব ইহার একটা কথা নিশ্চিত পরবর্ত্তী যোজনা। অবস্থা গতিকে "কায়স্থ পণ্ডিত বড়" ইত্যাদি কথাই পরবর্ত্তী যোজনা বলিয়া বোধ হয়।

অতঃপর লেখক আমাদের কৃত অর্থে অনাস্থা প্রদর্শন (দোষ প্রদর্শন নহে) পূর্ব্বক স্বয়ং "সুকবি বল্লভ হয়ে" ইত্যাদিরও একটা অর্থ করিয়াছেন, যথা—"দেব নারায়ণ সুকবি বল্লভ হয়ে (হয়), সে অনাদি জনম বিষয়ে এক লাচাড়ী কহে।" এ স্থলেও 'সু'টির গতি করা হয় নাই কেন? তাহার কষ্ট-কল্পিত এইরূপ অর্থে উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইবে, তাহা পাঠকেরই বিবেচ্য। তাহার এই অর্থে 'হয়' ক্রিয়াপদ, ইহার অর্থ হাঁ (অব্যয়) নহে। এ স্থলে তিনি যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, 'হয়' ক্রিয়া, ইহার অর্থ হাঁ হইতেই পারে না।

"হয় নয় একবার জিজ্ঞাসা করিয়া জান।" এইরূপ বাক্য এখনও পশ্চিম-বঙ্গে চলিত আছে। পূর্ব্ববঙ্গে তো কথাই নাই।

"নারায়ণদেব পদ্মাপুরাণ রচনা করিয়া কবিবল্লভ উপাধি লাভ করেন' বংশীদাসের ভূমিকায় উল্লেখিত এতদুক্তি উপলক্ষে আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে গ্রন্থরচনার পরে উপাধি লাভ ঘটিলে গ্রন্থের ভিতরে উপাধির কথা আসিতে পারেনা, যদি আসে তবে উহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার উত্তরে লেখক আমাদিগকে প্রবোধ দিয়া বুঝাইতেছেন, —"গ্রন্থ কর্ত্তার জীবৎমানে গ্রন্থের কোন স্থানের পরিবর্ত্তনে বা পরিবর্দ্ধনে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার থাকে এবং গ্রন্থকার তাহা করিয়া থাকেন। নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ছিল, তাহাতে হ্রস্ব দীর্ঘ হওয়ারই কথা। যে সকল গ্রন্থ মুদ্রিত হয়, তাহাতেও সংস্করণে সংস্করণে গ্রন্থকার পরিবর্ত্তন করেন।"

প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতেও হ্রস্ব দীর্ঘ হওয়াতেই তো পরস্পর বিরোধীয় মত স্থান পাইয়াছে। এই হ্রস্ব দীর্ঘ করাটা কিন্তু স্বয়ং গ্রন্থকারের না হইয়া অন্যের বলিয়াই মনে হয় না কি? গ্রন্থকারের হইলে অসামঞ্জস্যের কথা করাও যায়, তবে এমন সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে যে, উঁহারা নিজ গ্রন্থে অসামঞ্জস্য রাখিয়াই পরিবর্ত্তন করিতেন। বর্ত্তমানে ছাপার বন্দোবস্ত থাকায় হ্রস্ব দীর্ঘ ঘটিবার সুযোগ আছে, এক ফারমে যত ইচ্ছা তত কপি ছাপা হইয়া প্রচারিত হইতে পারে, গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে পরিবর্ত্তনের কারণ জ্ঞাপিত হইতে পারে। পূর্ব্ব গ্রন্থকার গণ কি জানিতেন না যে তাঁহাদের একখানা হস্তলিখিত গ্রন্থে পরিবর্ত্তন ঘটিলে, দূরান্তরে যে সকল প্রতিলিপি চলিয়া গিয়াছে, তাহা সংশোধনের উপায় নাই। এমতাবস্থায় নিজ গৌরব খ্যাপক দুইটা পংক্তি গ্রন্থকার যে নিজ গ্রন্থে না বসাইয়া দিলে তাঁহার নিদ্রা হইত না, এমন নহে,—বিশেষতঃ সেই দৈন্যপ্রকাশক বৈষ্ণবীয় যুগে। বিশেষ কথা আরও আছে, বর্ত্তমানে হ্রস্ব দীর্ঘ ঘটিতে পারে, বর্ত্তমান কালের গ্রন্থকার-বর্গ সাধারণতঃ লোকের মনোরঞ্জনার্থ বা সাধারণ শিক্ষার জন্যই গ্রন্থাদি প্রণয়ণ করিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ব্ব কবিবর্গ দেব দেবীর যে চরিত্র চিত্রণ করিতেন, তাহা অনেকস্থলেই দেবাদিষ্ট হইয়া। অনেক গ্রন্থকারই স্বীয় স্বপ্নাদেশের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এরূপ স্বপ্নকে তাঁহারা চিন্তা-জনিত ফলবিশেষ মনে না করিয়া বিশ্বাস করিতেন। কবি নারায়ণ দেবও লিখিয়াছেনঃ—

> "চৌদ্দ বৎসরের কালে দেখিল স্বপন।
> মহাজন সহিত পথেতে দরশন॥
> শিশু রূপেত গোসাই হাতেত করি বাঁশী।
> আলিঙ্গন দিয়া বলে যায় মুখে হাঁসি॥
> গোবিন্দের আশা মোর সেই সে কারণ।
> প্রণাম করিল মুঞি ভজিব চরণ॥" ইত্যাদি।

ঈদৃশাবস্থায় তাঁহারা ভক্তিপূত চিত্তে যে সকল রচনা করিতেন তাহা যে দেব দেবীর কৃপালব্ধ, তাহা তাঁহারা স্বয়ং বিশ্বাস করিতেন; বিশ্বাস করিতেন বলিয়াই কাহারও "কণ্ঠে ভারতী দেবী" বসিতেন, কাহাকেও "মদন গোপাল লেখা"ইতেন, ইত্যাদি। বস্তুতঃ তাঁহা-দের লেখা দেবাদিষ্ট (inspired) হইয়া। এসব লেখা যদিই বা তর্কস্থলে গ্রন্থকারের হ্রস্ব দীর্ঘ করার কথা স্বীকার অপরিবর্ত্তনীয়। এ সকল গ্রন্থ তাঁহারা দেবদেবীর স্বরূপ

ভূত জ্ঞান করিতেন, তাই অনেকস্থলে গ্রন্থপূজা প্রচলিত আছে। তাদৃশ দেবাদিষ্ট গ্রন্থের সহিত এখনকার গ্রন্থের তুলনায় যে কালবিরোধ দোষ ঘটে তাহা কি লেখক ভাবিয়া দেখেন নাই?

শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ।

শর-শয্যা কাব্য।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি, এল কর্ত্তৃক বিরচিত।

কবি হেমচন্দ্র ঘোষ বহুদিন পূর্ব্বে নবজীবনে কবিতা লিখিতেন। তাঁহার সেই সমস্ত কবিতা মানস প্রবাহ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং তাহা তৎকালের সমালোচক ও পাঠক সমাজে সাতিশয় সমাদর লাভ করে। অষ্টাবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ সাহিত্যের সহিত প্রথম পরিচয় কালে আমরা মানস প্রবাহের কবিতাবলী পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিতাম। নবজীবনের সেই প্রাচীন যুগে কবি শর-শয্যা কাব্য প্রণয়ন করেন। কিন্তু তৎপরেই তিনি "দুর্ভাগ্য বশতঃ শোক দুঃখ সন্তাপরূপ সংসারের অনন্ত বিড়ম্বনায় পড়িয়া বাণীর অর্চ্চনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, শর-শয্যা কাব্যও অপ্রকাশিতাবস্থায় ফেলিয়া রাখেন। সম্প্রতি সুদীর্ঘকাল অন্তে কবি শরশয্যা মুদ্রিত করিয়া পাঠক সমাজে অর্পণ করিয়াছেন। আজ শর-শয্যার সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পূর্ব্ব স্মৃতির উদয়ে আমরা সুখানুভব করিতেছি।

শর-শয্যা সুবৃহৎ কাব্য গ্রন্থ,—অষ্টাদশ সর্গে বিভক্ত এবং নানা ছন্দে গ্রথিত। ইহাতে কুরুক্ষেত্র মহা সমরের এক রাত্রি এবং দুই দিনের ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে। অষ্টম দিনের যুদ্ধাবসানে সন্ধ্যাকালে শ্রীকৃষ্ণ এবং পঞ্চ-পাণ্ডব শিবিরে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে

দিগ্‌বাস স্বচ্ছদেহ দিগব্যাপি রূপ,
বিমল শীতল অঙ্গ, নিরমল জলে
আকাশের মূর্ত্তি যেন,

পবন দেব তাঁহাদের শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং আত্মজ ভীমের হিতার্থে আগামী কল্যের যুদ্ধে পঞ্চ পাণ্ডবের বিনাশ জন্য ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার জন্য অত্যয়ার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন, তারপর এই বিপদ হইতে রক্ষার শরণাপন্ন হইতে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন।

তারপর কাব্যে কুরুক্ষেত্র মহাসমরে ভীষ্মের অলৌকিক বীরত্ব কাহিনী এবং তাঁহার মহিমাময় মহাপ্রস্থানের মহান চিত্র অঙ্কিত করিতে কবি প্রয়াস পাইয়াছেন। কবির চারু তুলিকার সুকোমল স্পর্শে ভীষ্মের গৌরবময় উজ্জ্বল চিত্র অতি সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে। মহর্ষি ব্যাসের অতুলনীয় চরিত্র শরশয্যা কাব্যে ম্লান বা শ্রীহীন হয় নাই। কবি অতি কৌশলে সেই মহাপুরুষের শৌর্য্য বীর্য্য ও মহত্ব স্বীয় তুলিকায় পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন।

গ্রন্থকার ভীষ্মের মুখে যে বাণী শুনাইয়াছেন আমরা এইখানে তাহার প্রতিধ্বনি করিলাম: গ্রন্থের একস্থানে আছে, ভীষ্মের জননী স্বপ্নে পুত্রকে পাপপূর্ণ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছেন; তখন ভীষ্ম বলিতেছেন:—

"তোমার অধিক পূজ্যা জননী ভারত,
ইহার প্রদত্ত ভক্ষ্য পানীয় আস্বাদে
ধরিয়াছি এই প্রাণ; * * *
অতুল স্বর্গের সুখ চাহেনা গাঙ্গেয়।
ভুঞ্জিব নরক এই সহস্র বৎসর
তথাপিও ত্যজিব না বিপদে মাতায়।
এইপ্রাণ, এইকায়, দেহের শোণিত—
জননী ভারত তরে করিব অর্পণ"।

গ্রন্থে এইরূপ বহু দেখাইবার জিনিস আছে; সৌরভের ক্ষুদ্র কলেবরে তাহা অসম্ভব। গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই গ্রন্থকারের সুললিত শব্দ বিন্যাস, অতুলনীয় মাধুর্য্য, ভাষার লালিত্য ও অসামান্য কবিত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন।

খণ্ডকাব্যে প্লাবিত এই বঙ্গ সাহিত্যে আমরা আমাদের স্বজলাবাসী গ্রন্থকার হইতে এইরূপ একখানি উপাদেয় কাব্য গ্রন্থ উপহার প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।

মাননীয় লর্ড কারমাইকেল

Asutosh Press, Dacca.

দ্বিতীয় বর্ষ। } ময়মনসিংহ, ভাদ্র, ১৩২১। {একাদশ সংখ্যা।

ভারতবর্ষীয় শিল্প-কলা।

কয়েক বৎসর হইতে ভারতবর্ষীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে বেশ একটু আলোচনা হইতেছে। ইহার সম্পূর্ণ ইতিহাস আজও জানা যায় নাই। তবে ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ, কুমার স্বামী, অবনীন্দ্র নাথ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ও শিল্পিগণের চেষ্টা দেখিয়া আশা করা যায় যে, তাহার ঐতিহাসিক তথ্য শীঘ্রই নির্দ্ধারিত হইবে। কোন্ নিভৃত গিরিগাত্রে প্রাচীন ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার শেষ নিদর্শন অজ্ঞাতভাবে যে পড়িয়া রহিয়াছে, দেশবাসী তাহার বড় সন্ধান রাখিত না, বিদেশীর যত্নে আজ সে কথা প্রচারিত হওয়াতে সভ্য জগৎ বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছে। হতাদৃতা ভারত জননীর ললাটদেশে সেই সভ্যতার উজ্জ্বল প্রভার শেষ রেখাপাত দেখিয়া বিদেশী মুগ্ধ হইয়াছে। কিন্তু কয়জন শিক্ষিত বাঙ্গালী তাহার সংবাদ রাখেন ?

ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতে এক সময়ে চিত্রবিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা হইয়াছিল। যে সময়ে এই বিদ্যা উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল, সেই সময়েই অজন্তার চিত্র সমূহ অঙ্কিত হয়। এই চিত্র গুলির পরিচয় দেওয়া বৃথা। য়ুরোপে আজকাল অজন্তার চিত্র লইয়া যথেষ্ট আলোচনা হইতেছে এবং ইহার অদ্ভুত অঙ্কন পদ্ধতি দেখিয়া, য়ুরোপীয়গণ শত মুখে ইহার প্রশংসা করিতেছেন। গ্রিফিথ্ (Griffith) সাহেব বলেন অজন্তার চিত্রগুলি প্রকৃতির ছবি এবং প্রকৃতির ন্যায়ই উজ্জ্বল (all are taken from Nature's book, glowing after her pattern). সে দিন একজন ইংরাজ এই চিত্রগুলির অঙ্কন পদ্ধতির বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—"The Ajanta paintings are characterised by masterly power over line, long subtle curves being drawn with great precision in a line of unvarying thickness with one sweep of the brush." আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অজন্তা চিত্রের সমালোচনা করিতে বসি নাই; নতুবা এরূপ আরও অনেক মত উদ্ধৃত করিতে পারিতাম।

অজন্তার চিত্রগুলির সময় নিরূপন করিতে যাইয়া, Col T. H. Hendley বলেন, যে যুগে ভারতে সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, এবং যে যুগকে ইতিহাসে সাধারণতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের যুগ বলা যায় সেই সময়েই (খৃঃ ৫০০-৬০০) এই চিত্রগুলি অঙ্কিত ও শিল্পবিদ্যার উন্নতি সাধিত হয়। সকল ঐতিহাসিক এসম্বন্ধে একমত না হইলেও ইহা দ্বারা চিত্রগুলির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পাঠকগণের একটা মোটামুটি ধারণা হইবে।

ভারতের প্রাচীন চিত্র শিল্পের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অজন্তার চিত্রগুলি অঙ্কিত হইবার পর এবং মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত এই বিদ্যার কোনরূপ অনুশীলন হয় নাই। এক সময়ে যে বিদ্যার এতদূর উন্নতি হইয়াছিল,

হঠাৎ তাহা কেন এতটা হতাদৃত হইল তাহার উত্তর দেওয়া সহজ নহে। যাহারা এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা বলেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই চিত্রবিদ্যা ভারতে বিকাশ পাইয়াছিল, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি হওয়াতেই এই বিদ্যার অবনতি ঘটে। স্মিথ সাহেব বলেন—"এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে যে এই বিদ্যার চর্চ্চা ছিল না, একথা বলা চলে না ; বরং একথাই সঙ্গত যে সেই চর্চ্চার সমস্ত চিহ্ন, কাল আপনার সর্ব্বসংহারক হস্ত দ্বারা মুছিয়া দিয়াছে"। তাঁহার কথাটাই অনেকটা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সে যাহা হউক আকবরের সময় হইতেই ভারতে পারস্য দেশীয় শিল্পের প্রচলন দেখা যায়। এই সময়ের চিত্রশিল্প পুস্তকের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। সে চিত্র যাঁহারা না দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এসম্বন্ধে কিছু বুঝান কঠিন। পুস্তকগুলি মসৃণ চর্ম্মে বাঁধিয়া, শিল্পিগণ তাহাদের উপর নানা চিত্র সন্নিবেশ করিতেন। কোন পুস্তকের উপর বা অর্দ্ধমুকুলিত পুষ্পের উপর মধুকর গুণ গুণ করিয়া, ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কোন পুস্তকের উপর অপর কোন সুশোভন চিত্র সন্নিবেশিত থাকিত। আকবরের রাজত্বকালে একখানি আকবর নামার উপর এইরূপ অঙ্কিত করা হয়। সে খানি এখন বিলাতে Albert Museumএ রক্ষিত হইয়াছে। আজ কয়েক বৎসর ইহতে তাহার প্রতিলিপি গ্রহণ করিবার চেষ্টা হইতেছিল। বহু কষ্টে Hendleyসাহেব কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই প্রথায় অঙ্কিত জয়পুরে 'রাজনামা' নামক আর একখানি পুস্তক পাওয়া যায়। Hendley সাহেব এখানিরও প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাতে ৪০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। ইহা দ্বারাও শিল্পিগণের কার্য্য কুশলতা কতকটা বুঝিতে পারা যায়।

আকবর বাদসাহ এই চিত্র বিদ্যা ভারতবাসীকে শিক্ষা দিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎকর্ত্তৃক পারস্য দেশীয় শিল্পিগণ দ্বারা ভারতে এই বিদ্যা প্রচার করিবার কথা ভারতের ইতিহাসে পাঠ করিতে পাওয়া যায়। ইতিহাসে বহু শিল্পীর নামও আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই শিল্পিগণের বিস্তৃতজীবনী জানিবার কোন উপায় নাই।

আইন ই আকবর ই গ্রন্থে আকবর কর্ত্তৃক শিল্প সম্বন্ধে উৎসাহ দিবার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। ব্লকম্যান সাহেব কর্ত্তৃক অনুদিত গ্রন্থ হইতে নিম্নে কয়েক ছত্রের বঙ্গানুবাদ দিলাম :—

"আকবর সাহ চিত্রবিদ্যার প্রতি যৌবন হইতেই অনুরাগ দেখাইয়া আসিতেছেন। সেই জন্য এই বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। বহু চিত্রকর যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। প্রতি সপ্তাহে দারোগা ও কেরাণীগণ শিল্পিগণের চিত্র সমূহ বাদশাহের সম্মুখে রক্ষা করেন। তিনি চিত্রগুলির দোষ গুণ বিচার, শিল্পিগণের যোগ্যতানুসারে পুরস্কার ও মাসিক বৃত্তির বন্দোবস্ত করেন। চিত্রাঙ্কনোপযোগী দ্রব্যাদির মূল্য যাহাতে বাড়িতে না পারে, সে বিষয়েও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। * * * প্রায় এক শত শিল্পী উচ্চতম শিল্প কুশলতার পরিচয় দিতেছে। অন্যান্য সামান্য শিল্পীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। হিন্দু শিল্পিগণের মধ্যেও উচ্চ শিল্পী আছে। তাঁহাদিগের দ্বারা অঙ্কিত চিত্র সমূহ অনেক সময়ে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র সমূহকেও বর্ণ চাতুর্য্যে ও ভাবপ্রবণতায় হারাইয়া দেয়।"

এই আকবর বাদসাহের সময়েই আমাদিগের জাতীয় গৌরব রামায়ণ খানি নানাচিত্রে সুশোভিত হয়। আজকাল ছেলে ভুলাইবার জন্য যাহারা অদ্ভুত চিত্র যোগে রামায়ণখানির মূল্য বৃদ্ধি না করিয়া তাহাকে বিদ্রূপ ভাজন করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহারা যদি এই সব চিত্র একবার দেখেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে লজ্জায় নতশির হইতে হয়।

হিন্দুগণ কোন দিনই উদ্ভাবনী শক্তিতে কোন জাতি অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। আকবরের মৃত্যুর পর, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তাঁহাদিগের চেষ্টা এক অভিনব পথে চালিত হওয়ায় ভারতে আর এক নূতন চিত্রের উৎপত্তি হয়। সম্পূর্ণ দেশীয় ছাঁচে, দেশীয় ভাবকে আশ্রয় করিয়া শিল্পিগণ ছোট ছোট চিত্র আঁকিতে আরম্ভ করেন। এই সব ক্ষুদ্র চিত্র সংগ্রহ করিয়া রাখা হইত। এই প্রকারের বহু চিত্র ইংরাজ পুরুষগণের চেষ্টায় সংগৃহীত হইয়া বর্ত্তমান সময়ে

বিলাতের British Museum এ রক্ষিত হইয়াছে। স্মিথ সাহেব বলেন যে, সাজাহান বাদসাহের রাজত্বকালে এই চিত্রের সমধিক উন্নতি ঘটিয়াছিল এবং তাহার পর হইতেই ইহার অবনতি ঘটে। কিন্তু ইহা যে ভারতবর্ষ হইতে একেবারে কোন সময়েই লোপ পায় নাই ইহা নিশ্চিত। কেননা মাওয়ার, জয়পুর প্রভৃতি বহু করদ ও মিত্ররাজ্যে এরূপ শিল্পীর একান্ত অভাব হয় নাই। ঐ সকল স্থানের শিল্পিগণ এখনও এইরূপ চিত্র অঙ্কনে যথেষ্ট শিল্প কুশলতার পরিচয় দিয়া থাকেন।

এই সব চিত্রের বিষয় সাধারণতঃ—রাজদ্বার, সৈন্য সমাবেশ, বুহ রচনা, শীকার যাত্রা প্রভৃতি। কোন চিত্রে বা বাদশাহ দরবার গৃহে সমাসীন, দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী, পার্শ্বে সভাসদ্ ও দূরে বীণাবাদিনী দণ্ডায়মানা, কোন চিত্রে বা হস্তী পৃষ্ঠে বাদশাহ উপবিষ্ট, শত শত সশস্ত্র পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈনিক তাঁহার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান; আবার কোন চিত্রে বা নিভৃতে নিরালা রাজকুমারী প্রেমাস্পদের প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্না। চিত্রগুলি অতি সুন্দর। য়ুরোপীয় চিত্রের সহিত রুচির সামান্য ইতর বিশেষ থাকিলেও, সে সব চিত্র বিখ্যাত য়ুরোপীয় চিত্রকরগণের প্রসিদ্ধ চিত্র হইতে কোন অংশে হীন নহে; এ কথা আমাদের অত্যুক্তি নহে, স্বয়ং স্মিথ সাহেব বলিয়াছেন;—'The portraits are unsurpassed, the best being quite as good, as though different in technique, from the highest class of European miniature paintings.' এতদ্ব্যতীত চিত্রগুলি দুই শত বৎসরের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের দৈনন্দিন জীবনের এক একখানি নিখুঁত ফটো। এগুলি আমাদিগের ইতিহাসহীন দরিদ্র দেশের মূক ইতিহাস; ভাষা নাই, কিন্তু কোন কথাই অস্পষ্ট থাকে না। পৃথিবীর মধ্যে আর কোন দেশে এরূপ বহু ও সমগ্র ঐতিহাসিক চিত্র আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। এবিষয়ে আমরা অন্য সমস্ত জাতির তুলনায় সৌভাগ্যবান, একথা কোন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকই অস্বীকার করিবেন না। মনুষ্য সমাজ ছাড়িয়া শিল্পিগণ প্রাণি জগতের প্রতিও দৃষ্টি দিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের চিত্রে অঙ্কিত পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি ও উদ্ভিদ্ জগতের মধ্যে বৃক্ষ লতা প্রভৃতির চিত্র যেমন সুন্দর তেমনি নিখুঁত। কিন্তু আজ কয়জন শিক্ষিত ব্যক্তি সে চিত্র দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিয়াছেন অথবা তাহার সামান্য সংবাদ পর্য্যন্ত রাখিয়া থাকেন!

এই সব চিত্র সাধারণতঃ কাগজের উপর আঁকা হইত। কেবল Col Hanna র যত্নে সংগৃহীত চিত্রের মধ্যে দুই একটি চিত্র চর্ম্মের উপর অঙ্কিত দেখা যায়। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, হস্তীদন্তের উপর চিত্রাঙ্কন প্রথার তখনও সূত্রপাত হয় নাই। সম্ভবতঃ য়ুরোপীয়গণের অনুকরণে ইহার সূত্রপাত।

শীতল সিং নামক এক জন হিন্দু শিল্পী শিল্পচাতুর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে Richard Johnson নামক একজন ইংরাজ ওয়ারেন হেষ্টিংসের পোদ্দার ছিলেন। দেশীয় শিল্পের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সেই সময়ে শীতল সিং কর্ত্তৃক অঙ্কিত কতিপয় মোগল চিত্র তাঁহার হস্তগত হয়। তিনি ঐ চিত্রগুলি যত্নের সহিত বিলাতে পাঠাইয়া দেন। সেই হইতে য়ুরোপে মোগল চিত্রের আদর। জনসন্ যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, বহু ইংরাজ তাঁহার পর সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার পর টিপু সুলতানের রাজগৃহে রক্ষিত বহু চিত্র লণ্ডনে প্রেরিত হয়; ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর হইতে জাহাজ বোঝাই করিয়া বিজাপুরের আদিলসাহ বংশীয় নরপতিগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত চিত্র সমূহ লণ্ডনে চলিয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতীত ব্যক্তিগত চেষ্টায় সংগৃহীত চিত্রের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। আমরা যাহা মূল্যহীন মনে করিয়া বিলাইয়া দিয়াছি তাহাই সমজদারের হাতে যাইয়া আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে—তাহা এখন আমাদের দেখিবারও সুযোগ নাই!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

তিব্বত অভিযান

প্রথম যুদ্ধ।

এই দারুণ শীতের সময়ও আমাদের জেনারেল সাহেব নিশ্চেষ্ট বসিয়াছিলেন না। যাহাতে বিনা গোলযোগে তিব্বতের সহিত আমাদের বাণিজ্য সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১২ই জানুয়ারী একজন তিব্বতীয় সৈনিক কর্ম্মচারী ও তিনজন লামা লাসা হইতে টুনায় উপস্থিত হয়েন। কর্ণেল্ সাহেব (ইয়ংহজব্যাণ্ড) নিজে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু ফল কিছুই হইল না। সন্ধির কথা উত্থাপিত হইলে তাঁহারা আমাদিগকে চুম্বি ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। কর্ণেল্ সাহেব এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অসম্মতি জ্ঞাপন করাতে তাঁহারা প্রস্থান করিলেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী লাসা হইতে সংবাদ আসিল যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমরা টুনা ও ফারী পরিত্যাগ না করিলে যুদ্ধ অনিবার্য্য। আমরা তাহার উত্তর দিলাম, উত্তর ফিরিয়া আসিল। ২রা মার্চ্চ তিব্বতীয়েরা টুনা আক্রমণ করিবে বলিয়া প্রচার করিল। কিন্তু শেষে শুনিলাম, ঐ দিন একটা অমঙ্গল সূচক চিহ্ন প্রকাশ পাওয়াতে উহা স্থগিত রহিয়াছে। তাহার পর জ্ঞাত হওয়া গেল যে ১৬ই মার্চ্চ কয়েকজন লামা আমাদের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য এক দৈব কার্য্যের আয়োজন করিয়াছেন। তিন দিন ধরিয়া উহা চলিয়াছিল। যাহাতে আমাদের সর্ব্বনাশ হয় তজ্জন্য দেশের সমস্ত প্রধান প্রধান অপদেবতার নিকট বর প্রার্থনা করা হয়। সে সময়ে আরাধ্য অপদেবতা মহাশয়েরা
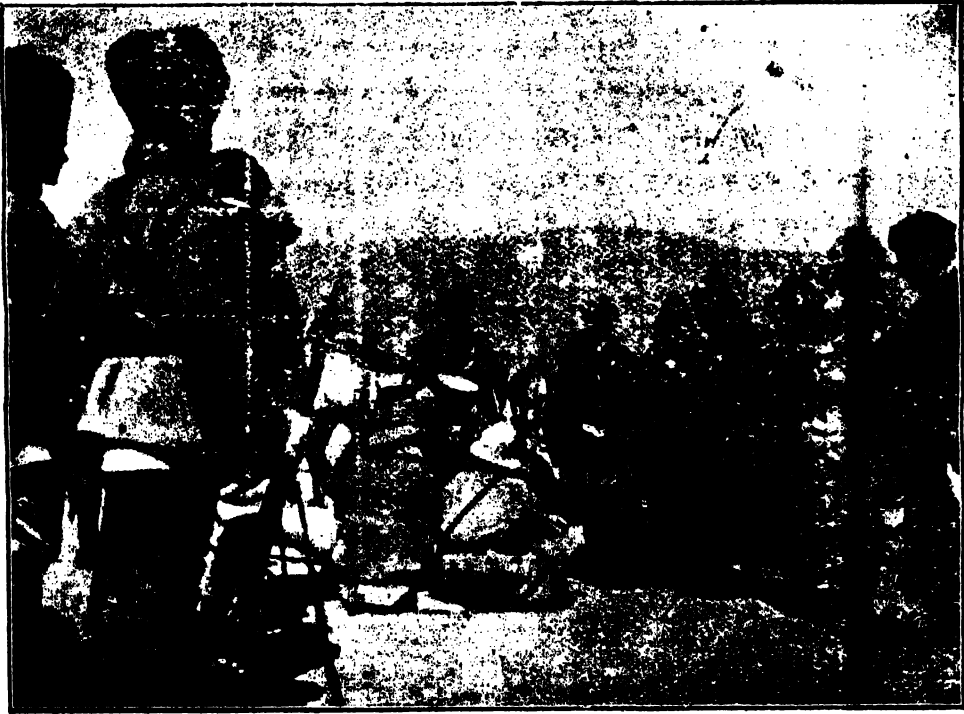
সিপাহীদিগের অঙ্গ রক্ষার উপর বসিয়া তিব্বতীয় দিগের সহিত সন্ধির আলাপ।

বোধ হয় নিদ্রা মগ্ন ছিলেন; কারণ, উহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র অনিষ্টের সম্ভাবনা দেখা গেল না।

২৯এ মার্চ্চ টুনায় সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উপস্থিত হইল। ইহার মধ্যে ১০৩ খানা আমাদের চির পরিচিত একা গাড়ী উল্লেখ যোগ্য। শুনিলাম এ পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহা ভিন্ন অপর কোনও যান যাতায়াত করিতে পারে না। দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম যে, রায় মহাশয়ও আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "একে এই ভয়ানক দেশ,

তাহাতে আমি একা। বাঙ্গালা ভাষাটা বোধ হয় অনেকটা ভুলিয়া গিয়াছি। তাই তাড়াতাড়ি এখানে চলিয়া আসিলাম।" কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে আমরা শীঘ্রই লাসার দিকে অগ্রসর হইব, তখন তিনি বিশেষ কাতর হইয়া পড়িলেন। আমাকে পুনঃ পুনঃ বলিলেন, "এমন কাজ করিওনা। আর ফিরিয়া আসিতে হইবে না। বউয়ের নোয়া গাছটা ইচ্ছা করিয়া খসাইও না।" কিন্তু শেষে তাঁহাকেও আমাদের সহিত যাইতে হইল। তিনি বলিলেন, এই ঘোর বিদেশে তোমাদের দুজন ছেলে মানুষকে কেমন করিয়া একা ছাড়িয়া দিব। অগত্যা আমাকেও যাইতে হইবে।" 'আসল কথা কিন্তু তাহা নয়। তিনি যখন শুনিলেন যে, টুনায় অতি সামান্য সংখ্যক সৈন্য থাকিবে—অধিকাংশ লোকই আমাদের

যুদ্ধের এক মিনিট পূর্ব্বে তিব্বতীয় সৈন্যের অবস্থান।

সহিত যাইতেছে, তখন তাঁহারমত পরিবর্ত্তন হইতে অধিকক্ষণ লাগিল না।

৩১এ মার্চ্চ আমরা জেনারেল সাহেবকে অগ্রে করিয়া টুনা ত্যাগ করিলাম। সঙ্গে আমাদের প্রায় ১২০০ সিপাহী, ১৭টা তোপ ও দেড়শত গোরা ও দেশী শওয়ার চলিল। দ্রব্যাদি বহন করিবার জন্য প্রায় ২৫০০ কুলি ও ২০০ খচ্চর এবং উপরোক্ত একা সকল চলিল। আমি যোগাড় করিয়া আমাদের তিন জনের জন্য একখানা একা সংগ্রহ করিলাম। সৈন্যাদি চারিভাগে বিভক্ত হইল। বলা বাহুল্য প্রত্যেক ভাগ এক এক জন ইংরাজ কর্ম্মচারীর অধীনে রক্ষিত হইল।

প্রায় তিন মাইল অগ্রসর হইবার পর আমরা কয়েক-জন তিব্বতীয় কর্ম্মচারীকে দেখিতে পাইলাম। পথের মাঝখানেই সিপাহীদিগের ওভারকোট বিস্তৃত হইল। তাহারাও তিনজন সাহেব তদোপরি উপবিষ্ট হইলেন। তারপর কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। ও হরি! সেই পুরাতন বুলি, "তোমরা চুপ্সি ফিরিয়া যাও, আর অগ্রসর হইওনা। হইলে আমরা যুদ্ধ করিব।" এই ফাঁকা আওয়াজ শুনিতে শুনিতে আমরা খুব অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সুতরাং অগত্যা সভা ভঙ্গ হইল। তিব্বতীয় মহাশয়েরা চলিয়া গেলেন, আমরা আবার অগ্রসর হইলাম।

এখন আমরা গিয়াংসি অভিমুখে যাইতেছিলাম। ঐ স্থান লাসার খুব নিকট বলিয়া আমরা ঐস্থানে এই গোলযোগের নিষ্পত্তির আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের সে আশা বোধ হয় পূর্ণ হয় না। আরও কিয়দ্দূর যাইবার পর দেখি, পথের ঠিক পার্শ্বে একটি দুর্গ বেষ্টিত স্থানে বহুতর সশস্ত্র তিব্বতীয় সৈন্য অপেক্ষা করিতেছে। এ পর্য্যন্ত এমন ভাব দেখি নাই। উহাদের ফাঁকা শাসন বাক্য শুনিয়া শুনিয়া আমাদের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে, লাসা পর্য্যন্ত কেহই আমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে না। এই প্রকার বিশ্বাস ছিল বলিয়াই আমি কুচের সময় নির্ভয়ে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। কুচের সময় কমিসেরিয়েটের আসবাব ও বাবুরা প্রায়ই মধ্যস্থলে থাকে। আমি এই নিয়ম প্রায়ই লঙ্ঘন করি-

তাম। প্রায়ই অগ্রে অগ্রে যাইতাম; আজও তাহাই করিয়াছিলাম। আমাদের এক্কা এবং সেন ও রায় মহাশয় অবশ্য যথাস্থানে ছিলেন। আমি একটা খচ্চরের উপর খানিকটা আগে আগে যাইতেছিলাম। কয়েকজন ইংরাজ কর্ম্মচারীও আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। এখন সহসা এই ব্যাপার দর্শনে আমি পিছনে হটিয়া আসিলাম। আমাদের সমস্ত সৈন্য গতিরোধ করিল। অফিসরেরা ঘন ঘন তুর্য্যধ্বনি দ্বারা আদেশ প্রচার করিতে লাগিলেন। আমরা গতিরোধ করিবা মাত্র তিব্বতীয়েরা অদৃশ্য হইল। তখন একশত সিপাহী ও তিনজন কর্ম্মচারী দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দুর্গের দ্বার উন্মুক্তই ছিল। তাঁহারা উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে গিয়া উঁহারা নিরাপদ সূচক বিউগল্ ধ্বনি করাতে আমরা সকলে ক্রমে ক্রমে দুর্গের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমার কপালে কষ্ট ছিল, তাই আমি সকলের অগ্রে যাইয়াই উহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

পূর্ব্বোক্ত তিন জন কর্ম্মচারী, আমি ও একশত সিপাহী দুর্গের মধ্যে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় দেখি প্রায় ২০০০ সশস্ত্র তিব্বতীয় সৈন্য আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বলা বাহুল্য আমি মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাদের সৈন্যের পশ্চাতে উপস্থিত হইলাম। ইতিমধ্যে জেনারেল সাহেব স্বয়ং আমাদের সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন। তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তিব্বতীয় দিগকে নিরস্ত্র হইবার আদেশ দিলেন। এ প্রকার হুকুম দেওয়া বড় সহজ কিন্তু তামিল করান বড় কঠিন। কয়েকজন বেশ ভাল মানুষের মত ঐ আদেশ পালন করিলেন। কিন্তু অবশিষ্ট সকলে গোলযোগ আরম্ভ করিল। শেষে ব্যাপার বিশেষ গুরুতর হইয়া পড়িল। একজন তিব্বতীয় একজন শিখকে গুলি করিল। বেচারা মুহূর্ত্তকাল ছটফট করিয়া পৃথিবী হইতে একেবারে বিদায় গ্রহণ করিল।

ইহার পর রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আমরা এ প্রকার ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। সেই জন্য প্রথম কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য কাবু হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু ইংরাজ-কর্ম্মচারীরা প্রকৃত বিপদের সময় যে কি প্রকার ধীর ও স্থির থাকেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজ পাইলাম। তাঁহাদের সুপরিচালনা গুণে মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাদের সিপাহীরা ঠিক হইয়া দাঁড়াইল। ইহার পর দুই চারি মিনিট পর্যন্ত যুদ্ধ চলিল, ইংরাজ শিক্ষিত সৈন্যের নিকট তিব্বতীয়দিগের বলবুদ্ধি খাটিল না। তাহারা অস্ত্রাদি ফেলিয়া সবেগে পলায়ন করিতে লাগিল, আর আমাদের সিপাহীরা গুলি চালাইতে চালাইতে অগ্রসর হইল। মিনিট দশেক পরে যুদ্ধ শেষ হইল। তখন দেখা গেল, তাহাদের ৩০০ হত, ২০০ আহত ও প্রায় ২০০ বন্দী হইয়াছে। আমাদের পক্ষে ৭ জন হত ও ১০ জন আহত হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি আমাদের সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, বরাবর যেমন হইয়াছে এবারও তিব্বতীয়েরা তেমনি পলায়ন করিবে। বিপদের আর কোনও সম্ভাবনা নাই। তাহার পর যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন আমি প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু যখন আমার পার্শ্ববর্ত্তী ক্যাণ্ডলার সাহেব (Mr. Candler একখানি দৈনিক ইংরাজিপত্রের সংবাদ দাতা) আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন, তখন আমার যেন চৈতন্য হইল। অমনি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু আশ্রয়ের উপযুক্ত স্থান দেখিলাম না। তখন আমি তাড়াতাড়ি আহত সাহেবের পার্শ্বে শয়ন করিলাম। আমি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ করিয়া ছিলাম, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। আমার শয়নের সঙ্গে সঙ্গে গুলি সকল আমার উপর দিয়া ছুটীতে লাগিল। প্রকৃত যুদ্ধ স্থলে ইহার আগে কখনও উপস্থিত ছিলাম না। ব্যাপার যে কি প্রকার ভীষণ তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিলাম।

এইস্থানে একটি বড় অদ্ভুত প্রথা দেখিলাম। যুদ্ধ যখন শেষ হইল, তখন আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হতাহত দিগকে পৃথক করিতে ছিলাম। যখনই আমরা কোনও আহত তিব্বতীয়ের নিকটে উপস্থিত হইতে ছিলাম, তখনই সে তাহার জিহ্বা বাহির করিয়া অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতে লাগিল। শুনিলাম, ইহা কৃপা ভিক্ষার চিহ্ন। আমরা যখন উহাদিগকে হাঁস-

পাতালে লইয়া গিয়া সেবা করিবার বন্দোবস্ত করিলাম, তখন প্রথমে উহারা বিশেষ বিস্মিত হইয়াছিল। আহত শত্রুকে যে কেহ আবার সেবা করে, তাহা উহারা জানিত না। তাহারা স্পষ্টই বলিল, "আমরা যদি আপনাদিগকে ঐ অবস্থায় পাইতাম তাহা হইলে কখনও ছাড়িয়া দিতাম না।" কি সর্ব্বনাশ! জীবহিংসার ঘোর প্রতিকূল মহাপুরুষ শাক্যমুনির শিষ্যগণের কি ভীষণ পরিণতি!

আমরা আহত সৈন্যদিগকে টুনায় প্রেরণ করিয়া অগ্রসর হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে ২॥ মাইল দূরবর্ত্তী 'গুরু' নামক গ্রামে পঁহুছিলাম। (পরে উপরোক্ত যুদ্ধ এই গ্রামের নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।) এখানেও উহারা আমাদিগকে বাধা দিবার চেষ্টা করিল। অবশেষে যখন উহাদের প্রায় ১০০ জন বন্দী ও কয়েকজন হতাহত হইল, তখন তাহারা অন্যত্র পলায়ন করিল।

এই গ্রামে উহারা ৫০.৬০ মণ বারুদ সংগ্রহ করিয়া ছিল। উহা একস্থানে ছিল না। তিব্বতীয়েরা পলাইবার সময় কয়েক স্থানে আগুণ লাগাইয়া দেয়। ঐ সকল স্থানে যে বারুদ আছে তাহা আমাদের সিপাহীরা জানিত না। আগুণ নিবাইবার জন্য অনেকে ঐ সকল স্থানে প্রবেশ করাতে আমাদের কয়েকজন সৈন্য হত এবং আহত হইল। যাহা হউক, ইহার পর আমরা গুরু অধিকার ও তথায় এক ক্ষুদ্র সেনানিবাস স্থাপন করিলাম। এইস্থানে অম্বানের (চীন সম্রাটের নিযুক্ত তিব্বতের সর্ব্বপ্রধান চীন কর্ম্মচারী। ইনি লাসায় অবস্থান করেন।) প্রেরিত দূতের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার নিকট শুনিলাম যে, অম্বান্ স্বয়ং আমাদের সহিত গিয়াংসীতে সাক্ষাৎ করিবেন; এতদিন উপযুক্ত আয়োজনের অভাবে তিনি আসিতে পারেন নাই। তিনি আশা করেন যে, ঐ স্থানে আমাদের সমস্ত গোলোযোগের শান্তি হইবে।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

সিন্ধু-গ্রন্থ।

(১)

মনে হয়, সিন্ধু, তুমি নীলের লেখন!
নিশা দিল চন্দ্রবিন্দু, তীর দিল দাঁড়ি,
ভানু দিল বর্ণমালা, বিসর্গ পবন,
বন দিল মকরন্দ মরম উপাড়ি।
নভ দিল তারাহারে শ্লোকের গাঁথুনী,
গিরি হীরকের কাজ ছত্রে ছত্রে করি'
দিল ঝরণায় ঢালি আনন্দ-লহরী,
মরু হাহা রস, মেঘ ছন্দের মাতুনী।
চক্রবাক্ যোড়া দিল চঞ্চু-চুমা-ধ্বনি.
যোগী দিল তপ আর কবি দিল গান,
রোগীপাশে জাগরিতা সেবাসুধা-খনি,
শিশু ঢেলে দিল তার উলঙ্গ পরাণ।

জড় ও জীবের রক্তে তব গীতি লেখা,
কাল-তালপত্রে তুমি প্রাণ-স্মৃতিরেখা.

(২)

ফেনার মলাট, সিন্ধু, ও সুধা-প্রহরী,
যতনে ঢাকিছে তব মসী-মুক্তা সব,
তোমারে পড়িতে গিয়া গেছে ভয়ে সরি
কত জাতি, কত দেশ, বিবর্ত্ত, বিপ্লব।
অধ্যায়ে অধ্যায়ে খোলে অজস্র ভুবন,
শব্দে শব্দে কত কাব্য, সঙ্গীত অক্ষরে,
উচ্ছ্বাস-তরঙ্গ দেখি' কাল-শিশু ডরে,
কালি মাখাইতে এসে করে পলায়ন।
অনুপ্রাস উৎপ্রেক্ষায় অর্থে অলঙ্কারে
গড়াইছে সপ্তস্বর্গ সপ্তসুরে বাঁধা,
দুই পংক্তি মাঝে কত বাণী আধা আধা,
কি বালাই, উলটিতে পাতা আরও বাড়ে!

জ্ঞানের ধর্ম্মের কত উত্থান পতন,
এই গ্রন্থে লিখে গেছে আত্ম-নিবেদন।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

বস্তু বিকার

বহুদিন হইল প্রসিদ্ধ লেখক অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় 'বস্তু বিচার' নামক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। সে সময় বস্তুর বিচার ছিল, তাই বস্তু বিচার লেখার দরকার। এখন আর সে দিন নাই, ভারতে বস্তু বিচার এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে, কাল প্রভাবে বস্তু বিচারের স্থান বস্তু বিকারে অধিকার করিয়াছে। এখন যে দিকে চাই সে দিকেই কেবল বস্তু বিকার। বস্তু বিকারের অত্যাচারে আয়ুঃস্বাস্থ্য বল, বীর্য্য ক্রমশঃ ক্ষয় পাইয়া যাইতেছে, ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ পাইতেছে, দেশটা একেবারে কিম্ভূত কিমাকার হইয়া উঠিয়াছে, তাই আমরা বস্তু বিকার সম্বন্ধে আজ ২।১টী কথা বলিব।

দুগ্ধের বিকার দধি, মাখন, ঘৃত ; ইক্ষু রসের বিকার গুড় চিনি প্রভৃতি ; তণ্ডুলের বিকার মুড়ী মণ্ড অন্ন। এই জাতীয় বিকার চিরদিন প্রচলিত, এই সকল বিকারের গুণ বৈজ্ঞানিকগণ ও চিকিৎসকগণ জানিয়াছেন, সুতরাং এই জাতীয় বিকারে লোকের ইষ্টভিন্ন অনিষ্ট নাই ; কিন্তু আজকাল যে এক প্রকার বিটকেলে চোরা বিকার আরম্ভ হইয়াছে তাহাই সমাজের সর্ব্বনাশের মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ঘৃত একটী উপাদেয় বস্তু, আয়ুর্ব্বেদ বলেন ঘৃত বলকর, পুষ্টিকর, তেজস্কর, ঘৃতে লাবণ্য আয়ুঃ বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়, স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পায়, বিষদোষ নষ্ট করে, ঘৃতে উন্মাদাদি মানসিক রোগ ও কুষ্ঠাদি কায়িক রোগ নষ্ট হয়। ঘৃত ভোজীর শরীরে সহজে জরা প্রবেশ করিতে পারে না। ঘৃত যজ্ঞ হোম শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক কার্য্যেও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পুরাতন ঘৃত বহু রোগে মহোপকারী।

এমন যে মহোপকারী বস্তু তাহা দেশে আর পাইবার উপায় নাই, এমন বস্তু বিকার ঘটিয়াছে যে ঘৃত বলিয়া যাহা বিক্রীত হইতেছে, তাহা অমৃতের পরিবর্ত্তে হলাহল উদ্গীরণ করিতেছে। শূকর গরু ইন্দুর অজগর সর্প প্রভৃতির চর্ব্বি ঘৃতের স্থান অধিকার করিয়া লোকের ধর্ম্ম ক্ষয়, আয়ুক্ষয়, স্বাস্থ্যক্ষয় করিতেছে। বহু চেষ্টায় বহু অর্থে আমরা যে ঘৃত ক্রয় করি তাহাতেও কিছু না কিছু বাদাম তৈল বা সর্ষপ তৈল মিশ্রিত থাকিবে।

আজ তুমি মাখন দাগাইয়া সাক্ষাতে ঘৃত প্রস্তুত করাও তাহাতেও বিশুদ্ধ ঘৃত পাইবে না। গোপনন্দনগণ চর্ব্বি মিশ্রিত চালানী ঘৃত দুগ্ধ মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া মন্থণ করিতে থাকে, তাহাতে দুগ্ধ হইতে কিঞ্চিৎ মাখন উঠিয়া মথিত চর্ব্বিতে মিশ্রিত হয়, এই অদ্ভুত বস্তুই বাজারে মাখন নামে পরিচিত ও বিক্রীত।

গতবর্ষে অপর পক্ষের পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ সময়ে বহুচেষ্টা করিয়াও একটু ঘৃত মিলাইতে পারিলাম না, কিছু মাখন আনিলাম, মনে করিলাম মাখন গলাইয়া ঘৃতের কার্য্য করিব।

পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করাইতেছেন, কাজ আরম্ভ হইয়াছে, এদিকে মাখন গালাইতেছে, কিন্তু কার সাধ্য সেখানে থাকে, চর্ব্বি পোড়ার গন্ধে নাক ঝালা পালা হইয়া যাইতে লাগিল। তখন আর উপায় নাই, ঘরে পুরাতন ঘৃত ছিল শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যে তাহার কিছু নিক্ষেপ করিয়া মধুর অভাবে গুড়ের ব্যবস্থার পথ অবলম্বন করিলাম।

এইতো দেশের অবস্থা, এই ভয়ঙ্কর বস্তু বিকারের প্রতিকারের উপায় নাই, খাদক যাহা পায় তাহাই খায়, সুতরাং বিক্রেতাগণ বস্তু বিকার করিবেনা কেন।

অবশ্য রাজ পুরুষগণ কলিকাতা নগরীতে ভেজাল ঘৃত বিক্রেতা দোকানীদিগের মধ্যে মধ্যে অর্থ দণ্ড করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহাতে বিন্দু মাত্রও উপকারের প্রত্যাশা নাই কারণ ভেজাল ঘৃত বিক্রয় করিয়া মাসে যদি ১০০০৲ টাকা লাভ হয়, তবে বৎসরে কি ছয় মাস পরে সামান্য টাকা দণ্ড দিলে ক্ষতি কি? দণ্ডের টাকা যে দুই দিনেই আয় হইয়া যায়। এই অবস্থায় ভেজাল বিক্রেতাগণের যতদিনে কায়িক দণ্ড না হইবে ততদিনে এই উপদ্রব দূর হইবার আশা নাই। উহা যে কতদিনে ঘটিবে তাহা ভগবান্‌ই জানেন। কেবল ঘৃত নয়, যত কিছু উপাদেয় প্রয়োজনীয় জিনিস, তাহার সমস্তেই বস্তু বিকার ঘটিয়াছে। মধু দৈব কার্য্যে, পিতৃকার্য্যে, ঔষধে, পানে, ব্যবহারের একটী নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু,

ইহা অশ্বডিম্বের ন্যায় নামে মাত্র অস্তিত্ব সম্পাদন করিতেছে।

বিক্রেতাগণ চিনির শিরায় কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ করিয়া বিক্রয় করিতেছে, কেহ কেহ গুড়ের শিরাও মিশাইতেছে। পশ্চিমা মজুর গুলির মধ্যে কথকগুলি স্ত্রী পুরুষে কেবল চিনির শিরায় (যাহাতে একবিন্দুও মধু নাই) একটু কমলা লেবুর আরক মিশাইয়া কমলা মধু বলিয়া বিক্রয় করিতেছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এখন আর বস্তু বিচার নাই; সমাজ যাহা পায়, তাহাই চক্ষু বুজিয়া খায়। নচেৎ মুটে মজুরে আমাদিগকে এই ভাবে ঠকাইতে পারিত না।

জামালপুরের ওদিকে যাহারা মধুর চাক ভাঙ্গিতে যায়, তাহারা কলস ভরা চিনির শিরা সঙ্গে নিয়া যায়, চাক ভাঙ্গিয়াই ঐ চিনির শিরায় একটু একটু মধু মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহা ইহাদের নিজের মুখেই অনেকের নিকট প্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং বিশুদ্ধ ঘৃত ও মধু ভূলোকে পাওয়ার আশাই নাই, ভূমিপুত্র মঙ্গল গ্রহেও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। দুগ্ধের দশাও আজ কাল তথৈবচ। অনেকে মনে করিতে পারেন দুগ্ধে জল দেয় তাহাতে আর বিশেষ অনিষ্ট কি? অনিষ্ট আছে, অপরিষ্কার জলেও স্বাস্থ্যের হানি হয়। অনেকে আবার পূর্ব্ব দিনের দুগ্ধ জাল দিয়া রাখে, সেই বাসী দুগ্ধ পর দিনের দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। এই দুগ্ধ সকলের পক্ষেই, বিশেষতঃ বালক ও রুগ্নদিগের পক্ষে বিশেষ অপকারী। যাহারা পূর্ব্বদিনের দুগ্ধ মিশায় না তাহারাও দুগ্ধ জাল দিয়া সর তুলিয়া জল মিশ্রিত করিয়া থাকে। এরূপ বস্তু বিকারেও স্বাভাবিক দুগ্ধের ফল পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ বিক্রেতাগণ এক পাত্রে বহু গাভীর দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া থাকে। তাহার কোনও গাভী রোগা, কোনটী সদ্যঃ প্রসূতা, কোনটীর হয়তো বসন্ত উঠিয়াছে, ইত্যাদি কারণে মিশ্রিত দুগ্ধে বহুরোগের বীজ নিহিত থাকে।

বিশুদ্ধ তৈল একেবারে দুষ্প্রাপ্য। যত প্রকার তৈল আছে, সব তৈলেই ভেজাল চলিতেছে। আজকাল এক প্রকার গন্ধহীন কেরোছিন বাহির হইয়াছে, ইহাও নাকি তিল তৈলাদিতে মিশ্রিত হইয়া থাকে।

শুনিতে পাই কৃত্রিম কুঙ্কুমে (জাফরানে) অতি ঘৃণিত বস্তু থাকে। রক্ত ও বিবিধ অপবিত্র জিনিসে একটু কস্তূরী মিশ্রিত করিয়া ব্যবসায়ীগণ বস্তু বিকার ঘটায়। রোগীর পথ্যেও বস্তু বিকার প্রবেশ করিয়াছে। বার্লিতে ময়দা, এরারুট ও শটীর পালোতে চক্ চূর্ণ প্রবেশ করিয়া মহান্ অনিষ্ট করিতেছে। আজকাল রোগের ঔষধে বস্তু বিকার তীব্র মাত্রায় প্রবেশ করিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদীয় এক একটী ঔষধ বহু দ্রব্যের সংমিশ্রণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে গন্ধ বর্ণ ঠিক রাখিয়া বহু মূলের বস্তুগুলি না দিলেও কেহ দেখিয়া ঠিক করিতে পারেন না। রাসায়নিক পরীক্ষা ভিন্ন আর কোন উপায়েই ঔষধ ঠিক কি না, বুঝিবার সাধ্য নাই। রসায়নবিৎ পণ্ডিত নিয়া কেহ ঔষধ খরিদ করিতে যায় না, সুতরাং ইচ্ছা করিলে নির্ভয়ে কৃত্রিম ঔষধ বিক্রয় করা যায়।

এই সুযোগ পাইয়া অনেকেই এখন সস্তা দরে কৃত্রিম ঔষধ বিক্রয় করিয়া পশার প্রতিপত্তি ও অর্থ লাভ করিতেছেন। এই বস্তু বিকারে ক্রেতার কেবল অর্থদণ্ড নয়, রোগীর প্রাণ নাশ পর্য্যন্ত ঘটিবার সম্ভাবনা। জগতে এক শ্রেণীর লোক আছেন যাহারা সম্মুখে একটি পয়সাও ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত, কিন্তু পাছ দিয়া সর্ব্বস্ব গেলেও তাহা দেখেন না, ইহারাই অল্প মূল্যে কৃত্রিম ঔষধ ক্রয় করিয়া পাছে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। আর এক শ্রেণীর লোক সরল ও বিশ্বাসী, তাহারাও সরল বুদ্ধিতে কৃত্রিম ঔষধ ক্রয় করিয়া প্রবঞ্চিত হইয়া থাকেন। যাহারা নিজে চিকিৎসক নহেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই বেতনগ্রাহী চিকিৎসক দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া সস্তা মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন, কিন্তু একজনের ঔষধ আর একজনে করিলে কতদূর সাবধান-সতর্কতা নেওয়া হয়, তাহা সহজেই সকলের অনুমেয়। আবার যাহারা পরের বাড়ী থাকিয়া চিকিৎসা করেন, যাহাদের লোক নাই, অর্থ নাই, আয়োজন নাই, তাহারা কিরূপে খাটি ঔষধ বিক্রয় করিবেন তাহাও সহজে অনুমেয়।

অনুমেয় বটে কিন্তু অনুমান করে কে, চিন্তা করিয়াই

বা দেখে কে ? লোক ভুলান কথায়, বিজ্ঞাপনের চটকে. বাহ্যাড়ম্বরের বাহুল্যে অনেকেই আত্মহারা হইয়া পরেন, তাই বস্তু বিকারের এত বাড়াবাড়ি।

ভাগ্যদোষে ভারতবাসীর ভূতের ভিতরেও ভেজাল ঢুকিয়া পড়িয়াছে। দার্শনিকগণের মতে পঞ্চ ভূত, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণায় পঞ্চ ভূতে অনেক ভূত বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এখন ভূত প্রায় চৌষট্টি। ভূতেও যখন ভেজাল, তখন ভৌতিক পদার্থে ভেজাল থাকিবে না কেন !

বস্তু বিকার যে কেবল অচেতন পদার্থেই ঘটিয়াছে তাহা নয়, আমাদের দেশে চেতন পদার্থেও বস্তু বিকার ঘটিয়াছে। যে যাহা নয়, সে যদি তাহা বলিয়া পরিচিত হয় কিংবা তদনুরূপ থাকে, তবেই আমরা তাহাকে বস্তু বিকার মনে করিয়া থাকি। দেশে অনেক উদারচেতা পরোপকারী মহা বুদ্ধিমান্ মহাবিদ্বান্ লোক আছেন, তাহারা অর্থের অভাবে, সহায় সম্পদ, যোগার যন্ত্রের অভাবে লোক সমাজে ও রাজদ্বারে কিছুমাত্র সম্মান গৌরব খ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি যেরূপ বস্তু সেভাবে প্রকাশ পাইতে পারেন নাই, বিকৃত ভাবে রহিয়াছেন। ইহাও এক প্রকার বস্তু বিকার বটে। এ বস্তু বিকারেও সমাজের যথেষ্ট হানি আছে। গুণের ও সাধুতার আদর না থাকায় দেশ অধঃপাতে যাইতেছে। উপযুক্ত সম্মান গৌরব সহানুভূতি না পাইয়া তাহারা ম্রটী হইতেছেন ও তাহাদের দীর্ঘ নিশ্বাসে দেশ শ্মশান ক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে। অপর দিকে মেকীর আদর বাড়িতেছে। যিনি যেরূপ পাত্র নহেন তিনি অর্থবলে, জিহ্বা বলে, যোগার যন্ত্র সহায় সম্পদের বলে, তদপেক্ষা সহস্রগুণ উন্নতি লাভ ও খ্যাতি গৌরভ লাভ করিয়া বড় বড় উপাধিতে অলঙ্কৃত হইয়া সমাজে প্রভুত্ব করিতেছেন। ইহাও এক প্রকার বস্তু বিকারই বটে। ইহাতেও সমাজের যথেষ্ট অনিষ্ট হইতেছে।

এ দিকে আমাদের দেশটা পরাধীন, হইয়াও যেন স্বরাট স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছে। কেহ কাহারও অধীন থাকিতে. চায়না। ইহাও এক প্রকার বস্তু বিকারই বটে। চির দিনের চণ্ডাল জাতি এখন আর চণ্ডাল বলিয়া পরিচয় দিতে চায় না। শৌণ্ডিকগণ বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিতে সমুদ্যত। এক প্রকার বস্তু আর এক প্রকার হইলেইতো বস্তু বিকার, সুতরাং ইহাও বস্তু বিকারে পরিগণিত।

এই বিকারে সমাজের অপকার কি উপকার আমরা সে কথার অবতারণা করিতে চাই না। উপকারই হউক, আর অপকারই হউক, ইহাও যে বস্তু বিকার তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। অর্থলোভে যাহারা বস্তু বিকারের সাহায্য করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যেও ঘোরতর বস্তু বিকার ঘটিয়াছে। স্থূল কথা আমাদের দেশের চেতন পদার্থগুলিও এখন ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় নাই। হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, আত্মম্ভরিতা, ধূর্ত্ততা, প্রবঞ্চনা, কপটতা প্রভৃতি অনেকের ভিতরে প্রবেশ করিয়া বস্তু বিকার ঘটাইয়াছে। আমরা চিকিৎসক। বিকার আমাদের চক্ষুঃশূল, বিকারের নাশ করাই আমাদের ব্যবসা ; কিন্তু এত বিকারের ঔষধ কোথায়, এ যে অসাধ্য ব্যাধি ! ভগবানের কৃপা ভিন্ন এ ব্যাধির ঔষধ নাই। এখনও সমাজ যদি সুপথ্যাশী হইত তবে রোগ এত বৃদ্ধি পাইতে পারিত না। একজনের দেখা দেখি দশ জনে কুপথ্য গ্রহণ করিতেছে। কাজেই দেশ রসাতলে যাইতেছে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন।

ঋণ-শোধ

নারায়ণ রায় যখন অশীতিবর্ষ বয়সে পৃথিবীর শেষ নিশ্বাস গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার মনে এই দুঃখ ছিল যে তিনি পুত্র মহেশ ও হরিশের জন্য কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, জোত জমি প্রভৃতি যে সকল উপসর্গে চঞ্চলা লক্ষ্মী অচলা হইয়া থাকেন, নারায়ণ পুত্রদ্বয়ের জন্য সে সকলের কোন বন্দোবস্ত করেন নাই। তবে, রায় মহাশয়ের মনে এই শান্তি ছিল যে, মহেশ ও হরিশ কখনও "ভাই ভাই. ঠাঁই ঠাঁই" হইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করিবে না ; সুতরাং মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে তাহাদের দিন কোনও প্রকারে চলিয়া যাইবে।

এদিকে বিশবৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া মহেশ চারিদিকে আঁধার দেখিল। গৃহে তাহার ত্রয়োদশ বর্ষীয়া পত্নী ভিন্ন দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল না। হরিশ কাণ্ডজ্ঞান-হীন বালক। দুই ভাই উৎসাহের সহিত গ্রামের স্কুলে পড়িতেছিল। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মহেশ যেন স্বপ্ন হইতে হঠাৎ জাগিয়া দেখিল সংসারটা গুরুভার প্রস্তরের ন্যায় তাহার ঘাড়ে চাপিয়া তাহাকে পিষিয়া মারিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। কাজেই অপরিপক্ক বয়সে সরস্বতীর নিকট বিদায় লইয়া মহেশ সংসার রক্ষণে মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিল। মহেশের পত্নী সৌদামিনী গৃহস্থঘরের মেয়ে নভেল,. কার্পেট মাথাধরা প্রভৃতি রোগগুলি তাহার আদৌ ছিল না। একটী চাকরের সাহায্যে সে বৃহৎ পরিবারের সকল কাজ সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিয়া দিনান্তে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুস্তকগুলি লইয়া একটু বসিবার অবকাশ পাইত। সংসারের অন্যান্য নীরস, কবিত্বহীন কাজ মহেশকেই করিতে হইত। সুতরাং পতি পত্নী পরস্পরের সাহায্যে বৃহৎ সংসারটা কোনও প্রকারে চলিতে লাগিল।

মহেশও সৌদামিনী উভয়েরই আন্তরিক ইচ্ছা, হরিশ পড়িয়া শুনিয়া একটা পণ্ডিত হইয়া বাহির হয়। সুতরাং তাহারা হরিশকে কোনও কাজে ডাকিত না। তাহাদের উৎসাহে হরিশ দ্বিগুণ তেজে পড়িতে লাগিল এবং ক্লাসের সকল ছেলেকে হটাইয়া দিয়া ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর সস্নেহ হৃদয়ের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল।

(২)

পিতার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই মহেশ বেশ বুঝিতে পারিল, তাহার অদৃষ্টটা যেন তত প্রসন্ন নহে। ক্রমে তিন বৎসর অজন্মা হইল। বাহির হইতে এক কপর্দ্দকও ঘরে আসিল না, কিন্তু 'সংসারের ঠাঁট বজায় রাখিতেই হইল; অন্নবস্ত্রের অভাব সত্বেও বার মাসের তের পার্ব্বন সমান ভাবেই চলিল। সকল প্রকার অভাবের মধ্যে পড়িয়া সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর ন্যায় মহেশ অস্থির হইয়া উঠিল। এমন সময় কলিকাতা হইতে একখণ্ড সংবাদ পত্র হরিশের পাসের খবর বুকে লইয়া উপস্থিত হইল। হরিশ প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করিয়াছে শুনিয়া মহেশ আনন্দের পরিবর্ত্তে বরং বিষাদ সাগরে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। হরিশের পড়াতো আর বন্ধ থাকিতে পারেনা! অনেক চিন্তা করিয়া মহেশ ভ্রাতার পড়ার বন্দোবস্ত করিবার জন্য মহাজনের শরণাগত হইল।

শুভদিনে হরিশ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর চরণে প্রণত হইয়া, চিরপরিচিত স্নেহ-নীর পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার ন্যায় অজ্ঞাত রাজ্যের উদ্দেশ্যে ছুটীয়া চলিল! যাত্রার সময় সৌদামিনী অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে বলিল "দেখ ভাই, আমাদের যেন ভু'লোনা"। হরিশ মার কথা বহুদিন হইল ভুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আজ এই স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রুরাশির প্রতিরোধ করিতে পারিলনা।

(৩)

রঙ্গমঞ্চের ন্যায় সংসারের দৃশ্যটিও অবিরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। হরিশ কলিকাতায় আসিয়া দেখিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর রাশির সমষ্টি—তাহাদের গ্রামখানার সঙ্গে তুলনা করিলে এ যেন স্বপ্নরাজ্য পরীর দেশ বলিয়া মনে হয়। গাড়ী ঘোড়া, ট্রাম, মিউজিয়ম্, চিড়িয়াখানা, থিয়েটার প্রভৃতি অসংখ্য দৃশ্যে তাহার নয়ন ঝলসিয়া গেল। নূতন সৌন্দর্য্যরাশির সঙ্গে সঙ্গে, নূতন ভাব, নূতন সঙ্গী তাহাকে নাচাইয়া মাতাইয়া তুলিল। দেখিতে দেখিতে পল্লি-গ্রামের হরিশ একজন প্রকাণ্ড 'সহুরে' হইয়া উঠিল। সার্ট, কোট, কলার, সিগারেট প্রভৃতি সভ্যতার কোনও উপসর্গই তাহার দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। মাস শেষে সে যে টাকার দাবী করিয়া পাঠাইত তাহা সংগ্রহ করিতে মহেশের হৃদয়ের রক্ত জল হইয়া যাইত কিন্তু হরিশ সুখে সচ্ছন্দে পড়াশোনা করিতে পারিতেছে, এই আনন্দে মহেশ ও সৌদামিনী কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান না করিয়া তাহার সকল দাবীই পূর্ণ করিয়া দিত।

কলিকাতার ভাবের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে হরিশ এফ, এ, পাস করিয়া মে ডকেল কলেজে ভর্ত্তি হইল। পাঁচবৎসর যখন কাটিয়া গেল তখন মহেশ জমি জমা বন্ধক রাখিয়া, ঘটী বাটী বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে লাগিল। আর এক বৎসর পরে হরিশ ডাক্তার

হইয়া বাহির হইলেই সকল কষ্টের অবসান হইবে, এই আশায় মহেশের হৃদয়ে আনন্দের উৎস খুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সংসার একেবারে অচল হইয়া গেল, পাল-পার্ব্বন বন্ধ হইল, এমনকি মধ্যে মধ্যে ভ্রাতৃ-বৎসলতার পুরস্কার স্বরূপ মহেশ সস্ত্রীক উপবাস করিতে লাগিল। এত করিয়াও শেষ রক্ষা হইল না। অবশেষে একদিন ভগ্ন প্রাণে মহেশ সৌদামিনীর কাছে আসিয়া বলিল "এখন উপায় কি? এখনও ছয় মাস বাকী আছে। আর টাকা ধার পাওয়া যায়না, আমি চারিদিক আঁধার দেখিতেছি।"

স্বামীর বিষণ্ণ, বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া সৌদামিনী মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিল, তারপর বাক্স খুলিয়া একগাছি সোনার হার তাহার হাতে দিল। "কোনও চিন্তা নাই, ইহাতেই কুলাইবে, যদি না কুলায়, আরো আছে।" এই বলিয়া হাতের সোণার বালা স্পর্শ করিল।

একটা বৈদ্যুতিক স্পন্দনে মহেশের হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। সৌদামিনীর পিতৃদত্ত অলঙ্কার খানা হাতে করিয়া মহেশের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত কহিয়া উঠিল, উপায় নাই, তাই দ্বিরুক্তি না করিয়া সে স্নেহের দান মাথায় তুলিয়া লইল, তারপর ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

(৪)

হরিশ ডাক্তার হইয়া বাড়ী আসিল, তারপর চাকুরী লইয়া চলিয়া গেল। মহেশ ও সৌদামিনী অল্পকাল মধ্যেই তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইল। এ হরিশ যেন আর সে হরিশ নহে। সে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর প্রতি কেমন একটা অনাদর এবং অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করে, তাহাদের সঙ্গ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিলে যেন শান্তি লাভ করে!

দুই বৎসরেই হরিশের পসার বেশ জাঁকিয়া উঠিল। ভাগ্যলক্ষ্মী এই নবীন ডাক্তারের হ্যাট্ কোট্ ও বসনভূষণের চাকচিক্যে আকৃষ্ট হইয়া নিজের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে মুষ্টি মুষ্টি স্বর্ণরাশি লইয়া তাহার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিলেন। জুড়িগাড়ী, কোঠাবাড়ী, আসবাবপত্র প্রভৃতি হরিশের কোনও কিছুর অভাব রহিল না। অধিকন্তু সহরের প্রবীণ উকিল অমরেন্দ্র বাবু আপনার হার্ম্মনিয়ম, পিয়েনোবাদিনী কন্যা জ্যোৎস্নাকে হরিশের হস্তে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিলেন।

হরিশ এই দুই বৎসরে মহেশ ও সৌদামিনীর কোনও খবর লইবার অবসর পায় নাই। বিবাহের পরদিন মহেশ একখানা পোষ্টকার্ডে জানিতে পারিল, হরিশের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাহার মস্তকে যেন চিরদিনের উন্নত আকাশটা ভাঙ্গিয়া পড়িল—"হায়, এই কি সেই হরিশ, সৌদামিনী না খাওয়াইয়া দিলে যাহার খাওয়া হইত না।" সৌদামিনীর হাস্য প্রফুল্ল মুখ চিরদিনের জন্য মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

এদিকে পৈতৃক বাড়ীঘর যখন দেনার দায়ে নিলাম হইয়া গেল, তখন মহেশ নিরুপায় হইয়া হরিশের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইল।

(৫)

হরিশের বৃহৎ অট্টালিকার একটী ক্ষুদ্র অন্ধকারময় গৃহে মহেশ ও সৌদামিনী আসিয়া আশ্রয় লইল। হরিশ চক্ষুলজ্জা এড়াইতে পারে নাই সুতরাং তাহাদিগকে স্থান দিতে বাধ্য হইল।

মহেশ এই নূতন আশ্রয়ে আসিয়া কিছুই নূতন দেখিতে পায় নাই। ভ্রাতার অনাদর সে সহিয়া থাকিতে শিখিয়া লইল। সংসারে দুঃখের বোঝা বহন করিতে যাহারা আসিয়াছে, তাহাদের সহ্য করিবার ক্ষমতা স্বভাবতঃই একটু বেশী থাকে। কিন্তু সৌদামিনী এই নূতন আশ্রয়ে আপনাকে অপমানিত জ্ঞান না করিয়া থাকিতে পারিল না। যে দিন সৌদামিনী হরিশের গৃহে পদার্পণ করিল, সেই দিনই জ্যোৎস্না ঠাকুরকে তাড়াইয়া দিল। সুতরাং রান্না বান্না ও অন্যান্য কাজ কর্ম্ম সৌদামিনীর ঘাড়ে আসিয়া পড়িল। জ্যোৎস্না এ সকল কাজে কখনও আসিত না, তাহার শরীর কারণে, অকারণে অসুস্থ হইয়া পড়িত। কাজ করিতে হয় বলিয়া সৌদামিনী দুঃখিত না হইয়া বরং আনন্দিত হইত। কিন্তু, জ্যোৎস্না যে তাহাকে সম্মানের চক্ষে না দেখিয়া বরং অনাদর করিত, তাহাকে দূরে দূরে রাখিত, এমন কি তাহার তিন বৎসরের ছেলে অনিল যাহাতে সৌদামিনীর কাছে না থাকিতে পারে তাহার জন্য নানা কৌশলে ছেলেটীকে

ভুলাইয়া রাখিত—এ সকল বিষয় সৌদামিনীর স্বভাব-কোমল হৃদয়ে তীব্র বেদনা জাগাইয়া তুলিত। মুখ ফুটিয়া সে কাহাকেও কিছু বলিত না, কিন্তু দিন দিন তাহার শরীর ও মন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। মহেশ সকলই বুঝিত, সকলই দেখিত এবং উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ রুদ্ধ করিবার জন্য দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া চলিয়া যাইত।

(৬)

দিবা নিদ্রা শেষ করিয়া জ্যোৎস্না পিয়েনোর কাছে বসিয়া কয়েকটী সঙ্গীতের সুর মিলাইতেছিল, এমন সময় সৌদামিনী ধীরে ধীরে আসিয়া মেজের উপর বসিল। তাহার রুগ্ন, কঙ্কালসার দেহে রক্তের লেশ ছিল না, কোটর প্রবিষ্ট চক্ষু হইতে মৃত্যু সোৎসাহে—উঁকি মারিয়া দেখিতেছিল।

অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়াও সৌদামিনী জ্যোৎস্নার সঙ্গে আলাপ করিবার সুযোগ পাইল না, জ্যোৎস্না তাহার দিকে দৃক্‌পাতও করিল না। অবশেষে সৌদামিনীই ধীরে ধীরে বলিল "আজ তোমাকে একটা কথা না বলিয়া পারিতেছি না, বোন্! আমার শরীরটা অসার হইয়া পড়িয়াছে, রান্নাবান্নার কাজ আমি তো আর চালাইয়া উঠিতে পারিব না। একটা রাঁধুনী না রাখিলে আর উপায় নাই।"

জ্যোৎস্না সৌদামিনীর দিকে না ফিরিয়াই বলিল, "রাঁধুনী রাখিলে কি করিয়া পোষায় বল। এই বৃহৎ সংসারের খরচ কত কষ্টে চলে, তাহা কি আর বুঝিতে পার না!"

ধীরে ধীরে সৌদামিনী উঠিয়া আসিল। হরিশকে বলিয়াও সৌদামিনী কোনও সদুত্তর পাইল না।

মহেশ যখন রন্ধনের সহায়তা করিতে আসিল, তখন সৌদামিনীর অশ্রুজল আর বাধা মানিল না। কাঁদিয়া বক্ষ ভাসাইয়া সৌদামিনী বলিল, "আমি যত দিন বাঁচিয়া আছি, তুমি একাজে কিছুতেই আসিতে পারিবে না। তারপর, যাহা ইচ্ছা, করিও।"

সৌদামিনী নিজেই চাকর হরেকৃষ্ণকে ডাকিয়া এক বেলা রাঁধিবার জন্য বলিয়াছিল, কিন্তু হরেকৃষ্ণ তাহা গ্রাহ্যও করিল না। অভাগিনী সৌদামিনীও একদিন গৃহিণী ছিল, তাহার সুখের সংসারে তাহার ইঙ্গিতেও চাকর খাটিত। সেই সংসার কেন ভাঙ্গিল তাহা মনে করিয়া সৌদামিনীর চক্ষু দিয়া আগুন ছুটিতে লাগিল।

তিল তিল করিয়া শরীরের শেষ রক্ত বিন্দু অকৃতজ্ঞ দেবরের সেবায় উৎসর্গ করিয়া অবশেষে একদিন ম্লান সন্ধ্যার বিশুষ্ক কুসুম কোরকের ন্যায় সৌদামিনী পৃথিবীর কোলে ঝরিয়া পড়িল।

মহেশ কাঁদিল না; সে মনে করিল, সৌদামিনী কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দের রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে।

(৭)

সৌদামিনীর মৃত্যুর পরে অত্যল্পকাল মধ্যেই মহেশ বৃদ্ধ হইয়া পড়িল; গুচ্ছ গুচ্ছ শুক্ল কেশ অকালে তাহার মস্তকে বার্দ্ধক্যের বিজয়-পতাকা উড়াইয়া দিল। সে হাসিমুখে কাহারও সহিত বড় একটা আলাপ করিত না। নির্জ্জনে হরিশের ছেলে অনিলকে কোলে করিয়া বসিয়া থাকিত।

বেশী দিন এ শান্তি উপভোগ তাহার অদৃষ্টে ঘটিল না। জ্যোৎস্না হরিশকে শীঘ্রই বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে মহেশ অনিলকে সভ্যতা শিক্ষা দিতে পারে না; এতদ্ব্যতীত একজনের উপার্জ্জনে দশ জনে বসিয়া খাওয়া অর্থের অপব্যবহার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অবশেষে হরিশ মহেশকে বলিল, "দাদা, আমাদের বৃহৎ সংসারের খরচতো আমি একা কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছি না, তুমিও যদি একটা চেষ্টা দেখ তবে ভাল হয়।"

মহেশ কিছুই বলিল না, সে দেখিল তাহার সম্মুখে একটা মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে, তাহা মানুষ নহে; নির্ম্মম পিশাচ। ক্রমাগত ঘাত প্রতিঘাতে মহেশের হৃদয়ে সংসারের প্রতি একটা বিজাতীয় বিতৃষ্ণা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল; আজ তাহা সজীব ও সবল হইয়া তাহাকে মাতাল করিয়া তুলিল। গভীর রজনীতে অন্ধকার আসিয়া যখন সারা পৃথিবীকে গ্রাস করিল, তখন মহেশ ধীরে ধীরে আপনার অন্ধকারময় কক্ষ হইতে বাহির হইয়া অনন্ত আঁধার ও অসীম বিশ্ব পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া যে সীমাহীন শূন্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারই কোলে মিশাইয়া গেল।

(৮)

যে মায়াবিনীর মায়াযষ্টিস্পর্শে দরিদ্রের পর্ণকুটীর রাজার প্রাসাদে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহারই মায়া মন্ত্রবলে সেই রাজপ্রাসাদ কোথায় উড়িয়া গিয়া শুধু শূন্যতার সৃষ্টি করে।

হরিশ যখন ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া একটা পৈশাচিক তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল, তখন সহসা একদিন প্রভাতে তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। যে ব্যাঙ্কে তাহার যথা সর্ব্বস্ব গচ্ছিত ছিল, সেই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার একখণ্ড ক্ষুদ্র কাগজে লিখিয়া জানাইলেন "ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে।" এই কথা কয়টীর অর্থ কি ভয়ঙ্কর—হরিশ দুই দিনেই তাহা বেশ বুঝিতে পারিল। তাহার হাতে এক কপর্দ্দকও নাই, কিন্তু চাল, ডাল, তরিতরকারী ও বস্ত্রের দোকানে প্রায় হাজার টাকা দেনা। মহাজনের পাল যখন ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় খাতা হস্তে আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল, তখন হরিশের জীবনটা একটা জীবন্ত অশান্তি বলিয়া মনে হইল।

হরিশ বুদ্ধিমানের ন্যায় ব্যবসায়ের আয় দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু ব্যবসায়ের স্রোতেও ক্রমে ভাটা পড়িতে লাগিল। চারিদিকে হ্যাট্ কোট্ ধারী নূতন ডাক্তারের দল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল এবং হরিশের মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইতে লাগিল। নিরুপায় হইয়া হরিশ বাড়ীখানা বিক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু জ্যোৎস্না তাহা আদবেই পছন্দ করিলনা, তাহার সুন্দর মুখখানা বিষণ্ণ হইয়া উঠিল।

অবশেষে হরিশ জ্যোৎস্নার অনভিমতেই বাড়ীখানা বিক্রয় করিয়া ঋণের দায় হইতে মুক্ত হইল। সহরের এক কোনে একটা পুরাতন স্যাঁৎসেঁতে ভাড়াটে বাড়ীতে সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

একদিকে এই স্যাঁৎসেঁতে বাড়ী, তার উপর রান্না বান্নার সকল কাজ যখন জোৎস্নার উপরে আসিয়া পড়াইল তখন সে হরিশকে ভর্ৎসনায়, টিট্‌কারীতে, ক্রন্দনে ব্যতি ব্যস্ত করিয়া তুলিল। একদিকে, অভাব, অন্যদিকে এই নিষ্ঠুরতা হরিশকে তীব্রভাবে বুঝাইয়া দিল "ইহাই এ সংসারে পাপের ফল—প্রায়শ্চিত্ত।"

(৯)

হরিশ বেশ বুঝিতে পারিল তাহার জীবনটা বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কিছু নহে। সারাদিন অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ এবং জোৎস্নার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া তাহার মাথা বিগ্‌ড়াইয়া গেল।

জ্যোৎস্না আসিয়া বলিল "আমি এবাড়ীতে, এভাবে আর থাকিতে পারিব না। ভদ্রলোকের মেয়ে কখনো এত কষ্ট সহ্য করিতে পারেনা।"

হরিশের ধৈর্য্যের প্রাচীর আজ ভূমিসাৎ হইয়া গেল, কর্কশ স্বরে সে বলিল "যাও, তোমার যেখানেইচ্ছা যাইতে পার—তোমার ন্যায় স্ত্রীর মুখ দেখিলেও পাপ হয়।"

জ্যোৎস্নার সুপ্ত অভিমান রাশি চন্দ্রালোকে সমুদ্র বক্ষের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সেই দিনই অনিলকে লইয়া সে কলিকাতায় তাহার ভ্রাতার নিকট চলিয়া গেল। ভৃত্য হরেকৃষ্ণ পূর্ব্বেই বিদায় লইয়াছিল, সুতরাং আজ হরিশ একা।

এই সঙ্গহীনতার মধ্যে হরিশ এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি লাভ করিল। তাহার আবশ্যক সকল কাজ নিজের হাতে করিয়া বহুক্ষণ সে ভাবিবার অবসর পাইত। সে চিন্তা জীবনের পূর্ব্বস্মৃতি—নিজের নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃ বধূর উদ্দেশ্যে অনুতাপের অশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জন করিয়া সে এক স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করিত।

কিন্তু অবস্থা বিপর্য্যয়ে হৃদয়ে যে বিষম আঘাত লাগিয়াছিল, শারীরিক কষ্টের সহায়তায় তাহা হরিশকে ক্রমে দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর করিয়া ফেলিল। তারপর সে রুগ্নশয্যা গ্রহণ করিল। এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় তাহার মুখে একবিন্দু জল দিবার কেহই রহিল না। অনাহারে, অনিদ্রায়, দুশ্চিন্তায় হরিশ সেই শূন্যগৃহে অচেতন হইয়া পড়িল।

(১০)

তিন দিন পরে চক্ষু মেলিয়া হরিশ দেখিল তাহার শয্যাপ্রান্তে এক সন্ন্যাসী বসিয়া রহিয়াছে। তাহার প্রশান্ত বদন ও উন্নত নাসিকা দেখিয়া হরিশ তৎক্ষণাৎ তাহাকে চিনিতে পারিয়া জড়াইয়া ধরিল।

সন্ন্যাসী হরিশকে শান্ত হইতে বলিয়া তাহার সেবায়

নিযুক্ত হইল। নিঃশব্দে ঔষধ পথ্য সংগ্রহ করিয়া হরিশকে সুস্থ করিয়া তুলিল।

হরিশ সুস্থ হইয়া আবার কাজকর্ম্ম করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী বিদায় প্রার্থনা করিলে হরিশ কান্দিয়া বলিল "দাদা, দুঃখের দিনে তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি, কিন্তু সুখের দিনে তাহা পারি নাই। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে। ছোট ভাই বলিয়া আমাকে মার্জ্জনা কর, তোমার পায়ের ধূলা আমার মাথায় তুলিয়া দাও। আমাকে চরণে রাখ।"

সন্ন্যাসী বলিল "হরিশ, আমি তোমার সকল অপরাধ ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু ভাই, আমার সকল বন্ধন টুটিয়া গিয়াছে। আমি মুক্তির আনন্দে নির্ভয়ে যে দিকে দুই চক্ষু যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আমাকে বিদায় দাও। আর দেখ, আমার স্ত্রী সর্ব্বস্ব দিয়া তোমাকে মানুষ করিয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে দুই বৎসর সে তোমার গলগ্রহ হইয়াছিল, দুই মুষ্টি অন্নের জন্য তোমার নিকট ঋণী হইয়া গিয়াছে। তাহার আত্মা বুঝিবা সেই ঋণের জন্য ছটফট করিতেছে। আজ আমি তাহাকে ঋণমুক্ত করিতেই আসিয়াছিলাম, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি; তাহা গ্রহণ করিয়া হতভাগিনীকে মুক্তিদান কর, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

সন্ন্যাসী গৈরিক উত্তরীয়ের ভিতর হইতে একমুষ্টি টাকা বাহির করিয়া হরিশের সন্মুখে রাখিল। হরিশ চক্ষুজল রোধ করিতে পারিল না, বজ্রাহতের ন্যায় দাদার চরণ প্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। সন্ন্যাসী ঋণশোধ করিয়া ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সিদ্ধি মাওলা।

৬৮৯ হিজরী অব্দে সম্রাট জালাল উদ্দিন ফিরোজশাহ খিলিজি যখন ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেছিলেন; সেই সময় সিদ্ধি মাওলা নামক এক জন সংসার বিরাগী সাধু পুরুষ দিল্লীতে আগমন করিয়া নানাবিধ অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন পূর্ব্বক, দিল্লীর অধিবাসীবর্গকে বিস্মিত ও চমৎকৃত এবং সম্রাটকে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই মহা তাপস সিদ্ধি মাওলার কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

পারস্যের অন্তর্গত জুরজান দেশে সিদ্ধি মাওলার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম শেখ হাসান জুরজানী। তাঁহার প্রকৃত নাম শেখ আবদুল কাওাহ, "সিদ্ধি মাওলা" উপাধি বিশেষ। শৈশবেই সিদ্ধি মাওলার মাতৃপিতৃ বিয়োগ ঘটে। নিরাশ্রয় বালক তদ্দেশীয় রাজকীয় বিদ্যালয়ে গমন করতঃ তথায় উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষকের আশ্রয়ে জাতীয় বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং অত্যল্প কাল মধ্যেই স্বীয় মনোযোগ ও অধ্যবসায় গুণে জাতীয় বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ ও অগাধ জ্ঞান সঞ্চয় করিতে সক্ষম হন। অতঃপর তিনি উচ্চ শিক্ষাভিলাষী হইয়া কিয়দ্দিবস মিশরের বিখ্যাত সর্ব্ব প্রধান বিদ্যালয় "জামে উল আজহারে" অধ্যয়ন করেন। মিশরবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সকলেই শিক্ষা বিষয়ে সিদ্ধি মাওলার অতিশয় অনুরাগ দর্শনে বিশেষ প্রশংসা করেন। মিশরের "জামে উল আজহারে" শিক্ষা সমাপ্তির পর সিদ্ধি মাওলা ইউনান দেশে গমন করিয়া, তথাকার প্রধান প্রধান বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের নিকট বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা করেন। দেখিতে দেখিতে সিদ্ধি মাওলা বিজ্ঞান ও রসায়ন বিদ্যায় অগাধ জ্ঞানলাভ করিয়া তৎসাময়িক একজন প্রধান বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হন। কিন্তু তাঁহার উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক মায়া মমতার হ্রাস প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তিনি একজন উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত পণ্ডিত হইয়াও যেন সংসার ধর্ম্মে সর্ব্বদাই নিষ্কামী ও নির্লিপ্ত। ক্রমে সাংসারিক মায়ার পরাজয় ও বৈরাগ্যের জয় হইল। সংসারবিরাগী সুধীকুল ভাস্কর সিদ্ধি মাওলা শুধু দেশ পর্য্যটন ও নানাদেশের সুধী মণ্ডলীর সহবাসে ঐহিক জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বোগদাদ, খোরাসান, সিরিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশের সাধক শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণের সমাধি দর্শন এবং প্রকৃত সাধকের নিকট পরম তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি মহাত্মা ও মহর্ষি

শেখ ফরিদ উদ্দিনের নাম ও তাঁহার গুণানুবাদ শ্রবণে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ মানসে ভারতবর্ষস্থিত শকরগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মহর্ষি ফরিদ উদ্দিনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত তথায় ঈশ্বর চিন্তায় নিরত ও বিভোর থাকেন। তৎপর কঠোর সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া গুরুদেবের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষি ফরিদ উদ্দিন তাঁহার প্রার্থনানুযায়ী তাঁহাকে "সিদ্ধি মাওলা" উপাধি প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন বটে, কিন্তু যাত্রাকালে বলিয়াদিলেন, "সাবধান ! বাদসাহী দরবারের বড় লোক দিগের সহিত কখনও সৌহার্দ্দ স্থাপন করিও না; তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে। যদি তাহা কর, নিশ্চয় তোমার সর্ব্বনাশ হইবে। এবং শেষে মনস্তাপ মাত্র সার হইবে।"

যাহা হউক সিদ্ধি মাওলা মহর্ষি শেখ ফরিদ উদ্দিনের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া দিল্লীর বাদশাহী দরবার এবং ভারত সম্রাটের অতুল ঐশ্বর্য্য ও শাসন বিধি দর্শন মানসে দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সুলতান বলবন ভারতের অধীশ্বর। বিপুল সমৃদ্ধিসম্পন্ন দিল্লী নগরীর অতুল মনোহারিত্ব ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া সিদ্ধি মাওলা তথায় অবস্থান করিবার মানস করিলেন। অল্পদিন মধ্যেই তিনি দিল্লী নগরীতে একটী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় ও একটী অতিথিশালা স্থাপন করিলেন। তাঁহার দ্বার হইতে কেহই রিক্তহস্তে ও অনাহারে ফিরিয়া যাইত না। তাঁহার অতিথিশালায় সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব ও প্রেমভাব সর্ব্বক্ষণ বিরাজিত। কাহাকেও কোন বিষয়ে কখনও বিফল মনোরথ হইতে হয় নাই। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে তাঁহার আদর যত্ন সকলের প্রতিই সমান ছিল। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিদিগের জন্যও সর্ব্বক্ষণ বিভিন্ন প্রকার আহার বিহারের বন্দোবস্ত থাকিত। তুরস্ক, পারশ্য, খোরাসান, ইরান, স্পেন, এবং সিরিয়া প্রভৃতি দেশের নৃপতিবৃন্দ দুর্দান্ত মোগল দলপতি চেঙ্গিজ খাঁ ও তাহার সহকারীগণ কর্ত্তৃক স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া প্রবল প্রতাপান্বিত সুলতান বলবনের আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন। ঐ সমস্ত নৃপতি বৃন্দের সহিত নানাদেশ হইতে খ্যাতনামা পণ্ডিতগণও অনেকেই আসিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত বিভিন্ন দেশবাসী পণ্ডিত মণ্ডলী ও সুলতান বলবনের দরবারস্থ পণ্ডিতগণ সিদ্ধি মাওলাকে একাধিক্রমে পঞ্চমাস পর্য্যন্ত কেবল নানাবিধ জটিল প্রশ্ন করেন, মহাজ্ঞানী সিদ্ধি মাওলা সমস্ত প্রশ্নাবলীর যথাযথ উত্তর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই প্রদান করিয়া পণ্ডিত মণ্ডলীকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিলেন। সকলে তাঁহার গুণগ্রামের ও অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ভারতে আবার জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চার ব্যহুল্যতা আরম্ভ হইল।

সুলতান বলবন সিদ্ধি মাওলার গুণে বিমুগ্ধ ছিলেন, কিন্তু সিদ্ধি মাওলা একজন পরম ধার্ম্মিক এবং সাধক মুসলমান হইলেও ধর্ম্ম বিষয়ে তিনি বাহ্যাড়ম্বরের বিরোধী ছিলেন। তিনি মসজিদ ও অন্যান্য উপাসনালয়ের উপাসনায় প্রায়ই যোগদান করিতেন না। তাঁহার নিজের জন্য দাস দাসী অথবা তাঁহার পরিবার পরিজন কিছুই ছিল না। তিনি নিজে সামান্য শাকান্ন খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন, কিন্তু অতিথি অভ্যাগতদিগের জন্য রাজভোগ প্রস্তুত করিয়া দিতেন। নিজে সামান্য মাদুর ও কম্বল শয্যায় শয়ন করিতেন, কিন্তু আগন্তুকগণের নিমিত্ত বাদশাহী শয্যা সাজাইয়া রাখিতেন। তিনি দান দাক্ষিণ্যে ও অতিথি সেবায় এরূপ ব্যয় করিতেন যে, লোকে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইত। তিনি কাহারও নিকট হইতে কখনও কোন উপঢৌকন গ্রহণ করিতেন না। একজন নিঃস্ব ফকির সর্ব্বদা এরূপ অজস্র ও বিপুল অর্থ ব্যয় করায় লোকে তাঁহাকে কিমিয়াবিদ্ (যিনি অপকৃষ্ট ধাতুকে রাসায়ণিক প্রক্রিয়ায় স্বর্ণে পরিণত করিতে পারেন) বলিয়া সন্দেহ করিত। তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই বহু লোকের সমাগম হইত; সম্রাটের পুত্রগণ এবং রাজপরিবারের অন্যান্য ব্যক্তি স্বীয় অনুচরবর্গ সহ প্রায়শই তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন। দিল্লীর অনেকের বাড়ীতেই রান্না করিবার প্রয়োজন হইত না। সম্রাট বলবনের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার মোহাম্মদ এবং তাঁহার অমাত্য কবিসম্রাট আমির খসরু সিদ্ধিমাওলার নিতান্ত অনুগত ছাত্র ছিলেন। আরও অনেকেই তাঁহার নিকট বিজ্ঞান ও হাকিমী বিদ্যা শিক্ষা করিতেন।

সুলতান বলবনের মৃত্যুর পর সিদ্ধিমাওলার ব্যয় আরও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। কথিত আছে যে প্রত্যহ ১০০০ এক সহস্র মণ ময়দা ও চাউল, ৫০০ পাঁচ শত মণ মাংস, ২০০ দুই শত মণ চিনি এবং এতদ্ব্যতীত আরও প্রভূত পরিমাণে চাউল, ডাইল, ঘৃত, তৈল ও অন্যান্য আহারীয় উপকরণ দরিদ্র ও আগন্তুক দিগকে বিতরণ করিতেন। প্রতিদিন ৩০০ তিন শত দরিদ্রকে বস্ত্রদান করিতেন। নগদ অর্থ দানের পরিমাণও যথেষ্ট ছিল। মোট কথা সিদ্ধিমাওলার দান দাক্ষিণ্যের নিকট স্বয়ং দিল্লীশ্বরও পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন।

সম্রাট জালালউদ্দিন ফিরোজ শাহ যখন দিল্লীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেছিলেন, তখন কাজী জালালউদ্দিন নামক এক ব্যক্তি সিদ্ধিমাওলার নিতান্ত অনুরক্ত ভক্ত হইয়া উঠে। সে ব্যক্তি নানাবিধ কুহকবাক্যে সিদ্ধিম ওলাকে ঐহিক যশোলিপ্সু ও গৌরবাকাঙ্ক্ষী করিয়া তুলে। চাটুকার জালালউদ্দিন সিদ্ধিমাওলাকে সর্ব্বদা বলিত— "হজরত! খিলিজিবংশের মূলোৎপাটন ও ভারতবর্ষে একচ্ছত্র ধর্ম্ম মূলক শাসন-বিধি স্থাপন করিবার জন্য পরম পিতা জগদীশ্বর আপনাকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন। যখন আরব ও সমস্ত ইউরোপ ঘোর অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্নছিল, যখন নানাবিধ অত্যাচার,অবিচার,ব্যভিচার, পরার্থপহরণ প্রভৃতি পাপস্রোত সর্ব্বত্র প্রবহমান ছিল,সেই সময় পশ্চিম গগনের জ্ঞান-মিহির স্বরূপ জগৎ-পূজ্য হজরত মোহাম্মদ মরুময় আরবদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, সমগ্র পৃথিবীতে জ্ঞান বিতরণ পূর্ব্বক অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত এবং সাম্য ও একতা প্রচার করিয়া ইস্‌লাম রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, আপনাকে পরমেশ্বর সেইরূপ দৈববলে বলিয়ান করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছেন। আপনার প্রতি সকলেরই এইরূপ বিশ্বাস।" সিদ্ধিমাওলা ধূর্ত্ত জালালউদ্দিন ও অন্যান্য চাটুকারদিগের বাক্যে কর্ণপাত করিয়া সংসার-বিরাগ পরিহার করতঃ নশ্বর জগতের অস্থায়ী ঐশ্বর্য্যের ভিখারী হইয়া উঠিলেন। আত্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান ও পরমার্থ চিন্তাকে অগাধ জলধি জলে বিসর্জ্জন করিয়া শিষ্যদিগকে রাজোপাধির ন্যায় নানাবিধ উপাধি প্রদান পূর্ব্বক নানা কার্য্যে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। সংসারের কুহক মায়ায়, কুহক লীলায় প্রলুব্ধ হইয়া আজ সংসার বিরাগী নিষ্কাম সন্ন্যাসী ফকির পাপ পঙ্কে নিপতিত হইলেন। কাজী জালাল উদ্দিনের কুমন্ত্রনায় সিদ্ধিমাওলার হৃদয়ে রাজত্ব লাভের প্রবল স্পৃহা জন্মিল। স্বয়ং সিংহাসনাধিকার করিবার পথ পরিষ্কার করণ মানসে তাঁহার দুই জন শিষ্যকে দিল্লীশ্বরের হত্যা সাধন কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ষড়যন্ত্র করিয়া স্থির হইল যে, শুক্রবার দিবস যখন সুলতান উপাসনার্থ মসজিদে গমন করিবেন, সেই সময় তাঁহার জীবন হরণ করা হইবে। এতব্যতীত বলপূর্ব্বক সিংহাসনাধিকার করিবার সঙ্কল্প সাধন মানসে দশ সহস্র অনুচর প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। ঐ সকল অনুচরবর্গের মধ্যে এক ব্যক্তি এই গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কথা সম্রাটের নিকট ব্যক্ত করাতে সিদ্ধি মাওলা ও তাহার অনুচরবর্গ ধৃত হইল। অতঃপর অপরাধিগণকে বিচার মঞ্চে দণ্ডায়মান করাইলে, তাহারা আপনাদিগকে নির্দ্দোষ ঘোষণা করিতে লাগিল। অপরাধের সানুকূলে কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া গেল না বিধায় কয়েকজন হিন্দু রাজকর্ম্মচারীর পরামর্শ মতে অগ্নি পরীক্ষা করা স্থির হইল। অগ্নি পরীক্ষা মুসলমান শাস্ত্রানুমোদিত নহে বলিয়া সমাজের আলেমগণ প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন; অগ্নিপরীক্ষা রহিত হইল। দুইজন ষড়যন্ত্রকারীর বিরুদ্ধে কথঞ্চিত প্রমাণ হওয়ায় তাহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এবং সিদ্ধি মাওলা ও কাজী জালাল উদ্দিনকে বন্দী করিবার আদেশ হইল। অবশিষ্ট ষড়যন্ত্রকারীদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করা হইল।

যখন শান্তিরক্ষকগণ সিদ্ধি মাওলাকে বিচারগৃহ হইতে কারাগারে লইয়া যাইতেছিল, তখন সুলতান তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কয়েকজন ভৃত্যকে বলিলেন, "এই ব্যক্তিই আমার প্রাণ নাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিল, ইহার অপরাধের বিচার তোমরাই কর।" সুলতানের ঈদৃশ উক্তি শ্রবণ মাত্র একজন ভৃত্য দৌড়িয়া গিয়া সিদ্ধি মাওলাকে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। সিদ্ধি মাওলা তাহাতে বাধা না দিয়া অবিকম্পিত স্বরে সানুনয়ে বলিতে লাগিলেন—"হে প্রিয় সুহৃদ! যত শীঘ্র পার, আমাকে আল্লাহ্ তালার নিকট পাঠাইয়া দাও।"

অস্ত্রাঘাতের পর অস্ত্রাঘাত হইতেছে, সিদ্ধি মাওলা অবিচলিত ভাবে সম্রাটকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে সম্রাট! আমাকে শীঘ্র নিহত করিতে মনস্থ করিয়াছ বলিয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি; কিন্তু ধার্ম্মিক ও নির্দোষ লোককে যন্ত্রনা প্রদান করা মহাপাপ। নিশ্চয় জানিও যে আমার অভিসম্পাত তোমার এবং তোমার বংশের উপর পতিত হইবে।" সিদ্ধি মাওলার তেজঃপূর্ণ তীব্রবাক্য শ্রবণ করিয়া সুলতান বিষন্নবদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ তাহার বদন মণ্ডলে এক গভীর চিন্তার ভাব প্রকটিত হইল। কিন্তু সুলতানের এক পুত্র সিদ্ধিমাওলার নিতান্ত বিদ্বেষী ছিলেন, তিনি সুলতানের দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা না করিয়া, জনৈক মাহুতকে অগ্রসর হইয়া সিদ্ধি মাওলার প্রাণবধ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। মাহুত রাজকুমারের ইঙ্গিত ক্রমে সিদ্ধি মাওলাকে তৎক্ষণাৎ হস্তীর পদতলে দলিত করিয়া হত্যা করিল।

হায়! ঈশ্বরপ্রেমিকের কি অসাধারণ ক্ষমতা! ভক্তের প্রতি দয়াময় বিশ্ব-পিতার কি প্রগাঢ় স্নেহ! কি দয়া! সেই মুহূর্ত্তেই চতুর্দ্দিক অন্ধকার করিয়া ভীষণবেগে এক বাত্যা সমুথিত হইল এবং দিবালোককে এক ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত রাত্রির ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন রাখিয়া ভয়ঙ্কর ভাবে বহিতে লাগিল। সুলতানের মনোহর হর্ম্যাবলী সমস্ত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল, দিল্লী নগরী শ্মশান সদৃশ হইল, বহু লোক হতাহত হইয়া এক মহা ভয়ঙ্কর দৃশ্যের সৃষ্টি করিল। সুলতানের ২ পুত্র ও সহধর্ম্মিণী প্রাণত্যাগ করিলেন। তারিখে ফিরোজসাহীতে লিখিত হইয়াছে "এই ভয়ঙ্কর সিদ্ধি মাওলার প্রেতাত্মারূপ তুর্ণডের বিকট তাণ্ডবে দিল্লী নগরীর প্রায় অর্দ্ধেকের বেশী লোক অকালে কালের কবলে পতিত হইয়াছিল। ১২৯১ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। সেই বৎসরই আবার ভারতে মহা দুর্ভিক্ষ হইয়া সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।"

সৈয়দ নুরুল হোসেন কাশিমপুরী।

বাদল রাতে।

বাতায়ন পাশে বসিয়া বিরলে
আকাশের পানে চাহি'
ভাবিতেছি আজি কত কিযে কথা
আঁখিজলে অবগাহি'।
ঝরে-বারিধারা ঝর্ ঝর্ ঝর্
অবিরল ধারে ধরণীর পর,
আঁখি কোণে মোর অশ্রু জাগিয়া
নীরবে মিলায় আঁখিতে,
যোগ নিখিলের উৎসব সাথে—
ছিলনা, চাহিনি রাখিতে।

দ্বারের কাছেতে আঁধার জমেছে
বাহির যায়না দেখা,—
বিজুলী স্বঘনে চমকি গগনে
টানিছে হতাশ রেখা।
পাগল বাতাস মোর ঘরে পশি'
বৃথা কা'রে খুঁজি' ফিরিছে নিশসি';
চকিতে ফিরিয়া পশিছে আবার,
দুরাশায় বুক বাঁধিয়া,
না জানি কাহারে খুঁজিছে আকুলে—
মরে কা'র লাগি' কাঁদিয়া!

কত কথা আজি পড়িতেছে মনে
আজিকে এভরা ভাদরে,
হৃদয়ে আমার জাগায়ে তুলিছে—
ভুলে যাওয়া কা'র আদরে।
মনে পড়ে তুমি আসিলে কেমনে
আধা জাগরণে, আধেক স্বপনে,
পলকের তরে ঝলকি আলোকে
গহন আঁধারে মিশালে।
জাগিয়া উঠিনু কাঁদিতে কেবল
কাঁদাতে ক্ষণিক হাসালে!

তুমি এসেছিলে, তুমি যে আসিবে,
একথাটি ভাবি কেবলি;
সার্থক তাই বাদলা এ ঘোর,
সার্থক তাই সকলি।
বিজুলী আজিকে আমার-ই লাগি'
খুঁজিছে তোমারে নিশি জাগি' জাগি',
বাতাস পাগল, হুতাশ আমার
নিবেদিতে তব চরণে
প্রলয় আজিকে আনিছে মরণ—
পাই যদি তোমা' মরণে।

আঁধারে আমার হৃদয় পূর্ণ
বাহির পূর্ণ আঁধারে,
আঁধারের মাঝে পাইনু বলিয়া
পাইনু পূর্ণ তোমারে;
আঁধারে কাটিল জীবন যাহার
আলোক নয়নে সহে কি তাহার?
অন্ধজনের আলোকের পরে
অধিকার কিছু আছে কি?
অশ্রুর ঝড় বহে যে হৃদয়ে
আলোক সেথায় বাঁচে কি?

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

ভাদ্রের শৈশব স্মৃতি।

শৈশবের অনেক জীর্ণ পুরাতন স্মৃতি, অনেক অতীত কাহিনী বুকে করিয়া ভাদ্র মাস আসে, আবার চলিয়া যায়। ভাদ্রের সেই জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী, চন্দ্রকর বিধৌত তটিনী, কুমুদ কমল-শোভিত তরঙ্গায়িত হ্রদ, দূর প্রান্তরে নব বিকসিত কুসুমের ঝলমল রূপালী আভা, আকাশে রৌদ্র কিরণ স্নাত সোনালী রূপালী নানারঙ্গের মেঘ, তাহাদের মৃদুমন্থর গমন, গুরুগম্ভীর গর্জ্জন, নিত্য ইন্দ্রধনুর আবির্ভাব, এই সকলের সঙ্গে মনের যে কি একটা অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বলিতে পারি না। এই সকল দেখিলে মনে পড়ে শৈশবের সেই জীর্ণ পুরাতন কথা।

কবে কোন দিন এমনই ভাদ্রমাসের চাঁদিনী রজনীতে এক বিদেশী নৌকার মাঝি তরঙ্গায়িত নদীর উপর দিয়া গাহিয়া যাইতেছিল:—

"হয় মন মোহিনী, ভবে এস গো ত্রিলোচনী"

আজও মনে পড়ে তার সেই গানটী। কত কাল বহিয়া গিয়াছে, আজও তাহা ভুলিতে পারি নাই। আজও যেন ভাদ্রের সলিলসিক্ত বায়ু কাণের কাছে আসিয়া মায়ের আগমনী বীণ্ বাজাইয়া দেয়। নিত্য সকালে উঠিয়া সেফালী ফুলের হার গাথিয়াছি, খালের ধারে বসিয়া মিছামিছি মাছ ধরাধরি খেলিয়াছি, নদীর ভাটিয়াল স্রোতে কাগজের পান্‌সী ভাসাইয়া দিয়াছি; তাহারা চন্দ্রলোকের পথ ধরিয়া রামধনুর দেশে ছুটীয়া যাইবে, তীরে দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণ নয়নে কেবল তাহাই দেখিয়াছি। এই চাঁদ্‌নী রজনীতে কতদিন সঙ্গীগণসহ আশার পান্‌সী বাহিয়া চন্দ্রলোক পানে ছুটিয়া চলিয়াছি। এইত চন্দ্রলোক বেশী দূরে নয়, এই শ্যামল বনরাজী নীলার পুরোভাগে সেই আলোক পূর্ণ দেশ— সেখানে দুঃখ নাই কেবল সুখ, বিষাদ নাই কেবল হর্ষ, বিচ্ছেদ নাই কেবল মধুর মিলন; সে দেশের মানুষ মরে না, ফুল শুখায় না, তারা লুকায় না; সে দেশে অমাবস্যা নাই, সারা বর্ষ পূর্ণিমা, অফুরন্ত জ্যোৎস্না, শীতল সুগন্ধি বায়ুতে সোনার পালঙ্কে শুইয়া সে দেশের লোক কত না সুখে নিদ্রা যায়, সে দেশে গেলে সুখের অন্ত নাই, শান্তির অবধি নাই, চল ভাই সেই দেশে। কিন্তু যতই চলিয়াছি, ততই যেন সেই আলোকপূর্ণ রাজ্য দূরে সরিয়া গিয়াছে। হায় তখন বুঝিতে পারি নাই—বুঝিতে পারি নাই যে, মোহিনী আশা এমনই প্রতারণার ফাঁদে ফেলিয়া, এমনই কত আলোকপূর্ণ রাজ্য চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া কত জাগ্রত স্বপন দেখাইবে। সে আশার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। চক্ষুর উপর হইতে শৈশবের সেই রঙ্গিন কাচটী খসিয়া পড়িয়াছে। দু দিনে পার্থিব জগতের কত রূপান্তর!

বস্তুত ভাদ্রমাস প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অতি রমণীয়। বিকচ কমল বক্তা ফুল্ল ইন্দিবরাক্ষী শারদ সুন্দরীর প্রথম যৌবনোন্মেষ—এই ভাদ্রমাসে। ষড়ঋতু ও বারমাস বর্ণনায় ময়মনসিংহের দরিদ্র পল্লীকবি নয়ান ঘোষ ভাদ্রমাসের

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া এক সুমধুর ছড়া গাঁথিয়া ছিলেন। ভাদ্রের চাটনীতে তাহা উপভোগ্য বটে। শৈশবের সেই চির পরিচিত ছড়াটীর কিয়দংশ পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

আধলা গাধলা দিন করেছে ভাদ্রমাসের রাতি,
ঘরের কোণে কুলের বউ জালিয়া দিছে বাতি।
বেঙ্ ডাকিছে ঘন ঘন কচু বনের মাঝে,
ভরা গাঙ্গে ঢেউ ছুটেছে আকাশ ভরা সাজে।
নদী নালায় জল ধরে না পান্‌সী ভাসে সুতে,
গাঙ্গের তলায় মাণিক জালায় ভাদ্রের চান্নি রাতে।
ভোর গিয়াছে কমল বনে আনতে ফুলের মধু,
ফুলের কাণে গুণ গুণিয়ে গাইছে ভ্রমর বধু।
সোনা রূপার মেঘের পাহাড় কাঁদিয়ে খাচ্ছে ছল,
ঘন বাদরে ফুটছে হাসি খরকে জিরার ফুল।
রোদ উঠেছে মেঘ নেমেছে
শিয়াল ঠাকুরের বিয়া।
ভিজা পথে করিম চলে
পাতলা মাথায় দিয়া।
কলসী কাঁকে বউ চলেছে
যম যমুনার জলে।
এমন সময় বাজল বাঁশী
কদম গাছের ডালে।
মন চ'লিল আগে, চরণ
রইল পথের মাঝে।
না জানি আজ কালার বাঁশী
কোন গহনে বাজে।
পিছল পথে আছাড় খেয়ে
পরল রাধা ঢলি।
নিজের দোষে কলসী ভাঙ্গি
পথকে দিল গালি।
ভাব দেখিয়া মনের দুঃখে
বলছে নয়ান ঘোষ।
বাঁশীর রোলে হুচট্ খেলে
পথের কিবা দোষ।

শৈশবে ক খ শিখিবার আগেই নয়াণ ঘোষের ছড়াগুলি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম—আজও তাহা মনে পড়ে। সে শৈশবের এক অতীব সুমধুর জীবন স্মৃতি। নয়ান ঘোষের গুণে মুগ্ধ আরও একজন ময়মনসিংহের পল্লী কবি ভাদ্রমাসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় একস্থলে গাহিয়াছেন—

"দিনের বাতী ঝিমি ঝিমি
রাতের মাণিক তারা।
ঘরে বসে শুনব এখন
নয়ান ঘোষের ছড়া॥"

ফলতঃ শৈশবের পরিচিত শ্রদ্ধা ভাজন এই কবি যুগলের সুমধুর ছড়া ও সঙ্গীতগুলি সুখদ ও উপভোগ্য বস্তু। যেমন সরল তেমনি সুন্দর, জ্যোৎস্নার মত বিকসিত, পদ্মের মত সুগন্ধি, শিশুর হাসির মত অনাবিল স্বচ্ছ।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভাদ্রমাস যেমন রমণীয়, তেমনি তাহাতে গর্ব্ব ও গৌরব করিবার জিনিষ অনেক রহিয়াছে। এই ভাদ্রমাসেই জগন্মাতার পূজার আয়োজন; পূজা অপেক্ষা আয়োজনে আড়ম্বর বেশী। আর এক কথায় ধরিতে গেলে ভারতবর্ষে যতগুলি আমোদ উৎসব আছে ভাদ্র তাহার সকলের উপর সতর আনা দাবী করিতে পারে। ভাদ্রমাস ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম মাস। যে কানু ছাড়া গীত নাই, উৎসব নাই, ব্রত পূজা নাই, ভারতের আকাশে, পাতালে, অনলে, অনিলে, পাহাড়ে, সাগরে, নির্ঝরে, বনে, উপবনে, পুলিনে, প্রান্তরে, যাহার গুণগাথা অহর্নিশ অবিরাম অবিশ্রান্ত ভাবে ধ্বনীত হইতেছে, নদীর জলে, বনের ফুলে, চাঁদের জ্যোৎস্নায়, লতায়, পাতায় যাহার সুমধুর স্মৃতি বিরাজিত, সেই ভুবন মনোমোহন কালরূপ ভাদ্রমাসেরই কৃষ্ণাষ্টমীতে দৈবকীর শুষ্ক অঙ্ক আলোকিত করিয়াছিল। পতিত পাবন ভূভার হরণ কংশবেশী মধুকৈটভ দর্পহারী জনার্দ্দন সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতিগণের বিনাস হেতু ভাদ্রমাসেই ভূভারতে জন্ম গ্রহণ করেন। এ হেন শ্রেষ্ঠতর সৌভাগ্য আর কোন মাসেরই অদৃষ্টে ঘটে নাই।

বিশেষ যে বাঁশীর রবে, যমুনা উছলিত, বৃন্দাবন পুলকিত, ব্রজাঙ্গনা বিমোহিত, আবার বাসি ফুল ঝরিত, বনের ধেনু ফিরিত, ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী যাহাতে

সতত বিরাজিত, সেই মোহন বাঁশীর জন্মদাতা যে বাঁশ, প্রবাদে বলে, ভাদ্রমাসেই তাহার জন্ম। এতটা সৌভাগ্য সত্বেও জ্যোতির্ব্বিদগণ ভাদ্রমাসের প্রতি একটু যেমন কুটিল কটাক্ষ করিয়াছেন। যে ভাদ্রমাসের অনাবিল জ্যোৎস্না-ময়ী রজনীতে নিবাত স্রোতস্বিনীর তলদেশ পর্য্যন্ত দৃষ্টি গোচর হয়, সেই বিকসিত কৌমুদী রাশি ও স্বচ্ছ সরল সৌন্দর্য্যের আধার ভাদ্রের চন্দ্রকেই তাঁহারা নষ্টচন্দ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন! নষ্টচন্দ্র দেখিলে নাকি স্ত্রীলোকের কলঙ্ক রটে, পুরুষের অপযশ ঘটে। যাহার অকলঙ্ক সৌন্দর্য্য, অতুলিত শোভা, তাহার দিকে ভ্রমেও ফিরিয়া চাহিতে নাই; কি কঠোর আদেশ! তাহা ছাড়া অনেক স্থলে অনেক জাতির মধ্যে ভাদ্রমাসে বিবাহও নিষেধ। শুনা যায় এই ভাদ্র মাসেই নাকি চির হতভাগিনী বেহুলা মৃত পতিকে গলায় জড়াইয়া, সাগরে ভাসিয়াছিল। তাই ভাদ্র মাসে ঝিকে বাপের বাড়ীতে, কিম্বা বৌকে শ্বশুর বাড়ীতে আনিতে নাই।

ভাদ্রের প্রসূতী গাভীর দুগ্ধ অপবিত্র, কোন দেব কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না, বিধবার অভক্ষ্য। হিন্দুর দৈনন্দিন গৃহ কার্য্যে যে গোময় ব্যবহৃত হয়, ভাদ্রে তাহাও অপবিত্র। শ্রাবণের গোময় দ্বারা ভাদ্রের অভাব দুর হইয়া থাকে। ভাদ্রে হিন্দুর পক্ষে গরু কেনা বেচা উভয়ই নিষেধ। এমন কি জুতা পর্য্যন্ত কিনিতে নাই। এই সকল প্রবাদ প্রবচণের মূলে কোন সত্য নিহিত আছে কিনা, এবং বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে তাহার প্রচলন আছে কিনা, জানিনা। কিন্তু ময়মনসিংহের অনেক স্থলে আজও সেই আচার পদ্ধতি অব্যাহত রূপে চলিতেছে।

ভাদ্রের অনুকূলেও কতকগুলি প্রবাদ প্রবচণ আছে। "ভাদ্রে তালের পিঠা, বড় মিঠা, খাইলে নাকি যায় যমের লেঠা।" দেবের নৈবেদ্যের প্রধান উপকরণ যে নারিকেল, ভাদ্রেই তাহা আহারের উপযোগী হইয়া থাকে।

"ডাকদে বলে খনা, ভাদ্রে নারিকেল ঝুনা।"

ডাকের বচনে আছে,

"ভাদ্র মাসে কুড়ার রাও, ঢুকে ঢুকে পানি খাও"।

ছেলে বেলায় ঠাকুর মার এই উপদেশটী মানিয়া চলিতাম। দুপুর বেলার আকাশে যখন কুড়া পাখী সূক্ষ্ম চীৎকারে আকাশ টাকে ছিঁড়িয়া ফাড়িয়া দিত, তখন জল ভরা গ্লাস মুখের কাছে ধরিয়া রাখিতাম; প্রত্যেকটা শব্দে এক এক চুমুক জল খাইয়াছি, পেট ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, তথাপি পানে বিরতি নাই। আজও তাহা মনে পড়িলে হাসি পায়। "তাল নিহারী" বা "তাল নিঝুমী" নামে যে এক নিবাত প্রশান্ত রজনীর অস্তিত্ব কথা শুনা যায়, তাহাও ভাদ্র মাসেরই অঙ্গগত। প্রবাদ আছে, উন পঞ্চাশৎ বায়ুর সব ক'টি ভাই ভাদ্রের কোন অনির্দ্দিষ্ট রজনীতে মলয়াচলের নিভৃত গহ্বরে নিজ নিজ ভামিনী সহ বিহার করিতে চলিয়া যায়, তখন গাছের অতি-কোমল পাতাটিও নড়ে না। পৃথিবী থাকে চেতন হারা, রজনী নিস্তব্ধ নিথর। শুনা যায় খুব ঝড় তুফানেও নাকি তাল পড়েনা; কিন্তু তাল পড়িবার এক নির্দ্দিষ্ট সময় এই তাল নিহারী রাত্রি। পৃথিবী নাকি তখন বায়ু শূণ্য হয়। ঠাকুর মা বলিতেন, তাল শিশুগণ এই নিঝুম রজনীতে নিরাতঙ্কে মায়ের কোলে নিদ্রা যায়; দুষ্ট সয়তান এই অবসরে তাহাদিগকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, ঠাকুর মার সেই কথায় মনের ভিতর কি এক অমূলক ভিতির সঞ্চার হইত। কিন্তু হায়, আজ সেই অমূলক চিন্তা সত্যে পরিণত হইয়াছে। কোথা সেই মাতৃ অঙ্ক—সকল জ্বালা জুড়াইবার স্থান। দুষ্ট সয়তান কোন অশুভ অবসরে চেতন হারা দেহটাকে ঘুমের ঘোরে কতই না নীচে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। যাঁহার কোলে শুইয়া ছিলাম, কোথায় সেই মূর্ত্তিমতী করুণা? কোথায় সেই শৈশব? কোথায় সেই শীতল সুখদ মায়ের কোল, যাহাতে উঠিলে স্বর্গ সুখ ভুলিয়া যাইতাম। আজ স্বর্গ ভ্রষ্ট নক্ষত্রের মত, বহু নীচে গড়াইয়া পড়িয়াছি।

বরষার উৎপত্তি ও অবস্থিতি সম্বন্ধে আরও একটী ছড়া আছে, যথা—

"আষাঢ়ে উৎপত্তি
শ্রাবণে যুবতী
ভাদ্রে পোয়াতি
আশ্বিনে বুড়া
কার্ত্তিকে দেয় উড়া"

আষাঢ়ের নূতন জলের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে ময়মনসিংহ বাসীর মনে আরও দুইটী চির পুরাতন ভাবের বন্যা নিত্য নূতনতর রূপে আসিয়া ঢেউ খেলাইতে থাকে। একটী বাইছ খেলা, অপরটী ঘাটু গান। দুইটীই বহু কালের পুরাতন কাহিনী। আবাল বৃদ্ধ, ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে এ দুটী সকলের প্রিয় ও প্রীতিপদ। এই দুইটীরই পূর্ণ পরিণতি ভাদ্র মাসে। সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত ভাটী অঞ্চলেই ইহার প্রসার প্রতিপত্তি অধিক। আষাঢ় হইতেই পল্লী গ্রামের যুবক ও ছেলের দল তাহাদের চির প্রিয় জাটীয়াল সঙ্গীতগুলি লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়ে। এই সকল সঙ্গীত এতদ অঞ্চলে সারি গান নামে প্রসিদ্ধ। এই সকল গানে এমন একটু কি যেন মাখা থাকে যাহা শুনিলে বহুদিনের বিস্মৃত কত নিশির কত স্বপ্ন; কত দিনের কত ভুলা কথা—একটী একটী করিয়া মনের ভিতর জাগিতে থাকে।

শ্রাবণ মাস আসিতেই পল্লী বাসিগণ তাহাদের বাইছের নৌকাগুলির সংস্কারে মন দেয়; কেহ বা নূতন নৌকা কিনিয়া আনে। এই সমস্ত নৌকা সাধারণ নৌকা হইতে একটু স্বতন্ত্র রকমের; সুদীর্ঘ অথচ অল্প পরিসর। আয়াতন দৈর্ঘ্যে ৬০ ফিট হইতে ৯০ ফিট পর্য্যন্ত, প্রস্থ ৪॥ ফিট মাত্র। দেশ ব্যাপিয়া এই সময় একটা ভাবের সাড়া পড়িয়া যায়। শ্রাবণ যাইতে না যাইতেই নৌকা গুলিকে নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ফুল-পাখী-লতায়-পাতায় ইন্দ্রধনুর মত করিয়া তুলে। গলুইয়ের উপর বিচিত্র পেখম-ধরা ময়ুর, সারস পাখী, রাজ হাঁস, প্রভৃতি গড়িয়া ভাসাইয়া দেয়। বাস্তবিক সে সৌন্দর্য্য চক্ষে না দেখিলে উপলব্ধি করা যায় না। শতশত ইন্দ্রধনু যেন আকাশ ছাড়িয়া শ্রাবণের নিথর জলের উপর পড়িয়া খেলা করিতে থাকে। ঘাটে ঘাটে সেই অপরূপ দৃশ্য। শ্রাবণে পল্লী বাসীর চক্ষে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় দর্শন। যে গ্রামে বাইছের নৌকা নাই, সে গ্রামের লোক হতভাগ্য ও নির্ধন। শ্রাবণ গত হইয়া ভাদ্র যেই আসিল, অমনি চারিদিকে সাজ সাজ রব। শ্রাবণের শেষ সংক্রান্ত দিন হইতেই বাইছ খেলার সূত্রপাত; যেখানে বাইছ খেলা হয়, চলিত কথায় তাহাকে আরং বলে। শত শত বৎসর ধরিয়া সেই আরং গুলি যেন কত যুগের পুরাতন স্মৃতির ভাণ্ডার খুলিয়া বসিয়া আছে। কাহাকেও সংবাদ দিতে হয় না, নির্দ্দিষ্ট দিনে ঝাঁকে ঝাঁকে নৌকা সকল ভালবাসা দেখিবার জন্য যেন সারস পাখীর মত নানাদিক হইতে উড়িয়া আসিতে থাকে। এই সকল নৌকাকে তামেসগীরের নৌকা বলে। প্রত্যেক আরঙ্গে তিন হইতে পাচ সহস্র নৌকা এবং পনর হইতে পচিশ হাজার লোক আসিয়া একত্র হয়। যাহারা পদব্রজে আসে, তাহারা নদীর উচ্চ পাহাড়ের উপর সারি বাঁধিয়া দাঁড়ায়, ইহাদের সংখ্যাও পাঁচ সহস্রের কম নহে। ভাটী অঞ্চল বাসীদের পক্ষে এরূপ অধিক সংখ্যক লোক দেখিবার এমন শুভ অবসর আর নাই।

সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। জাতি ভেদ নাই, হিংসা দ্বেষ নাই, সকলই একমাত্র আনন্দে মাতোয়ারা। হিন্দুর নৌকায় মুশলমান, মুশলমানের নৌকায় হিন্দু, গলা গলি, কোলাকুলি, কি মধুর ভাব! ভাদ্রের ভরা নদীর উপর এই মহান দৃশ্য—মধুর মিলন যে একবার দেখিয়াছে, জীবনে সে আর তাহা ভুলিতে পারিবে না। এই মধুর মিলন ক্ষেত্র ময়মনসিংহ বাসীর পক্ষে একটী সুখ স্বপ্নের মত।

বেলা অপরাহ্ন হইতেই সেই প্রিয়দর্শন নৌকাগুলি কোন ভ্রমণশীল সঙ্গীতের মত নানা দিক হইতে ছুটিয়া আসিতে থাকে। তাহাদের প্রত্যেকেই বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত, দেখিলে বোধ হয় যেন কোন দূর চন্দ্রলোক হইতে সুদৃশ্য বিহঙ্গ সকল জল কেলি মানসে নক্ষত্র পথে ছুটিয়া আসিতেছে। বাইকগণ দৃঢ়হস্তে বৈঠা ধরিয়া বসিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। শত শত বৈঠা তালে তালে উঠিতেছে পড়িতেছে। কোনও নৌকা শৃঙ্খল ছিন্ন উন্মাদের মত নদীর জলে ছুটা ছুটী করিতেছে। কোনও নৌকা সারিগান গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দের মনে তরঙ্গ তুলিতেছে, বৈঠাতে আবদ্ধ ঘুঙ্গুর মধুর নিক্বণে তালে তালে বাজিতেছে। নিমাই-সন্ন্যাস, কৃষ্ণলীলা, জলভরা, কুঞ্জসাজান প্রভৃতি লইয়া পল্লী কবিগণ যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছেন, চলিত কথায় তাহাদিগকে সারিগান বলে। তাহাই এই সকল নৌকায় গীত হইয়া থাকে। একজনে গলুইর উপর দাড়াইয়া নাচিয়া নাচিয়া পদাবলি

গাহিতে থাকে ; চলিত কথায় তাহাকে বয়াতি বলে। একব্যক্তি ঢুলুকে তাল ধরে, অপর সকলে লহর টানিতে থাকে। নিমাই সন্ন্যাসের একটী সারি গানের নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সকলে—"মায় কান্দেরে নিমাই চান সন্ন্যাসে যায় রে।
বয়াতি—শচী মায়ের কান্দনেতে বিক্ষের পত্র ঝরে।
সকলে—নিমাই চাণ সন্ন্যাসে যায় রে।
বয়াতি—যখন জন্মিলে রে নিমাই নিমতরু মূলে.
হইয়া কেন না মর ছিলে, না সইগাব কোলে॥
সকলে—নিমাই চান সন্ন্যাসে যায় রে।
বয়াতি—আগে যদি জানতাম রে নিমাই যাইবে রে ছাড়িয়া।
এমন অল্পকালে তোরে না করাইতাম বিয়া॥
সকলে—মায়ের দুর্লভ চান গেলে কোথাকারে।
অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া (নিমাই রে) দিয়া গেলে কারে॥

এই সকল গানের সরল ভাব ও ভাষায়, শ্রোতার প্রাণ কাঁদাইয়া তুলে। অজানিত ভাবে চক্ষের পলক ভিজিয়া উঠে।

জল ভরার একটি সারি গান এইরূপ—

সকলে—"ও সই যাবে নিগো যমুনায় জল আনিবার ছলে।
কি রূপ দেখিয়া আইলাম কদম্বের মূলে॥ ও সই...
বয়াতি—একদিন রাধে স্নানের বেলায় কিনা কাম করিল।
দেখ সোনার কলসী কাঁকে লইয়া যমুনাতে গেল॥
সকলে—ও সই কি রূপ দেখিয়া আইলাম কদম্বের মূলে।
বয়াতি—কাহার পিন্ধন লাল নীল, কাহার পিন্ধন সাদা, সুন্দর রাধিকার পিন্ধন কৃষ্ণ নামটী লেখা।
সকলে—ওই সই ইত্যাদি
বয়াতি—জলের ঘাটে গিয়া রাধা কিনা কাম করিল,
(দেখ) বসন খানি রাইখ্যা পাড়ে জলেতে নামিল॥
সকলে—ও সই যাবেনিগো—
বয়াতি—সখীগণ সঙ্গে রাধা জল কেলি করে,
কলসী গেল সুতে ভাইস্যা বসন নিল চোরে।
বয়াতি—গলা পানিত থাকিয়া রাধা বসন খানি চায়,
কালা বলে এইরূপে কি বসন দেওয়া যায়।
সকলে—ও সই যমুনায় জল আনিবার ছলে।
বয়াতি—কোমর পানিত থাকিয়া রাধা চাহিল বসন
শ্যাম বলে রাধে তোমার নাইকি সরম?
সরমে ভরমে কি হইবে—
"তখন হাটু জলে থাকিয়া রাধা চাইল বসন খানি
কৃষ্ণ বলে দেখি তোমায় তীরে আইস ধনি!
তীরে উঠিয়া রাধা বলে বসন দাওহে শ্যাম,
কৃষ্ণ বলে আগে রাধে যৌবন কর দান।
সকলে—ও সই যাবে কিগো যমুনায় জল আনিবার ছলে।

আদিরশের বর্ণনায় অনেক পল্লীকবি ভারতচন্দ্রের উপর টেকা দিয়াছেন।

তারপর বাইচ্ খেলার আরম্ভ। দুই দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত কোথাও সরল কোথাও বক্র রেখার ন্যায় দর্শক মণ্ডলী, মধ্যে ভাদ্রের ভরা নদী উন্মত্ত যৌবন ভরে থই থই করিতেছে। এই বিলোল তরঙ্গ রাশির উপর বাইচের নৌকাগুলি সারি বাঁধিয়া প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে অগ্রসর হইল। একবারে দশ বার খানা নৌকা সারি দিয়া নক্ষত্র বেগে ছুটিল। এই সময় বাইকগণের মনে এক বিষম উত্তেজনার সঞ্চার হইয়া থাকে। কে কারে হারাইবে। বৈঠার আঘাতে নদীর জল রাশি স্ফটিক চূর্ণের মত যেন ঠিকরিয়া পড়িতে থাকে।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে পর হার জিত হইয়া গেল। যে নৌকা হারিয়া গেল, সে যেন উদ্যমহীন ক্লান্ত সারসপক্ষীর মত একস্থানে নিশ্চল হইয়া বসিল; আর জয়ী নৌকা যোদ্ধ পুরুষের মত সগর্ব্বে হেলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে হার জিতের পর সর্ব্বশেষ ফাইনেল। দর্শকগণের মধ্যে তখন যে বিপুল আগ্রহ দৃষ্ট হয়, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। দুইটী নৌকা অগণিত দর্শক মণ্ডলীর দৃষ্টিপথের মধ্য দিয়া উল্কাপিণ্ডের মত ছুটিয়া যাইতেছে। ত্রিশ সহস্র লোকের নয়ন তাহাদের উপর কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। যেন দুইটী উড্ডীয়মান বিহঙ্গ পরস্পর আড়াআড়ি ভাবে ব্যোম পথ

আলোড়িত করিয়া ছুটিয়াছে। কি উদ্যম! কি উৎসাহ! উভয়েই যেন মহারণে ব্রতী। ইহার মধ্যে যে নৌকা জয় লাভ করিল,তাহার যশোগানে ভাদ্রের নদী ভরিয়া গেল।

জয় উল্লাসে বিজয়ী নৌকা আপন ঘাটে গিয়া লাগিল। তখন কুলবালাগণ জয় জোকারে তাহার অভ্যর্থনা করিল। ধান্য দূর্ব্বা লইয়া "আর্গিয়া পুছিয়া" নৌকার ললাটে সিন্দুরের ফোটা দিল। গলুইয়ের উপর ঘৃতের বাতি জ্বালিয়া দিল। এ প্রদীপ সারা রাত্রি জ্বলিবে। নিবিলেই সর্ব্বনাশ। ভবিষ্যতে আর তার জয় লাভের আশা নাই। সে দিন হইতে সে নৌকার চলা ফিরা ভাব ভঙ্গি একটা ভারি রকমারি হইয়া গেল। যেন সে একটা বড় কেল্লা ফতে করিয়া আসিয়াছে। সেই বিজয়ী নৌকা অন্য কোন দিন পৃথক আরঙ্গে উপস্থিত হইলে, তাহার লাল নীল নানা রঙ্গের বিচিত্র পতাকার উপর সর্ব্বাগ্রে দর্শক মণ্ডলীর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয় এবং নদীর তরঙ্গে ফুল ফেলিয়া সেই বিজয়ী নৌকার অভ্যর্থণা করা হইয়া থাকে। বাইচ শেষে আরঙ্গের অবস্থা এক শোচনীয় নীরবতায় পরিণত হইয়া থাকে। বোধ হয় যেন সহসা দমকা হাওয়া লাগিয়া সেই জন শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া চুড়মার হইয়া গেল। যেন কোন ভীষণ ঘুর্ণিবাতে রেণু পরমাণুর মত কে কোথায় উড়িয়া গেল। এই পূর্ণ এক বৎসরের জন্য বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক "চল যাই আপন দেশে" প্রভৃতি সুমিষ্ট সারি গান গাহিতে গাহিতে যে যাহার আবাস মুখে চলিয়া গেল। একদিনের অযুত জন কলরব মুখরিত আরঙ্গস্থল পুনরায় পূর্ণ এক বৎসরের জন্য নীরব ভাষায় আপন অতিথিগণকে বিদায় দিয়া যেন আকুল প্রাণে তাহার বিরহ বেদনার সঙ্গীত গাহিতে লাগিল।

এই আমোদজনক ব্যাপারটী, ময়মনসিংহবাসীর পক্ষে যেমন প্রাচীনতম, তেমনি প্রিয়। শুনা যায় চাঁদ সদাগরের সৌখীন পুত্রগণ ইহার প্রবর্ত্তক। বোধহয় ময়মনসিংহবাসিগণের মনের উপর চন্দ্রধরের অসীম প্রতিপত্তি হইতেই এই জনরবের সৃষ্টি। যে কোন ঘটনা বিশেষের আদি অন্ত খোজ করিতে যখন ময়মনসিংহবাসী অসমর্থ হইয়াছেন, তখনই তাহার দোষগুণ চন্দ্রধরের উপর চাপাইয়া দিয়াছেন। এই জনরব সত্য হউক আর মিথ্যা হউক বাইচখেলা যে অতি পুরাতন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

একদিন পরিব্রাজক মুখে এই বাইচখেলার কথা দিল্লীর সিংহাসনতল পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। দিল্লীর রাজপুরুষগণ যখন এতদঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিতেছিলেন, তখন রোয়াইল বাড়ীর রাজভবন হইতে কুমার মসজিদজালাল কৌতুহল পরবশ হইয়া বাইচ খেলা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় ভাদ্রমাসের প্রথম তারিখে ফতেপুরের নদীতে এইরূপ একটী আরঙ্গ স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ফতেপুরের নদী আজও সেই বিগত স্মৃতিটুকু বুকে লইয়া আসিতেছে। প্রতি বৎসর এই নির্দ্দিষ্ট তারিখে তথায় সমারোহ সহকারে আরঙ্গ জমিয়া থাকে। কাহাকেও সংবাদ দিতে হয় না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে লোক আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। এই অঞ্চলে আরও অনেকগুলি আরঙ্গ আছে। তন্মধ্যে ফতেপুরের আরঙ্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আরও একটু গৌরবের বিষয় এই যে ইহার সঙ্গে দিল্লীসিংহাসন অধিষ্ঠাতাগণের একটী ক্ষুদ্র স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে।

এই সকল আরঙ্গস্থান পূর্ব্ব ময়মনসিংহবাসীর কাছে অতি প্রিয়। শৈশবে ও কৈশোরে বহুবার এই মিলন ব্যাপার সচক্ষে দর্শন করিয়াছি। এখন সেই আমোদ তরঙ্গ মানব রুচির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ মন্দিভূত হইতেছে।

শ্রীচন্দ্রকুমার দে।

ধাতু সমূহের উৎপত্তি কল্পনা।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন যে প্রাচীন মিশরে রসায়ণ শাস্ত্রের এবং প্রাচীন ব্যাবিলনে জ্যোতিষ শাস্ত্রের বীজমন্ত্র প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল। পরে গ্রীকগণ তাঁহাদের শিষ্যরূপে এই মন্ত্রদ্বয় লাভ করিয়াছিলেন। গ্রীকদিগের মধ্যে যখন নানাপ্রকার বিজ্ঞান চর্চ্চার আদর বর্দ্ধিত হইয়াছিল, সেই সময়ে আলেকজান্দ্রিয়া নগর সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাচর্চ্চার একটী প্রধান কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যাঁহারা তথায় রসায়ণ শাস্ত্র চর্চ্চা করিতেন লোকে

মাননীয়া লেডী কারমাইকেল

ASUTOSH PRESS, DACCA.

তাঁহাদিগকে আল্‌কেমিষ্ট বলিত। কিরূপে নিকৃষ্ট ধাতুকে সুবর্ণ বা রজতে পরিণত করিতে পারা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবন করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই পরশমণি অন্বেষণে পাশ্চাত্য সভ্যজগৎ নিযুক্ত ছিল। গ্রীক আল্‌কেমিষ্টগণ মনে করিতেন বিভিন্ন ধাতু ভিন্ন ভিন্ন গ্রহদ্বারা পৃথ্বীগর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ব্যাবিলোনিয়ার গ্রহাচার্য্যগণই প্রথম সুবর্ণরজতাদি ধাতুদিগের সহিত সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহদিগের নিকট সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছিলেন।

খৃষ্টের ৫ম শতাব্দীতে নব-প্লেটো সম্প্রদায় ভুক্ত অলিম্পীওডর কোন্ ধাতু কোন্ গ্রহদ্বারা উৎপন্ন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন (১)। নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল।

সন্তান।	পিতা।
ধাতুর নাম।	গ্রহের নাম।
সুবর্ণ	সূর্য্য
রজত	চন্দ্র
তাম্র	শুক্র
লৌহ	মঙ্গল
বঙ্গ	বুধ
সীসা	শনি
ইলেক্‌ট্রস	বৃহস্পতি

ইহার পরবর্ত্তীকালে (ঠিক্ কোন সময়ে তাহা জানা যায় না) বঙ্গকে বৃহস্পতির এবং পারদকে মাকুরিয়স বা বুধের সন্তান বলা হইত। আলেকজান্দ্রিয়ার আলকেমিষ্টগণ কখন কখন পারদকে হার্মিসদেবের (মাকুরিয়সের গ্রীক নাম) বীর্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ইউরোপে উল্লিখিত ধাতু সকল স্ব স্ব পিতৃভূত গ্রহের নামে পরিচিত হইত।

(১) According to the account of the Neo-Platonist Olympiodor (in the fifth century A.D.), gold corresponds to the sun, silver to the moon, copper to Venus, iron to Mars, tin to Mercury and lead to Saturn.

Meyer's History of Chemistry P. 27.

প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই, ভারতীয় আর্য্যগণ ধাতুসমূহের উৎপত্তির অন্য প্রকার কল্পনা করিতেন। ভারতের প্রাচীনতম শাস্ত্র ঋগ্বেদে কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন অনুমান দেখিতে পাওয়া যায় না। অথর্ব্ববেদ ও ব্রাহ্মণ রচনার কালে এ বিষয়ে আর্য্যদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। অথর্ব্ববেদে হিরণ্যের তিন প্রকার জন্মলাভ উল্লিখিত হইয়াছে।

ত্রেধাজাতং জন্মনেদং হিরণ্যমগ্নেরেকং প্রিয়তমং বভূব।
সোমস্যৈকং হিংসিতস্য পরাপতৎ।
অপামেকং বেধসা রেত আহুস্তত্তে হিরণ্যং ত্রিবৃদস্ত্বায়ুষে॥ অথর্ববেদ ৫।২৮।৬

"হিরণ্য তিন প্রকারে জাত; একটী অগ্নির প্রিয়তম; একটী সোমের—তাহা যথার্থে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; আর একটী জলের—তাহাকে লোকে বিধাতার বীর্য্য বলে। এই তিন প্রকার হিরণ্যই আয়ুষ্কর।

অগ্নেঃ প্রজাতং পরিযদ্ধিরণ্যমমৃতং দধে অধিমর্ত্ত্যেষু।
অথর্ববেদ ১৯ ২৬।১

"অগ্নি হইতে যে সুবর্ণ উৎপন্ন হয় তাহা মরণশীল মানবকে অমরত্ব প্রদান করে।"

দেবানামস্থি কৃশনং বভূব। অথর্ববেদ ৪ ১০.৭

"ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের অস্থি (শঙ্খের কারণভূত) কৃশন (সুবর্ণ) ছিল।"

অগ্নেরেতশ্চন্দ্রং হিরণ্যং। অদ্ভ্যঃ সংভূতং অমৃতং প্রজাসু॥
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১ ২ ১ ৪

"চন্দ্র-হিরণ্য অগ্নির বীর্য্য। প্রজার মঙ্গলের জন্য জল হইতে উৎপন্ন।

"From his (Indra's) seed his form flowed and became gold." (শতপথ ব্রাহ্মণ, The secred books of the East series, Part V. p. 215)

"তাঁহার (ইন্দ্রের) বীর্য্য হইতে তাঁহার আকার বহির্গত হইয়া হিরণ্য হইয়াছিল।

উপরি উদ্ধৃত অংশে হিরণ্য, চন্দ্র-হিরণ্য ও কৃশন এই তিন প্রকার হিরণ্যের উল্লেখ রহিয়াছে। হিরণ্য ও কৃশন নাম দ্বারা সুবর্ণকে এবং চন্দ্র-হিরণ্য নাম দ্বারা রজতকে সম্ভবতঃ বুঝাইত। সোমের নিকট হইতে যে হিরণ্য

হননার্থ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহাই বোধ হয় কৃশন। কারণ অথর্ববেদের নিম্নলিখিত ঋকের ব্যাখ্যায় সায়ন কৃশন শব্দের অর্থ শক্রক্ষীণকারী বলিয়াছেন।

সনো হিরণ্যজাঃ শঙ্খঃ কৃশনঃ পাত্বং হসঃ।
অথর্ববেদ ৪।১০।১

স হিরণ্যজাঃ সুবর্ণাৎ উৎপন্নঃ শঙ্খঃ কৃশনঃ শক্রণাং তনুকর্ত্তা নো অস্মান্ অহংসঃ পাপাৎ পাতু রক্ষতু।

সেই হিরণ্যজাত শক্রক্ষীণকারী শঙ্খ আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ভারতীয় আর্য্যগণ হিরণ্য ও রজতকে দেবতা সম্ভূত বলিয়া কল্পনা করিতেন। যথা—

হিরণ্য ... ইন্দ্রের বীর্য্য হইতে উৎপন্ন
চন্দ্র হিরণ্য বা রজত অগ্নির বীর্য্য হইতে ,,
কৃশন (অন্য প্রকার হিরণ্য) দেবতাদিগের অস্থি হইতে ,,

অথর্ববেদে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানবগণ সূর্য্যের নিকট হইতে সুবর্ণ-হিরণ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যদ্ধিরণ্য সূর্য্যেন সুবর্ণং প্রজাবন্তো মনব পূর্বে ঈশিরে।
অথর্ববেদ, ১৯.২৬।২

"পূর্ব্বকালে পুত্র ও ভৃত্য পরিবৃত মানবগণ সূর্য্যের নিকট হইতে যে শোভন-হিরণ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

ইহাতে সূর্য্যকে সুবর্ণের দাতা বলিয়া জানা যাইতেছে। কিন্তু সুবর্ণের উৎপত্তি সূর্য্য হইতে হইয়াছে এরূপ কোন স্থানে উল্লেখ নাই।

তাম্র, সীসা, লোহ ও বঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ কল্পনা দেখিতে পাই।

শ্যামময়োস্য মাংসানি লোহিতমস্য লোহিতং।
অথর্ব্ববেদ ১১.৩।৭

"(বিরাট পুরুষের যখন অন্ন পাক হইয়াছিল) শ্যাম ময় অর্থাৎ লোহ তাঁহার অন্নের মধ্যে মাংস এবং লোহিত ময় অর্থাৎ তাম্র ইহার রক্ত।"

ত্রপু ভস্ম হরিতং বর্ণঃ পুষ্করমস্য গন্ধঃ।
অথর্ব্ববেদ, ১১।৩.৮

"(পাক শেষে) যাহা ভস্ম ছিল তাহাই ত্রপু বা বঙ্গ; (সেই অন্নের) বর্ণ পীত ও গন্ধ পদ্মের মত ছিল।"

সীসং ম ইন্দ্রঃ প্রায়চ্ছৎ তদঙ্গ যাতু চাতনং।
অথর্ব্ববেদ ১।১৬।২

"ইন্দ্র আমাকে সীসা প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা রক্ষ পিশাচাদি নাশক।"

From his (Indra's) navel his life breath flowed and became lead—not iron nor silver. (শত পথ ব্রাহ্মণ ; The sacred book of the East series ; part v p. 215)

"তাঁহার (ইন্দ্রের) নাভিদেশ হইতে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছিল এবং সীসা রূপে পরিণত হইয়াছিল—উহা অয়স কিম্বা রজত নহে।"

অতএব দেখা গেল

তাম্র বা লোহিতময় বিরাট পুরুষের অন্নের রক্ত,
লোহ বা শ্যামময় ঐ মাংস,
বঙ্গ বা ত্রপু পাকশেষে ভস্ম,
সীসা ইন্দ্রের প্রাণবায়ু হইতে উৎপন্ন।

পুরাণে ধাতু দিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

রজত—শিবের অশ্রু হইতে উৎপন্ন,
তাম্র—কার্ত্তিকেয়ের বীর্য্য হইতে ,,
সীসক—সর্পরাজ বাসুকির বীর্য্য হইতে ,,
লোহ—লোমিল নামক দৈত্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে ,,
সুবর্ণ—অগ্নিদেবের বীর্য্য হইতে উৎপন্ন।

P. C. Ray's Chemistry vol II
P. L XXXVII, foot note.

অতএব অথর্ব্ববেদ ও ব্রাহ্মণ রচনার কালে ভারতীয় আর্য্যগণ ধাতু সমূহের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে প্রাচীন মিশর বা ব্যাবিলোনীয় কল্পনার কোন ছায়াপাত হয় নাই। পৌরাণিক যুগেও ধাতু সমূহের উৎপত্তির কল্পনা আর্য্যরীতি সম্মত ছিল; তবে সে সময় সকল গুলিকে দেবতা হইতে উদ্ভূত কল্পনা না করিয়া দৈত্য এবং সর্প হইতেও উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

———

নারায়ণ দেব।

(৩)

তাহার পর 'মগধ" পর্ব্ব। ইহাই যে সকল অনর্থের মূল" তাহা সত্য। "নারায়ণদেবে কয় জন্ম মগধ" ইহা গ্রন্থে না থাকিলে এবং শ্রীহট্টে "মগধ" নামক একটা স্থানের সংবাদ না পাওয়া গেলে আর কোন গোল হইত না।

"মগধ" সম্বন্ধে দীনেশ বাবুর মতের প্রতিবাদ স্বরূপ লেখক যাহা বলিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন নাই তৎপক্ষে তিনি লিখিয়াছেন "মগধের নিকট-বর্ত্তী স্থানে বাছাই রাজা ছিল। বিরজা বাবু দ্বিজবংশীর পদ্মাপুরাণের ঐ অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন বাছাই রাজার নগর নিষধ ও কালঞ্জরের মধ্যে। নিষধ ও কালঞ্জর মান্দ্রাজে—বেহারে নহে।" এস্থলে লেখকের কৌশলটি এই যে, পাঠককে বুঝিতে দেওয়া হইয়াছে যে উদ্ধৃত উক্তি আমাদের বা আমাদের অভিপ্রেত। ইহা সত্য কিনা আমাদের কথা উদ্ধৃত করিলেই প্রতি-পন্ন হইবে। তাহা এই :—

"দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, 'চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সোনকা বেহারিয়া রাজার কন্যা ছিলেন।" বেহার এই নাম দ্বারা তিনি পাটনা ও গয়া প্রভৃতি জেলা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এস্থলে জিজ্ঞাস্য চাঁদ সদাগর কোন দেশের লোক ছিলেন? তিনিও কি বেহারী? চম্পক নগর কোথায়? মনসার ভাসানের পুঁথি বেহার প্রদেশে আছে কি? পদ্মাপুরাণের কাহিনী কি ঐতিহাসিক? তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন কবি ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উল্লেখ করেন কেন?

"রত্নপাট মহানদী, বিহারীয়া দুই নদী, কালিন্দা আর যে কালিয়ানী" (বংশীদাস) শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর বেহারে এই সমস্ত আছে কি? তারপর—'চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সোনকার পিতৃপরিচয় বংশীদাস অন্যরূপ দিয়াছেন—

"মাণিক্য পাটলী দেশে, গন্ধ বণিক্য বংশে, সুরসার পুত্র শঙ্খপতি।" এই মাণিক্য পাটলী কোথায়? ইহা কি বর্ত্তমান পাটনা? তাহা হইলে পাটলীপুত্র না লিখিয়া মাণিক্য পাটলী দেশ কেন? শ্রীহট্টেও পাটলী নামক স্থান আছে।"

"বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ হইতে নিম্নলিখিত অংশটুকু গ্রহণ করা হইল,—

"উত্তরে নিষধ দক্ষিণে কালঞ্জর।
তার মধ্যে রম্য গিরি বাছাইর নগর॥
হালকর্ম্ম বিনে তার অন্য কর্ম্ম নাই।
এতেকেই লোকে বলে হালুয়া বাছাই॥

ইহাতে কি অনুমান হইতে পারে যে বাছাই বিহারের অধিবাসী ছিলেন?" ইত্যাদি।

পাটলী শ্রীহট্টে থাকার কথা বলিয়াছি, 'মাণিক্য ভাণ্ডার' নামক স্থানও শ্রীহট্টে এবং ত্রিপুরা প্রান্তে আছে। ভাটেরার তাম্রফলকে "কালিয়ানী" নদীর উল্লেখ আছে, কালিয়ানী (কালনী) নদী শ্রীহট্টের একটি নদীর নাম ও ঐ নামে গ্রামও শ্রীহট্টে আছে। 'রত্না' রত্নাকরের সংক্ষেপ হইলেও প্রবাদ যে প্রাচীন কালে রত্না নামে শ্রীহট্টে এক নদী ছিল, উহা এক্ষণে ভরাট হইয়া বিলুপ্ত হইয়াছে। "রত্নাং ভরাং' বলিয়া প্রাচীন দলিল পত্রে এখনও রত্নার পরিচয় পাওয়া যায়। আবার রত্না নামক নদীও হবিগঞ্জের উত্তরে বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বোক্ত কালনী নদী জলসুখার প্রান্তবাহী, মগধ রাজ্য জলসুখা প্রভৃতি স্থান লইয়াই ছিল বলিতে পারা যায়। জলসুখার "নগর" এখনও একটি প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন গ্রাম। সুতরাং পদ্মাপুরাণের মগধ যে বেহার অঞ্চলীয় নহে, তাহা বোধ হয় কিনা, তাহা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। শ্রীহট্টে সপ্তগ্রাম পাণ্ডুয়া, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থান আছে। ঐ সকল স্থানের অধিবাসী শ্রীহট্টে আগমন করিয়া স্বদেশের নামে গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। মগধও যে তদ্রূপ ভাবে নাম প্রাপ্ত হয় নাই, তাহা বলা যায় না। মগধ নাম হওয়াতে, পশ্চিমের মগধের অনু-করণে এই মগধকেও যে বংশীদাস "বেহার" বলেন নাই, তাহাই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে? 'রত্না', 'কালিয়ানী' (কালনী) ইত্যাদি নদীর নাম হইতে এই বেহার যে শ্রীহট্টের মগধ, তাহাই অনুমিত হয়!

তারপর নিষধ ও কালঞ্জর কোথায়? মান্দ্রাজে এই

নামে স্থান আছে সত্য। কিন্তু অনুসন্ধানে ইহা যে শ্রীহট্টে মিলে না, এমন নহে। কালগুরা নামে একটি পল্লী শ্রীহট্টের নবীগঞ্জের নিকটে পাওয়া যায়। এসব আলোচনায় বোধ হয় যে, শ্রীহট্টের কবি, শ্রীহট্টের স্থান সমূহের উল্লেখে কাব্য রচনা করিয়াছেন। চাঁদ সদাগর বা সোনকার ঐতিহাসিকত্বের মূল দৃঢ় নহে। নারায়ণদেব এবং বংশীদাস ও কবিবল্লভ সম্বন্ধে আলোচনার সহায়তা হইবে বলিয়াই এ সমস্ত কথা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধের ন্যায় এস্থলেও উত্থাপিত করিলাম। এসম্বন্ধে প্রকৃত রহস্য ভেদ করিতে হইলে, যাঁহারা নারায়ণদেবকে "চিরদিনই ময়মনসিংহের" বলেন এবং যাঁহারা তাঁহার জন্মস্থান শ্রীহট্টের নগর গ্রাম বলেন, এই উভয় পক্ষীয় কয়েক জন ব্যক্তি লইয়া যদি একটা কমিশন গঠিত হয় ও তাঁহারা সংসৃষ্ট স্থান গুলি ভ্রমণ করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করেন, তবে অনেকটা আশা করা যাইতে পারে।

আমরা নারায়ণদেবকে জোর করিয়া শ্রীহট্টে টানিয়া আনিতে ইচ্ছুক, এরূপ ভ্রান্ত ধারণা যেন কাহারও না হয়। যে শ্রীহট্টে রঘুনাথ শিরোমণি, অদ্বৈতাচার্য্য, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, শ্রীবাসপণ্ডিতের জন্ম, পার্ষদ মুরারি গুপ্ত ও রাঘব পাণ্ডবীয় প্রণেতার যে বাক্য সুধা শ্রীহট্টে বর্ষিত হইয়াছিল, যে শ্রীহট্টের প্রতিভা কাশী ও নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের প্রতিভাকেও জয় করিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, সে শ্রীহট্ট নারায়ণের জন্য কাঙ্গাল নহে। শ্রীহট্টের দ্বাবিংশতি পদ্মপুরাণকারের মধ্যে ষষ্ঠীবর কোন অংশেই নারায়ণ হইতে হীন নহেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীহট্টের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকও প্রচারকদের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। বহু কৃতী পুত্রের জননী শ্রীহট্ট ভূমি হইতে এক নারায়ণ বিচ্যুত হইলে কাহারও ক্ষোভের কারণ হইবে না আমরাও স্বীকার করি যে জন্মস্থান শ্রীহট্ট হইলেও তিনি ময়মনসিংহ বাসী হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জন্মস্থান মগধের নগর গ্রাম, ইহা জানা সত্ত্বেও তাহা না বলিলে মৃত কবির আত্মার প্রতি অবিচার হয়।" অচ্যুত বাবুও ময়মনসিংহের গৌরব প্রকটনেই উন্মুখ, ময়মনসিংহের গৌরব-খ্যাপক "সৌরভে" প্রকাশিত তদীয় প্রবন্ধাবলীই তাহার পরিচায়ক। নারায়ণদেবের জন্মস্থান সম্বন্ধে তাঁহার সংশয় থাকায়, তিনি তাঁহাকে শ্রীহট্টের কবি বলেন নাই, নব্যভারতে বরং ভিন্নরূপ উক্তিই করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই সতীশবাবু নিজ কথার পোষকজ্ঞানে অচ্যুতবাবুর সেই উক্তি তদীয় প্রবন্ধে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

যাহা হউক এখন "মগধ" পর্ব্বের সহিত প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। "সৌরভে" এসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে "শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় দীনেশবাবুর মগধ অস্বীকার করেন না। তিনি এই মগধ বেহারে না হইয়া শ্রীহট্টে হওয়ার পক্ষে একান্ত আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, শ্রীহট্টে মগধ বলিয়া একটা বিলুপ্ত রাজ্য ছিল। এই কথার প্রমাণার্থে পাদটীকায় কামাখ্যাতন্ত্রের একবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সে বচন এই :—

ত্রিপুরা কৌকিকা চৈব জয়ন্তী মণিচন্দ্রিকা।
কামাখ্যা মাগধী দেবী অষ্টামী সপ্ত পর্ব্বতাঃ ॥

"ইহাতে দেখা গেল যে, সপ্ত পর্ব্বত লইয়া কামাখ্যা তন্মধ্যে মাগধী নামে একটি পর্ব্বত আছে। তৎপর দেখাইয়াছেন শ্রীহট্টের এক প্রাচীন কবির পাঁচালীতে মগধ আছে, জলসুখার নিকটবর্ত্তী আজমীরগঞ্জ যে এক সময় এক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী ছিল, ষ্টুয়ার্ট সাহেবের বাঙ্গালার ইতিহাসে তাহা লিখিত। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রতিভা" পত্রিকায় প্রকাশিত হস্তাঙ্কিত একখানা ম্যাপে কি সূত্রে শ্রীহট্ট সহরের উত্তরে মগধ নির্দ্দেশিত হইয়াছে বুঝিতে পারা গেল না। অচ্যুত বাবু বলিলেন শ্রীহট্টে মগধ নামে এক লুপ্ত রাজ্য ছিল। প্রমাণ করিলেন, প্রথমে কামাখ্যায় মাগধী নামে এক পর্ব্বত আছে। তৎপরে শ্রীহট্টে মগধ নামে এক নৃপতি ছিল। তৎপর আজমীরগঞ্জ এক সময় এক ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। তৎপর একখানা ম্যাপে কি সূত্রে শ্রীহট্ট সহরের উত্তরে (কামাখ্যায়) মগধ নির্দ্দেশিত হইয়াছে বুঝিতে পারা গেল না। সুতরাং আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইয়াছে তিনি কি সূত্রে এই সকল অপ্রমাণ লইয়া শ্রীহট্টে মগধ প্রমাণ করিতে প্রস্তুত হইলেন?" "সৌরভ" ১৬০ পৃষ্ঠা।

"প্রথমতঃ" সপ্ত পর্ব্বত লইয়া কামাখ্যা" ইহা তাঁহাকে

কে বলিল? একে আর অর্থ করিয়া পাঠককে ভ্রমে পাতিত করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। অচ্যুতবাবুর প্রবন্ধে কুত্রাপি এরূপ উক্তি নাই, যাহাতে ঐ সপ্ত পর্ব্বত লইয়া কামাখ্যা বুঝায়। কামাখ্যা তন্ত্রের বচনে পাওয়া যায় যে কামরূপ মহেশ্বরীর পীঠ শত যোজন বিস্তীর্ণ, তাহার মধ্যে সাতটি পর্ব্বত আছে ইহাতে এরূপ বুঝায় না যে কামাখ্যা দেশের মধ্যেই উক্ত সাতটি পর্ব্বত। সাতটি পর্ব্বতের স্থান নির্ণয় অধুনা কঠিন নহে। ত্রিপুরা, কৌকিকা (কুকি পাহাড়) জয়ন্তীয়া, মণি (মণিপুর) চন্দ্রিকা (চন্দ্রগিরি), কাছাড়। এই স্থানগুলি শ্রীহট্টের পার্শ্বে, জয়ন্তীয়া, শ্রীহট্টের অন্তর্গত। এই স্থানগুলির ন্যায় যে মগধও একটি স্থান হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। এক্ষণে "শ্রীহট্ট নগরে বাস মগধ নৃপতি" এই বাক্যের সহিত সমন্বয় বিধান করিয়া এই মগধকে শ্রীহট্টের অন্তর্গত বলা যায় কিনা, সুবোধ ব্যক্তি অবশ্যই তাহা বুঝিতে পারেন। তাহার পর "নগর" জলসুখার এক প্রাচীন পল্লী, জলসুখার আজমীরগঞ্জে যে এক সময় এক ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল ষ্টুয়ার্ট সাহেবের গ্রন্থে তাহা জানা যায়; তদবস্থায় মগধকে ঐ স্থানেই বলা যাইবে না কেন তাহা বুঝা যায় না। "শ্রীহট্টে মগধ নামে এক নৃপতি ছিলেন" বলিয়া লেখক মহাশয় বলেন, একথা কে তাঁহাকে বলিয়াছে? মগধ নামে কোন নৃপতির কথা তো অচ্যুতবাবুর প্রবন্ধে পাওয়া যায় না? লেখক একে আর বলিয়া বার বার পাঠকের ভ্রান্তি জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে কতদূর উচিত কার্য্য হইয়াছে, তিনিই বিবেচনা করুন। তৎপর বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রতিভা" পত্রিকায় ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ মহাশয় একটি প্রবন্ধের সহিত স্বয়ং একখানা আন্দাজি ম্যাপ অঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; ঐ হস্তাঙ্কিত ম্যাপে শ্রীহট্ট সহরের সংলগ্ন ভাবে উত্তরে মগধ লিখিয়াছেন। মগধ শ্রীহট্ট জিলার মধ্যে হইলেও শ্রীহট্ট সহরের উত্তরের হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই অচ্যুতবাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, কি সূত্রে তিনি মগধ শ্রীহট্ট সহরের সংলগ্ন ভাবে উত্তরে হইবে বলিয়া লিখিয়াছেন? এরূপ প্রশ্ন করা অসঙ্গত হয় নাই, কেননা উপেন্দ্র বাবু শ্রীহট্ট সহরের উত্তরে মগধ সন্নিবেশের কোন কারণ বা প্রমাণ নির্দ্দেশ করেন নাই। সুতরাং সৌরভের লেখক মহাশয় ইহাতে কোন্ কথা 'অপ্রমাণ' পাইলেন বুঝা যায় না। তাঁহার প্রতিবাদে দেখিতে পাই যে "শ্রীহট্ট সহরের উত্তরে" এই পদের পশ্চাতে "(অর্থাৎ কামাখ্যায়)" এইরূপ লিখিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে অচ্যুতবাবুর প্রবন্ধে "অর্থাৎ কামাখ্যায়" আছে কি? অর্থাৎ কামাখ্যায় লিখিয়া তিনিই কি পাঠকের এই ভ্রান্তি জন্মাইতেছেন না যে মগধ শ্রীহট্টে নহে কামাখ্যায়?

লেখক নাকি কোন কোন পদ্মাপুরাণে পাইয়াছেন যে,

"নারায়ণ দেবে কয় জন্ম মুগধ।
ভট্টমিশ্র নহে পণ্ডিত বিশারদ॥"

এইরূপ লিখিত আছে "মু"টি নাকি "ম"এর মত। সুতরাং অর্থ হোক বা না হোক মুগধই গণ্য হইল।

লেখক মহাশয় পূর্ব্বে একবার "কায়স্থ পণ্ডিত বড় বিদ্যাবিশারদ" ইতি উক্তির পক্ষে ওকালতী যথেষ্ট করিয়া থাকিলেও এস্থলে বলিতেছেন—"মুগ্ধ শব্দের একটি অর্থ মূর্খ। প্রাচীন কবিগণ অনেক স্থলেই মূর্খ শব্দ স্থলে মুগ্ধ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন।"

এস্থলে আমাদের একটা জিজ্ঞাস্য আছে, প্রাচীন কবিগণ মূর্খ শব্দ স্থলে মুগ্ধ শব্দের প্রয়োগ কোথায় করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করিবেন কি? মুগ্ধস্থলে পয়ারে "মুগধ" হইয়া গেল, কিন্তু জন্মের বেলায় "জনম" হইল না কেন? তাহা হইলে অন্ততঃ চৌদ্দটা অক্ষরের মিল হইত, এস্থলেও ছন্দপতন ঘটিত না।

অনন্তর "কায়স্থ পণ্ডিত বড় বিদ্যাবিশারদ" এই উক্তির সহিত "ভট্টমিশ্র নহে পণ্ডিত বিশারদ" ইতি উক্তির সামঞ্জস্যও বেশ! নারায়ণদেব বোধ হয় এত অসতর্ক ছিলেন না যে একবার যাহা বলিবেন, পরক্ষণেই তাহার বিপরীত উক্তি করিবেন। ইহাতে কি মনে হয়? ইহাতে কি মনে হয় না যে—

"কায়স্থ পণ্ডিত বড় বিদ্যাবিশারদ।
সুকবি বল্লভ খ্যাতি সর্ব্ব গুণযুত॥"

এই পংক্তিদ্বয় পরবর্ত্তী যোজনা? বহু প্রাচীন হস্ত-

লিখিত পুঁথিতে ইহা না থাকায় ইহাই বোধ হয়। শ্রীযুক্ত দীনেশবাবু ২০০ বৎসর পূর্ব্বকার যে পুঁথি পাইয়াছেন, তাহাতেও উহা নাই, ইহা প্রক্ষিপ্ত আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি।

মুগধ শব্দের অপভ্রংশে মূঢ় বলিয়া একটা শব্দই আছে। তা' ছাড়া অপভ্রংশেরও একটা রীতি আছে, যেমন মিত্র—মিত্তির, চিত্র—চিত্তির, শুক্র—শুকুর, শুক্ল—শুকুল (হিন্দী), মুক্তা—মুকুতা ইত্যাদি। মুগ্ধ স্থলে যদি মূঢ় না হইত, তবে মুগুধ হওয়া সঙ্গত ছিল কিনা বিবেচ্য। কাজেই বোধ হইতেছে যে ঘ'এর স্থায় 'ম'কেই 'মু' পড়া হইয়া থাকিবে।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। সুতরাং এই স্থানেই শেষ দাঁড়ি দিতে হইল।

শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ।

আলোচনা।

সংস্কৃত শিক্ষায় বিলাস।

এই বিলাস-লালসা-পরিপূরিত বিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন দুরূহ ব্যাপার রূপে পরিণত হইয়াছে। এই শাস্ত্রের, এই পবিত্র দেব-ভাষার আলোচনা করিতে হইলে, মানস-রাজ্যে আর্য্য-ভাবের সুপ্রতিষ্ঠা আবশ্যক। অনার্য্যভাবের বিন্দুমাত্র ছায়াপাত হইলে, ভোগ-লালসা সামান্যরূপেও মানস-মধ্যে প্রবেশ লাভ করিলে, এ ভাষার চর্চ্চা তেমন ফলদায়িনী হইতে পারে না। কঠোর অধ্যবসায়, সম্যক্ কষ্ট সহিষ্ণুতা ও প্রবল ভোগ-বিতৃষ্ণা এ ভাষানুশীলনে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এ যুগে অনেকেই প্রাগুক্ত গুণনিচয়ের সম্যগধিকারী না হইলেও, অল্প অধ্যয়ন-ব্যয়-সংকুলনের ব্যবস্থাভাবে অথবা কৌলিক ব্যবসায় রক্ষার্থ বাধ্য হইয়া সংস্কৃত চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা আশানুরূপ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন না।

চতুর্দ্দিকস্থ সর্ব্ববিধ বিষয়ই অধুনা মানবকে নিয়ত ভোগমার্গে প্রধাবিত করিতে যত্নপর। আরামোপভোগার্থ সুকোমল গদিবিশিষ্ট কাষ্ঠাসন (চেয়ার), সুসজ্জিত বিচিত্রাবরণ টেবিল, নয়ন-রঞ্জন কারুকার্য্য সমন্বিত কাচময় আলোকাধার ও স্বর্ণাক্ষরাঙ্কিত বিবিধ বর্ণ রঞ্জিত এবং সুমসৃণ কাগজে মুদ্রিত পুস্তক রাজি সতত আশে পাশে চক্ষু যুগলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। কোথাওবা এগুলি সংস্কৃত শিক্ষার্থীর প্রাক্তন সহপাঠিবৃন্দের সবিলাস-অধ্যয়নের সামগ্রীরূপে পরিণত হইয়াছে। সহপাঠীও আবার চক্ষুর দোষাভাবেই সুবর্ণ-'ফ্রেম'-মণ্ডিত চসমায় বিভূষিত এবং 'হ্যাট্ কোটে' সুসজ্জিত হইয়াছেন:

সতত চতুর্দ্দিকে এগুলি প্রত্যক্ষীভূত থাকিয়া, ক্রমশঃ অলক্ষিতে সংস্কৃত-বিদ্যার্থীরও মানসিক পরিবর্ত্তন সংঘটন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ পল্লীবাসী হইতে নাগরিকগণ এই কারণ বশতঃই একটু বিলাস পরায়ণ হইয়া থাকেন। সতত পরিদৃশ্যমান দিগন্ত-বিস্তারি বিলাস-তরঙ্গে নির্লিপ্ত থাকা বাস্তবিকই কঠিন ব্যাপার।

মানুষের অধঃপতন যত সহজে নিষ্পন্ন হয়, উচ্চ স্থানে আরোহণ তত আয়াসলব্ধ নহে; উহা যত্ন-সাধ্য,—পরিশ্রম-সাপেক্ষ। সংস্কৃত-বিদ্যার্থীবৃন্দও সহজেই যে নয়নারাম বিলাস-ব্যসনের মধুর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবেন, উহার আর বিচিত্র কি? তাঁহাদেরও কুশ-নির্ম্মিত আসন, মৃন্ময়-প্রদীপ ও হরিতালাদি-লিপ্ত 'তোলট' কাগজে হস্ত-লিখিত প্রাচীন পুস্তকাবলির প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি হ্রাস-প্রাপ্ত হইতে থাকে,—উত্তরীয়ক মাত্র পরিচ্ছদে আর তাঁহারা তৃপ্তি অনুভব করিতে পারেন না! সংস্কৃতাধ্যায়িবৃন্দ স্বকীয় অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে, পূর্ব্বতন-সহপাঠি হইতে নিজ পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া বড় অধিক সময় গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন না!! বিলাস-ভোগের সুযোগাভাবে নিজের প্রতি, এমন কি,—সংস্কৃত শিক্ষার প্রতিও ক্রমে শ্রদ্ধাহীন হইয়া উঠেন।

অবশ্য, ইহা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ব্যতীত কিছুই নহে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে এতাদৃশ দৌর্ব্বল্যের কবল হইতে পরিমুক্ত হওয়া, অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না। প্রখর-বিবেচনা-শক্তি রূপ সুদৃঢ় নৌকা না থাকিলে এই তরঙ্গে নিমজ্জিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

এই বিলাস-ব্যসনে আকৃষ্ট না হইয়া তৎপ্রতি সঘৃণ হওতঃ পূত-চরিত্র আর্য্যগণের চরমোদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া, পবিত্র ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে যতটুকু মানসিক-বলের

আবশ্যক, দুর্ভাগ্যক্রমে অধুনা তাহা অধিকাংশ সংস্কৃত-শিক্ষার্থীর মধ্যেই বিরল। ঈদৃশ প্রতিকূলাবস্থায় কেমন করিয়া 'উন্নতি-মার্গে অগ্রসর হওয়া সম্ভাবিত হইতে পারে?

আমাদের মনে হয়, এই পবিত্র ভাষার অনুশীলনে বৈদিক যুগের ঋষিগণের অবলম্বিত পথে, তাঁহাদেরই আদর্শে—একটী সুনিবিড় রমণীয় স্থান নিরূপিত হওয়া আবশ্যক। তাহাতে ভোগ বাসনা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হওয়ার আশা করা যাইতে পারে। নতুবা এই বিলাস-ঝটিকার বিশাল-বিবর্ত্তে অবিচলিত থাকা অনেকের পক্ষেই সহজসাধ্য নয়।

হিন্দু জাতির নিকটে 'সংস্কৃত' দেব ভাষা বলিয়া কীর্ত্তিত। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—

"সংস্কৃতং নাম দৈবী বা গদ্বাখ্যাতা মহর্ষিভিঃ"

হিন্দুর দৃষ্টিতে এই ভাষা পবিত্রতার আকর, এই স্বর্গীয় ভাষার উপাসকগণও সম্মানিত। এ শাস্ত্র কখনও ভোগ বিলাসের অনুকূল নহে;—ইহা ত্যাগী ও সংযমী হওয়ার উপদেশক;—এ শিক্ষার পরিণামে বিলাস-বাহুল্য নাই—বিলাসকে বিষবৎ পরিত্যাগ করাই এ শাস্ত্রের মূলমন্ত্র। সুপবিত্র নিরাকাঙ্খ জীবন সংগঠনই এ শাস্ত্রের চরম লক্ষ্য যিনি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া প্রথম হইতেই বিপথে চলিবেন তাঁহার 'প্রকৃত শিক্ষা' হইবে কেমনে? তিনি উভয়ের সংমিশ্রণে একটী 'বাবু-পণ্ডিত' সাজিতে পারেন; কিন্তু অর্থার্জ্জনের তেমন অনুকূল নহে,—বিলাসেরও সাহায্য কারিণী নয়, এমন শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া তাঁহাকে শুধু চির-অশান্তি ভোগ করিতে হইবে নাকি? উদ্দেশ্য ভ্রান্ত চিত্তের শান্তি কোথায়?

শ্রীমুরারিমোহন ব্যাকরণতীর্থ।

সাহিত্য সেবক।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ—নিবাস ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণায় কৈলাগ্রাম, পিতার নাম পূর্ণচন্দ্র গুহ। উপেন্দ্র বাবু ১৯০২ সনে বি, এ পাস করিয়া শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করেন, অতঃপর বি, টী, পাস করিয়াছেন এবং ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন। "কাছারের ইতিবৃত্ত" নামে তাঁহার একখানা গ্রন্থ আছে। তিনি মাঝে মাঝে ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনে এবং প্রতিভায় প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। তাঁহার বয়স ৩০ ৩৫ বৎসর।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ—১৮৯৭ সনে এম,এ, ও ১৯০১ সনে বি এল পাস করিয়া ঢাকাতে ওকালতি করিতেছেন। মাঝে মাঝে ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনে তাহার সমালোচনা ও প্রবন্ধ বাহির হয়। ঢাকা সাহিত্য পরিষদের ইনি সম্পাদক।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায়—১২৭৪ সালে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত আচমিতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺ রাজচন্দ্র রায়। উপেন্দ্র বাবু বাল্যকাল হইতেই গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ লিখিতেন। স্কুলে অধ্যয়ন কালেই তিনি স্থানীয় "চারুবার্ত্তা", "ভারত মিহির", 'কুমার' প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা ও গদ্য প্রবন্ধ লিখিতেন। ময়মনসিংহের লুপ্ত আরতির ইনি একজন পরিচালক ছিলেন এবং মাঝে কয়েক বৎসর ইহার হস্তে "আরতির" সম্পাদকীয় ভারও ন্যস্ত হইয়াছিল।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়— জন্ম— ১২৭১। শ্রাবণ সংক্রান্তি। পিতার নাম ৺ ভারতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইঁহার আদি নিবাস অধুনা পদ্মা গর্ভস্থ তারপাশা গ্রামে ছিল। বর্ত্তমান নিবাস ইছাপুরা গ্রামে। ইনি বিক্রমপুরের অন্তর্গত আরিয়ল গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। ৪ বৎসর বয়সে উপেন্দ্র বাবু মাতৃহীন হইয়া মতামহীর কোলে লালিত পালিত হন এবং ১০ বৎসর বয়সে পিতার সহিত ময়মনসিংহ ইঁহার গমন করেন। পিতা ময়মনসিংহ নর্ম্যালস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। উপেন্দ্র বাবুর প্রাথমিক শিক্ষা ময়মনসিংহ হার্ডিঞ্জ স্কুলে আরম্ভ হয়। ময়মনসিংহ নর্ম্যালস্কুল উঠিয়া গেলে ভারত বাবু ঢাকা নর্ম্যালস্কুলে গমন করেন। সেখানে মডেল স্কুল হইতে উপেন্দ্র বাবু ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ছাত্রবৃত্তি, ১৮ বৎসর বয়সে ঢাকা পগোজ স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স, ২ বৎসর পরে ঢাকা কলেজ হইতে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার ২ বৎসর পরে বি, এ, পরীক্ষা প্রদান করিয়া-

ছিলেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া ২৭ বৎসর বয়সে সরকারী কার্য্যে প্রবেশ করেন। এখন ইঁহার ২৫ বৎসর চাকরী হইয়াছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে ইনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। এখন পেন্সন গ্রহণ করতঃ সাহিত্যালোচনা করিতেছেন। দীর্ঘকাল যাবত ইনি ঢাকা বিভাগের মধ্য ইংরেজী ও মধ্য বাঙ্গালা ও উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষা সমিতির সম্পাদকরূপে কাজ করিয়াছেন। উপেন্দ্রবাবুর "চরিতাভিধান" গ্রন্থ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম বাহির হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। ইনি কিছু দিন ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকের কার্য্যও করিয়াছেন। সম্প্রতি উপেন্দ্র বাবু একখানি বৃহৎ বাঙ্গালা অভিধান সম্পাদনে নিযুক্ত আছেন, এবং মাঝে মাঝে প্রতিভা ও ঢাকা রিভিউ পত্রিকায় প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকেন।

ভ্রম সংশোধন।

বর পণ, আত্মহত্যা ও সমাজ প্রবন্ধে "ময়মনসিংহের একটী যুবকের সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা ঠিক সংবাদ নহে। তাঁহাকে ঋণ গ্রস্থ বলা যায় না। ভগ্নির বিবাহে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করা তাঁহার পক্ষে বিশেষ কষ্ট সাধ্য নহে; তাঁহার অন্যান্য ভগ্নিদিদের বিবাহে তাঁহাকে ইহা অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতে হইয়াছে।

শুভ-দৃষ্টি

কোন অপরিহার্য্য কারণে এ সংখ্যায় শুভ-দৃষ্টি প্রকাশ করা গেল না। আশ্বিনের (শারদীয়) সংখ্যায় শেষ করিয়া দেওয়া হইবে।

পাটের গীত।

ওরে, আমার সাধের পাট!
তুমি, ছেয়ে আছ বাঙ্গ্‌লা মুলুক—
বাঙ্গ্‌লা দেশের মাঠ!

যে দেশে যেখানে যাই,
সেথায় তোমায় দেখ্‌তে পাই,
গ্রামে গ্রামে আফিস তোমার
পাড়ায় পাড়ায় হাট!

ধান ফেলিয়ে তোমার বোনে,
বাধা নিষেধ নাহি শোনে,
ছালায় ছালায় টাকা গোণে,—
চাষার বাড়্‌ছে ঠাট!

যার ছিলনা ছনের কুড়ে,
তাহার এখন বাড়ী যুড়ে,
চৌচালা আট চালা কত,
ঝিল্‌মিলি কপাট!

যার ছিল না ছেঁড়া পাটী,
মাটীর সানকী বদ্‌না বাটী,
প্লেট পেয়ালা পরিপাটী
এখন পালং খাট!

মেকড়া পরা পেচী বুচী,
গিল্‌টিতে আর হয় না রুচি,
এখন সোণার বাউটী পঁচি,
উজল করে ঘাট!

তোমার হ'লে অল্প ফলন,
কঠিন বড় খাজ্‌না চলন,
রাজা প্রজা সবার দলন,
বিষম বিভ্রাট!

সার্ভিয়া অষ্ট্রীয়ার লড়াই,
আমরা নাহি তারে ডরাই,
তোমার হ'ল খরিদ বন্ধ,
তাই তে "গৌরাঙ্গ্‌ কাঠ"।

মহাজনে দেয় না টাকা,
কি সে যায় আর বেঁচে থাকা,
পঞ্জাবে মান্দ্রাজে আকাল,
বাঙ্গালা ভজ্‌রাট!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

দ্বিতীয় বর্ষ। } ময়মনসিংহ, আশ্বিন, ১৩২১। { দ্বাদশ সংখ্যা।

ডাক্তার।

মণিমোহন বাবু ডাক্তারী ব্যবসা সুরু করিয়াই ঢাকা সহরের কোনও এক প্রকাণ্ড স্থানে বড় রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড এক সাইন বোর্ড টাঙ্গাইয়া রীতিমত ডিস্পেন্সারী খুলিয়া বসিলেন। যদিও তিনি খাঁটী নেটীব ডাক্তারের ভগ্নাংশ মাত্র অর্থাৎ বিশেষ কোনও অজ্ঞাত দৈব দুর্ঘটনা বশতঃ নেটিব ডাক্তারী পরীক্ষার পাশের সনদখানা প্রাপ্ত হন নাই, তবু খুব অসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যেই, উঁচুদরের ডাক্তার বলিয়া সহরে তাঁর খুব নাম ডাক পড়িয়া গেল। কারণ, প্রাক্তন কর্ম্মফলে, এ জন্মে ভাগ্যদেবী কিছু দিনের জন্ত মণিমোহন বাবুর উপর সুপ্রসন্ন ছিলেন।

কলেজের পাশ করা এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদের মতই তাঁর বেশভূষা, তাঁদের মতই মণিমোহন বাবুর নিজের ব্রুহাম গাড়ী, কোন বিষয়েই মা লক্ষ্মী তাঁর এই পোষ্য পুত্রটীকে এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদের অপেক্ষা খাটো করেন নাই। অথচ মণিমোহন বাবুর কাছে, ভিজিটের টাকার সিকি পয়সা [illegible] না। যে সমুদয় এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনেরা তাঁর সঙ্গে [illegible] প্রতিযোগিতা রক্ষা করিতে না পারিয়া নিতান্ত [illegible] দুটাকা ভিজিট গোপনে হজম করিতেন, মণিমোহন বাবু [illegible] আদায় করা, এমন কি [illegible]

মোহন বাবু, তাঁর রোগীদের নিকট হইতে নিজের গাড়ীর ঘোড়ার দানার মূল্য স্বরূপ একটা নির্দ্দিষ্ট হারে [illegible] আদায় করিয়া গাড়ী ঘোড়ার দাম ত্তদ তুলিয়া লইয়াছিলেন।

ইহার কিছুকাল পর মণিমোহনের ভাগ্য-লক্ষ্মী অপর দশজনের ভাগ্য-লক্ষ্মীর মতই, আপনার চপল স্বভাব বশতঃ, নানারূপ অসঙ্গত চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন—কারণ ভোগ-ক্ষীণ পূর্ব্বোক্ত প্রাক্তন কর্ম্মফলেই তিনি মণিমোহনের উপর আর বেশী দিন অহেতুক প্রসন্ন থাকিবার বিশেষ কোনও সঙ্গত অজুহাত খুঁজিয়া পাইলেন না।

ক্রমান্বয়ে পুরা দুই বৎসর সহরে কোনও রূপ এপিডেমিক না হওয়ায়, ডাক্তার মহলে হাহাকার পড়িয়া গেল। সহরের ডিস্পেন্সারীগুলিতে কলেরা-কিওর, ম্যালেরিয়া মিকশ্চার প্রভৃতি নানা জাতি পেটেণ্ট ঔষধের শিশি-বোতলগুলি সারি সারি মজুত। প্রতি ডোজে সাড়ে বাইশ গ্রেণ করিয়া কুইনিন বিক্রি একেবারে বন্ধ। অনেকগুলি ডিস্পেন্সারী ভগবানের এরূপ অবিচারে একেবারে ফেল পড়িয়া গেল। মণিমোহন বাবু সরঞ্জাম খাটো করিয়া, আগে হইতেই গাড়ীখানা সামান্ত মুনাফায় বেচিয়া ফেলিয়া হাত পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাই সর্ব্বনাশের অগ্নি গোলকটা এ যাত্রা কাণের ধার দিয়া চলিয়া গেল। মা-লক্ষ্মীর সঙ্গে ভবিষ্যতে আমার [illegible] হইবে ভাবি না কারণ আমাকে এই [illegible] এল, এম, এস, পরীক্ষায় পাশ হইয়া চিকিৎসায় [illegible] ঢাকায় বসিয়া বসিতে হইল।

আমার ছোট মামা জজ কোর্টের নাজীর ছিলেন। মণিমোহন বাবুর সহিত অল্প বিস্তর পরিচয় সূত্রে একদিন সন্ধ্যার পর ছোট মামা মণিমোহন বাবুর সহিত আমার আলাপ পরিচয় করিয়া দিবার জন্য তাঁর ডিস্পেনসারীতে লইয়া আসিলেন। তিনি প্রথমতঃ আমার ব্যবসার গন্ধ পাইয়াই আমার উপর নারাজ হইলেন; তার পর যে জন্য আমার সম্প্রতি জাহাঙ্গীর বাদসার সহরে আগমন, তার সংবাদ অবগত হইয়া অবৃষ্টি-সংরম্ভ প্রাবৃটের মেঘখণ্ডের ন্যায় সহসা অত্যন্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। আমাদের দুজনার মধ্যে আত্মীয়তা খুব গাঢ় হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, একেবারে আলাপটাই বাদ হইয়া যায় দেখিয়া, মামা মণিমোহন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—"আজকাল সহরে কাহিল কাতরের ভাবগতিক কেমন, মণি বাবু?" মণিমোহন বাবু মুখটা বেজায় বিকৃত করিয়া বলিলেন:—"আরে রাম রাম, সে কথা আর তুলে কাজ কি নাজীর বাবু; ঢাকা সহরো দেখছি শেষ কালে দারজিলিং হয়ে উঠ্‌লো!"

আমি একটা কথা বলিবার উপলক্ষ্য পাইয়া একটু হাসিয়া বলিলাম:—"কি রকম! শীতটা এবার কিছু বেশী পড়েছে নাকি?"

মণিমোহন বাবু একটু রহস্য করিয়া বলিলেন:—"শীত নয় দাদা—শীত নয়, একেবারে চির বসন্ত! লোকে এখন ঢাকা সহরে হাওয়া বদ্‌লাতে আস্‌বে বলে মনে হচ্চে।"

আমি বলিলাম—"অন্ততঃ মানুষের স্থূল দেহটা যদ্দিন আছে, তদ্দিন আমাদের কালিদাসের মামুলী বিরহীর মত বসন্ত কাল দেখে অত ঘাবড়াবার তো বিশেষ কোনো কারণ দেখি না!—"

মণিমোহন বাবু বলিলেন—মশায়, মাপ করবেন, কালিদাসের বিরহীদের বসন্ত কালাতঙ্ক নামক ব্যামো বা তার চিকিৎসা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বড়ই অল্প! তবে ব্যামো-পীড়াটা বাস্তবিক মানুষের স্থূল দেহের কি সূক্ষ্ম দেহের অন্তর্গত, আজ কাল তাতেও নানা রকম গোল লাগিয়ে উঠ্‌চে! তাই ভয় হয়—এলোপ্যাথি ব্যবসাটা বুঝি আর টেঁকে না!

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম—"কথাটা ভাল করে বুঝতে পারা গেল না!"

মণিমোহন বাবু রহস্যবিৎ বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিলেন:—"তা কথাটার মাঝে কতকটা আধি ভৌতিক কতকটা আধি দৈবিক রহস্য আছে বটে, সব কথা খুলে না বললে ব্যাপার খানা ভাল করে বুঝতে পারবেন না। কিন্তু তা হলে ঐ তক্তপোষে তোষকটার উপর বেশ একটু আঁট হয়ে বসা যাক! বেতের চেয়ারে আলগা হয়ে বসে বলতে সুরু কল্লে বোধ করি কথাটা ভাল জমবে না।"

শেষ পক্ষের বিবাহ করিয়া অবধি ছোট মামা আমার রাত্রি ৮ টার পর ঘরের বাহির থাকিতেন না। আমার একটু পাকা বন্দোবস্তের লক্ষণ দেখিয়া তিনি আমাকে রাখিয়াই চলিয়া গেলেন।

আমি মণিমোহন বাবুর ফরমাস মত জুতা খুলিয়া তক্ত পোষের তোষকের উপর আসন করিয়া বসিলাম। ডাক্তার হাত নাড়িয়া, মুখ ঘুরাইয়া, চোক পাকাইয়া আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী দীর্ঘ গল্প জুড়িয়া দিলেন।

মণিমোহন বাবু ঝুলানো কেরাসিন লেম্পটার আলো একটু চড়াইয়া দিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।—"সে আজ প্রায় পঁচিশ বৎসরের কথা। সে সময়ে নব্যবঙ্গে চসমা ও লম্বা দাঁড়ির নূতন আমদানী—সুতরাং আমার চোখে জিরো নম্বরের চসমা এবং মুখে প্রচুর পরিমাণে দাঁড়ির উপদ্রব ছিল। সে বৎসর সমস্ত ঢাকা সহর ভীষণ কলেরা রোগের সংক্রামন বিষে দূষিত হইয়া উঠিল। ঘরে ঘরে মৃত্যু কঙ্কালরূপ ধারণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। অতএব শুভলগ্ন উপস্থিত দেখিয়া আমি রণ বেশে কলেরার সহিত সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার কোট পেণ্টালুনের উপর মাথায় মেটেরংএর জার্ম্মান বাবু ক্যাপ, কারণ তখনো কলিকাতা চাঁদনীচকের সস্তা হ্যাট বাজারে আমদানী হয় নাই। হাতে ক্লরোডাইন ও ক্যালোমেল নামক বরুণ ব্রহ্মাস্ত্র লইয়া সে যাত্রা চিকিৎসায় যে পরিমাণে যশোলাভ ঘটিয়াছিল, অখণ্ড মণ্ডলাকার শুভ্র রজত খণ্ড লাভ হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী! কারণ সে কালে টাকা এত সস্তা হয় নাই, পথে ঘাটে আজ কালকালকার মত এত নানা প্যাথির

ডাক্তারের ছড়া ছড়িও ছিল না, এবং এসিষ্টাণ্টসার্জ্জনদের বাজার দর এখনকার চাইতে ঢের বেশী চড়া ছিল !"

যদিও মণিমোহন বাবুর আক্ষেপ পূর্ণ কথা গুলির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে করুণ রস মিশ্রিত ছিল,তবু বক্তৃতাটা অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে আশঙ্কায় আমি বলিলাম :—

"সে আধি ভৌতিক কথার রহস্যটা কিন্তু এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদের পাল্লায় পড়িয়া মাঠে মারা যাবার যো হচ্চে—" মণিমোহন বাবু একটু মুরুব্বিয়ানা ভাবে বলিলেন :—

"সে দিকেই পাড়ি জমবে এখন। "পারিপার্শ্বিক" অবস্থার সঙ্গে যোগ রেখে বলতে হচ্ছে কিনা সেই, জন্যে পথে যা একটু ঘুরপাক আছে !"

বেগতিক দেখিয়া আমাকে চুপ করিতে হইল। ডাক্তার আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

"ভরা ভাদ্র মাস। সেদিন যেন ঢাকা সহরের মাথার উপর বাদলের আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। অবিশ্রান্ত ঝর ঝর—ধারাপাতের আর বিরাম নাই। দেবদারু গাছ গুলির পাতা আকাশে উড়াইয়া দিয়া, শিথিল বৃন্ত যুথিকার অনাথ ফুল-গুলি সিক্ত কাননতলে বিলুণ্ঠিত করিয়া দিয়া, দমকা হাওয়া মৃত্যুর হাহাকার বিদীর্ণ-নগরের বুকের উপর দিয়া দীর্ঘ নিশ্বসের মত হু হু শব্দে বহিতেছিল।

"সন্ধ্যা যখন মিলাইয়া আসিল, তখন ভজহরি বসাকের কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছে। তার দুই বাহুতে দুইটা হাইপোডার্ম্মিক নিডলের খোঁচা দিয়া তার সম্বন্ধে ভিজিট লাভের আশা পরিত্যাগ করিতে হইল। মির্জ্জা সাহেবের নিকার বিবির তখনো আশা আছে—মনে করিয়া সে বাড়ী হইতে ভিজিটের বাকীটাকাটা আদায় করিতে গিয়া দেখি, নিকার বিবি সাদা "তপন" পরিয়া নিঃশব্দে দোলায় চড়িতেছেন! টাকাটা নগদ আদায় হইল না দেখিয়া ক্ষুণ্ণ মনে, সিক্ত বস্ত্রে, ক্লান্ত দেহে, যখন ঘরে ফিরিলাম, তখন রাত্রি আন্দাজ আট টা।

"শরীরটা কেমন একটু জ্বর জ্বর করিতেছিল, দেখিয়া স্ত্রীর নিকট আটার পুরু রুটী এবং গরম কোর্ম্মার ফরমাস দিয়া বাহির বাড়ীতে বৈঠক খানা ঘরে বসিয়া এক গ্লাস শ্যামপেন নামক ফরাসী দ্রাক্ষারস পান করিলে পর, জ্বর জ্বর ভাবটা একেবারে দূর হইয়া মনটা ক্রমশঃ প্রফুল্ল হইয়া আসিতে লাগিল !"

মণিমোহন বাবু আমার মুখে একটু বিরক্তির চিহ্ন দেখিয়া বলিলেন :—দেখুন মহাশয়! যে হেতু আপনার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে হেতু আপনার নিকট কোনও প্রকার অপ্রিয় সত্যও গোপন করিবার আবশ্যক নাই! একবার "কলে" মাণিকগঞ্জ গিয়া নেহাৎ ম্যালেরিয়ার ভয়েই মদ ধরিয়াছিলাম, সে কথা বলা বাহুল্য। যদিচ ঢাকায় আসার পর ম্যালেরিয়ার আশঙ্কা দূর হইল, তথাপি ম্যালেরিয়ার ঔষধটার মায়া কাটাইয়া উঠিতে পারিলাম না! আপনাদের নূতন ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়াতে কি লেখে জানিনা; কিন্তু আমার নিজের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান এই যে, যতক্ষণ মদের নেশা না ছুটিয়াছে ততক্ষণ "এনাফিলস" মশার হাতে মরণশীল স্বপ্ন প্রাণ বাঙ্গালীর আর কোনও ভয় নাই!

"বৈঠক খানা ঘরের খোলা জানালা গুলি দিয়া আমার মুখের উপর আর্দ্র হাওয়া যতই লাগিতে লাগিল, আমার মনোবৃত্তির উপর দ্রাক্ষারসের প্রভাব ততই রঙ্গীন হইয়া উঠিতে লাগিল। যদিও আমার বৈঠকখানা ঘর তেমন সাজানোছিলনা, এবং সবুজ চিমনির উপরে একটা উজ্জল কেরাসিনের আলোই জলিতেছিল, তবু আমার মনে হইল যেন আমি এক তাড়িতালোক উদ্ভাসিত সুসজ্জিত রঙ্গ মঞ্চের উপর দাড়াইয়া আছি! বিচিত্র রঙ্গভূমি! আর আমি তার একমাত্র অভিনেতা! নায়িকার প্রতীক্ষায় উদ্ভ্রান্ত নায়ক যেমন রঙ্গমঞ্চে অস্থির ভাবে পাদ চারণা করিতে করিতে নেপথ্যের পানে ঘন ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করে, আমিও সেই ভাবে খোলা জানালা দিয়া বাহিরের ঝিল্লিরব মুখরিত অন্ধকার নিশিথের পানে চাহিলাম। যদিও সে রাত্রে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের কোথাও একটী তারা ছিল না; তবু আমার জানালার কাছে আসিতেই মনে হইল যেন নক্ষত্র খচিত অনন্ত আকাশে আর একটী তারারও স্থান নাই! যেন আমার আশ্চর্য্য নায়িকা জলদ জালের বহিরাবরণ ছিন্ন করিয়া আকাশের সুনীল পটে নক্ষত্র পুঞ্জে লেখা একখানা বিচিত্র রহস্য লিপি, তার অদৃশ্য সুন্দর হস্তে বিস্ময়ের নেপথ্য রাজ্য হইতে আমার পানে উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে!

"রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হইয়া আসিতেছিল। এবং যদিও আমার বাড়ীর ত্রিসীমানায় কোনও প্রকার ফুল গাছের শিকড় পর্য্যন্ত ছিলনা। তবু যেন খোলা জানালা দিয়া কেতকীর স্নিগ্ধ গন্ধে আমার অচেতন বৈঠক খানা ঘরটা শুদ্ধ বিভোর হইয়া গেল! অর্থাৎ মোটা মোটি কথাটা এই যে তখন আমার ভাব জগতে অত্যন্ত উর্দ্ধগতি হইয়া গেছে। সুতরাং গৃহিনীর নিকট যে আটার রুটি ও গরম কোর্ম্মার ফরমাস দিয়াছিলাম, সে কথা আদৌ আমার মনে ছিলনা।"

মণিমোহন বাবু হঠাৎ থামিয়া পড়িয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "গল্পটা আপনার কেমন বোধ হচ্চে?" আমি একটু মুচকি হাসিয়া বলিলাম—"মন্দনয়! তবে কিনা কাব্যের মিষ্টতাটা কিছু বেশী কড়া হয়ে পড়চে!"

মণিমোহন বাবু একটা ছোট এলাচি ছাড়াইতে ছাড়াইতে বলিলেন:—"গল্প বলতে হলে একটু মাধুর্য্য রসের মিশাল চাই দাদা, নৈলে গল্পে দানা বাঁধবে কেন? বালুচর প্রায় পার হয়ে এসেচি। এইবার ঘটনার স্রোত বইবে!"

মণিমোহন বাবু বলিতে লাগিলেন:—এমন সময় বেহারা বৈঠকখানার রুদ্ধ দরজায় একটা ঘা দিয়া ডাকিল "হুজুর!"

সে শব্দে আমার ভাব-বিভোর চিত্তে সহসা রোগীর স্বপ্ন ফুটিয়া উঠিল! তাই বলিয়া উঠিলাম:—

"কে হরকিষণ?—কেয়া বাৎ রে, কোথাও রোগী টোগী দেখতে যানে হউগা কি?"

আমার হিন্দুস্থানী ভাষায় যে পরিমাণ দখল মজঃফরপুর জেলা নিবাসী নবাগত হরকিষণ গোয়ালার খাঁটী "বাবু বাঙ্গলায়" দখল, তদনুরূপ! সে বলিল—

"যেবে হোবে হুজুর! একটা ভদর আদমি বাহের ঠারা আছে!"

"আমি ঘরের সদর দরজা খুলিয়া দিবা মাত্র চট্ করিয়া একটী ছোকরা আমার ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া বরাবর আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল!

"দিব্যি পাতলা একহারা চেহারা তার। পরণে মিহি ধুতি, গায়ে ফিণফিণে পাতলা পাঞ্জাবী জামা, গলায় চাদর নাই। ফুটফুটে রং, কালো ফুলের পাঁপড়ির মত কপালের চারিদিকে কোঁকড়ানো চুলের গুচ্ছগুলি লুটাইয়া পড়িয়াছে! ছোকরাটীর বয়স অল্প, তখনো মুখের উপর হইতে মেয়েলি ছাপটী ঘুচে নাই। বনের হরিণের মত ডাগর ডাগর ব্যথাপূর্ণ চোখ দুটী! মনে হয় কাঁদিলে বুঝি সে চোখ হইতে এখনি মুক্তা ঝরিয়া পড়ে! আমি তীব্র দৃষ্টিতে একবার তাহার আপাদ মস্তক দেখিয়া লইয়া বলিলাম—

"কি চাই মশায়?"

"একবার আপনাকে দয়া করে 'কলে' বেরুতে হচ্চে!"

আমি একটু গম্ভীর হইয়া বলিলাম:—

"দয়ার কথা বলচেন কি, সেতো আমাদের নিত্য কর্ম্ম; তবে কিনা রাতের 'কলে' আজ কাল আমি ডবল ভিজিট চার্জ্জ করে থাকি, দিন কালটা ভাল নয় কিনা!"

"ছেলেটী আমার কথায় কোনও জবাব না দিয়া পকেট হইতে নিঃশব্দে দুইটা সভারিণ বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল!

"যেখানে আট টাকায় কাজ হইত, সেখানে এরূপ সহজ ভাবে বিনাবাক্যব্যয়ে দুইটা গোটা সভারিণ ফেলিয়া দিতে দেখিয়া আমি অবাক হইয়া সে চঞ্চল ছোকরার সুন্দর মুখখানার পানে চাহিলাম। সেও আমার মুখের পানে চাহিয়াছিল, কিন্তু তার পলকহীন উদাস নয়নের দৃষ্টি কেমন যেন লক্ষ্য হীন! মৃত পথিক যে দৃষ্টিতে আমাদের তরুলতা ঘেরা বিচিত্র সুখদুঃখ মাখা সজীব পৃথিবীর পানে তাকাইয়া থাকে, ছোকরার চাহনি কতকটা সেই ধরণের। শীতল তুষারময় দৃষ্টি! আমার বোধ হয়, সে চাহনিতে একটা তপ্ত রক্তময় সদ্য-স্পন্দিত মানব হৃদয় চিরকালের জন্য জমিয়া বরফ হইয়া যাইতে পারে!"

তার পর মণিমোহন বাবু ল্যাম্পের আলোটা আরো একটু চড়াইয়া দিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন:—

"আমি ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করিলাম:—

"কোন দিকে যেতে হবে?"

"লালবাগ—পরি বিবির কবরের দিকে।"

"যদিও তখন আমার কাচা বয়স এবং শরীর মজবুত,

এবং মরিব বলিয়া আদৌ বিশ্বাস ছিল না, তবু জানি না কেন, রাত্রিকালে কবরের দিকে যাইতে হইবে শুনিয়া গা-টা কেমন যেন ভার হইয়া উঠিল। যাহোক ঝকঝকে সভারিণ দুটোর পানে চাহিয়া তবু অনেকটা সুস্থ বোধ করিলাম। তখন কোচমানকে গাড়ী জুড়িবার জন্য আদেশ দিয়া তাড়াতাড়ি সাজ পোষাক করিয়া পাশের কামরা হইতে বৈঠকখানায় ফিরিয়া দেখি, ছোকরাটী মৃতবৎ পাণ্ডুর মুখে উদ্বিগ্ন অস্থির ভাবে একবার উঠিতেছে একবার বসিতেছে, কখনো জানালা দিয়া কি দেখিতেছে, আবার কখনো ঘরের ভিতরে অস্থিরভাবে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে। কিছুতেই যেন সে সুস্থির হইতে পারিতেছিল না!

"আমি পোষাক পরিয়া তার দিকে একটু অগ্রসর হইয়া বলিলাম—রোগের হিষ্ট্রীটা একটু আমায় বলুন দেখি মশায়। তাহলে ব্যাগে পুরে দু চারটা ঔষধও সঙ্গে নিতে পারি! ছোকরা আমার প্রশ্ন শুনিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিল। কতক্ষণ ইতস্তত করিয়া পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখে আমার কাণের কাছে চুপি চুপি বলিল :—

"ব্যারামটা ভাল করে ঠাহর করা যাচ্ছে না—তবে ওপিয়াম পয়জনিং বলে মনে হচ্চে!"

"আমি একটু ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলাম :—"পুলিশে খবর দেয়া হয়েছে?"

"ছোকরাটী ক্ষীণ প্রতিধ্বনির মত অতি নির্জীব কণ্ঠে বলিল :—গোল করবেন না ডাক্তার বাবু, বড় ঘরের কথা!

"এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম কেন আট টাকা ভিজিটের স্থানে দুইটা গোটা মোহর আসিয়া পড়িল! বড় লোকের খাস অন্দর মহলের ট্রাজেডী ঢাকা দিতে পয়সা খরচ আছে বটে। আমি অধিকতর প্রাপ্তির সম্ভাবনায় খুসী হইয়া একবার আকাশের পানে চাহিলাম, বোধ হইল যেন আকাশের সব তারাগুলি একেবারে সভারিণ হইয়া গিয়াছে।

"আমি গোঁফ জোড়াটায় একটা চাড়া দিয়া মুরব্বিয়ানা-ভাবে বলিলাম— তাহলে ভিজিটের উপর আরো কিছু বেশী ধরে দিতে হবে। ছোকরা একটু ম্লানভাবে হাসিল। সে হাসিটার মানে "না" অর্থে তর্জমা করিবার আমার কোনও সঙ্গত কারণ ছিল না! প্রাপ্তির কথাটা এখানে আরো খোলাসা করিয়া রাখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল কিন্তু আমি এ বিষয়ে আর কথা বাড়াইলাম না। কারণ কথায় বলে নেবু বেশী টিপিলে তিতো হইয়া যায়।

"গাড়ী তখনো সদর দরজায় আসে নাই। আমি ওপিয়াম্ কেসের উপযোগী সব রকম এনটিডোট্, ষ্টমাক পাম্প প্রভৃতি লট বহর একটা ছোট গ্লাডষ্টোন ব্যাগে পুরিতে পুরিতে ছোকরাটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম :—

"রোগী পুরুষ কি স্ত্রীলোক?"

"স্ত্রীলোক।"

"আপনার কে হন তিনি?"

"আত্মীয়। সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, আমার ইহকাল পর-কাল সেই আত্মীয়তার ডোরে বাঁধা!"

বাক্যের কুহেলিকা ভেদ করিয়া আসল সম্পর্কটা অনুমান করিয়া লইতে আমাকে বেশী বেগ পাইতে হইল না। ছোকরার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট, অপূর্ব্ব আবেগ ভরা এবং অপর্য্যাপ্ত অশ্রুপূর্ণ! সে কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার মনে হইল—পৃথিবীতে এখনো ভালবাসা আছে, স্বর্গেও যথেষ্ট অশ্রু আছে এবং স্বর্গে মর্ত্ত্যে সুখদুঃখময় হাসি অশ্রুমাখা ভালবাসার সম্পর্ক আছে!

"এমন সময় গম্ভীর নিশীথের নিস্তরে একটা শব্দের তরঙ্গ তুলিয়া আমার গৃহ-ভিত্তি কম্পিত করিয়া দরজার সম্মুখে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল! ছোকরাটী আর দেরী না করিয়া নিঃশব্দ পাদবিক্ষেপে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গিয়া আমার আগেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। পরে আমাকে ডাকিয়া বলিল :—

শীগগীর আসুন ডাক্তার বাবু! দেরী হলে হয়তঃ আর তাকে গিয়ে আমরা দেখতে পাবো না!

"কথাগুলির ভিতর দিয়া স্নেহের অমঙ্গল আশঙ্কা যেন মথিত হইয়া উঠিতেছিল! আমি ধীরে ধীরে, গম্ভীরভাবে ব্যাগ হাতে করিয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম। আমার চক্ষে অশ্রুবিন্দু ছিল না বটে কিন্তু মানুষের চরম বিপদের সময় আমার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যটা ভিতর হইতে আমাকে পীড়া দিতে ছিল। প্রিয়জনের বিপদে মানুষের ব্যাকুলতাই স্বাভাবিক, গাম্ভীর্য্যটাই নিতান্ত অকরুণ!

নিশীথের ছায়াম্লান সুপ্ত রাজ পথের উপর দিয়া আমাদের গাড়ী ছুটিতে লাগিল! গাড়ীর চাকার শব্দে রাস্তার দুধারের নিদ্রিত গাছ পালা গুলির মূল যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে ছিল!

"রাস্তার দুই পাশের রুদ্ধদ্বার নিদ্রিত গৃহ গুলি, তন্দ্রাচ্ছন্ন গাছ পালাগুলি, টেলিগ্রামের তার, লাম্প-পোষ্টের রক্তিম আলো একে একে চলন্ত চিত্র-দৃশ্যের মত আমার সমুখ দিয়া পেছনে সরিয়া যাইতে লাগিল! তখন আকাশে মেঘের যবনিকার এক অংশ ছিন্ন করিয়া কৃষ্ণা দশমীর বাঁকা চাঁদ দেখা দিয়াছিল। সে রাস্তার পাশে পাশে, কখনো বৃক্ষশ্রেণীর আড়াল দিয়া কখনো জলাশয় পার হইয়া মঙ্গলাকাঙ্খী প্রিয়জনের মত আমার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে ছিল,—এ দুর্দ্দিনের রজনীতে এক মাত্র সেই আমাকে পরিত্যাগ করে নাই!

"ছোকরার নির্দ্দেশ মত নানা অলি গলি ঘুরিয়া,অনেক রাস্তার মোড় ফিরিয়া,অবশেষে আমাদের গাড়ী মস্ত একটা দোতালা বাড়ীর সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী আসিবা মাত্রই ছোকরাটী চট্ করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া একবার নিঃশব্দে আঙ্গুল দিয়া সেই বাড়ীটা দেখাইয়া দিয়া সে বাড়ীর আলো ছায়া-মাখা প্রকাণ্ড আঙ্গিনার মধ্যে যে হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, তাহা আমি ভাল করিয়া ঠাহর করিতে পারিলাম না। আমি খোলা ফটক দিয়া প্রবেশ করিয়া সেই বাড়ীটার পানে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে সে রুদ্ধ দ্বার শূন্য পুরী একটা নিস্তব্ধ দৈত্য প্রহরীর মত নিশীথের বক্ষের উপর ঠিক সোজা হইয়া দাড়াইয়া ছিল।

"আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়া আমার বিস্ময় আরো ঘনী ভুত হইয়া উঠিল। সেবাড়ীর কক্ষগুলিতে, কি আঙ্গিনার কোনও খানে, কোনও রূপ মানুষের সাড়া পাইলাম না। গৃহের কোনও একটী প্রকোষ্ঠ হইতে একটী ক্ষীণতম আলোক রশ্মিও বাহির হইয়া আসিয়া সে প্রাঙ্গনে রেখা পাত করে নাই। মানুষের আসন্ন বিপদের সময় যেমন চারিদিকে আত্মীয় স্বজনের একটা ব্যস্ত ছুটাছুটি পড়িয়া যায়—সে বাড়ীতে সেরূপ কোন লক্ষণও দেখা গেল না। চারিদিক নীরব—ঝড় বহিবার পুর্ব্বে প্রকৃতি যেরূপ নিস্পন্দ হইয়া যায়, কতকটা যেন সেইরূপ!

"যদিও অনেকদিন মধ্য রাত্রে একা ঘরে বসিয়া মরা মানুষের মাথার খুলি সমুখে রাখিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ম্যাডিকাল স্কুলের পড়া মুখস্থ করিয়াছি, কত দিন মরা মানুষের হাড় দিয়া তাল বাজাইয়া গুন্ গুন্ করিয়া ভাল বাসার গান আওড়াইয়াছি, কতদিন হাসপাতালে রোগীর 'ডিউটী' করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, উঠিয়া দেখিয়াছি আমি মৃতের সঙ্গে এক গৃহে রাত্রিবাস করিয়াছি কিন্তু কোন দিনও মনের মধ্যে কোনও প্রকার ভয়ের উদ্রেক হয় নাই। আজ, জানি না কেন, সে বাড়ীটার আঙ্গিনার ভিতরে পা দিতেই আমার গা-টা কেমন ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল।

"একবার মনে হইল, রোগী দেখিয়া কায নাই, ঘরে ফিরিয়া যাই। অমনি পকেটের সভারিণ দুইটা এক সঙ্গে বাজিয়া উঠিয়া অতি মিষ্ট ভাষায় মৃদু ভাবে আপত্তি জানাইল। তাই সাহসের উপর ভর করিয়া সমুখের দিকে অগ্রসর হইলাম। দুই এক পা করিয়া আঙ্গিনা পার হইয়া সিড়ির ধাপ গুলি পার হইয়া দালানের নীচের তালার সদর দরজার সমুখে আসিয়া দাড়াইলাম। দরজাটা যেন ভিতর হইতে বন্ধ বলিয়া বোধ হইল। দুই একবার এদিকে ওদিকে তাকাইয়া সঙ্গীয় ছোকরাটীর অন্বেষণ করিলাম কিন্তু কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলাম না। আমি একটু বিরক্ত ভাবে চেঁচাইয়া বলিলাম :—

"কোথা গিয়েচেন মশায়। দরজা যে বন্ধ দেখচি, ভিতরে যাবো কেমন করে ?"

ছোকরাটী দালানের ভিতর হইতে, পরিচিত কণ্ঠে বিনীত ভাবে জবাব দিল :—

"দরজা তো খোলাই রয়েচে ডাক্তার বাবু। ঘা দিলেই দরজা খুলে যাবে।"

"দরজায় ধাক্কা দিতেই কপাট দুটা মৃদু আর্ত্তনাদ করিয়া খুলিয়া গেল। আমি চট্ করিয়া দালানের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি চারিদিকে নীরন্ধ্র অন্ধকার। নিজের অবয়বই ভাল করিয়া দৃষ্টি গোচর হয় না। তবু নিকটে কিম্বা দূরে যে কোথাও মানুষ আছে, তাহা অনুভবেও বুঝিতে পারিলাম না। একটা ভীতি মিশ্রিত বিস্ময় আমার হৃদয় অভিভূত করিয়া ফেলিল। একবার ইচ্ছা হইল

পালাইয়া যাই, কিন্তু পেছন দিকে পা যেন চলিল না! আবার সে ছোকরাকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিলাম :—"এ যে ঘোর অন্ধকার দেখছি, পথ দেখে যাবো কেমন করে?" ছোকরাটী যেন আমার খুব নিকট হইতেই উত্তর করিল :—"দু পা এগুলেই বাঁ দিকে আপনার দোতালায় উঠবার সিঁড়ি, বরাবার চলে আসুন না!"

"অন্ধকারময় অপরিচিত স্থানে পরিচিত ব্যক্তির পক্ষে এরূপ হুকুম করায় যথেষ্ট রসিকতা আছে—স্বীকার করি, কিন্তু অপরিচিত লোকের পক্ষে সেরূপ কড়া হুকুম পালন করা তত সহজ নয়! তাই আমি বলিলাম :—

"একটা আলো দেখাতে পারেন?"

"ছোকরাটী একটু ক্লান্ত ভাবে বলিল :—"আলো ফালো যোগাড় করে আন্‌তে আরো ঢের দেরী হয়ে পড়বে! আপনি একটু ধরে ধরে চলে আসুন না উপরে!"

"এযাত্রা আমি বিলক্ষণ চটিয়া উঠিলাম। ছোকরাটাকে খুব কয়েকটা ঝাঁজালো কথা শুনাইয়া দিবার ইচ্ছা হইল। কথাগুলি ঠোঁটের গোড়ায় আসামাত্র আবার গোটা মোহর দুটার কথা মনে পড়িল! তারা যেন আমার পকেট হইতে "মহারাণীর" দোহাই দিয়া বলিল :—ডাক্তার কর কি, কর কি! এক্ষেত্রে আরো যে প্রাপ্তি সম্ভাবনা আছে! সুবিধামত ভিজিট কবুল হইলে, তোমাদের যে পরলোক পর্য্যন্ত যাইয়া চিকিৎসা করিয়া আসা উচিত।

"মোহরের 'দৈববাণী' টা আমার নিকট নিতান্ত মন্দ ঠেকিল না। ভাবিলাম এতদুর আসিয়া, রোগীটার একবার নাড়ী টিপিয়া না গেলে সভারিণ দুটো হজম হইবে না। পকেটে সিগারেট ও দেশলাই ছিল। সে দেশলাইএর কাঠি পোড়াইতে পোড়াইতে সিঁড়ির মাঝামাঝি তক উঠিয়া আবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম—অন্ধকার ব্যতীত আর কোথাও কিছু নাই! আমি চিৎকার করিয়া বলিলাম :—বাঃ কাউকে যে কোথাও দেখতে পাচ্চিনা!

"আবার সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চ প্রান্ত হইতে ছোকরার পরিচিত কণ্ঠ শোনা গেল :—

"চলে আসুন না ডাক্তার বাবু! আমি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেচি! আপনি কি ভয় পেয়েছেন?

'আমি বলিলাম না'! কারণ ভয়টা কাপুরুষের লক্ষণ এবং সে বিষয়ে কোন অবস্থাতেই কেউ স্বজ্ঞানে স্বীকারোক্তি করিতে রাজি নয়। দ্বিতীয়তঃ এবার ছোকরার কথা শুনিয়া মনে আবার কয়েকটা সাহসের স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল! একরতি সাহসের নাগাল পাইয়া—ভয় হইয়াছিল বলিয়া মনে মনে একটু লজ্জিত হইলাম। ভয় যে একেবারে গিয়াছিল, তাও নয়; তবে ছোকরার মুখে অভয় পাইয়া অনেকটা ভরসা হইয়াছিল বটে! দেশলাইএর আলোর সাহায্যে বাঁকি কয়টা সিঁড়ির ধাপ পার হইয়া দোতালার প্রশস্ত বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইতেই অন্ধকারটা যেন একটু পাতলা বলিয়া মনে হইল।

"সেই ম্লান জ্যোৎস্নায় ছোকরাটী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু তার মুখ এবার এত সাদা ও রক্তহীন বলিয়া বোধ হইল যে সে পাণ্ডুর জ্যোৎস্না হইতে সেটী পৃথক করিয়া লইয়া দেখাই যেন শক্ত!

"আমি বারান্দায় আসা মাত্রই ছোকরাটী একবার তার তুষার-শীতল দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে দেখিয়া লইয়া নীরবে বারান্দাদিয়া বরাবর সমুখের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল, আমিও বিনাবাক্যব্যয়ে তার পেছনে পেছনে চলিতে লাগিলাম।

"চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা শব্দ শুনিয়া একবার মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইলাম। আমার বোধ হইল যেন ঠিক আমাদের পাশের কক্ষশ্রেণীগুলির ভিতর হইতে একসঙ্গে অনেকগুলি উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাসের ধ্বনি গুমরাইয়া গুমরাইয়া উঠিতেছে! মনে হইল যেন অনেকগুলি ব্যথিত হৃদয়ের দীর্ঘনিশ্বাস কোনও একটা অনির্দ্দিষ্ট মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণার অব্যক্ত ধ্বনিরূপে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে অশান্তভাবে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে! যেন এই রুদ্ধদ্বার কক্ষগুলির ভিতরে অনেক পুত্রহীনা জননী, কত পত্নীহারা পুরুষ, কত পতিহীনা অনাথিনী বহু যুগযুগান্তর কারারুদ্ধ থাকিয়া অবশেষে মূর্ত্তিহীন বেদনাময় দীর্ঘনিশ্বাসে পরিণত হইয়া সে শূন্য পুরী পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে! আমার বার বার মনে হইতে লাগিল, যেন আমিও মরিয়া গিয়াছি। যেন আমি লোকালয় ছাড়াইয়া তরুলতাময় শ্যামল পৃথিবী ছাড়াইয়া অনেক অতৃপ্ত বাসনা

অনেক অপূর্ণ আকাঙ্খা লইয়া পরলোকের এক অনন্ত দীর্ঘ নিশ্বাসময় অন্ধকার পান্থশালায় পদার্পণ করিয়াছি—পরলোক ভিন্ন এমন নিরানন্দ দীর্ঘনিশ্বাসের নাট্যশালা আর কোথায় থাকা সম্ভব পর ?

"ছোকরা সমুখের দিকে চলিতেছিল, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তার অনুসরণ করিতেছিলাম !

"মনে হইল যেন সে দীর্ঘনিশ্বাসের পথ দিয়া আমরা দুজনে বহু দেশ বহু জনপদ বহু রাজ্য ছাড়াইয়া চলিলাম, অথচ যখন সেই ছোকরা আমাকে লইয়া সেই দালানেরই একটী কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল তখন সবিস্ময়ে উপলব্ধি করিলাম, সেই দালানের উপরতালার একটী মাত্র বারান্দা ছাড়াইয়া আসিয়াছিমাত্র,আর কোথাও যাই নাই!

"কামরায় ঢুকিয়া দেখিলাম একটী পিলসুজের উপরে ছোট্ট একটী মল্লিকায় তৈল দীপ মিটমিট করিয়া জলিতেছে। সে অস্পষ্ট আলোকে ঘরের ভিতরের অন্ধকার যেন আরো জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে হইল। আরো দেখিতে পাইলাম, মেঝের উপরে একটা বিছানার উপর একটা দীর্ঘ পদার্থ শোয়ান, তার আপাদ মস্তক একখানা পাতলা কমলা রঙ্গের চাদর দিয়া ঢাকা ! ঘরে আর কেহ নাই, কিছু নাই !

"কিছুক্ষণ পরে সেই ছোকরাটী "এই যে আপনার রোগী" মাত্র এই ক'টী কথা বলিয়া, অতি বিবর্ণ মুখে, কম্পিত হস্তে ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে সেই শয্যাস্থিত কমলা-রঙ্গের লঘু যবনিকা তুলিয়া ধরিতেই সে বঙ্গভূমির এক ভীষণ দৃশ্য আমার চোখের সমুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল !

"আমি দুই চক্ষু প্রাণপণ বলে বিস্ফারিত করিয়া দেখিতে পাইলাম, সে বিছানার উপর এক শীর্ণ দীর্ঘ কঙ্কালাকৃতি নারীরূপী মনুষ্য মূর্ত্তি ! ঠিক সেই সময় পাশের একটা কামরায় একটা মেয়েলীসুরের কান্না আমার কাণে আসিয়া পঁহুছিল ! মানুষের ভাষাতীত করুণ, মানুষের সহনাতীত দুঃসহ সে রোদনধ্বনি ! সে নিস্তব্ধ রাত্রে, সে বিরাট শূন্তভবনে, সে উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাসের নিভৃত রাজ্যে সে বিলাপধ্বনি সমুদয় পরলোকের একমাত্র ক্রন্দন ধ্বনির মত আমার কাণে আসিয়া বাজিল !

"আমি ধীরে ধীরে নারীর শীতল রিক্তাভরণ মণিবন্ধ স্পর্শ করিয়া দেখিলাম কোথাও জীবনের নাড়ী স্পন্দিত হইতেছে না। ধীরে ধীরে বক্ষের চর্ম্মাবৃত অস্থিপঞ্জরের উপর ষ্টেথোস্কোপ যন্ত্র বসাইয়া কেবল নিজের বুকের ধুক্ ধুক্ শব্দ শুনিলাম মাত্র ! তার নিশ্চল হৃদয়ের কোথাও একটুকু প্রাণ অবশিষ্ট ছিল বলিয়া বোধ হইল না ! হাত পা বরফের মত শীতল। আঙ্গুলগুলি শুকনা পাতার মত, রক্তশূন্য !

"শরীরের দিক দেখা শেষ হইলে রোগীর মুখের পানে চাহিয়া আমার চোখে জল আসিতে চাহিল ! কি সুন্দর মুখ ! ব্যাধির স্পর্শে নবযৌবনের লাবণ্যরাশি তার অঙ্গে কতকগুলি শুষ্ক ঝরা পাপড়িমাত্র ফেলিয়া রাখিয়া উড়িয়াগিয়াছিল বটে,—কিন্তু মুখ খানিতে তার তখনো সদ্যছিন্ন মাধবীগুচ্ছের মতন অম্লান কোমলতা মাখানো ! মরা গাছটীর আগ-ডালে কতকগুলি পত্র-কিশলয় তখনো শ্যামল, আর সেই পত্র-গুচ্ছের ভিতরে যেন একটী ফুলের মত একখানা মুখ,—তার সবগুলি পাঁপড়ি তখনো শুকায় নাই ! মুখের উপর পদ্মের কুঁড়ির মত দুটী মুদ্রিত চক্ষু ! চোখের পাতার উপর মৃদু আঘাত করিবা মাত্র ঘনদেত্র পল্লবের ছায়ায় দুটী সুন্দর মদিরায়ত চক্ষু খুলিয়া গেল ! রক্ত করবীর পাঁপড়ির মত ঈষদ্ভিন্ন অধরপুটে রঙ্গীণ নেশার মত একটু হাসি ! সে চক্ষু, সে হাসি দেখিয়া মৃত্যু আমার মনে হইল, সে মরে নাই, ঘুমাইয়া ছিল মাত্র ; এখনও অনেক দূরে, আহা ! বুঝি বা এ যাত্রা বাঁচিলে বাঁচিতেও পারে ! বাস্তবিক, এ জগতে এরূপ জীবন্মৃত রোগীর সহিত আর কখনো আমার সাক্ষাৎ হয় নাই।

"চোখ মেলিয়া সে আশ্চর্য্য নারী, আমার পানে তার শীর্ণ দীর্ঘ কঙ্কালময় তর্জ্জনী উত্তোলন করিয়া বিস্ময়ের সহিত সেই ছোকরাকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—

"এ-কে—ইনি কে গো ?"

সে বলিল। "ডাক্তার"

স্ত্রীলোকটী অবাক হইয়া বলিল :—"ডাক্তার! ডাক্তার কেন ? ডাক্তার দিয়ে আমার কি হবে ?"

আমি বলিলাম :—"কি হয়েছে আপনার ?"

স্ত্রীলোকটী পরিষ্কার গলায় উত্তর করিল:—"আর কি হবে আমার! আমি যে মরে গেছি!"

"এখন কেমন বোধ কচ্ছেন?"

"সর্ব্বাঙ্গে বিষের জ্বালা—গা পুরে গেল!"

"কতক্ষণ এরূপ বোধ হচ্ছে?"

স্ত্রীলোকটী একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল:—"কতক্ষণ! অনেকক্ষণ—অনেক দিন—অনেক বছর ধরে এই ভাবে চলচে—আরো অনেক বছর ধরে চলবে! আপনি ডাক্তার হয়ে বুঝতে পাচ্চেন না, যে আমি মরে গেছি!"

"তখন আমার কপাল ঘামিয়া গিয়াছে। বিকারের রোগী অনেক রকম দেখিয়াছি; কিন্তু এটী যে কোন ধরণের রোগী তা হঠাৎ ঠাহর করিতে পারিলাম না। তবু আমি সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিলাম—ও সব কি বক্‌চেন আপনি—মরা মানুষে আবার কথা কয়?

"সে কঙ্কালসার নারী মূর্ত্তি এবার হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিল:—

"মরা মানুষে কথা কয় না? কয় বই কি! এই দেখুন না, আমিই কথা বলচি"।

"এই বলিয়া সে কঙ্কালসার মৃতা বিছানায় বসিয়া হি হি করিয়া অনর্গল হাসিতে লাগিল! আমার মনে হইল, সেই সঙ্গে চারিদিকের রুদ্ধ কামরা গুলি হইতে এক সঙ্গে একটা অট্টহাসির রোল পড়িয়া গেল! সে তীব্র উচ্ছসিত অসংযত হাসি উচ্চ হইতে উচ্চতর, তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া যেন আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশের দিকে উঠিতে লাগিল!

"চাহিয়া দেখি বালকটীও আমার পাশে নাই। আমি পাগলের মত সে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া, লম্বা বারান্দা পার হইয়া তিন লাফে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া পড়িয়া বাড়ীর আঙ্গিনায় পহুছিলাম। তারপর আমি আমার গাড়ীর আলো লক্ষ্য করিয়া আঙ্গিনার ভিতর দিয়া সেই দিকে বরাবর ছুটিতে লাগিলাম! আমার মনে হইল যেন একদল অদৃশ্য দেহহীন স্ত্রীপুরুষ, দ্রুতপদে হাসির করতালি বাজাইয়া আমার পেছনে পেছনে ছুটিয়া আসিতেছে! আমি আরো বেশী দৌড়াইতে লাগিলাম। তারাও সেই ভাবে দৌড়াইতে লাগিল!

"অবশেষে যখন আমি গাড়ীর পাদানির উপর দাঁড়াইয়া, ভীতি বিকৃত কণ্ঠে সুপ্ত কোচমানকে জাগাইয়া দিয়া বলিলাম, "হাঁকাও ভুরবগ; জলদি হাঁকাও"—তখন মনে হইল কার যেন দীর্ঘ নিশ্বাসের উষ্ণ বায়ু আমার মুখের উপর আসিয়া লাগিল! মনে হইল, কার যেন এলান কেশের একটী গুচ্ছ আমার উৎকণ্ঠা-পাণ্ডুর কপোল স্পর্শ করিয়া গেল!

"গাড়ী রাস্তা দিয়া তীরবেগে ছুটিয়া চলিল! আমি গাড়ীতে বসিয়া যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, আমার গাড়ীর দুই পাশে হাসির ঝড় বহিতেছে! সেই হা হা হি হি শব্দ করিয়া একদল অঙ্গহীন অদৃশ্য স্ত্রীপুরুষ আমার গাড়ীর দুই পাশ ধরিয়া বাতাসের মত ছুটিয়া চলিয়াছে!

"আমি কাঁপিতে কাঁপিতে গাড়ীর দুই দিকের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম! গাড়ীর ভিতরটায় একটা নিকষ কৃষ্ণ গাঢ় অন্ধকার জমিয়া উঠিল—আমি তবুও যেন দেখিতে পাইলাম—আমার সেই মৃতকল্পা কঙ্কালাকৃতি রুগ্নানারী আমার সম্মুখের বেঞ্চে বসিয়া আমার পানে অনিমেষ-অত্যুজ্জ্বল চোখে তাকাইয়া কেবলি অনর্গল হি হি করিয়া হাসিতেছে! তার পরে ঠিক কি হইয়াছিল তা বলিতে পারি না। কারণ আমি গাড়ীর ভিতরেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া ছিলাম!"

গল্প বলিতে বলিতে মণিমোহন বাবু যেন বেশ একটু পরিশ্রান্তই হইয়াছিলেন। বোধ হয় সেই জন্যই গল্পটার এই খানেই নায়কের পতন ও মূর্চ্ছা সংঘটন করিয়া যবনিকা পাত কার্য্যটা নির্ব্বিঘ্নে সারিয়া দিয়া, আমার দিকে তাকাইয়া হাসিমুখে বলিলেন:—"কেমন বুঝলেন!"

একে রাত্রি কাল, তাহাতে ভৌতিক গল্প! এখন আমাকে বাসায় কে রাখিয়া আসিবে আমিও শুষ্কমুখে কেবল সেই কথা ভাবিতেছিলাম।

আমি বলিলাম—আশ্চর্য্য ভৌতিক ব্যাপার! কোন বৈজ্ঞানিক মাসিক পত্রিকায় দিলে আলোচনা হতে পারে ভাল! অন্ততঃ কোন শারদীয় সংখ্যায় গল্প বলে লিখেদিলেও পাঠকদের অবকাশের সময়টা কাটবে ভাল। আড্ডাগুলিও জমবে ভাল। মণিমোহন বাবু বলিলেন—"ঠিক কথা।"

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ।

বিজ্ঞাপন-বিজ্ঞান।

(A Psychological Science)

৬৬ নং বীডন্ ষ্ট্রীটে কোন কালে 'হরেক রকম বাজীও বারুদের কারখানা' ছিল কি না, জানি না; কিন্তু সে কালের ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে সেখানে একবার "হরেকর কমবা জীওবা রুদের কারখা নাডডনং" পড়িয়া তাহার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, তাহা চির প্রসিদ্ধ। আজিও যদি কেহ সমস্ত বিজ্ঞাপনের মানে করিতে সাহসী হন, তবে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অবস্থায় পড়িবেন না, একথা জোর করিয়া বলা চলেনা।

বিজ্ঞাপনের ক্রম বিকাশ কোথায় গিয়া ঠেকিবে, জানা যায় না। কিন্তু একটা ক্রম বিকাশ যে হইতেছে তাহা ঠিক। যে যত নূতন রকমের বিজ্ঞাপন দিবে তাহার তত বাহাদুরী এবং তার জিনিসের বোধ হয় কাটতিও তত বেশী। জানি না, কালে ইহা একটী বিজ্ঞানে পরিণত হইবে কিনা এবং বিশ্ব বিদ্যালয়ে পড়াইতে হইবে কিনা, কিন্তু এখনই ইহা এমন জটিলতা অর্জ্জন করিয়াছে যে অনেক বুদ্ধিমান্‌কে হতবুদ্ধি হইতে হয়, অনেক বিদ্বান্‌কে অজ্ঞ প্রতিপন্ন হইতে হয়। আমরা এবিষয়ে কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়া নিজের মূর্খতাই প্রকাশ করিব কিনা জানি না।

প্রবন্ধ লিখিবার শাস্ত্রানুযায়ী—প্রথমেই একটী সংখ্যা দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের সংখ্যা দেওয়া বড় সোজা ব্যাপার নয়। তথাপি আমরা চেষ্টা করিব, কারণ যশোলিপ্সা মানুষের একটী বদ্ধমূল বাসনা। কালক্রমে যখন বিজ্ঞাপন পাঠ একটী শাস্ত্রে পরিণত হইবে, তখন ঐ শাস্ত্রের মহা-মহোপাধ্যায়গণ আমাদিগকে—যদিও আমরা অকৃতকার্য্য, তথাপি প্রথম অধ্যাপক বলিয়া একবার স্মরণ করিবেন—এই যশের আশায় এই অসম্ভব কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছি। বিজ্ঞাপনের সাধারণ, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, প্রকাশন। যে কোন মনের ভাব প্রকাশ করাকেই বিজ্ঞাপন বলা চলে। জানান অর্থেই বিজ্ঞাপন সংস্কৃতে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃতে যে অর্থই হউক না কেন, বাংলায় বিজ্ঞাপন কথাটা 'বিক্রেয় বস্তুর, অস্তিত্ব প্রকাশন' অর্থেই রূঢ়।

সুতরাং বিজ্ঞাপন দুই প্রকার/ কথিত ও লিখিত। আর বিজ্ঞাপ্য বস্তু—চন্দ্র সূর্য্য ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সবই। তবে কতক গুলি বস্তু আছে, যাহার মৌখিক বিজ্ঞাপন এখনও চলে নাই—যেমন বর বিক্রয়। পিতা যখন পাশ করা ছেলে বিক্রয় করেন, তখন ছেলেকে মাথায় করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ডাকিয়া ফিরেন না। এস্থলে লিখিত বি--াপনই চল। ক্রমে প্রতিযোগিতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মৌখিক বিজ্ঞাপনও চলিবে কিনা বিবেচ্য। কতকগুলি বস্তু আছে, যাহার লিখিত বিজ্ঞাপন সম্ভব পর নয়;—যেমন "এক পয়সায় তিন দিয়াশলাই!" আবার কোন কোন জিনিষ আছে, যাহার উভয় প্রকার বিজ্ঞাপনই চল;—যেমন সন্দেশ!'

এই দুই প্রকার ছাড়া বিজ্ঞাপনের একটী তৃতীয় প্রকার দৃষ্ট হয়,—তাহা'মৌন;—যেমন মফঃস্বলের উকীল। ইনি সাইন বোর্ড ও রাখেন না, রাস্তায় 'উকীল চাই' বলিয়া ডাকিয়াও ফিরেন না; বাসায় বসিয়া সতৃষ্ণ নয়নে রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকেন, অথবা কাছারীর নিকটে, বট গাছটীর তলায়, দ্রুত পায়চারি করেন; তাতেই তাঁর বিক্রেয় বস্তু বিজ্ঞাপিত হয়। সহরের উকীল মোক্তারগণ প্রায়ই বাড়ীর দেয়ালে নিজের নাম ও উপাধি (বি. এল.বা বি. এ. ফেল) ছাপাইয়া রাখেন, ইহা তাঁহাদের লিখিত বিজ্ঞাপন। ব্যারিষ্টারগণ মফঃস্বলেও বাড়ীর গায়ে নাম ছাপাইয়া বিজ্ঞাপন দেন এমন দেখা যায়।

মৌন বিজ্ঞাপনের একটা প্রকার ভেদ—প্রদর্শনী। যেমন মুদীর ও মনোহারীর দোকান। সহরেত ছালাও কুলি দেখিয়াই সাধারণতঃ চাউলের দোকান চেনা হয়। লাকরির দোকানও কুলি মার্কা। কাঁসারির বিজ্ঞাপনকেও মৌন বলা যাইত, কিন্তু তার দোকানের সামনে গেলেই "কি চাইলেন, বাবু" বলিয়া সে ত্মাকে কতকটা 'মৌখিক' বা 'কথিত' করিয়া ফেলে। আবার কোন কোন জিনিষ আছে, যাহার অবস্থা.ভেদে মৌন ও কথিত এই উভয় প্রকার বিজ্ঞাপনই দৃষ্ট হয়;—যেমন, 'দই'। রাস্তায় যখন বিক্রয় হয়, তখন উহা চির পরিচিত মৌখিক বিজ্ঞাপন; আর দোকানে যখন বিক্রয় হয়, তখনি সে বিক্রি মৌন বিজ্ঞাপনে। কিন্তু মাঝে ২ পথিককে 'কি নিবেন বাবু' বলায় উহা মৌখিক হইয়া পড়ে।

'কি চাইলেন' বলাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, দিবার মত কিছু আছে। কিন্তু সাইন বোর্ড বিহীন মফঃস্বলের মোক্তারের বাসায় গেলে যখন 'আসুন' বলিয়া ডাকা হয়, তখন ইহা মৌখিক বিজ্ঞাপনে পরিণত হয় কিনা, সে বিষয়ে আচার্য্যদের মত ভেদ দৃষ্ট হয়। তবে, যদি মোক্তারের ফরাসের উপর হাত বাক্সের কাছে একটী লম্বা খাতা খোলা পড়িয়া থাকে, যদি কলমটী কালির দোয়াতে আকণ্ঠ মজ্জিত থাকে, আর যদি ঘরে বেশী লোকের সমাগম না থাকে, যদি মোক্তারটীকে দেখিয়া মনে হয় যে তিনি অনেক কথা বার্ত্তা বলিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন নাই, তাহা হইলে ইহা মৌখিক বিজ্ঞাপন মনে কর যাইতে পারে; আর তা না হইলে ইহা ভদ্রতা মাত্র, বিজ্ঞাপন নয়।

পাছে গোল হইয়া যায় সেই জন্য আবার বলিয়া নেওয়া দরকার যে বিজ্ঞাপনের আমরা তিনটী প্রকার পাইয়াছি:—লিখিত, কথিত, মৌন। মৌনের আবার একটী প্রকরাভেদ—বিক্রয় বস্তুর প্রদর্শনী। কথিতেরও তেমনি একটা প্রকারভেদ আছে, যাহার আমরা নাম দিতে পারি—'যান্ত্র ভাবিক',—যেমন চাবি বিক্রেতার বিজ্ঞাপন। বাদ্যযন্ত্রের বিজ্ঞাপন প্রায়ই এরূপ—যেমন হারমোনিয়মের দোকানের "পেঁ পোঁ"। গানের কলের দোকানের সামনে গেলে "সমরেন্দ্র, সমরেন্দ্র" অথবা "পাপীয়সী রাক্ষসী" প্রভৃতি দ্বারাই উহাকে চেনা যায়; ইহা যন্ত্র-ভাবিক কি মানুষ ভাবিক এ বিষয় ন্যায়তঃ মত ভেদ চলে।

কথিত বা মৌখিক বিজ্ঞাপনকে অন্য এক প্রণালীতে আরও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়;—যথা, চল ও অচল। "পান-চুরট দেশলাই" যখন রেলওয়ে ষ্টেশনে বিক্রয় হয়, তখন উহা এক জায়গায় থাকিয়াই হাঁকে সুতরাং তখন উহা অচল মৌখিক। কিন্তু ঘি যখন রাস্তায় রাস্তায় "ঘী-ঈ-ঈ" রূপে বিচরণ করে, তখন উহা চল-মৌখিক বিজ্ঞাপন।

লিখিত বিজ্ঞাপনও চল এবং অচল ভেদে দুই প্রকার। সাইন বোর্ড প্রভৃতি অচল বিজ্ঞাপন—স্থানে বসিয়া বক্তব্য ঘোষণা করে। ডাক্তার যখন কাষ্ঠ ফলকে নিজের নামের আগে 'মিষ্টার' দিয়া অন্তে বড় বড় অক্ষরে এম্,ডি লিখেন এবং তার পর অদৃশ্য অক্ষরে বন্ধনীর ভিতর 'চিকাগো' লিখিয়া টানাইয়া রাখেন, তখন উনি অচল বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপিত হন। আবার যখন বিবাহেচ্ছুর 'সুন্দরী পাত্রী আবশ্যক হয়, এবং "ক, C/o ম্যানেজার, হিতবাদী" এই নামে যাহাদের দিবার মত পাত্রী আছে তাহাদের নিকট হইতে চিঠি আহ্বান করেন, তখন তিনি চল-লিখিত বিজ্ঞাপনের আশ্রয় নেন। আবার যখন "অন্ধ রজনী"! ক্ষীরোদ বাবুর নূতন নাটক। পলিন! হাসির ফোয়ারা! গানের ঝরণা!!" ট্রাম গাড়ীতে ছড়াইয়া পড়ে, কিংবা যখন "হতাশ রোগীর আশার কথা। অবধৌতিক চিকিৎসা" হাতে হাতে বিলি হয়, তখনও উহা চল-লিখিত বিজ্ঞাপন। কিন্তু গোয়ালিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধ ব্যবহার করিবার অনুজ্ঞা যখন দেয়ালের গায়ে আঁটা থাকে, তখন উহা অচল-লিখিত বিজ্ঞাপন। অন্যান্য শ্রেণীর বেলায় যেমন, এখানেও তেমনি কতকগুলি লিখিত বিজ্ঞাপন আছে যাহা চল কি অচল ঠিক করিয়া বলা যায় না;—যেমন কলিকাতায় ট্রামের গায়ে যে লেখা আছে "ইহা হস্তদ্বারা স্পর্শিত হয় নাই। ইহাতে মাঠা সম্পূর্ণ থাকে। ইহা ভারতগাভীর পাঁচ সের দুগ্ধের সমান!!" তাহা যেখানে লেখা আছে সেইখানেই থাকে বটে কিন্তু ট্রাম তো সহর জুড়িয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

লিখিত বিজ্ঞাপনের অন্তর্ভুক্ত একপ্রকার সাঙ্কেতিক বিজ্ঞাপন আছে; যেমন 'এই খানে সিন আঁকা হয়'। এই সঙ্গে যখন একটী ছোট সিনও টানাইয়া রাখা হয়, তখন সিনটী লিখিত সঙ্কেত। চশমার দোকানের সামনে যখন দুইটী প্রকাণ্ড চক্ষু মিটি মিট করিতে থাকে—তখন উহাও সঙ্কেত।

বিজ্ঞাপনের আর একটী মিশ্র জাতি দৃষ্ট হয়, যথা আদালতের নিলামের বিজ্ঞাপন। ইহা উল্লিখিত প্রধান তিনটী জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন;—ইহা যান্ত্র-ভাবিক, কারণ ঢোলের বাদ্য আছে; ইহা চল-কথিত, কারণ একজন হাঁকিয়া বেড়ায়; ইহা চল-লিখিত, কারণ একটী লিখিত ইস্তাহার ও সঙ্গে বিলি হয়।

লেখক ও গ্রন্থকারগণ সাধারণতঃ চল-লিখিত

বিজ্ঞাপনেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। মাঝে মাঝে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়; যেমন, 'মথি প্রণীত সুসমাচার' যখন হাতে করিয়া ফিরি করা হয়, তখন উহা চল কথিত বিজ্ঞাপন। গ্রন্থকারদের চল-লিখিত বিজ্ঞাপনে একটা বিশেষত্ব আছে; তাহাদের অনেক সময়ই রাম না জন্মিতেই রামায়ণ হয়। যেমন, 'নূতন বই! সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত, প্রবীণ লেখক বঙ্গমায়ের অঙ্গরক্ষা শ্রীযুত চিরঞ্জীব শর্ম্মা প্রণীত "নাগা জাতির ইতিহাস"। সামাজিক, রাষ্ট্র-নৈতিক অর্থনৈতিক—নানা তথ্যে পরিপূর্ণ। যুবক যুবতী, ছাত্র শিক্ষক, ধনী নির্ধন, সকলের সমান ভাবে পড়া উচিত! ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। মূল্য আড়াই টাকা মাত্র। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। কিন্তু যাহারা আগামী ৩০ শে আষাঢ়ের পূর্ব্বে গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইবেন, তাহারা কেবল মাত্র পাঁচ সিকায় পাইবেন।" বলা বাহুল্য, ৩০শে আষাঢ়ের পরও এই বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়।

চল-লিখিত বিজ্ঞাপন কখনও কখনও সংবাদ পত্রে সংবাদ রূপে প্রচারিত হয়। যেমন 'সদর ও মফঃস্বলের সংবাদ' স্তম্ভে যখন থাকে, "কলিকাতায় সার্কাস। আমরা সুখের সহিত জানাইতেছি যে এই সার্কাস ইউরোপ ও আমেরিকায় তাঁহাদের ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় গড়ের মাঠে তাঁবু করিয়াছেন। এবার অনেক নূতন খেলা দেখান হইবে"।—তখন, ইহা সংবাদ পাঠকের নিকট যেমন সংবাদ, তেমনি সার্কাসটির পক্ষে একটা চল-লিখিত বিজ্ঞাপন। 'কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চশমা বিক্রেতা ও চক্ষু পরীক্ষক ওয়াল্টার বুশ্‌নেলের প্রতিনিধি মিঃ ফেরিয়ার সম্প্রতি ঢাকায় আসিয়াছেন এবং ডাক বাংলায় অবস্থিতি করিতেছেন'—ইহা একাধারে সংবাদ ও বিজ্ঞাপন। আবার, "কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত রামাপদ চট্টোপাধ্যায় এম,এ,বি,এল সম্প্রতি একটী জটিল দেওয়ানী মোকদ্দমায় ময়মনসিংহে যাইতেছেন; সেখানে তাঁহার প্রায় পনর দিন দেরী হইবার কথা।" ইহা যে নিরবচ্ছিন্ন সংবাদ তাহা কে বলিবে? যশোলিপ্সু ব্যক্তিরা অনেক সময় সংবাদ-দাতাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া নিজেদের চলা-ফিরার সংবাদ ছাপাইয়া থাকেন; ইহাও একাধারে সংবাদ ও বিজ্ঞাপন। যেমন, 'ফতেপুরেরসুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদ ইয়াছিন মহাশয়ের সঙ্গে গত কল্য লাট সাহেবের এক ঘণ্টা ধরিয়া কথা বার্ত্তা হইয়াছিল।'

বহুরূপী চল-লিখিত বিজ্ঞাপন কখনও সংবাদ, কখনও বা সমালোচনা রূপে ও বিরাজ করে। যেমন "পল্লিচিত্র—কাব্য গ্রন্থ। শ্রীযুত ঈশ্বরীমোহন কারকুন প্রণীত। মূল্য আট আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। লেখক নূতন হইলেও বইখানা ভাল হইয়াছে।" ইহা একাধারে সংবাদ, সমালোচনা ও বিজ্ঞাপন।

সমালোচনা যখন বিজ্ঞাপনের কাজ করে, তখন উহা ছায়া বাজীর পুতুলের মত পিছনে অদৃশ্য লেখকের নিজের তারের টানে নাচে। জোলা যেমন ছেলে না জন্মিতেই বাজারে ছেলের নাম কিনিতে গিয়াছিল,তেমনি আমাদের 'বেঙ্গলী' 'মানসী'তে 'ঠাকুরাণীর কথা' প্রকাশিত হইবার তিন মাস পূর্ব্বেই তাহার সমালোচনা বাহির করিয়াছিলেন। তাহা চল লিখিত বিজ্ঞাপন; এ বিজ্ঞাপনে কে তার টানিয়াছিল, তাহা দেখা না গেলেও অনুমান করা চলে।

বই পড়িয়া ভাল কি মন্দ, যাহারা বিচার করিতে না পারে, তাহারা প্রায়ই সমালোচনা দেখিয়াই বই কিনে। তাদের জন্য অনেক সময় গ্রন্থকার নিজেই সমালোচনা লিখিয়া ছাপিয়া থাকেন। বিলাতে নাকি ইহাতে কোন দোষ নাই এবং ইহা প্রায়ই হইয়া থাকে। 'নব্যভারতের কল্যাণে আমরা অবগত হইয়াছিলাম সম্প্রতি 'প্রবাসী'ও এ দেশে এই নির্দ্দোষ কলাবিদ্যাটীর চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন। গ্রন্থকারের নিজের লিখিত সমালোচনা— বিজ্ঞাপন ও সমালোচনার সংমিশ্রণ না অমিশ্র' বিজ্ঞাপন, এ সম্বন্ধে নৈয়ায়িকদের মধ্যে এখনও বিতণ্ডা চলিতেছে।

বিজ্ঞাপনকে মোটামুটি উপরের লিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেই যথেষ্ট; ইহার চেয়ে বেশীদূর যাইতে গেলে, রহস্য ক্রমেই ঘনাইয়া চলিবে এবং আমরাও পথ হারাইয়া যাইতে পারি।

বিজ্ঞাপনের জাতিভেদের রহস্য ছাড়া আর এক রকম রহস্য আছে, যাহা গূঢ়তর। সেটী আর কিছু না—অনেক

বিজ্ঞাপনের অর্থ করিতে মাথা ঘামিয়া যায়। যেমন, বিজ্ঞাপনে যখন থাকে 'এই খানে উৎকৃষ্ট খাওয়ার সন্দেশ পাওয়া যায়,' তখন আপাততঃ যেন মনে হয় যে বিজ্ঞাপন দাতা পরবার জিলিপি অথবা শুইবার নিমকী বিক্রয় করেন না। কিন্তু এই অর্থ ঠিক কি না, কে জানে? আবার যখন দেখি 'সন্ন্যাসী প্রদত্ত সর্ব্বরোগ হর মাদুলী কেবল পাঠানের খরচ বাবত মাত্র পাঁচ সিকা লইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হয়,' তখন উহা সন্ন্যাসী না সংসারীর প্রদত্ত, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ব্ল্যাকমান্ অর্থ কাল মানুষ, এবং কখনও কখনও সাদা মানুষের নাম; কিন্তু কথাটি যখন অচল-লিখিত বিজ্ঞাপনে বিরাজ করে, তখন উহা কাল কি সাদা মানুষের দোকান ঠিক বুঝা যায় না। "লা—ব্রেব্রইস্‌স্‌" কে রাবড়ি মনে করিয়া বাটী হস্তে ঘরের বাহির যে কেহ কেহ না হন, তা নয়।

গূঢ়ার্থতা আলঙ্কারিকের মতে কাব্যের দোষ; কিন্তু বিজ্ঞাপনে অনেক সময় ইহাই গুণ। যেমন, 'হিতবাদী' "বঙ্গবাসী' বলিয়া ডাকিলে ভোরের ঘুম সহজে ভাঙ্গেনা; কিন্তু 'আলিপুরে বোমার মামলা', চিৎপুরে খুন' বলিয়া ডাকিলে পত্রিকা খানা কিনিবার ইচ্ছা সহজেই হয়। "অকাল বার্দ্ধক্যে হিন্দুজাতি দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছে" বলিয়া আরম্ভ করিলে স্বভাবতঃই মনে হইবে বক্তা নিতান্তই স্বদেশ বৎসল; তারপর আস্তে আস্তে যদি বলা হয়, 'কুন্তলীন ব্যবহার করিলে চুল পড়া নিবৃত্তি হয় এবং অকাল বার্দ্ধক্যও দূরিত হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞাপনটী জমে ভাল।

গূঢ়ার্থতা ছাড়া বিজ্ঞাপনের আরও অলঙ্কার আছে। শ্লেষ বা দ্ব্যর্থবোধকতা তার মধ্যে একটী। "কেহ পড়িবেন না" দেখিয়া যদি কেহ না পড়েন, তবে তিনি বাক্যের একটী অর্থ গ্রহণ করিলেন মাত্র; উদ্দেশ্য বুঝিলেন না। ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

সংশয় ও অনেক সময় বিজ্ঞাপনের অলঙ্কার হয়; যেমন "বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের হিন্দু হোটেল" বলিলে স্বতঃই সন্দেহ উপস্থিত হয়, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের অহিন্দু হোটেল হইতে পারে কিনা। তেমনি, যখন কেহ নিজকে আপনাদের সেই চির পরিচিত অমুক বলিয়া বিজ্ঞাপিত করেন, তখন নাকি অনেকেই লজ্জিত হন এবং মনে করেন, তাইত! চেনা লোকটীকে চিনিতে পারিলাম না!

বিজ্ঞাপনের আর একটী অলঙ্কার ইহার আর্ষ-প্রয়োগ। যেমন একজন লিখিতেছেন—"বিণাপাণী ঔষধালয়" এইখানে বিণা এবং পানী বানান দুইটী আর্ষ। "আপনাদের সেই চির পরিচীত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্বয়ং স্বহস্তে পাচক কর্ত্তা"—এখানে কয়েকটী আর্ষ প্রয়োগই আছে।

বিজ্ঞাপন শাস্ত্রে অদ্ভুত রসের ছড়াছড়ি দৃষ্ট হয়। যেমন,"হাজার হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত! বাংলা দেশ প্রায় জনমানব শূন্য!" বড় বড় অক্ষরে ইহা লিখিয়া নীচে খুব ছোট ছোট অক্ষরে লিখা হয়; "হইতে যাইতেছিল, এমন সময় আমাদের 'জ্বর ত্রিপুরারি-সুধা' লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য আবিষ্কৃত হইয়াছে"—

বিজ্ঞাপনে কলা বিস্তারও যথেষ্ট পারিপাট্য দৃষ্ট হয়। ছবি ব্যতীত কবিতাও খুব পাওয়া যায়। যেমন, 'জন-জামাই ভাগিনা, কেহ নহে আপনা;'—ইহাদ্বারা ঔষধ বিশেষের ভাল হইতেছে এই কথা প্রকারান্তরে বলিবার চেষ্টা হইতেছে। 'মুস্কিল আসানের বড়ী, জ্বরের গলায় দড়ী'—একটী ঔষধের বিজ্ঞাপন মাত্র নয়, একটী উৎকৃষ্ট কবিতাও!

বিজ্ঞাপনে সঙ্গীত কলারও অভাব নাই। তবে, সঙ্গীতটা প্রায় চল কথিতেই সীমাবদ্ধ। যেমন, কলিকাতায়, রি=ঈ=পু=উ—ক র্ম—অ=অ;" অথবা স্ত্রী=কণ্ঠোত্থিত, "মাটী লেবে গো=ও—ও;"। ঢাকার "কু-ঞ-ও-" তে ও কিছু সঙ্গীত বিদ্যা আছে বলিয়া কেহ২ মনে করেন।

বিজ্ঞাপনে চিত্রকলা সম্বন্ধে ভূরি ভূরি গ্রন্থ রচনা করা চলে। সাধারণ একটী প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রয়াস পাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। তথাপি একেবারে কিছু না বলিলে প্রবন্ধ অপূর্ণ থাকিয়া যায়। 'ইংলণ্ডের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিশু'-এই শিরঃ-পংক্তির নীচে কয়েকটী নাদুস্ নুদুস ছেলে মেয়ের ছবি দেখিয়া কাহার মনে না আনন্দ হয়? এবং কাহার না এমন একটী ছবি ঘরে রাখিতে ইচ্ছা হয়? কিন্তু যিনিই ছবিটী নিবেন, তিনিই জালে পড়িবেন; কারণ, "ইহারা সকলেই মেলিন্‌স্ ফুড্ ব্যবহার করিয়া

থাকেন!" আবার, একটী সুগোল সুঠাম শিশু-মুখ এক কামড় খাইয়াই বিস্কুটটী ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতেছে আর বলিতেছে, 'এ ত এলেন চেরীর বিস্কুট নয়'! এই চিত্র দেখিয়া চিত্রকরের প্রশংসা করিব না বিজ্ঞাপন দাতার প্রশংসা করিব?

এত সব অলঙ্কারে অলঙ্কৃত বিজ্ঞাপন শাস্ত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় কেন যে গ্রহণ করিতেছেন না, বলা দুষ্কর। বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন বিদ্যাকে আমরা বিজ্ঞান বলিয়া মনে করিতে পারি না। কিন্তু ইতিমধ্যেই বিজ্ঞাপনের বহুবিধ নামকরণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে; ইহাতেই প্রমাণ হয়, ইহার আদর কত বাড়িতেছে।

বিজ্ঞাপনকে কেহ জুয়াখেলা, কেহ কলাবিদ্যা, কেহ বা বিজ্ঞান কেহ বা ব্যবসা, প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যায় বিজ্ঞান' নামটী ইতিমধ্যেই ইহাকে দেওয়া হইয়াছে। পি, সি, বার্টন নামক একব্যক্তি ইতিমধ্যেই অত্যন্ত তেজের সহিত বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে 'বিজ্ঞাপনকে এখন আর জুয়াখেলা বা অন্য কিছু বলা চলে না; ইহা এক্ষণে বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে।' বাস্তবিকই, যখন অধ্যাপক পল্ চেংরিটনের মত লোক বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে বই লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই ইহার বিজ্ঞানত্ব-প্রাপ্তির আর বেশী বিলম্ব নাই। অধিকন্তু, সম্প্রতি আবার বিলাতের 'রিভিউ অব্ রিভিউস্'পত্রিকা বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে পৃথিবীর বড় বড় লোক-দের মত সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়া ইহার মূল্য আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন। এমন অবস্থায়—যখন মিঃ বার্টন বার্ম্মিহাম প্রদর্শনীতে বিজ্ঞাপনকে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের অন্তর্গত বলিয়া প্রকাশ্য ভাবে প্রচার করিতেছেন এবং মিঃ গারেণ্ড, মিঃ ওয়াডসওয়ার্থ এমন কি প্রফেসর পল্ চেরিংটন পর্য্যন্ত যখন বিজ্ঞাপন শাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন এবং রিভিউ অব রিভিউস এ বিষয় ওকালতি করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে বাণিজ্য প্রধান বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে কালেবা বিজ্ঞাপনকে মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত করিয়া তাহার অধ্যাপনাও আরম্ভ হইতে পারে। আমাদের মনে হয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের এখন হইতেই কিছু কিছু করিয়া বিজ্ঞাপন শাস্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করা উচিত; কারণ কে জানে কবে কাহাকে উহা পড়াইতে হইবে?

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শুভদৃষ্টি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি ৯টা। আমি গীতা পড়িতে ছিলাম। শৈবাল এতক্ষণ রাখালের মার নিকট ছিল, আসিয়া আমার পার্শ্বে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দেখিলাম গাঢ় নিদ্রা। গীতা বন্ধ করিয়া উঠিলাম। রাখালের কোঠায় আলো জ্বলিতেছিল, আমি শান্তির অন্বেষণে ধীরে ধীরে দ্বার ঠেলিয়া চোরের ন্যায় সে কক্ষে প্রবেশ করিলাম। ধীরে ধীরে শয্যার নিকট যাইয়া কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলাম—"সরলা।"

আলু থালু বেশে সরলা উঠিয়া আমার বুকে পড়িল। আট বৎসরের পুঞ্জিভূত শোকাবেগ উচ্ছসিত হইয়া উভয়কে প্লাবিত করিল। বিশ্বের অনন্ত শান্তি, অনন্ত করুণা, অনন্ত আশীর্ব্বাদ যেন মহামিলনের বার্ত্তা পাইয়া ছুটিয়া আসিল।

সরলার শুভ-দৃষ্টি বিশ্বপ্রেম লইয়া আমার দৃষ্টির ভিতর লয় পাইল। আমি তাহার করুণ কাহিনীর বিনিময়ে তাহার গণ্ডে প্রেমের প্রতিদান পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত করিয়া দিলাম। শুভ-দৃষ্টির জয় হইল।

নীরবে বহুক্ষণ শান্তি সুখ উপভোগ করিলাম। কাহারও মুখ হইতে কথাটি ফুটিল না। উভয়ের সতৃষ্ণ মৌন আঁখি উভয়ের প্রাণের কথা মৌন ভাষায় ব্যক্ত করিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে আমি বলিলাম—"সরলা তুমি আমাকে চিন্তে পারলে কি করে?"

সরলা চক্ষু মুছিয়া বলিল—"তুমি আমার হৃদয়ে চির প্রকাশিত; রাখালের হাতে অঙ্গুরী দেখিয়াই তোমাকে বুঝিয়াছি। রাখাল বলিল—"এ ছবি খানাও তিনি আমাকে দিয়াছেন। ছবি খানা দেখিয়া বুঝিতে কিছুই বাকি রহিল না। তার পর তুমি রাখালকে ডাকিতে

ডাকিতে রাখালের নিকট আসিলে, চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল। তোমাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে পেয়েছি, ইহা অভাগিনীর প্রতি ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ।

আমি দুঃখিত হইয়া বলিলাম—"তুমি অভাগিণী কেন সরলা?

সরলা—"তুমি অভাগিনী করিলেই অভাগিনী।" নতুবা অভাগিনী কেন হইব। সরলা থামিয়া বলিল—"তুমি রাখালকে চিনিলে কেমন করিয়া?"

সরলার হাতে একখানা চিঠি দিয়া বলিলাম—এই সেই সৌভাগ্যলিপি, রাখালের পকেটে কাল পাইয়াছিলাম। দেখ দেখি চিন্তে পার কিনা?

সরলা চিঠি দেখিয়া বলিল—" এ আমার চিঠি, আমি মাধব দাদাকে লিখিয়াছিলাম। তিনিই রাখালকে চণ্ডী বাবুর বাড়ী যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। এ চিঠিতে তুমি আমাকে চিনিলে কেমন করিয়া?

আমি বলিলাম—"চিঠিতে পরিচয়ের অভাব কি? যাহা কিছু সন্দেহ ছিল, মাধব রায়ের নিকট তাহাও জানিয়া বুঝিয়াছি।

এরপর শীতের সেই সুদীর্ঘ রজনী সরলা তাহার বিষাদ পূর্ণ কাহিনী বর্ণনায় অতিবাহিত করিল। তাহার পিতার মৃত্যু, ঋণদায়ে সম্পত্তি নষ্ট, ভ্রাতাদিগের উশৃঙ্খলতা, অন্নাভাবে উপবাস ক্লেশ, মাধব রায়ের কৃপায় রাখালের পাঠের ব্যবস্থা, আমাদের খামার জমির যৎসামান্য আয় দ্বারা মাতা পুত্রের ব্যয় নির্ব্বাহ—একে একে সকল কথা বিবৃত করিল। নিবিষ্ট চিত্তে তাহা আমি শুনিলাম। অতঃপর আমিও আমার অজ্ঞাত বাস, সন্ন্যাস, চণ্ডী বাবুর বাসায় অবস্থান, বিবাহ সকল কথা আনুপূর্ব্বিক বলিয়া তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলাম।

সরলা আমাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিল—"আমি তোমাকে সম্মুখে পাইয়া তোমার রাখালকে যে তোমায় বুঝাইয়া দিতে পারিলাম, ইহাই আমার পরম সুখ, পরম সৌভাগ্য। ইহার পর মৃত্যুতে আর আমার কষ্ট নাই। এখন জীবনে শান্তি উপভোগ কর—আমি কায়মনো বাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।"

সরলা আমার বুকের কাছে মুখ লুকাইয়ে কাঁদিতে লাগিল।"

আমি বলিলাম—"সরলা এ সংসার তোমার, আমি অদৃষ্ট দোষে তোমার সম্মান করিতে পারি নাই। কষ্ট দিয়াছি বলিয়া কি আমাকে কষ্ট দিবে? সতীর অবমাননা করিয়া যে কষ্ট পাইতেছি তাহা হৃদয় চিড়িয়া না দেখাতে পারিলে তুমি বুঝিবে না। শৈবাল তোমার ছোট বোন্, তুমি যেরূপ ব্যবস্থা করিবে, সেইরূপই হইবে। আমি এতদিন শান্তি খুঁজিয়া আসিয়াছি, এখন তাহাই ভোগ করিব। তোমার পবিত্র ব্যবহারে আমার সংসার শান্তিময় হউক।"

এইরূপ দীর্ঘ নিশ্বাস ও তপ্ত অশ্রুর বিনিময়ে সে সুখ নিশি অবসান হইল।

আমি সরলাকে সাবধান করিয়া দিলাম—"শৈবালকে তুমি পরিচয় দিও না, আমি দিব।"

(২)

প্রাতঃকালে আমি বাহির হইয়াছিলাম। সহর ঘুরিয়া চণ্ডীবাবুর বাসায় গেলাম। চণ্ডীবাবু বলিলেন—"এই যে যোগেশ, আমিও যে তোমার বাসায় গিয়াছিলাম! আমরা কলিকাতা যাব, তা শৈবাল সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল। এ বিষয়ে তোমার নিকট বলিতে আমাকে সংবাদও দিয়াছিল। আমি সেদিন যাইতে পারি নাই।"

চণ্ডীবাবু একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন—"রাখাল সংবাদ নিয়ে এসেছিল বলে, পচা বল্লে, তুমি নাকি রাখালকে * * * এগুলি যোগেশ কি বলবো * * তোমার পক্ষে * * * আমি শুনে অবধি * * *।

আমি মাথা নীচু করিয়া থাকিয়াই বলিলাম, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি হঠাৎ অজ্ঞাতে একটা নিতান্ত কুকর্ম্ম ক'রে ফে'লেছি। সেজন্য এ তিন দিন কাওকে মুখ দেখাইনি।"

চণ্ডীবাবু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"ত্রুটী বুঝ্‌তে পেরেছ যখন, তখন আর কোন কথা নাই। শৈবাল যেতে চেয়েছিল, তা আমাকে কেন—তোমাকে বল্লেইতো হ'তো—এ সঙ্কোচ ভাব—এ ভাব বাবা তুমিই শিখাইয়েছ।

আমি "আচ্ছা" বলিয়া মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া আসিলাম।

বড়ই লজ্জিত হইলাম। শৈবাল রাখালকে তাহার

বাবার নিকট চিঠি দিয়া পাঠাইয়াছিল, তবে আমাকে তাহা বলিল না কেন? রাখালকেই বা বলিতে নিষেধ করিল কেন? শৈবাল বড় অভিমানিনী তাহাকে সন্দেহ করিলে সে এরূপই করিয়া থাকে। আমারও এইরূপ রজ্জু দেখিয়াই সর্পভ্রম হয়। এইরূপ সন্দেহেই আমি আমার জীবন অশান্তি পূর্ণ করিয়াছি। বাস্তবিক আমার সঙ্কোচ ভাব ও সন্দেহ শৈবালের চরিত্রকে আমার নিকট দুর্ব্বোধ করিয়া তুলিতেছিল।

বাসায় আসিয়া দেখিলাম—শৈবাল মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া আছে। আমি মাটির দিকে চাহিয়াই বলিলাম—"শৈবাল তুমি কলিকাতা যাইতে প্রস্তুত হও।"

আমার ব্যবস্থায় যেন মর্ম্মপীড়িত হইয়া শৈবাল বলিল—"আমি কলিকাতায় যাইব আপনাকে কে বলিল?"

আমি—"তোমার বাবা বলিয়াছেন।"

শৈবাল—"আপনি কি বলিলেন?"

আমি—"আমার বলিবার কি আছে? আমি আপত্তি করি নাই।"

শৈবাল—"রাখালের মা এসেছেন এ অবস্থায় আপনি আপত্তি করিলেন না কেন?"

আমি বলিলাম—"আপত্তির কি কারণ আছে। তাঁরা আছেন, চাকর আছে, বরং কদিনের জন্য একটা ঠাকুর রেখে দিব।

শৈবাল চিন্তা করিয়া বলিল—"এমন অবস্থায় আমি যাব না।"

আমি—তা বেশ না যাও সেও ভাল।"

আফিসে যাইবার সময় শৈবালকে ডাকিয়া বলিলাম—"অতিথির যত্ন করিও।" শৈবাল ছল্ ছল্ নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া আসিলাম।

(৩)

শৈবালকে তিন দিন মুখতুলিয়া চাহিয়া আদর করি না। অভাগিনী সেই অনাদর মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে। অতিথির সম্মুখে গৃহকর্ত্রী কর্ত্তার অনাদর পাইলে, তাহা তাহার পক্ষে দারুণ মনোকষ্টের কারণ হয়। শৈবাল সে মনোকষ্ট চাপিয়া রাখিয়া শুষ্ক প্রাণে অতিথির সম্বর্দ্ধনা করিতেছে—দেখিয়া আমি কষ্ট অনুভব করিলাম।

সন্ধ্যার সময় গৃহে আসিয়া শৈবালকে ডাকিলাম—"শৈবাল বাতাস কর। বড় গরম হইয়াছে।"

শৈবাল কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল—"পৌষ মাসে বাতাস করিব, পাখা কোথায়?"

আমার বাতাসের কোন প্রয়োজন ছিল না—তবু বলিলাম—"তোমার আঁচল দিয়াই কর।" শৈবাল তাহাই করিতে লাগিল।

আমি বলিলাম—"তুমি সেদিন রাখালকে তোমার বাবার নিকট পাঠাইলে—তবু কথাটা বল্লে না কেন?"

শৈবাল সমস্ত দিন মর্ম্ম যাতনা চাপিয়া রাখিয়াছিল, আমার এই প্রশ্নে সে বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল।

রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"কেন আপনি এরূপভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।"

আমি—"এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কি কোন অপরাধ করিয়াছিলাম।"

শৈবাল—"আপনি সন্দেহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।"

আমি—"কি প্রকারে বুঝিলে?"

শৈবাল—"আপনার কথার ভাবে ইঙ্গিতে। কৈ" আপনিত পূর্ব্বে আমাকে এরূপ করিতেন না। জগদীশ বাবুর ঘটনার পর হইতেই আপনার মনে একটা বৃথা সন্দেহ হইয়াছে; আপনি অতি সামান্য কারণেও আমাকে অবিশ্বাস করেন। আমি আপনার এই ব্যবহারে বড় কষ্ট পাই। আপনিও কষ্ট না পান তাহা নহে।

আমি বলিলাম—"তা তুমি বলিলেই সব গোল চুকিয়া যাইত। তুমি নিজেত বলিলেই না, বরং রাখালকেও নিষেধ করিয়া রাখিয়াছিলে—ইহা কি সন্দেহের কারণ নহে।"

শৈবাল নিঃসঙ্কোচে বলিল—"আপনি সন্দেহ করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি উত্তর দেই নাই, সন্ধ্যার সময় রাখাল আসিলে তাহাকে ও নিষেধ করিয়াছিলাম। প্রয়োজন

দেখিলে আমি নিজেই বলিতাম। আপনি যে এরূপ অভিনয় করিবেন, তাহা কি কখনও মনে করিয়াছি।"

আমি—"আমার কোন বিষয় সন্দেহ হইলে কি তাহা তুমি বুঝাইয়া দিবে না?"

শৈবাল গর্ব্বিতভাবে বলিল—"মিথ্যাকথা ও মিথ্যা ব্যবহার শিখি নাই, সঙ্কোচ, অসঙ্কোচ জানি না, পাপ পুণ্যও বুঝি না। পিতামাতা যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই শিক্ষা করিয়াছি। সে শিক্ষার ভিতর হইতে আপনি যাহা নিষেধ করিয়াছেন, তাহা দোষ বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি। ইহার পর আপনি যদি অন্যায় ব্যবহার করেন, অন্যায় সন্দেহ করেন, অবিশ্বাস করেন, কৈফিয়ৎ দিয়া আপনাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিব কদিন? আমার কৈফিয়তেই বা আপনার প্রত্যয় হইবে কেন?"

আমি বলিলাম—"তবে কি কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা না করিয়া সেই সন্দেহের বোঝাই বহন করিতে হইবে?"

শৈবাল বলিল—"বিশ্বাস থাকিলে কেন সন্দেহ হইবে। "সন্দেহ" অবিশ্বাসের প্রসূতি, মিথ্যার ছায়া। আপনার যাহাতে বিশ্বাস আছে তাহাতে সন্দেহ থাকিবে না, তাহাতে মিথ্যাও প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

আমি বলিলাম—"তুমি কোন ত্রুটী করিলে কি তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিব না?"

শৈবাল—"আপনি ভুল করিতেছেন, ত্রুটীতে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কিছু নাই।"

আমি—"কেন, তুমি একটা ত্রুটী করিয়া যদি করিয়াছ বলিয়া ভয়ে অস্বীকার কর!"

শৈবাল—"যাহার প্রতি আপনার দৃঢ় বিশ্বাস, সে কার্য্য করিয়া তাহা অস্বীকার করিবে, এ চিন্তা আপনি করিবেন কেন?"

আমি—"যদিই—ধর না কেন—সে অস্বীকার করে?"

শৈবাল—"তবে সে অবিশ্বাসী মিথ্যাবাদী—তাহাকে আপনি সন্দেহ করিতে পারেন। এরূপ স্থলে মিথ্যাবাদীর কৈফিয়তকেই বা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবেন।"

আমি শৈবালের তর্কে হারিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

শৈবাল বলিল—"বাবার নিকট শুনিয়াছি "সন্দেহ" অনেক জীবনকে দুঃখপূর্ণ ও শান্তিহীন করে। অনেক সোনার সংসারকে ছারখার করে। নিজ জীবনেও আমি তাহা অনেক অনুভব করিতেছি।"

শৈবাল কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি শৈবালের কথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া তাহাকে টানিয়া লইলাম। এবং স্নেহ গদগদ কণ্ঠে বলিলাম—"শৈবাল আর তোমাকে কখনও সন্দেহ করিব না। যাহা হইয়াছে, তাহার জন্য ক্ষমা চাহিতেছি। আইস, তোমার সঙ্গেও 'তে-রাত্র' পরে একটা "শুভ-দৃষ্টি" করিয়া আপোষ করি।" শৈবালের সহিত শুভ-দৃষ্টির পর আপোষ হইয়া গেল। আমি হাসিয়া বলিলাম—"এ আপোষে কি কোন সর্ত্ত রাখিতে হইবে?"

শৈবাল—"অবশ্য।"

আমি—"কি কি!"

শৈবাল—"সন্দেহ, প্রতারণা ও মিথ্যা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।"

আমি কাগজ লিখিয়া বলিলাম—"স্বাক্ষর কর।"

শৈবাল হাসিয়া বলিল—"আমি কেন স্বাক্ষর করিব, আপনি করুণ। আমি সেরূপ ব্যবহার করি না, সুতরাং স্বাক্ষর করিব না। অগত্যা হাসিতে হাসিতে লিখিলাম—আগামী সোমবার হইতে এই আপোষ নামা কার্য্যকরী হইবে।—আমি স্বাক্ষর করিয়া দিলাম। শৈবাল তাহা হাতে নিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। আমি বলিলাম—"এতো অতি ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আপোষ হইল। এরপর একটা বৃহৎ স্বত্ব সব্যস্তের মোকদ্দমাও যে দায়ের আছে; তুমি যেরূপ বক্তৃতা করিতে পার, তাহাতে সেটার নিষ্পত্তি যে কিরূপ হইবে, তাহা বলিতে পারি না।'

শৈবাল খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি বলিলাম—"বহু দিন তোমার গান শুনি না, একখানা গাও দেখি।"

শৈবাল বলিল—"ভদ্র লোকের মেয়ে একলাটী বসে আছে, আমরা এখানে গান গাইব, একি ভাল দেখায়?"

আমি একটুক চমকিত হইয়া বলিলাম—"ওঃ সে কথা যে মনেই ছিল না। তুমি তো তোমার কর্ত্তব্য কর নাই—আজকার ডায়রি দাও নাই। রাখালের মার কিরূপ যত্ন করলে—তিনিই বা কি কি করিলেন?

শৈবাল নিঃসঙ্কোচে বলিল—"আপনার অন্যায় ব্যবহারে আমি বড়ই কষ্ট অনুভব করিতেছিলাম। তাই আজ প্রাণ খুলিয়া তাঁহার সহিত কোন গল্প করিতে পারি নাই। বিশেষ তিনিও গল্প প্রিয় নহেন। তিনি প্রাতে ও বিকালে রান্না করিতে গিয়াছিলেন—আমি দিই নাই। তিনি সকল সময় কাজ লইয়াই থাকিতে ভালবাসেন। দেখিতে না দেখিতে, নিষেধ করিতে না করিতে কাজ করিয়া ফেলেন। বড় ঠাণ্ডা মেজাজি ও মিষ্ট ভাষী, এমন লোকের সহবাস ঘটিয়াছে, তাহা আমাদের সৌভাগ্য। আমাকে তিনি দিদি বলিয়া ডাকেন। আমি এখন দেখিতেছি মাতা পুত্র উভয়েরই দিদি—" বলিয়া শৈবাল হাসিয়া উঠিল।

আমি সাগ্রহে বলিলাম—"তিনি এমন মিষ্টভাষী, তবে আমার সহিত আলাপ করাইয়া দাও না। বেশ একত্রে বসিয়া তিন জনে গল্প গুজব করিব।"

শৈবালের মুখ কাল হইয়া গেল, একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"আপনার সহিত তাঁহার কি সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয়—হয় নাই।"

এইমাত্র আপোষনামা লিখিয়াছি। আমি কি বলিব মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিলাম—"দেখ দেখি তিনি কি করিতেছেন?

শৈবাল ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"পঁচা ও রাখালকে পড়াইতেছেন।"

ইহার পর শৈবাল মহা উদ্বিগ্ন ভাবে বলিল—রাখালের মার সহিত আপনার—

আমি শৈবালের মুখ হইতে কথা বাহির হইতে না হইতে বলিলাম—"আজ খেতে টেতে দিবে না নাকি?"

শৈবাল ছাড়িল না। ক্রমেই আরও অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল।

আমি শৈবালের সরল ও নির্ব্বিকার চরিত্র ভাবিয়া আদর করিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলাম—"শৈবাল এ কথা না শুনিলেই কি নয়?"

শৈবাল—"আপনার যদি কোন আপত্তি থাকে, এবং আমার পক্ষে তাহা শোনা অপ্রয়োজন মনে করেন—আমি শুনিতে চাই না।"

আমি সেই ভাবে বলিলাম—"আমার কোন আপত্তি নাই, তোমারও কোন অপ্রয়োজন নহে। তবে সে একটা অতি বড় মোকদ্দমা—আপাততঃ উদরের প্রবোধ দাও, নিজেও প্রবোধ লইয়া আইস। তার পর নিশ্চিন্তে সমস্ত রাত্রির জন্য মোকদ্দমাটী লইয়া বসি। তুমি বিচারক হইও। এটাই সেই স্বত্বসাব্যস্তের মোকদ্দমা। বড় জটিল মোকদ্দমা।

(৪)

রাত্রি ৯টা। শৈবালকে বলিলাম—"মোকদ্দমার শুনানি আরম্ভ করা যাক।"

শৈবাল বলিল—"না, আমি শুনতে চাই না।"

আমি—"তবে কিন্তু আমার দোষ নাই।"

শৈবাল—"আমি কি আপনাকে দোষী করিতেছি।"

আমি—"আজ না কর, আর একদিন করবে।"

শৈবাল—"কেন করিব?"

আমি—"তবে এত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করেছিলে কেন?"

শৈবাল—"আপনি আমাকে রাখালের মার সহিত আপনার পরিচয় করাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন, তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।"

আমি—"আমি যদি বলি, আমার সহিত রাখালের মার পূর্ব্বে আলাপ ছিল, তবে তুমি কি মনে করিবে?"

শৈবাল সরল ভাবে বলিল—"আপনি ঠাট্টা করিতেছেন মনে করিব।"

আমি আগ্রহ সহকারে বলিলাম—"কেন?"

শৈবাল বলিল—"কাল আফিস হইতে আসিয়া আপনি রাখালকে দেখিতে অতিশয় সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।"

আমি বলিলাম—"আর আমি যদি বলি, তাঁর সহিত আজ পর্য্যন্তও আলাপ নাই"—

শৈবালের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; সে কোন কথা বলিল না।"

আমি শৈবালের মানসিক ভাব বুঝিতে পারিলাম না, তাহাকে আদর করিয়া বলিলাম—"তবে শৈবাল, তুমি আমার নিকট হইতে কিরূপ উত্তর পাইলে সুখী হও।"

শৈবাল কাতর স্বরে বলিল—"আমি আপনার নিকট

উত্তর চাইনা। উভয় উত্তরই আমার নিকট সমান কষ্ট দায়ক। স্বামী দেবতা, স্বামীর কার্য্যের বিচার করিবার অধিকার স্ত্রীর নাই। আমি আপনার উত্তর চাইনা।"

আমি বলিলাম—"শৈবাল তোমার মনে সন্দেহ হইয়াছে। শৈবাল নিঃসঙ্কচিত্তে বলিলাম—"হাঁ, কোন কারণে হইয়াছে। উপায় নাই।"

আমি বলিলাম—"কাল রাত আমার সহিত রাখালের মার আলাপ হইয়াছে।"

শৈবাল পূর্ব্ববৎ বলিল—"তা অমি দেখিয়াছি।"

আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম—"তুমি দেখলে কেমন করিয়া ?"

শৈবাল অম্লান বদনে বলিল—"রাত আপনাকে বিছানায় না দেখিয়া রাখালকে দেখিতে গিয়াছিলাম। এই কি আপনার প্রথম আলাপ ?"

আমি—"তার পর জিজ্ঞাসা কর।"

শৈবাল পুনরায় বলিল—"এই কি আপনার প্রথম আলাপ ?"

আমি—"না শৈবাল—আট বৎসর পূর্ব্বে রাখালের জন্মের বৎসরও তাহার সহিত আলাপ ছিল।

শৈবালের হৃদয়ের গুরুভার যেন একটু লঘু হইয়া গেল।

আমি বলিলাম—"এ উত্তরে কি তুমি সুখী হইলে ?" শৈবাল আগ্রহের সহিত বলিল—"হইয়াছি, তবে আমার আরও দুই একটা কথা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

আমি—"জিজ্ঞাসা কর।"

শৈবাল—"কাল তবে রাখালকে দেখিতে এত সঙ্কোচ বোধ করিতে ছিলেন কেন ?"

আমি—"আমার সন্দেহ হইয়াছিল। শৈবাল, আট বৎসর পূর্ব্বে যাহার সহিত দেখাছিল, তিনিই যে রাখালের মা, তখনও নিঃসন্দেহ জানিতে পারি নাই।"

শৈবাল বড় কৌতুহলের সহিত শুনিতে লাগিল। সে কি বলিতে যাইতেছিল হঠাৎ থামিয়া গেল।

আমি বলিলাম—"থামিলে কেন ?"

শৈবাল—"আর জানিবার কোন প্রয়োজন নাই।"

আমি—"আরও কিন্তু মজা আছে।

শৈবাল তখন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"তার পূর্ব্বেও কি পরিচয় ছিল ?"

আমি—"ছিল।"

শৈবাল—"বাঃ বড় মজাতো, তাহলে তিনি আপনার কেহ হন ?"

আমি—"হাঁ, শৈবাল, তিনি আমার স্ত্রী, তোমার দিদি।"

শৈবালের মনের ভার একেবারে লঘু হইয়া গেল। তাহার মনে আনন্দ ধরে না। সে হাত তালী দিয়া এক দৌড়ে সরলার নিকট চলিয়া গেল। আমিও অগত্যা তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলাম।

সরলা তখন রাখালকে বুকে লইয়া ঘুমাইতে ছিল। শৈবাল তাহাকে ডাকিল—"দিদি।" সরলা উত্তর করিল—"দিদি!"

আমি বলিলাম—"সরলা, শৈবাল—তোমরা দুবোনের শুভ-দৃষ্টি-হউক, দুজনে দুজনকে শুভ-দৃষ্টিতে দেখ। আমিও তোমাদিগকে শুভ-দৃষ্টি করি।"

সরলা শৈবালকে বক্ষে চাপিয়া লইল। শৈবাল সরলার পায়ের ধুলা লইল।

আমি ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া
সেই প্রীতি সম্মিলনকে

শুভ-দৃষ্টিতে

নিরীক্ষণ

করিলাম।

অযাচিত।

অন্ধ আবেগে তৃপ্তির লাগি সারাটা নিখিল ধরা
ঘুরিয়া ফিরিল বাসনা আমার—পাপ মলিনতা ভরা।
বাহির হইতে চমকি হেরিল, ব্যর্থ প্রয়াসে ফিরে—
বসে আছ ওগো তৃপ্তিদ তুমি স্থানটুকু সব জুড়ে।

তিব্বত অভিযান।

গিয়াংসী পথে।

আমরা যখন গুরু ত্যাগ করিলাম, শীতের প্রকোপ অনেকটা কম বোধ হইল। একে এপ্রেল মাস, তাহার উপর আমরা এখন আধিত্যকা ভূমিতে অবস্থান করিতে ছিলাম। তিব্বতে এ সময়ে বসন্ত কাল। আমাদের দেশে পৌষ মাসে যে প্রকার শীত, এখন আমরা তাহাই অনুভব করিতে ছিলাম। শীত বস্ত্রাদি (এদেশের) সমস্তই গুরুতে পড়িয়া রহিল,—কারণ, আমরা সকলেই জানিতাম, পুনরায় শীত আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই আমরা ফিরিতে পারিব।
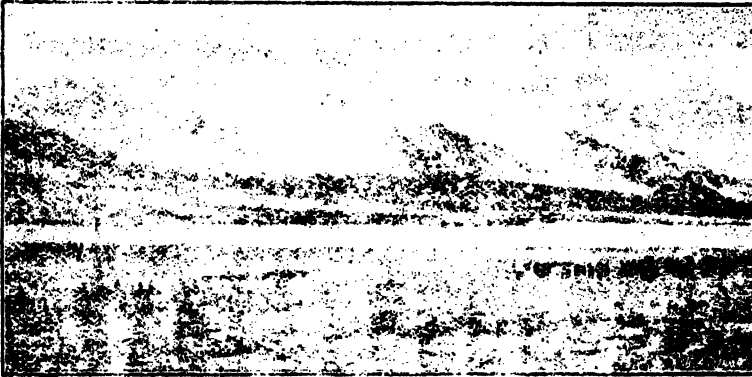
রাম হ্রদ—অদূরে চুমলহরি শৃঙ্গ।

কিয়দ্দূর গিয়া আমরা 'রাম' হ্রদের পশ্চিম তটে উপস্থিত হইলাম। ইহা এইবার আমরা বেশ স্পষ্ট দেখিলাম। পূর্ব্বে যখন দেখিয়াছিলাম, তখন ইহা বরফ আবৃত ছিল। এখন প্রায় সমস্ত বরফ গলিয়া গিয়াছিল। সামান্য কিছু কিছু বরফ কিনারার কাছে ছিল। শুনিলাম, ইহা দৈর্ঘ্যে ১৫ ও প্রস্থে প্রায় ৬মাইল। আমরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার ঠিক অপর পারে বিশাল চুমলহরি পর্ব্বত শৃঙ্গ আকাশকে আলিঙ্গন করিতেছে। এই উচ্চ শৃঙ্গের প্রায় সমগ্র ভাগ সাদা ধপ ধপ করিতেছে। হ্রদের জল সম্পূর্ণ নীল বর্ণ, ঠিক যেন সমুদ্র। নীল [আ]কাশের নীচে সাদা চুমলহরি, তাহার কোলে আবার [নী]ল হ্রদের জল—সে শোভা দেখিবার জিনিস। সাহেবেরা এই স্বর্গীয় দৃশ্যের ফটো উঠাইয়া লইলেন। তিব্বতে এ প্রকার হ্রদ আরও অনেক আছে। প্রায় সকলেরি জল নীল বর্ণ ও লবণ ময়। বোধ হয় এই জন্য ভূগোলবিদেরা অনুমান করেন যে, কোনও এক প্রাচীন যুগে সমস্ত হিমালয় প্রদেশ, তিব্বত সহ বঙ্গোপসাগরের নীচে অবস্থিত ছিল।

এই হ্রদের মধ্যে সহসা অতি ভীষণ বেগে ঝটিকা আরম্ভ হইল। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের ঝড় বড় অভদ্র। আগমনের পূর্ব্বে নোটিশ দিতে জানে না। কোথাও কিছু নাই, সকলে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এখন সময়ে দিগন্ত ব্যাপিয়া ঝড় আরম্ভ হইল। আমরা যথাসম্ভব শীঘ্র শিবির সংস্থাপন করিলাম। এমনই কাজের শৃঙ্খলা, যে ৫।৭ মিনিটের মধ্যে এত লোকের তাঁবু সব খাটান হইয়া গেল। কিন্তু উহা শেষ হইবার আগেই ঝড়ের বেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল বলিয়া আমরা চাকরদের তাড়া দিতে লাগিলাম। কাজে কাজেই উহারা যেমন তেমন করিয়া কাজ শেষ করিল। এই নির্ব্বুদ্ধিতার ফল কিন্তু হাতে হাতে পাইলাম।

ঝড় যখন আরম্ভ হয়, তখন বেলা চারিটা। তত ঝড়ে রন্ধন হওয়া অসম্ভব বলিয়া আমরা তিনজনে কয়েক পেয়ালা চা ও খানকয়েক পাউরুটি খাইয়া সেদিনকার মত খাওয়া শেষ করিলাম। সন্ধ্যার পর ঝড়ের বেগ আরও বৃদ্ধি পাইল। তখন রায় মহাশয় তাঁহার অতি মোটা কর্কশ গলায় 'আমায় কোথায় আনিলে, গানটা যথাসাধ্য চড়ায় গাহিতেছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার সুর বিশেষ মিষ্ট, এবং সেইজন্য তখন তত চড়াসুরে ধরিয়াছিলেন; কারণ, ঝড় এত জোরে বহিতেছিল যে চীৎকার না করিলে কেহ কাহারও কথা শুনিতে পাইতেছিলাম না, এবং আমরা না শুনিলে তাঁহার গানটা মাঠে মারা যায়। সেন মহাশয় একটা কেরাসিনের টিন স-জোরে

চাপড়াইয়া তাল রাখিতেছিলেন। আমি অন্য কাজের অভাবে তাম্রকূট সেবনে নিযুক্ত ছিলাম। প্রকৃতি দেবীর এই উৎপাতের সময় আমরা যে কিছু কম উৎপাত করিতে ছিলাম তাহা নয়। তবে সুখের বিষয় আমাদের এই ব্যাপার আর কেহ জানিতে পারিতেছিল না।

সহসা গান বন্ধ করিয়া রায় মহাশয় আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মেহানত ক'চ্চি আমি, আর ফল ভোগ কর্‌চ তুমি! বলি, কিছু আছে কি ?" আমি কলিকাটা উঠাইয়া তাঁহার গড়গড়ায় বসাইয়াছি মাত্র, এমন সময় তাঁবুটা সশব্দে আমাদের উপর পতিত হইল। তাহার পর, দুই এক মিনিট পর্য্যন্ত আমি স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলাম। হঠাৎ "বাহিরে এস! বাহিরে এস!" শুনিয়া তাঁবুর বাহিরে আসিলাম—ছোট তাঁবু, আঘাত যে বিশেষ কিছুই লাগে নাই, তাহা না বলিলেও চলে। বাহিরে আসিয়া দেখি, সেন মহাশয় আমার অগ্রেই বাহির হইয়াছেন। ইতিমধ্যে তাঁবুর ভিতর হইতে ভীষণ চীৎকারধ্বনি শুনিতে পাইলাম ; "ওরে বাবারে! আয়রে, আমি ম'লাম-রে! ওরে তোরা শেষে কি আমায় অপঘাতে মার্‌লি!" আমরা হাসিব কি কাঁদিব ভাবিয়া পাইলাম না। তাঁহাকে বাহিরে আসিতে অনেক অনুনয় করিলাম, কিন্তু কোনও ফল হইল না। তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ২ বলিলেন, "ওরে আমার সর্ব্বাঙ্গ যে একবারে ছাতু-হয়ে গেছে। কি ক'রে যা'ব ? হাত পা সব ভেঙ্গে গেছে।" তাঁহার ক্রন্দন ও এইসব কথা শুনিয়া বিলক্ষণ ভয় হইল। তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দেখি; তিনি বেশ আরামের সহিত গড়গড়া টানিতেছেন। আমি বলিলাম ; এই বুঝি আপনার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ হইয়াছে ?" তিনি ক্রন্দনস্বরে বলিলেন, "হাত পা ভেঙ্গে গেলে তামাক খাইতে নাই, ইহা কোন শাস্ত্রে লেখে ?' যাহা হউক, অনেক কষ্টে তাঁহাকে বাহিরে আনা হইল ও ধরাধরি করিয়া লইয়া গিয়া অন্য এক তাঁবুর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তাঁহার যে হাত পা ভাঙ্গে নাই, তাহা তাঁহাকে বুঝাইতে আমাদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

চুমলহরির পাদদেশে তিব্বতীয় চমর (গোরু) সমূহ।

পরদিবস বাহির হইয়া আমরা বেলা দশটার পর 'চালু' গ্রামে উপস্থিত হইলাম। গ্রাম খানির চারিদিকে যবের ক্ষেত, চাষের সুবিধার জন্য রাম হ্রদ হইতে কয়েকটি খাল কাটাইয়া ক্ষেত্রের মধ্যে আনা হইয়াছে। কয়েকজন আধুনিক ইতিহাস লেখকের মতে প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়েন্থসাঙ্গ ভারতবর্ষ হইতে ফিরিবার সময় এই গ্রামে কয়েক দিবস বিশ্রাম করিয়াছিলেন। অধিবাসীরা সামান্য কৃষক—এ বিষয়ে অবশ্য কোন ও সংবাদ দিতে পারিল না। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, অনেকের মতে উক্ত পরিব্রাজক মহাশয় তিব্বতে আদৌ পদার্পণ করেন নাই।

চালুর কিয়দ্দূরে 'কালা' হ্রদ। ইহা অনেকটা রামহ্রদের মত। তবে আকারে উহা অপেক্ষা অনেক ছোট। ইহার তিনদিকে পাহাড় এবং জল ঈষৎ লাল। দেখিলাম, হ্রদের মধ্যে অপরিমিত মৎস্য। অসংখ্য বক ও অন্যান্য পক্ষী সকল অনবরত মাছ শিকার করিতেছে।

নানা জাতীয় হংস উহার মধ্যে বিচরণ করিতেছে। আমি কিন্তু লোভ সাম্‌লাইতে পারিলাম না। একজন ভুটিয়াকে দুই আনা পয়সা দেওয়াতে সে ৫।৭ মিনিটের মধ্যে দুইটা বড় বড় মাছ ধরিয়া দিল।

কালা হ্রদের ঠিক তটে এক খানি ক্ষুদ্র গ্রাম। অধিবাসীর সংখ্যা ৩০।৩৫ ঘরের অধিক হইবে না। উহাদের মধ্যে এক গ্রামপতি ভিন্ন আর একজনও মানুষের মতন মানুষ দেখিলাম না। শুনিলাম গ্রামের অধিকাংশ যুবক আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গিয়াংসী গিয়াছে। যদি সত্য সত্যই যুদ্ধ হয়, হয়ত উহাদের কেহই ফিরিবে না।

পরদিবস আমরা 'সামদা' গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলাম। আমরা শুনিয়াছিলাম, ঐ স্থানে তিব্বতীয়েরা আমাদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। সেই জন্য গ্রামে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে একদল অশ্বারোহী সৈন্য ব্যাপারটা ঠিক জানিবার জন্য প্রেরিত হইল। তাহারা দেখিল গ্রামের প্রায় মধ্য স্থলে অনুমান ১০০ তিব্বতীয় সৈন্য এক সুরক্ষিত স্থানে অবস্থান করিতেছে। উহাদের মধ্যে প্রায় ৪০।৫০ জন লামাও ছিল। তাহারা আমাদের অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে নিকটে আহ্বান করিল। তাহারা ইংরাজ শিক্ষিত সৈন্য। অসভ্যোচিত হেয় ব্যাবহার কখনও শিক্ষা করে নাই। লামারা তিব্বতের পুরোহিত—পুরোহিতেরা সব দেশে ধার্ম্মিক বলিয়াই প্রসিদ্ধ। এইজন্য আমাদের সিপাহীরা নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাদের নিকট অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহারা অহাদের দুর্গের ৫০।৬০ গজের মধ্যে উপস্থিত হইবা মাত্র বিশ্বাস ঘাতক তিব্বতীয়েরা তাহাদের উপর গুলি চালাইতে লাগিল। কয়েক জন আহত হইয়া পড়িয়া গেল। অবশিষ্ট সৈন্যেরা নীরবে এই ব্যবহার হজম করিল না। তাহারা উহার উত্তর দিল এবং আহত সঙ্গীদিগকে উঠাইয়া লইয়া ফিরিয়া আসিল। তাহাদের উপর যদি যুদ্ধ করিবার আদেশ থাকিত, তাহা হইলে তাহারা কখনও ঐভাবে ফিরিত না। শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিত। যাহা হউক আমরা যখন সদল বলে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, তিব্বতীয়েরা তখন অদৃশ্য হইয়াছে।

ইহার পর আমরা 'নিয়াং' নদী প্রাপ্ত হইলাম। ইহা গিয়াংশীর তলদেশ ধৌত করিয়া তিব্বতের প্রধান নদী 'সাংপো'তে যাইয়া মিলিত হইতেছে। এই সাংপোই যে হিমালয় ত্যাগ করিবার পর 'ব্রহ্মপুত্র' নাম গ্রহন করিয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। এখন হইতে আমরা তিব্বতের বাহ্যিক অবয়বের বেশ পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিলাম। এতদিন পর্য্যন্ত কেবলই পাহাড় দেখিয়া আসিতেছিলাম; এখন সমভূমি আরম্ভ হইল—অবশ্য পার্ব্বত্য সমভূমি (অধিত্যকা)। আগে গ্রাম বড় একটা দেখিতাম না; এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল।

এতদিন পর্য্যন্ত আমরা একটী বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম। দেশের যেখানে সেখানে বৌদ্ধমঠ। যেখানে দুর্গম পর্ব্বত, ৭০।৮০ মাইলের মধ্যেও লোকালয় নাই, যেখানে বার মাসই দুরন্ত শীত, সে সব স্থানেও মধ্যে মধ্যে মঠ দেখিয়াছিলাম। তখন মনে করিয়াছিলাম, বিপদ গ্রস্ত পথিকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য য়ুরোপের আলপস্ পর্ব্বতের মত এই দুর্গম হিমালয় প্রদেশের ও স্থানে স্থানে মঠ স্থাপিত হইয়াছে। এখন বুঝিলাম, তাহা নয়। গ্রামের মধ্যেও মঠের সংখ্যা খুব অধিক। তিব্বত লামাদিগের রাজ্য। লামারাই এখানকার সর্ব্বময় কর্ত্তা। সেই জন্য লামাদিগের সংখ্যা ও এত অধিক। এমন অবস্থায় মঠের যে প্রাচুর্য্য হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? আর একটি কথা বলা আবশ্যক। বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থের নানা প্রকার পদ সকল প্রায়ই পর্ব্বত গাত্রে খোদিত দেখিতে পাইতাম। পর্ব্বতের গায়ে ছোট ছোট প্রস্তর খণ্ড সকল বসাইয়া অক্ষর সকল লিখিত হইয়াছে। এক একটা অক্ষর প্রায় ২০ ফুট লম্বা। কি বিষম ব্যাপার সহজেই বুঝা যায়। ঐই সকল লেখা বহুদূর হইতে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়! পাঠক জানেন, পর্ব্বত গাত্রে বা গুহার ভিতর এই ভাবে লিখিবার প্রথা আমাদের দেশের বৌদ্ধ নৃপতিগণের সময়ও প্রচলিত ছিল। অশোকের নাম এ বিষয়ে এক প্রধান সাক্ষ্য। অনেকেই হয়ত জানেন, মহারাজ কনিষ্কের সময় বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতে প্রচারিত হয়। ইহাতে আমাদের মনে দুঃখ

যে, পর্ব্বত গাত্রে লিখিবার প্রথা এ দেশে ভারতবর্ষ হইতেই নীত হইয়াছে।

নিয়াং নদীর তটে আমরা অবগত হইলাম যে, চারি মাইল দূরে দুইটি পর্ব্বতের মধ্যে এক অপ্রশস্ত স্থানে কয়েকশত তিব্বতীয় সৈন্য অবস্থিতি করিতেছে। উহারা পর্ব্বতের উপর এমন স্থানে কয়েকটা তোপ রাখিয়াছে যে, আমরা যেমন ভাবেই অগ্রসর হই না কেন আমাদের সম্মুখে অবস্থান করিবে। আমরা যখন ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী হইলাম, তাহারা তোপ চালাইতে লাগিল। কিন্তু আমরা পূর্ব্ব হইতে সাবধান ছিলাম বলিয়া বিশেষ কোনও অনিষ্ট হইল না। তোপের আওয়াজ হইবামাত্র এক্কার ঘোড়া সকল অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িল। তিন জন কুলী এক একটা ঘোড়ার মুখ ধরিয়া রাখিয়াও তাহাদিগকে সামলাইতে পারিতেছিল না। আমি খচ্চরের উপর ছিলাম বলিয়া আমাদের এক্কায় রায় ও সেন মহাশয় মাত্র বসিয়াছিলেন। ঘোড়াগুলা যখন লম্ফ ঝম্ফ করিতেছে, তখন রায় মহাশয় স্বয়ং লাগাম ধরিয়া বসিলেন এবং কুলীরা তাঁহার ঘোড়ার মুখ ধরিয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তাহারা অগত্যা উহার মুখ ছাড়িয়া দিল। ঠিক এই সময়ে কয়েকটা তোপ গর্জ্জিয়া উঠিল। তখন রায় মহাশয়ের পক্ষীরাজ মহাশয় এক্কা লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল! দুর্ভাগ্যক্রমে পথের মধ্যে একখানা বড় পাথর ছিল। তাহার সহিত ধাক্কা লাগিবা মাত্র এক্কা উলটাইয়া গেল! বলা বাহুল্য আরোহী দুই জনই ৫।৭ হাত দূরে যাইয়া পড়িলেন। সেন মহাশয় একে যুবক, তাহার উপর এক পাশে ছিলেন বলিয়া বিশেষ আঘাত পাইলেন না। কিন্তু রায় মহাশয়ের দুর্দ্দশার একশেষ হইল। শরীর তিনচারি স্থানে কাটিয়া গেল; কাপড়, জামা লণ্ড ভণ্ড হইল।

জেনারেল সাহেব দুইদল গুর্খাকে ঐ তোপ অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। তাহাদের পৃষ্ঠ রক্ষার জন্য দুই দল শিখ সৈন্য গমন করিল। প্রায় এক ঘণ্টা যুদ্ধের পর তিব্বতীয়েরা পলায়ন করিল। তাহারা যে ভীরু বা কাপুরুষ এমন যেন কেহ মনে না করেন। আজকার যুদ্ধে তাহারা বিলক্ষণ সৌর্য্য ও বীর্য্য দেখাইয়াছিল। কিন্তু ইংরেজের উন্নত অস্ত্র সস্ত্র ও যুদ্ধ প্রণালীর নিকট তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। শুনিলাম, তিব্বতীয়দিগের প্রায় ১৫০ জন হতাহত ও ১০০ জন বন্দী হইয়াছে। আমাদের হতাহতের সংখ্যা ঠিক জানিতে পারিলাম না। তাহার কারণ এই যে, এসব কথা প্রায়ই গোপন রাখা হয়।

যে স্থানে এই যুদ্ধ হইল তাহার তিব্বতীয় নাম আমরা জানিতাম না। রক্তে এই স্থান লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছিল বলিয়া জেনারেল সাহেব ইহাকে Red Gorge নামে অভিহিত করিলেন। গিয়াংসী হইতে ইহা প্রায় ৯ মাইল দক্ষিণে। যাহাহউক, যুদ্ধের পর আমরা আর বিশ্রাম করিবার অবসর পাইলাম না। তৎক্ষণাৎ রওনা হইলাম এবং পুনরায় নিয়াং নদীর তটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নদী পার হইবার পুল ছিল। কিন্তু শত্রুসৈন্য উহার ঠিক অপর দিকে অবস্থান করিতেছিল বলিয়া উহার প্রায় তিন মাইল উজানে এক স্থানে নদী পার হইলাম। তাহার পর নদীর কিয়দ্দূরে, এক উন্মুক্ত প্রশস্ত ময়দানে শিবির সন্নিবেশ করিলাম। শুনিলাম, সহরের প্রসিদ্ধ দুর্গ 'গিয়াংসীজং' আমাদের শিবির হইতে দুই মাইলের অধিক নহে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

উকিলের লাইব্রেরী।

ও কি গ্রন্থ? দণ্ডবিধি! ফেলে দাও দূরে।
ওখানা কি? কার্য্যবিধি! নিক্ষেপ সাগরে।
গাদা গাদা ওকি বাঁধা? ল-রিপোর্টার!
এখনি আগুন জ্বালি করহ সৎকার।
কি আশ্চর্য্য! জগতের জুয়াচুরী দিয়া
আলমারী গুলি তব ফেলেছ ভরিয়া?
হায় কত অর্থ বৃষ্টি কতই আগ্রহ,
করিয়াছে কুকাণ্ডের প্রকাণ্ড সংগ্রহ!
জ্বলিতেছে নামগুলি অনল অক্ষরে—
জাগে পাপ-প্রেত-আত্মা পঞ্জর ভিতরে।

ফেলে দাও গঙ্গাজলে, ধোও প্রতি স্তর!
পাপ-কলুষিত-কক্ষ—পাপের দপ্তর।
দিবা রাত্রি একি চর্চ্চা ? "ও করেছে খুন"—
"ও ছিঁড়েছে পাল ওর, ও ছিঁড়েছে গুণ।"—
"রহিম মেরেছে রামে না পাইয়া নুণ"—
"খোদা বকস্ হরিয়াছে মামুদের বোন্।"
"ফুলজান পান দিতে দেয় নাই চুণ—
চেরাগালী তাই তারে করিয়াছে খুন।"
"মজুর নালিয়া নিল ফজু কারকুন"—
"হরি দিছে মুরারির আড্ডায় আগুন"—
"নবীনের কান নিছে গদার শকুন"—
এই জপ—সিদ্ধি ওই টাকার একুন।
এই তন্ত্রে, এই মন্ত্রে গেঁথে গেঁথে নথি,
মুদ্রা গণি যায় দিন, অনিদ্রায় রাতি।
বিশ্ব সাক্ষী সাক্ষী ভাই, সাক্ষীগণ দিয়া
বলাও অনৃত কত অমৃত বলিয়া।
ফেলে দাও, রেখোনাকো দূর হো'ক্ ছাই,
জাল-জুয়াচুরী-বেদ আপদ বালাই।
নিত্য নিত্য লও কত "পরামর্শ-ফিস",
লও মোর পরামর্শ দিতেছি gratis।

* * *

সমস্ত আলমারা ব্যাপি আছে যত স্থান—
"ভগবৎ গীতা" মাত্র রাখ একখান।
প্রতি পত্রে রত্নমণি, রাখ যত্ন করে।
মনচোরা বাঁধা সেথা ভক্তি কারাগারে।
জাল-জুয়াচুরী-গাথা যদি ভাল লাগে,
সে প্রাণচোরার কথা পড় অনুরাগে।
গায়ে পর, হৃদে ধর, তাঁর নামাবলী,
ভব জলধির সেই একমাত্র জালী।
ফেলরে রজত মুদ্রা ফেলে দাও হেম,
সব চুরী চেয়ে ভাল চুরী তাঁর প্রেম।
"জাল" "জাল" জপনায় ছিঁড় মায়া-জাল
দূর হয়ে যাবে যত যন্ত্রণা-জঞ্জাল।
মরা মরা বলি রাম পেল রত্নাকর,
মনচোরা জপ, পাবে পরশ পাথর।
আসিবে তোমার তরে ত্রিদিবের রথ,
রাখ একখানি গ্রন্থ—"গীতা-ভগবৎ।"

৺মনোমোহন সেন।

মরিয়াম।

বঙ্গদেশে যে সকল ফল পাওয়া যায়, তাহা ব্যতীত ব্রহ্মদেশে আরও অনেক প্রকারের ফল দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি বাস্তবিকই সাধারণের পক্ষে খুব সুন্দর ও সুস্বাদু আর কতগুলি শুধু এদেশবাসীগণই পছন্দ করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে কয়েক রকম ফল কেবল তরকারীতেই খাওয়া যায়।

ফলাদির ভিতরে মরিয়াম ও ডুরিয়াম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। মরিয়ামের গাছ বহু ডাল পালা বিশিষ্ট। দেখিতে কতকটা বকুল গাছের মতন। ফলগুলি দেখিতে জলপাইয়ের মতন; তবে আয়তনে আরও বড় হইয়া থাকে। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে মরিয়াম পাকিয়া থাকে। পাকিলে সিন্দুরের মতন লাল হয়। সবুজ পত্রের পার্শ্বে রক্তিম মরিয়াম ফল সুশোভিত বৃক্ষগুলি চৈত্র ও বৈশাখ মাসে বড়ই মনোরম দেখায়। তখন মাণ্ডালে ও সেগা-ইনের (Sagaing) বাজারে বহু পরিমাণে মরিয়াম দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল জায়গাতেই নাকি মরিয়াম অধিক জন্মিয়া থাকে।

মরিয়াম অতি প্রয়োজনীয় ফল। কচি অবস্থায় উহার অম্বল সুস্বাদু ও হজমকারক। পাকিলে খুব টক। মিষ্ট মরিয়ামও পাওয়া যায়, তবে পরিমাণে খুব কম। ইহার গন্ধের সহিত আমের গন্ধের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। মিষ্ট মরিয়াম দুগ্ধেও খাওয়া যায়।

মরিয়াম শিয়াল ও কুকুরের কামড়ের ঔষধ। এখান-কার লোকেরা বলিয়া থাকে যে একটি মাত্র মরিয়াম খাইলে শিয়াল ও কুকুরের কামড়ের আভ্যন্তরিণ বিষ নষ্ট হইয়া থাকে। অপরিপক্ক অবস্থায় উহা আঁচার করিয়া রাখিলে, দেড় কি দুই বৎসর ভাল অবস্থায় থাকে। ইহার আঁচার সুস্বাদু ও রুচিকারক। মধুর

ভিতরে ডুবাইয়া রাখিলে বহু বৎসর অবিকৃত অবস্থায়ও থাকিতে পারে।

মরিয়াম সম্বন্ধে একটী বিস্ময়জনক প্রবাদ আছে। ব্রহ্মদেশে শিয়াল দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ম্মারা বলিয়া থাকে যে এ দেশে বহু মরিয়াম গাছ আছে; শিয়াল ঐ গাছের হাওয়া পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না; তাই শিয়াল দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে কুকুরের সংখ্যা এদেশে কম নহে। ইহা সত্য যে বঙ্গদেশে শিয়াল নাই অথবা এত কম যে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি ব্রহ্মের বহু স্থান ভ্রমণ করিয়াছি ও জঙ্গলময় স্থানে রাত্রিবাস করিয়াছি কিন্তু কখনও শিয়াল দেখি নাই অথবা শিয়ালের ডাক শুনি নাই। আমার একজন পোষ্টাফিসের ইনস্পেক্টার বন্ধুকে একথা জিজ্ঞাসা করায় তিনিও বলিলেন যে তিনি ব্রহ্মদেশে বিশ বৎসরের অধিক কাল বহু স্থানে গমন করিয়াছেন ও জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে অসংখ্যবার রাত্রি যাপন করিয়াছেন; কিন্তু তিনি কোথায়ও শিয়ালের ডাক শুনেন নাই। এদেশের বহু পুরাতন বাঙ্গালী অধিবাসীদিগকে একথা জিজ্ঞাসা করায় তাহারাও ঐ প্রকার বলিলেন। কারণ যাহাই হউক বিষয়টা আশ্চর্য্যই বটে।

শুনিতে পাই যে স্বনামধন্য খেদাধ্যক্ষ মিঃ ক্লার্ক সাহেব আজ প্রায় ১৫ বৎসর হইল ২৪টা শিয়াল ভারতবর্ষ হইতে সংগ্রহ করিয়া জাহাজে এদেশে আনিয়া উত্তর ব্রহ্মদেশে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এখন উহাদের কিম্বা উহাদের বংশধরগণের চিহ্ন পর্য্যন্তও ঐ অঞ্চলে পাওয়া যায় না। মরিয়ামের প্রভাবই বোধ হয় ইহার কারণ।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার।

অদ্ভুত স্বপ্ন।

(১)

বহু তৈল মর্দ্দন করিয়া বন্ধুবর দেবেন্দ্রনাথ যখন অবশেষে "ডেপুটিত্ব" রূপ অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিলেন, তখন বন্ধুবর্গের অনুরোধ একেবারে এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা একটা প্রীতিভোজ দিতে সম্মত হইলেন। আমরা এক পেট ক্ষুধা লইয়া সন্ধ্যার সময় তাঁহার গৃহে সমাগত হইলাম। বিখ্যাত গায়ক জনপ্রিয় বাবু তাঁহার সঙ্গীত সুধা দ্বারা আমাদের চিত্ত বিনোদন করিতে নিয়োজিত হইলেন; তাঁহার সুমিষ্ট স্বর লহরি অন্তঃস্থল স্পর্শ করিয়া আমাদিগকে অভিভূত করিয়া তুলিল।

অন্যান্য গানের পরে অবশেষে ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "তানসেন-বিক্রমাদিত্য-সংবাদ" গানটি হইল:—দুই জন বন্ধু কোরাস দিতেছিলেন। আমি একটি তাকিয়ার উপরে মাথা রাখিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের অসাধারণ প্রতিভার কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা টের পাই নাই। মনে হইল,—

প্রাতর্ভ্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে Esplanade এ গিয়াছি, তথা হইতে হাঁটিতে হাঁটিতে ক্রমে Hall and Anderson এর দোকানের সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম; সমস্ত দোকান পাট বন্ধ থাকায় স্থানটি যেন খাঁ খাঁ করিতেছিল! পার্শ্বেই Park Street, মনে করিলাম আর অধিক দূর অগ্রসর হইব না, Park Street দিয়া ঘুরিয়া Wellesleyর ট্রাম ধরিব; তদনুসারে কিছু দূরে যাইতেই দেখিলাম প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড ওয়ালা একটি বাড়ী; আরও নিকটে আসিয়া দেখিলাম, গেটের সম্মুখে শ্বেত পাথরের উপরে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে,—

Raja VIKRAMADITYA
of
UJJAINEE.

বুঝিলাম ইহাই রাজার কলিকাতাস্থ বাস ভবন; সম্মুখে দারোয়ান কটিদেশে তরোয়াল বাঁধিয়া পাহাড়া দিতেছিল, আমি প্রবেশ করিতে গেলে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক আমাকে যে দেখিতে পাইল সেরূপ কোন লক্ষণও দেখাইল না! রাজা বিক্রমাদিত্যের নাম বহুবার শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাঁহাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল হইল; আমি আর কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, বিস্তৃত সোপানাবলী অতিক্রম পূর্ব্বক রাজার ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করিলাম। রাজা তাঁর নব বন্ধুর সহিত বসিয়া খোস গল্প করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম ইঁহারা সেই নব রত্ন। তাঁহারাও যখন আমাকে

দেখিতে পাইলেন না,তখন ভাবিলাম, ইহা হয় তো আমার অশরীরী আত্মা হইবে অথবা মহাত্মা Stead কথিত Double নশ্বর বেশ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। কথা বার্ত্তা শুনিয়া বুঝিলাম,নবরত্নের এক জন—বাঙ্গালা মাসিকের সম্পাদক, এক জন ইংরাজী দৈনিকের সম্পাদক, এক জন ছোট গল্প লেখক, এক জন উদীয়মান কবি, এক জন সমালোচক, একজন লাইফ্ ইন্‌সিয়োরেন্স কোম্পানির ডিরেক্টার, একজন থিয়েটারের ম্যানেজার, একজন সঙ্গীত শিক্ষক ও একজন বিলেত ফের্ত্তা বেকার; ইঁহাদের মুখ্য কার্য্য হইতেছে, সকালে ও সন্ধ্যার পরে রাজার নিকটে আসিয়া আড্ডা জমানো, তাহার সহিত আর একটা ক্ষুদ্র গৌণ উদ্দেশ্যও আছে,—তাহা রাজার চা ও সিগারের ধ্বংস সাধন।

মাসিক সম্পাদক মহাশয় পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তাঁহার স্বর্ণ মণ্ডিত 'Pince nez' খানি ভাল করিয়া মুছিয়া লইলেন; তারপর পুনরায় উহা নাকে বসাইয়া বলিলেন, "দেখুন রাজা, আর ইতস্ততঃ করিবেন না, যাহা হয় একটা লিখিতে আরম্ভ করুন। বলিতেছেন, বাঙ্গলা লেখা আপনার অভ্যাস নাই, কিন্তু আপনার জীবনীর যে অংশটুকু "বেতাল পঞ্চবিংশতি" নামে বটতলা হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহা যদিও একটু juvenile, কিন্তু বেশ interesting জীবনের অন্যান্য more serious ঘটনাগুলি যদি একটু গুছাইয়া লিখিয়া দেন, তাহা হইলে আমি সানন্দে তাহা বাহির করিব। ভাষার জন্য ভাবিবেন না, বঙ্গভাষা এখন বেওয়ারিস; উহার স্বত্ব সম্বন্ধে ব্যারিষ্টারের বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও রায় বাহির হয় নাই।"

রাজা সিগারের ট্রেটি সম্পাদক প্রবরের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া সলজ্জে বলিলেন, "আচ্ছা, চেষ্টা করা যাইবে।"

ছোট-গল্প-লেখক মহাশয় হস্তস্থিত সিগার জ্বালাইবার পর 'vesta' র বাক্স সম্পাদক মহাশয়ের দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "যদি লিখিতেই হয়, তাহা হইলে নীরস 'জীবন চরিত' লিখিবেন না, কেহ পড়িবে না। তার চেয়ে 'ছোট গল্প' নাম দিয়া ছাই-ভস্ম যাহা লিখিবেন, তাহাই পাঠক বর্গ আগ্রহের সহিত পড়িবে। বাঙ্গলায় যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেন নাই তাঁহারা পর্য্যন্ত ছোট গল্প লেখক দিগের নাম একডাকে বলিয়া দিতে পারেন।"

উদীয়মান কবি মহাশয় কি বলিতে যাইতেছিলেন এমন সময় খানসামা ট্রের মধ্যে করিয়া একখানা টেলিগ্রাম্ রাজার হস্তে দিয়া বলিল "পিয়ন এইমাত্র দিয়া গেল হুজুর;" রাজা উহা পাঠ করিয়া আনন্দে টেবিল্ চাপরাইয়া বলিলেন, "Grand news"; তারপর সঙ্গীত-শিক্ষক মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন "গজেন্দ্র বাবু আপনি clubএ খবর দিবেন, বিখ্যাত ওস্তাদ মিঞা তানসেন অদ্য আমার বাড়ীতে আসিতেছেন, এই রাত্রেই তাঁহার গান হইবে। আমি His Majesty আকবর সাহর নিকট wire করিয়াছিলাম,—তানসেন তাঁহারই Court Musician কি না,—দিল্লি হইতে এই উত্তর আসিয়াছে; ওস্তাদজি পাঁচ দিনের বিদায় লইয়া আসিতেছেন, অদ্য প্রাতঃকালেই পৌঁছাইবেন।"

সকলে সমস্বরে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলে গজেন্দ্র বাবু উঠিয়া; বলিলেন,—"তাহা হইলে আমি এখন উঠি; আজ রবিবার, আমাকে সভ্যদিগের বাড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া clubএর subscription সংগ্রহ করিতে হইবে, সেই সঙ্গে সংবাদটাও প্রচার করিয়া দেওয়া যাইবে।"

গজেন্দ্র বাবু চলিয়া গেলে রাজা খানসামাকে আদেশ করিলেন শীঘ্র যেন Private Secretary মাধব বাবু, তাঁহার বড় মোটর গাড়ীতে করিয়া তানসেন মিঞাকে হাবড়া ষ্টেসন হইতে লইয়া আসে। তারপর ওস্তাদজির থাকিবার বন্দোবস্তের জন্য আর একটি কর্ম্মচারীকে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া বন্ধুবর্গের নিকটে আসিয়া বসিলেন।

'বিলাত ফের্ত্তা' মহাশয় দন্তের ভিতরে সিগার রাখিয়া "ফরাসী ধরণে" কাসিতে কাসিতে বলিলেন, "Rajah, there will be a grand party, this evening, eh? রাজা সস্মিত বদনে অদ্যকার উৎসবে সকলকে যোগদান করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া একবাজি "Auction Bridge" খেলিতে বসিলেন। তখন খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত "one in no trump" "Two

in hearts" প্রভৃতি চীৎকারে কক্ষটি মুখরিত হইয়া উঠিল। ক্রমে বার দুই rubber শেষ করিয়া নবরত্নের সকলেই একে একে প্রস্থান করিলেন; তথাপি ওস্তাদ্‌জির দেখা নাই! রাজা পুনঃপুনঃ French loindowর দিকে চাহিতে লাগিলেন। বলিতে কি আমিও তানসেন মিঞাকে দেখিবার জন্য কম উদ্‌গ্রীব হই নাই! কলিকাতার প্রায় সকল ওস্তাদই তাঁহার গানের যে প্রকার শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহাতে আসল লোকটাকে দেখিতে আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। যাহা হউক, আরও অর্দ্ধঘণ্টা পড়ে মোটর ভেঁপু বাজাইয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিল। রাজা ওস্তাদ্‌জিকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য নীচে নামিয়া আসিলেন। তানসেন মিঞাকে দেখিয়া কিন্তু বড়ই নিরাশ হইতে হইল! আমি ভাবিয়াছিলাম তাঁহার চেহারা এমনই কোমল ও সুন্দর হইবে যেন দেখিয়াই মনে হয় লোকটার দেহ শুধু রাগ, রাগিনী, গমক, মূর্চ্ছণা দ্বারাই নির্ম্মিত,—নিশ্বাস প্রশ্বাসের ভিতরে ছন্দ যেন আপনি ধরা দেয়; কিন্তু লোকটাকে সে রকম কিছু না দেখিয়া মন স্বতঃই খারাপ হইয়া গেল। যাহা হউক, রাজা তাঁহার হস্ত মর্দ্দন করিয়া বলিলেন"মহাশয়ের নাম অবগত ছিলাম, অদ্য দেখিয়া ধন্য হইলাম। আপনি কি রাস্তায় কোথাও নামিয়াছিলেন,এত বিলম্ব হইল যে?"

ওস্তাদ্‌জি প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিলেন, না মহাশয়, 'হুগলি ব্রিজ্‌' পার হইয়াই আপনার বাড়ীতে উঠিতেছি; ট্রেণটাই আজ একটু late হইয়া গিয়াছে।

রাজা ওস্তাদ্‌জিকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে লইয়া গেলেন; খানসামা ইতিপূর্ব্বেই টেবিলের উপরে চায়ের সরঞ্জাম ও টোষ্ট, ডিম প্রভৃতি রাখিয়া গিয়াছিল, রাজার অনুরোধে ওস্তাদ্‌জি খাইতে বসিলেন। রাজা বলিলেন, "চা পানান্তে গোসল করিয়া হাজ্‌রি খানা মুখে দিন। Long journeyতে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছেন, একটু বিশ্রাম আবশ্যক। আজ রাত্রে বহু গণ্য মান্য লোক আপনার গান শুনিতে আসিবেন।"

তানসেন ব্যস্তভাবে বলিলেন, "তাহা হইলে শীঘ্র একজন লোক ষ্টেসনে পাঠাইয়া দিন, আমার বাদ্যযন্ত্র গুলি লইয়া আসুক; 'পিয়ানো' আর 'ব্যাঞ্জোর' 'টিউন্‌' আমাকে দুপুর বেলাই ঠিক করিয়া লইতে হইবে। নিজের যন্ত্র না হইলে আমার গান ভাল জমে না, তাই, দিল্লি হইতে এসকল সঙ্গে করিয়া আনিতে হইয়াছে; এগুলি সব France হইতে special order দিয়া আনীত"।

রাজা তৎক্ষণাৎ প্রাইভেট সেক্রেটারিকে ডাকাইয়া বাদ্যযন্ত্র গুলি আনাইতে আদেশ দিলেন।

(২)

সান্ধ্য-ভ্রমণ করিতে করিতে পুনরায় উজ্জয়িনীর রাজ বাটীতে আসিলাম! দেখিলাম, সিংহদ্বার নানা প্রকার পত্র, পুষ্প ও পাতাকাদ্বারা সজ্জিত হইয়া উৎসব বেশ ধারণ করিয়াছে; বড় বড় দুইটি arch light বহু দূর পর্য্যন্ত তীব্র আলোক বিকীর্ণ করিয়া রাস্তার অগণিত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। আমি নূতন পোষাকে আবৃত-সশস্ত্র-দরোয়ানদ্বয়ের পার্শ্ব দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম; সোপানের উপরে লাল সালু দেওয়া হইয়াছিল, উহা অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতেই দেখিলাম, সম্মুখস্থ বৃহৎ হল্‌টিতে বিস্তৃত ফরাস ও মছ্‌লন্দ পাতিয়া রাখা হইয়াছে; মাঝে মাঝে আতরদান, গোলাপদান এবং রৌপ্য পাত্রে রক্ষিত সোনালি তবক দিয়া মোড়া সুগন্ধি পান রহিয়াছে। উপরে ইলেক্‌ট্রিক্‌ ঝাড় হইতে শত শত বাতি নানারঙ্গের বাল্‌ব্‌ দিয়া রঙ্গিন রশ্মি বাহির করিয়া কক্ষটিকে রামধনুর ন্যায় সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে! স্বয়ং রাজা তাঁহার নব রত্নের সহিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন।

ক্রমে হল্‌টি কলিকাতার ধনবান ও জ্ঞানবান লোক দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গেল; তখন রাজা ও তাঁহার নবরত্নগণ তানসেন মিঞাকে লইয়া মস্‌নন্দের মধ্যভাগে বসিলেন।

শুনিলাম গান করিবার সময় তানসেন মিঞার হস্ত পদাদি এত ভীষণ ভাবে সঞ্চালিত হইয়া থাকে যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'হরিপদ' কেও হারমানাইয়া দেয়;—কোনও বাদ্য যন্ত্র এমনকি তানপুরা পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে তখন বাজানো সম্ভবপর হয়না। গান করার দরুণ তাঁহাকে জীবনে নাকি আর স্বতন্ত্র কোনও ব্যায়াম

করিতে হয় নাই!—কাজেই গজেন্দ্র বাবু প্রভৃতির উপর পিয়ানো ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রাদি বাজাইবার ও তাঁহাদের সতর্ক যত্ন লইবার ভার পড়িল।

অর্দ্ধঘণ্টাকাল সুর ঠিক করিয়া লইয়া ওস্তাদ্‌জি প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের "তোমারি রাগিণী জীবন কুঞ্জে" ধরিলেন। গান শুনিয়া বুঝিলাম লোকটা ওস্তাদ বটে; কারণ কথা গুলি যদি স্পষ্ট বুঝিতে না পারিতাম, তাহা হইলে সুর কিম্বা মুখভঙ্গি কিছু দ্বারাই মনে হইত না যে উহা সেই সর্ব্বজন পরিচিত ঈশ্বর সঙ্গীত। যাহাহউক ৬৪ গুন বাঁট করিবার পর যখন 'সম্' এ আসিয়া থামিলেন, তখন সকলেই ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া পড়িয়াছিলেন।

গান থামিতেই রাজা করজোরে বলিলেন, "মহাশয়! আমরা কলিকাতাবাসী; রবীন্দ্রনাথের গান বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম জিনিষ হইলেও, তাহা শোনা আমাদিগের পক্ষে কিছুমাত্র আয়াস সাধ্য নয়। যাহাতে ভারতীয় সঙ্গীত কলার শ্রেষ্ঠত্ব সহজে উপলব্ধি করিতে পারি, এই রূপ গান হউক।"

তখন ওস্তাদ্‌জি উর্দ্দু ভাষায় একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেন; আমি একজন মৌলবী রাখিয়া কিছুদিন উক্ত ভাষার চর্চ্চা করিয়াছিলাম, সুতরাং তাঁহার বক্তৃতা বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হইল না। উপসংহারে তিনি বলিলেন, "ভারতীয় সঙ্গীত কলার বিশেষত্বই হইতেছে—উহার রাগ ও রাগিণী; এগুলি এমন ভাবেই গঠিত যে যথাসময়ে রাগিণীতে তান উঠিলে উহার ভিতরকার গুঢ়তম ভাবটা ফুটিয়া না উঠিয়াই পারেনা। সকলকে এসম্বন্ধে Music Doctor Alfred Westharp মহোদয় Royal Asiatic Society র Bengal branch এ যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তবে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত আমি আর একটু যোগ করিয়া দিতে চাই; ভারতীয় সঙ্গীতকলা শুধু মনস্তত্ত্বময় নহে, উহাতে পদার্থ বিজ্ঞানের অস্তিত্বও যথেষ্ট পরিমাণ আছে। আমি দুইটি গান গাহিয়া আপনাদিগকে তাহার প্রমাণ দিব।"

এই বলিয়া ওস্তাদ্‌জি মল্লার রাগিণীতে একটা গান ধরিলেন; রাজা সকলের অগ্রে বসিয়াছিলেন, সুতরাং ওস্তাদ্‌জি তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়াই গাহিতে লাগিলেন। গানের 'আস্থায়ী' পার হইতে না হইতেই দেখি রাজার কপালে বিন্দু বিন্দু জল কণা সঞ্চিত হইয়াছে! উহা ঘাম না জল তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলামনা; কিন্তু সে সন্দেহ বড় বেশীক্ষণ রহিলনা; গান 'অন্তরার' শেষ সীমায় পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার চুল ও পোষাক রীতিমত সিক্ত হইতে লাগিল! ইলেক্‌ট্রিক্ ফ্যানের হাওয়ায় রাজা কাঁপিতে লাগিলেন! কিন্তু সে রকম অবস্থায় কোন উচ্চ বাচ্য করিয়া গানটা নষ্ট করা যায় না, তাই খানসামা Water proof আনিয়া দিলে তিনি তাহা গায়ে দিয়া গানের 'সঞ্চারী' ও 'আভোগ' অংশটুকু শুনিলেন। আভোগের সময় মৃদু মৃদু মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ হইয়াছিল; তবে উহা রাস্তার গাড়ীর শব্দ কিনা তাহা ঠিক বলিতে পারিনা। যাহাহউক উপস্থিত সুধীবর্গ ভারতীয় সঙ্গীত কলায় পদার্থ বিজ্ঞানের এতাধিক অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়া যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তখন ওস্তাদ্‌জি বলিলেন "এইবার আমি 'দীপক' গাহিব, আপনারা শুনুন।"

রাজা 'মল্লার' শুনিয়া এইমাত্র বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং সম্মুখে বসিয়া পুনরায় 'দীপক' শুনিতে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা হইল না। তিনি উঠিতেই ওস্তাদ্‌জি লজ্জিত হইয়া বলিলেন," এবার কাহারও দিকে মুখ ফিরাইব না, দৃষ্টি আমার নিজের দেহের উপরেই আবদ্ধ থাকিবে।"

আমার কিন্তু কথাটা শুনিয়াই বুক ধড়াস ধড়াস করিয়া উঠিল; মনে হইল, পূর্ব্বেই গান গাওয়ার দরুণ ওস্তাদ্‌জির ভিতরকার 'ভারতীয় সঙ্গীত কলা শক্তি, যেরূপ উস্কানো অবস্থায় আছে, তাহাতে এখনই 'দীপক' গাহিলে একটা কিছু অনর্থ ঘটিতে পারে। কার্য্যেও তাহাই হইল; 'দীপক' রাগিণীতে এক তান দিতেই তৎক্ষণাৎ ওস্তাদ্‌জির পায়জামা ধরিয়া উঠিল! তখন মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল; কেহ ওস্তাদ্‌জির কাপড় নিভাইতে ব্যস্ত, কেহ জল আনিতে ব্যস্ত, কেহ 'আপন বাঁচাইতে' ব্যস্ত,—মহা হট্টগোল—চীৎকার। গজেন্দ্র বাবু গজের ন্যায় শরীর লইয়া পিয়ানোর ডালা চাপা পড়িলেন; ছোটগল্প লেখক এবং উদীয়মান কবিতে এমনই মাথা

ঠোকাঠুকি হইয়া গেল যে তাঁহাদের কপাল ফুলিয়া উঠিয়া সেখানেও এক একটা পকেট এডিসনের মাথার ন্যায় দেখাইতে লাগিল; বিলাত ফের্ত্তা মহাশয় 'বাঙ্গালিরই মত চম্পট পরিপাটি' দিবার মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া, লাফাইবার জন্য যেই একখানা চেয়ারের উপরে উঠিয়াছেন, অমনই ইলেক্ট্রিক্ ফ্যানের চলন্ত ব্লেডে মাথা কাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল! স্বয়ং রাজা এরূপ ভাবে পড়িয়া গেলেন যে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিবার সামর্থ্যও তাঁহার রহিল না। যাহা হউক নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগের গায়ে ছিটাইবার জন্য বারান্দায় কয়েক বাল্‌তি গোলাপ জল ছিল, তাহাই ঢালিয়া সেক্রেটারি মাধব বাবু কোনও রকমে আগুন নিভাইলেন, কিন্তু তখন ওস্তাদ্‌জির সর্ব্বাঙ্গে ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছিল! আমি ভাবিলাম কল্য প্রাতে এঘটনা নিশ্চয়ই নানা রংএ রঞ্জিত হইয়া "Statesman" প্রভৃতিতে বাহির হইবে, এবং তাহাতে তানসেন মিঞার 'গীতবাদ্য' নিশ্চয়ই জগৎময় প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। এসকল কথা ভাবিতেছি এমন সময় কে আমার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিল, চাহিয়া দেখি, ইনি নবরত্নেরই একজন। তিনি কর্কশ স্বরে বলিলেন, "কে হে তুমি এখানে দাঁড়াইয়া? তোমাকে নিশ্চয়ই invite করিয়া আনা হয় নাই।" আমি আত্মাকে হটাৎ অশরীরী অবস্থা হইতে সশরীরীতে পরিণত হইতে দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলাম। কি বলিতে যাইতে ছিলাম এমন সময় রত্ন মহাশয় বিরাশী সিকার ওজনে এক ধাকা মারিলেন! সেই ধাকাতেই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখি, সে রত্নটি আর কেহই নহে, বন্ধুবর দেবেন্দ্রনাথ; তিনি বলিতেছেন, "খুব ঘুমাইতেছ যে! এত ধাকাইতেছি তবু বাবুর ঘুমই ভাঙ্গে না! উঠ অন্ন প্রস্তুত।"

তখন বুঝিলাম, এতক্ষণ যাহা দেখিয়াছি, তাহার সকলই স্বপ্ন। খাইতে খাইতে স্বপ্ন বিবরণ সকলের নিকট প্রকাশ করিলাম; তখন এসম্বন্ধে নানাপ্রকার সমালোচনা চলিল। একজন দার্শনিক বন্ধু বুঝাইয়া দিলেন—জন প্রিয় বাবুর গান এত মর্ম্ম স্পর্শি হইয়াছিল যে ঘুমাইলেও তাহাই স্বপ্নে দেখিয়াছি। বন্ধুবর দীনেশচন্দ্র প্রায় তিনবৎসর হইল "থিওজফির গর্ত্তে" পড়িয়া গিয়াছিলেন, অদ্যাবধি উঠিতে পারেন নাই; তিনি বলিলেন "এই স্বপ্ন বিবরণ London এর Theosophical Societyতে পাঠানো উচিত; আত্মা সম্বন্ধে নূতন theory বা হির হইতে পারে।"

শ্রীঅমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী।

মিলন।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

সতর বৎসরের যুবক ধনরাজ স্বাবলম্বনে জীবিকা অর্জ্জন মানসে আজ ছাপ্রা জিলা হইতে বঙ্গের এক সুদূর পল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নিঃসম্বল সে যুবক। পরিধানে একখানি জীর্ণ বস্ত্র, মস্তকে একখানা চাদর জড়ান এবং বগলে একটি পুরাতন জীর্ণ ছাতা। তুলসী দাসের অসম্পূর্ণ দোহা গাহিয়া গাহিয়া সে নিঃস্বহায় যুবক দৈনিক যাহা কিছু উপার্জ্জন করিত, তাহা হইতে যৎকিঞ্চিৎ ব্যয় করিয়া কখনও ছাতু কখনও ভুংরি খাইয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিল। এইরূপে সপ্তাহ কাল কাটাইয়া একদিন অপরাহ্নে সে পুরাতন পাদুকা সংস্কারোপযোগী কয়েকটী অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া লইল।

সারা দিন কাজ করিয়া ধনরাজ যাহা উপার্জ্জিত করিত, তাহা হইতে ২।১ পয়সার কিছু খাইয়া দিন যাপন করিত এবং সন্ধ্যার পরে এক মুঠা অন্নের যোগার করিত। শয়নের জন্য তাহার কোনও ভাবনা ছিল না। পথিপার্শ্বে বটবৃক্ষ তলেই তাহার সুখ-শয্যা রচিত হইত। মেঘ বর্ষণের সম্ভাবনা দেখিলে কখনও কোনও গৃহের বারেন্দায়ও সে আশ্রয় গ্রহণ করিত।

সেদিন অবিরাম বারিপাত হইতেছিল। ধনরাজ অন্যোপায় হইয়া নিকটস্থ স্কুল গৃহের বারেন্দার একপার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল। অবিরাম প্রবল বর্ষণে অন্যত্র স্থান না পাইয়া কয়েকটি গ্রাম্য কুকুরও তাহার একধারে লাঙ্গুল গুটাইয়া পরমানন্দে নিদ্রা যাইতেছিল। সে সময় মুখ প্রক্ষালন মানসে স্কুলের প্রধান শিক্ষক রামতারণ মুখোপাধ্যায় বারেন্দার এক পার্শ্ব দিয়া এক গাড়ু জল

হস্তে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিতেছিলেন। বিবাহাদি না করাতে স্কুল গৃহের একটি কক্ষেই তাহার স্থান সঙ্কুলন হইত। এবং তথায় তিনি স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতেন। তাহার হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থা ছিল; কিন্তু লোকে তাঁহার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি দেখিয়া তাঁহাকে গোঁড়া হিন্দু নামে অভিহিত করিত। রামতারণ বাবু বারেন্দাতে উঠিয়াই দেখিতে পাইলেন যে কয়েকটি কুকুর পরিবেষ্টিত হইয়া একখানা জীর্ণ বস্ত্র গাঁয়ে কে যেন বসিয়া রহিয়াছে। তিনি "ওখানে কে?" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ধনরাজ তখন ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করতঃ যোড় হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। "নারায়ণ, নারায়ণ" বলিয়া—গাড়ু মাটিতে রাখিয়া মস্তকে দুই হাত স্থাপন করতঃ মাষ্টার মহাশয় আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন— "ভগবান আজ কি রক্ষাই করিয়াছেন!" এই জলে মুখ প্রক্ষালন করিলে এখনই পতিত হইতাম। অতঃপর ধনরাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"বেটা, চামার আজ তুই দুরভিসন্ধি করিয়াই আমার জাতি নষ্ট করিবার উপক্রম করিয়াছিলি। ভাল চাস তো এখনি বেরো।"

ধনরাজ উত্তর করিল, "হুজুর সন্ধ্যার সময় অন্যত্র স্থান পাইব না মনে করিয়াই এখানে আসিয়াছি। আমার কি কয়েকটা কুকুরের পার্শ্বেও স্থান হইতে পারে না?" এই কথা শুনিবা মাত্র রামতারণ বাবু ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি ধার করিলেন, এবং পায়ের কাষ্ঠ পাদুকা ধনরাজের গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া সরোষে বলিয়া উঠিলেন—"বেটার যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! দূরহ এখান হ'তে। নীচ চর্ম্মকার হইয়া ব্রাহ্মণের সহিত বিচার! জানিস্‌না তোর ছায়া স্পর্শে স্নান করিতে হয়!" ধনরাজ বিনা বাক্য ব্যয়ে মাষ্টার মহাশয়কে পুনরায় অভিবাদন করিয়া প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল। মাষ্টার মহাশয়ের পাদুকা, নীচ জাতির স্পর্শে কলুষিত হইয়াছে বলিয়া সে রাত্রে তথায়ই পড়িয়া রহিল। তিনি পুনরায় পুষ্করিণীতে যাইয়া হাত মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

দরিদ্র ধনরাজ স্কুল গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া এক অশ্বশালায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। সে অবধি সে আর অপর কোনও ভদ্র-গৃহে পদার্পণ করিবার কোনও প্রয়োজন বোধ করে নাই। কিছুদিন পরে একখানা "শিশু গ্রন্থ" সংগ্রহ করিয়া সে নাগরী বর্ণ পরিচয় শিক্ষা করিতে লাগিল। সে পথি পার্শ্বে বসিয়া অবসর সময়ে অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকিত। তাহার একাগ্রতা দেখিলে মনে হইত যেন অধ্যয়নই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য। কিছু দিনের মধ্যেই বর্ণমালা শেষ করিয়া তুলসির রামায়ণ পড়িতে আরম্ভ করিল। রামায়ণ পড়িবার সময়ে সে যে অতুল আনন্দ উপভোগ করিত, তাহা তাহার উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীত হইত। অশ্বশালার অশ্ব-রক্ষকগণ ধনরাজ আসার পূর্ব্বে নানারূপ অসভ্য আমোদে দিন কাটাইত; এখন ধনরাজকে পাইয়া তাহারা সে সব ছাড়িয়া রাত্রিতে ধনরাজের ভজন গান ও রামায়ণ পাঠ শুনিত। এবং ধনরাজের সহিত তন্ময় হইয়া যাইত। সে সময়ে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সে অল্প কিছু সময় মাত্র কাজ করিত। তাহার টাকা পয়সার দিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। যে যাহা দিত তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিত।

এক ঔষধালয়ের পার্শ্বেই ধনরাজ অবস্থান করিত। আজ সে ডাক্তার বাবুকে জানাইল তীর্থ ভ্রমণ মানসে সে ৺চন্দ্রনাথ যাইবে এবং তাহার একখানা কম্বলের অভাব। ডাক্তার বাবুর নিকট তাহার কিছু পাওনা ছিল; এবং তিনি তাহার গুণে বিশেষ মোহিত ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় একখানা কম্বল যোগার করিয়া দিতে সম্মত হইলেন। সন্ধ্যার সময়ে ধনরাজ ঔষধালয়ে আসিয়া উপস্থিত। কাল ভোরে সে তীর্থ যাত্রা করিবে। সেখানে কয়েকটি ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। ধনরাজের ইতি-হাস শুনিয়া সকলেই কিছু কিছু সাহায্য করিলেন। অধিকন্তু থানার দারোগা বাবুর সহিত ৺চন্দ্রনাথের মহান্তের বিশেষ পরিচয় থাকাতে তিনি একখানা সুপারিশ পত্রও লিখিয়া দিলেন। ধনরাজ টাকা পয়সা লইতে প্রস্তুত ছিল না। সে চাহিতেছিল মাত্র একখানা কম্বল। যাই হউক সকলের বিশেষ অনুরোধে সে, ঐ অর্থ গ্রহণ করিল।

(২)

হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় বহুকাল সব্ জজের কার্য্য

করিয়া এখন পেন্সন লইয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে ৺কাশীবাস মানসে বাঙ্গালী টোলাতে একখানা বাসা ভাড়া করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। তাহার দুই পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রদ্বয় একজন মুন্সেফ্ ও একজন ইঞ্জিনিয়ার চাকরী উপলক্ষে উভয়েই সপরিবারে বিদেশে আছেন। একমাত্র কন্যা হেমনলিনী বৃদ্ধ পিতামাতার সহিত ৺কাশীধাম অবস্থান করিতেছে। হেমনলিনীর রূপ লাবণ্যের খ্যাতি অল্প দিনের মধ্যেই বাঙ্গালী টোলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এবং তাহার গুণে আশপাশের সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল! হেমনলিনী বৃদ্ধ বয়সে জন্মিয়াছিল বলিয়া পিতামাতার বড়ই আদরের ছিল। কিন্তু অতি আদরে লালিত পালিত হইয়াও তাহার স্বভাবের মাধুর্য্য নষ্ট হয় নাই। স্নেহের মেয়েকে পরের ঘরে দিতে হইবে বলিয়াই হউক, অথবা পিতা মাতা কুলীনে সৎপাত্র খুঁজিতে সময় লাগে বলিয়াই হউক হেমনলিনীকে কিছু অধিক বয়সে বিবাহ দিয়াছেন। আজ দুই বৎসর হয় হেমের বিবাহ হইয়াছে। সম্প্রতি দেশ হইতে বৃদ্ধ হরিহর বাবু, বৈবাহিকের অনুমতি গ্রহণ করিয়া হেমনলিনীকে কিছু দিনের জন্য নিজের কাছে, ৺কাশীধামে আনিয়াছেন।

আজ হরিহর বাবুর বাড়ী নিস্তব্ধ, যেন এক বিপদের ছায়া পড়িয়াছে। গল্লির সম্মুখে একখানা গাড়ী দণ্ডায়মান। বাড়ীর উপর তালার এক কক্ষে পল্লীর কয়েকটী ভদ্র লোক মৌনভাবে বসিয়া রহিয়াছেন। ডাক্তার অতুল বাবু রোগীকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া ঐ কক্ষে আসিয়া গম্ভীরভাবে বসিলেন। তাহাকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখিয়া সকলেই উদ্বিগ্ন হইলেন এবং তাহাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন; "ডাক্তার বাবু, আপনি রোগীর অবস্থা কিরূপ মনে করেন ?"

ডাঃ-বাবু—"রোগীর অবস্থা তত ভাল নয়। তবে আমার ইচ্ছা হয় একবার ডাক্তার সাহেবের সহিত পরামর্শ করি।"

সকলেই ইহাতে একবাক্যে সম্মতি দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ ডাক্তার সাহেবের জন্য চলিয়া গেলেন; ডাক্তার সাহেব রোগীকে পরীক্ষা করিয়া অতুল বাবুর সহিত কি পরামর্শ করিলেন। অতঃপর রোগীর শরীরে পিচকারী দ্বারা বিষ প্রয়োগ করাইয়া দিয়া একখানা ব্যবস্থা পত্র রাখিয়া চলিয়া গেলেন। অতুল বাবু যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে, "ডাক্তার সাহেবের মতে রোগী একরূপ চিকিৎসার বাহির হইয়াছে। তবে ইহাই আমাদের শেষ চিকিৎসা! ইহাতে উপসর্গের কোনও বৈলক্ষণ্য না হইলে আপনারা অন্য চেষ্টা করিতে পারেন।" ডাক্তার বাবুর এই কবুল জবাব শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। হরিহর বাবু পাগলের মত এঘর ওঘর করিতে লাগিলেন; এবং ঘন ঘন ধূমপান করিতে লাগিলেন। পার্শ্বের বাড়ীর মেয়েরাও ডাক্তারদের জবাব শুনিয়া রোগীকে শেষ দেখা দেখিতে আসিয়াছেন। সুধা হেমনলিনীর সমবয়স্কা। অল্প দিনের মধ্যেই উভয়ের বেশ সদ্ভাব হইয়াছিল। সেও সেই সঙ্গে আসিয়াছিল। সকলেই রোগীর শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া। রোগী অনবরত প্রলাপ বকিতেছে। মাঝে মাঝে কি যেন সাধু সন্ন্যাসীর কথা বলিতেছে। এই প্রলাপ শুনিয়া সুধা তাহার মাতাকে অন্তরালে নিয়া কি বলিল। ইহার পর প্রকাশ পাইল, রোগীর জ্বর হওয়ার পূর্ব্ব দিন সে সুধার সহিত দশাশ্বমেধের ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিল। বাড়ী ফিরিয়া আসিবার সময়ে—পথিপার্শ্বে এক সন্ন্যাসী বসিয়াছিল, লোকের জনতাতে তাঁহার পাশ ঘেরিয়া আসার সময় হেমনলিনী সন্ন্যাসীর ছায়া পদ দলিত করিয়া আসে। পর মুহূর্ত্তেই উভয়ের মনে হইল যে কার্য্যটি অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে। তাহারা ফিরিয়া যাইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল; কিন্তু সন্ন্যাসী ধ্যানস্থ থাকাতে কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিল না। উভয়ে ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে ফিরিল।

এই কাহিনী শুনিয়া বৃদ্ধদের সকলের মত হইল যে সন্ন্যাসীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা ভিন্ন রোগ প্রতিকারের আর অন্য উপায় নাই। তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ হরিহর বাবু সুধাকে সঙ্গে করিয়া সন্ন্যাসীর উদ্দেশে বাহির হইলেন। পথে কিছু ফল সংগ্রহ করিয়া লইলেন। গঙ্গারধারে যাইয়া সুধার নির্দ্দেশ মত উভয়ে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী বৃদ্ধকে পদ প্রান্তে দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল এবং তাহাকে ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। হরিহর বাবু সমস্ত অবস্থা বিবৃত

করিলেন। সন্ন্যাসী বলিল; "বাবা, আমি সামান্য মানব মাত্র। ৺বিশ্বেশ্বরের নিকট প্রার্থণা কর, ফল পাইবে।" হরিহর বাবু সন্ন্যাসীকে ফল মূল অর্পণ করিলেন। সন্ন্যাসী উহা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিল। বলিল, "বাবা, ভগবান আজ আমার আহার প্রদান করিয়াছেন, আজ আর কোনও আহারের আবশ্যক নাই।" হরিহর বাবু ঐ ফলের ডালি সন্ন্যাসীর পাদস্পর্শ করাইয়া প্রসাদ রূপে গ্রহণ করিলেন, এবং সন্ন্যাসীর ধুনি হইতে কিছু ভস্ম আহরণ করিয়া সুধার সহিত বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বাসায় আসিয়া হেমকে প্রসাদী ডাবের জল একটু একটু খাওয়াইতে লাগিলেন। এবং ধুনির ভস্ম কপালে ও বক্ষে লেপন করিয়া দিলেন।

হেমের স্বামী আজ চারি বৎসর যাবত পাটনায় ওকালতী করিতেছিলেন। টেলিগ্রাম পাইয়া রাত্রিতে আসিয়া পঁহুছিয়াছেন। গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়াই তিনি রোগীর শয্যা পার্শ্বে উপবেশন করিলেন ও শুশ্রূষার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। আহার করিতে অনুরোধ করিলে—তিনি ক্ষুধা নাই বলিয়া তাহা প্রত্যাখ্যাণ করিলেন। শুশ্রূষার সময় অল্প আছে মনে করিয়াই যেন রোগীকে মুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়িতে ইচ্ছা হইতে ছিল না।

ভগবানের ইচ্ছায় শেষ রাত্রিতে জ্বর কমিতে লাগিল। বেলা প্রায় ৭ সাত টার সময় জ্বরের সম্পূর্ণ বিরাম হইল। কক্ষে অপর কেহই ছিলনা, কেবল হেমও তাহার স্বামী। রোগী স্থির দৃষ্টিতে স্বামির মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল "জল"। তিনি তৎক্ষণাৎ গঙ্গা জল মিশ্রিত ডাবের জল রোগীর মুখে তুলিয়া দিলেন। অতিধীরে হেম জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কখন আসিলে।" তিনি আনন্দে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, যেন তাহার বাক্‌রোধ হইয়া সমস্ত প্রাণের আবেগ উত্তপ্ত জলের মত চক্ষেতে আসিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের এই মিলন সময়ে সুধা আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। এই সময়ে সুধাকে দেখিয়া হেমের রোগ ক্লিষ্ট মুখ ঈষৎ রক্তিমাভা ধারণ করিল। সুধার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া স্বামীকে মৃদু স্বরে বলিল; "আমার দিদি, সুধা।" তিনি সহাস্য বদনে করপুট যুক্ত করিয়া সুধাকে অভিবাদন করিলেন। মুহূর্ত্তেই যেন কত পরিচয় হইয়া গেল। সুধা হাসিয়া বলিল—"জামাই বাবু আপনার বিরহেতেই হেম মরিতে বসিয়াছিল, নচেৎ আপনার স্পর্শ মাত্রেই জ্ঞান লাভ করিল কিরূপে?"

ক্রমে বাড়ীর ও পাড়ার সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধেরা বলিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসীর কৃপায় রোগী এবার জীবন লাভ করিয়াছে। ডাক্তার অতুল বাবু শুনিয়া বলিতে লাগিলেন; উহা আর কিছু নয় আমাদের ঔষধের গৌন ফল। কিন্তু কোনও কোনও অবিশ্বাসী যুবক বলিতেছিল যে অতিরিক্ত ঔষধ প্রয়োগে রোগ জটিল হইয়া পড়িয়াছিল এবং ঔষধ ক্ষান্ত করা হইয়াছে বলিয়াই রোগী এ যাত্রা রক্ষা পাইল।

ক্রমে হেম সারিয়া উঠিল। কিছুদিন পরে একদিন সন্ধ্যা সময়ে স্বামী স্ত্রীতে মিলিয়া সন্ন্যাসীর চরণ বন্দনা করিতে চলিলেন। সুধাও সঙ্গে গেল। তিন জনে ৺শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরে আরতি দর্শন করিয়া আসিয়া সাষ্টাঙ্গে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদ প্রান্তে উপবেশন করিলেন সন্ন্যাসী ধ্যানস্থ ছিলেন; কিছু কাল পরে চক্ষু মেলিয়া দুইটি রমণী মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; "মা, তোমরা এখানে কেন?" এই প্রশ্ন শুনিবা মাত্র যোড় হস্তে হেমের স্বামী পশ্চাৎ হইতে বলিলেন, "প্রভো, আমার স্ত্রী এবার আপনার কৃপাতেই জীবন লাভ করিয়াছে।" ক্রমে হেম ও সুধা সমস্ত কাহিনী সন্ন্যাসীর নিকট বিবৃত করিল। সন্ন্যাসী সহাস্যে বলিলেন "মা, তোমরা মহামায়া, তোমরা সকলই করিতে পার এ সকল তোমাদের লীলা।" সন্ন্যাসী যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—"প্রার্থনা মানুষের কাছে নয়, প্রার্থনা করিতে হয় দেবতার কাছে, কারণ তিনিই একমাত্র নিয়ন্তা। ভেদ জ্ঞান ভুলিয়া ভগবানের প্রিয় কার্য্য সাধন করাই প্রকৃত সাধনা।"

সে সময় ধুনির কাষ্ঠ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। এবং কিছু সময়ের জন্য সকলের মুখই স্পষ্ট দেখা গেল সন্ন্যাসী ও যুবক উভয়েই উভয়কে চিনিল। হেমের স্বামী আসিয়া সন্ন্যাসীর পদ প্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। সন্ন্যাসীও তাহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিলেন। দুইটি রমণী অবাক হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।